ভুটিয়া স্ত্রীলোক।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযুবালা দত্ত

সম্পাদিত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

১৩১৭

ঢাকা ;
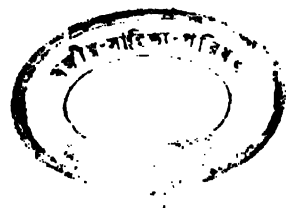
উয়ারী, "ভারত-মহিলা" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ২।৶০ দুই টাকা দশ আনা।

সূচীপত্র।

শ্রীমতী জুবেইদা আলি আকবর।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৬ষ্ঠ ভাগ। | বৈশাখ, ১৩১৭। | ১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

আকুল পিপাসা,
তোমারে লভিব হৃদে, এ দারুণ আশা
সদা পূর্ণ করে প্রাণ। সদা সাধনায়
বন্দী করে রাখি তোমা হৃদয়-কারায়!
কি আকুল তৃষা মোর, কি আশা আমার,
অন্তর্য্যামী জান সবই, কি জানাব আর!
যখন যে ভাবে থাকি যেন সর্ব্বক্ষণ,
শুধু ওই রূপজ্যোতি হেরে ও নয়ন!
যখন যে ভাবে থাকি, হৃদয়ে আমার,
লভি ও পরশ তব সুধা সান্ত্বনার।
আমারে ঘিরিয়া থাক, থাক মোর সাথে,
এ হৃদয়ে বন্দী থাক, দিবস-নিশীথে।
সত্য জ্ঞান বিশ্বাসেতে পূর্ণ থাক্ হিয়া,
অন্ধকারে দিব্যজ্যোতি, থাক উজলিয়া।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

শিশুশিক্ষায় বঙ্গনারী।

বঙ্গ-গৃহে শিশু—ছায়াবৃত ভূমিতে উদ্গত পুঞ্জ পুঞ্জ শীর্ণ শস্যাঙ্কুরের মত ; বিবর্ণ ক্ষীণ দেহ—একটু খানি অপরিসর স্থানের মধ্যে নিবিড় হইয়া পরস্পর-সংলগ্ন হইয়া জন্মিতেছে, ঠেলাঠেলি করিয়া আপন আপন স্থান অধিকার করিতেছে, পরস্পরকে প্রতিহত করিতেছে, বিঘ্ন দ্বারা পীড়িত করিতেছে, দ্বন্দ দ্বারা শক্তি ক্ষয় করিতেছে! একখণ্ড রৌদ্র-বঞ্চিত ভূমিতে উদ্গত সহস্র শীর্ণ অঙ্কুর—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কঠোর শাসনের নীচে যুঝিয়া মরিতেছে—বঙ্গগৃহে শিশুগণের কথা ভাবিতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক কিছুই মনে পড়ে না!

বন্ধুবর্গের অনুরোধে এই বিষয়টির আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া আমি এমন একটি জায়গায় হস্তার্পণ করিতে যাইতেছি, যেখানে সমস্ত দেশের ও সমস্ত সমাজের নাড়ী আসিয়া মিলিয়াছে ও যেখান হইতে রক্তধারা সমস্ত দেশের ও সমস্ত সমাজের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হইতেছে। এই বিষয়টির সম্যক পর্য্যালোচনা করিতে গেলে আমাদের

খুব সম্ভবতঃ বহু অপ্রীতিকর কথা বলিতে হইবে, তজ্জন্য এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনায় আমি ক্ষমা চাহিতেছি। শুভ ইচ্ছায় যাহা উক্ত হয় তাহার তিক্ততা সকলের কাছেই মার্জ্জনীয়।

আমাদের জননীগণ আমাদের শিশুদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেন, একথা বিচার করিবার আগে এবিষয়ে তাঁহাদের সক্ষমতা কতটা, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। বালিকা তাহার ত্রয়োদশ বর্ষের সময় চারুপাঠ ও বোধোদয়ের বিদ্যা লইয়া পতি-গৃহে আগমন করে, তাহার বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহার অতীত একটা দীর্ঘ বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহার বধূ-জীবনের সহস্র গুরু দায়িত্ব তাহাকে চারিদিক হইতে ভারগ্রস্ত করিয়া ফেলে। এই সময়ে সে সন্তানের জননী হইতে আরম্ভ করে, প্রতি নববর্ষের সঙ্গে নব শিশু তাহার অঙ্ক অধিকার করিতে থাকে, ফলমের গাছে অপর্য্যাপ্ত ফলভারের ন্যায় তাহা তাহার দৈহিক ও মানসিক বিকাশকে লুণ্ঠিত করিয়া ফেলে। ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা—দৈহিক গঠন পর্য্যন্ত যাহার সম্পূর্ণ হয় নাই, প্রতি বৎসর তাহার অঙ্ক সন্তান দ্বারা অধিকৃত হইলে তাহার ফল যাহা দাঁড়ায়, তাহা না বলিলেও চলে। এই অপরিণত ফলগুলি, অধিকাংশই ঝরিয়া পড়ে; যাহা থাকে তাহাও প্রায়ই স্বাভাবিক ভাবে স্ফূর্ত্ত হয় না, তাহাদের দুর্ব্বল নিস্তেজ ব্যাধিপীড়িত ক্ষীণ মূর্ত্তি—দুর্ভিক্ষের প্রাণীর মত করুণা উদ্রেক করে, আনন্দ দান করে না। জন্মমুহূর্ত্ত হইতে তাহারা রোগ ভোগ করিতে থাকে, আপনার প্রাপ্য অংশে বঞ্চিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, প্রচুর প্রশ্রয় ও ঔদাসীন্যের ভিতর লালিত হইয়া, যদৃচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এই ত গেল শিশুদের সাধারণ বাহ্যিক অবস্থা। তাহাদের মানসিক উন্নতি বিধানের জন্যও অপেক্ষাকৃত কোনো উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত দেখা যায় না। আমাদের জননীগণ সন্তানকে "মেয়ের পুতলি সোহাগের ডালি" ছাড়া আর কোনও ভাবে দেখিতে প্রস্তুত নন। যে সুবৃহৎ পরিণামটি তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, কঠিন সাধনার দ্বারা যে সেখানে তাহাদের পঁহুছাইয়া দিতে হইবে, তাহা তাঁহারা স্নেহের নিকটদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছেন না, এবং মূঢ় যাত্রীর মত ভারবহনের আকাঙ্ক্ষায় বিহ্বল হইয়া থলি লঘু করিতে গিয়া তাহা একেবারে রিক্ত, পাথেয়হীন করিয়া তুলিতেছেন, অনাবশ্যক বোঝা কমাইতে গিয়া তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা যেটিতে প্রয়োজন, সেইটি হইতেই বঞ্চিত করিতেছেন!

শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও কথা কহিবার আগে তাহার শিক্ষার সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। যাঁহারা এ বিষয়ে চাণক্য শ্লোকের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন, তাঁহারা কতটা ঠিক পথে চলেন তাহা বলিতে পারি না। কারণ, এই বিশ্ব জগতের বহুতর ব্যাপার দৃশ্যমান শক্তির দ্বারা অনুশাসিত হয় না, বহু অদৃশ্য শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে গঠন করে, বিস্তৃত করে, বর্দ্ধিষ্ণু করে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় থাকে তখন তাহার শিক্ষার প্রথম পত্তনকাল উপস্থিত হয়। জননীর ইচ্ছা, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা হইতে রস গ্রহণ করিয়া সে পরিপুষ্ট হয়; মাটির নীচে অদৃশ্য বৃক্ষের বীজের মত, ভবিষ্যৎ কালের যে অঙ্কুর তাহা হইতে উদ্গত হইবে, একটু একটু করিয়া সে তাহাকে আপনার ধূসর বহিরাবরণের নীচে স্তর-বিন্যস্ত করিয়া লয়! মাতৃস্তন্য পান করিবার সময় শুধু স্তন্যই পান করে না, নদীর খর প্রবাহে তীরের মৃত্তিকা চঞ্চল আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া যখন ছুটিতে থাকে, তখন তাহা শুধু বহিয়াই চলিয়া যায় না, তাহার সূক্ষ্ম কণাগুলি থিতাইয়া নীচে জমিতে থাকে; অন্ধকারে অলক্ষ্যে স্তরের উপর স্তর রচিত হইতে থাকে, অবশেষে একদিন তাহা সলিল ভেদ করিয়া উর্ব্বর শস্যশ্যামল বেশে বিস্মিত বিশ্বলোকের মাঝখানে জাগিয়া উঠে। ঠিক্ এমনি করিয়া পারিপার্শ্বিক ঘটনার স্রোত শিশুর অবিকশিত মনোবৃত্তির উপর দিয়া বহিয়া যাইতে থাকে, পলি মাটির মত তাহা তাহার উপর ক্রমাগত স্তর রচনা করিয়া যাইতে থাকে, তাহার সম্মুখে তাহার যে মহনীয় ভবিষ্যৎ আসিতেছে, মানুষ হইয়া সে যাহার মাঝখানে দাঁড়াইবে, প্রভু হইয়া সে যাহার উপর শাসন-দণ্ড চালনা করিবে, স্রষ্টা হইয়া সে যাহাকে রচনা করিয়া লইবে —সেই মহনীয় ভবিষ্যৎ, বিধাতা পুরুষের অলক্ষ্য লেখনী চালনার মত তাহার উপর আপনার মুঠা মুঠা বীজ বপন করিয়া যাইতেছে, আর আমরা তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া তন্দ্রায় ঢুলিতেছি, আমাদের নিস্পন্দ দেহ উল্লঙ্ঘন করিয়া

সেই বিরাট দেবতা বাহির হইয়া যাইতেছেন, আমরা তাহার আভাস মাত্রও পাইতেছি না।

তথাচ, মাতৃগর্ভে থাকিতে শিশুর শিক্ষারম্ভ—মূল বিষয়ের একটি গৌণ আভাস মাত্র। কোমল মনোমৃত্তিকার উপর জ্ঞানের তাহা প্রথম পত্তন; স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হয়, চাপ দিলে বিগলিত হয়, সঞ্চালিত করিলে অবয়ব লুপ্ত হয়। শিশুর এই আদ্য সংস্কার যাহাকে সহজাত সংস্কারের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত করা যায়—তাহার জীবনের বৃহৎ চিত্রপটের উপর কতগুলি অস্পষ্ট রেখা-সমষ্টি মাত্র, তাহার পরবর্ত্তী যে সংস্কার—আপনার বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যাহা সে অর্জ্জন করিতে থাকে—উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসের মত তাহা তাহাকে বিচিত্র বর্ণের দীপ্তিতে ভরিয়া তুলিতে থাকে, তাহাকে আর কিছুতেই তুলিয়া ফেলা যায় না।

জীবন-বৃক্ষে সংস্কার শিকড়ের মত, হৃদয়ের গভীরতম অংশে তাহা অবতরণ করে, বক্ষের নিবিড়তম স্নায়ুর ভিতর তাহা বাহু-বিস্তার করে, শরীরের দূরতম অংশে তাহা আপনার গৃহীত রস প্রেরণ করে। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখা যায়, যে লোকপ্রকৃতি কতগুলি সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। ধাতব পদার্থ নির্ম্মাণের সময় যেমন তাহা গলাইয়া ছাঁচে ঢালে, তেমনি উন্নত ও শুভ সংস্কারের ছাঁচে শিশুর অগঠিত দ্রব মনোবৃত্তিকে যদি একবার ঢালাই করা যায়, তবে বিধাতার অঙ্গীকার-পত্রের মত তাহা অবিনশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়।

এখন বিচার্য্য এই যে, আমাদের মধ্যে কয়জন পিতা ও কয়জন মাতা এমন আছেন যাঁহারা এই ছাঁচটি গঠন করিতে সমর্থ? সন্তানকে উন্নত দেখিবার আকাঙ্ক্ষা যাঁহারা করেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন, বৃহৎ মহীরুহ বিশাল অরণ্যের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, কাশ-তৃণ গুল্মের ভিতর উৎপন্ন হয়। সুপুত্র লাভ বহু পুণ্য ফলে হইয়া থাকে বলিয়া আমাদের ভিতর যে একটা কথা আছে, তাহা শুধু এই সত্যটিকে প্রতিপন্ন করিবার জন্যই উক্ত হইয়াছিল। কিন্তু লোকে যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি "পুণ্য" শব্দের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া তাহার মূল অভিপ্রায়টিকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, এবং অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ডের মিথ্যা আড়ম্বরকে শিশুর জন্ম-গৃহের ভিতর টানিয়া আনিয়া তাহাকে নিষ্ফলতার দ্বারা অন্ধকার করিতেছে। সদাচারী পুত্র এমন একটি শোভন মিলন হইতে জন্মগ্রহণ করে, বিধাতার সৃষ্টির উদ্যানে যাঁহারা নির্ম্মল কুসুমটির মত বিকশিত হইয়াছেন, যাঁহাদের জীবনের শুভ্র দলগুলি উন্নত সদাকাঙ্ক্ষার শিশিরে মার্জ্জিত হইয়াছে! ছায়াচ্ছন্ন অকর্ষিত ভূমিতে উপ্ত বীজ যেমন খর্ব্বত্ব ও বিবর্ণত্বই লাভ করে, অসংস্কৃতচিত্ত দম্পতির সন্তান তেমনি একটা গ্লানিগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার পৈতৃক স্বত্ব তাহাকে প্রাকৃতিক বর্ব্বর দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রবেশের অধিকার দান করে, আপনাকে তাহার উপরে উত্তোলন করিবার শক্তির দ্বারা বিভূষিত করে না। দুঃখ দুরিতপূর্ণ সংসারের নিদারুণ-ঝঞ্ঝার ভিতর পড়িয়া সে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, অধোগতির অতল গহ্বরে অবতরণ করিতে থাকে; বন্ধ্যা নারীর মত জননীর নিষ্ফল স্নেহ তাহার দিকে মৌন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, প্রতিকারের শক্তি-বঞ্চিত হইয়া প্রতিদিন সে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, রোগগ্রস্তের মত সে তাহার সজীব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া মৃতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অজ্ঞান অন্তর্দৃষ্টিকে ক্ষীণ করে, মূঢ়তাকে স্ফীত করে, মানব হৃদয়ের সেই চিরন্তন তৃপ্তি যাহা বিশ্বসৃষ্টির প্রথম প্রভাতে কল্যাণকে বেষ্টন করিয়া বিকশিত হইয়াছিল, তাহাকে মলিনতা দ্বারা হেয় করিয়া তোলে। এই অন্ধতা তাঁহাদের দৃষ্টিকে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণ হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছে, তাঁহারা যে পথ দিয়া চলিতেছেন, তাহা যে ভয়াবহ আরণ্য পথ, তাহা যে তাঁহাদিগকে হিংস্র শ্বাপদের নখরের কাছেই নিয়া পঁহুছাইয়া দিবে, তাঁহাদের কল্পিত রম্য আবাসের দুয়ারের নিকট লইয়া যাইবে না—তাহা শুধু এই দৃষ্টিহীনতার জন্যই তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না; নীর ভ্রমে যে স্ফটিক-স্তম্ভের দিকে তাঁহারা চলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে পানীয় দান করিতেছে না, কেবল আঘাতের দ্বারা বিক্ষত করিতেছে।

এইখানে অনেকে বলিতে পারেন যে, আমাদের প্রাচীনেরা—যাঁহারা তাঁহাদের শৈশবে একান্ত নিরপেক্ষ ভাবে লালিত হইয়াছেন—ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শোভন চরিত্রের উদাহরণ তাঁহারাই অধিকতর দেখাইতে সক্ষম; সেই হিসাবে বিংশ শতাব্দী যে গণনা-ফল প্রকাশিত করিবে তাহা তাহার

সমকক্ষতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার অতীত ব্রাহ্মণ্য-যুগে একটা সুবিস্তৃত সঞ্চয় করিয়াছিল, জগতের অসীম শস্যক্ষেত্রে এই নিঃসঙ্গ কৃষাণ একাকী তখন হলচালনা করিতেছিল, তাহার দিগ্বিস্তৃত প্রান্তর পক্ক ধান্যে ভরিয়া উঠিতেছিল, অন্নপূর্ণার মত সে তাহা লইয়া ক্ষুধিত বিশ্ববাসীর অন্ন বণ্টন করিতেছিল ; দেশ দেশান্তর তাহার জ্ঞানে আলোকিত হইতেছিল, রাজা রাজান্তর তাহার বিদ্যায় শ্রীমণ্ডিত হইতেছিল, ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর তাহার ঋদ্ধিতে পুষ্পিত হইতেছিল! তাহার ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে সে যে পক্ক শস্য সেদিন ঘরে তুলিয়াছিল, তাহা নব্যভারত উত্তরাধিকারের দখলী সনন্দের জোরে ভোগ করিয়াছে। বাহিরে অনাবৃষ্টিতে ক্ষেত্রে ফসল না জন্মিলেও তাহার গোলাঘরে যে ধান্য স্তূপীকৃত ছিল, তাহা কামধেনুর মত অপর্য্যাপ্ত খাদ্যে তাহার অঙ্গন ভরিয়া দিয়াছে। তাহার জমার খাতায় এইবার শূন্য পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার বর্ত্তমান তাহার ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে এমন কিছুই সঞ্চয় করিতেছে না, যাহা সে তাহার বংশধরগণকে দান করিতে সক্ষম হইবে, রিক্তহস্তে সে আজ তাহার গৃহের নির্জ্জন রাজাসনটিতে বসিয়া আছে, বাহিরে বৈশাখের জ্বালাময় আকাশের বারি-হীন উত্তাপে তাহার শস্য-শ্যামলা সজলা সফলা ভূমি ফাটিয়া শতধা হইয়া যাইতেছে! এইবার তাহার বংশধরদিগকে সঞ্চিত ধনসম্ভোগের অভ্যস্ত আরাম ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নূতন ধন অর্জ্জনের জন্য দৃঢ় মাংসপেশী গঠিত করিতে হইবে, রৌদ্রকঠিন মৃত্তিকার উপর দিয়া অক্লান্ত শ্রমে হল চালনা করিতে হইবে, প্রণালী খনন করিয়া মহাসাগরের রুদ্ধ জল তাহার মাঠে মাঠে উৎসারিত করিয়া দিতে হইবে, তবে তাহার ভবিষ্য-বংশ তাহার সোনার ফসল ঘরে তুলিতে পাইবে, নহিলে তাহার দ্বার-প্রান্তে যে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আজ দেখা দিতেছে তাহা মহামারীর প্রচণ্ড সংহার-মূর্ত্তিতে তাহার ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে!

শিশু গর্ভে থাকিতে জননীর যেমন হৃদয়কে উন্নত ও শুদ্ধ চিন্তার দ্বারা পূর্ণ রাখা উচিত, ভূমিষ্ঠ হইলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সতর্কতার সহিত তাহার মনে শুভ সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিতে সচেষ্ট হওয়া চাই। কোনও কাজে, কোনও কথায়, কোনও ঘটনায়, এই ক্ষুদ্র শিক্ষার্থী যেন কোনও ক্ষুদ্রতা, কোনও সঙ্কীর্ণতা, কোনও অপবিত্রতার আভাস না পায়! তাহার শিক্ষাকে তাহার গ্রন্থপত্রের অন্তর্নিবিষ্ট একটি স্বতন্ত্র বিষয় করিয়া না রাখিয়া তাহাকে তাহা তাহার মাতৃস্তন্যের সহিত পান করিতে দেওয়া হউক, তাহার খেলা হাসি কৌতুকের ভিতর তাহার মূলকে প্রোথিত করা হউক, তাহা তাহাদের জীবনের অংশের মধ্যে পরিণতি লাভ করুক, হৃদয়ের শক্তির ভিতর স্থিতিলাভ করুক, আকাঙ্ক্ষার ভিতর অধিকার লাভ করুক!

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমি বলিয়াছি যে, শুভ ইচ্ছার তাগিদে আমাকে ইহার ভিতর বহু অপ্রীতিকর বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে, সেজন্য যদি কাহারও অসন্তোষ উদ্রিক্ত হয়, তবে তাঁহারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, ক্ষতস্থান অশোভন বলিয়া তাহা বাঁধিয়া রাখিলে তাহা ক্রমশঃ গভীর হইতেই থাকে, অস্বীকার করিয়া তাহাকে লুপ্ত করা যায় না।

আমাদের অন্তঃপুরিকারা কথোপকথনের সময় সাধারণতঃ যাহা বলিয়া থাকেন, শিশুদিগের তাহা শ্রুতিগোচর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বহু অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যক্তির চরিত্র তাহাতে নির্দ্দয়রূপে সমালোচিত হইতে থাকে, যে বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র জানা নাই, সেই বিষয়ে অবলীলাক্রমে বহু গুরুতর বাক্য প্রযুক্ত হইতে থাকে এবং একটি মাত্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করিয়া এক একটি জীবন ও চরিত্রের সমস্ত মীমাংসা নিষ্পন্ন হইতে থাকে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, If the best man's faults were written on his forehead, it would make him pull his hat over his eyes. (মানুষের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম—যদি তাঁহার দোষগুলি তাঁহার ললাটের উপর লিখিত হইত, তবে তিনি তাহা গোপন করিবার প্রয়াসে, আপনার চক্ষু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিতেন)। লোক-চরিত্র একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়, ন্যায়শাস্ত্রের (Logic) নিয়ম ধরিয়া তাহার সিদ্ধান্ত করা যায় না ; একটি ক্ষুদ্র কার্য্য, ক্ষুদ্র ঘটনার মূলে কত অসংখ্য হেতু বিদ্যমান থাকে তাহার নির্দ্দেশ করাও সাধ্যাতীত। সদ্দৃষ্টান্ত সকল সময়েই শোভন চরিত্র হইতে জন্মগ্রহণ করে না, ঘৃণিত আবর্জ্জনার ভিত-

রেও মাঝে মাঝে তাহাকে পাওয়া যায় এবং কণ্টকগুল্ম পতিত ভূমিকে অতিক্রম করিয়া ধনীর সযত্নরক্ষিত উদ্যানে দেখা দেয়। মানুষ আপনার হৃদয়কেও পরিপূর্ণ ভাবে দেখিতে পায় না, আপনার প্রকৃতিকেও ভাল করিয়া চিনিতে পারে না, তাহার প্রতিদিনের সুপরিচিত ইচ্ছা অনিচ্ছার মাঝখানে অবস্থা-বিপর্যায় সহসা একদিন এমন একটি প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলে—যাহার অস্তিত্ব সে কস্মিন কালেও কল্পনা করে নাই, এবং যাহাকে সে কোনও দিন আপনার পরিচয়-পত্র দান করে নাই। নিজের সম্বন্ধে যখন এইরূপ, তখন যাহার সহিত জীবনে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, অথবা অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মুহূর্ত্ত মাত্র যাহার সঙ্গে বাহিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে প্রকাশিত মতামত কতটা সত্য ধারণ করিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইংরাজীতে অপর একটি প্রবাদ আছে, "Fools rush in where angels fear to tread." (দেবতারা যেখানে পদক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হন, নির্ব্বোধেরা সেখান দিয়া ধাবিত হয়)। কিছুমাত্র না জানিয়া ও না বুঝিয়া আমরা যখন অপরের চরিত্র সমালোচনা করিতে বসিয়া যাই, তখন আমরা "দেবতার ভীতি-স্থলকে"ও উল্লঙ্ঘনে পার হইতে থাকি, কিন্তু তাহা আমাদিগকে কোন উচ্চতর স্থানে উত্থিত না করিয়া আরও নিম্নতর স্থানে নামাইয়া দেয়! অপরের চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা আপনাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলি ও পরের ঘরে উঁকি দিবার উৎকট লোভে আপনার প্রদীপের তৈল নিঃশেষিত করি! হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও মর্য্যাদা-বোধের অভাব হইতেই সাধারণতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে; যাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তিনি কখনও অপরের সম্মানে আঘাত করিতে পারেন না। অনেকে অসম্ভ্রমের সহিত বাক্য উচ্চারণ করিয়া আরাম পাইয়া থাকেন, ইহা শুধু অসংস্কৃত ও দূষিত রুচিরই পরিচয় প্রদান করে এবং সংক্রামক বিষের মত অপরের চিত্তকেও দূষিত করে। বিরোধ ও বিসম্বাদ সহানুভূতির অভাব হইতেই জন্মগ্রহণ করে, নিজের অনুভূতির (feeling) বাহিরে যিনি পা বাড়াইতে পারেন না, অপরের ধারণা ও মত সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি স্বভাবতঃই খর্ব্বত্ব লাভ করে এবং সহানুভূতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

শিশু বাহিরে যতই কেন না শিক্ষা প্রাপ্ত হোক্, মাতৃ-অঙ্কে বসিয়া সে যাহা শোনে ও যাহা দেখে তাহাই সে তাহার সমস্ত হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করে। অনুচিত আলাপ ও হৃদয় ভাবে তাহার চিত্ত ক্ষুদ্র হইয়া যায়, অনুভূতি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, আকাঙ্ক্ষা নিম্ন হইয়া যায়; আমাদের জননী-গণের সর্ব্বতোভাবে এই বহু-অনর্থকর দোষটিকে পরিহার করিতে হইবে, কারণ ঐরূপ অসংযত বাক্যদ্বারা তাঁহারা শুধু নিজেকেই দূষিত করেন না, শিশুর ভবিষ্য জীবনের ভিতর তাহাকে কুৎসিৎ ব্যাধির মত বিস্তৃত হইতে দেন। ইহা সচরাচরই দেখা যায় যে, যে বিষয়টি অপরে করিলে আমরা তাহাকে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিয়া থাকি, নিজে তাহা করিবার সময় কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করি না। অপরে কি করিতেছে তাহা দেখিবার অভ্যাস হইতে ফিরাইয়া শিশুকে নিজে কি করিতেছে তাহা দেখিবার অভ্যাসে দাঁড় করাইতে হইবে, তাহার সরস হৃদয়ক্ষেত্রে সদাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করিয়া দিয়া তাহাকে এই সব কণ্টকগুল্ম ও বিষবৃক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে হইবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ গঠন না করিলে তাহাকে কিছুতেই তদনু-যায়ী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, বীজ বপনের সময় যখন আসিয়া অতর্কিতে চলিয়া যায়, তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান-পিপাসার শুভ সুযোগ অর্থহীন কলকাক-লীর ভিতর দিয়া কখন অপসৃত হইয়া যায়! শিশুর কোমল হৃদয়ক্ষেত্র শিক্ষার কঠিন হলচালনার অপেক্ষা রাখে না, শুধু উপযুক্ত অবসর ও উপযুক্ত সময়ে মুঠা মুঠা বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়, তাহার দ্রব চিত্ত-মৃত্তিকা তাহাতেই অঙ্কুরোদ্গম করে, এই স্বাভাবিক স্বতঃ আগত সুযোগটিকে হারাইলে বহু আয়াসেও তাহাকে ফিরান যায় না।

সঙ্গ—শিশুর জীবনে একটী বৃহত্তম বিষয়। গৃহের প্রভাবকেও তাহা ক্ষীণ করে, শিক্ষাকে অতিক্রম করে, পৈতৃক গুণাবলীকে ম্রিয়মাণ করে। এই সময়ে তাহাকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের নীচে না রাখিলে, অলক্ষিতে বহু অদৃষ্ট অশুভের বীজ সে গ্রহণ করিবে, বিষাক্ত কণ্টক-

তরুর মত যাহা কাটিয়া দিলেও আর বিনষ্ট হইবে না। জননী নিজে তাহার সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন, দূষিত-প্রকৃতি বালকদিগের সংস্রব হইতে তাহাকে সাবধানে দূরে রক্ষা করিবেন, চাকর চাকরাণীর সহবাস বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। এক দিকে এ বিষয়ে যেমন সতর্কতার আবশ্যক, অন্যদিকে ইহাও ভুলিলে চলিবে না, যে বালকদিগকে জড় পদার্থের মত তাহার শৈশবোচিত ক্রীড়া ও কল-কোলাহল হইতে দূরে রাখিলে তাহার মানব প্রকৃতিকে এবং তাহার শারীরিক বিকাশকে আমরা ক্রমাগত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতে থাকিব, তাহাকে কোন ক্রমে উন্নত করিতে পারিব না।

আজ কাল আমাদের দেশের শিশুবিদ্যালয়গুলি কিণ্ডারগার্টেনের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য্য যে আমরা তাহা হইতে বিশেষ কোন ফল পাইতেছি না। সৌন্দর্য্য ও কৌতুকের বিচিত্র রসকে প্রকৃতিবক্ষ হইতে তুলিয়া নিয়া স্কুলের ক্ষুদ্র স্ফটিকাধারে রাখিয়া আমরা তাহাকে পচাইয়া ফেলিতেছি, তাহাদিগের বিভিন্ন রুচিনিষ্ঠ প্রকৃতিকে একই রূপ আনন্দের ভিতর পীড়ন করিয়া ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছি। শিশুদের শিক্ষাস্থলে সেদিন আমরা একটি প্রবল সফলতার সাক্ষাৎ পাইব, যেদিন আমাদের জননীগণ আপনার হাতে তাহাদের শিক্ষার ভার তুলিয়া লইবেন, এবং আমাদের পিতৃগণ তাস ও দাবার মিথ্যা কৌতুক-রসের কুহক হইতে মুক্ত হইয়া তাস ও কাল হরণের অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যাপারগুলিকে নিরস্ত করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-নিষ্ঠ ভূয়োদর্শনের দ্বারা তাহা পরিচালিত করিবেন! তাহাদের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষাকে বিভিন্ন উপায়ে তৃপ্ত করিয়া তাহাদের বিভিন্নমুখী জীবনের পথকে বিভিন্ন দিকে মুক্ত করিয়া দিবেন!

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়, অনেকে শোভন পরিচ্ছদকেই শিক্ষার চরম উৎকর্ষ বলিয়া মনে করেন ও শিশুর সমস্ত স্বাভাবিকতার উপর খড়্গহস্ত হন। পল্লীর ছায়াচ্ছন্ন পথে আমাদের ছেলেরা বহুদিন হইতে জুজুর ভয় পাইয়া আসিতেছিল, আজ এই বিংশ শতাব্দীর নবপ্রভাতের আলো যখন তাহাদের পরিবর্ত্তিত প্রশস্ত পথের উপর হাসিয়া অবতরণ করিল, তখন সহসা তাহাদের আনন্দের মাঝখানে নব সভ্যতা যে ছেলেধরার রূপ ধরিয়া তাহার বৃহৎ কালো থলিটি লইয়া আসিয়া উদিত হইবে, তাহা বেচারীরা আদৌ মনে ভাবে নাই; তাহাদের অকারণ আনন্দ—পাখীর গানের মত, নদীর কলতানের মত, বাতাসের উচ্ছ্বাসের মতই যাহার কোনো কিছু কৈফিয়ৎ নাই, তাহাকে যে তাহারা প্রবল কণ্ঠস্বরে নিনাদিত করিয়া তুলিবার অবকাশ আর পাইবে না, তাহাদের যে শান্ত শিষ্ট ও সভ্য হইয়া শোভন ও পরিচ্ছন্ন বেশে (যাহার অর্থ তাহারা যুগ যুগান্তরেও খুঁজিয়া পাইবে না) ধীরতা শিক্ষা করিতে হইবে—এত বড় একটা ভয়ানক কথা তাহারা কখনও কল্পনা করে নাই!

স্নেহের দুর্ব্বলতায় জননীগণ সন্তানের অন্যায় আবদার সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতিদিনের উক্ত সেই কথাটিকে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে পাঁচেতেও যা পঞ্চাশেও তা। স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়ে আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব্ব করিবার শক্তি তাহাতে সে আর আয়ত্ত করিতে পারে না এবং মানুষ—তাহার যে সদসৎ জ্ঞানের জন্য জীবরাজ্যের প্রভু হইয়াছে, তাহার গরিষ্ঠ ভাবটিকে সে রক্ষা করিতে পারে না; আত্মশাসনের ক্ষমতা হইতে সে বিচ্যুত হয় এবং তাহার জন্ম-জনিত অধিকারের (Birth-right) বৃহৎ সম্পত্তি হইতে সে বিতাড়িত হয়।

ধনী-গৃহের সন্তানেরা একটুখানি বেশী বিলাসিতা ও সৌকুমার্য্যের ভিতর পালিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ছেলেকে নবনীত-শয্যায় সর্ব্বপ্রকার কোমলতার ভিতর পালন করাকেই আদরের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টা কতটা সার্থকতার দ্বারা ভূষিত হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাতে যে ছেলেকে তাহার জীবন-দ্বন্দ্বের অনুপযুক্ত করিয়া তোলা হয় এবং তাহার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতাকে আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা বেশ বলা যায়। "জীবনদ্বন্দ্ব" এই কথাটা হয়ত কেহ কেহ স্বীকার করিবেন না, কিন্তু মানুষ শুধু তাহার জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায়ই যুঝিয়া মরিতেছে না, সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে জড়প্রকৃতির সহিত তাহার একটা বোঝাপড়া চলিয়া আসিতেছে, সেই স্থায়িত্বের দ্বন্দ্বক্ষেত্রে পরাজয়ের ভয়ে সে মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিতেছে এবং একটা

আকাশগামী চেষ্টার দ্বারা বিশ্বলোক আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। পুরুষ—যাহাকে জীবন-সংগ্রামে "সিন্ধু-নীরে ভূধর-শিখরে, বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা" ধরিবার বীর্য্য সঞ্চয় করিতে হইবে—তাহাকে হে আমাদের স্নেহপরায়ণা জননীগণ! তোমাদের বাৎসল্যের স্ফীত ধারায় কোমল করিয়ো না, তাহার শৈশব-দোলার শয্যা লৌহদ্বারে গঠন করিয়া দাও, তাহার প্রকৃতিগত কাঠিন্যকে কঠোরতার ভিতর কঠিনতর করিয়া তোল! মৃত্তিকার রৌদ্রতাপে তাহার সৌকুমার্য্য নষ্ট হইবে বলিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়ো না, তাহাকে অবারিত প্রান্তরের মধ্যে ধাবিত হইতে ছাড়িয়া দাও, সভ্যতার বিভীষিকা ভুলিয়া তাহার প্রবল কণ্ঠস্বরকে, দিগন্তের অন্তসুপ্ত প্রতিধ্বনিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে দাও, তাহার জীবন হইতে অনর্থক আড়ম্বরের বৃহৎ বোঝা নামাইয়া লইয়া তাহার শৃঙ্খল-পীড়িত পক্ষপুট মুক্ত করিয়া দাও! ভৃত্যের সেবার উপর তাহাকে তৎপর করিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়ো না, তাহাকে অলস ও কর্ম্মভীরু করিয়া গড়িয়া তুলিয়া দৈন্যের দ্বারে দুর্দ্দশার শৃঙ্খলে বিজড়িত করিয়ো না, শৈশব হইতে তাহাকে তাহার নিজের কাজ গুছাইয়া করিতে দাও ও অপরকে সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত হইতে দাও, অতিকায় কচ্ছপের মত তাহাকে শুধু আপনার পৃষ্ঠের বৃহৎ খোলাটিকে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করিবার সঙ্কীর্ণতা হইতে রক্ষা কর! বোধিত কর তাহাকে, সেই অনাড়ম্বর সরল জীবনের উদার মন্ত্রে—যাহা বৃষ্টিধারা-পুষ্ট তরুশাখার মত আকাশকে আলিঙ্গন করিতে বাহু বাড়াইবে ও অপরকে ছায়াদানে শীতল করিবে। শিখিতে দাও তাহাকে—আপনাকে খর্ব্ব না করিলে অপরকে দেখিতে পাওয়া যায় না, আত্মসুখ সঙ্কুচিত না করিলে অপরের স্বস্তিকে স্থান দান করা যায় না! অয়ি আমাদের সন্তান-বৎসলাগণ! তোমাদের হৃদয়কে কঠিন কর, স্নেহকে আবৃত কর, কাতরতাকে রুদ্ধ কর—সন্তানের প্রত্যেক অন্যায় কার্য্যে অপক্ষপাত বিচারকের মত তাহাকে যোগ্য শাস্তি ভোগ করিতে দাও, বেদনার পীড়নে বহ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মত নির্ম্মল হইয়া আমাদের এই তরুণ যাত্রীগুলি তাহাদের জীবনপথে যাত্রা করুক!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কাশ্মীর এবং পঞ্জাব।

কাশ্মীর।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে আগমন করেন। কাশ্মীর নৈসর্গিক শোভা ও সম্পদের জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের গ্রন্থ হইতেও আমরা কাশ্মীরের নৈসর্গিক শোভা ও সম্পদের সাক্ষ্য লাভ করি। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণী পাঠে কাশ্মীরের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রতিকূলভাব উপস্থিত হয়। আমাদের এই নির্দ্দেশ সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা তদীয় গ্রন্থের কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি।

কাশ্মীর চতুর্দ্দিক শৈলমালা-পরিবেষ্টিত। কাশ্মীর প্রকৃতির ঈদৃশ দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত বলিয়া অদ্যাবধি কোন নরপতি এই দেশ আক্রমণ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কাশ্মীরের রাজধানী উত্তর দক্ষিণে ১২ অথবা ১৩ লি ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪ অথবা ৫ লি। আমাদের বর্ণিত দেশ সর্ব্বত্র ফলফুল-শোভিত। জল বায়ু শীতল এবং সুতীক্ষ্ণ। চারিদিকে রাশি রাশি তুষার দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুর বেগ অতি অল্প সময়ই অনুভূত হয়। জনপুঞ্জ চর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গরাখা এবং শুভ্রসূত্রে বস্ত্র পরিধান করে। তাহারা লঘুচিত্ত এবং অশিষ্ট; ভীরুতা এবং দুর্ব্বলতা তাহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব। কাশ্মীরের নরনারী দেখিতে সুশ্রী। তাহারা কাজকর্ম্মে ধূর্ত্ত কিন্তু জ্ঞানানুরাগী এবং সুশিক্ষিত।

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের আগমন কালে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ও হিন্দু,—এই দুই ধর্ম্মেরই প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক এবং তাহাতে মহারাজ অশোকের চরিত্রের একদেশ প্রকটিত হইয়াছে। আমরা সে বিবরণ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কাশ্মীরে বিশ্বাসী এবং অপধর্ম্মাবলম্বী, এই দুই শ্রেণীর লোকই পরিদৃষ্ট হয়। সঙ্ঘারাম এবং শ্রমণের সংখ্যা যথাক্রমে একশত এবং পঞ্চসহস্র। মহারাজ অশোক-নির্ম্মিত

চারিটি স্তূপ বিদ্যমান আছে। এই সকল স্তূপের প্রত্যেক টিতেই তথাগতের ক্ষুদ্র চিহ্ন স্থাপিত রহিয়াছে।

তথাগতের নির্ব্বাণ লাভের একশত বৎসর পরে (১) মগধের নরপতি অশোক সমগ্র পৃথিবীতে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন; সুদূরবর্ত্তী দেশের লোক সমূহও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিত। সর্ব্বশ্রেণীর প্রাণীই তাঁহার প্রিয় ছিল। তাঁহার সময়ে পাঁচশত অর্হৎ এবং পাঁচশত প্রচলিত মতত্যাগী পুরোহিতের বাস ছিল। এই দুই শ্রেণীই অশোক রাজার নিকট তুল্য আদর ও সম্মান-ভাজন ছিল। মাধব নামে একজন প্রচলিত মতত্যাগী পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি আশ্রমবাসে প্রকৃত খ্যাতির অন্বেষণ করিতেন। তিনি প্রকৃত ধর্ম্মবিরোধী শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত, তাহারা তাঁহার সাহচর্য্য লাভেচ্ছু হইত এবং তাঁহার মত গ্রহণ করিত। মহারাজ অশোক ধার্ম্মিক এবং সাধারণ মনুষ্যের প্রভেদ করিতে অসমর্থ ছিলেন; এই কারণে তিনি লোকের প্ররোচনায় পুরোহিতদিগকে জলমগ্ন করিতে সংকল্প করেন। অর্হৎগণ মহারাজ অশোকের তাদৃশ সংকল্পের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া গোপনে কাশ্মীরে আগমন করেন। অশোক এই সংবাদ জানিতে পারিয়া পরিতপ্ত হন এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু অর্হৎগণ রাজানুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের বাসের নিমিত্ত পাঁচশত সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং সমগ্র কাশ্মীর ভূমি তাঁহাদের হস্তে দানস্বরূপ অর্পণ করেন।

মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালেই সমগ্র কাশ্মীর দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হয়। হিউএনৎসঙ্গের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, উত্তর-ভারতে কনিষ্ক মহাপ্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। কনিষ্কের ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার বিশাল ক্ষমতার অনুরূপই প্রবল ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি বিধান জন্য অক্লান্তভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। আমরা হিউএনৎসঙ্গের গ্রন্থ হইতে সে বিবরণের মর্ম্ম সংকলন করিয়া দিতেছি।

তথাগতের নির্ব্বাণ লাভের চারিশত বৎসর পরে গান্ধারের অধিপতি কনিষ্ক কাশ্মীরের আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার রাজমহিমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তিনি দূরবর্ত্তী দেশ সকল স্বীয় আধিপত্যাধীন করিয়া তুলেন। কনিষ্ক রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেই বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনায় নিরত হইতেন। তাদৃশ আলোচনা কালে পরস্পর-বিরোধী নানা মত পাঠ করিয়া তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন। এই কারণে মহারাজ কনিষ্ক বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রবেত্তৃগণকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে সমস্ত ভ্রম প্রমাদের মীমাংসা ও সংশয় ভঞ্জন করিয়া লইতে সংকল্প করেন। তাঁহার সাদর আমন্ত্রণে পাঁচশত আচার্য্য সম্মিলিত হন এবং তিনখানি ভাষ্যগ্রন্থ সংকলন করেন।

মহারাজ কনিষ্কের শক্তি সুদূরপ্রসারিণী ছিল; চীনদেশ হইতে করদ রাজগণ তাঁহার নিকট আপনাদের বিশ্বস্ততার প্রতিভূস্বরূপ দূত প্রেরণ করিতেন। মহারাজা এই সমুদয় দূতের সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি তাঁহাদের বাসের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা চীনাপটি নামে পরিচিত হয়।

মহারাজ কনিষ্কের মৃত্যুর পরেই তাঁহার বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয় এবং কিরাতগণ কাশ্মীর অধিকার করিয়া তত্রত্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিনাশ করে। তারপর শাক্য বংশীয়গণ কর্ত্তৃক কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে হিউএনৎসঙ্গ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, মহারাজ কনিষ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, ক্রীত (Serf বা কিরাত) জাতীয় * কাশ্মীরবাসীরা কাশ্মীর দেশ হস্তগত করে। এই রাজ বিপ্লবের দুইশত বৎসর পরে একজন শাক্যকুমার তুখার অন্তর্গত হিমতল রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ

(১) এই নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক; মহারাজ অশোকের শিলালিপি পাঠ করিলে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ২২১ বৎসর পরে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল।

* ইহা ঘৃণা সূচক উপাধি, হীন প্রকৃতির জন্য পার্শ্ববর্ত্তী জনপুঞ্জ কর্ত্তৃক এই উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল।

করেন। তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া কিরাতগণ কর্তৃক কাশ্মীর হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বহিষ্কারের বৃত্তান্ত অবগত হন। তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহার ধর্ম্মানুরক্ত হৃদয়ে রোষানল উদ্দীপিত হইয়া উঠে; তিনি কিরাতগণের দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তিন সহস্র সাহসী সেনা সমভিব্যাহারে বণিকের ছদ্মবেশে কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন। তাঁহারা তথায় উপনীত হইলে কাশ্মীরাধিপতি তাঁহাদিগকে অতিথি রূপে সসম্মানে আশ্রয় দেন। অতঃপর শাক্য নরপতি কিরাত-রাজকে উপঢৌকন প্রদান ব্যপদেশে পাঁচশত অসম সাহসী কৃতকর্ম্মা সহচর সহকারে রাজসভায় উপনীত হন এবং অচিরে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার মুণ্ডপাত করেন। এই ভাবে কিরাত অধিপতির বিনাশ সাধন করিয়া তিনি মন্ত্রীবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আমি হিমতলের রাজ্যাধিকারী, আমি এই নীচ কুলজাত রাজন্যগণের অত্যাচারের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। সে দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। জনপুঞ্জ নির্দ্দোষ।" অতঃপর তিনি মন্ত্রীদিগকে নির্ব্বাসিত এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশ্মীর রাজ্যে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের পুনরাবাসের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আহ্বানে পরমসৌগতগণ আগত হইলে তিনি তাঁহাদের হস্তে কাশ্মীর রাজ্য অর্পণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করেন।

প্রাগুক্ত ঘটনার কতিপয় বৎসর অন্তে কাশ্মীর দেশে কিরাতগণের দ্বিতীয় বার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ কর্তৃক একাধিকবার নির্য্যাতিত হইয়া তাহারা ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায় এবং তৎফলে বর্ত্তমান সময়ে অপধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান আছে এবং চতুর্দ্দিকে তদ্বিশ্বাসীদের ধর্ম্মমন্দির পরিদৃষ্ট হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

স্ত্রীশিক্ষা।

গত মাঘ মাসের "ভারতমহিলায়" একজন বি. এ. উপাধিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম। স্ত্রীশিক্ষা যে ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়ীভূত হইতেছে, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধ-লেখকের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। তাঁহার বিবেচনায় "বালিকাদিগকে শিক্ষালাভার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, তাহাতে তাঁহারা উদ্ধত হয়েন, এবং কোনও বিষয়ে তাঁহাদের মতের সহিত না মিলিলে, তাঁহারা তর্ক করিতে আসেন। আর বিদ্যালয়ে জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা স্ত্রীলোকদিগের কোনও কার্য্যে আইসে না, কারণ তাঁহারা ত আর গৃহনির্ম্মাণ করিতে বা জমিজরীপ করিতে যাইবেন না?"

এক্ষণে আমরা আমাদিগের মতামত প্রকাশ করিব। প্রথমতঃ তিনি উদ্ধত বা উচ্ছৃঙ্খল শব্দটী কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। যদি স্বাধীনভাবে বিচরণ এবং বিবেক বুদ্ধিমত কার্য্য করাতেই ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, প্রাচীন কালের পূজনীয়া ঋষিকন্যাগণ উদ্ধতার পরাকাষ্ঠা ছিলেন।

কারণ, আমরা জানিতে পারি, রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে যে সকল বিদ্বন্মণ্ডলী আসিয়া সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, মহীয়সী গার্গীও তন্মধ্যে একজন। যজ্ঞান্তে রাজর্ষি একলক্ষ ধেনুর শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া সভায় উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন,—"এই সভার মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এই একলক্ষ ধেনু গ্রহণ করুন।"

কে সাহস করিয়া সেই ধেনু গ্রহণ করিবেন? সভা নীরব, নিস্তব্ধ।

এমন সময়ে সহসা যাজ্ঞবল্ক্য গাত্রোত্থান করিয়া আপন শিষ্যকে সেই সকল ধেনু আশ্রমে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তখন সভা হইতে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল; যাজ্ঞবল্ক্য স্থির ভাবে উত্তর প্রদান করিলেন,—

"আপনাদিগের যাঁহার যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা থাকে, করুন। আমি উত্তর প্রদান করিতেছি।" কিন্তু কেহই তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। তখন সেই মহতী সভার মধ্যস্থল হইতে একটী রমণী উত্থিত হইয়া কহিলেন;—"বিদ্বমণ্ডলী, আমি এই ঋষিকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যদি ইনি তাহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হয়েন, তবে বাস্তবিকই ইঁহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ এই সভায় আর কেহই নাই।"

সকলেই আহ্লাদিত হইয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্যও তাহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন।

শকুন্তলা, সাবিত্রী, সুভদ্রা ইত্যাদি অন্যান্য মহিলাগণের কাহিনী পাঠ করিয়াও আমরা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। শকুন্তলা যখন স্বামী-গৃহে যাত্রা করেন, তখনতো দোলা চতুর্দোলায় চড়িয়া গমন করেন নাই! সাবিত্রী যখন ঋষিকন্যাগণের সহিত ফুল তুলিতেছিলেন, এবং অন্যতীরে ঋষিবালকগণ কুশ কাটিতেছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তিনি আপনার অথবা ঋষিকন্যাগণের চতুর্দ্দিক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন নাই! এবং সুভদ্রা যখন অর্জ্জুনের রথ চালাইয়া লইয়া যান, তখন তিনিও অনাবৃত স্থানেই ছিলেন! এই সকল পুরাকালীন মহিলাদিগের কার্য্যাবলী দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহারা স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতেন না?

তৎপরে আধুনিক কালের মধ্যে সতী রাজপুত মহিলা-গণের জীবনী আলোচনা করিলে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, রমণিগণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বীরনারী বেশে উপযুক্ত তরবারিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। যদি এই সকল কার্য্য উদ্ধত স্বভাবের মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে বলি, এরূপ উদ্ধতা হইতে আমরা শতবার ইচ্ছা করি।

প্রবন্ধ-লেখক মহোদয় লিখিয়াছেন, পাশ্চাত্য জগতের নারীগণের হুঙ্কারে পাশ্চাত্য জগৎ কম্পিত এবং তাঁহাদের পরিণাম বিশৃঙ্খলাময় ও অশান্তিপূর্ণ। কিন্তু একথা লিখিবার পূর্ব্বে আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহার একবার পাশ্চাত্য বাসীদিগের পরিবারিক জীবন কিরূপ তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশবাসীদিগের পারিবারিক জীবন এত সুশৃঙ্খলাপূর্ণ ও শান্তিময় যে, ভারতের কোনও পরিবারে সেইরূপ সুশৃঙ্খলা ও শান্তি বর্ত্তমান আছে কিনা সন্দেহ।

গৌহাটী মহিলাসমিতিতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্,এ মহাশয় ইংলণ্ডে প্রবাসকালে ইংরেজ-রমণীগণের সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা ও কার্য্যাবলী দ্বারা তিনি কিরূপভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—"উচ্চশিক্ষা পাইলে রমণিগণ যে বিলাসিনী হয়েন না, গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্য কেমন সুচারুরূপে ও বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করেন, মধ্যাবস্থার ইংরেজ-রমণিগণই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।" তিনি আরও বলেন,—"জগতের কোন বৃহৎ কার্য্যই রমণিগণের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় নাই, এবং আমাদিগের জাতীয় উন্নতি যে সম্পূর্ণরূপে ভারত রমণিগণের উপর নির্ভর করিতেছে, একথা ভুলিয়া গেলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।"

ইংরেজ পরিবারের চিত্র প্রদর্শন আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে, রমণিগণ যে উচ্ছৃঙ্খল হয়েন না, তাহা প্রদর্শনার্থেই আমা-দিগকে এত কথা লিখিতে হইল। তৎপরে দ্বিতীয় যুক্তিটী—"কোনও বিষয়ে তাঁহাদিগের মতের সহিত না মিলিলে, তাঁহারা তর্ক করিতে আইসেন," এ সম্বন্ধেও আমাদিগের কয়েকটী কথা আছে। প্রবন্ধ-লেখক কি ইহাই ইচ্ছা করেন, পুরুষজাতি নারীজাতির উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করুন, কিন্তু রমণিগণ কোন বাক্যব্যয় না করিয়া "ভিজে বিড়াল" টীর মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন। তাঁহা-দিগের বিবেক, বুদ্ধি "গোল্লায়" যাক্! এই জন্যই বুঝি পুরুষ জাতি রমণিগণকে সুশিক্ষা প্রদানে অনিচ্ছুক! তবে, যদি তাঁহারা (রমণিগণ) কোনও ন্যায্য বিষয়ের জন্য দাবী করেন, তাঁহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন, এবং আত্মোন্নতি সাধন মানসে বদ্ধপরিকর হয়েন!

পরিবারিক সুখ শান্তি নষ্ট হইবে কথাটার অর্থ—রমণি-গণের উপর যে একচেটিয়া প্রভুত্ব ছিল, যাহা তাহাদিগকে মূকের ন্যায় নির্ব্বাক্ এবং পশুর ন্যায় আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছাবিহীন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর থাকিবে না! গৃহে বিদ্যাশিক্ষা করা, ইহার অর্থ, তৃতীয়ভাগে শিক্ষা সমাপ্ত

করিয়া উলকার্পেটের সর্ব্বনাশ, এবং সমবয়সী বালিকাদিগের নিকট পদ্যগদ্য ছন্দে পত্র লিখন ; কিন্তু ইহা শিক্ষা নহে. শিক্ষার কলঙ্ক মাত্র।

যদি বাটীতে রাখিয়া শিক্ষা দিলেই শিক্ষা হইত, তাহা হইলে আজ আমাদিগের দেশের সহস্রের মধ্যে নয়শত সাড়ে নিরানব্বই জন ভগিনীই বর্ণজ্ঞানবিহীনা কেন? আমাদিগের দেশে স্ত্রী শিক্ষার সুফল এখনও সকলে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, এবং ইহার উন্নতি সাধনে তদ্রূপ উৎসাহী নহেন বলিয়াই প্রচুর পরিমাণে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত।

তৎপরে বালিকাদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—"বিদ্যালয়ে জ্যামিতি পরিমিতি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহা তাহাদিগের কোনও কার্য্যে আইসে না।" তাহা হইলে আমাদিগের বিবেচনায় বালক বিদ্যালয় হইতেও এসব পাঠ উঠিয়া যাওয়া উচিত। কারণ, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ হয়ত: ভবিষ্যৎ জীবনে কেরাণী, উকীল, মুন্সেফ্ প্রভৃতি হইবেন, এই সকল কার্য্যের সহিত জ্যামিতির কোনও সম্পর্ক নাই। জ্যামিতি বিদ্যা খাটাইবার সুবিধা খুব কম লোকেরই হইয়া থাকে। কিন্তু সেজন্য কি তাঁহারা তাহা শিক্ষা করিবেন না? শুধু গৃহকার্য্যের সহায়তা ছাড়া বিদ্যার কি আর কোনও প্রয়োজন নাই? জ্ঞানোপার্জ্জন করাই কি বিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য নয়?

সাংসারিক জীবনেও যে ইহার দরকার হয় না, এমন নহে। অন্ততঃ ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র কন্যা ইত্যাদির শিক্ষার নিমিত্তও ইহাতে জ্ঞান থাকা দরকার। আর যে সকল রমণীর ভূসম্পত্তি আছে. তাঁহাদিগের পরিমিতি ও জরীপ জানা নিতান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই সকল বিষয় অধ্যয়ন করিলে, মস্তিষ্ক পরিষ্কৃত হয়, এবং কিরূপভাবে কোন বিষয়ের বিচার করিতে হয়, তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

আর যদি এসকল বাদ দিয়া রমণিগণকে একেবারে সাধারণ শিক্ষা প্রদান করিতে চাহেন, অর্থাৎ কিনা পত্র লিখন, বাজারের হিসাব রাখিতে শিক্ষা (অর্থাৎ রান্নাঘর ও শয়ন ঘরের গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু স্থান আছে, সেই স্থান-টুকুতে বাঁচিয়া থাকিতে যাহা জানার দরকার সেরূপ শিক্ষা) দিতে চাহেন তাহা হইলে প্রথমতঃ যোগ, বিয়োগ, পূরণ. ভাগেই গণ্ডগোল বাঁধিয়া যাইবে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে এই সকল নিয়মের অঙ্ক বেশী বড় করান উচিত নয়। কেননা, এমন খুব কম বালিকাই আছেন, যাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে টাকার কারবার করিতে হইবে।

তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকেই /১ সের আলুর দাম ৵১৫ হইলে /৪ সের আলুর দাম কত, মূলো পয়সায় দুটো, /• চারি পয়সায় কত? মাছ ।• চারি আনা, পান ৵১০, লঙ্কা ৵৫, মোট কত? এইরূপ হিসাবই করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে বড় বড় পূরণ ও ভাগ অঙ্ক করান উচিত নহে, কেননা তাহা ত আর কাজে লাগিবে না!

এখন দেখিবার বিষয়, এই সকল নিয়মের অঙ্ক শিখিলেই অঙ্ক সকল ক্রমে বড় করিয়া দেওয়া হয় কেন? তাহার অর্থ, অঙ্কের যে নিয়মটী বালিকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সেটীই আরও পরিষ্কার ভাবে যাহাতে সে বুঝিতে পারে, এবং ঐ অঙ্ক সম্বন্ধে তাহার মস্তিষ্ক যাহাতে আরও পরিষ্কার হয়, তজ্জন্য এই প্রকার প্রণালী মতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

জ্যামিতিই বালকবালিকাদিগের বিচার কার্য্যের প্রথম সোপান। জ্যামিতিক অনুশীলনী সকল প্রমাণিত করিয়া তাঁহারা একদিকে যেরূপ অতুল আনন্দ লাভ করেন, অপর দিকে সেইরূপ তাঁহাদিগের বুদ্ধিও মার্জ্জিত হয়।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরাই জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা। সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের সময় এত বিরক্তিকর ছিল না যে, সময় কাটাইবার আর উপায় না পাইয়া এই সকল অনর্থক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

লেখক মহোদয় আর একস্থলে লিখিয়াছেন, বালিকাদিগের শিক্ষা একাদশ বর্ষ বয়সেই সমাপ্ত হওয়া উচিত! জিজ্ঞাসা করি, একাদশ বর্ষ বয়সেই কোনও বালকের বৃক্ষারোহণ বিদ্যাই শেষ হয়, না সে একজন "পণ্ডিতমহাশয়" হইয়া পড়ে! বালিকাগণ ও অমানুষী শক্তি লইয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন নাই! তাঁহারাও মানুষ। পুরাকালে না হয় ভাগ্যক্রমে ২।১টী দেবতার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিত, তাঁহাদের কৃপায় "হঠাৎ সরস্বতী" হওয়া চলিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ দেবতার দর্শনলাভ নিতান্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমাদিগের

বিবেচনায় কাঁচা কাঁঠালকে পাকাইবার চেষ্টা না করিয়া বাল্যকাল হইতে যাহাতে রমণিগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন, এবং পরিণত বয়সে যাহাতে প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ করেন, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীসুনীতিবালা গুপ্ত।
বালিকা বিদ্যালয়, গৌহাটী।

স্মরণে।

১

কত সুখ তোমার স্মরণে,
কেমনে বলিব আমি ?
হে মোর হৃদয়-স্বামি,
সুখ-সুধা-সিন্ধু তুমি দাসীর জীবনে !
প্রিয়তম, তব স্মৃতি
পরিপূর্ণ প্রেম প্রীতি ;
শান্তির ত্রিদিব মম তোমারি চরণে।

২

জানেনা বোঝেনা কেহ,
ধরিয়া অমর দেহ
তুমি যে রয়েছ মোর হৃদয়ে গোপনে।
আনন্দ নির্ঝর রূপে
তুমি যে গো চুপে চুপে
ঢাল স্নিগ্ধ অনাবিল ধারা এ জীবনে।

৩

তব প্রাণ মম প্রাণ
রহিয়াছে প্রাণারাম,
বাঁধা চিরতরে দৃঢ় পবিত্র বাঁধনে ;
তাই, আমার হৃদয় হ'তে
পারেনি তো কোনো মতে
তোমারে কাড়িয়া নিতে দুর্ব্বল মরণে।

৪

অনুভব হয় মম,
সুমধুর অনুপম
সুরভি নিশ্বাস তব মলয় পবনে।
হেরি নিতি নিতি নব
উজল কিরণ তব
সুনীল প্রভাতাকাশে তরুণ তপনে।

৫

তব মৃদু চারু হাসি
প্রাণাধিক, ওঠে ভাসি
মধুময়ী রজনীর চাঁদের কিরণে।
প্রকৃতি সুষমা মাঝ
তোমারে হৃদয়রাজ,
নেহারে এ দাসী সদা অতৃপ্ত নয়নে।

৬

মুদি যবে আঁখিদ্বয়ে
হেরি তুমি এ হৃদয়ে
বিরাজিত ভকতির হৈম সিংহাসনে,
বিষাদ-বেদনা-নাশি
অধরে লইয়া হাসি,
স্নেহ-মমতার দ্যুতি লইয়া আননে।

৭

জগতের উপেক্ষায়
বুক যবে ভেঙ্গে যায়,
নিদারুণ দুঃখানল জ্বলে যবে মনে,
তখন মমতা ভরে
নিবাও সে অনলেরে
সান্ত্বনার সুশীতল সলিল সিঞ্চনে।

৮

প্রত্যক্ষ দেবতা মোর,
দুঃখের আঁধারে ঘোর
সুখের উজল জ্যোতিঃ তুমি এ ভুবনে।
হে আমার প্রাণারাম,
পুণ্য তুমি মূর্ত্তিমান,
দূরে যায় পাপ তাপ তোমারি স্মরণে।

শ্রীপ্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

ম্যাডাম গঁ্যায়ো।

বৈষ্ণবেরা বলেন, ভক্ত এবং ঈশ্বরের মধ্যে যে প্রেম তাহা পতিপত্নীর প্রেমের ন্যায়। স্ত্রী স্বামীকে যে অহেতুক প্রেম বিতরণ করেন,—যে অহেতুক প্রেমের আদর্শ ভারতে সীতা দেবী দেখাইয়াছেন—তাহা ভক্তজীবনেরও আদর্শ। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন, ভক্তি করেন, তিনি তাহার কারণ জানেন না, বা জানিতে চাহেন না; সেইরূপ ভক্ত ভগবানকে ভালবাসিতেছেন, কেন বাসিতেছেন জানেন না; তিনি উপাস্য দেব সেই জন্য তাঁহাকে ভালবাসেন; ইহারই নাম অহেতুক প্রেম। ভগবান আমার সুখ স্বচ্ছন্দতা দিতেছেন, তিনি আমার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, তিনি আমার সহায় ও বন্ধু, সেই জন্য তাঁহাকে ভালবাসিব,—এইরূপ প্রেম ব্যবসায়বুদ্ধ্যাত্মিকা। স্ত্রীলোক কি প্রকারে ভগবান্‌কে পতিরূপে বরণ করিয়া তাঁহার সহিত একাত্মা হইয়াছেন, ম্যাডাম গঁ্যায়োর মহৎ জীবনী তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। ভারতে বৈষ্ণব কবি ও ভক্তেরা ভগবানকে মধুরভাবে সাধন করিতেন; বৈষ্ণবেতিহাসে অহেতুক প্রেমের অনেক জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি মধুরভাবে এই পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় নারী ঈশ্বরকে পতির ন্যায় সেবা করিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সে বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই মহীয়সী রমণী ফরাসী-দেশীয়া। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রিল তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। আড়াই বৎসর বয়সে কোন এক মঠে (Convent) গঁ্যায়োর শিক্ষা আরম্ভ হয়, এবং এখানে তিনি তাঁহার বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মচরিতে এই অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি যদিও নিতান্ত শিশু ছিলাম তথাপি ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে এবং সন্ন্যাসিনীদের বেশভূষা পরিধান করিতে আমি বড়ই ভালবাসিতাম।"

একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তন ঘটে; তিনি একদা হঠাৎ খৃষ্টান্ ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল প্রাপ্ত হন, এবং এই সময় হইতে এই গ্রন্থখানি চিরকালের জন্য তাঁহার জীবনের সাথী হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি অপর কোন পুস্তক বা বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না দিয়া কেবলমাত্র এই গ্রন্থপাঠে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইতাম, এবং আমার স্মৃতিশক্তি প্রবল থাকায়, বাইবেলের ঐতিহাসিক অংশগুলি একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম।"

ইহার এক বৎসর পরে ঈশ্বরের সহিত তাঁহার প্রথম যোগ স্থাপিত হয়, এবং সেই সময়ে তাঁহার মন ভক্তিতে এরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে তিনি ভক্তিভরে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কেবল সাময়িক স্পন্দন,—উহা তাঁহার জীবনে স্থায়ী হইল না, পৃথিবীর অপবিত্রতা শীঘ্রই তাঁহাকে গ্রাস করিল। তিনি বলিয়াছেন, —"আমার দোষ এবং ত্রুটিসমূহ পুনরায় পরিপুষ্ট হইল, এবং আমার ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা ম্লান হইয়া গেল।"

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গঁ্যায়োর পিতা তাঁহার পরিবার প্যারী (Paris) নগরীতে আনয়ন করেন। পর বৎসরে ষোল বৎসর বয়সে তিনি জ্যাক্‌স্ গঁ্যায়ো নামক অষ্টত্রিংশৎ বর্ষীয় এক ধনীলোকের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। এই বিবাহ কেবলমাত্র বিবাহের জন্যই হইয়াছিল, ইহার ভিতরে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের কোন আকর্ষণ ছিল না; বালিকা গঁ্যায়ো এ বিবাহে সুখী হইতে পারিলেন না। স্বামীর সহিত তাঁহার বয়সের বিশেষ বিভিন্নতা ছিল বলিয়াই যে তিনি কেবল অসুখী ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার শ্বশুরালয়ে শান্তির লেশমাত্র ছিল না। গৃহ সংসার "এক অশিক্ষিত শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী" কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত, এবং তাঁহার স্বভাব এতই অপ্রিয় ছিল যে সেজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশভোগ করিতে হইত।"

নিজের বহু দোষ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও গঁ্যায়ো জানিতেন যে, "ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া যাহা আমাকে দান করিবেন, তাহা আমারই মুক্তির জন্য। 'মঙ্গলের জন্য তুমি আমাকে কষ্ট দিতেছ, ইহার ফল মধুময় হইবে। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিলাম যে আমার সহিত তোমার ঐরূপ ব্যবহার আমারই শূন্য অহঙ্কার এবং রূঢ় স্বভাবের সংশোধনের জন্য। আমার আত্মদোষ ও দুর্ব্বলতা দূর করিবার ক্ষমতা ছিল না, তোমারই কৃপা, উহাদিগকে বশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

এই সময় হইতে তাঁহাকে কিছুকাল পাপের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। পবিত্র বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য আসিয়া বার বার তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল। যে কৃপাময় ভগবান্ মানবের মনে প্রকৃত বল এবং শান্তি দান করেন, সেই পরমপুরুষের সহিত তাঁহার যোগ ভাল করিয়া এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এইবার তাঁহার কৃপা হইল। ভগবান্ কোন কার্য্য স্বহস্তে করেন না, বা যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারেন না; তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি মানবের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত করেন। তিনি যখন এই সুন্দর আত্মাটীকে তাঁহার জন্য ব্যগ্র বুঝিতে পারিলেন, তখন যাহাতে এই ভক্তিময় প্রাণের যথোচিত বিকাশ হয়, সেই জন্য বিনিধ ধর্ম্মাত্মাকে তিনি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। এই ধার্ম্মিকদের মধ্যে ফ্রান্সিস নামক এক যোগী পুরুষ তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করেন।

তিনি ব্যগ্রভাবে ভগবানকে পাইবার উপায় জানিতে চাহিলে যোগী বলিলেন,—"বৎসে, তুমি এতকাল ভগবানকে বাহিরে অনুসন্ধান করিয়াছ বলিয়া তাঁহাকে পাইতে অকৃত-কার্য্য হইয়াছ; তোমার হৃদয়মাঝে স্বর্গধাম বিরাজমান, তুমি তথায় তাঁহার অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইবে।"

গ্যাঁয়ো ইহার পর আত্মচরিতে লিখিতেছেন,—"এই কথা-গুলি বলিয়া ফ্রান্সিস চলিয়া গেলেন, কিন্তু এই কথা কয়েকটি শাণিত বাণের ন্যায় আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এই সময়ে ভগবানের প্রেমের এমনই চিহ্ন আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল, যে আমি কখনও আর সে প্রেম-চিহ্ন মুছিতে ইচ্ছুক হই নাই। আমি বহুবর্ষ হইতে মনে মনে যাঁহাকে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তাঁহাকে পাইবার উপায় এই সাধু আমার সম্মুখে আনিয়া দিলেন। আমি জ্ঞানাভাবে আমার হৃদয়মাঝে যাহা ছিল, তাহাও জানিতে পারিতাম না, তাঁহার কথায় আমার সুপ্ত জ্ঞান প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। হে প্রভু, তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরে বাস করিতে, এবং সর্ব্বদা যাহাতে তোমার এই সন্তান তোমাকে আমার ভিতরে অনুসন্ধান করে, তাহাই তুমি চাহিতে। হে অনন্ত সৎস্বরূপ! তুমি আমার এত নিকটে বর্ত্তমান ছিলে, কিন্তু তোমাকে পাইবার জন্য আমি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলাম, তবু তোমার সন্ধান পাই নাই। আমার জীবন আমার নিকট ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইত! বিপুল ঐশ্বর্য্য-পরিবৃত হইয়াও আমি নিজেকে দরিদ্র ভাবিতাম, পৃথিবীর প্রচুর খাদ্য দ্রব্য চতুর্দ্দিকে থাকা সত্বেও আমার অনন্তের জন্য ক্ষুধার শান্তি হইত না! হে চিরসুন্দর! কেন তোমাকে আমি এত পরে জানিতে পারিলাম! ইহার কারণ এই যে, "The kingdom of God is within you"—'তোমার হৃদয়মাঝে তোমার ঈশ্বরের বসতি' এই মহাবাক্য আমি বুঝিতে পারি নাই। ইহা আমি এক্ষণে অনুভব করিলাম; যখন তুমি আমার হৃদয়রাজ হইলে এবং আমার এই হৃদয় যখন তোমার রাজ্য হইল, এখানে সম্রাটের ন্যায় তোমার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ! এখানে তুমি তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছ।"

"এই সাধু যোগী আমার যে কি উপকার করিলেন, তাহা আমি ভাষায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। আমার হৃদয় মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, ঈশ্বর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমিও তাঁহার উপস্থিতি হৃদয়মাঝে অনুভব করিতে লাগিলাম। এই অনুভূতি যে কেবলমাত্র বাহ্যভাবে উপলব্ধি করিতেছিলাম তাহা নহে, কিন্তু তিনি যে আমার অন্তরতম স্থানে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি বুঝিলাম, ভগবানের নাম অমৃত বর্ষণ করে বলিয়া লোকে তাঁহাতে নিমগ্ন হয়। হে অমৃতস্বরূপ! তোমার এই অমৃতরস আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিল। আমি সে রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিলাম না; কারণ, হে প্রেমময়, তোমার প্রেমের অমৃতবন্যা প্রবাহিত হইয়া আমার আমিত্ব বা অহং জ্ঞান ধৌত করিয়া লইয়া গেল। আমি এতই পরিবর্ত্তিত হইলাম, যে আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, অপরের কথা আর কি বলিব! এখন হইতে আমি আর সেই সকল বেদনাদায়ক কষ্টে পীড়িত হইতাম না; অথবা পার্থিব কর্ত্তব্য সম্পাদনে কখনও পরাঙ্মুখ হইতাম না। ভীষণ অগ্নির মধ্যে তণ্ডুলকণার ন্যায় আমার সকল দুর্ব্বলতা ভস্মীভূত হইল।"

"উপাসনা এখন হইতে আমার নিকট সহজসাধ্য হইয়া গেল। প্রহরের পর প্রহর মুহূর্ত্তের ন্যায় চলিয়া যাইত। কিন্তু প্রার্থনা ব্যতীত আমি কিছুই করিতাম

না; প্রেমের আধিক্যে সময়ের দীর্ঘতা অনুভব করিতাম না। আমার এই প্রার্থনা আনন্দ হইতে উত্থিত হইত, এবং ঈশ্বর যে আমার হৃদয়মাঝে বিরাজ করিতেন, তাঁহার উপর নির্ভরশীলতা হইতে আমি তাহা বুঝিতে পারিতাম। এই নির্ভরশীলতা জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয় নাই—প্রেম হইতে। কারণ এক্ষণে আমি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই সম্মুখে দেখিতে পাইতাম না। তাঁহাকে অধিক পবিত্রভাবে ও দৃঢ়ভাবে ভালবাসাতে, আমার সম্মুখ হইতে অপর সকল বিষয় অন্তর্হিত হইল; কিন্তু কেন তাঁহাকে ভালবাসিতাম, ইহার কারণ জানিতাম না।"

ইহাই অহেতুক প্রেম; আদর্শ প্রেম। ২০ বৎসর বয়সে ম্যাডাম গ্যাঁয়োর জীবনে এই পবিত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তিনি তাঁহার এই অবস্থা সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"মানব-সমাজের সকল প্রকার বাহ্যিক সুখস্বচ্ছন্দতা, ক্রীড়া, বিশ্রাম, নৃত্য, বিলাস-ভ্রমণ, সুখান্বেষীদের সঙ্গ, আমি এই জন্মের মত ত্যাগ করিলাম। পৃথিবীর লোকেরা যে সকল সুখে সর্ব্বদা নিমগ্ন এবং যাহা তাহাদের নিকট কত প্রিয় বলিয়া বোধ হয়,—সেই সকল আমোদ প্রমোদ আমার নিকট অতি নিরানন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইত, এবং মনে হইত, যে আমিই বা এককালে কি করিয়া ঐ সমুদায়ে নিমগ্ন ছিলাম! এই সময় হইতে আমার মনের নিভৃত কক্ষে এই আকাঙ্ক্ষা জন্মিল,—যে আমি সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিব। আমার অন্তঃকরণ হইতে স্বর্গীয় পিতার নিকট এই ভাষা সর্ব্বদা উত্থিত হইত—'হে পিতা, আমি কোন্ প্রিয়বস্তু তোমার নিকট স্বেচ্ছায় বলি দিতে বা অর্পণ করিতে অনিচ্ছুক? আমাকে ক্ষমা করিও না, আমাকে ত্যাগ করিও না।' আমার বোধ হইত, যেন আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং জ্ঞাতসারে তাঁহার নিকট অপরাধ করিতাম! আমি ঈশ্বর বা যীশুর কথা শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম।" (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আছে

ওরা যে সকলে বলে জগতে সে নাই,
অদ্ভুত আশ্চর্য্য কথা,
বিশ্বব্যাপী কপটতা,
কি বলিতে কি বলে তা বুঝিনাতো ছাই।
কি যে সে দারুণ ভাষা,
শত বজ্র সর্ব্বনাশা,
না শুনে না বুঝে যেন আগে ম'রে যাই,
ওরা যে সকলে বলে জগতে সে নাই!

২

সে নাই অবনী-তলে তাও কভু হয়?—
অজর অমর বীর,
শ্রেষ্ঠ রত্ন ধরণীর,
পবিত্র করুণা-সিন্ধু উদার হৃদয়;
দীনের দোসর ভাই,
কেহ তার পর নাই,
"শত্রু মিত্র ছোট বড়" তার কাছে নয়,
সে নাই অবনী-তলে তাও কভু হয়?

৩

ওরা কেন বলে "ভবে সে যে নাহি আর"
আকাশ পড়ে যে খসি,
নিভে যায় রবি শশী,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভেঙে হয় চুর মার।
একেবারে যায় না সে,
কতবার ফিরে আসে,
কখনো দেখিনি কেহ নিঠুরতা তার,
তাই বলি—গিয়ে থাকে, আসিবে আবার।

৪

আমি চিনি, সে যে চির উদার সরল
তেজস্বী মনস্বী শান্ত,
উদাসী সন্ন্যাসী কান্ত,
নিরমল হিয়া খানি পূত গঙ্গাজল,

মরতে সে দেবতুল্য,
কে বোঝে তাহার মূল্য,
তার বুকে ভরা সদা দেবতার বল,
সে কি কভু যেতে পারে ছাড়ি ভূমণ্ডল ?

৫

আছে সে জগতে বটে আছে সে কোথায়
আছে সে জাহ্নবী ঘাটে,
আছে সে শ্যামল মাঠে,
আছে নব বিটপের শীতল ছায়ায়,
আছে সে ফুলের বনে
বেলা গন্ধরাজ সনে,
পাপিয়া গাহিয়া গীত তাহারে শুনায়।
মেঘমালা বজ্র স্বরে,
তাহারি বন্দনা করে,
মৃত্যু তার পায়ে লুটি মরিবারে চায়,
অজর অমর সে যে এ মর ধরায়।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

জ্যোতির্ব্বিদের ভুল।

অধ্যাপক রবার্টসন আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ। আকাশ-মণ্ডল সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি অতি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন। মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধের জন্য নিত্যই তাঁহার দ্বারে হাটাহাটি করেন। এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার বেশ দু পয়সা আয় হয়।

আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার মানমন্দিরে বসিয়া কতকগুলি পরীক্ষার ফলাফল গণনা করিতেছেন। অবশেষে কাগজ পত্রগুলি সরাইয়া রাখিয়া বিমর্ষ মুখে তিনি ভাবিতে বসিলেন। কি বিষম কথা! তিনি পুনঃ পুনঃ গণনা করিয়া দেখিলেন, ঠিক্ তিন মাস পরে একটা অতি বৃহৎ গ্রহের সহিত আমাদের এই পৃথিবীর সংঘর্ষ হইবে। সেই সংঘর্ষণে পৃথিবীর ধ্বংশ অনিবার্য্য। কিছুদিন হইল এই তত্ত্বটী তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু আর তিনটী মাত্র মাস পরে আমাদের এই সাধের ধরণী প্রলয়োৎপাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মহাকালের কুক্ষিগত হইবে, মন কি সহজে তাহা মানিতে চায় ? তাই সমস্ত গত সপ্তাহটী প্রতিরাত্রে অতিশয় অভিনিবেশ সহকারে দূরবীক্ষণ সাহায্যে তিনি সেই বিশেষ গ্রহটীর অবস্থান লক্ষ্য করিয়াছেন, এক বারের গণনা দশবার করিয়াছেন, আজ পুনরায় সেই সকল গণনা নূতন করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু ফল সেই একই! এই কথায় যদি অনাস্থা করিতে হয় তবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপরেও আর আস্থা স্থাপন করা যায় না। সুপণ্ডিত অধ্যাপক রবার্টসন বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি সন্দিহান হইবেন! তবে যে বিজ্ঞান, গণিত সকলই অবিশ্বাস করিতে হয়!

জুন মাসে অধ্যাপক এই তত্ত্বটী আবিষ্কার করিলেন। আগষ্টের শেষ ভাগে পৃথিবীর প্রলয় কাল। দু এক দিন এদিক সেদিক যদি নিতান্তই হয় তবে সেপ্টেম্বরের ২।৩ তারিখ পর্য্যন্ত পৃথিবী বাঁচিয়া থাকিতেও পারে, কিন্তু ৭ই সেপ্টেম্বরের পর তাহার আর কোন আশা নাই।

এই বিষম প্রলয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া অধ্যাপক কিছুক্ষণ শান্ত ভাবে বসিয়া রহিলেন। সেই বিশেষ দিন সম্বন্ধে অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনার ফলও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে দিন আকাশমার্গে অদ্ভুত উল্কাবৃষ্টি হইবে। তাঁহাদের গণনার ফল স্মরণ করিয়া রবার্টসন মৃদুহাস্য করিলেন। ভাবিলেন, গণনায় একটু ভুল করিয়া তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই আছেন! কিন্তু বৈজ্ঞানিক-জগতের সম্মুখে তাঁহার সাংঘাতিক আবিষ্কারের ফল প্রকাশ করা তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিলেন। প্রলয়ের মুহূর্ত্ত যখন উপস্থিত হইবে, পৃথিবী যখন ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকিবে, সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে "আমি ত তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম," এই কথা বলিয়া কি কোন লাভ হইবে? তদ্দ্বারা কি কোনরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করা যাইবে?

তিনি যদি ধর্ম্ম প্রচারক হইতেন, তবে পৃথিবীর নরনারীকে "শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনের" কথা বলিয়া পাপ তাপের জন্য অনুতপ্ত হইতে এবং ঈশ্বরের দয়ার ভিখারী হইতে উপদেশ দিতেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার কার্য্য নহে। আর তিনি

জানিতেন, তাঁহার গণনার ফলে সংসারের ভোগসুখাসক্ত নরনারী সহজে বিশ্বাস করিবে না। কয়েক জন জ্যোতির্বিদের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাদের গণনার ভ্রান্তি প্রদর্শন করা যেমন তাঁহার নিকট অনাবশ্যক মনে হইল, পৃথিবীর প্রলয়ের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া দেওয়াও তাঁহার নিকট তেমনই নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল। আপনার আত্মীয় স্বজনের নিকটও তিনি গণনার ফল গোপন রাখিলেন। নিজের জন্যও তিনি বড় ভাবিত হইলেন না। বিবাহ করেন নাই, স্ত্রীপুত্র নাই। নিজে চিরদিন সৎভাবেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, মৃত্যুর পর আত্মার যে নিতান্ত অসদ্গতি হইবে সেই আশঙ্কা তাঁহার বড় ছিল না। সুতরাং গণনার ফল কাহারো নিকট ব্যক্ত করিবেন না, এই মীমাংসা করিয়া তিনি ধীরে ধীরে মানমন্দির হইতে অবতরণ করিলেন।

চারিদিক হইতে তিনি পৃথিবীকে আজ এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ঐ যে বাগানের গাছে সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়াছে, এই কি তাহাদের শেষ ফুল,—আর তাহাতে ফুল ফুটিবে না! ঐ যে মধুমক্ষিকাগুলি শীতকালের জন্য সযত্নে মধু আহরণ করিতেছে, এ মধু আর তাহাদের ব্যবহারে আসিবে না? প্রকৃতি ত তৃণপুষ্পে তেমনি মনোহর বেশ ধারণ করিয়া সজ্জিত হইতেছে, সেও কি অবশ্যম্ভাবী ধ্বংশের কোন খবরই পায় নাই? এই বিশাল ধরণীপৃষ্ঠে এক মাত্র অধ্যাপক রবার্টসনই কি এই সাংঘাতিক তত্ত্ব জানিতে পারিলেন? অধ্যাপক ধীরে ধীরে তাঁহার বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বাটীর প্রবেশ দ্বারে বাইসিকেলের শব্দ শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। তাঁহার ভাগিনেয় আসিয়া তাঁহার করস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করতঃ বলিল, "মামা, আজ এত সকালেই যে আপনি কাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন? বিশেষ একটা পরামর্শের জন্য আসিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, আপনার গণনা ভঙ্গ করিয়াই আপনার সঙ্গে কথা কহিতে হইবে। এত সকালেই আপনি গণনা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছেন, ভালই হইল।

অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরামর্শ বাবা?" যুবক লজ্জাবনত মুখে বলিল,—"যতই বয়স বাড়িতেছে, লেডি ডেনবার্সের প্রকৃতি ততই খিট্‌খিটে হইয়া উঠিতেছে। বেচারী নেটা তাঁহার মন জুগাইয়া চলিতে চলিতে দিনের পর দিন রোগা হইয়া পড়িতেছে, তার স্বাস্থ্য শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়া রহিয়াছে, অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিতেছি না। কিন্তু আর কি এ ভাবে থাকা উচিত? আপনি কি পরামর্শ দেন? নেটা বলে, বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিছু দিন ত খুব ভালই লাগিবে, কিন্তু তার পরেই দরিদ্রতার পেষণে অস্থির হইতে হইবে। সে বলে,—আপনি কি যেন বলিতে চাইছেন, বলুন।"

অধ্যাপক ভূমিকাস্বরূপ একটু কাশিলেন। তাঁহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, অর্থের ভাবনায় কুমারী বলাণ্ডের (নেটা) চিন্তিত হইবার কোন আবশ্যক নাই, কারণ তিন মাস মধ্যেই জগতের ধনী নির্ধন সকলকেই এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইবে,যখন পার্থিব অর্থের ভাবনার আর কোনই প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু তিনি দেখিলেন, অর্থের অনাটনে হেনরির মন উদ্বিগ্ন থাকিলেও আশা, প্রেম ও আনন্দের দিব্যজ্যোতিঃ তাহার মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তরুণ যুবক প্রেমের যে মধুর স্বপ্নে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই স্বপ্নকে একটী কথায় চূর্ণ করিয়া দিতে তাঁহার আদবেই ইচ্ছা হইল না।

বিবাহের পর সংসারের ব্যয় কি করিয়া নির্ব্বাহ করিবে এই বিষয়ে হ্যারী মাতুলকে আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিতে লাগিল। প্রেমাস্পদা বালিকাকে অপরের বেতনভোগী সখিত্বের দায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য সে আরো কঠিন শ্রম করিবে, নিজের পোষাক পরিচ্ছদের খরচ আরো কমাইয়া দিবে। কিন্তু অধ্যাপকের কর্ণে তাহার এ সকল কথার কিছুই প্রবেশ করিতেছিল না। তিনি আপন চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, আর তিনটী মাত্র মাস অবশিষ্ট। এই দুইটী যুবক-যুবতী এতদিন সংসারে কঠোর সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে।

বাকী তিনটী মাস তাহাদিগকে একটু সুখ সম্ভোগের সুবিধা করিয়া দিলে মন্দ কি? অধ্যাপক কি তাহাদিগকে সুখী করিবার পক্ষে কিছু সাহায্য করিতে পারেন না? তাঁহার বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট আয় ৪০ পাউণ্ড ছাড়া বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়াও কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, মোটের উপর তাঁহার মূলধনের পরিমাণ সহস্র পাউণ্ড ধরা যায়। কিন্তু এক হাজার পাউণ্ড মূলধন আর একটা কথা কি? কিন্তু সম্মুখে আর মোটে তিনটী মাস ত বাকী! যাহা মূলধন আছে তিন মাসেই ত সব খরচ করিতে হইবে! অধ্যাপক দেখিলেন, তিন মাসের জন্য এত টাকা যার আছে সে ত বেশ ধনী লোক! তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, হ্যারী কাছে নাই। সে অদূরে কুমারী জেনের সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন হইয়াছে।

কুমারী জেনের বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর, তাঁহার বিবাহ হয় নাই। হ্যারীর সহিত তাঁহার অনেক দিনের পরিচয়, তাহাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন। হ্যারীর সঙ্গে তিনি তাঁহার বাগানের সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিলেন, তাহাদের কথাবার্ত্তা যখন শেষ হইল তখন অধ্যাপক ভাগিনেয়কে নির্জ্জনে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা হ্যারী, তুমি তবে শীঘ্রই বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর?"

"হ্যাঁ, মামা! শুধু টাকা পয়সার কথা ভাবিয়াই দেরী করিতেছি। এই অবস্থায়ই আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু—"

ভাগিনেয়কে বাধা দিয়া অধ্যাপক বলিলেন, "তুমি আমার নিকট আসিয়া ভালই করিয়াছ। ছুটী চাহিলে কি তুমি এখন ছুটী পাবে?"

হ্যারী বিস্মিত হইয়া বলিল, "হাঁ, তা পাব বই কি?"

"তাহা হইলে, তুমি যদি কুমারী বলাণ্ডকে সম্মত করিয়া এক মাস দেড় মাসের মধ্যে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে বার্ষিক—(বার্ষিক কথাটা বলিতে বলিতে অধ্যাপক মনে মনে হাসিতেছিলেন, কারণ পৃথিবীবাসীর জীবনে বৎসর ত আর আসিবে না!)—চারি শত পাউণ্ড করিয়া বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিব।"

"মামা, আপনি বলেন কি? আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেন?"

"ছি বাবা! তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করিব কেন? তোমার যা আছে, আর আমি যা দিব, বোধ হয় তাতে তোমাদের এক রকম চলিয়া যাইবে,—না?"

"এক রকম? এক রকম কেন, বেশ স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যাইবে। কিন্তু আপনার অবস্থা ত আমি জানি। আপনি কি নিজে অনাহারে থাকিয়া আমাদিগকে সুখী করিবার সংকল্প করিতেছেন? আমার প্রতি আপনার স্নেহ ভালবাসার পরিমাণ আমি জানি, কিন্তু আমি আপনাকে কষ্টে ফেলিতে প্রস্তুত নই।"

"দূর বোকা ছেলে! এখানে অনাহারে মরিবার কোন কথা হইতেছে না। আমি স্বচ্ছন্দে দিতে পারি বলিয়াই বলিয়াছি।"

"আপনার পুস্তক তা'হলে এখন খুব বিক্রী হচ্ছে?"

একটু কাশিয়া আমৃতা আমতা করিয়া অধ্যাপক উত্তর করিলেন, "হাঁ, বইয়ের কাট্‌তি এখন কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু টাকা কোথা হইতে আসিতেছে তাহা ভাবিবার তোমার দরকার নাই। তুমি বলিলে, কুমারী বলাণ্ডের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছে, তাহা হইলে বিবাহের পর মধুমাস (Honeymoon) কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাপন করিতে হইবে। বেচারীকে দেশভ্রমণ করাইয়া একটু সুস্থ ও সুখী কর, খরচের জন্য ভাবিও না। এই ভ্রমণের ব্যয় তোমার বিবাহে আমার যৌতুক। আপততঃ দুই শত পাউণ্ড দিব, যদি তাতে না কুলায়, আরও পাইবে। না—না, ধন্যবাদের কোন আবশ্যক নাই, তোমাদিগকে সুখী দেখিলেই আমি সুখী হইব।"

তাঁহারা উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। হ্যারী তাহার নব সৌভাগ্যে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ভক্তিবিগলিত দৃষ্টিতে মাতুলের দিকে চাহিয়া রহিল। সে মাতুলকে সর্ব্বদাই দরিদ্র বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে, আর তিনি কি না বার্ষিক চারি শত পাউণ্ড দেওয়া নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় মনে করিতেছেন! তার পর আত্মসংবরণ করিয়া সে তাহার সুখময় ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনায় আঁকিতে লাগিল। তৎপর মাতুলকে বলিল,

"আমি তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা চাই। ডাকের পূর্ব্বে বাড়ী যাইতে হইবে, আজকের ডাকেই খবরটা নেটাকে দিতে হইবে।"

"আমি ত আজ কাল চা পান করি না। কেমিরন বলে, অতিরিক্ত অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে চা পান করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়।"

"মামা! আপনি বরাবর চা এত ভালবাস্‌তেন, আর কোথাকার এক বুড়ী কেমিরন, তার কথায় চা বন্ধ করিয়াছেন! লক্ষ্মীছাড়া বুড়ী কোন্ দিন আপনি বেশী মোটা হইয়া যাইতেছেন অজুহাতে আপনার খাবারও কমাইয়া দিবে দেখিতেছি! চলুন ঘরে যাই, আমি তাহাকে জব্দ করিতেছি!"

চামুণ্ডা-প্রকৃতি কেমিরন অধ্যাপকের রাঁধুনী। এই বৃদ্ধা অধ্যাপকের সুখ সুবিধার প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদা আপনার মরজি মত ঘর সংসার করিয়া আসিতেছে। অধ্যাপক তাহার ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকিতেন। কিন্তু হেনরী আসিলেই তাহার সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া যাইত না। হ্যারী (হেনরী) রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, খালি ঘর, কেমিরন নিজে চা খাইয়া অধৌত বাসনগুলি ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে। হ্যারী রাগে গড় গড় করিতে লাগিল, এবং মাতুলকে বলিল, "মামা, এই লক্ষ্মীছাড়া বুড়ী আপনাকে কষ্টের একশেষ দেয়, এর চেয়ে আপনি কি খাওয়া দাওয়ার একটু ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারেন না? এই খরচেই আরও ঢের সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। আমি সুখে বিদেশে বেড়াইতে যাইব, কিন্তু এই বুড়ীর কথা মনে করিয়া আমার অর্দ্ধেক সুখ নষ্ট হইয়া যাইবে। আপনি বিবাহ করিলেন না কেন মামা?"

অধ্যাপক হাসিয়া বলিলেন, "বিবাহ ব্যাপারটা মস্ত বড় পরীক্ষা হ্যারী!"

"আপনি ত আমার পক্ষে এই পরীক্ষাটা সম্ভব করিয়া দিতেছেন। আমি ইহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া একটুও ভীত নই। যাক্, এখানে ত চা পাইব না, দেখি কুমারী জেনের বাড়ীতে একটু পাওয়া যায় কি না।"

এই বলিয়া মাতুলকে একাকী ফেলিয়া হ্যারী কুমারী জেনের বাড়ী গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া চা পান করিলে মিস্‌ জেন অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। আচ্ছা মামা, আপনি মিস জেনকে বিবাহ করেন না কেন?" আপনার আনন্দে হ্যারী আজ অধীর। অধ্যাপক হাসিয়া বলিলেন, "তিনি আমায় বিয়ে করতে গেলেন কেন?" যাহা হোক, মিস্ জেন অতি সমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। হ্যারী সাগ্রহে তাঁহার সঙ্গে নানা কথায় নিমগ্ন হইল। কিন্তু অধ্যাপক আজ যেন অন্য দিন অপেক্ষাও বেশী অন্যমনস্ক, চিন্তামগ্ন। মিস্‌ জেন তাঁহাকে ভাল করিয়াই জানিতেন, সুতরাং তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইলেন না।

ভাগিনেয়ের কথায় তাঁহার মনে আজ নূতন চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। মিস্‌ জেনের সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বদাই খুব উচ্চ ধারণা, কিন্তু অধ্যাপক বড় সতর্ক মানুষ, আর বিবাহটাকে তিনি সর্ব্বদাই একটা বিপজ্জনক পরীক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আজ তাঁহার মনে হইল, আর মোটে ত তিনটী মাস! সুফল হউক আর কুফল হউক, তিন মাসের পরীক্ষা একটা ভয়ের কথা নয়। তিনি যদিও চিন্তামগ্ন ছিলেন তথাপি হ্যারী ও মিস্‌ জেনের কথাবার্ত্তার প্রতি একবারে উদাসীন ছিলেন না, তাঁহাদের সকল কথাই মনোযোগ পূর্ব্বক তিনি শুনিতেছিলেন।

কুমারী জেন্ বলিলেন, "হ্যারী, একবার কুমারী বলাগুকে আমার এখানে আনিতে হইবে—অবশ্য আমার খালি বাড়ীতে ২।৪টা দিন কাটাইতে যদি তার নিতান্ত বিরক্তি বোধ না হয়!"

অধ্যাপক মনে মনে বলিলেন, "মাঝখানে একটা মাত্র দেয়াল, এক পাশে একজন একক পুরুষ, অন্য পাশে একজন একাকিনী মহিলা!"

এমন সময়ে হ্যারী তাড়াতাড়ি মিস্‌ জেন ও মাতুলকে অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেল। অধ্যাপক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও হ্যারী— আমিও যাইতেছি।" কিন্তু তাঁহার কথা শুনিবার পূর্ব্বেই হেন্‌রি অদৃশ্য হইয়াছে। চলিয়া যাইবার জন্য এত ব্যস্ত সমস্ত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই বলিয়া মিস্

জেন তাঁহার প্রতিবেশীকে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু অধ্যাপক রবার্টসন নিতান্ত বিপন্নের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। মিস্ জেনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছেন। অধ্যাপক তখন হতাশ হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, জাল নিক্ষিপ্ত হইল।

(২)

জুলাই মাসের প্রথমভাগে সেই সহরের ধর্ম্মমন্দিরে যুগ্ম বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। পাঠক পাঠিকা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, অধ্যাপক রবার্টসন এবং হেনরি এই দুই বিবাহের বর, আর কুমারী জেন ও কুমারী বলাও বিবাহের কন্যা। বিবাহের পর হেনরি মাতুলপ্রদত্ত অর্থ সাহায্যে নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া মধুমাস যাপন করিতে সুইজার্লেণ্ডে যাত্রা করিল। আর পরিণতবয়স্ক নবদম্পতি ইংলণ্ডেরই নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তরুণ নবদম্পতি যতই স্বপ্নময় রাজ্যে ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে বাস করুক না, অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী দাম্পত্য জীবনে যে শান্তিসুখের আস্বাদন পাইলেন, তাহার সহিত সে উচ্ছ্বাসের তুলনা হয় না। মিসেস্ রবার্টসন যেন এই বিবাহে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর কমিয়া গিয়াছে, তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধ্যাপক পত্নীর সুন্দর কোমল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর তিনি দেখিলেন, তাঁহার পত্নী সুশিক্ষিতা নারী, তাঁহার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তিনি অনেক সময়ই নিপুণতার সহিত যোগ দিতেন।

কিন্তু এই সুখশান্তির নির্ম্মল আকাশে ক্রমে ক্রমে বিষাদের কৃষ্ণমেঘ দেখা দিল। জুলাই মাসের দিনগুলি যতই ফুরাইতে লাগিল অধ্যাপকের মুখ ততই মলিন, অন্তর ততই বিষণ্ণ হইতে লাগিল। এমন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, এমন আনন্দ, পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের এমন স্বর্গীয় সুখ, যাহা লাভ করিয়া আজ জীবন কৃতার্থ হইয়াছে, আর দুদিন পরেই ত তার অবসান! দিবারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর অমানিশার আবির্ভাব!

বিবাহের পর এই কয় দিন অধ্যাপক জীবনের নব সৌভাগ্য লাভে আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছিলেন, যতই দিন যাইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল, হায়, আরো পূর্ব্বে কেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই! আর কয় দিন পরেই ত সব ফুরাইবে। মিসেস রবার্টসন স্বামীর এই বিষাদের কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। প্রলয় চিন্তায় রবার্টসন যখন নিমগ্ন হইতেন তখন বিষাদে তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া থাকিত, আবার যখন মনে হইত, আর যে অল্প কয়টী দিন অবশিষ্ট আছে তাঁহার পত্নীর সুখের প্রতি সে কয়টী দিনও তিনি যথোচিত মনোযোগ দিতেছেন না, তখনই তিনি চমকিয়া উঠিতেন, স্ত্রীকে আকুল হৃদয়ে যত্ন ও আদর করিতেন। মিসেস রবার্টসন জানিতেন, পুরুষ-চরিত্র সর্ব্বদাই রহস্যময়, তাহারা নানা খামখেয়ালির অধীন। নারীগণ যদি ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের এই সকল খামখেয়ালি সহ্য না করেন, তবে সংসারে সুখ শান্তির আশা কোথায়? সুতরাং তিনি স্বামীর ব্যবহারে কিছুমাত্র বিরক্ত হইতেন না।

একে একে আগষ্ট মাসের দিনগুলি ফুরাইতে লাগিল, পৃথিবী চিরদিনের ন্যায় আপনার কক্ষে যথা নিয়মে ঘুরিতে লাগিল। অধ্যাপকের মনে নিজের গণনা সম্বন্ধে একটু সন্দেহের সঞ্চার হইল। অবশেষে শান্ত হাসি মুখ লইয়া আগষ্টের সংক্রান্তি দিবসের নবীন প্রভাত যখন পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিল তখন অধ্যাপক একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রাতরাশ নীরবে সমাধা করিয়া সদ্যপ্রাপ্ত ডাকের অপঠিত চিঠিগুলি হাতে করিয়া তিনি অন্যমনস্ক ভাবে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশ অভিমুখে বেড়াইতে চলিলেন।

অধ্যাপক রবার্টসন আজ আপনাকে বড়ই বিপন্ন মনে করিতেছেন। এক দিকে, আপনার জ্ঞানের উপর তাঁহার অগাধ আস্থা ছিল, অদ্যকার রজনী অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধূলিসাৎ হইবার সম্ভাবনা। কারণ প্রলয়ের কোন লক্ষণই ত দেখা যাইতেছে না! যদি পৃথিবী বাঁচিয়া থাকে, তিনিও বাঁচিয়া থাকিবেন, আর লোকের নিকট না হইলেও নিজের নিকট স্বীকার করিতেই হইবে যে, অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনাই ঠিক, ভুল

তাঁহারই। আবার অন্যদিকে—আত্মাভিমানের উপর এই যে প্রচণ্ড আঘাত, জীবনের নবলব্ধ সুখ উপভোগের আশায় কেমন আনন্দের সহিতই তাহা বহন করিতে মন প্রস্তুত! তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, আত্মাভিমানে আঘাত লাগিলেও বাঁচিয়া থাকাতেই তিনি প্রকৃত লাভবান্।

কিন্তু এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা চিন্তা বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিল। তিনি আপনাকে বিষম বিপদে পতিত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বিষয়-জ্ঞান একটু প্রবল থাকিলে বহু পূর্ব্বেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন। আজ ডাকে যে সকল চিঠি আসিয়াছিল, পর্ব্বতের পাদদেশে বসিয়া তিনি যখন সেগুলি পড়িতে লাগিলেন, তখন যে ব্যাঙ্কে তাঁহার টাকা গচ্ছিত ছিল, সেই ব্যাঙ্কের একখানি চিঠি ও তৎসঙ্গে ৫ পাউণ্ডের একখানি নোট পাইলেন। চিঠিতে লিখিত ছিল, উহাই তাঁহার গচ্ছিত অর্থের শেষ কিস্তী।

অধ্যাপক পৃথিবীর অস্তিত্ব-কাল গণনা বলে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার সঞ্চিত অর্থেরও এমন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, প্রলয়ের দিনে যেন তাঁহার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত খরচ হইয়া যায়। তাই আজ তাঁহার হাতে তাঁহার অর্থের শেষ পাউণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। যে হোটেলে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন তাহার প্রাপ্য শোধ করিলে আজ রাত্রেই এই অর্থও ফুরাইয়া যাইবে। তিন মাসের মধ্যে এক হাজার পাউণ্ড জলের মত উড়িয়া গিয়াছে। হেনরিকে প্রতিশ্রুত দুই শত পাউণ্ড দিয়াও তাঁহার মন তৃপ্ত হয় নাই। কি জানি বিদেশে দম্পতি অর্থাভাবে যথেষ্ট আমোদ ও আনন্দ ভোগ করিতে না পারে, এ জন্য তিনি তাহাদিগকে আরো এক শত পাউণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তার পর চামুণ্ডারূপিনী কেমিরনকেও বিবাহের পর বিদায় দিতে হইয়াছে। এই বয়সে কর্ম্ম গেলে সে কি করিয়া দিনপাত করিবে, এই বলিয়া কান্নাকাটি করিলে অধ্যাপক দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে মাসিক একটা পেন্সনের বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন। দরিদ্র ডাকপিয়ন বেচারীর ছেলেটি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তিনি নিজ খরচে তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইয়াছেন। সে দিন একজন শ্রমজীবী খনির ভিতর কাজ করিতে করিতে কয়লা চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে, তিনি তাহার বিধবা পত্নীর ভরণপোষণের জন্য মাসিক যথেষ্ট সাহায্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। অবশ্য বিবাহের পর নিজেদের মধুমাস যাপনের ব্যয় তেমন বেশী হয় নাই, কিন্তু উপরোক্ত নানা উপায়ে হাত এখন শূন্য হইয়া আসিয়াছে।

প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অধ্যাপক এখন মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। শুধু নিজে হইলে অভাব অসুবিধার জন্য তিনি ভীত হইতেন না। কিন্তু এখন তাঁহার প্রতিশ্রুতির উপর কত জন নির্ভর করিতেছে! পত্নীর ভরণপোষণ করিতে হইবে; আর তাঁহাকে তিনি বুঝিতে দিয়াছেন যে তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। হ্যারী ও তাহার পত্নী এত দিনে তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে আরামের জীবন যাপন করিতে নিশ্চয়ই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, কেমিরন পর্য্যন্ত আশাতীত পেন্সন পাইয়া যেন অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছে। তারপর সেই বিধবা। —হায়! অধ্যাপক আজ কি বিষম অবস্থায়ই পতিত হইয়াছেন! তিনি মেঘহীন নির্ম্মল আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তেজোদীপ্ত সূর্য্যের দিকে তাকাইলেন, —সূর্য্য যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে। হতাশ্বাস হইয়া তাঁহার অন্তর বলিতে লাগিল, 'প্রলয়ের পূর্ব্বচিহ্নস্বরূপ এখনই সূর্য্য কেন অন্ধকার হইয়া আসুক না!' কিন্তু তাঁহার কামনা পূর্ণ হইলনা, মধ্যাহ্নসূর্য্য আকাশে তেমনি প্রখর কিরণ বিস্তার করিতে লাগিল।

ভাবনায় তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব চূর্ণ হওয়া অপেক্ষা জীবন লোভনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর্থিক সর্ব্বনাশ, অপমান ও লাঞ্ছনা সহিয়াও কি জীবন ধারণ করিতে হইবে? তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। খরতর সূর্য্যকিরণ তাঁহার বিরলকেশ মস্তক আরো উত্তপ্ত করিতে লাগিল। তিনি তখন একটু শীতল স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সম্মুখেই দুইটী শৃঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গভীর পর্ব্বত-গহ্বর। নিম্নে ক্ষুদ্র একটী স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে।

উপর হইতে গহ্বরে অবতরণ করিবার জন্য একটা দড়ির সিঁড়ী ঝুলিতেছে। অধ্যাপক নীচে নামিয়া সেই শীতল স্থানে বসিয়া চিন্তা করিবেন স্থির করিয়া সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন, কিন্তু হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া একেবারে সবেগে নীচে পড়িয়া গেলেন। ভাগ্যে তাঁহার মস্তকটা প্রস্তরের উপর না পড়িয়া সেই ঝরণার পার্শ্বস্থিত কোমল ঘাসের উপর পড়িয়াছিল, নতুবা, পৃথিবীর শেষ দিন না হইলেও অধ্যাপকের পক্ষে তাঁহার গণনার ফল সত্যই হইত। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

দীর্ঘ মূর্চ্ছার পর যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, হোটেলে নিজের কুঠরীতেই শায়িত রহিয়াছেন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য তাঁহার রক্তিম আলোকে পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে। তাঁহার পত্নী জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সেই আলোকে স্নাত হইয়া প্রকৃতির রম্য দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তিনি দুর্ব্বল কণ্ঠে পত্নীর নামোচ্চারণ করিলেন, মিসেস্ রবার্টসন ছুটিয়া তাঁহার পাশে আসিলেন। তিনি স্বামীর একখানি হাত আপন হাতে লইয়া কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন একটু ভাল আছ প্রিয়তম!"

অধ্যাপক ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, "হাঁ।" তৎপর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি বার, কোন্ তারিখ?"

"আজ বৃহস্পতি বার, ৩রা সেপ্টেম্বর।"

"৩রা সেপ্টেম্বর?—তুমি ঠিক জান?"

"নিশ্চয় জানি! আগষ্টের শেষ দিন তুমি আঘাত পাইয়াছিলে।"

"হাঁ—আমার মনে পড়িতেছে। আচ্ছা, সে দিন কোন ঘটনা হয় নাই?"

"ঘটনা?—কি ঘটনা!—তুমি কি ঘটনার কথা বলিতেছ প্রিয়তম!"

"সে দিন কি খুব বড় তুফান হইয়াছিল? তুমি দেখেছিলে—?"

"না না! সে দিন কিছুমাত্র বড় তুফান হয় নাই, বরং—অতি সুন্দর দিন ছিল; যদিও অজানাদের তাহারা যখন তোমাকে হোটেলে লইয়া আসিল তখন আমার নিকট জগৎ অন্ধকার বোধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতির কোন দুর্য্যোগ হয় নাই।"

"রাত্রিতেও নহে?"

"না। রাত্রিও খুব সুন্দর ছিল। আমি জানি, কারণ সে রাত্রে আমি আর বিছানায় শুই নাই। ও! কি সুন্দর—চমৎকার উল্কাবৃষ্টিই সেই রাত্রে হইয়াছিল। একি! ওকি প্রিয়তম! তুমি অমন করিতেছ কেন?"

অধ্যাপক অনুচ্চস্বরে একটু চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, পত্নীর ব্যাকুল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া পাশ ফিরিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, হায়, ঐ পতনেই কেন তাঁহার মৃত্যু হইল না!

অধ্যাপকের চিকিৎসকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন, যে তাঁহার মস্তকের খুলিটী নিশ্চয়ই অতি কঠিন উপাদানে নির্ম্মিত, কারণ এত গুরুতর পতনেও যে তাহা শুধু ভাঙ্গে নাই, তা' নয়; তিনি আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিয়া উঠিলেন। শুধু তাঁহার পত্নীই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, স্বামীর মস্তিষ্ক সুস্থ হয় নাই। পূর্ব্বে যে সাময়িক বিষাদ দেখা যাইত এখন তাহা গভীরতর আকার ধারণ করিয়া অধ্যাপককে যেন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তুলিয়াছে।

কি করিয়া তিনি এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন ভাবিয়া যখন চক্ষে পথ দেখিতেছিলেন না তখন হেন্‌রির একখানা চিঠি অকূল সাগরে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় তাঁহার প্রাণে একটু আশার কিরণ দেখাইয়া দিল। হেন্‌রি লিখিয়াছে, নেটা এতদিন যাঁহার সখিত্ব করিয়া আসিয়াছে, সেই লেডি ডেনবার্সের মৃত্যু হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে যদিও তিনি নেটাকে অনেক কষ্ট দিয়াছেন, কিন্তু তিনি হৃদয়বতী নারী ছিলেন, তাহার অক্লান্ত সেবা ও যত্ন কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া তাঁহার উইলে নেটাকে ছয় হাজার পাউণ্ড দান করিয়া গিয়াছেন। গুরুতর অভাবের সময় মুক্তহস্তে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া মামা যে স্নেহ বাৎসল্য ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য নবদম্পতি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

করিয়াছে। কিন্তু এখন তিনি বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদেরও কিঞ্চিৎ অর্থ সংস্থান হইয়াছে, তাহা'রা আর তাঁহার নিকট হইতে কিছুতেই সাহায্য গ্রহণ করিবে না।

আশাতীত ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ভার হইতে এই রূপে মুক্তি পাইয়া অধ্যাপকের বুকের ভার যেন একটু লঘু হইল। সহৃদয়া পত্নীর নিকট তখন তিনি তাঁহার গণনার ভুলের কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিলেন। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিতে মনটা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইল বটে, কিন্তু প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তিনি যে সহানুভূতি পাইলেন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মিসেস্ রবার্টসনের সন্দেহ হইয়াছিল, আর্থিক অভাবই স্বামীর মনঃকষ্টের কারণ, যেহেতু রোগশয্যায় প্রলাপে অর্থিক সর্ব্বনাশ ও সম্মান হানির কথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিয়া তাঁহার মনের একটা গোপনীয় ভারের লাঘব হইল। কারণ, এক এক বার তাঁহার মনে হইতেছিল, বুঝি ইচ্ছা করিয়াই রবার্টসন প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক নিজকে অবস্থাপন্ন লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।

(৩)

একদিন নির্জ্জনে বসিয়া দম্পতি প্রেমালাপ করিতেছেন, এমন সময় এই সকল কথা উঠিলে অধ্যাপক বলিলেন, "প্রবঞ্চক অপেক্ষা নির্ব্বোধও ভাল, না প্রিয়ে?" তারপর তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমাদের খরচ পত্র যৎসামান্য তাই রক্ষা; নির্ব্বোধের ন্যায় যে সকল সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহা পালন করিতেই হইবে। এখনও আমার কয়েকখানি অপ্রকাশিত পুস্তক আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু পাওয়া যাইবে। তারপর আমার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি বিক্রী করিয়া কিছু পাওয়া যাইবে,—ও গুলি আর রাখা হইবে না। কিন্তু তা'তেও বেশী কিছু মিলিবে না। প্রিয়তমে, আমাকে যে তুমি একটুও ভৎর্সনা করিতেছ না?

স্বামীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিপীড়ন করিয়া মিসেস্ রবার্টসন বলিলেন, "কেন ভৎর্সনা করিব নাথ! তুমি জান না, আমারও কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে। আমি সর্ব্বদাই মিতব্যয়ী, এজন্য আমাকে যতটা নিঃসম্বল মনে হয় আমি তত দরিদ্র নই। তোমার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল মনে করিয়া আমি এতদিন তোমাকে একথাটা বলি নাই।"

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে থাকিবার পর পত্নী অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত স্বামীকে বলিলেন, "অসুখের সময় প্রলাপে 'বিবাহটা একটা পরীক্ষা' তুমি বার বার একথা বলিতে কেন? জীবনের আর তিন মাস মাত্র অবশিষ্ট থাকিবার পূর্ব্বে জীবনের সুখকে পরীক্ষায় ফেলিতে তোমার বুঝি সাহস হয় নাই?"

লজ্জায় অধ্যাপকের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "হাঁ, বিবাহটাকে আমি পরীক্ষা বলিয়াই মনে করিতাম। কোন নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া আমি তাহাকে সুখী করিতে পারিব কি না, আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিন মাস মাত্র সময়ের মধ্যে তাহাকে নিতান্ত দুঃখিনী করিবার আশঙ্কা অল্প। আমি কি তোমাকে বড়ই অসুখী করিয়াছি জেন্?"

পত্নী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া প্রেমার্দ্র নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। (অনুবাদিত)

শ্রীচঞ্চলা গুপ্ত।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত ও নারীজাতির উচ্চশিক্ষা।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বিগত মাঘমাসে ৭৪বৎসর বয়সে বারাণসী ধামে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত,চরিত্রবান ও বিনয়ী লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। নারীজাতির উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রাচীন-মতাবলম্বী রক্ষণশীল মহাপণ্ডিতের মত জানিতে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে। গত ১২৯৪ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহ সম্মিলনীর পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাগণের পুরস্কার-প্রদর্শনী সভায় সভাপতিরূপে তিনি এ বিষয়ে যে বক্তৃতা

করিয়াছিলেন, আমরা নিয়ে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমাকে সভাপতি হইতে হইবে না, এই রূপই আমার ধারণা ছিল; সুতরাং আমি সে জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করি নাই। আর আমি টোলের একজন ভট্টাচার্য্য। আমার বক্তৃতা সাধারণের প্রীতিকর হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ। কাজেই সভ্যমণ্ডলী আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। স্ত্রীশিক্ষার অবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

> অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং
> ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
> শৌচে ধর্ম্মেন্ন পক্ত্যাঞ্চ
> পারিণহ্যস্য রক্ষণে॥

স্বামী স্ত্রীকে অর্থ সংগ্রহে, ব্যয়ে শৌচাচারে ধর্ম্মকার্য্যে, অন্নপাকে এবং গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদি রক্ষণ বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন।

স্বামী প্রভূত পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন স্ত্রীর নিকট তাহা গচ্ছিত থাকিবে; সুধু গচ্ছিত নহে, ঐ সমুদায় অর্থের ব্যয়ের ভার স্ত্রীর উপর অর্পিত হইবে। সংক্ষেপতঃ স্বামী কেবল অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীই গৃহের কর্ত্রী।

এই স্ত্রী শিক্ষিতা না হইলে চলিবে কেন? শুনিতে দুঃখও হয়, এবং হাসিও পায়, যে লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় বা সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় সমাজের একভাগ নিয়ত আলোকিত এবং অপরভাগ অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ের কথা বলিতেছি না, এমন দিন গিয়াছে যে দিন হিন্দুসমাজ সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন! হিন্দুজাতি একটী শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। হিন্দুসমাজ অন্য সমস্ত সমাজকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন হিন্দুসমাজের স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা ছিলেন, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। আমাদের [illegible] গৃহে স্বামীর অন্যান্য ব্যবহার্য্য বস্তুর ন্যায় একটী [illegible] ছিলেন না। তাঁহারা—

> গৃহিণী সচিব সখিমিত্থ
> প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

স্বামীর গৃহিণী, মন্ত্রী, সখী ও নৃত্যগীতাদি বিষয়ে প্রিয়শিষ্যা ছিলেন। সন্ধি বিগ্রহাদি গুরুতর কার্য্যে স্বামী স্ত্রীর নিকট উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা পাইতেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রীর আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন। ইহার উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুধু তাহাই নহে, আমাদের স্ত্রীগণ যেমন নীতিশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি উপার্জ্জন করিতেন তেমনি গণিতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্ক করিতেন। এমন কি, যাহা নিতান্ত দুরধিগম্য এবং যে বিষয়ে ভারতীয় মহর্ষিগণ সর্ব্বোচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, আজিও যাহাতে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিতেছেন না, আমাদের স্ত্রীগণ সেই সূক্ষ্মতম আত্মবিদ্যাতেও প্রবেশ লাভ করিতেন। সুতরাং আমাদের স্ত্রীগণ কেবল শিক্ষিতা ছিলেন এমন নহে, তাঁহারা উচ্চতম শিক্ষাই প্রাপ্ত হইতেন।"

লয়লার প্রতি।

('হাতিফি' হইতে)

তুমি যেথা নাই সে দেশে কেমনে থাকি ?
স্বপনে যে আজো তোমারি মূরতি আঁকি;
নিরখি' স্বপনে আঁখি ভরে আসে জলে,
জেগে দেখি, আছি একাকী এ শিলাতলে!
মরুর মরীচি বিস্তারে শুধু মায়া,—
ধরিবারে ধাই,—সুদূরে মিলায় ছায়া!
ভাবনার জ্বালা জ্বলিছে অনুক্ষণ,
মরণ-সাগরে ডুবিলে জুড়ায় মন।
আকাশের পাখী ধরিতে করিনু সাধ,
ধরিনু যখন, নিয়তি সাধিল বাদ;—
চোখের উপরে কেড়ে নিয়ে গেল তারে,
বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম......নিরাশারে!
মায়াবীর রাজা খিজিরে করিনু সাথী,
অমৃতের কূপে পৌঁছিনু রাতারাতি;—

তীরে গিয়ে দেখি, শুকায়ে গিয়েছে জল,
সকল যতন হ'য়ে গেল নিষ্ফল।
লয়লা আমার, কর তুমি হাহাকার,
নিঠুর নিয়তি, নিস্তার নাহি আর।
মজনু গুমরি' গুমরি' কাঁদরে তুই,
তোর অশ্রুতে মরুতে ফুটিবে শুভ্র সুরভি জুঁই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

গৃহিণীর সাজি।

"সুগৃহিণী" বলিতে সচরাচর যে সকল গুণের সমষ্টি বুঝায়, আজ কালকার গৃহিণীদিগের মধ্যে যে তাহার অনেক অভাব আছে তাহা স্বীকার করিতে কেহই বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবেন না। রন্ধন-বিদ্যায় সেকালের গৃহিণীগণ যেমন সুনিপুণা ছিলেন বর্ত্তমান কালের গৃহিণীগণের মধ্যে সেরূপ রন্ধনপটু নারী কয়টী পাওয়া যায়? ছেলেপিলের সামান্য অসুখ বিসুখ হইলে আমাদের মা দিদিমারা লতা পাতা-জাত টোটকা ঔষধ দিয়া যেরূপ বিনা পয়সায় তাহা-দিগকে আরাম করিতেন, আজ কাল আর তাহা বড় একটা দেখা যায় না। এখন কথায় কথায় ডাক্তার ডাকিতে হয়, পয়সা খরচ করিতে হয়। শিক্ষিতা মহিলাগণের ও নব্যা গৃহিণীদিগের অনেক ত্রুটী ক্রমে দূর হইতেছে, এই সকল বিষয়েই বা তাঁহারা পশ্চাৎপদ থাকিবেন কেন? গৃহিণীগণের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য আমরা প্রতি মাসে ভারতমহিলায় "গৃহিণীর সাজিতে" কিছু কিছু সংগ্রহ করিব। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ এ বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য করিলে অনেকেরই উপকার হইবে, আমরাও অনুগৃহীত হইব। আশা করি, রন্ধন, মুষ্টিযোগ-সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে গৃহিণী-ভগিনীগণ আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। ভাঃ মঃ সঃ।

নারিকেলের পায়স।

পায়স সাধারণতঃ দুগ্ধে চাউল অথবা সুজি দিয়াই হয়, কিন্তু পরিপক্ক গৃহিণীগণ আজও নানা প্রকার দ্রব্যের সংযোগে নানারূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন। একই পদার্থকে নানারূপে ব্যবহার করিয়া নানাপ্রকার [illegible] প্রস্তুত হইতে পারে। আজ আমরা আমা-দের পাঠকপাঠিকাদিগকে নারিকেলের পায়স উপহার দিব। নারিকেলের নাড়ু ও সন্দেশ বোধ হয় সকলেই সর্ব্বদা খাইয়া থাকেন, নারিকেলের পায়স সকলে খাইয়াছেন কি না জানি না। যাহা হউক যাহারা খান নাই তাহারা ইহার সাহায্যে পায়স প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন। একটী নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া চাঁচিয়া ধুইয়া লইয়া ভাঙ্গিতে হইবে। তারপর কুরুনি দিয়া পরিষ্কার করিয়া কোরাইতে হইবে, যেন মালার গায়ের কাল অংশগুলি না পড়ে। সেই কোরান নারিকেলটা শিলে খুব মিহি করিয়া বাটিয়া লইতে হইবে, অথবা না কুরিয়া নারিকেল তুলিয়া লইয়া ছুরি দিয়া উহার গায়ের কাল অংশটা চাঁচিয়া ফেলিয়া তার পর শিলে বাটিয়া লইলেও হয়, বাটাটা চন্দনের মত খুব মিহি হওয়া চাই। তার পর ।/২ অথবা ।/২॥০ দুধ লইয়া খানিকক্ষণ জ্বাল দিতে হইবে। ঘন হইয়া আসিলে উহাতে সেই বাটা নারিকেলটা ছড়াইয়া দিবে, নারিকেল দিবার সময় খুব তাড়াতাড়ি চারিদিকে নাড়িতে হইবে, নতুবা ডেলা পাকাইয়া যাইবে অথবা ধরিয়া যাইতেও পারে। তার পর ৩।৪ খানা তেজপাতা, কিছু কিস্‌মিস্‌ বাদাম পেস্তা ফেলিয়া দিবে, কয়েকটী এলাচের দানাও দিবে। অভাবপক্ষে কিস্‌মিস্‌ পেস্তা ইত্যাদি না দিলেও চলে। তার পর নাড়িতে নাড়িতে যখন বেশ থক্‌থকে হইয়া উঠিবে তখন আধ পোয়া আন্দাজ চিনি দিয়া নাড়িতে থাকিবে, যখন বেশ ফুটিতে থাকিবে তখন ছটাক খানেক কি আধপোয়া ভাল ঘিয়ে একটু দারচিনি ও একটা ছোট এলাচের গুঁড়ো মিলাইয়া পায়সে মিশাইয়া দিবে। দারচিনি ও এলাচের পরিবর্ত্তে সামান্য একটু কর্পূরের গুঁড়ো দিলেও চলে। এখন নামাইয়া ফেলিবে, নামাইবার সময় এক ফোঁটা আতর বা একটু গোলাপ-জল দিয়া নামাইলে সুগন্ধ হয়, না দিলেও ক্ষতি নাই। নামাইয়া কোন পাত্রে ঢালিয়া ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা গন্ধটুকু উড়িয়া যাইবে। ইহারই নাম নারিকেলের পায়স।

মুষ্টিযোগ।

১। মানকচুর শিকড় ও তুঁতে সমান ওজনে গ্রহণ করতঃ বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলে নালি-ঘা আরাম হয়।

২। পুঁই পাতায় গাওয়া ঘৃত মাখাইয়া তাহা ফোড়ার উপর লাগাইয়া রাখিলে, ফোড়া আপনা আপনিই গলিয়া যায়।

৩। ফোড়া বসাইতে হইলে বটের আঠা দিয়া তাহার উপর সিমুলের তুলা লাগাইয়া দিলে উহা বসিয়া যায়।

৪। ফোড়ার উপর কাঁটানটের (কাঁটা ক্ষুহ্রে) পুলটিশ দিলে, উহা আপনা হইতেই ফাটিয়া যায়।

৫। একটি পাতি কি কাগজীলেবুর মুখ কাটিয়া, ঐ মুখ উপরদিকে করিয়া ঘুঁটের আগুনে খানিকক্ষণ বসাইবে। যখন লেবুর ভিতর বুজ বুজ শব্দ করিতে থাকিবে, তখন নামাইয়া লেবুর ভিতর খোল করিয়া যে আঙ্গুলটীতে আঙ্গুলহাড়া হইয়াছে সেই আঙ্গুলটী আঙ্গুলহাড়া পর্য্যন্ত লেবুর ভিতর গুঁজিয়া দিবে। এই প্রকার ২।৩ দিন করিলে অঙ্গুলহাড়া আরোগ্য হয়।

৬। তীক্ষ্ণ কলিচুণ লাগাইলে ওষ্ঠব্রণ আরোগ্য হয়।

৭। শূন্য উদরে নিমপাতার রস মধুসহ পান করিলে কৃমি নষ্ট হয়।

৮। উচ্ছে পাতার রস গরম জলে মিশাইয়া পান করিলে কৃমি রোগের শান্তি হয়।

৯। ১ ছটাক ডালিমের শিকড় ও ১ ছটাক শেওড়ার শিকড়, /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /।৹ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ দিবসে চারিবার অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করিলে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কৃমি নাশ হয়।

১০। কিছু পুরাতন তেঁতুল ভিজান জল দেড় ছটাক মিছরির গুঁড়ার সহিত খাইলে পেট গরম স্নায়ু ও শান্ত হইয়া শরীর সুস্থ হয়।

১১। হরিতকী ও শুণ্ঠী সমান ভাগে লইয়া ইক্ষু-রস অথবা সৈন্ধব সহ সেবন করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

১২। কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া অত্যধিক আহার করিলে যদি কষ্ট বোধ হয় তবে বাড়ী আসিয়া গোটা চারেক পাতি লেবুর রস খানিকটা লবণাক্ত জলে মিশাইয়া সেবন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গুরু আহার জনিত কষ্ট নিবারণ হইয়া থাকে।

শ্রীমতী জুবেইদা আলি-আকবর।

বর্ত্তমান সময়ের যে কয়েকটী ভারত-মহিলা প্রতিভা ও সুশিক্ষা বলে দেশ বিদেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, শ্রীমতী আলি-আকবর তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনি বোম্বাই প্রদেশের সম্মানিত মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত আলি-আকবর সে অঞ্চলের একজন পদস্থ সম্মানিত ব্যক্তি। শ্রীমতী আলি-আকবর দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া মনের যে উদারতা, জ্ঞানে যে বিশালতা ও অভিজ্ঞতার যে প্রচুরতা লাভ করিয়াছেন,আমাদের অবরোধাবদ্ধা ভারতীয়া মুসলমান ভগিনীগণের পক্ষে তাহা স্বপ্নের জিনিষ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইনি একাধিক বার ইংলণ্ডে গিয়া সে দেশের প্রধান প্রধান নারীদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। স্বর্গীয় সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরম সমাদরে ইঁহাকে নিজগৃহে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

জুবেইদা পরম রূপবতী। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনি যখন প্রথম ইংলণ্ড গমন করেন তখন লণ্ডন সহরে, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পরিচ্ছদ-পরিহিতা মহিলাকে একটী পুরস্কার দিবার কথা ঘোষিত হয়। দেশ বিদেশের সম্মানিত ও অবস্থাপন্ন মহিলাগণ সেই পোষাক-প্রদর্শনী সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী জুবেইদা ভারতীয় পোষাক পরিধান করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরীক্ষাকারীদিগের বিচারে ইনিই পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি এক সেট্ চা-পাত্র উপহার পান, তাহার মূল্য পোনর শত টাকা।

গত জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ের হিন্দু-মহিলাদিগের "সামাজিক ও সাহিত্য-সমিতির" বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমতী আলি-আকবর সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। আমরা নিম্নে সেই বক্তৃতার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"প্রিয় ভগিনীগণ, নারী-সম্প্রদায় জাতির জননী—সৃষ্টি-কর্ত্রী—বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। নারী নম্র ও কোমল বটে, কিন্তু এই নম্রতা ও কোমলতার সাহায্যেই তিনি এমন এক প্রভাব বিস্তার করেন, যাহার সহিত জগতের আর কোন শক্তিরই তুলনা হয় না। সংসার-রঙ্গমঞ্চে যে সকল নরনারী অভিনয় করে, নারীই তাহাদের চরিত্র গঠন করেন। সমাজের ভবিষ্যদ্বংশ বর্ত্তমান শিশুদিগের কোমল অন্তরে ভবিষ্যৎ কল্যাণের বীজ নারীই রোপন করেন। তাঁহারই জ্ঞানগর্ভ বাণী, তাঁহারই দেশপ্রীতি শিশু-হৃদয়ে বীজরূপে প্রোথিত হয় এবং এক-দিন তাহাই সবল পুরুষ ও দেবীরূপিনী নারীরূপে বিকশিত হইয়া উঠে, এবং দেশের পরম কল্যাণ সাধন করে। এই মাতৃত্ব ব্রত পালনই আমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, এবং এইগুরুতর কার্য্য সাধনের উপযুক্ততা কিরূপে লাভ করিতে পারি তাহাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয়।

প্রথমতঃ, প্রকৃত শিক্ষা, অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জ্জন, এবং বর্ত্তমান ও অতীত যুগের উৎকৃষ্ট চিন্তাবলীর সংস্পর্শ দ্বারা আমাদের প্রকৃতিকে সুগঠিত, সুমার্জ্জিত ও সমুন্নত করিতে হইবে। প্রকৃতি-মাতা আমাদিগকে যে ভার দিয়াছেন সেই কার্য্যের উপযুক্ততা লাভের জন্য প্রধানতঃ আমাদিগকে এই সকল উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু হৃদয়বৃত্তিগুলি যদি বিকশিত ও মার্জ্জিত না হয়, প্রেম, সহানুভূতি, পরসেবা ও আত্মত্যাগকে যদি নারীজীবনের প্রকৃত বিশেষত্ব—প্রাণ—বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারি, তবে পুস্তকগত বিদ্যা বা বিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা আমাদের বিশেষ কিছুই লাভ হইবে না। এ গুলিই আমাদের প্রকৃত দুর্গ, কর্ম্মের প্রকৃত পথ। ভগিনীগণ! দৈনন্দিন জীবনে এই সকল সদ্‌গুণ প্রকাশের প্রয়োজন হইলে আমরা যেন তাহাতে কথনই হীনতা প্রদর্শন না করি। সুকোমল বাক্য, প্রীতিপূর্ণ ভাব সহানুভূতিময় কর্ম্ম, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবন হইতে যেন নির্ঝরের ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত হয়। সংসারে নারীকে সর্ব্বদা শান্তি ও সেবারূপিনী দেবীর ন্যায় বিচরণ করিতে হইবে; আমাদের এই কল্যাণরূপিনী প্রকৃতির মূল আমাদের হৃদয়েই নিহিত। একটী মিষ্ট কথা, একটু সাদর অভিবাদন, একটী সহানুভূতিপূর্ণ কোমল দৃষ্টি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, প্রেমই ঈশ্বর; যে ভালবাসে সে ঈশ্বরের এবং সে-ই ঈশ্বরকে জানিতে পারে। নারীর পরম সৌভাগ্য এই যে, জগতের সর্ব্বসুখের নিদান এই প্রেম প্রকাশের অধিকার বিশেষ ভাবে তাঁহারই। প্রার্থনা ও ঐকান্তিক অনুরাগ এই শক্তি লাভের প্রধান উপায়। প্রতিদিন জগতের প্রেমময় পিতার নিকট অকৃত্রিম আত্মসমর্পণ দ্বারা আমরা তাঁহার শক্তি, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিব। অতএব সরল ও ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা না করিয়া আমাদের একটী দিনও যেন অতিবাহিত না হয়।

জ্ঞানবলেই মহত্ত্ব, বয়োবৃদ্ধিতে মহত্ত্ব নয়। হৃদয়ের সম্পদই প্রকৃত সম্পদ, ধন-সম্পদ তাহার নিকট তুচ্ছ। জগতের সম্মুখে কোন নারীর মহত্ত্ব ঘোষিত হইলেই যে তিনি বড় মহীয়সী হইলেন তাহা নয়, সংসারের সম্মুখে ঘোষিত না হইয়া যে মহৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা তাহার নীরবতারই জন্য মহত্তর আকার ধারণ করে! নারীর যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য তাহাও যে জগতের নিকট ঘোষিত হইতেই হইবে, এমন নহে। সত্য যে প্রভাব তাহা প্রতিনিয়ত সকলের দ্বারাই অনুভূত হয়। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন, "নারীর প্রেম ও দয়া-প্রণোদিত কর্ম্ম নামবিহীন, খ্যাতিবিহীন।"

আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ভগিনীগণ! শরীরের সৌন্দর্য্য বিধাতার একটী দান সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সৌন্দর্য্য যদি আত্মার সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ না হয় তবে ইহার মূল্য বড় বেশী নহে। প্রেম-প্রসূত প্রতি চিন্তা ও ভাব আমাদের আকৃতিকে দেব-ভাবাপন্ন করে। সোওডেনবার্গ নামক ধার্ম্মিক লেখক লিখিয়াছেন, "সদ্ভাব ও প্রীতি মানবের আকৃতিকে

অনুরঞ্জিত করে এবং প্রেমের সৌন্দর্য্য মুখের প্রতি অণু হইতে ফুটিয়া বাহির হয়। রাস্কিন বলিয়াছেন, "মনুষ্যের এমন একটী সদ্‌গুণ নাই, যাহার ব্যবহারে অন্ততঃ সাময়িকরূপেও বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় না।" পণ্ডিতবর এমার্সনও এই একই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমাদের চারিদিকে আনন্দ বিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা মানবদেহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির আর কোন শ্রেষ্ঠতর উপায় নাই।"

ভগিনীগণ, ইহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। আমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির দিকেই আমাদের সমস্ত মনোযোগ, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রয়োগ করা উচিত। এই আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য স্বাভাবিকরূপেই আমাদের বাহ্য দেহে প্রকাশিত হইবে।

আমাদের মধ্যে নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য্যে সুন্দরী অনেক মহিলা আছেন। তন্মধ্যে আমি কয়েক জনের মাত্র নামোল্লেখ করিব। শ্রীমতী এনি বেসান্টের নাম সভ্য জগতে বিখ্যাত। তাঁহার শিক্ষায় প্রেম ও আত্মোৎসর্গের ভাব জীবন্ত ভাবে প্রস্ফুটিত। তাঁহার কর্ম্মশীল জীবন শুধু নারীদিগের নয়, পুরুষদিগেরও অনুকরণীয়। আমাদের দেশেও বরোদার মহারাণীর ন্যায় সুশিক্ষিতা ও গুণবতী, ভূপালের বেগমের ন্যায় উচ্চহৃদয়া, শ্রীমতী রমাবাই রাণাডের ন্যায় উৎসাহময়ী ও সেবাপরায়ণা এবং শ্রীমতী জানকী বাইয়ের ন্যায় কর্ম্মশীলা মহিলাগণ রহিয়াছেন। ভারতের নারীজাতির পুনরুত্থানে সাহায্যকারিণী আত্মোৎসর্গপরায়ণা, শ্রমনিরতা আরো কত মহিলা এ দেশের নানা স্থানে বাস করিতেছেন। আজ আমাদের মধ্যে এখানেও এরূপ উল্লেখযোগ্য নারী রহিয়াছেন। কুমারী মানেকজি কর্সেটজির নামোল্লেখ না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। ভারত-নারীর জন্য তিনি জীবন ব্যাপিয়া অক্লান্ত শ্রম না করিলে আমরা আজ যত অধিকার ভোগ করিতেছি তাহার অনেকগুলি হয়তঃ ভোগ করিতে পাইতাম না।"

ধূমকেতু।

দুর্লভদর্শন হইলেও ধূমকেতুকে মানুষ কখনও সাদরে অভিনন্দন করে না। বরং যে বৎসর আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয় লোকে সে বৎসর নানা প্রাকৃতিক উৎপাতের আশঙ্কা করে। এই আশঙ্কার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে বলিয়া ত মনে হয় না, কিন্তু বেচারা ধূমকেতু চির দিন কলঙ্কের পশরা মাথায় বহন করিতেছে। বিশেষতঃ এ বৈশাখে যে ধূমকেতুটী দেখা দিবে—যাহার নাম হ্যালির ধূমকেতু—সে বেচারার কলঙ্করাশি ইতিহাসেও স্থান পাইয়াছে। বিলাতের Collier's Weekly নামক পত্রিকায় এই কলঙ্কের ধারাবাহিক ইতিহাস বাহির হইয়াছে। লেখক বলেন, মিশর যখন সভ্যতার নবযৌবনে তেজোদীপ্ত এবং গ্রীস যখন পশুতুল্য বর্ব্বরগণ দ্বারা অধ্যুষিত তখন এই ধূমকেতু আকাশমার্গে দেখা দিয়াছিল; অধুনা সভ্যতাভিমানী ইউরোপ ও আমেরিকা যখন বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইবে, এবং অসভ্য আফ্রিকা ও সাইবেরিয়া যখন জগতে প্রাধান্য লাভ করিবে, তখনও ইহা আকাশে দেখা দিবে। আকাশ-পথের বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় কিঞ্চিদধিক ৭৫ বৎসর পরে পরে ইহা নিয়মিত রূপে আকাশে দেখা দিয়াছে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১১ অব্দে ইহা রোমের আকাশে দেখা দিয়াছিল, এবং অবশ্যই এগ্রিপ্পার মৃত্যু সূচনা করিয়াছিল। জোসেফাসের নিকট ইহা নিশ্চয়ই জেরুসালেম ধ্বংশের জন্য উত্তোলিত সুবিশাল জ্যোতির্ম্ময় কৃপাণরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। ৪৫১ খৃষ্টাব্দে বিধাতার অভিশাপ-স্বরূপ "এটিলা"—নামক মানব জাতির ঘোর শত্রু তাহার পতনের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আকাশ-মার্গে এ বিচিত্র অতিথির দর্শন লাভ করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নরমাণ্ডির উইলিয়ম ইংলণ্ড-বিজয়সূচক দূতরূপে ইহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগের ইউরোপ বিজয়ের সময় এই ধূমকেতু দেখা দিয়া খৃষ্টীয় জগতের অন্তরে ত্রাসোৎপন্ন করিয়াছিল। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে জেমস্‌টাউন প্রতিষ্ঠার সময় দর্শন দিয়া ইহা এক শক্তিশালী জাতির জন্ম সূচনা করিয়াছিল। সেক্‌স্‌পিয়র ও গ্যালিলিও ইহা দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন।

যখনই ইহা আকাশে দেখা দিয়াছে তখনই নাকি যুদ্ধ, মারিভয়, রাজমৃত্যু প্রভৃতি অকল্যাণ সংঘটিত হইয়াছে। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অধীন হইয়া জগতে যাহা সংঘটিত হইয়াছে এই বেচারার উপর তাহার অপরাধ চাপান হইয়াছে। অবশেষে এডম্যাণ্ড হ্যালি নামক জ্যোতির্ব্বিদ গণনা দ্বারা স্থির করেন যে, এই ধূমকেতুটী গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাধীন, এবং নিয়মিত রূপে কিঞ্চিদধিক ৭৫ বৎসর পরে আমাদের আকাশে দেখা দিয়া থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, ধূমকেতু এখন অপবাদ মুক্ত হইয়াছে।

ধূমকেতুর পরিচয় দিয়া প্রথম বৎসরের ভারত-মহিলায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সৌরজগতের শাসনাধীন অনেকগুলি ধূমকেতু আছে। এই ধূমকেতুগুলি লম্বা লম্বা বাদামী আকারের পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ বিষয়ে, ইহাদিগকে মোটামুটি একটা নিয়ম পালন করিতে দেখা যায়। সূর্য্য হইতে দূরে যাইতে যাইতে, ইহারা কোন একটা বড় গ্রহের কক্ষা অর্থাৎ ভ্রমণপথের কাছে আসিয়া থাকে।

পণ্ডিতদিগের সাধারণতঃ মত এই যে, ধূমকেতুগুলি আমাদের এই সৌরজগতের জিনিস নহে। তাহারা অবাধ্য শিশুর মতন এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডময় ছুটিয়া বেড়ায়। পথে কোন সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সেই সূর্য্যের টানে বাধ্য হইয়া তাহার কাছে আসে বটে, কিন্তু সূর্য্য তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ধূমকেতু তাহাকে পাশ কাটিয়া, চিরকালের জন্য তাহার হাত এড়াইয়া, পুনরায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণে বাহির হয়।

তবে সৌরজগতের ঐ ধূমকেতুগুলি কোথা হইতে আসিল? উহারা কি করিয়া, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিবার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে নিযুক্ত হইল

ইহার একটা উপায় আছে। সূর্য্যের চারিদিকে বড় বড় গ্রহগুলি পাহারাওয়ালার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটী ধূমকেতু সূর্য্যের কাছে আসিবার সময় ইহাদের কাহারও সঙ্গে যে তাহার দেখা হইবে না, এমন কোন কথা নাই। আর একবার দেখা হইলে যে এই সকল পাহারাওয়ালা, একটী বার তাহাকে থামাইয়া বকসিস্ আদায়ের চেষ্টা করিবে না, এরূপ মনে করাও অন্যায়।

এইরূপে, একটা কোন বড় গ্রহের টানাটানিতে, যদি ধূমকেতুর গতির বেগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় তবে আর তাহার সূর্য্যের হাত এড়াইয়া যাইবার ক্ষমতা থাকে না। তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে সূর্য্যের প্রদক্ষিণে নিযুক্ত হইতে হয়। এই প্রদক্ষিণের সময় প্রত্যেক বার তাহাকে, প্রথমে যে স্থানে গ্রহ কর্ত্তৃক ধরা পড়িয়াছিল, সেই খানে ফিরিয়া আসিতে হয়। উহার অধিক আর সে দূরে যাইতে পারে না।

এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয়, যে সৌর জগতের ধূমকেতুগুলি আমাদের বড় বড় গ্রহগুলির আকর্ষণেতেই ধরা পড়িয়াছিল। তাই কতকগুলি বৃহস্পতির কক্ষার কাছে, কতকগুলি শনির কক্ষার কাছে, দুএকটা ইউরেনাসের কক্ষার কাছে, আর কতকগুলি নেপচুনের কক্ষার কাছে আসিয়াই আবার সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া যায়। এরূপ করিবার পক্ষে এমন সঙ্গত কারণ থাকিতে, উহাদের ঐ ব্যবহার যে নিতান্ত আকস্মিক, ইহা মনে করা যায় কিরূপে? সুতরাং পণ্ডিতেরা গ্রহকর্ত্তৃক ধূমকেতু ধরা পড়িবার মতটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই নেপচুনের বাহিরে গ্রহ থাকিবার কথা অনুমান করিয়াছেন।

দেখা যায় যে, কতকগুলি ধূমকেতু নেপচুনের বাহিরে অনেক দূরে গিয়া তবে ফেরে। সুতরাং উহাদের ঐ ফিরিবার স্থানে কোনও বৃহৎ গ্রহ থাকা আশ্চর্য্য নহে ঐরূপ গ্রহ থাকিলে কেন যে দেখা যায় না তাহার কারণ এইরূপ হইতে পারে যে, এতদূরে থাকাতে তাহার আকারও অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া যায় এবং সূর্য্যের আলো কম পড়াতে, উজ্জ্বলতা অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং তাহাকে দেখা অথবা ফটোগ্রাফ করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে।"

সহযোগী সাহিত্য।

জল ও মানব-দেহের উপর তাহার কার্য্য।

ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান বড়ই অল্প। সাধারণ লোক কেন, এ দেশের বহু শিক্ষিত লোক সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের অধিবাসীগণ এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। সে সব দেশের অধিকাংশ অধিবাসীরই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি কথা জানা আছে। আমরা আজন্ম জল পান করিয়া আসিতেছি; কিন্তু তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে অতি অল্প খবরই রাখি। সম্প্রতি মানব-দেহের উপর জলের উপকারিতা সম্বন্ধে "নিউ হেরল্ড" পত্রে ডাঃ ডব্লিউ, আর্, সি লেট্সন্ লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য ও অনায়াসলব্ধ সামান্য জলের, নিয়মমত ব্যবহারে, দেহের উপর আশ্চর্য্য কার্য্যকরী ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম।

মানবের শরীরের চতুষ্পঞ্চমাংশই জল। এমন কি শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন উপাদান দন্তেও শতকরা চারিভাগ জল রহিয়াছে। হাড়ে শতকরা একাদশ হইতে চতুর্দ্দশাংশ, পেশিতে তিন-চতুর্থাংশ ও রক্তে চতুষ্পঞ্চমাংশ হইতে সপ্ত অষ্টমাংশই জল।

জীবনধারণোপযোগী শারীরিক ব্যাপার প্রধানতঃ জল দ্বারাই সংঘটিত হইতেছে। জল আমাদের খাদ্যদ্রব্যের একটি মূল উপাদান। জলই প্রধানতঃ আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করিতেছে। অর্থাৎ সঞ্চালন, পরিপাক, সমীকরণ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়া একমাত্র আমাদের দেহস্থ জল সাহায্যে সম্পাদিত হইতেছে। লোককে খাদ্যাভাবে বাটি, সত্তর এমন কি আশীদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা যায়; কিন্তু জলাভাবে লোক পাঁচ, ছয় দিনের ভিতরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দেহের আভ্যন্তরীণ অপবিত্র পদার্থের দূরীকরণই রোগ-নিবারণ ও চিকিৎসার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। দেহস্থ কলুষিত পদার্থকে দূর করিতে পারিলেই বহু কঠিন রোগ আপনা হইতে সারিয়া যায়। আধি শরীরের দূষিত পদার্থকে দূর করিবার একটা প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দেহের দূষিত পদার্থকে দূর করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও উৎকৃষ্ট উপায়, নির্ম্মল জল পান করা। ইহা দেহকে সহজে আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা হইতে মুক্ত করে। অতি অল্প লোকই শরীরে অনবরত যে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে তাহা দূর করিবার উপযুক্ত প্রচুর পরিমাণ জলপান করিয়া থাকে। আমরা দৈনিক যে দুই, তিন গ্লাস জল পান করি তাহা দেহস্থ এই সব বিষাক্ত পদার্থকে প্রতিরোধ করিবার পক্ষে অতি সামান্য।

চা, কাফি মদ, দুগ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য তরল পদার্থ জলের ন্যায় মানব-দেহের উপর কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। প্রথমতঃ, দুগ্ধ ব্যতীত এই সকল তরল পদার্থে ঠিক বিষ না [illegible] অধিক পরিমাণে অন্যবিধ দুষ্ট পদার্থ মিশ্রিত আছে। কাফিতে "কেফিন" চাতে "থিন" এবং মদে এলকহল্ রহিয়াছে। এই সকল পদার্থ স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই অপকারী। তাহারা দেহকে বিষাক্ত করে এবং জীবনী-শক্তির ক্রিয়ার বিকৃতি ঘটায়।

সর্ব্বপ্রকার তরল পদার্থের মধ্যে দেহের কার্য্যপ্রণালীতে একমাত্র জলেরই প্রয়োজন। চা, কাফি প্রভৃতি তরল পদার্থে জল বর্ত্তমান থাকার দরুণই দেহের দরকার হইতে পারে। দৈহিক যন্ত্র সকল এই সকল পদার্থ হইতে জল ছাঁকিয়া নেয়; এই ছাঁকন কার্য্যে যন্ত্র সকলের উপর একটা অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং ইহা হইতে নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শরীরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জলের অভাবই আমাদের পীড়ার একটি প্রধান কারণ। চিকিৎসকরূপে লেখক দেখিয়াছেন যে, অধিকাংশ স্থলেই রোগীর শরীরে উপযুক্ত জলের অভাবই ব্যাধির কারণ। বিশেষতঃ, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্টকাঠিন্য, রসবাত, গেঁটেবাত, শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্যতম প্রধান কারণ, শরীরে উপযুক্ত জলাভাব। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে প্রচুর পরিমাণ নির্ম্মল জল পানই কখন কখন রোগ-মুক্তির একমাত্র চিকিৎসা। জল ঔষধের মিকশ্চার কিংবা বড়ী হইতে উৎকৃষ্ট। বড়ী এবং মিকশ্চার পাকস্থলীর স্নায়ুমণ্ডলক সকলকে উত্তেজিত করিয়া কার্য্য করে।

অগ্নিমান্দ্য দুইটি কারণে উৎপন্ন হয়, শরীরে প্রচুর পরিমাণ "গ্যাস্ট্রিক্" রসের অভাব ও পাকস্থলীর কর্ম্ম নিশ্চেষ্টতা। জলের অভাব হইতেই এই দুইটির উৎপত্তি। এরূপ অবস্থায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ নির্ম্মল জলপান দেহের উপর বিবিধ প্রকারে কার্য্য করে। ইহা পাকস্থলীকে পরিষ্কার করতঃ নূতন বল প্রদান করে এবং রক্ত বৃদ্ধি করে।

অবশ্য ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য এবং কোষ্টকাঠিন্যই একমাত্র নির্ম্মল জল পানে আরোগ্য হইবে। তবে, লেখকের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, যথেষ্ট পরিমাণ জলের সাহায্য ব্যতীত অন্যবিধ চিকিৎসা, যথা ব্যায়াম, পথ্য, ঔষধ প্রভৃতি এই সকল পীড়া কোন রকমেই আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবে না।

স্বাভাবিক অবস্থায় একটি লোকের দৈনিক প্রায় দেড় সের জলপান করা বিধেয়। অসুস্থাবস্থায় এই পরিমাণ তিন, চারি কিংবা ততোধিক সের পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

আমাদিগের দৈনিক ১০।১২ গ্লাস জলপান [illegible] অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। প্রত্যুষে, দ্বিপ্রহর ও রাত্রির ভোজনের অগ্রভাগে, এবং নিদ্রার পূর্ব্বে ইহা পানীয়। আহারের পূর্ব্বে অর্দ্ধঘণ্টা ও পরে দুই ঘণ্টার মধ্যে কোন প্রকার তরল পদার্থ সেবন করা অনুচিত।

শ্রী[illegible]গোপাল সেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

শ্রীযুক্ত জেঙ্কিন্স সাহেবের পত্নী।

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা

নারী--সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গনারী।

এ বৎসর ২৩টী বালিকা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বালিকাবিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকার ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। উত্তীর্ণা বালিকাদিগের মধ্যে ১৯টী বাঙ্গালী। উত্তীর্ণা ছাত্রীদের নাম নিয়ে দেওয়া হইলঃ—প্রথম বিভাগ ঃ—শান্তিলতা বসু, প্রিয়তমা চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা দাস ও ক্ষীরোদমণি সেন, ঢাকা ইডেন বালিকাবিদ্যালয়। শান্তা চট্টোপাধ্যায় ও মোহিতবালা মজুমদার, বেথুন স্কুল। নলিনী রায় ও সুরীতি মিত্র, লরেটো। ইন্দুপ্রভা বিশ্বাস ও বিভাবতী মিত্র, আলেকজাণ্ডার বালিকাবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। সরলাবালা বক্সী, ফ্রিচার্চ্চ মিশন।

দ্বিতীয় বিভাগ ঃ—প্রিয়তমা দাস ও শরৎবালা রক্ষিত, ঢাকা ইডেন বালিকাবিদ্যালয়। ললিতা রায়, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। এগনিস কুলাসিডাইন, লরেটো। এগনিস রোজার্স, ডাওসেসান। কিরণবালা চট্টোপাধ্যায় ক্রাইষ্টচার্চ্চ। চমৎকারিণী দে, শিক্ষয়িত্রী। উইকার ওয়ালবর্গা ডাইবার।

তৃতীয় বিভাগ ঃ—আলেকজাণ্ডার এলিন, প্রাইবেট। জে, বয়েস, ঢাকা ইডেন বালিকাবিদ্যালয়।

নারীর অধিকার।

ইংলণ্ডের রমণীগণ এ পর্য্যন্ত ডাক্তারী শিক্ষার জন্য লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স কিম্বা রয়েল কলেজ অব সারজন্স-এ প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই। তাঁহারা স্ত্রীলোকদের জন্য স্থাপিত লণ্ডন স্কুল অব মেডিসিনে পড়িতেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা স্কটলণ্ডের কলেজ হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। নারীগণ লণ্ডনের কলেজে প্রবেশ অধিকার লাভ করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি তাঁহারা সে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। নারীজাতি ক্রমেই নানা অধিকার প্রাপ্ত হইতেছেন।

স্বাস্থ্য-তত্ব।

কুমারী ওয়ার্ড সংপ্রতি দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন; তাঁহার স্বাস্থ্য এখনও যৌবনকালের মতন আছে। তিনি বলিয়াছেন—প্রফুল্লতা ইহার কারণ। প্রফুল্লতাই জীবনের সূর্য্য-কিরণ; স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক। জীবনে মিতাচারী হওয়া আবশ্যক, গৃহে ও বাহিরে অঙ্গ সঞ্চালন দরকার। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্যাণ্ডোর প্রণালীতে ব্যায়াম করিয়া থাকেন; প্রত্যহ কয়েক মাইল ভ্রমণ করেন।

মহিলা-পরিষদ।

বারাণসী ধামে শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর যত্নে ও তত্বাবধানে মহিলা পরিষদের একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দেরাদুন কন্যা-পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী জ্যোতিঃস্বরূপ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাগৃহে প্রায় দুই শত রমণী সমবেত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে হিন্দুস্থানী রমণীগণের সংখ্যাই অধিক।

প্রথমে সেণ্ট্রাল হিন্দু-বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলে ও দেরাদুন কন্যা-পাঠশালার ছাত্রীরা দুইটী সঙ্গীত করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীমতী গয়াবাই গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করেন। তৎপরে মিসেস গোবিন্দ দাস, মিসেস জ্যোতিঃস্বরূপ, মিসেস ওয়াওল নাম্নী একটী কাশ্মিরী রমণী, মিসেস নন্দকিশোর, শ্রীমতী ইন্দুকুঁওর দেবী, শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী এবং শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল ঃ—

(১) ভারতের উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যক।

(২) বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক, এজন্য তাহা নিবারণের উপায় বিধান আবশ্যক।

(৩) এ দেশের স্ত্রীশিক্ষা বর্ত্তমান কালের উপযোগী করা, অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা কেবল লিখিতে পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট হইল না। গৃহস্থালী, রন্ধন, সূচীশিল্প-বিদ্যা,

চিত্রবিদ্যা, সন্তান-পালন, রোগী-পরিচর্য্যা ইত্যাদি শিখা উচিত।

(৪) অবরোধের কাঠিন্য দূর করা। যেহেতু এই অবরোধ প্রথা এ প্রদেশে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের পথে বিশেষ অন্তরায়।

(৫) যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের ধনী, দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত পরিবারের বালকবালিকাগণের অত্যধিক অলঙ্কার ব্যবহার দূষণীয়।

(৬) এতদ্দেশীয় বিধবাগণের শোচনীয় অবস্থা দূর করা কর্ত্তব্য।

(৭) হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল জাতির বিবাহ উৎসবে কুটুম্বিনীগণের অশ্লীল গীত করার প্রথা দূরীকরণ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পত্র।

যখন আয়র্লণ্ড-বাসীরা ইংরেজদিগকে দেশ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে মিঃ হার্ডী (লর্ডফ্রান্‌ব্রুক) স্বরাষ্ট্র-সচিব ছিলেন; তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার নিকট যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল চিঠিতে মহারাণীর উদারতা, নির্ভীকতা ও জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ পায়। একবার জনরব উঠিল যে, মহারাণীকে শত্রুরা অপহরণ করিবে। তাঁহাকে রক্ষার জন্য অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা হইল। মহারাণী লিখিলেন, তাহার জন্য যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাহা যেন তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হয়; বিপদ সর্ব্বত্রই আছে; কিন্তু তজ্জন্য সদা সর্ব্বদা প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া থাকা কি কষ্টদায়ক তাহা কারাগারের কয়েদীরাই বেশ জানে। এরূপ প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া তিনি অধিক দিন থাকিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি অন্যত্র একটু ঠাট্টার ভাবে লিখিয়াছেন--

"এখানে ত কোন বিপদ দেখি না; আমার পৌত্র প্রিন্স আর্থার ও আমার নিজের পরিচারিকাটাই ত একমাত্র ভীষণ মানুষ দেখিতে পাই।" অবশেষে কানাডা হইতে মহারাণীর বিপদের জনরব মিথ্যা বলিয়া যখন প্রমাণিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, "এই জন্য লর্ডস্মকের লজ্জিত হওয়া উচিত; আমি এই সকল জনরব কখনও বিশ্বাস করি নাই; এখন আমারই জয় হইল।"

ইতর প্রাণীর প্রতি তাঁহার বড়ই দয়া ছিল; ডেইলী টেলিগ্রাফ কাগজে কুকুরের প্রতি নিষ্ঠুরতার কথা পাঠ করিয়া তিনি মিঃ হার্ডিকে লিখিলেন, তিনি যেন এই বিষয়ে অনুসন্ধান করেন; মূক জন্তুর উপর, বিশেষতঃ কুকুরের উপর নিষ্ঠুরাচরণ মানুষকে যেরূপ পশুত্বে পরিণত করে, এমন আর কিছুতে করে না।

প্রীতিসম্মিলন।

কিছু দিন যাবৎ ইংরেজ ও দেশীয়দিগের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য কোন কোন পদস্থ ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত জেঙ্কিন্স সাহেবের শ্রদ্ধেয়া পত্নী এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইংরেজ মহিলাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিচারপতি জেঙ্কিন্স ন্যায়বিচারক বলিয়া এদেশে সর্ব্বসাধারণের গভীর শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার সহৃদয়া পত্নীও এদেশের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। তাঁহার বাড়ীতে প্রীতিসম্মিলনের দিনে নিমন্ত্রিতা মহিলাগণ যথাসম্ভব ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যাইবেন, এরূপ কথা ছিল। ইংরেজ ও দেশীয় অনেক মহিলাই বিচিত্র ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন। কেহ সন্ন্যাসিনী, কেহ ভিখারিণী, কোন হিন্দু-মহিলা পার্শী-নারীর বেশ, ইংরেজ মহিলা দেশীয় মহিলার পোষাক পরিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এরূপ প্রীতিসম্মিলন সদা একঘেয়ে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এদেশীয় মহিলাগণের নিকট নূতন জিনিস। এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে জীবনীশক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করে, কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়। যে সকল ইংরেজ-মহিলা এ বিষয়ে উদ্যোগী তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী। বিধাতা কবে সদয় হইবেন, দোষত্রুটি বিবর্জ্জিত হইয়া পাশ্চাত্য নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদগুলি এদেশের নরনারীর মধ্যে কবে প্রবর্ত্তিত হইবে! লেডি জেঙ্কিন্স এই প্রীতিসম্মিলনীতে ভারতবর্ষীয় রাণীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, এইবেশে তাঁহার যে ফটো লওয়া হইয়াছিল আমরা তাহার প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৬ষ্ঠ ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। ২য় সংখ্যা।

স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড।

মেঘশূন্য আকাশে বজ্রধ্বনির ন্যায় সহসা গত ৭ই মে যখন সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ আসিয়া এ দেশে উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত দেশবাসীরই হৃদয় কেমন শোকভারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, এবং সেই সুদূর ইংলণ্ড-ভূমিতে আর একটী শোকভারে পীড়িতা দুঃখিনী নারীর—সমস্ত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞীর—দুঃখের কথা মনে করিয়া হৃদয় কেমন ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সমস্ত ইতিহাসের মাঝখানে যে সম্রাজ্ঞী তাঁহার দয়া ও স্নেহ-মমতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার এই ভীষণ দুঃখে কাহার না প্রাণ ফাটিয়া যায়? সম্রাট গত এপ্রিল মাসের ২৭শে তারিখ "Biarritz" (বিয়ারিজ) হইতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন; সেই স্থানে তিনি অসুস্থ হইয়া কয়েক দিন শয্যাগত ছিলেন, সেই ঠাণ্ডা লাগিয়াই তাঁহার এই ব্রঙ্কাইটিস (দুষ্ট কাশী) স্থায়ী হইয়াছিল। সেই স্থানে সুস্থ হইয়া তিনি বন্ধুবান্ধব ও অনুচরদিগের সহিত কয়েক দিন আমোদ প্রমোদে কাটাইয়াছিলেন। কয়েক দিনের অসুস্থতায় যে তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কেহই কল্পনাও করে নাই। সম্রাজ্ঞী যখন প্রবাস হইতে ফিরিলেন, তখন অসুস্থতার জন্য সম্রাট তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই, তাহাতেই দেশবাসী সকলে তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ জানিতে পারিল। ৫ই মের টেলিগ্রামে সম্রাটের অসুস্থতার কথা প্রকাশিত হইল; ভয়ের কারণ আছে, তাহাতে জানা গেল। ৬ই মে তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁহার রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, শুধু নরওয়ের রাণী (তাঁহার কন্যা) আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তিনি রবিবারে উপস্থিত

হইবেন, সংবাদ পাওয়া গেল। ৬ই মে বৈকালে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধির কথা প্রকাশিত হইল।

প্রিন্স অব ওয়েলস সমস্ত সকাল বকিংহ্যাম প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় ক্যাণ্টারবারির আর্চ্চ বিসপ (ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম-যাজক) আসিয়া, সমস্ত গির্জ্জা ঘরে প্রার্থনা করিবার আদেশ দিলেন। টেলিগ্রামে উত্তর পাইলেন, সম্রাটের মঙ্গলের জন্য চতুর্দ্দিকেই প্রার্থনা হইতেছে।

৬ই মে রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড এই নশ্বর মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার সম্রাজ্ঞী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু, সকলেই তাঁহার শেষ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই পৃথিবীতে অতিশয় লোকপ্রিয় সম্রাট ছিলেন, তাঁহার হস্তে গ্রেটব্রিটেন, আয়র্লণ্ড ও সমগ্র ভারতবর্ষের ভার ন্যস্ত ছিল, তিনি এই সাম্রাজ্য ও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া, যিনি সম্রাটের সম্রাট তাঁহার আহ্বানে চলিয়া গেলেন। পৃথিবীর সমস্ত মায়াবন্ধন, আত্মীয় স্বজন, প্রিয়জন, শিশুর খেলার দ্রব্যের মত পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

সম্রাটের মৃত্যুর পর প্রিন্স অব ওয়েলস ও প্রিন্সেস বকিংহাম প্রাসাদ হইতে যখন মারলবরো প্রাসাদে গমন করিলেন, তখন সমস্ত দেশবাসী এই শোকাবহ ঘটনার সংবাদ জানিয়া কাতর অন্তরে সম্রাজ্ঞীর প্রতি সমবেদনা জানাইল। প্রিন্স অব ওয়েলস লর্ড মেয়রকে টেলিগ্রামে নিম্নলিখিত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন :—

"আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি,যে আমার প্রিয়তম পিতা অদ্য রজনী সাড়ে এগারটার সময় শান্তিতে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।"

লর্ড মেয়র দুঃখ জানাইয়া উত্তর দিলেন ও সম্রাজ্ঞীকে একখানি সান্ত্বনাপূর্ণ টেলিগ্রাম পাঠাইলেন।

সম্রাট এই অল্পদিনের অসুস্থতায় শয্যাগত হন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনেও জাপানের রাজকুমারের আগমনের বিষয় ও জাপানী প্রদর্শনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কোথায় কি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, সে ইচ্ছাও জানাইয়াছিলেন। মৃত্যুর দিনে দুইবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কাশিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন ও নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছিল, হৃৎযন্ত্র (heart) দুর্ব্বল হইতেছিল, অক্সিজেন বায়ু প্রয়োগে নিঃশ্বাসের কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কণ্ঠনালী-চিকিৎসক ডাঃ সেণ্টক্লেয়ার টমসন যখন প্রাসাদে নীত হইয়াছিলেন, তখনই সমস্ত দেশবাসীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। হৃদয়ের দুর্ব্বলতার জন্যই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বের রবিবারে স্যাণ্ড্রিংহামে হঠাৎ শীতল বাতাস লাগিয়াই এই ব্রঙ্কাইটিস হইয়াছিল। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় সকলে বুঝিলেন, শেষ সময় আসিতে আর বিলম্ব নাই। সম্রাট ইতিপূর্ব্বে বেশ প্রফুল্ল ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সহসা অচেতন হইয়া পড়িলেন, সেই ভাবেই তাঁহার জীবন-প্রদীপ চির নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ক্যাণ্টারবারীর আর্চ্চ-বিসপ সমস্ত অপরাহ্ণ উপস্থিত ছিলেন ও সময়োচিত উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন।

সম্রাজ্ঞী আলেকজ্যাণ্ড্রার দুঃখের আর সীমা নাই, তিনি ক্রমাগত সেই কক্ষে যাইতেছেন ও বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহার শোক আর কাহারও বাক্যে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে না। যিনি এক দিন পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী ছিলেন, একদিনেই, শুধু এক জনের বিহনে তাঁহার আর সে পদ রহিল না। কৈশোরে বিবাহের পর হইতে সুদীর্ঘকাল উভয়ে একত্র মিলিতভাবে যে সুখ ও প্রণয়ের জীবন যাপন করিয়াছেন, অকস্মাৎ সেই জীবনের গতি প্রতিরুদ্ধ হইল। ঈশ্বর তাঁহার শোকসন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা দিন্ ও তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকে দীর্ঘজীবী ও পিতার উপযুক্ত সন্তান করুন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

৭ই মে সমস্ত রাজপরিবারবর্গ গিয়া সম্রাটকে দর্শন করিয়াছেন। ২১শে মে তাঁহার সমাধি হইয়াছে। জর্ম্মাণীর কাইসর, সম্রাট ইমানুয়েল, প্রেসিডেণ্ট লোবে,বেলজিয়মের প্রিন্স আলবার্ট, সম্রাট হ্যাকন, সকলেই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। রুষিয়ার ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞী (পূর্ব্ব রাজার পত্নী), ডেনমার্ক ও পর্টুগালের সম্রাট এবং অন্যান্য অনেক সম্রাট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত

ছিলেন। উইণ্ডসরের ফ্রেগ্রমোরে সমাধি হইয়াছে।

সম্রাজ্ঞী আলেকজ্যাণ্ড্রা ধৈর্য্যের সহিত দুঃখভার বহন করিতেছেন। ৭ই মে বকিংহ্যাম প্রাসাদের গির্জ্জাঘরে উপাসনা হইয়াছিল, তিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞী মেরির সহিত সেই উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চম জর্জ্জ এডমিরালের পোষাকে (নৌ-সেনাপতি) সজ্জিত হইয়া সহস্র লোকের আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছার উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া সেণ্টজেম্‌সে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মিঃ চর্চ্চহিল ও ক্যাণ্টারবরির আর্চ্চ বিসপ আপনাদিগের উপযুক্ত বসনে সজ্জিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রিভি কাউনসিলের সভ্যগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা সেই কাউনসিল বসিয়াছিল। শোকাহত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই; তবু তিনি তাঁহার পিতার উচ্চ আদর্শ ধরিয়া তাঁহারই পথে অগ্রসর হইবেন ও সমস্ত দেশের মঙ্গল ও কল্যাণ বিধান করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তিনি যে পিতা হারাইয়াছেন সে শোক আর জীবনে যাইবে না। পিতার সহিত তিনি একাধারে তাঁহার প্রিয় সম্রাট, পিতা ও বন্ধুকে হারাইয়াছেন। তিনি পিতার পথে চালিত হইয়া, কর্ত্তব্য পালন করিবেন ও সম্রাজ্ঞী মেরি তাঁহার সকল কর্ত্তব্যে, সকল কার্য্যে সহায় হইবেন। সেই দিন সমস্ত নগর উৎসবে পূর্ণ হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, নবীন সম্রাট ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে সমান স্নেহ-চক্ষে দেখিবেন, ও সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা প্রদান করিবেন।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৮৪১ খৃঃ ৯ই নভেম্বর ডিউক অব ওয়েলিংটন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সূতিকাগৃহের ধাত্রী মিসেস লিলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "একটি ছেলে হইয়াছে?" মিসেস লিলি উত্তর করিলেন, "রাজপুত্র!" এলবার্ট এডওয়ার্ড বকিংহ্যাম প্রাসাদে তাঁহার জননীর বিবাহের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রিন্স অব ওয়েলস জন্মগ্রহণ করিবার পর একমাস অতীত হইলে মহারাণী উইণ্ডসর প্রাসাদে গমন করেন ও সেই স্থান হইতে আপনার মাতুলকে লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা এই স্থানে আসিয়াছি, আমাদের নর্সারির (শিশুপুত্রের গৃহ) খুব সুব্যবস্থা হইয়াছে। আমি কি ভাবিতেছি জানেন? এই শিশু কার মত হইবে! আমার আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রার্থনা, শিশু সকল বিষয়ে তাহার পিতার অনুরূপ হউক। ১৮৪২ সনের ২৫শে জানুয়ারী উইণ্ডসরে সেণ্ট জর্জ্জ চ্যাপেলে (গির্জ্জায়) এই শিশুর জাতকর্ম্মানুষ্ঠান (Christening) সম্পন্ন হইয়াছিল। শৈশব হইতে মহারাণী তাঁহাকে "বার্টি" এই প্রিয় নামে সম্বোধন করিতেন। ইংলণ্ডের সকল মহানুভব ব্যক্তি রাজপুত্রকে দেখিয়া প্রীত হইতেন। তাঁহার ক্ষুদ্র দেহের শক্তি ও মুখের প্রশান্ত ও আনন্দময় ভাব দেখিয়া সকলে পুলকিত হইতেন। রাজ্যভার বহন করিয়াও আপনার সন্তান পালনে মহারাণী কখনো কুণ্ঠিত ছিলেন না।

প্রিন্স সপ্তম বৎসর বয়সে ধাত্রী (নর্স) ও শিক্ষয়িত্রীর (গভরনেস) নিকট হইতে তাঁহার প্রথম শিক্ষক মিঃ হেনরী বার্চ্চ-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শৈশব হইতেই তিনি সর্ব্বদা তাঁহার পিতার সহিত থাকিতেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন প্রিন্স্ কনসর্ট লণ্ডন নগরীতে কয়লার এক্সচেঞ্জে উপস্থিত ছিলেন, প্রিন্স তখন তাঁহার সহিত ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হাইডপার্কে যে একজিবিসন (প্রদর্শনী) হয়, প্রিন্স প্রথম সেই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার পর তিন বৎসর অতীত হইবার পর তিনি তাঁহার মহিমাময়ী জননী সম্রাজ্ঞী ও প্রিন্স কনসর্ট-এর সহিত পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত ছিলেন। তাহার পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পিতামাতার সহিত পারিসে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেল তিনি চার্চ্চ অফ ইংলণ্ডের অনুমোদিত খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। আর্চ্চ বিসপ ক্যাণ্টারবরির নিকট যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা সেই পরীক্ষার ফলে অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্যানন টারভার-এর সহিত প্রিন্স প্রথম

বিদেশ ভ্রমণ করিতে যান। প্রিন্সের অনেকগুলি উপাধি, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সম্মানজনক উপাধি ব্যারণ রেনফ্রু। দেশ পর্য্যটন কালে সাধারণতঃ তিনি এই উপাধিই গ্রহণ করিতেন। লোকে তাঁহাকে সামান্য এক জন ব্যারণই মনে করিত। এই ভ্রমণেও তিনি এই নামেই পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে স্পেন দেশে, পরে পর্টুগাল এবং রোমে গিয়াছিলেন। তৎপরে শিক্ষালাভের জন্য তিনি এডিনবরা গমন করেন। অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। এই প্রকারে শিক্ষা লাভ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের পর প্রিন্স তাহার পিতামাতার ও শিক্ষকের শিক্ষা হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া সাবালক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি পুনরায় অক্সফোর্ডে ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৎপরে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ট্রিনিটি কলেজে (কেম্ব্রিজ) শিক্ষার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রকার বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ দেখিয়া সে সময়ে একটি কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, "তাঁহাকে শিক্ষার জন্য একবার উত্তর, একবার দক্ষিণ, আবার অন্য দিকে যাইতে হইতেছে, কখনো কেমব্রিজে, কখনো অন্য স্থানে গিয়া একেবারে ভার চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং ডিনামিকস্ ষ্টাটিকস্ আর ম্যাথাম্যাটিকস্—

"Will be piled
On his brain's awful cargo of cram"

১৮৬০ সনে প্রিন্স অব ওয়েলস ক্যানাডায় গিয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ক্যানাডাবাসীরা এক রেজিমেণ্ট সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। তৎপরে মহারাণীকে ক্যানাডায় লইয়া যাইবার জন্য তাহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু মন্ত্রীবর্গ এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ প্রিন্স অব ওয়েলসকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। প্রিন্স ক্যানাডায় গিয়া সমস্ত প্রধান নগর দর্শন করিয়াছিলেন এবং অটোয়াতে পার্লিয়ামেণ্ট-গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে সেণ্ট লরেন্সে বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া ব্রিজ পার হইয়াছিলেন। সেই সময় দড়ির উপরে এক চাকার গাড়ীতে নায়েগ্রা প্রপাত পার হইবার কথা হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। পরে যুক্তরাজ্যে উপস্থিত হইলে চিকাগোতে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র দেশবাসী আসিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিয়াছিল; মহারাণীকে তাহারা লিখিয়াছিল, "রাজপুত্র আমাদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।"

তাহার পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলস স্বদেশে ফিরিয়া আসেন ও ১৮৬১ সালে কেম্ব্রিজে পাঠাভ্যাস করিতে যান। সেই সময় বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক চার্লস কিংসলি সেখানকার অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ নভেম্বর মাসে প্রিন্স কনসর্ট তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেই সময় ঠাণ্ডা লাগাইয়া পীড়িত হন এবং সেই পীড়াই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। তাহার কিছু দিন পরে প্রিন্স ডিন ষ্টানলির সহিত খৃষ্টীয় তীর্থস্থান প্যালেষ্টাইন দর্শন ও ইজিপ্ট ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ১৮৬২ সালের গ্রীষ্মের প্রথমে রাজপুত্র স্বদেশে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার একবিংশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হইয়াছে এবং বিদ্যাভ্যাসও সম্পূর্ণ হইল।

১৮৬১ সালের শরৎকালে প্রিন্স কনসর্টের অভিপ্রায়ানুসারে জর্ম্মানীতে ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেকজ্যাণ্ড্রার সহিত প্রিন্স অব ওয়েলসের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব হইতেই এই দুই রাজ-পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধানুষ্ঠানের সম্ভাবনা-সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল। তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত উভয়ের যাহাতে সাক্ষাৎ সংঘটন হয়, সে জন্য স্থির হইয়াছিল যে ওয়ারমসের গির্জ্জায় পরস্পরের দেখা হইবে, কিন্তু তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। প্রিন্স অব ওয়েলস রাজকুমারী আলেকজ্যাণ্ড্রার ছবি দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনের পরই উভয়ের হৃদয় বিনিময় হইয়া গেল; রাজকুমারী আলেকজ্যাণ্ড্রা অতুলনীয়া সুন্দরী, তাঁহার তুল্য সুন্দরী পাশ্চাত্য জগতে দুর্লভ; তেমনি তাঁহার অশেষ গুণ। তাঁহার দয়া, তাঁহার সর্ব্ব জীবে মমতা অতুলনীয়। এই অশেষ গুণবতী রাজকুমারী সকল সময়ে স্বামীর সকল কার্য্যে সহায় হইয়া উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সুমাতাও

সম্রাটমাতা আলেকজান্দ্রা।

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

জগতে দুর্লভ। বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কয়েকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৬২ খৃঃ ৪ঠা নভেম্বর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। প্রিন্স অব ওয়েলসএর বার্ষিক আয় ৪০০০০ পাউণ্ড ও তাঁহার পত্নীর বার্ষিক আয় ১০০০০ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৬৩ খৃঃ ১০ই মার্চ্চ উইণ্ডসরে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সমস্ত দেশবাসী আনন্দিত অন্তরে যুবরাজ-পত্নীকে অভিনন্দন করিল। রাজকবি টেনিসন এই উপলক্ষে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার দু'লাইনের ভাবার্থঃ—

"স্যাক্সন আর নরমান—আমরা সকলেই ডেন,
আমরা সকলেই তোমায় অভিবাদন করিতেছি।"

বিবাহের পর তাঁহারা ওসবর্ণ-এ মধুমাস যাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা স্যাণ্ড্রিংহ্যাম প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন।

পিতার মৃত্যুর পর রাজপুত্র সর্ব্বদাই রাজ্যের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বামীর শোকে কাতর হইয়াছিলেন, উপযুক্ত পুত্র সকল কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেন। তিনি ন্যায়বিচারে সর্ব্বদা প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিতেন, জননীর প্রতিনিধি হইয়া কর্ম্মভার বহন করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজের গৃহ ছিল স্যাণ্ড্রিংহ্যামে। সেখানে তিনি গ্রাম্য জমিদারের মত বাস করিতেন, আপনার জমিদারীর কার্য্য আপনি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। গ্রামের ধনী, নির্ধন সকলকে সমভাবে দেখিতেন ও আদর যত্ন করিতেন। আপনার উদ্যান, ক্ষেত্র, অশ্বশালা, কুকুরের গৃহ আপনি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

সেই সময় প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস আপনার সংসার লইয়াই থাকিতেন। লণ্ডনের হাঁসপাতালে আলেকজ্যাণ্ড্রা-বিভাগের ভিত্তি স্থাপনই প্রজাদিগের জন্য তাঁহার প্রথম শুভানুষ্ঠান। প্রিন্সেসের প্রাণ যেমন অনাথ, আতুর, দুঃখী রোগীদিগের জন্য কাঁদিয়াছে, এমন আর অল্প রমণীর প্রাণই কাঁদিয়া থাকে। দুঃখী অনাথ শিশুদের জন্য তিনি অনেক করিয়াছেন ও অরমণ্ড ষ্ট্রীটে শিশু-হাঁসপাতাল তাঁহারই যত্নে স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি যে শুধু অর্থ মাত্র ব্যয় করিয়াছেন তাহা নয়; ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সেই শিশু-হাঁসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করিয়া সেখানে ক্ষুদ্র রোগীদের সেবিকাদিগকে দেখিতে অনেকবার গিয়াছেন। কতবার তাঁহার তিনটি কন্যা সমভিব্যাহারে শকটপূর্ণ ফুলরাশি লইয়া সেই শিশুদের দেখিতে গিয়াছেন, এবং প্রতি বিভাগে গমন করিয়া প্রত্যেক শিশুকে ফল, খেলেনা দিয়া আনন্দিত করিয়াছেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, সেই পীড়িত শিশুগুলি যত্নের সহিত প্রিন্সেসের প্রদত্ত খেলেনাগুলি, ফুলের গুচ্ছে বাঁধা রেসমের ফিতাটুকু, সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল! প্রিন্সেসের মধুর স্মৃতি যেন তাহাতেই গ্রথিত ছিল! সেই ক্ষুদ্র শিশুগুলি প্রিন্সেসকে পরী বলিয়া মনে করিত।

সম্রাট এডওয়ার্ডের তিনটি পুত্র সন্তান ও তিনটি কন্যা। তন্মধ্যে বড় পুত্র প্রিন্স ক্লারেন্স অকালেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান ও শেষের পুত্রটি জন্মিবার পরই ইহলোক পরিত্যাগ করে। তিনটি কন্যা; বড়— প্রিন্সেস রয়েল ডচেস অব ফাইপ; তিনিও মাতার মত গুণশালিনী। তিনি ইংলণ্ডের সম্রাটের কন্যা হইয়াও একজন ডিউককে বিবাহ করিয়াছেন; এ বিবাহ শুধু ভালবাসার জন্য। তাঁহার স্বামী ডিউক অব ফাইপ স্ত্রীর ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন নাই, দম্পতি সে ঐশ্বর্য্য অনুযায়ী জীবনও যাপন করিতেছেন না। তাঁহাদের জীবন নির্জ্জনে পরম সুখে কাটাইতেছেন। সম্রাটের মধ্যম কন্যা প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া এ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা, তাঁহার মধুর স্বভাব ও সরলতায় স্যাণ্ড্রিংহামের সকলেই মুগ্ধ। তিনি সর্ব্বদাই দীন দরিদ্রদিগের কুটীরে গমন করিয়া তাহাদের অবস্থা দেখিয়া থাকেন। টেকনিকাল (কার্য্যকরী) বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। যখনই স্যাণ্ড্রিংহামে বাস করেন তখনই প্রায় সর্ব্বদা সেই বিদ্যালয়ে যান; নিজে পশমের ক্রোশে কাজ করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। এক সময় তিনি তাঁহার একটি প্রিয় কুকুরের লোম কাটিয়া তাহা সেই স্কুলে পশম করিয়া নিজের ব্যবহারের শাল করিয়াছিলেন। প্রিন্সেস মড সম্রাটের কনিষ্ঠা কন্যা, তিনি সকলের পরম আদরের-পাত্রী,, বহুকাল পর্য্যন্ত "বেবি" নামে অভিহিতা

হইয়াছেন। তিনি বালিকা হইয়াও বালক-প্রকৃতির ছিলেন ও প্রিন্স জর্জ্জের (বর্ত্তমান সম্রাট) সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে মিল ছিল। তিনি বাহিরের আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া ভালবাসিতেন, এ জন্য অনেকে তাঁর নামকরণ করিয়াছিল "হ্যারি।" এক সময় তিনি সাইকেল শিখিবার জন্য পিতামহী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, পথে পথে সাইকেলে ভ্রমণ করিয়া, সকলের সম্মুখে হস্ত পদ দেখান উচিত নহে। তাহাতে প্রিন্সেস মড বলিয়াছিলেন, "সবাই ত জানে, আমাদের দুটো পা, দুটো হাত আছে, দেখিলে কি হইবে?" উত্তর শুনিয়া মহারাণী তাঁহাকে সাইকেলে চড়িতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই প্রকার সাইকেল ভ্রমণের সঙ্গী তাঁহার মাতুলপুত্র, ডেনমার্কের ক্রাউন প্রিন্সের দ্বিতীয় পুত্র, প্রিন্স চার্লসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়, ও উভয়ের মধ্যে যে ভালবাসার সঞ্চার হয় তাহা কোন বাধা বিঘ্নে প্রতিরোধ মানে নাই। ক্রাউন প্রিন্স অব ডেনমার্কের ইচ্ছা ছিল, যে প্রিন্স চার্লস হলাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনাকে বিবাহ করেন। সেই জন্য প্রিন্স চার্লসকে প্রায়ই হলাণ্ডে যাইতে হইত ও রাণীর মনস্তুষ্টি করিতে হইত, কিন্তু তাঁহার হৃদয় ইংলণ্ডের রাজকুমারীর নিকট পূর্ব্বেই বিক্রীত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে তাঁহাদের বিবাহ স্থির হওয়ার কথা জগতে প্রচার হওয়ায় সকলে বিস্মিত হইল। বিবাহের পর তাঁহারা ডেনমার্কে বাস করিতেন। কিন্তু তখন প্রিন্স চার্লস নৌ-বিভাগে কার্য্য করিতেন, সে জন্য অনেক সময় তাঁহাকে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাহিরে যাইতে হইত। তখন আপনার স্বদেশ-ভূমির জন্য,স্যাণ্ড্রিংহামের জন্য প্রিন্সেসের মন কাঁদিত। তাঁহার মাতা ও রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। অবশেষে প্রিন্স চার্লস নরওয়ের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ও প্রিন্সেস মড নরওয়ের রাণী হইয়াছেন। সুমিষ্ট ব্যবহার ও স্নেহে তাঁহারা প্রজাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। রাজ্ঞী আলেকজ্যাণ্ড্রার সকল কন্যাই স্ত্রীজাতির বাঞ্ছনীয় সকল গুণে গুণবতী।

রাজ্ঞী আলেকজ্যাণ্ড্রার গুণে ও সুব্যবহারে সম্রাটের যেমন রাজ্যে শান্তি ও সুব্যবস্থা রক্ষার সাহায্য হইয়াছে, তেমনি তাঁহার গৃহস্থালীও সুখের হইয়াছে। সম্রাট এ হেন পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ ও পৌত্রপৌত্রী, দৌহিত্রদৌহিত্রী লইয়া পরম আনন্দে জীবন কাটাইয়াছেন। ইউরোপের প্রায় সকল রাজার সহিতই তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জর্ম্মান সম্রাট কইসর তাঁহার বড় ভগ্নীর পুত্র, রুষিয়ার রাজ্ঞী তাঁহার ভগিনীর কন্যা। রুষিয়ার ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞী রাণী আলেকজ্যাণ্ড্রার ভগ্নী। অষ্ট্রিয়া ব্যতীত ইংলণ্ডের সকল সাম্রাজ্যের সহিতই তাঁহাদের সম্পর্ক আছে। তাঁহাদের গৃহে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজিত ছিল।

সম্রাট তাঁহার বিবাহের আট বৎসর পরে ১৮৭১ খৃঃ টাইফয়েড জ্বরে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। সে সময় ইংলণ্ডে সকলেই তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। রাণী আলেকজ্যাণ্ড্রা, তখন দিবা রাত্রি আপনার ননদ প্রিন্সেস এলিসের সহিত স্বামীর সেবা করিয়াছেন। ঈশ্বরের কৃপায় প্রিন্স রক্ষা পান ও আপনার পরিবারবর্গ ও স্বদেশবাসীর হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারিত করেন। সমস্ত দেশবাসী একত্রিত হইয়া সেণ্টপল গির্জ্জাতে প্রিন্সের জীবন রক্ষার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃঃ ১১ই অক্টোবর প্রিন্স অব ওয়েলস ভারত-ভ্রমণে বাহির হন। সে সময় আর্ল নর্থব্রুক ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তখন লর্ড সলিসবেরি ভারত-সচিব ছিলেন, মিঃ ডিস্‌রেলির হস্তে তখন কাউন্সিলের শাসনভার ছিল। প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আগমন করিলে সমগ্র ভারতের অধিবাসীগণ তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দন করিয়াছিল। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ তিনি পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সিংহলের সুন্দর উদ্যান, বোম্বাই মান্দ্রাজ ও কলিকাতার গৌরব-সূচক দৃশ্য ও প্রাসাদাবলী, সকলই তিনি দেখিয়াছিলেন। পুরাতন ভারতবর্ষের গৌরবস্থান কাশী, আগ্রা ও দিল্লী ভ্রমণ করিয়া তিনি কানপুর ও লক্ষ্ণৌ দর্শন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি বাঙ্গালীদিগের সহিত অত্যন্ত সদ্‌ব্যবহার করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত যখন

সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন প্রিন্স তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তৎপরে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগকে দেখিবার জন্য তিনি স্বর্গীয় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন; সেখানে স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে রাজোচিত ভাবে বরণাদি করিয়াছিলেন ও তিনি তাঁহাদিগকে উপযুক্তভাবে নমস্কার ইত্যাদি করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সর্ব্বদা একজন ভারতবর্ষীয় অনুচর থাকিত, যখন তাহার দেহের শক্তি হ্রাস হইতেছিল সেই অনুচরের হস্তে ভর দিয়া তিনি শকটারোহণ করিতেন। আমাদিগের স্বর্গীয় সম্রাট সেই মাতার পুত্র হইয়া ভারতবাসীকে কেন না প্রীতি করিবেন?

সকলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম হইলে বলে, "Victoria the Good," তেমনি সম্রাট এডওয়ার্ডের নাম হইলে লোকে বলে,"Edward the Peace-maker" অর্থাৎ শান্তি-সংস্থাপক। এই নামই জগতে প্রচার হইবে। সম্রাটের ভারতবর্ষের আগমনের পরই মহারাণী ভিক্টোরিয়া "ভারত-সম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণ করেন ও দীল্লি দরবারে মহাসমারোহে তাহা ঘোষণা করা হয়।

১৯০১ খৃঃ ২২শে জানুয়ারী প্রিন্স অব ওয়েলস ইংলণ্ডের সম্রাট হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি নয় বৎসর কয়েক মাস মাত্র রাজ্যশাসন করিয়াছেন। সম্রাট হইবার পর তিনি ইংলণ্ডের সকল রাজ্যে যাহাতে সখ্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯০৩ খৃঃ এপ্রিল মাসে তিনি পর্টুগালে গমন করেন। সে দেশবাসীরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল এবং তিনি লিসবনে সম্রাট চার্লসের অতিথি হইয়াছিলেন। তাহার পর জিব্রালটার, মলটা, নেপলস হইয়া রোমে সম্রাট ইমানুয়েলের অতিথি হইয়াছিলেন। ইটালী হইতে ফ্রান্সে গমন করিয়া পরে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার এই প্রকার সখ্যতায় দেশে শান্তির বীজ রোপিত হইয়াছিল। এই প্রীতি স্থাপন দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। অশান্ত দেশে যেন শান্তিবারি সিঞ্চিত হইয়াছে। বহু দিন হইতে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে মনোমালিন্য চলিতেছিল, সম্রাট গিয়া যেন মায়াদণ্ডের দ্বারা সেই সকল অশান্তির কাল মেঘকে দূর করিয়া দিলেন, এবং সেই হইতে এই উভয় দেশের মধ্যে শুধু নির্ম্মল আকাশ জ্যোৎস্নালোকের মত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। সেই সম্বন্ধ আজ পর্য্যন্ত এক ভাবেই অটুট রহিয়াছে। ইটালীর রাজা ও রাণী আসিয়া ইংলণ্ডে বাস করিয়া প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। তার পর তিনি অষ্ট্রিয়ার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে গমন করেন। ১৯০৪ খৃঃ সম্রাটের সহিত জর্ম্মানীর কাইসরের সাক্ষাৎ হয়। সম্রাট কাইসরের মাতুল, এই দর্শনে উভয় পক্ষে আনন্দের সীমা ছিল না। তাহার পর স্পেন দেশের রাজার সহিত তাহার ভগ্নীর কন্যা ভিক্টোরিয়া অব ব্যাটানবর্গের বিবাহের কথা হয়। স্পেন দেশের রাজা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী, ইংলণ্ডের রাজন্যবর্গ চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের ধর্ম্মে দীক্ষিত; তথাপি সম্রাট বর ও কন্যার ভালবাসা দেখিয়া বিবাহে মত দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসীরা ইহা অনুমোদন করে নাই। এইরূপে তিনি স্পেন দেশের রাজাকেও ভালবাসার সূত্রে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাজকার্য্যে কখনও তিনি অবহেলা করেন নাই। মৃত্যুর দিনও তিনি কার্য্য করিয়াছেন। রাজ্যে ও প্রজাদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা তাহার জীবনে যেন প্রধান কর্ত্তব্য ছিল, তিনি জীবনে কখনও সে কর্ত্তব্য পালনে বিরত হন নাই।

সম্রাট এক সময়ে ডচেস অব ফাইপের ডায়েরিতে স্বহস্তে একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমি কোন্ সময় সুখী? যে সময় আমি বাড়ীতে আরামে থাকিতে পাই, আর নির্জ্জনে বসিয়া ধূমপান করি, বা একখানি খুব ভাল উপন্যাস লইয়া পাঠ করি, স্ত্রী কন্যাদের লইয়া শান্তিতে আনন্দ উপভোগ করি, সেই সময়ই আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। যদি আমায় কেহ 'আজ্ঞে মহারাজ' সম্বোধন উঠিতে বসিতে না করে, আমি সামান্য ভদ্রলোকের মত যেস্থানে ইচ্ছা যাই, কেহ আমায় অভিবাদন করিতে ব্যস্ত হইয়া না উঠে, তবে আমি সুখী হই। আর যখন আমি দন্তরোগে অধীর হইয়া পড়ি, আর আমায় তবুও কোন সভায় যাইতে হয়, ব্যথা সত্বেও মৃদু হাস্য করিতে হয়, তখনই আমার দুঃখের সীমা থাকে না।"

বেশী দিন পূর্ব্বের কথা নয়, ডেনমার্ক হইতে একজন ফটোগ্রাফার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন ও সম্রাটের চিত্র লইবার জন্য বকিংহ্যাম প্রাসাদে গমন করিয়া ফটোগ্রাফের যন্ত্রাদি সজ্জিত করিতেছিলেন ; এমন সময় সম্রাট সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাতঃকালীন শুভ ইচ্ছা জানাইয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। চিত্রকর তাঁহার চিত্র দুইবার তুলিয়া তৃতীয়বার লইবার সময় বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া আপনার মস্তক একটু উঁচু করিয়া রাখুন।" ইহা শুনিয়া সম্রাট হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ কালকার দিনে মস্তকটা উচ্চে রাখাই একান্ত আবশ্যক।"

এই জগতে আসিয়া সম্রাট সর্ব্বদাই মস্তক উচ্চ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সকলের সহিত এত সরলভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন যে তাহাতে সকলের হৃদয়ের ভয় দূর হইত। কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। মহামতি মিঃ গ্লাডষ্টোন বলিয়াছিলেন, যে সম্রাট শুধু বিদ্যার্জ্জন করিয়া জ্ঞানলাভ করেন নাই। তিনি সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া ও কথা কহিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

সম্রাটের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, তিনি একদিন মেরিয়েনবাদ-এর পোষ্টাফিসে একখানি টেলিগ্রাম পাঠাইতে গিয়াছিলেন। টেলিগ্রাফ আফিসের ভদ্রলোকটি তাঁহাকে নমস্কার করিবার পর তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া আনন্দিত ভাবে বলিলেন, "এই যে পেন, তুমি কেমন আছ ?" সেই ভদ্রলোকটির নাম মিঃ পেন। তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে স্যাণ্ড্রিংহ্যাম প্রাসাদে অনুচরের কার্য্য করিতেন। সম্রাট পেনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরিচিত হইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "তোমার স্ত্রীকে লইয়া পেন একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিও।" তিনি তাহার পর পেনকে নিজের একখানি ছবি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে ক্ষুদ্রকেও তিনি বিস্মৃত হইতেন না।

মার্কুইস অব ল্যান্সডাউনের কন্যা লেডি বিয়াট্রিসের বিবাহের সময় তিনি লেডি ল্যান্সডাউনের পূর্ব্বে গির্জ্জায় গিয়াছিলেন। বিবাহের পর ল্যান্সডাউনের প্রাসাদে তিনি লেডি ল্যান্সডাউনকে বলিলেন, "আপনি লেডি বিয়াট্রিসের জাতকর্ম্মের সময়ও আমাকে অপেক্ষা করাইয়াছিলেন, মনে আছে কি ?" সম্রাটের পক্ষে এই প্রকার সকল কথা স্মরণ করিয়া রাখা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরিবার ইংলণ্ডের মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবার। সম্রাট সকল শিশুদিগের জন্মতিথিতে খেলেনা উপহার দিতেন, সে জন্য সকল শিশুই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সম্রাট আপনার পরিবারের মধ্যে শিশু পৌত্রদের ও পৌত্রীকে লইয়া অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন। একদা বকিংহাম প্রাসাদে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সহিত প্রিন্স অব ওয়েলস ও তাঁহার স্ত্রী সন্তানদিগকে লইয়া জলযোগে (Lunch) বসিয়াছিলেন। জলযোগান্তে সম্রাট একটি পৌত্রকে স্কন্ধ-দেশে লইয়া সেই আহারের গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ও রাজ্ঞী আলেকজ্যাণ্ড্রা আর একটিকে লইয়া বেড়াইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। সে দিন তাঁহাদের উভয়েরই বাহিরে যাইবার কথা ছিল। তাঁহারা সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শিশুদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিলেন। যখন তাহারা বাহিরে গমন করিলেন, দেখিলেন, প্রাসাদের উচ্চ গবাক্ষ হইতে শিশুরা হাত নাড়িয়া তাহাদের ঠাকুর্দ্দা ও ঠাকুরমাকে ডাকিতেছে।

রুষিয়ার রাজবংশের সহিত ইংলণ্ডের রাজবংশের সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন পূর্ব্ব "জার" মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন সম্রাট (সে সময়ে প্রিন্স অব ওয়েলস ছিলেন) সেই মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপনীত হন এবং রুষিয়ার 'জার' তাঁহার কাছে আপনার শোকদুঃখে মুহ্যমান সন্তানকে ফেলিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। সে সময় সম্রাট নবীন 'জার'কে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তাহার পর ইংলণ্ডের রাজকুমারী প্রিন্সেস এলিসের কন্যার সহিত যখন নবীন জারের বিবাহ হইল তখন সে বন্ধন আরও দৃঢ় হইল। রুষিয়ার রাজকুমারীরা ইংলণ্ডের সম্রাটকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, যখন রুষিয়ার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রাজকুমার কাউস-এ (Cowes) আসিয়াছিলেন, তিনি সপ্তম এডওয়ার্ডকে পাইয়া

এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে আর কাহারও অভাব অনুভব করেন নাই। সম্রাট সকল বিষয়ে এত দয়ালু ছিলেন যে, শুনা যায় এক সময়ে তিনি 'জারের' সহিত তাঁহার শিশুদিগের থাকিবার কক্ষে যান। রাজপুত্র ও রাজকুমারীরা তাঁহাকে দেখিয়া বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি সেই শিশুদিগকে খেলেনা ইত্যাদি উপহার দিলেন। তাহার পরে দেখিলেন যে, তাহাদের ধাত্রী আইরিস জাতীয় রমণী। দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহার পরে বড়দিনের সময় যখন তিনি সেই শিশুদিগকে উপহার পাঠাইলেন, সেই শিশুদের ধাত্রীকেও একটি উপহার দিয়াছিলেন, তাহা একটি ব্রোচ; তাঁহার প্যাটার্ণ ছিল স্কটদেশীয় রাজচিহ্ন—সেই ব্রোচের বাক্সের উপরে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "সম্রাট এডওয়ার্ড তাঁহার আয়র্লণ্ড দেশীয় প্রজাকে পাঠাইয়াছেন।"

সম্রাট সর্ব্বদাই আপনার পৌত্র-পৌত্রীদের কাছে রাখিতেন। যখন প্রিন্স ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস ভারতবর্ষে ও অষ্ট্রিয়ায় গমন করিয়াছিলেন, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী তাঁহাদের সন্তানদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, ও সম্রাট তাঁহার পৌত্র ইংলণ্ডের ভাবী সম্রাট প্রিন্স এডওয়ার্ডকে রাজোচিত শিক্ষা যথেষ্ট দান করিয়াছেন। প্রিন্স এডওয়ার্ড শিশুকাল হইতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন। এই রাজপুত্রেরা সকলে সৈন্যদিগের কুচকাওয়াজ দেখিতে অত্যন্ত ভালবাসেন।

সম্রাট সকল কার্য্যেই গভীর মনোনিবেশ করিতেন। যখনি কেহ তাঁহার সহিত পরিচিত হইতেন, তিনি অনন্দের সহিত তাঁহার পরিচিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যখনি তিনি রাজপথে গমনাগমন করিতেন, যদি জানিতে পারিতেন, কোন রুগ্ন বা দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার দর্শনাভিলাষী, তিনি তখন তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের অভিবাদন পাইয়া আনন্দে প্রত্যভিবাদন করিতেন।

দরিদ্র দুঃখীদিগকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন ও হাঁসপাতালে যথেষ্ট দান করিতেন। কেহই তাঁহার নিকট হস্ত পাতিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিত না।

এক সময় তাঁহার স্যাণ্ড্রিংহ্যাম প্রাসাদে "নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ জেমস নওয়েলস অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "নওয়েলস, আমি তোমাকে 'নাইট' করিতে চাই, এ সংবাদে তোমার স্ত্রী কেমন খুসী হইবেন তা বল!"

মিঃ নওয়লেস বলিলেন, "আপনার এই দয়াতে তিনি কৃতার্থ হইবেন, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?'

তিনি মিসেস নওয়েলসকে এই সংবাদ জ্ঞাপনার্থে টেলিগ্রাম করিতে বলিলেন। মিঃ নওয়েলস 'নাইট' হইবার পর বলিয়াছিলেন, "ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্রাট যে ভাবে আমায় এই সংবাদ দিয়াছিলেন তাহাই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ গৌরবের বিষয়।

এক সময় একজন চিকিৎককে তিনি 'নাইট' উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে তাঁহার জীবিকা অর্জ্জনের সময় কোন অসুবিধা হয়, সেই জন্য তাঁহাকে নাইটের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান হইতে অব্যাহতি দিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কারণ একজন চিকিৎসকের পক্ষে সেই ভারবহ পোষাক পরিধান করা নিতান্ত কষ্টকর।

অসুস্থতার সময় তাঁহার অসীম ধৈর্য্য ছিল। তিনি বিশ্বাসীর ন্যায় সমস্ত রোগকষ্ট সহ্য করিয়াছেন, রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার অসুস্থতার জন্য যে এই অভিষেক ব্যাপারের উৎসব বন্ধ ছিল, তজ্জন্য আমি দুঃখিত। এই দেশবাসীর একাগ্র প্রার্থনায় আমি অদ্য সবল হইয়া এই রাজ্যভার গ্রহণের উপযুক্ত হইয়াছি। আমার জন্য তাঁহারা যে প্রার্থনা করিয়াছেন সেই প্রার্থনার বলেই আমি সুস্থ হইয়াছি। এখন ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা, তিনি আমাকে যে ভার অর্পণ করিলেন, আমি যেন তাহার উপযুক্ত হই।"

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মত, হাঁসপাতাল পরিদর্শন জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতেন। চিকিৎসকেরা সম্রাটের নিকট অনেক সাহায্য ও সহানুভূতি পাইতেন। রোগীরা তাহাদের সম্রাটকে দেখিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত।

সম্রাটের শারীরিক স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল, তিনি খুব বলিষ্ঠ ছিলেন। সর্ব্বদা দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ

করিয়া বেড়াইতেন। লণ্ডনের প্রতি বর্ষের আমোদ প্রমোদে সমানে যোগদান করিতেন ও সর্ব্বত্র ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতেন। যখন তিনি স্যাণ্ড্রিংহ্যামে থাকিতেন, গৃহের বাহিরে, উন্মুক্ত আকাশতলে, পরিষ্কার বাতাসে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন। তিনি পরিপক্ক শিকারী ছিলেন। যৌবন কালে এ বিষয়ে তাঁহার যেমন আনন্দ ও উৎসাহ ছিল, শেষ বয়সে তাহা ছিল না, তবু তিনি বন্দুকে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সম্রাট সর্ব্বদা বায়ু পরিবর্ত্তন ও স্থান পরিবর্ত্তন করিতে ভালবাসিতেন। সেই জন্য তিনি সর্ব্বদা গ্রাম্যাবাসে বা আপনার প্রজাদিগের বাটীতে যাইতেন, অথবা কয়েক দিনের জন্য ব্রাইটনে বেড়াইয়া আসিতেন। তিনি সর্ব্বদা নূতন স্থান ও নূতন লোক দেখিতে ভালবাসিতেন। সারাদিন খুব পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় থিয়েটার বা অপেরাতে প্রায়ই যাইতেন। তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল ছিল বলিয়া এত পরিশ্রম সহিত।

সম্রাট বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি শৈশব হইতে জীবনের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের যে কোন নূতন আবিষ্কারের সংবাদ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

যখন সম্রাট এডিনবরা ইউনিভারসিটিতে রসায়ন পাঠ করিতেন তখন ডাঃ প্লেফেয়ারের নিকট তিনি পাঠ লইতেন। এক দিন ডাঃ প্লেফেয়ার তাঁহার সহিত একটি গরম সীসাপূর্ণ কটাহের নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি সম্রাটকে বলিলেন, "আপনার কি বিজ্ঞানে বিশ্বাস আছে?" প্রিন্স বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" ডাঃ প্লেফেয়ার তৎপরে এমোনিয়া দিয়া প্রিন্সের হস্তধৌত করিয়া দিয়া বলিলেন, "এইবার আপনি এই পাত্র হইতে খানিকটা সীসা তুলিয়া আনুন।" প্রিন্স বলিলেন, "আপনি কি আমায় ইহা করিতে বলিতেছেন? ইহা কি সম্পূর্ণ নিরাপদ?" ডাঃ প্লেফেয়ার বলিলেন, "হাঁ ইহাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।" প্রিন্স বিনা বাক্যব্যয়ে শিক্ষকের আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিলেন! ইহা অতিশয় বিপজ্জনক কার্য্য ছিল, উপযুক্ত শিক্ষক ব্যতিরেকে এ কার্য্য করা উচিত নহে। ইহাতে সম্রাটের জীবনের নির্ভীকতা ও সাহস সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া আপনার সন্তানদিগকে পর্য্যটনকারীদিগের ভ্রমণ-কাহিনী শুনাইতেন। তিনি বলিতেন, এইপ্রকার ভ্রমণ-কাহিনী শুনিলে ও নানা দেশের সংবাদ জানিলে সন্তানদিগের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। এই জন্য প্রিন্স বাল্যকাল হইতে নানা ব্যক্তির নিকট ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন, ইহাতে তাঁহার সকলের সহিত কথোপকথনের শক্তি অদ্ভুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

লোকে বলিত, "সম্রাট একেবারে সাধারণ ইংরাজ ভদ্রলোকের মত।" তিনি সমস্ত রাজ্যের চারিধারে, কত সহস্র ডিনার টেবিলে, কত সমুদ্রের জাহাজে বিচরণ করিতেন আর সকলে শুভইচ্ছা জানাইয়া বলিত, "আমাদের সম্রাট! ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" কত পল্লীতে পল্লীতে, কত গৃহে প্রাসাদে, নরনারী সকলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত, তাঁহার জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত। তিনি যে শুধু নামের সম্রাট ছিলেন, তাহা নয়। তিনি সম্রাটের মতন সম্রাট ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে আরও অনেক রাজা হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই এমন প্রজারঞ্জক রাজা হন নাই, কাহারও প্রাণ এমন প্রজার দুঃখে কাঁদে নাই, কেহ প্রজার জন্য এত স্বার্থত্যাগ করেন নাই, কাহারও রাজ্যে শান্তি এমন ভাবে বিরাজ করে নাই, এবং কাহারও রাজত্বকালে সর্ব্বরাজ্যে এমন প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই, তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা জগতে দুর্লভ, তাহার তুলনা মিলে না। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তি সুখে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সুখ দুঃখের ভাগিনী, সম্রাজ্ঞী আলেকজ্যাণ্ড্রার তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া পুত্র পঞ্চম জর্জ্জ দীর্ঘজীবী হইয়া, পিতার উপযুক্ত সন্তান হইয়া সুখ ও শান্তিতে রাজ্য শাসন করুন, আমাদের এই কামনা।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কাশ্মীর এবং পঞ্জাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

পঞ্জাব।

হিউএন্থসঙ্গের ভারতবর্ষ পর্য্যটন কালে পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এতন্মধ্যে হিউএন্থসঙ্গ তক্ক, চীনাপটি, জলন্ধর, কুলুত, শতদ্রু, বৈরাট (১) মূলতান এবং পরবত প্রভৃতি রাজ্যের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সে বিবরণ পাঠে জানিতে পারি যে, পঞ্চনদ ভূমিতে হিন্দুধর্ম্মের অধিকতর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু নানা স্থানে হিন্দুর দেবমন্দিরের পার্শ্বেই বৌদ্ধমঠ এবং সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যাইত। শতদ্রু রাজ্যের জনপুঞ্জ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সরল ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের তাদৃশ প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসত্ত্বেও আমাদের পরিব্রাজক তত্রত্য রাজধানীর সঙ্ঘারাম সমূহ পরিত্যক্ত এবং শ্রমণের সংখ্যা নগণ্য দেখেন। সেই প্রাচীন কালেও পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশ ফলশস্যপূর্ণ ছিল বলিয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। হিউএন্থসঙ্গ পঞ্চনদ ভূমির সর্ব্বত্রই দারুণ গ্রীষ্ম বোধ করেন; কেবল কুলুত রাজ্যে শীতাধিক্য অনুভূত হয়। এতদ্দেশবাসী জনপুঞ্জের স্বভাব চরিত্র বর্ণন কালে এক এক রাজ্যের লোকের চরিত্র এক একরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা পাঠ করিলে মোটের উপর উপলব্ধি জন্মে যে, পঞ্চনদ ভূমির অধিকাংশস্থানবাসীরা উদ্ধত-স্বভাব এবং শৌর্য্যবীর্য্যশালী ছিল। চীনাপটির অধিবাসী-গণ সন্তুষ্টচিত্ত, শান্তিপ্রিয়, ভীরুস্বভাব এবং উদাসীন-প্রকৃতি ছিল। শতদ্রু রাজ্যবাসীদিগকে হিউএন্থসঙ্গ ধর্ম্মশীল, নম্রস্বভাব, তুষ্টিকর প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। হিউএন্থসঙ্গ পঞ্জাববাসীর অনেক সৎকীর্ত্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই নির্দ্দেশের সার্থকতা প্রদর্শন জন্য তদীয় গ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে। "পূর্ব্বকালে গরীব এবং অনাথগণের প্রতিপালন জন্য তক্ক রাজ্যের স্থানে স্থানে পুণ্যশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল পুণ্যশালায় তাহাদিগকে খাদ্য, ঔষধ, পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রদত্ত হইত। এই কারণেই কোন আগন্তুককেই ক্লিষ্ট হইতে হইত না।"

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থসঙ্গের পর্য্যটনকালে পঞ্চনদ প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এক সময়ে এতদ্দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা, হিউএন্থসঙ্গের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, মিহিরকুল নামক এক হিন্দু-নরপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করেন, এবং তদবধিই বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য সে বিবরণ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

পুরাকালে (হিউএন্থ সঙ্গের ভারতাগমনের বহু পূর্ব্বে) পঞ্চনদ ভূমির অন্তর্গত সাকল নামক রাজধানীতে মহারাজ মিহিরকুল সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত অংশে তাঁহার আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। মিহিরকুল বৌদ্ধ-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হন এবং তদর্থে একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্য্যকে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণের ধনাদিতে স্পৃহা ছিল না, খ্যাতিলাভেও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন; সুপণ্ডিত এবং খ্যাতনামা বৌদ্ধাচার্য্যগণ রাজানুগ্রহ ঘৃণা করিতেন। এ জন্য তাঁহারা মহারাজ মিহিরকুলের আদেশ প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। একজন পুরাতন রাজ-ভৃত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তর্কশাস্ত্রে প্রাজ্ঞ এবং সুবক্তা ছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণ তাঁহাকে রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে মিহিরকুল নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চনদ-ভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্কাশিন করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

তৎকালে মগধে বালাদিত্য রাজা রাজত্ব করিতে-ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এই কারণ মিহিরকুলের তাদৃশ ঘোর নিষ্ঠুর অত্যাচার

(১) কানিংহাম সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বৈরাট মহাভারতোক্ত মৎস্য দেশের রাজধানী বিরাট নগর হইতে অভিন্ন।

উৎপীড়নের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া ব্যথিত হইলেন, এবং স্বরাজ্যের সীমা সুদৃঢ় করিয়া তাঁহাকে বার্ষিক নজর দিতে অস্বীকার করিলেন। বালাদিত্যের কৃত কার্য্যে মিহিরকুলের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি বিপুল বাহিনীসহ মগধাভিমুখে অভিযান করিলেন।

বালাদিত্য মিহিরকুলের বলবীর্য্যের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন; তিনি মিহিরকুলের অভিযানের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। বালাদিত্য প্রকৃতিপুঞ্জের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই কারণে অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগামী হইল। তিনি অনুচরগণ সহ একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মিহিরকুল নৌ-পথে ঐ দ্বীপে উপনীত হইলেন। এই স্থানে বালাদিত্যের সুকৌশলে প্রবল প্রতাপান্বিত মিহিরকুল বন্দী হইলেন। ইহাতে মিহিরকুল লজ্জা ও অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া মুখমণ্ডল স্বীয় পরিচ্ছদ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। বালাদিত্যের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মুখের কাপড় অপসারণ করিতে বিরত রহিলেন।

বালাদিত্যের মাতা অতিশয় গুণবতী রমণী ছিলেন। তিনি অসাধারণ মিহিরকুলের পতন সংবাদ অবগত হইয়া দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে মিহিরকুল তাঁহার সমীপে নীত হইলে তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আহা! মিহিরকুল, তুমি লজ্জিত হইও না, সমস্ত পার্থিব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য ঘটনানুসারে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তোমাকে দেখিয়া আমার পুত্রবাৎসল্য উপস্থিত হইয়াছে, তুমি মুখের কাপড় খুলিয়া ফেল এবং আমার সঙ্গে আলাপ কর।" রাজমাতার বহু আকিঞ্চনে মিহিরকুল মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর মাতার আদেশে বালাদিত্য মিহিরকুলকে একজন তরুণী কুমারীর সঙ্গে বিবাহান্তে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক সসম্মানে বিদায় দিলেন। মিহিরকুলের অনুপস্থিতির সুযোগে তদীয় ভ্রাতা সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি মুক্তি লাভ করিয়া কাশ্মীরে উপনীত হইলেন তত্রত্য অধিপতি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কাশ্মীরাধিপতি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং সে জন্য তাঁহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু মিহিরকুল অচিরে সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া কাশ্মীরের প্রজাকুলকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন এবং তার পর রাজাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইলেন। অতঃপর চতুর্দ্দিকে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষমতা লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্কাশনে বদ্ধপরিকর হইলেন। মিহিরকুল প্রবল পরাক্রমে গান্ধার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক এক হাজার ছয় শত স্তূপ এবং সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন, এবং নবতি লক্ষ বৌদ্ধ নরনারীকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন। অমাত্যগণ তাঁহাকে এই ভয়ঙ্কর কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জের পরিবর্ত্তে আপনাদের জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য প্রার্থী হইলেন। মিহিরকুল তাঁহাদিগকে উত্তর প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে সিন্ধুনদের উপকূলে তিন লক্ষ সম্ভ্রান্ত-বংশজাত নরনারীকে হত্যা করিলেন, তৎসমসংখ্যক নরনারী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল। তার পর তিনি তিন লক্ষ নরনারীকে দাস দাসীরূপে স্বীয় সৈন্য শ্রেণীতে বিতরণ করিলেন। এই সকল দুষ্কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি প্রজাকুলের অর্থ অপহরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সমস্ত দুষ্কার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হইলেন। মিহিরকুলের মৃত্যুকালে চারিদিকে বিদ্যুৎপাত ও শিলা বর্ষণ হইয়াছিল। ঘোর অন্ধকার সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, প্রবল ঝটিকা এবং ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইলে পবিত্র-চেতা সিদ্ধপুরুষগণ বলিয়াছিলেন, "অসংখ্য নরনারীর হত্যাসাধন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্কাশন জনিত পাপের ফলে মিহিরকুল সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ নরকে পতিত হইয়াছেন। এই নরকে তাঁহাকে অনন্তকাল যাপন করিতে হইবে।"

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্চনদ প্রদেশে সৌরধর্ম্মের

প্রভূত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আমরা এই প্রসঙ্গে হিউএন্থসঙ্গ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ মূলতানের বৃত্তান্তের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

মূলতান দেশ চক্রাকারে প্রায় ৪ হাজার লি; রাজধানী চক্রাকারে ন্যূনাধিক ৩০ যোজন। মূলতান রাজ্য জনপূর্ণ। অধিবাসীরা অর্থশালী। ভূমি উর্ব্বরা এবং শস্যশ্যামলা। জলবায়ু প্রীতিকর। অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সরল, তাহারা সাধুস্বভাব, জ্ঞানানুরাগী এবং গুণী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা অল্প। এই দেশে দশটি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার অধিকাংশই ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। এই সকল সঙ্ঘারামে অতি অল্পসংখ্যক শ্রমণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা বিদ্যালোচনায় নিরত আছেন; কিন্তু তাঁহাদের কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। মূলতান দেশে একটি সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান আছে, এই মন্দির অতি সুবিশাল এবং আদ্যন্ত কারুকার্য্যখচিত; তদভ্যন্তরস্থিত সূর্য্যমূর্ত্তি স্বর্ণনির্ম্মিত এবং বহুমূল্য রত্নভূষিত। সূর্য্যমূর্ত্তির ঐশ্বরিক জ্ঞান সময় সময় প্রহেলিকাবৎ লোকসমক্ষে প্রকটিত হইয়া থাকে; ইঁহার দৈবক্ষমতা সর্ব্বজনবিদিত। রমণিগণ মন্দিরে গমনপূর্ব্বক গীতবাদ্য, দীপারতি এবং সচন্দন পুষ্পদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা অর্চ্চনা করেন। আদি কাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। পঞ্চনদ প্রদেশের রাজন্যবৃন্দ এবং ধনবানগণ আমাদের বর্ণিত মণিমুক্তারত্নাদি উৎসর্গ করিতে তৎপর রহিয়াছেন। তাঁহারা একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানে গরীব দুঃখীরা আশ্রয় লাভ করে, পিপাসার্ত্তকে জল, ক্ষুধাতুরকে অন্ন এবং পীড়িতকে ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে। সমস্ত দেশ হইতে নরনারীগণ মোক্ষ কামনায় সূর্য্যদেবের উপাসনার্থ এই স্থানে আগমন করে; এই কারণ সহস্র সহস্র লোকের কলরবে মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণ-ভূমি সর্ব্বদা মুখরিত থাকে। সূর্য্যমন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব নির্ম্মলসলিলা দীর্ঘিকা দ্বারা পরিশোভিত; সে দীর্ঘিকার তীরে স্থানে স্থানে পুষ্পকুঞ্জ চারিদিকের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; এই সকল পুষ্পকুঞ্জে যাত্রিগণ অবাধে পরিভ্রমণ করিতে পারে।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

নারীশক্তির অপচয়।

(৩)

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, মানুষ এক সময় পশু অপেক্ষা অতি অল্পই উন্নত ছিল। ইতরপ্রাণীর ন্যায় তাহারাও অগ্নি, ধাতুদ্রব্য এবং পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যবহার জানিত না। এখনও সভ্য মানবগণের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কোন কোন স্থানে তাহাদের বংশধরগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অসভ্য জাতি এবং সভ্য মানবের মধ্যে কত প্রভেদ! এমন কি উহাদিগকে মানব নামে আখ্যাত করা যায় কিনা, তাহাই বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক এবং নারীদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই পৃথিবীর আদিম অবস্থার অসভ্য জাতি অপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছে। আমরা যে দেশে বাস করি, তাহার নাম কি, উহা কত বড় এবং কিরূপে শাসিত হয়, তন্নিবাসিনী রমণীদের মধ্যে কয়জনে এ সকল তত্ত্ব জানেন? পল্লীগ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বুদ্ধিমতী বর্ষীয়সী রমণীকে আমি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরেও দেশ আছে এবং মানুষ সেখানে যাইতে পারে। তিনি যে আমার কথা কেবল অবিশ্বাস করিলেন তাহা নহে, আমাকে উপহাস করিতেও ছাড়িলেন না। সমুদ্রের জলে আঁশ নাই, সুতরাং লঙ্কায় গমন মানুষের পক্ষে অসম্ভব, সেখানে এখনও বিভীষণ বাস করিতেছে, কান বন্ধ করিলে যে গুম গুম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় তাহা রাবণের চিতানলের শব্দ, এই সকল গল্প তাঁহারা এমন দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করেন, যে তাঁহাদের জ্ঞান একটী বালকের জ্ঞানের সহিতও তুলিত হইতে পারে না। ভগবানের প্রিয় সন্তান মানবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? তাঁহারা অজ্ঞতা প্রযুক্ত আপনাদের অভাব বুঝিতেছেন না বলিয়া কি তাঁহাদের প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্য কিছুই নাই? অসভ্য লোকদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোক প্রদান করা বিধাতার প্রিয় পবিত্র কার্য্য মনে করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ খৃষ্টীয় নরনারী তজ্জন্য আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিতে-

ছেন। আর আপন জননী, পত্নী, ভগিনী ও কন্যা প্রভৃতি আপনার জনের পশুর ন্যায় হীন অবস্থা দেখিয়া কি ভারত-সন্তানদের হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হয় না? এক হিসাবে নারীজাতির এইরূপ হীনাবস্থা পুরুষের স্বার্থের অনুকূল সন্দেহ নাই, কারণ নারীর জ্ঞান রন্ধন-কুটীরে সীমাবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত তাহাকে পুরুষের যথেচ্ছাচারিতার অন্তরায় স্বরূপ হইতে হয় না; কিন্তু যে ভারতবাসীর শাস্ত্রে জননীকে স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠা জ্ঞান করিতে শিক্ষা দেয়, তাহাদের পক্ষে কি এইরূপ সংকীর্ণতা শোভা পায়? সকল পুরুষই স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া নারীজাতির প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছেন হয়ত একথা বলিয়া আমরা ভুল করিতেছি, কিন্তু দেশের ভ্রান্ত সংস্কার গুলিকেও বিনাবিচারে গ্রহণ করিয়া অনেকেই যে প্রকারান্তরে পূর্ব্বতন স্বার্থপর ব্যবস্থাপকদিগের ক্রীড়াপুত্তলি হইতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে দেশে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিরাট যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যে দেশে সীতাকে হরণ করিয়া রাবণ সবংশে নিহত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল, "ধন দিয়াই হউক কি পত্নী দিয়াই হউক নিজকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিবে," ইহা কি সেই দেশের উপদেশ? আমাদের ইহাই দুঃখ যে হিন্দু তাহার পবিত্র আদর্শ হারাইয়া কতিপয় হিন্দুকুলগ্লানি কাপুরুষের উপদেশে রমণীজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির দুরবস্থার কথা উঠিলেই অনেকেই মনু প্রভৃতি ঋষিদের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া বলেন, এই দেখ হিন্দুশাস্ত্রে রমণীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবার বিধান আছে। মনু বলিয়াছেন :—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলা ক্রিয়াঃ।
প্রজানার্থং মহাভাগঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চনঃ।

সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়াই সকলে অবাক্! তারপর যখন তাহার ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়, তখন তো একেবারেই চুপ। বাপ্‌রে, এমন কথা আছে তবে আর হিন্দুনারীর দুঃখ কি? শাস্ত্রে যখন আছে তখন শাস্ত্রের কথা পালন না করিলেও চলে, শুধু আছে ইহা শুনিলেই নারীজাতির সমস্ত কষ্ট দূর হইবে। শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশে কিরূপে প্রতিপালিত হয় নিম্নে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সকলেই জানেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে তাহা ব্রাহ্মণের দ্বারা করিতে হইবে, আর যদিই বা নিজের প্রার্থনা করা আবশ্যক হয় তাহা সংস্কৃত করিয়া বলিতে হইবে। এখন সংস্কৃত অনেকেই জানেন না, তবু ভগবান বাঙ্গালা কথা শুনিবেন না, এই ভয়ে দুই একটা শ্লোক মুখস্থ করিয়া লইতে হয়। আমার এক দিদিমা এইরূপ কয়েকটা শ্লোক মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তো আর তার অর্থ বুঝিতেন না, কাজেই এটার মাথা ওটার ল্যাজে যোড়া দিয়া তাহাই তোতাপাখীর মত আওড়াইতেন। আমরাও ছেলেবেলায় ঐ সকল শ্লোকের অর্থ বুঝিতাম না, কিন্তু যখন বড় হইলাম তখন সংস্কৃত না জানিলেও তাহার অর্থ একটু একটু বুঝিতাম। একদিন ভাবিলাম, দিদিমা রোজ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া কি মন্ত্র পড়েন শুনিতে হইবে। দেখিলাম, পঞ্জিকায় যে নবগ্রহ স্তোত্র থাকে তাহারই শেষাংশ :—

"ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রণতঃ শুচিঃ
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ।"

ইত্যাদি অংশ পড়িতেছেন। প্রার্থনার নাম গন্ধও নাই, কিন্তু প্রার্থনা পাঠে যে ফল হইবে তাহাই প্রার্থনা ভাবিয়া পড়িতেছেন। হায়! অজ্ঞানতা নিরীহ পল্লীরমণীকে এরূপ ভাবে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, যে তাঁহারা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মচর্য্যা করিতে পারিতেছেন না, বা প্রাণ খুলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিতেছেন না। আমরা আমাদের বক্তব্য হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু উপায় নাই; ভারত-নারীর বর্ত্তমান অবস্থার কতকটা আভাস প্রদান না করিলে, আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে পারিতেছি না বলিয়া অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিতে হইতেছে, পাঠকপাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। শিক্ষার অভাবে ভারত-নারী যে শুধু জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আস্বাদ হইতেই বঞ্চিতা, তাহা নহে। তাঁহাদের মনের উদারতা, বিশ্বপ্রেম, নরসেবা প্রভৃতি নারীজাতির স্বাভাবিক সৎবৃত্তিগুলিও মৃতপ্রায় থাকে, এবং পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা,

হিংসা, কলহ প্রভৃতি দোষগুলি তৎসমুদয়ের স্থান অধিকার করে। প্রতিবেশীদিগকে প্রীতি করা দূরে থাকুক, শ্বাশুড়ী পুত্রবধূকে এবং ননদিনী ভ্রাতৃজায়াকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারেন না, নীচ স্বার্থপরতা তাঁহাদের হৃদয় এমন ভাবে অধিকার করিয়া ফেলে, যে অতি সামান্য বিষয় লইয়া সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারাও তুমুল কলহের সৃষ্টি করিয়া "গৃহ-তপোবন"কে ভীষণ রণক্ষেত্রে পরিণত করেন। পশুর ন্যায় আহার ও নিদ্রা ব্যতীত মানবের যে আর কিছু লক্ষ্য আছে ইহা তাঁহাদের মনেই স্থান পায় না। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, হিন্দু-শাস্ত্রে নারীকে যেরূপ সম্মান করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং হিন্দুসমাজে নারীর স্থান যেরূপ উচ্চ, পৃথিবীর আর কোনও স্থানে সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। যদি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ প্রতিপালিত হয়, তবে হিন্দুনারীর ন্যায় সৌভাগ্যবতী অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদব্যাস বলিয়াছেন ঃ—

"পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি।
অবমত্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ॥
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী॥"

যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের মান রক্ষা করে, তাহার পদে পদে শুভ প্রাপ্তি হয়, আর যে মূঢ় পুরুষাধম স্ত্রীলোকের অবজ্ঞা করে, সতী পার্ব্বতী তাহার পদে পদে অমঙ্গল করেন। অতীত নারী-চরিত্রের গৌরব ঘোষণা এবং চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মৃত স্বামীর অনুগমন-কারিণী পতিব্রতা রমণীদের গুণকীর্ত্তন করিলেই ভারত-নারীর মান রক্ষা করা হয়, আমরা এরূপ মনে করি না। নারীকে জ্ঞানগরিমায় এরূপ শ্রেষ্ঠা করিয়া তুলিতে হইবে যে, পৃথিবীর যাবতীয় জাতির চোখে ভারত-নারী সম্মানার্হা বলিয়া পরিগণিতা হন। স্বামী পত্নীকে প্রিয়তমা শিষ্যার আসন প্রদান করিবেন ইহা আমাদের ভারতেরই আদেশ।

হর প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।

এই অতি পুরাতন সরল কবিতাটি কি আমাদের মনে এ ভাব জাগাইয়া দেয় না, যে পতি পত্নীর সম্বন্ধ কেবল প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ নহে। পত্নী পতির আহার্য্য প্রস্তুত করিবেন, এবং স্বামী তাঁহাকে বসন ভূষণে শোভিতা করিবেন, উভয়ের কর্ত্তব্য শুধু এই খানেই শেষ হয় না। পুরুষের ন্যায় নারীও জ্ঞানলাভের অধিকারিণী এবং এ সম্বন্ধে স্বামী আচার্য্য এবং পত্নী তাঁহার শিষ্যা।

নারীর শিক্ষার কথা দূরে থাকুক সাংসারিক ব্যাপা-রেও তাহাদের সম্মান রক্ষিত হইতেছে, আমাদের এরূপ মনে হয় না। সাধারণতঃ ধনী-গৃহে পত্নী বিলাস-সামগ্রী এবং দরিদ্রের ঘরে দাসী ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুরুষের একাধিক বিবাহ এবং ভীষণ কন্যাপণ প্রচলিত থাকায় নারীর জীবন অনেক স্থলে গবাদি পশু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বিবেচিত হয় না। সম্ভ্রান্ত পরিবারেও রমণীর প্রতি কিরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা নিম্নে একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যবংশোদ্ভব কোন ভদ্রলোকের একটী মাত্র পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। একটী মেয়ে, সুতরাং বাপ মায়ের কিরূপ আদরের তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মেয়ের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতার উৎকণ্ঠাও বাড়িতে লাগিল। মাতা সর্ব্বদাই বলিতেন, "বাছা আমার ষষ্ঠির কৃপায় দশ বছরে পড়িল, এখন তো আর ঘরে রাখা যায় না!" মেয়ের কানেও কখন কখন এ কথা না যাইত তাহা নহে; সে আপনাকে অপরাধিনী মনে করিত, অথচ এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে জন্য তাহাকে ঘরে রাখা যায় না, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল, সুতরাং শারীরিক পুষ্টি নিবন্ধন তাহাকে বয়সের তুলনায় একটু বড় দেখাইত; কিন্তু মানবের আকাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যরত্ন বালিকাকে শীঘ্র শীঘ্র মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কারণ স্বরূপ হইয়া উঠিল। যাহা হউক জননীর জামাতা দর্শনের সাধ এত প্রবল হইয়া উঠিল, যে পিতা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া একটী বর স্থির করিলেন। বিবাহ হইল বটে, কিন্তু পিতা সর্ব্বস্ব দান করিয়াও জামাতা ও বৈবাহিকের তুষ্টিসম্পাদন করিতে পারিলেন না। অঙ্গুরী কি এমনই একটা তুচ্ছ জিনিষ লইয়া শ্বশুরের প্রতি জামাতার একটা ক্রোধ রহিয়া গেল, নব পরিণীতা পত্নীকে তিরস্কার এবং প্রহার

করিয়া ঝাল মিটাইতে লাগিলেন, শাশুড়ী ননন্দা প্রভৃতিও সুবিধা মত বালিকা বধূর বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া স্বামীর ক্রোধানলে ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিল। পিতা মাতার স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহে এই অত্যাচার তাহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইত, সমবয়স্কা ননদিনীর সঙ্গে যে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবে, তাহারও উপায় নাই, কারণ তাহার কথার একটা কল্পনাতীত কদর্থ বাহির করিয়া এরূপ ভাবে আপনার মাতার কাছে লাগাইত, যে সে জন্য তাহাকে যথেষ্ট শাস্তি পাইতে হইত। একদিন রামায়ণ পাঠকালে সীতার সঙ্গে রামের পঞ্চবটী বনে বাসের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, "আমার কিন্তু ভাই ওরূপ বনে বনে থাকতে বেশ ভাল লাগে।" আর কি তাহার রক্ষা আছে? ননন্দা তৎক্ষণাৎ মাতার কাছে দৌড়িয়া গিয়া বলিল, "মা! তোমাদের বেহায়া বৌয়ের কথা শুনেছ, সংসার টংসার ছেড়ে দাদাকে নিয়ে বনে যাবেন, তাই নাকি ওঁর খুব ভাল লাগে!" শাশুড়ীও শুনিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে বধূর মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "তবে রে মাগী বজ্জাত ডাইনী! তুই আমার ছেলেকে গুণ করে ভুলিয়ে বনে নিয়ে যাবি! রোস্ দেখাচ্ছি মজাটা।" ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হউক, এরূপ ব্যবহার তো প্রাত্যহিক ঘটনা, তাহার অঙ্গের ভূষণ। একদিনের ঘটনা লিখিতে এখনও আমাদের হস্ত কম্পিত হইতেছে। রাত্রিতে রন্ধন শেষ হইলে শোবার ঘরে একটা হাঁড়িতে করিয়া অনেকে আগুন আনিয়া রাখেন; একদিন বালিকা বধূ আগুনের হাঁড়ি আনয়ন পূর্ব্বক ননন্দাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, "ঠাকুরঝি, বড় গরম, আমার হাত দুখানা যেন পুড়ে গিয়েছে।" ননন্দাও তেম্নি, সে তাহার ভাইকে গিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "দাদা, বড় মানুষের বেটীর কথা শুনেছ, আগুনের হাঁড়ীটা রান্না ঘর থেকে আনতে ওঁর হাতে ফোস্কা পড়ে।" লোকটা মাতাল হইয়াছিল কিনা ভগবান জানেন, এই কথা শুনিবা মাত্রই পত্নীর হাত দুই খানি ধরিয়া উত্তপ্ত আগুণের হাঁড়ীতে চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "তুই খুব বড় মানুষের মেয়ে, এ গরীবের ঘরে তোর থাকা হবে না, চল্ তোকে তোর বড় মানুষ বাপের বাড়ীতে রেখে আসি।" এই বলিয়া ক্রমাগত প্রহার করিতে করিতে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া সেই অবস্থায় সেই রাত্রিতে, পিত্রালয়ে লইয়া চলিল, স্বামীর সঙ্গে সমবেগে চলিতে অক্ষম হওয়াতে পাষণ্ড পেছন হইতে ঘুসি মারিতে লাগিল, এবং বালিকা তাহার চোটে এক একবার উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল; এইরূপ ভাবে প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় তাহাকে পিত্রালয়ের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে ফেলিয়া দিয়া স্বামী ফিরিয়া আসিল। তখন রাত্রি প্রায় ১২টা, রাস্তার লোকের চলাচল প্রায় বন্ধ, দৈবাৎ বালিকার জনৈক আত্মীয় তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। মেয়ের এরূপ অবস্থা দেখিয়া মায়ের প্রাণ যে কিরূপ করিতে লাগিল তাহা বলা অপেক্ষা বুঝা সহজ। বাড়ীময় একটা মড়া-কান্না পড়িয়া গেল, প্রতিবেশীগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ব্যাপার খানা কি?" এই ঘটনা শুনিয়া কাহারও দুঃখের সীমা রহিল না।

পাঠকপাঠিকাগণ দাস ব্যবসায়ের কথা শুনিয়াছেন। শুনিয়াছি কোন কোন দেশে দাসদাসী ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিত। উল্লিখিত ঘটনার সহিত তাহার কোন পার্থক্য আছে কি? পার্থক্য এইটুকু যে এ দাসীর সঙ্গে সঙ্গে টাকাও পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা নৃশংসতার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? তবে সুখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া আধুনিক যুবকগণ পত্নীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে শিখিতেছেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপালন করা কেহই আবশ্যক মনে করেন না, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য-টুকু ষোলআনা আদায় করিতে চাহেন।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যত্ত্ু তেন স্বর্গে মহীয়তে।

স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্র যজ্ঞ, স্বতন্ত্র ব্রত এবং স্বতন্ত্র উপবাস নাই। পতিসেবা বলেই স্ত্রীজাতির স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে; ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য দ্বারা ইহা পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে স্বামীই নারীর একমাত্র ঈশ্বর, স্বামীর

আরাধনা ভিন্ন রমণীর আর কোনই কর্ত্তব্য নাই। স্বামী পূজনীয় এবং নারীর প্রধানতম অবলম্বন সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষিতা নারীগণ শুধু স্বামীর অস্তিত্বের মধ্যেই বিলীন হইয়া থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ভগবান তাঁহাদিগকেও মানবোচিত শক্তিতে ভূষিত করিয়াছেন, শুধু স্বামীর পরিচর্য্যাতেই তাঁহারা সেই শক্তির পরিণতি হইতে দিতে চাহেন না; তাঁহারা বুঝিয়াছেন, পুরুষের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার সীমার মধ্যে তাঁহাদের আবদ্ধ থাকা ভগবানের অভিপ্রেত নহে, শক্তি জগতের কাজে লাগাইতে হইবে। শিক্ষিতা নারী এবং পুরুষের মধ্যে এইটুকু মাত্র বিরোধ। নারীর এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু ইহা জাতীয় উন্নতির অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে আশা ন্যায়ের অনুগামিনী, যাহা বিধাতার অভিপ্রেত, তাহা একদিন পূর্ণ হইবেই, ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইবে।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

অম্লান কমল।

(১)

হে বিভো! চিন্ময় মম নিত্য শতদল,
ঘ্রাণে চিত্ত অন্ধ-পারা করিলে গো মাতোয়ারা,
পরিমল তরে যদি করিলে পাগল—

(২)

মজিতে রাখিলে বিঘ্ন কেন তরে হরি?
আহা, প্রতিকূল বায় কেন ঠেলে নিয়ে যায়
মনোনীত নিধি হতে প্রবঞ্চিত করি!

(৩)

যতবার লয়ে যাবে ঘুরি ফিরি ফিরি
তুলিয়া ভীষণাহবে প্রেম গুঞ্জরণ রবে
উপনীত হব পদে গন্ধ অনুসরি!

(৪)

যতদিন রাজীবে বিলীন নাহি হবে দেব চিত,
অমল আঘ্রাণ বাসে ঘুরিব গো আশে পাশে
পদ্মমধু ঘ্রাণোন্মত্ত মধুপের মত!

(৫)

সহসা একদিন উষালোকে, সুমাহেন্দ্র পলে
কৃপা পবনের ভরে পৌঁছিয়া চরণ'পরে
ডুবিব জন্মের মত অম্লান কমলে!

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

ম্যাডাম গ্যাঁয়ো।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিন্তু এই সকল অভ্যন্তরীণ আনন্দ এবং শান্তি বাহ্যিক পরীক্ষা এবং কষ্ট দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল। তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা এখনও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্বাভাবিক স্নেহ পর্যন্ত তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর শিক্ষাগুণে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তদুপরি আবার তাঁহার ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন ভগবান্ তাঁহাকে ভীষণ দৈহিক কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি ভীষণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই রোগ তাঁহার যে অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল তাহা জন্মের মত অপহরণ করিল; কিন্তু ইহার মধ্যেও ভগবানের করুণাপূর্ণ হস্ত দেখিয়া ভক্তিমতী গ্যাঁয়ো অন্তরে দিব্য আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ইহার পর ক্ষণকালের জন্য মানসিক দুর্ব্বলতা তাঁহাকে গ্রাস করে এবং পাপ ও সংসারে টানিয়া লইতে প্রয়াস পায়। তিনি পাপের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যমাখা মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! আমি কি পৃথিবীর জন্য কিছুই না রাখিয়া, সকলই ভগবানকে দিব? এই বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিলাসের যুগে যখন সকলেই উহাতে ডুবিয়া রহিয়াছে,তখন আমার চক্ষু, আমার ইন্দ্রিয় কি এ সকলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিবে, না

থাকা উচিত ?" এই দুর্ব্বলতা প্রায় সকলকেই সময়ে সময়ে অভিভূত করে ; প্রাকৃত মানব একবার পৃথিবীর পাপ-পঙ্কে ডুবিলে উঠিতে চায় না, বা উঠিতে পারে না,—সেই জন্যই তাহাদের শোক, সেই জন্যই তাহাদের হৃদয়ে চির অশান্তির বসতি! কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যাকুলপ্রাণে আকুল হৃদয়ে তাহার দুর্ব্বলতা হইতে উঠিতে চায়, ভগবান্ তাহাকে নিজ হস্তে পাপের প্রলোভন হইতে উত্তোলন করেন। ম্যাডাম গ্যাঁয়োকেও তিনি বল দিলেন, ব্যাকুলা নারী প্রলোভনকে জয় করিয়া পুনরায় শান্তির আস্বাদন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "সম্ভব হয় ত' আজ হইতে আমি একেবারে ভগবানেরই হইব, পার্থিব বস্তু আমার হৃদয়ের সামান্য অংশও অধিকার করিতে পারিবে না!"

অনেক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া গ্যাঁয়ো তাঁহার সংকল্প অক্ষুণ্ণ রাখিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরের বিশ্বাসী দাসী সাজিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবেন বলিয়া এক পত্রে স্বাক্ষর করেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"আমি আজ হইতে ভগবানকে আমার করিয়া লইলাম; এবং যদিও আমি তাঁহার ভালবাসার উপযুক্ত নই, তথাপি আমি ঈশ্বরকে পতিরূপে বরণ করিতেছি এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি। এই আত্মায় আত্মায় উদ্বাহ ক্রিয়ার দিনে আমি যেন তাঁহারই ইচ্ছার সহিত যুক্ত হইতে পারি, শান্ত ও পবিত্রভাবে অহংভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত যেন নিজেকে এক করিতে পারি। আমি যখন তোমার হইলাম, হে যীশু, তখন আমার এই ইচ্ছা, যে তোমার রক্তসিক্ত মুখপানে চাহিয়া আমি যেন সকল লোভ, ক্লেশ, ঘৃণা, শোক, বহন করিতে পারি।"

এই পত্রে তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা শুধু মুখের ভাষা নয়, নিজ জীবনে তাহা অনুভব এবং উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার নাম আজ প্রাতঃস্মরণীয় এবং তাঁহার জীবন ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের আদর্শস্থল হইয়া রহিয়াছে।

ম্যাডাম্ গ্যাঁয়োকে অতঃপর ভগবদ্ভক্তির পরীক্ষা দিবার জন্য আরও কতকগুলি দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। ভগবান্ তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগের জীবন অধিকতর মিষ্ট করিবার জন্য, অধিক ভক্তি বিশ্বাসে সজ্জিত করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেন। যে সন্তান সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, যে তাঁহাতে সকলই অর্পণ করিতে পারে, সেই সন্তানই তাঁহার প্রিয়, সেই প্রিয় সন্তানই তাঁহার অমৃত লাভের অধিকারী হয়। সেই অমৃতের অধিকারী করিবার জন্য ভগবান্ গ্যাঁয়োকে কঠোর পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিলেন। এক্ষণে তাহার দুইটি পুত্র; জ্যেষ্ঠটি শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর কৃপায় মাতার প্রতি বিমুখ, সুতরাং তাঁহার স্নেহ প্রধান ভাবে কনিষ্ঠ পুত্রের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অমানুষিক ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া এই শিশুটীকে তিনি আকুল স্নেহের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিলেন। ভগবান্ কিন্তু তাহা সহিতে পারিলেন না। এই পুত্রটীকে তিনি ব্যথিতা জননীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইলেন। ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন, "এই আঘাত আমার পক্ষে একবারে মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল; আমি প্রথমে ইহাতে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান আঘাত দিয়াছিলেন, আমার এই দুর্ব্বলতার সময়ে তিনিই শক্তি প্রদান করিলেন। আমি আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম, এবং তাহার মৃত্যুতে যদিও আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে ভগবানের হাত দেখিয়া আমি অশ্রুবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিলাম না। আমি তাহাকে ঈশ্বরের নিকট ধরিয়া বলিলাম :—"The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be His name!" "ঈশ্বর দিয়াছিলেন, তাঁহার দান তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারই নাম জয়যুক্ত হউক।"

ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা এবং তাঁহার একমাত্র কন্যা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া যান। এই কন্যা অবিকল মাতারই অনুরূপ ছিল। মাতা লিখিয়াছেন,—"আমি তাহাকে সময়ে সময়ে কোন জনশূন্য স্থানে প্রার্থনা করিতে বসিতে দেখিতাম। আমি

যখনই প্রার্থনা করিতাম, তখনই সে আমার সহিত প্রার্থনায় যোগদান করিত; এবং যদি আমি তাহাকে না লইয়া একা প্রার্থনা করিতাম, তাহা হইলে সে নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া, আমার নিকটে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিত, "মা, মা, তুমি প্রার্থনা করিতেছ, আমি ত তাঁহার নাম করিতেছি না!" এবং যখন সে আমাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ দেখিত, তখন আমার নিকট একবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "মা তুমি ঘুমাইতেছ?" কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিত, "না, তুমি আমাদের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছ।" এই কথা বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিত।

এই সকল পারিবারিক দুর্ঘটনা ব্যতীত ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবনে আর একবার অবসাদ আসে। দীর্ঘ-সাত বৎসর কাল তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সন্দেহের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; এই সংগ্রাম ভগবানকে তাঁহার নিকট অধিকতর উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত করিয়া তুলিল। এই সাত বৎসর কাল তাঁহার মন ধর্ম্মের আনন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ও আশা ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই।

তাঁহার এই অবসাদের অবস্থায় একবার তাঁহাকে পাপের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল; কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি শীঘ্রই উহা হইতে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরে তিনি জীবনের এই অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লিখিয়াছেন:—"হে পরম পবিত্র ঈশ্বর, যে তোমা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা রক্ষিত হইতে পারিত না, সেই তুমিই আমার মুক্তির জন্য তখন আসিয়াছিলে। সকল প্রকার কষ্টের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া আমি অবশেষে নিরাশ হইয়াছিলাম। ঘোরা রজনীর তমঃ আমার আত্মাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। আমার বোধ হইল ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাব কৃপার জয় হউক, আমার হৃদয় তাঁহার পদতলে আত্মসমর্পণ করিয়া লুটাইয়া পড়িল। যদিও আমি ভাবিলাম যে আমি একেবারে গিয়াছি, কিন্তু আমার প্রেম তখনও সজাগ ছিল।"

তাঁহার এ সন্দেহের অবস্থা আর থাকিল না; মুক্তির দিন আসিল। গ্যঁয়ো তাঁহার গুরু ফাদার লা কম্বকে (Father La Combe) তাঁহার সন্দেহ এবং ভীতির কারণ সমূহ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার চিঠি পাইয়া তিনি লিখিতেছেন, "ফাদার লা কম্বের প্রথম পত্র পাওয়া অবধি আমি নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলাম।" তাঁহার পত্র গ্যাঁয়োকে পুনর্জীবন দান করিয়াছিল; সেই হইতে তিনি আর কখনও হতাশ হন নাই, বা কখনও দুঃখের ভারে অবসন্ন হন নাই। তিনি বলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম, যে আমি চিরকালের জন্য ঈশ্বরকে হারাইয়াছি, কিন্তু আমি পুনরায় তাঁহাকে পাইলাম এবং তিনি অধিকতর জ্যোতিষ্মান হইয়া অধিকতর শুদ্ধরূপে আমার আত্মায় ফিরিয়া আসিলেন। ভগবান্ যাহা লইয়াছিলেন, তাহার বহু গুণ প্রেম তিনি আমাকে দান করিলেন। হে আমার ঈশ্বর! আমি তোমাতেই সকল পাইয়াছি; যে শান্তি আমি এখন অনুভব করিতেছি তাহা পবিত্র, স্বর্গীয় ও অব্যক্ত। যাহা আমার ছিল, তাহা কেবলমাত্র সান্ত্বনা, ও শান্তি; কিন্তু এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছার সহিত এক হইয়া, আমি আমার সান্ত্বনা-দাতাকেও পাইতেছি; কেবল শান্তি পাইতেছি তাহা নহে, শান্তিদাতাকেও পাইয়াছি। এই পরম শান্তি আমার সকল কষ্টের অবসান করিল, কিন্তু এক্ষণে কেবলমাত্র শান্তির উৎস আরম্ভ হইল!

"আমি সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতাম, যে পাছে জীবনের পূর্ব্বগতি পুনরায় ফিরিয়া আসে, এবং সেই জন্য সর্ব্বদা সজাগ অন্তঃকরণে থাকিতাম। আমি জাগিয়া থাকিতাম, এবং ঈশ্বরের কৃপায় পাপসমূহ আমার নিকট আসিতে পারিত না। ঈশ্বরই আমাকে নূতন সত্য জীবন দিবেন বলিয়া আমাকে কষ্ট দিয়াছিলেন, তাহা পাইলাম।"

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে গ্যাঁয়োর স্বামী ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর মাত্র; তখন তাঁহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা বর্ত্তমান।

ভগবান্ মঙ্গলময়। তিনি যাহা করেন তাহা মানবের মঙ্গলেরই জন্য। স্বামীর মৃত্যুতে গ্যাঁয়োর

জীবন আরও উন্মুক্ত হইল; এবং তাঁহার বিবেকের আজ্ঞানুসারে তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট অনেক বিবাহের প্রস্তাব আসিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়চিত্তে সে সকল প্রত্যাখ্যান করিলেন। যখন তিনি এইরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি মানবের সেবা করিয়া তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে মনস্থ করিলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সেবাকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রচুর অর্থ দরিদ্রকে দান করিয়াছিলেন। নিজ হস্তে দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়া তাঁহার অতুল আনন্দের বিষয় ছিল। তিনি বলেন,—"পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা দিতে এবং তাহাদের শয্যা প্রস্তুত করিবার জন্য আমি সর্ব্বদা তাহাদের নিকট গমন করিতাম। আমি প্রলেপ লাগাইতাম, ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া পুনরায় বন্ধন করিয়া দিতাম। মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করিবার ব্যয় আমি সময় সময় নির্ব্বাহ করিতাম, এবং কখনও কখনও গুপ্তভাবে ব্যবসায়ী এবং শিল্পীদিগকে, যাহাতে তাহারা ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে পারে সেই জন্য সাহায্য করিতাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নারীদিগের উপানৎ ব্যবহার।

আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকগণের জুতা ব্যবহার সম্বন্ধে আমি মনে মনে অনেক দিন হইতেই আলোচনা করিয়া আসিতেছি, এবং তাহাদিগকে কেন জুতা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না, তাহা ভাবিয়া ও আমাদের সামাজিকগণের, বিশেষতঃ আমাদের আধুনিক শিক্ষাভিমানীদিগের এতৎবিষয়ে নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। অবশ্য এসব কথা আমাদের হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। বর্ত্তমানে নিজের নাপিত, ধোপা, চাকর ঠাকুর (পাচক) এমন কি মেথর পর্য্যন্ত জুতা ব্যবহার করিয়া নিজেদের গৃহিনীগণের সাক্ষাতে বাহাদুরী করিতেছে; কিন্তু যাঁকে নিজের সহধর্ম্মিনী না হইলেও অন্ততঃ সঙ্গিনী বলিয়া মনে করা হয়, তিনি নগ্নপদে ঐসব চাকরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজ পদযুগলের ধুলিপটল দ্বারা আপন বিছানা সমাচ্ছাদিত করিয়া আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। স্ত্রীলোকগণকে যদি আমরা এতই হেয় বলিয়া মনে করি তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গ আমাদের চিরকালের তরে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে যাহাতে সর্ব্ব প্রকারে আমাদের সহধর্ম্মিনী ও সঙ্গিনী করিতে পারি, তাহাই আমাদের করা উ ত।

আমাদের নিজেদের রাজকার্য্য ব্যপদেশ ব্যতীতও হ্যাট কোট ইত্যাদি ব্যবহার করিতে কোন বাধা হইতেছে না; আর অতি আবশ্যকীয় স্থলেও সেই আমরাই আমাদের সহধর্ম্মিনী বা সঙ্গিনীগণকে জুতা ব্যবহার করিতে দিতেও অসম্মত। ইহা আমাদের নৈতিক সাহসও কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল!

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা জগদীশ্বরী দেবী লিখিত ১৩১৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের "ভারত মহিলা" পত্রিকায় প্রকাশিত "প্রাচীন ভারতে নারীগণের উপানদ ব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধ দৃষ্টে আমার পূর্ব্বমনোগত ভাব জাগরিত হওয়ায় আমি এ কথাগুলি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তিনি একজন হিন্দুসমাজের প্রধান পণ্ডিতের পত্নী হইয়াও এরূপ স্বাধীন ভাবে নিজের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া বড়ই আনন্দ বোধ করিয়াছি। অবশ্য তিনি যে কারণে ভারতীয় মহিলাগণের নগ্নপদে থাকার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াছেন, তাহাতে কেহই একমত হইবেন না। আমার বোধ হয় উত্তপ্ত জল বায়ু ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ভারতের অধোগতির সঙ্গে ভারতীয় ললনাগণের সামাজিক অবস্থার (status) হেয়তা যোগ হইয়া এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে যে নারীগণ উপানৎ ব্যবহার করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্তা জগদীশ্বরী দেবী মহাশয়ার উপরোক্ত প্রবন্ধে তাহার কয়েকটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখান হইয়াছে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের আদ্য শ্রাদ্ধেও খড়ম জুতা প্রভৃতি দান করার প্রথা, এবং শাস্ত্রে কুত্রাপি

স্ত্রীলোকের উপানদ ব্যবহার বিষয়ে নিষেধ না থাকাই ইহার প্রমাণ। পুরাকালে যখন রাণীগণ নিজ নিজ স্বামীর সঙ্গে রাজসভায় উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহারা নগ্নপদে যাইতেন বলিয়া অনুমান করা যুক্তি যুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান অবস্থানুসারে শাস্ত্রে নিষেধাভাব দৃষ্টে আমাদের হিন্দুসমাজের স্ত্রীলোকগণের উপানদ ব্যবহারে কোনও বাধা দেখা যাইতেছে না। তবে সমাজে হঠাৎ কোনও নূতন বিষয়ের প্রচলনে ব্রতী হইতে হইলে একটু নৈতিক বলের প্রয়োজন। অতএব যাহাতে আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকগণ আবশ্যকীয় স্থলে জুতা ব্যবহার করিতে পারেন সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিয়াও কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ না করিতে পারিলে শিক্ষার বিশেষ কোন সফলতা দৃষ্ট হয় না।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী চৌধুরী।

সুজাতা।

১

মিলায় অম্বর-কোলে তারা অগণন
পূর্ব্বাকাশ বিরঞ্জিত সুবর্ণ-বিভায়;
অঞ্চলে কুড়ায়ে ল'য়ে ছড়ান রতন
নিশিথিনী ধীরে যেন লইছে বিদায়।

২

'সেনানী' গ্রামের পাশে শ্যাম অরণ্যানী
নীড়ে নীড়ে জাগরিত বিহঙ্গনিকর;
স্নিগ্ধ বায়ু ব'য়ে আনে কার পুণ্য-বাণী,
প্রফুল্ল প্রসূন রচে অঞ্জলি সুন্দর।

৩

সুব্রতা সুজাতা দেবী সখিগণ সাথে
হর্ষ ভরে ঊষা-স্নান করি সমাপন,
দেখা দিলা ভোজ্যপূর্ণ স্বর্ণ-থালি হাতে
বন-দেবতায় সুখে করিতে পূজন।

৪

দিগ্-বধূ পরিবৃতা বিশ্ব-রমা ঊষা
অকস্মাৎ বিশ্বে যেন পাইল প্রকাশ;
তৃণ-শীর্ষে মুক্তা-বিন্দু ক্ষণে তৃপ্ত তৃষা
ও রাতুল পদাম্বুজ-ধূলি করি নাশ।

৫

সবার অজ্ঞাতে সেথা বোধিদ্রুম তলে
মুক্তি-পথান্বেষী শাক্য মহা ধ্যানে রত;
সৌম্য মূর্ত্তি বালার্কের দিব্য প্রভা ঝলে
করুণা-কল্যাণ-ছায়া সে আস্যে সতত।

৬

বিস্মিতা সুজাতা নমি ভক্তি-নম্র-শিরে
আরাধ্য-দেবতা-ভ্রমে কন মৃদু ভাষে,—
"হে দেব! সুপুত্র-রত্ন দিয়া এ দাসীরে
পূরিলে সকল প্রাণ কি নবীন আশে!

৭

"কত দিবসের সাধ সার্থক আমার
প্রভু তুমি, কৃপাময় বাঞ্ছা-কল্প-তরু;
তোমারি আশীষে আজি নন্দন সংসার,
শিশু-শূন্য এত কাল ছিল যাহা মরু।

৮

"বৎস মোর মাসত্রয়ে পদার্পিল আজি,
আসিনু অর্পিতে তোমা 'মানসিক' মম,
করুণা-কটাক্ষপাতে বন-দেবরাজ,
লহ তাই আশীষিয়া সুতে নিরুপম।"

৯

এত কহি ভোজ্যপূর্ণ কাঞ্চনের থালা
শাক্যের চরণ-প্রান্তে করিলা স্থাপন;
বিধি মতে মন্ত্রোচ্চারি' উৎসর্গিলা বালা
বিকচ কুসুম পুঞ্জে করিয়া অর্চ্চন।

১০

সহসা টুটিল ধ্যান, স্তিমিত নয়ন
মেলিয়া হেরিলা শাক্য সুজাতার পানে,
মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া গেল নিখিল বেদন
কি অমৃত বরষিল সকল পরাণে!

১১

"হে রমণী, নহি আমি অরণ্য-দেবতা",
শাক্যসিংহ ধীর-কণ্ঠে কন স্মিত মুখে—
"আমি শুধু খুঁজিতেছি নির্ব্বাণ-বারতা
নিবারিতে জগতের দুর্নিবার দুখে।

১২

"নিয়ে যাও ভোজ্য তব অভীষ্টের পাশ,
মোরে দাও করিবারে নির্জ্জন সাধন,
দেখি সিদ্ধ হয় কি না আজন্মের আশ
শাশ্বত মুক্তির পথ করি নিরূপণ।"

১৩

"তোমারেই জানিয়াছি উপাস্য আমার",
কৃতাঞ্জলিপুটে বামা করে নিবেদন,—
"হে বরেণ্য, তব যোগ্য এই উপহার,
তুমি শুধু দয়া করে করগো গ্রহণ।"

১৪

"করিয়াছি পণ আমি", কন শাক্যবীর
করুণার মহোদধি—মঙ্গল-কেতন—
"এই যোগাসনে রব শৈল হেন স্থির
যতদিন নাহি হয় ব্রত উদ্‌যাপন।

১৫

"একান্তই বাঞ্ছা যদি তব হে কল্যাণী,
পরমান্ন তুলে দাও মোর ওষ্ঠাধরে;
করিতেছি আশীর্ব্বাদ সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
হইবে বিনষ্ট তব বিশ্বের ভিতরে।"

১৬

আনন্দে উথলে হৃদি, হর্ষে আঁখি-জল
মুছিয়া অঞ্চল-কোণে সুজাতা তখন,
আবার বন্দিয়া শাক্য চরণ-কমল
করান সে নর-দেবে মিষ্টান্ন ভোজন।

১৭

সে নিমেষে নব ভাব জাগে ধরিত্রীর
তরুণ অরুণ ঢালে নব রশ্মি-ধারা;
গাহে পাখী, বহে বায়ু সাধ্বী রমণীর
ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-প্রেমে হ'য়ে আত্ম-হারা।

১৮

তার পর কত দিন—কত মাস বুঝি—
একটী দিবস কভু হয় নাই ভুল,
সুজাতা স্বহস্তে নিত্য শাক্যদেবে পূজি
সমর্পেন পরমান্ন যতনে অতুল!

১৯

সখিবৃন্দ একে একে নাহি আসে আর
অন্ধ নর শ্লেষ-বাক্যে করে কানাকানি;
নিঃশব্দে পালেন সতী ব্রত আপনার
অপার্থিব মায়া-মাখা সারা হৃদি খানি।

২০

আচম্বিতে একদিন পূত শুভক্ষণে
লভিলেন শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব মহান্;—
শূন্য সেনানীর বন, সজল নয়নে
সুজাতা সিদ্ধার্থে দিলা বিশ্ব-জনে দান! *

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

জাপানের স্ত্রীজাতির রীতিনীতি।

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া জাপান পৃথিবীর মধ্যে প্রখ্যাতনামা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের নারীগণ কি প্রকার রীতিনীতি অনুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা অবগত হইবার জন্য অবশ্য অনেকেই কুতূহলী হইবেন, সন্দেহ নাই। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদান করিব।

জাপানের মহিলাগণের চিত্র দর্শন করিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছে, তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসিনী এবং জাঁকজমক-প্রিয়া। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে "প্রজাপতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রজাপতির ন্যায় তথাকার ললনাগণ সাজ সজ্জায় বিভূষিতা থাকেন এবং তাঁহারা

---

* সাধ্বী সুজাতা দেবীর সহগামিনী সহচরীগণের নাম যথাক্রমে বলগুপ্তা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, বিজয়সেনা কমলা, সুন্দরী, কুম্ভকারী, উল্লবিল্লিকা এবং জটিলিকা। বুদ্ধদেবের তপস্যার সময় ইঁহারাও তাঁহার আহার যোগাইতেন, পরিশেষে একমাত্র সুজাতা দেবীই নিত্য তাঁহাকে অন্ন, মধু ও পায়স ভোজন করাইতেন।—লেখক।

অত্যন্ত চঞ্চলমনা। যদি কাহারও এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে তবে তিনি বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে। লোকে সাধারণতঃ উৎসবাদিতে এবং ফটো প্রভৃতি তুলিবার সময় উত্তম বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া থাকে। সুতরাং জাপানী মহিলাগণের ফটো বা ছবি দেখিয়া তাহাদের সামাজিক রীতি নীতির পর্য্যালোচনা করিতে গেলে ভ্রান্তিতে পড়িতে হইবে, সন্দেহ নাই। জাপ-ললনাগণের হৃদয় যে কত উদার তাহার প্রমাণ রুষ ও জাপানের যুদ্ধে বহুল পরিমাণে সকলেই অবগত হইয়াছেন; অতএব সে সমুদায়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বয়সের সম্মান।

জাপানবাসী মহিলাগণ জনক জননীর নিকট সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বহু বিষয়ে অভিজ্ঞা হইয়া থাকেন। তাঁহারা অত্যন্ত সহনশীলা, কোন বিষয়েই হঠাৎ তাঁহারা মস্তক বিকৃতি বা ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ করেন না। পূজনীয়দিগকে তাঁহারা যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকেন, আত্মীয় স্বজন ভিন্ন অপর কোন বয়োবৃদ্ধ নরনারী ভবনে সমাগত হইলে অতি সমাদরে তাঁহাদের অভাব পূরণে যত্নবতী হয়েন। এমত কোন স্ত্রীলোকই তথায় দৃষ্ট হয় না, যিনি বয়োবৃদ্ধগণকে সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করেন। তাঁহাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য পূজার্হগণের নিকট বশ্যতা, উৎফুল্লতা এবং তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বপ্রকার সাধুব্যবহার। তাঁহারা বলেন, যদি পিতামাতা স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের নিকট অবাধ্যতা ও বিমর্ষভাব প্রদর্শিত হইল তাহা হইলে সে ললনার জীবন ধারণে ফল কি! আমাদের দেশে কিন্তু এই মহান্ স্বর্গীয় ভাবটি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। জাপকুলবালাগণ সমাজকে বিলক্ষণ সম্মান করিয়া চলেন। নক্স সাহেবের বিবরণীর উপর আমরা আদবেই আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। তিনি কি বলিতেছেন শুনুনঃ—

"The great blot on the social structure of Japan is its treatment of women We do not mean that there are not happy wives and honoured mothers and carefully nourished daughters, for there are many such, but woman's status is Asiatic." অর্থাৎ "জাপানবাসীগণ স্ত্রীলোকের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, এইটি তাহাদের সমাজের কলঙ্ক। তিনি আবার বলিতেছেন, "তাই বলিয়া আমি এ কথা বলিতে পারি না, যে তাহাদের মধ্যে সুখী স্ত্রী, সম্মানিতা জননী, যত্নে লালিতা পালিতা দুহিতা তথায় যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? তাঁহারা (কামিনীগণ) যে এসিয়া মহাদেশের স্ত্রীজাতির উপযোগী পদবীতে অধিরূঢ়া!" এই বক্তব্য দ্বারাই তাঁহার রুচির যথেষ্ট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। নক্স সাহেব বলিতেছেন "Woman's status is Asiatic" সে কথার আমরাও অনুমোদন করি। এসিয়ার লোকের নিকট ইউরোপ, আমেরিকা অথবা অপর কোন মহাদেশের ন্যায় ব্যবহার কোনপ্রকারেই আশা করা যাইতে পারে না।

প্রাচ্যজগতের সর্ব্বত্রই কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই প্রকার ব্যবহার যে কেবল পিতামাতার প্রতিই সন্তানগণ করিয়া থাকে, তাহা নহে। জাপান-সাম্রাজ্যেও আমাদের ভারতবর্ষের ন্যায় কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। জাপানে বালিকাগণকে অতি শৈশবে এই প্রকার সম্মান করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা তাহাদের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষণীয় বিষয়। বালিকাগণ বিনা আপত্তিতে পূজনীয়গণের আদেশ ন্যায় অন্যায় বিবেচনাশূন্য হইয়া পালন করিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠা ভগিনী সকল কার্য্যে কনিষ্ঠার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, এবং তাহাকে (জ্যেষ্ঠাকে) আমাদের দেশে যে প্রকার "বড়দিদি" প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে জাপানেও তত্তুল্য বিশেষ সম্বোধন প্রচলিত আছে। অতঃপর বালিকাকে গৃহস্থালী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। উক্ত কার্য্যাদি সম্পাদনে তাহারা কোন প্রকারেই ভৃত্যগণের উপর নির্ভর করে না। তাহাকে রন্ধনকার্য্য এবং গৃহমধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যত প্রকার কার্য্য হইতে পারে তৎসমুদায়, গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি বহু কষ্টসাধ্য কার্য্যে নফরের ন্যায় নিযুক্ত থাকিতে হয়। পিতা যদি কোন

ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেন এবং আগন্তুকের জন্য অপেক্ষায় থাকেন তখন জাপবালিকা তাহার পিতার পাশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকে। আগন্তুক আসিলে বালিকা পিতার হস্তে খাদ্যের রেকাবী গুলি তুলিয়া দেয়। জলের অভাব হইলে পানীয় দ্বারা গ্লাস পূর্ণ করিয়া রাখে। এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে বালিকাগণ সম্মানের লাঘব বিবেচনা করে না। তাহারা এই কার্য্য উৎফুল্লান্তঃকরণে সম্পন্ন করিতে পারিলে বিশেষ পরিতুষ্ট হয়।

বালিকাগণ কাপড় ধৌত করিতে শিক্ষা করে। তাহারা রজককে বিশ্বাস করে না। এই কার্য্যে তাহারা সতত শীতল জল ব্যবহার করে এবং ভুলিয়াও কখনও সাবান ব্যবহার করে না। তাহারা রেশমী এবং তুলার বস্ত্র "ইস্ত্রী" না করিয়া উহা একখণ্ড মসৃণ কাষ্ঠফলকের উপর পিটিতে থাকে। তাহাতে ধুতি শুষ্ক হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয়।* তাহাদিগের ছবি বা অপর কোন গৃহসজ্জাদি পরিষ্কার করিতে হয় না। তাহারা বাহির বারান্দা হস্তদ্বারা পরিষ্কার করে। প্রাতঃকালে গদি গুটাইয়া, মশারী তুলিয়া রাখে। পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন, এই সকল কার্য্য ইতর লোকের বালিকাগণ দ্বারাই সাধিত হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। ধনী, দরিদ্র সকল শ্রেণীর বালিকাগণই এসব কাজ করিয়া থাকে। রাজবংশ ভিন্ন সকল শ্রেণীর বালিকাগণকেই দৈনিক গৃহস্থালীর কার্য্য আবশ্যক মত সম্পন্ন করিতে হয়। এই প্রকারে জাপবালিকাগণ সকল কার্য্যেই অভ্যস্তা হইয়া পড়ে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগণপতি রায়।

আমার গোয়েন্দাগিরি।

আনন্দে মনটা বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আমার বন্ধু লাহোরের পুলিস ইন্‌স্পেক্টর একটু আড়ালে ডাকিয়া আমাকে বলিলেন, "মাধবলাল, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ডিটেক্‌টিভগিরির অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করিবার অতি সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।' এই চুরির খবর অবশ্যই তুমি শুনিয়াছ, মিলিটারী গেজেট ও ট্রিবিউন দুই কাগজেই ইহার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে। এখন কাজে লাগিয়া যাও, চোর ধর। বিশেষ পুরস্কার পাইবে। আমি ভুল করিলাম, তুমি টাকা চাও না, তুমি চাও যশঃ। ওকি, লজ্জিত হও কেন? লজ্জার কথা কি আছে? চেষ্টা কর। কিন্তু মনে রাখিও, চোর ধরিতে গিয়া ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি অধিক খাটাইও না। এখন বিদায়, নমস্কার!"

দুই দিন হইল, রাত্রি প্রায় দশটার সময় লাহোরের একজন ধনবান ব্যবসায়ী, সহরের অপেক্ষাকৃত এক নির্জ্জন অংশ দিয়া গাড়ী চড়িয়া অনেকগুলি টাকা লইয়া যাইতেছিলেন। গাড়ীর দুই দিকের দরজা দিয়া দুই জন লোক এক সঙ্গে লাফাইয়া চলন্ত গাড়ীতে উঠে, এবং একজন সেই বণিকের মুখে কাপড় গুঁজিয়া ধরে এবং আর একজন তাঁহার এক থলে টাকা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লয়। তারপর দুজনে মিলিয়া বেশ শক্ত করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া গাড়ীতে ফেলিয়া পলায়ন করে। গারোয়ানটী ছিল বৃদ্ধ, কালা। চোরদিগের সহিত বণিকের ধ্বস্তাধস্তিতে গাড়ীতে যে ঝাকুনি লাগিয়াছিল, সে মনে করিয়াছিল তাহা রাস্তার বন্ধুরতারই জন্য। বণিকের মুখ এমনই করিয়া তাহারা বন্ধ করিয়াছিল যে, তিনি ত কোন শব্দই করিতে পারেন নাই, করিলেও কালা কেমন করিয়া তাহা শুনিবে? বণিক ভাল করিয়া চোর দুজনের চেহারাও দেখিতে পান নাই, তিনি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিয়াছিলেন, যে তাহাদের উভয়েরই চেহারা কৃশ ও দীর্ঘ।

আমি এখন কি করি? রেলওয়ে ষ্টেশনে আমার সহিত ইনস্পেক্টরের কথা হয়, আমি কার্য্যোপলক্ষে দ--- সহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ষ্টেশনে আসিয়াছি। গাড়ী আসিবার আর বিলম্ব নাই। আমি ওকালতী করিতাম, কিন্তু ওকালতী আমার ভাল লাগিত না। আমার মনে হইত, ওকালতি করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেন নাই, ডিটেক্‌টিভগিরি করিয়া সংসারের পাপভার একটু দমন করিবার জন্যই তিনি আমাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়াছেন। ডিটেক্‌টিভের কার্য্যে আমার যে স্বাভাবিক একটা দক্ষতা আছে আমি সর্ব্বদাই তাহা অনুভব করিতাম, কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের নিকটও তাহা

অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। আজ বাস্তবিকই মস্ত এক সুযোগ উপস্থিত।

ট্রেইন ষ্টেশনে পৌঁছিল। সেই ষ্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করে, সুতরাং গাড়ী চড়িয়াও অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। প্ল্যাটফরমে আজ অনেক লোক, তন্মধ্যে অনেক পুলিস কর্ম্মচারী। তীব্রদৃষ্টিতে তাহারা যাত্রীদিগকে দেখিতেছে। আমি মনে করিতে লাগিলাম, "বেশ বাহাদুর পুলিস বটে! এইরূপেই চোর ধরিতে হয়! চোর যদি গাড়ীতে থাকে তবেও কি তাহাকে ধরিবার উপায় এই!" ইচ্ছা হইতেছিল, একবার গিয়া উপস্থিত প্রধান পুলিস-কর্ম্মচারীটাকে বলি যে, তিনি চোর ধরিবার বিশেষ বাধা জন্মাইতেছেন মাত্র। যা হোক, অবশেষে ঘোড়ার চিহি চিহি শব্দের মত চীৎকার করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমি হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এই দিকের রাস্তা আমার পরিচিত, অনেক বার এইপথে যাতায়াত করিয়াছি। দেখিবার মত কিছুই নাই। আমি একখানি ডিটেক্‌টিভের গল্পের বই খুলিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইলাম। পুস্তকখানি আগেই অনেকটা পড়া হইয়া গিয়াছিল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করিয়া ফেলিলাম। পুস্তকোল্লিখিত সুচতুর ডিটেক্‌টিভের বুদ্ধি-চাতুর্য্যের বিষয় আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ঘটনা-চক্রও তাহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল। নতুবা শুধু বুদ্ধিবলে তিনি ঘটনার কোন কিনারা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। আহা! দৈব যদি অনুকূল হইয়া আমাকেও সাহায্য করে, তবে কি মজাই হয়! ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া মাথা বাড়াইয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কি ভীষণ গরম! বেলা প্রায় দশটা। প্রখর সূর্য্যোত্তাপে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। আরোহীগণ কেহই গাড়ী হইতে মস্তক বাহির করিতেছে না। শুধু কোন কোন জানালা দিয়া কখন কখন দু এক খানা হাত বাহির হইতেছে। হঠাৎ এক খানা হস্তের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইল। একখানা দীর্ঘ কৃশ হস্ত নাড়িয়া নাড়িয়া কি জানি ইঙ্গিত করিতেছে। একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলাম, কালা-বোবাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় হাত বলিল, "এসো, নিরাপদ।" আমি এই সাঙ্কেতিক ভাষা জানিতাম, সমস্তই বুঝিলাম। হস্ত ভিতরে অপসৃত হইল, আমি মুখ বাড়াইয়া সেই গাড়ী খানি আমার গাড়ী হইতে কয় দরজা পরে আছে, দেখিয়া লইলাম।

উত্তেজনায় আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। অবশেষে কি যে অনুকূল ঘটনার জন্য আমি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম তাহাই উপস্থিত হইল? আমার সে সময়ের মনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। চোরকে যে পাইয়াছি সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আমি যেন কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলাম না। তারপর এক ষ্টেসনে গাড়ী থামিল। আমি সংযত হইয়া ধীরে ধীরে সেই চিহ্নিত কামরায় প্রবেশ করিলাম। সেই কামরায় একজন মাত্র আরোহী, তাহার আকার সুদীর্ঘ, পোষাক শুভ্র, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী। অল্পক্ষণ পরে আর একজন দীর্ঘাকার পুরুষ সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই আমাকে দেখিয়া সে যেন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া সেই লোকটার পাশে বসিল। তাহারা কোন কথাবার্ত্তা কহিল না, কিন্তু আমি বেশ বুঝিলাম যে তাহারা পরস্পরের নিকট পরিচিত। তাহাদের প্রথম দৃষ্টিতেই আমি তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তারপর আবার দ্বার খুলিয়া আর একজন লোক সেই কামরায় প্রবেশ করিল। এই লোকটা বেঁটে এবং হৃষ্টপুষ্ট, সবল। এই লোকটীকে দেখিয়া আমি বিরক্ত হইলাম, কারণ, ইহার আগমনে আমার পর্য্যবেক্ষণের অনেক বাধা হইতে পারে। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি পাঠে মগ্ন আছি, এই ভাবে পুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আড় চক্ষে সন্দিগ্ধ আরোহীদ্বয়ের প্রতি চাহিতে লাগিলাম। নবাগতদ্বয় খবরের কাগজ খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রথম আরোহী নীরবে এক কোণে বসিয়া রহিল। গাড়ীর ভিতর অসহ্য গরম বোধ হইতে লাগিল। আমার মুখে ঝর ঝর করিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। আমি আড় চক্ষে চাহিয়া দেখিলাম, তৃতীয় ব্যক্তিও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম আরোহী রুমালে মুখ মুছিল, সেই ঘর্ম্মসিক্ত রুমালের দিকে চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল,

আমিও চমকিত হইলাম। একি! তাহার রুমালে একি রং? সেকি মুখে কোন কৃত্রিম রং মাখাইয়াছে? সে তাড়াতাড়ি রুমাল লুকাইয়া ফেলিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যস্ততায় তাহার পাগড়ী খুলিয়া পড়িল। একি! এযে রমণীর সুদীর্ঘ কেশরাশি! পাগড়ীর নীচে ঠিক স্ত্রীলোকেরই ন্যায় সিঁথি! আমার মাথার মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের স্রোত বহিয়া গেল। এযে পুরুষবেশী নারী! এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোরের একজন সহযোগী! বণিকের বর্ণনার সহিত ইহাদের আকৃতিও মিলিতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আরোহীর মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। ছদ্মবেশী স্ত্রীলোকের দৃষ্টি ভীতিপূর্ণ, দ্বিতীয় আরোহীর দৃষ্টি সান্ত্বনা ও সাহসপ্রদ। তাহার দৃষ্টিতে সাহস পাইয়া প্রথম আরোহী তাহার পাগড়ী আবার বাঁধিয়া লইল। পরবর্ত্তী ষ্টেসনে যখন গাড়ী দাঁড়াইল তখন একটা ব্যাগ হাতে করিয়া প্রথম আরোহী নামিয়া গেল। এক গ্লাস জল আনিবার ছলে গাড়ী হইতে নামিলাম। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সেই ছদ্মবেশী স্ত্রীলোকটী একটা কামরায় বসিয়া রহিয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী আবার ছাড়িয়া দিল। আমরা আবার যার তার পাঠে মনোযোগ দিলাম। পরবর্ত্তী ষ্টেসনে দ্বিতীয় আরোহী গাড়ী হইতে নামিল এবং ষ্টেসন গৃহের অভিমুখে চলিল। তাহার পশ্চাদনুসরণ করিব কি না করিব ভাবিতেছি, এমন সময় আমি আমার স্কন্ধদেশে কাহার স্পর্শ অনুভব করিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম; সেই বেঁটে আরোহীটী কি যেন বলিবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করিতেছে। সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদের গতিবিধি কি সন্দেহাত্মক নয়?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

"আপনারই মত একজন মানুষ—সন্দিগ্ধ দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঐ ব্যক্তি যে একজন স্ত্রীলোক আপনি কি তাহা লক্ষ্য করেন নাই?"

"হাঁ, চক্ষে দেখিয়া কে আর না বুঝিতে পারে?" এই লোকটাও সব দেখিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি আমার হিংসা হইল। তাহার সহিত এবিষয়ে আর কিছু বলিতে আমার ইচ্ছা হইল না। সে আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আপনি ইহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। ঐ পুরুষটী নিশ্চয়ই চোরদের একজন।"

আমি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে যে আমাকে বড় হুকুম করিতেছেন?"

"ইন্‌স্পেক্টর আপনাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন আমি তাহা শুনিয়াছি। আমিও আপনারই মতন একজন উমেদার ডিটেক্‌টিভ, আমাকেও তিনি উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন। আমরা সতীর্থ ভাই। আমার ভারও আপনার উপর দিতেছি। অন্য জরুরী কার্য্যে আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি। কাল বোধ হয় আপনার সঙ্গে আমার দ—ষ্টেসনে দেখা হবে। আপনি সেখানে যাবেন আমি জানি; আমিও সেখানে যাইতেছি। আপনার কোন ভয় নাই, প্রশংসা আপনিই পাইবেন, আমার তাহাতে কোন দাবী থাকিবে না।"

আমি তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া ষ্টেসনের দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, পুরুষটি বাহির হইয়া গেল। তার পর দেখিলাম, তাহার সহযোগী ছদ্মবেশী স্ত্রীলোকটীও বাহির হইল। তখন আমিও আমার গন্তব্য ষ্টেশনে না গিয়া এখানেই রহিয়া গেলাম এবং উহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলাম। সেই বেঁটে লোকটী আবার আমার পৃষ্ঠে হস্তস্পর্শ করিল, এবং বলিল, "বন্ধু, খুব সাবধান, দেখিবেন, যেন ইহারা দৃষ্টির বাহিরে না যায়। প্রশংসা আপনিই পাইবেন, নিশ্চয় জানিবেন আমার ইহাতে কোন অংশ থাকিবে না। কাল ১০টার সময় দ—ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইবে।" আমি হাসিয়া বিদায় হইলাম, খুসনাম যে আমারই হইবে, তাহার নয়—এ কথাটা সে না বলিলেও পারিত।

আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমার শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাহারা যেন নিশ্চিন্ত ভাবে পথ চলিতেছে, মনে যেন কোন উদ্বেগ নাই, গোপনের জন্য কোন চেষ্টা নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহ কেহ তাহাদিগকে নমস্কারও করিতে লাগিল। কি বিষম মানুষ! লোকের নিকট সুপরিচিত, সম্মানের পাত্র, অথচ ভিতরে ভিতরে এমন

হীন ব্যবহার, আস্ত ডাকাত। এ কথাও মনে হইতে লাগিল, যে বিখ্যাত দস্যুদল প্রদেশটাকে উচ্ছন্ন করিতেছে এ ব্যক্তি তাহাদেরই একজন। যদি ইহাদিগকে ধরিতে পারি তবে আমার কি ভাগ্য!

ক্রমে আমরা সহরের সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলাম। এমন সময় একখানি সুন্দর গাড়ী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহারা সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। সেখানে আর কোন গাড়ী ছিল না, সুতরাং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি তখন সমবেত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজনকে ঐ দুই ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "ইনি এখানকার একজন সর্ব্বজনবিদিত সম্মানিত লোক। আমরা তাঁহাকে 'সংস্কারক' বলিয়া ডাকি, তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক, নাম পণ্ডিত রামব্রত। সঙ্গীটী ইঁহার কোন বন্ধু হইবেন।"

'সর্ব্বজনবিদিত' কথাটী শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। ইনি যতটা বিদিত আছেন, তাহা ত শুধু এই সহরের মধ্যে, শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে আরও বিদিত হইবেন।

আমি আর বিলম্ব না করিয়া থানায় চলিয়া গেলাম। স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টরকে জানাইলাম, যে লাহোরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর আমার বন্ধু। আমার সন্দেহের কথা তাঁহাকে বলিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, "পণ্ডিত রামব্রত একজন শ্রদ্ধেয়-চরিত্র ব্যক্তি, তিনি চোর, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

আমি তখন ছদ্মবেশী স্ত্রীলোকটীর কথা বলিলাম। এ কথায় তিনি একটু চিন্তিত হইলেন; বলিলেন, "বুঝিতে পারিতেছি না।" আমার কথায় তাঁহার মনে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কতকটা প্রত্যয় জন্মিয়াছে দেখিয়া আমি প্রসন্ন হইলাম। তাঁহাকে বলিলাম, আমি কোন হোটেল হইতে চারিটী খাইয়া আসিতেছি। আপনারা আমার জন্য একটু অপেক্ষা করুন। বেশী তাড়াতাড়ি করিবার দরকার নাই। তাহারা স্থির হইয়া বাড়ীতে বসুক, হয়তঃ এক সঙ্গে আস্ত দলটাকেই ধরিতে পারিব।"

ইন্‌স্পেক্টর আমার কথায় একটু হাসিলেন, আমি সে হাসির অর্থ বুঝিলাম না। যা' হোক আহারান্তে ফিরিয়া আসিয়া আমি স্থানীয় পুলিসের সঙ্গে রামব্রতের বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাড়ীটী প্রকাণ্ড, সহরের অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অংশে অবস্থিত। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন সেখানে এক প্রকাণ্ড জনতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার প্রাপ্য প্রশংসা হইতে আমি বঞ্চিত হইব, ভাবিয়া মনটা দমিয়া গেল। পুলিস কি তবে ইতিমধ্যেই আসিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছে? তাহারা যে আমার জন্য অপেক্ষা করিবে বলিয়াছিল! জনতা ভেদ করিয়া আমরা দ্বিতলে আরোহণ করিলাম। সেখানে এক মহা কলহ বাঁধিয়া গিয়াছে। যে দ্বারের সম্মুখে লোকগুলি ঝুঁকিয়াছে তাহার অর্দ্ধেক খোলা। ঘরের মধ্যে রামব্রত বসিয়া আছে, তাহার পার্শ্বেই সেই ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক, এখন আর তাহার ছদ্মবেশ নাই। স্ত্রীলোকটী পরম সুন্দরী, তাহার মুখমণ্ডল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গাম্ভীর্য্যের পরিচায়ক। দ্বারদেশে সমবেত জনমণ্ডলী উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ। রামব্রত তাহাদিগের সহিত কথা বলিতেছিল, আমি তাহা শুনিয়া, বিস্ময়ে হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সে বলিল, "বন্ধুগণ, বেশী কথায় আর কাজ কি? তোমরা আমাদিগকে ধরিয়াছ—কিন্তু অসময়ে ধরিয়াছ। এখন ধরা পড়াকে আর ভয় করি না। আমরা এখন বিবাহিত। এ যখন বিধবা ছিল তখন তোমরা ইহার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছ, তোমরা তাহার কোন যত্নই করিতে না। এখন তোমাদের নিকট হইতে আমি ইহাকে নিয়া আসিয়াছি, তোমরা বিরক্ত হইতেছ কেন? তোমরা তাহাকে চাও না, তাহাকে তোমরা গলগ্রহস্বরূপ মনে কর। আমি ইঁহাকে চাই, ইহাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, ইহার চরিত্র ও জীবনের মর্য্যাদা বুঝি। তোমরা আমাদিগকে জাতিচ্যুত করিতে পার, আমি তাহার জন্য একটুও ভীত নই। এত দিন একাকী ছিলাম, এখন দুজনে মিলিয়া সংকল্পিত সংস্কারকার্য্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিব।"

রামব্রত থামিলেন। তাঁহার এই কয়টী কথার শক্তি

দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। কেহ তাঁহার কথায় বাধা দিতে সাহসী হইল না, সকলে শান্তভাবে তাঁহার কথা শুনিল। তিনি থামিলে সকলে কলরব করিয়া উঠিল। ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া আমার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "কি বলেন, ইহাকে গ্রেপ্তার করিব? আমি পূর্ব্বেই মনে করিয়াছিলাম এইরূপই একটা কিছু হইবে।"

"আপনি কেন তবে আমাকে তখন তাহা বলেন নাই?"

"দেখিলাম, আপনার অনুমান সম্বন্ধে আপনি দ্বিধা-শূন্য, আর বিষয়টা কি তাহা জানিতে আমারও কৌতুহল হইয়াছিল।"

"আচ্ছা এখন হাসিতেছেন, এক দিন আমার ক্ষমতাকে আপনার সম্মান করিতেই হইবে। আমি চোরকে নিশ্চয়ই ধরিব।" মস্তক উন্নত করিয়া আমি সেখান হইতে বাহির হইলাম, কিন্তু মন একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

একটু দূর গিয়াই হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়িল। এবার ঠিক হইয়াছে! আচ্ছা সেই বেঁটে বলবান লোকটী কে? সে নিশ্চয়ই চোর অথবা চোরের সাথী। সেই ত কৌশল করিয়া আমাকে প্রকৃত চোরের অনুসরণ হইতে ফিরাইয়াছে। নিশ্চয়ই সেই বেটা চোর! আমি কি নির্ব্বোধ! তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম! কিন্তু তাহাকে সন্দেহ করিবার ত কোন কারণ ছিল না। আচ্ছা সে ত কাল দ—ষ্টেসনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়াছিল। সে কি আর সেখানে যাইবে? যা হোক আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি না কেন?

পর দিন ১০টার কিছু পূর্ব্বে আমি দ—ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ব্যস্ত ভাবে আমি সেই লোকটীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। সে ষ্টেসনে উপস্থিত হইল এবং দূর হইতে আমাকে দেখিয়া হাত নাড়িয়া নিকটে ডাকিল। আমি সাগ্রহে তাহার নিকট গেলাম।

একটু বিদ্রূপের ভাবে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, আপনি চোর ধরিতে পারিয়াছেন ত?"

"হাঁ আমি ধরিতে পারিয়াছি অর্থাৎ প্রায় পারিয়াছি, কিছু এখনও বাকী আছে। তাহারা কোথায় আছে আমি খবর পাইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটু সাহায্য করিবেন? আমার সঙ্গে একটু আসিবেন?"

"আপনার সঙ্গে কোথায় যাইব? আমার একটা কথা শুনুন, আপনার আমার দুজনেরই উপকার হইবে",—সে আরো যেন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সম্মুখে কি যেন দেখিয়া হঠাৎ মৃদু চীৎকার করিয়া উঠিল এবং দৌড়িয়া আমার পার্শ্ব হইতে পলায়ন করিল। একখানা মাল গাড়ী সবে মাত্র চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে লাফাইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িল। তাহার পশ্চাতে আর এক জন লোক লাফ দিয়া সেই গাড়ীতে উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই আমি বুঝিতে পারিলাম, এই অনুসরণকারী আমার বন্ধু লাহোরের ইন্‌স্পেক্টার। চলন্ত গাড়ীতে আরোহণ রূপ রেলওয়ে আইনের এরূপ নিয়ম লঙ্ঘন ব্যাপারে ষ্টেসন-মাষ্টার এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি ব্যাপারটার অর্থ পরিষ্কার বুঝিতে না পারিয়া থতমত অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটি পরিচিত স্বর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবু মাধবলাল, আপনি একটু দেরী করিয়া আসিয়াছেন।" আমি ফিরিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বদিনের পরিচিত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। তিনি আরো বলিলেন, "আমরা কয়েক দিন যাবৎ লোকটার সন্ধানে ছিলাম, ভাগ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তাই সহজে তাহাকে ধরিতে পারিলাম। সে বেশ বুঝিয়াছিল, এ যাত্রা আর তার নিস্তার নাই, তাই আপনার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া সে হয়ত রাজার সাক্ষী হইবার যোগাড়ে ছিল। এখন আসি, বিদায়! আপনি হতাশ হইবেন না! লাহোরের ইন্‌স্পেক্টর আপনাকে বলিয়াছিলেন, চোর ধরিতে ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি বেশী খাটাইবেন না, সে কথাটা মনে রাখিবেন।"

আমি হতভম্ব হইয়া কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শ্রীচঞ্চলা গুপ্ত।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী।

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

তেজস্বিনী নারীর প্রতি।

হে নারি, তোমার যত দোষ ত্রুটি জানি,
অন্যায় দেখিলে গুরু লঘু নাহি মানি,
ক্রুদ্ধা সর্পিনীর মত রোষে বাক্য বিষ
দোষীর হৃদয়ে ঢেলে দেও অহর্নিশ।
ক্ষুদ্রতা যাহার চিত্তে, ঘৃণা তার তরে,
তার সাথে বাক্য বন্ধ কর দর্পভরে।
মুখে স্পষ্ট কথা, মনে নাহি কোন ভয়,
প্রাণের মিলন কারো সঙ্গে নাহি হয়।
বিপদেও কেহ যদি অনুগ্রহ করে,
বড় যেন ব্যথা পাও আপন অন্তরে।
বিরক্ত হইয়া সদা সবে বলে তাই,
এমন গর্ব্বিতা নারী কেহ দেখে নাই।
তবুও নিয়ত আমি শ্রদ্ধা করি মনে,
কে দেখেছে ক্ষুদ্র ভাব তোমার জীবনে ?
ন্যায় ও সত্যের প্রতি অটল নির্ভর,
কুটিলতা কারে বলে জানে না অন্তর।
হেরিলে দুঃখীর দুঃখ কেঁদে ওঠে প্রাণ,
প্রশংসা করিলে কেহ হও ম্রিয়মাণ।
লহ আজি স্নেহ মোর ওগো তেজস্বিনি,
নারীর গৌরবে তুমি হও গৌরবিনী।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

নবীন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন মার্লবরা প্রাসাদে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি যখন সূতিকাগৃহে ছিলেন, তখন সেই প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছিল। তাঁহার পিতা রাজা এডওয়ার্ড পত্নী ও পুত্রকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়া স্বয়ং অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজার চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তিনি পত্নী ও পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে দমকলের সাহায্যে কিয়ৎকাল পরে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

জর্জ্জের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অ্যালবার্ট কালে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিবেন, এডওয়ার্ড ও আলেক্‌জান্দ্রার ইহাই আশা ছিল। সুতরাং তাঁহাকে রাজোচিত বিবিধগুণে অলঙ্কৃত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। জর্জ্জ দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন, তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কোন আশা ছিল না; সুতরাং তাঁহাকে ইংলণ্ডের এক জন প্রধান নৌ-যোদ্ধা করিবার জন্য পিতা মাতার বাসনা হইয়াছিল। শৈশব হইতেই তিনিও আপনার শিক্ষকের নিকট সামুদ্রিক জীবনের ভয়াবহ কাহিনী আগ্রহান্বিত হইয়া শ্রবণ করিতেন। শিক্ষক মহাশয় প্রায়ই তৎসম্বন্ধে গল্প বলিতেন। সেই হইতেই বালক জর্জ্জের মনেও নৌ-বিভাগে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়; তিনি উপযুক্ত বয়সের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

তিনি শৈশবের সীমা অতিক্রম করিলে পাদ্রী ডেল্টন তাঁহার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ডেলটন তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন ও ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। রাণী আলেক্‌জান্দ্রা নিজে যে সমুদয় গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন কেবল তাহাই তাঁহাকে পাঠ করিতে দিতেন। পুত্রের চরিত্র গঠনের ভার মাতা নিজের হস্তে রাখিয়াছিলেন। তিনি বাহ্যাড়ম্বর ও অপব্যয় যে মহাপাপ তাহা পুত্রের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। বিলাসিতা ও অলসতা যে বড়লোকের সর্ব্বনাশের কারণ তাহা পুত্রকে তিনি বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পঞ্চম জর্জ্জ "ব্রিটানিয়া" যুদ্ধ জাহাজে শিক্ষার্থীরূপে প্রবেশ করিলেন; আপনার উচ্চ পদবীর, উচ্চবংশের বিষয় তিনি ভুলিয়া গেলেন। এখানে অন্যান্য নাবিকদিগের সঙ্গে তিনি একত্র বাস করিতেন এবং তাহারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিত তিনিও সেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গরীব নাবিকদের সহিত বাস করাতে বড় মানুষী হাবভাব তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

নৌ-জীবনোপযোগী অবস্থা পরম্পরা তিনি যে ভাবে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। এ সময়ে তিনি সর্ব্বপ্রকার আমোদ-

প্রমোদে যোগদান করিতেন; বালজনসুলভ অপভাষাও অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। সময় সময় যখন তর্কে পারিয়া উঠিতেন না, তখন তিনি বিবাদ করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদিন আপনার নৌ-সহচরদিগকে নিষেধ করিলেন,—"তোমরা আমাকে 'কুমার জর্জ্জ' বলিয়া সম্বোধন করিও না।" সহচরগণ এইবার সুযোগ পাইল। তাহারা জর্জ্জকে 'স্প্রাটস্' (মৎস্য বিশেষ) বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল। শিক্ষা শেষ করিয়া নৌ-বিভাগে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত তিনি ঐ নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন। "ব্রিটানিয়ায়" যুদ্ধ শিক্ষার সময় তাঁহার অশেষ গুণের পরিচয় প্রকাশ হয়। পরে তিনি 'ব্যাকান্টি' নামক যুদ্ধ জাহাজে প্রেরিত হন। এখানে তিনি নিজ হস্তে জাহাজের মাস্তল ও পাটাতন মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিতেন, রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতেন। ঝড় বৃষ্টির সময় মাস্তলের উপর উঠিয়া পাল গুটাইতেন, মহা তুফানে জাহাজ হইতে নৌকা নামাইতেন এবং দাঁড় বাহিয়া বিপুল তরঙ্গের প্রতিকূলে নৌকা লইয়া যাইতেন। যখন অন্য কোন কাজ না থাকিত, তখন সিঙ্গা বাজাইতেন, সে বাজনার সঙ্গে নিজে নৃত্য করিতেন, অপর নাবিকগণও নৃত্য করিত। তিনি অসমসাহসিক ছিলেন। এক সময় তিনি পারিসের এফেল টাওয়ার দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। টাওয়ারের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া তিনি দেখিলেন, চূড়ার উপর এক সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড রহিয়াছে। তিনি সেই কাষ্ঠদণ্ড বাহিয়া তাহার মস্তকোপরি উত্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

১৮৯২ সালের ১৪ই জানুয়ারী প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টরের মৃত্যু হওয়াতে, জর্জ্জ ইংলণ্ডের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন, সুতরাং তাঁহাকে যুদ্ধ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। ১৮৯৩ সালে ৬ই জুলাই রাজকুমারী মেরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, মেরীর মাতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত-ভগিনী ছিলেন। সুতরাং এই বিবাহে ইংলণ্ডের লোক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল। বিবাহের পর ইঁহারা উভয়ে 'ইয়র্ক কটেজে' বাস করিতে আরম্ভ করেন। 'ইয়র্ক কটেজ' প্রাসাদ যথোপযুক্তরূপ জাঁকজমকশালী না হইলেও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী বড়ই মনোমুগ্ধকর! সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এই প্রাসাদে বহু সুখের দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি অনেক সময় এই প্রাসাদে আপনার শিশুসন্তানগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন; সর্ব্বদাই তাহাদিগের নিকট প্রবাদমূলক বহু স্থানের বিচিত্র ইতিহাস ও দানব উপদানবের গল্প-গাথা এবং কখনও তাহাদিগকে সৎশিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন। জর্জ্জ যখনই বাটীর বাহির হইতেন, ফিরিবার সময় সন্তানগণের জন্য কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিতেন। এখানে কৃষিকার্য্য, শিকার ও নানা প্রকার ব্যায়াম চর্চ্চায় তাঁহাদের দিন সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। এখানে বাসকালে, তিনি নিকটবর্ত্তী অনাথ ও দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচন করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বড়ই পিতৃভক্ত। পিতার জীবিতকালে তিনি পিতার প্রাত্যহিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করিতেন। বিবাহের পর, প্রায় সেইরূপ ভাবেই আপনার জীবন-গতি পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেন। যে দিন যে যে কার্য্য সমাপন করা আবশ্যক হইত, পর দিনের জন্য ফেলিয়া না রাখিয়া সেই দিনই তিনি সে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ একজন অদ্বিতীয় বক্তা। তাঁহার বক্তৃতা প্রায়ই তিনি লিখিয়া আনেন না। এ সংসারে প্রত্যেকের একটা না একটা প্রিয় বস্তু আছে। পঞ্চম জর্জ্জের দুইটী বিষয় বিশেষ প্রিয়;—প্রথম, ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ; দ্বিতীয়, সংবাদপত্রে নিজের, স্ত্রীর এবং সন্তানগণের সম্বন্ধে যে বিষয় প্রকাশিত হয়, তৎসমুদয় কাটিয়া রাখা। কি সৌজন্যে, কি আচার ব্যবহারে, কি চালচলনে হাবভাবে, পঞ্চম জর্জ্জ একজন প্রকৃত ইংরেজ। তিনি অমায়িক, সরলপ্রাণ, পরদুঃখকাতর, সাহসী। তিনি কর্ত্তব্যপালনে কখনও পরাঙ্মুখ নহেন; পরিচিতের বা বন্ধুর অভাব মোচনেও কুণ্ঠিত হন না। সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য পালনে তিনি সর্ব্বদাই যত্নপর।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ (তৎকালে যুবরাজ জর্জ্জ আলবার্ট) ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। সে

ঘটনা ভারতবাসীর মনে চিরজাগরুক রহিবে। তাঁহার অমায়িকতা, সরল ব্যবহার এবং কার্য্যকুশলতা ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে চিরগ্রথিত থাকিবে। "গিল্ড হলে" বক্তৃতাকালে, ভারতবাসীর প্রতি অধিকতর সহানুভূতি দেখাইবার জন্য তিনি রাজকর্ম্মচারীদিগকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উদারতার পরিচায়ক। ভারতের ও ভারতবাসীর অবস্থা যে তিনি সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সে বক্তৃতা তাহারই পরিচায়ক।

রাজা জর্জ্জ স্বভাবতঃ মিতভাষী। সার আর্থার বিগ তাঁহার একজন প্রিয়বন্ধু। একদা মহারাণী ভিক্টোরিয়া জর্জ্জ ও তাঁহার বন্ধু বিগ ও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জর্জ্জ আর কাহারও নিকট উপবেশন না করিয়া, সার আর্থারকে বলিলেন, "আমি আপনার পার্শ্বে বসিব। আপনি কথা অপেক্ষা চিন্তা ভালবাসেন।" রাজা জর্জ্জ তোষামোদ আদবেই পছন্দ করেন না, "মহামহিম রাজকুলাবতাংশ" বলিয়া কেহ সম্বোধন করিলে অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি তাঁহাকে 'মহাশয়' বলিয়া ডাকিলেই সন্তোষ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু বারম্বার 'মহাশয়' 'মহাশয়' বলিলে তিনি অপ্রসন্ন হইতেন। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করেন এবং প্রাতরাশেরও পূর্ব্বেই চিঠি পাঠ ও লেখা সম্পন্ন করেন।

রাণী মেরী।

রাণী মেরী ইংলণ্ডে বিশেষ পরিচিতা। কেন্সিংটন রাজপ্রাসাদে তাঁহার জন্ম হয়। সরল শিক্ষায় এবং সরল বহির্বেষ্টনে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। সাধারণ বালকবালিকার ন্যায় রাণী মেরী ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কেন্সিংটন উদ্যানে ক্রীড়া করিতেন। কখনও কখনও তাঁহাদের সহিত ধাত্রী বা শিক্ষয়িত্রী থাকিতেন। বালিকা মেরী শিল্প, গীতবাদ্য এবং ভাষা শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি পিয়ানো বাজাইতে বিশেষ নিপুণা। তাঁহার গলার সুরও চমৎকার। চারিটী ভাষায় তিনি অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন।

কেন্সিংটন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া যখন তাঁহার পিতৃ-পরিবার "শ্বেত-ভবনে" আবাস স্থান নির্দ্দেশ করিলেন সেই সময় হইতেই কুমারী মেরীর পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। "শ্বেত ভবনে" আসিয়া তাঁহারা বিশেষ সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা সন্তানগণের বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন; সন্তানগণও মাতৃভক্তি শিক্ষা করিতে লাগিল। কুমারী মেরী সর্ব্বদাই মাতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। সাধারণে তখন বুঝিতে পারিল,—মাতা যে কোনও কার্য্যই করুন না কেন, কন্যার সাহায্য ব্যতীত তাহা নিপন্ন করিতে পারিবেন না। মাতার শ্রমলাঘবের জন্য কন্যা কত বিষয়ে মাতাকে সহায়তা করিতেন। হাঁসপাতালে এবং অন্যান্য বিষয়ে দানের জন্য কখনও বা পোষাক তৈয়ারী করিতেন। কখনও সন্নিকটস্থ দরিদ্রদিগের সাহায্য করিতেন। কুমারী মেরী কঠোর পরিশ্রম করিতেন; বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ইতিহাস পাঠই তাঁহার বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল।

"শ্বেত ভবনে" বাসের সময় হইতেই কুমারী মেরী সাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হন। তিনি যখন যে কার্য্য করিতেন, এই সময় হইতে তাহা লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রমশঃ পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হন। ক্রমশঃ তিনি ইয়র্কের ডিউকপত্নী বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন। কিন্তু তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া জীবিত ছিলেন এবং তাৎকালীন ওয়েলসের প্রিন্স-পত্নী রাজ্ঞী আলেক্জান্দ্রা সমাজ-নেত্রীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করায় যুবরাজ-পত্নী মেরীর প্রতি তেমন গুরুকার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হইত না। পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহে এবং যত্নে বুঝি রাণী মেরীর তুলনা হয় না। মাতা পার্কে যাইয়া সন্তানগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন। পিতাও সে ক্রীড়ায় যোগ দিতেন। সে কি সুন্দর।

রাণী মেরী এক্ষণে সন্তানগণের শিক্ষার চিন্তায় সমাকুল। তাঁহার ইচ্ছা—অপরের বিদ্যায় যতদূর সম্ভবপর, সন্তানগণ সেইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তাই তিনি আপন ইচ্ছামত সন্তানগণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষায় রাণী মেরী 'কিণ্ডার গার্ডেন' প্রণালীই গ্রহণ করিতেন। তিনি স্বয়ং তাহাদের নিকট ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের ব্যবহার প্রণালী বিবৃত

করিতেন। আত্ম-সংবরণ, আত্মসংযম, নিঃস্বার্থ-পরতা—রাণী মেরী সন্তানদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের এ পর্য্যন্ত ৫ পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম এডওয়ার্ড। তিনি ১৮৯৪ সালে ২৩ শে জুন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চম জর্জ্জের ভারত-ভ্রমণ সময়ে রাণী মেরী ভারতাগমন করিয়াছিলেন। যুবরাজের ন্যায় তিনিও ভারতবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। (সংগৃহীত)।

গৃহিণীর সাজি।

পঁ্যাজের পায়স।

খাদ্যের মধ্যে পঁ্যাজ ও দুধ এই দুইটী জিনিষ পরস্পর বিরোধীগুণসম্পন্ন। অনেকে পঁ্যাজকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণাই করেন। দুধ সাত্বিক আহার্য্য আর পঁ্যাজ তমোগুণপ্রধান খাদ্য। কিন্তু এই দুইটী পরস্পর-বিরোধী পদার্থের সংমিশ্রণে অতি সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। গতবারে আমরা নারিকেলের পায়স প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, নারিকেলের পায়স অপেক্ষা পঁ্যাজের পায়স অধিকতর উপাদেয়। উহার প্রস্তুত প্রণালীও কঠিন নহে। এবারে আমাদের পাঠিকা ভগিনীদিগকে তাহাই উপহার দিতেছি।

এক পোয়া আন্দাজ পঁ্যাজ খুব কুঁচাইয়া কাটিয়া সাত আট বার জল বদলাইয়া ফেলিয়া ফেলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। বার বার জল বদলাইয়া সিদ্ধ করিতে করিতে উহার গন্ধ মরিয়া যাইবে। তার পর /২ সের কিম্বা /২।৷৹ সের দুধ লইয়া জাল দিতে হইবে, উহাতে কিছু কিস্‌মিস্‌ ফেলিয়া দিবে, দুধ যখন বেশ ক্ষীর হইয়া আসিবে তখন ঐ সিদ্ধ পঁ্যাজ এবং এক পোয়া চিনি দিবে। যখন বেশ ফুটিতে থাকিবে, তখন নামাইয়া একটু গোলাপজল ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহাই পঁ্যাজের পায়স।

মুষ্টিযোগ।

১৩। আম ও জাম ছালের কাথ খৈচূর্ণ সহ সেবন করিলে, গর্ভিণীর গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

১৪। কাবাব চিনি পানের সহিত ২।৪ দিন খাইলে অথবা মিছরি ও মরিচ এক সঙ্গে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে কাশি ভাল হয়।

১৫। শ্বেত অপরাজিতার মূল কটীদেশে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভপাত হয় না।

১৬। আদার রস ১ তোলা মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দী ও কাশী ভাল হয়।

১৭। বুকে সর্দ্দী বসিলে পুরাতন ঘৃত কণ্ঠদেশে মালিস করিবে, অথবা একটি পাতি লেবু গোবরের ভিতর রাখিয়া পোড়াইবে, সেই লেবু ও পুরাতন ঘি একত্র করিয়া বুকে মালিস করিলে উপকার হয়। বুকে বেদনা হইলে পুরাতন ঘি আদার রস ও কর্পূর মিশাইয়া মালিস করিবে। গরম দুগ্ধের সহিত ঘি অল্প করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দী ও কাশীর উপশম হয়।

১৮। ঈষদুষ্ণ গব্য ঘৃত, গোলমরিচ চূর্ণ ও আদার রস এই সকল দ্রব্য একত্র যোগ করিয়া সেবন করিলে কাশী, সর্দ্দিবসা ও স্বরভঙ্গ, গলা খুসখুসি ভাল হয়।

১৯। হাঁপকাশ রোগী দোক্তাতামাক মুখে রাখা অভ্যাস করিলে হাঁপকাশ দমন থাকে।

২০। তুলসীগাছের ঘুংরি পোকা, তামার মাদুলীতে করিয়া ধারণ করিলে বালকদিগের হাঁপানি রোগ ভাল হয়।

২১। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে শ্বেত দুর্ব্বার রস, ফটকিরির জল কিংবা চিনি সংযুক্ত দুগ্ধের নস্য লইলে উপকার হয়।

২২। ছাগদুগ্ধ ও আতপ চাউলের চেলেনি জল একত্রে মিশাইয়া পান করিলে রক্ত উঠা ক্ষান্ত হয়।

২৩। আয়াপানার পাতার রস ও পান ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে রক্তরোধ হইয়া বেদনাদি নিবারণ হয়।

২৪। ফটকিরির গুঁড়া বা তামাকের পাতা ক্ষতস্থানে লাগাইলে রক্তপড়া বন্ধ হয়।

ভারত-ভগিনী-সম্পাদিকা

শ্রীমতী রোশনলাল।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৬ষ্ঠ ভাগ } আষাঢ়, ১৩১৭। { ৩য় সংখ্যা।

নারীশক্তির অপচয়।

(৪)

গ্রীকদের পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত আছে, পারসিউস্নাস নামক বীর যখন অ্যাথেনী দেবীর আদেশে গর্গন নাম্নী দানবীর মস্তক আনয়ন করিবার জন্য গমন করেন, তখন পথিমধ্যে তিনটী অনন্তকুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের তিন জনের একটী মাত্র চক্ষু ও একটী দন্ত ছিল, প্রয়োজন মত উহা তাহারা একে অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দর্শন এবং চর্ব্বণ কার্য্য সম্পন্ন করিত, অথচ তাহারা মনে করিত, তাহাদের মত ভাগ্যবতী আর কেহই নাই এবং তাহাদের কোনই অভাব নাই। পারসিউস্নাস তাহাদের দুরবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ করিলে তাহারা ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ভারত-নারীগণও সেইরূপ তাঁহাদের নিজের অভাব বুঝিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জ্যোতিষ গণিত প্রভৃতি, এমন কি বীরত্বেও যে ভারত-নারীর যশঃ-প্রতিভা পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাদেরই কন্যা। তাঁহাদের এই শোচনীয় বিস্মৃতি, আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান বোধের অভাবই যে নারীজাতির দুর্গতির প্রধান কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন, বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ ভগবানের অভিপ্রেত নহে! গৃহই তাঁহাদের রাজ্য এবং মাতৃত্ব এবং পত্নীত্বই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীর অধিকার আছে, তাহা আমরা বুঝাইতে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু সে অধিকারের দাবী ছাড়িয়া দিলেও বলিতে হয় যে,

গৃহ-রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন এবং প্রকৃত মাতা এবং পত্নী হওয়া কি এতই সহজ, যে তাহা বিনা শিক্ষায়ই সম্ভাবিত হইতে পারে? সন্তান গর্ভে ধারণ এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রতিপালন ও পীড়া হইলে "বাছার কি হইল" বলিয়া চীৎকার করিলেই মাতার কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন? জননীর সদ্দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে কোন পুরুষ সংসারে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। পত্নীর আদর্শ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি, মাতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীমতী ললিতা রায় কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন সোসাইটীর অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের * প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি, বালকবালিকাগণের চরিত্র গঠন এবং তাহাদের মনোবৃত্তি সকল বিকাশের ভার নারীজাতির হস্তেই ন্যস্ত; যে সকল প্রাচীন ভারতীয়া মনস্বিনীবর্গ জ্ঞানগরিমায় পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধর এবং পুণ্যময়ী ভারত-মাতার সুসন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য শিশুকে যেরূপ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন তাহা মাতা ভিন্ন অন্যে পারেন না। দেশ-সেবায় এবং নর-সেবায় সন্তানকে দীক্ষিত করিবার পক্ষে মাতার শিক্ষা যেরূপ ফলপ্রসূ অপরের শিক্ষা সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

ইংলণ্ডে মেরীর রাজত্বকালে যখন তাঁহার আদেশে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-বিশ্বাসীদিগকে দলে দলে জীবন্ত দগ্ধ করা হইতেছিল, তখন দুইটী শিশুসন্তান সহ একটী রমণীকেও জীবন্ত দগ্ধ করিবার জন্য আনা হইয়াছিল। রমণী অগ্রে শিশু দুইটীকে জ্বলন্ত কাষ্ঠস্তূপে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাও বৎস, পিতার পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর, আমিও আসিতেছি," এই বলিয়া তিনি নিজেও অম্লানচিত্তে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমরা পাশ্চাত্য নারীর এইরূপ অদ্ভুত মানসিক বলের কথা শুনিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত কি ভারত-নারীর পক্ষে নূতন? কুন্তী, রাক্ষসের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়াও আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের উপকারার্থে আপন পুত্রকে অম্লানবদনে দান করিয়াছিলেন। জনা অর্জ্জুনের অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় পাইয়াও বীরধর্ম্ম পালনের জন্য অকাতরে আপনার সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন! আর এখন প্রতিবেশীর গৃহে অগ্নি লাগিলে সন্তানকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিতেও অনেক জননী কুণ্ঠা বোধ করেন, পাছে গায়ে ফোস্কা পড়ে! শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "গোরা" উপন্যাসে সুচরিতা শিশু সতীশকে বলিতেছেন:—

"আমাদের যে দেশ, আমাদের যে জাত, সে কত বড় তা জানিস্? এ এক আশ্চর্য্য দেশ! এই দেশকে পৃথিবীর সকলের চূড়ার উপরে বসাবার জন্য কত হাজার হাজার বৎসর ধ'রে বিধাতার আয়োজন হয়েছে। দেশ বিদেশ থেকে কত লোক এসে এই আয়োজনে যোগ দিয়েছে! এদেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, কত মহাযুদ্ধ ঘটেছে, কত মহাবাক্য এইখান থেকে বলা হয়েছে, কত মহাতপস্যা এইখানে সাধন করা হয়েছে, এবং জীবনের সমস্যার কত রকম মীমাংসা এই দেশে হয়েছে, সেই আমাদের এই ভারতবর্ষ! একে খুব মহৎ বলেই জানিস্ ভাই—একে কোনদিন ভুলেও অবজ্ঞা করিস্‌নে। এই কথাটী তোকে মনে রাখ্‌তে হবে, খুব বড় দেশে তুই জন্মেছিস্, সমস্ত হৃদয় দিয়ে এই বড় দেশকে ভক্তি করবি, আর সমস্ত জীবন দিয়ে এই বড় দেশের কাজ করবি।" যে জ্ঞান প্রভাবে ভগ্নী ভ্রাতাকে এমন উপদেশ দিতে পারে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে কি? নারীর কর্ম্মক্ষেত্র অন্তঃপুরের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও জাতীয় জীবন সংগঠন এবং প্রকৃত মানুষ-সৃষ্টি সম্বন্ধে নারীর প্রভাব কোন মতেই উপেক্ষণীয় নহে, সুতরাং নারীকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিলে দেশের কল্যাণ সম্ভাবনা অতি অল্প।

বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে প্রধানতম অন্তরায়। বার বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের বিধান বলিয়া কন্যা একটু বয়স্কা হইলেই তাহার বিবাহের জন্য পিতামাতা একান্ত অধীর হইয়া উঠেন। শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র, তবে প্রাচীন কালের সমাজতত্ত্ব

* ১৩১৬, আষাঢ় মাসের ভারত-মহিলা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধে পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি হইতে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতেই হইবে, প্রাচীনকালে এরূপ কোন বিধান ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না, থাকিলেও দেশের অবস্থা ভেদে যে অন্যথাচরণ করা যাইতে পারে না, আমরা এরূপ মনে করি না। শাস্ত্রকারগণের সময়ে যেরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন আবশ্যক ছিল, এখনও তাহা সর্ব্বাংশে মানিয়া চলিতে হইবে, বোধ হয় শাস্ত্রকারগণেরও এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। দেশের উন্নতিকামী কোন ব্যক্তি প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে যাহারা বলেন, "আমাদের মুনি ঋষিগণ কি মূর্খ ছিলেন যে তোমরা তাঁহাদের ব্যবস্থা উল্টাইতে চাও!" তাঁহারা এই কথাটী ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। ঋষিগণ পরমজ্ঞানী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা যে মানবসুলভ ভ্রম প্রমাদের অতীত একথা বলা যায় না, সুতরাং শাস্ত্রের প্রত্যেক বাক্যই যে অভ্রান্ত একথা বলা যায় না; বিশেষতঃ শাস্ত্রকারগণের যেরূপ মতানৈক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে কোনটী অভ্রান্ত বলিলে কোন কোনটী আপনা হইতে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। গল্প আছে, একবার কোন সহরে ভয়ঙ্কর মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল। প্রত্যহ এত লোক কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল, যে মৃতদেহের উপযুক্ত সৎকার দূরে থাকুক, উহা অপসারিত করাও কঠিন হইয়া পড়িল। চিকিৎসকগণ অগত্যা মৃতদেহের উপর একটা বিশেষ চিহ্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন, মুর্দ্দাফরাসগণ তাহা দেখিয়া মৃতদেহ অপসারিত করিতে লাগিল। দৈবাৎ চিকিৎসক এক মুমূর্ষু রোগীকে ঐরূপ চিহ্নিত করিয়া গিয়াছিলেন, মুর্দ্দাফরাসগণ তাহাকেও লইয়া চলিল। এ রোগীর একটু চেতনা সঞ্চার হইলে "আমি বেঁচে আছি" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাহকেরা বলিতে লাগিল, "ডাক্তার ব'লে গেছেন তুমি মরেছ, আর তুমি বলছ আমি বেঁচে আছি, আমরা এমন বোকা নই যে ডাক্তারদের কথা ছেড়ে তোমার কথা বিশ্বাস করব?" মহাগণ্ডগোল, তারপর সেই ডাক্তার আসিয়া গোলমাল মিটাইয়া দেন। শাস্ত্রের প্রতি বিনা বিচারে এইরূপ অন্ধবিশ্বাস আমাদের জাতীয় উন্নতির যথেষ্ট বিঘ্নস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সকলের কাছে শাস্ত্রের দোহাই দিতে অনেকেই সাহস করেন না। যে সকল আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন বলিয়া শাস্ত্রের বিধান আছে তাহা প্রতিপালন করিলে খাঁটি ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে, অথচ নারী যদি পাদুকা ব্যবহার করেন কি প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে এমনই একটা তুচ্ছ কাজ করিয়া বসেন অমনি দেশ রসাতলে গেল বলিয়া চীৎকার উঠিতে থাকে। দেশ কাল ভেদে পরিবর্ত্তন যদি আবশ্যক হয় তবে নারীর বেলায় তাহা খাটিবে না কেন তাহা বুঝা শক্ত।

কিন্তু এ জন্য কেবল পুরুষদিগকে দোষী করিলেই চলিবে না। আমরা নিজের অভাব নিজে বুঝিতে না পারিলে তাঁহারা আমাদের অভাব বুঝাইয়া দিতে বা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, আমরা এরূপ দাবী করিতে পারি না। আমাদিগকে স্বয়ং শক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে, সম্মুখে অসংখ্য প্রকারের বাধা বিপত্তির জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া ভাগ দখল করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। যে সকল পুরুষের হৃদয় নারীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া উৎসাহসূচক কতিপয় বাক্য ভিন্ন আর কিছুই আশা করিতে পারি না। তাঁহারা যে আমাদের উদ্যম ও চেষ্টায় বাধা না দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, আপাততঃ ইহাই কৃতজ্ঞতার সহিত বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিব। নিজের শক্তি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী থাকিয়া কঠোর অধ্যবসায় ও একাগ্রতা সহকারে আত্মোন্নতি সাধনে যত্নশীল হইব, পার্থিব মানবের সাহায্য না পাইলেও সকল শক্তির উৎস ভগবানের সাহায্য হইতে আমাদিগকে কেহই বঞ্চিত রাখিতে পারিবেন না। বিপদ এবং নানাবিধ প্রলোভন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে সত্য, কিন্তু তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে, তবে ত আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইবে! পাশ্চাত্য নারীসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া যতই তাঁহাদের নিন্দা করা হউক না কেন, তাঁহারা যে বর্ত্তমান কালের ভারত-নারী অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত-

তর তাহাতে সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর এবং ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যেরূপ অদ্ভুত ত্যাগস্বীকার করিতেছেন এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহারা যেরূপ প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছেন, সে সমুদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও গৃহের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া তাঁহারা স্বামীর কর্ম্মভার যেরূপ লঘু করিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সেখানে শিশুসন্তানদের শিক্ষার ভার পত্নীর হস্তে প্রদান করিয়া স্বামী নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহে কাহারও পীড়া হইলে পত্নী স্বামীর সাহায্য ব্যতিরেকে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং চিকিৎসকের সঙ্গে যথাবিহিত পরামর্শ করিতে পারেন। এ দেশে কতিপয় বিলাসিনী ইংরেজ রমণীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং সাময়িক পত্রাদিতে দুই একটী উচ্ছৃঙ্খল রমণীর বিবরণ পাঠ করিয়া সমগ্র নারীজাতির উপর তাহা আরোপপূর্ব্বক অনেকেই পাশ্চাত্য নারীদের প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়াছেন তাঁহারাই বলেন ইংরেজ পরিবার অতি মধুর। অপরাহ্নে কন্যাগণ পিয়ানো সংযোগে গান করিতেছেন, পত্নী সূচী-কার্য্য করিতেছেন, এবং স্বামী তাঁহার পাশে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ ও গল্প করিতেছেন। ছোট ছোট শিশুরা দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কেহ বা মাতার কাছে প্রশ্ন করিতেছে, মাতা সহাস্য মুখে উত্তর প্রদান করিতে-ছেন। ইহার সঙ্গে একবার আমাদের দেশের একটী পরিবারের তুলনা করা যাউক। যুবক কর্ম্মে, পরনিন্দায় বা তাশ পাশাতে সমস্ত বেলা কাটাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিলেন, জননী মালা জপ করিতেছেন, ছেলেকে দেখিয়া পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বউ, গোপাল এসেছে, একটু জল খেতে দাও।" জল খাইতে ত দিবেন কিন্তু বড় খুকী দুপুরবেলা জল খাইয়া গ্লাসটী কোথায় রাখিয়াছে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; অনেক ডাকা-ডাকি হাঁকাহাঁকিতে গ্লাস যদি বা আসিল, কিন্তু জল-যোগের দ্রব্য নির্ব্বাচন এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল; কারণ স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধটী অতি জটিল, যদি ভাল ভাল জিনিষ বাছিয়া দেন, তবে ননন্দা প্রভৃতির নিকট হইতে "সোয়ামীকে ভাল খাবার বেছে দিয়াছে," এইরূপ শিষ্টাচার সঙ্গত মিষ্ট বাক্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে; আর যদি তাহা না দেন তবে স্বামী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরি-ত্যাগ করিয়া বলিবেন, "এই তো ভালবাসা! আমাকে খেতে দেবার সময় ভাল জিনিষটুকুও হাতে উঠিতে চায় না।" যাহা হউক, জল খাবার লইয়া, ঘোমটা দিয়া ভাল করিয়া মুখ ঢাকিয়া (কারণ দিনের বেলায় স্বামী মুখ দেখিতে পাইলে অখ্যাতির সীমা থাকিবে না) স্বামীর কাছে উপস্থিত হইলেন। এখন উভয়েরই ইচ্ছা একটু গল্প সল্প করেন, কিন্তু এরূপ বেহায়াপনা করা সাহসে কুলাইতেছে না, স্ত্রীর প্রাণটী কাঁপিয়া উঠিতেছে, পাছে স্বামী দুষ্টামি করিয়া তাঁহার ঘোমটা তুলিয়া ফেলেন। কারণ ঐ যে শাশুড়ী ঠাকুরাণী বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, বউ বেহায়া কি না তাহা পরীক্ষা করাও যে তাহার কাজ নয় তাহা নয়। স্বামী ঘোমটার কাপড় তুলিলে স্বামীর কিছু না হউক, এই অপরাধে পর দিন তাঁহাকে নাকালের একশেষ হইতে হইবে। তার পর বালিকা বধূ বৎসর বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া যদি পরমায়ুর জোড়ে নিজে বাঁচিতে পারেন তবে তিনিও শিক্ষা এবং সদ্দৃষ্টান্তের অভাবে শাশুড়ীর একটী দ্বিতীয় সংস্করণ হইবেন। পরসেবা প্রভৃতি সদ্গুণরাজির পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতার প্রাধান্য সংস্থাপিত হইবে, অথচ ইহাই না কি আমাদের গৃহ-তপোবনের আদর্শ!

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য রমণীর আদর্শ এরূপ না হউক তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র শুধু গৃহ-প্রাচীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং বর্ত্তমান উন্নততর অবস্থার সহিত সে অবস্থার তুলনাই হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহারা কেবল আত্মচেষ্টা দ্বারা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। সহস্র প্রকারের বাধা আসিয়া তাঁহাদিগকে পথভ্রান্ত করিতে পারে নাই। আমাদের দেশবাসিনী ভগিনীদের নিকট তাই নিবেদন করিতেছি, স্বচেষ্টায় মানুষ যে অধিকার লাভ করে না, তাহা উপযুক্ত ফলপ্রসূ হয় না, এ কথাটী যেন তাঁহারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

শিশুর স্বাস্থ্য।

"শিশুর স্বাস্থ্য"—বিষয়টীর পর্য্যালোচনা সকল সময়েই সকল সমাজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক। একজন বহুদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—ইউরোপীয় জাতিগণ সামান্য কুকুরের যতটা যত্ন করিতে জানেন, আমরা আমাদের শিশুদিগকেও সেরূপ যত্ন করিতে জানি না। কথাটী অনেক পরিমাণে সত্য এবং আমাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জাকর।

শিশুর স্বাস্থ্যের সহিত প্রত্যেক মনুষ্যের গার্হস্থ্যও সাধারণভাবে জাতীয় জীবনের অতি নিকট সম্বন্ধ। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সহিত গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা এবং জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে জাতির শিশুগণ সাধারণতঃ দুর্ব্বল ও রুগ্ন, সে জাতি কখনও উন্নতির পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে আমদের যে জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে, শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞান ও অবজ্ঞা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। শিশুর স্বাস্থ্য কিরূপ আহার ও পরিচ্ছদাদি দ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং কোন্ কোন্ উপায়ে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হইতে পারে, বর্ত্তমান কালের পিতামাতার হৃদয়ে সাধারণতঃ সে চিন্তা উপস্থিত হইলেও উপযুক্ত পুস্তকাদি ও শিক্ষার অভাবে সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ অতি অল্পই ঘটে! এদিকে সাধারণ দারিদ্র্য, বর্ত্তমান সময়ের বিলাস-বাহুল্য এবং উপযুক্ত খাদ্যাদির দুর্লভতা প্রযুক্ত ইচ্ছা থাকিলেও শিশুদের যথোচিত যত্ন করা অনেকের পক্ষে অতি সুকঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ অবস্থায় শিশুর স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার ও উপায় উদ্ভাবন করা চিন্তাশীলগণের বিশেষ চিন্তার বিষয়, এবং সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। এই গুরুতর সমস্যার যথাশক্তি আলোচনা করিবার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

"শিশুর স্বাস্থ্য" কথাটী শুনিতে ক্ষুদ্র হইলেও অর্থে বহুবিস্তৃত। প্রধানতঃ শিশুর স্বাস্থ্য বলিলে, শিশুর শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারের স্বাস্থ্য বুঝায়। পক্ষান্তরে শিশুর কষ্টেসৃষ্টে বাঁচিয়া থাকা মাত্র বুঝায় না। ক্রমিক বিকাশ বা উপচয়ও এই "স্বাস্থ্য" কথাটির অন্তর্গত। অতএব শিশুর শারীরিক ও মানসিক নীরোগিতা এবং যথোচিত শরীরোপচয় ও শক্তি সমূহের বিকাশ—এই গুলি কোন্ উপায়ে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, এবং কি জন্য এই গুলির অভাব ঘটে তৎসমস্ত কথা সম্পূর্ণভাবে একটী প্রবন্ধে আলোচিত হইতে পারে না। এ স্থলে আমি যাহা বলিব তাহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। চিন্তাশীল সুধীগণ বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া কার্য্য-পথ স্থির করিবেন।

প্রথমে শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য বা শারীরিক নীরোগিতা ও উপচয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন করিব। শিশু-শরীর ও প্রৌঢ়-শরীরের একটী প্রধান প্রভেদ এই যে, শিশুর শরীর নিয়ত বৃদ্ধিশীল, আর প্রৌঢ় শরীর প্রায় একই অবস্থায় স্থিতিশীল। পক্ষান্তরে শিশুর শরীরে শীত বায়ু, রৌদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা অতি অল্প, প্রৌঢ় শরীরে ঐ সহিষ্ণুতা অনেক অধিক। এই জন্য শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা এতদূর কঠিন ব্যাপার।

প্রথমতঃ আহারের কথা। শিশুর খাদ্যের আবশ্যকতা শিশুর বয়ঃক্রমের অনুপাতে (প্রৌঢ়ের হিসাবে) ধরা যাইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, নিয়ত শিশু-শরীরের বৃদ্ধিশীলতার জন্য স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বয়ঃক্রমের অপেক্ষা অনক বেশী। শিশুর অস্থি, মাংস, মেদঃ প্রভৃতি সকল ধাতুই নিয়ত উপচিত হইতেছে। খাদ্য হইতে উপযোগী সার ভাগ গ্রহণ করিয়াই এই উপচয় বা পুষ্টি সাধিত হয়। অতএব এই সমস্ত ধাতুর উপচয়ের জন্য যথেষ্ট সামগ্রী বা উপাদান শিশুর খাদ্যে থাকা একান্ত আবশ্যক। শিশু-খাদ্য-নির্ব্বাচনের ইহাই মূল সূত্র। এই সূত্রটি সাধারণের অজ্ঞাত থাকায় দেশের প্রভূত অমঙ্গল ঘটিতেছে। পক্ষান্তরে, শিশু কোন্ বয়সে কোন্ খাদ্য সহজে পরিপাক করিতে পারে, এ বিষয়েও জনসাধারণের কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞানের অভাবে দেশের শত সহস্র দুগ্ধপোষ্য শিশু অকালে মৃত্যুমুখে

যাইতেছে। সাধারণতঃ একবৎসর পর্য্যন্ত শিশুর পক্ষে স্তন-দুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। গো-দুগ্ধ বা ছাগ-দুগ্ধ কখনই স্তন দুগ্ধের সমান হইতে পারে না। ক্ষুদ্র শিশুর উদরে স্তন-দুগ্ধ সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত ছানায় পরিণত হয় ও সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। গো-দুগ্ধ বৃহদাকার খণ্ড খণ্ড ছানায় পরিণত হয় এবং সহজে জীর্ণ না হইয়া সমগ্র পরিপাক-যন্ত্রের বিকার উৎপন্ন করে। এইজন্য যাবৎ শিশুর কয়েকটী দাঁত না উঠে এবং গোদুগ্ধ জীর্ণ করিবার শক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত স্তনদুগ্ধ ভিন্ন অপর কিছু শিশুকে না দেওয়াই প্রশস্ত।

বড় দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে প্রসূতিগণের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভগ্নপ্রায় বা ভঙ্গুর। শিশুকে প্রচুর স্তনদুগ্ধ দান করা এখন আমাদের প্রসূতিগণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কাজেই স্তনদুগ্ধের অভাবে কেবল বার্লি, এরারুট, চিনি প্রভৃতি মিলিত গোদুগ্ধ পান করাইয়া শিশুর জীবন রক্ষার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ দুগ্ধ অনেক স্থলেই শিশুগণ সহজে জীর্ণ করিতে অক্ষম। সুতরাং ক্রমে ভেদ, বমি, অজীর্ণ, জ্বর, যকৃত, প্লীহা প্রভৃতির আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে শিশু-যকৃৎ বা Infantile Liver পীড়ার এতদুর আধিক্য হইবার প্রধান কারণ স্তনদুগ্ধের অভাব। স্তনদুগ্ধের অভাবে গোদুগ্ধ দিতে হইলে. উহাকে স্তনদুগ্ধ সদৃশ করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিবর্ত্তিত শ্বেতসার (Starch) দ্বারা এখন নানা প্রকার শিশুখাদ্য বা ফুড্ প্রস্তুত হইতেছে। সেই ফুডগুলির উপাদান সাধারণ চিনি বা শ্বেতসার হইতে বিভিন্ন। দন্তোদ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ চিনি বা "শ্বেতসার" (তণ্ডুল, যব, গোধূম প্রভৃতি) জীর্ণ করা শিশুর পক্ষে কঠিন ব্যাপার। এই জন্য উক্ত ফুড্ গুলির এত অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। ফুড্ গুলির মধ্যেও কোন্টী কোন্ শিশুর উপযোগী, তাহা নিশ্চয় করা নিতান্ত সহজ নহে। তবে মেলিন্স (Mellin's food). নেসলের ফুড (Nestle's food) প্রভৃতি কয়েকটী ফুড সাধারণতঃ সহজে সহ্য হইয়া থাকে।

দেশীয় প্রথায়, দুগ্ধের সহিত উৎকৃষ্ট মধু ও সমপরিমাণে জল মিশাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট স্তনদুগ্ধ সদৃশ দুগ্ধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট মধুর উপাদান সাধারণ চিনি নহে, উহার চিনি প্রধানতঃ দ্রাক্ষা হইতে উৎপন্ন চিনির ন্যায় (Grape-Sugar), এই জন্য উহা শিশুদের পক্ষে উত্তম খাদ্য।

বোতলে দুগ্ধ পান করাইবার প্রথাও শিশুর পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। বোতল ও রবারের চুচুক (Nipple) সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত কঠিন; এজন্য বোতলের দুগ্ধ অম্লগন্ধি হইয়া নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। ঝিনুক বা চাম্‌চে দ্বারা দুগ্ধ পান করাইবার সনাতন প্রথা অতি বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর।

শিশুর চারিটী বা ছয়টী দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত তাহাকে অন্ন খাওয়াইবার অভ্যাস না করানই প্রশস্ত। ধীরে ধীরে অন্ন খাইতে অভ্যাস হইলে শিশুর খাদ্য বাড়ীর সাধারণ আহারের অনুরূপ না হইয়া সুনির্ব্বাচিত ও প্রচুর হওয়া আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মৎস্য,মাংস, মুগ, ছোলা প্রভৃতি ডালে প্রস্তুত খাদ্য (যথা—জিলিপী, বড়া, পাঁপর প্রভৃতি) ডিম, দুগ্ধ এবং দুগ্ধের বিকার যথা ছানা দধি প্রভৃতি শিশুকে সহ্যমত প্রচুর পরিমাণে খাওয়ান কর্ত্তব্য। অধিক পরিমাণে মাছ বা সন্দেশ বাড়ীর কর্ত্তার পাতে না দিয়া, শিশুর পাতে দেওয়াই অধিক আবশ্যক। কারণ কথিত আহার্য্যগুলিতেই রক্ত, মাংসাদি প্রস্তুত হইবার প্রধান উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। বড় দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এ বিষয়ে জনসাধারণ নিতান্ত অজ্ঞ। ঘৃত, তণ্ডুল, গম প্রভৃতি শ্বেতসার (Starch)-বহুল পদার্থ শিশুর পক্ষে আবশ্যক হইলেও পূর্ব্বোক্ত আহার্য্যগুলির ন্যায় অত্যাবশ্যক নহে। যাঁহারা মাংসাশী নহেন, তাঁহারা ভাল দুগ্ধ, ছানা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইলে প্রায় সমান ফল পাইতে পারেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য প্রায় পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। দুগ্ধ জলবৎ, ঘৃত চর্ব্বিও তৈল-মিশ্রিত, সর্ষপ তৈল কেরোসিন তৈলের স্বজাতীয় Bloomless oil পর্য্যন্ত মিশ্রণে বিষাক্ত। আজ কাল কি খাইয়া জীবন ধারণ করিব, তাহাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় মুড়ি ও ঘৃত-বর্জ্জিত শুষ্ক বিস্কুট এবং ছানা অনেকটা বিশ্বাস যোগ্য। বলা বাহুল্য, সহরের সৌখিন খাবার ছেলেদের কখনও খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

আহারের পর শিশুর পরিচ্ছদ। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ বড়ই অবহেলা দেখা যায়। কোন্ সময়ে কোন্ পরিচ্ছদ আবশ্যক সাধারণতঃ আমাদের স্ত্রীলোকেরা তাহা জানে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অতি অল্পই লক্ষ্য করা হয়। শীতকালে বা বর্ষাকালে গরম কাপড় সময়ে সময়ে পরান হইলেও নানা কারণে শিশু-দিগকে দশ বিশ মিনিট বা অধিক কাল অৰ্দ্ধউলঙ্গ বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ রাখা হয়। এইরূপ অভ্যাস অত্যন্ত অনিষ্টকর। শিশুকে যথা সময়ে যথোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করান স্ত্রীলোকগণের অবশ্য শিক্ষণীয়। বেশ সুস্থ-শরীর শিশুর অনেক সময়ে ইহাতে অনিষ্ট হয় না বটে কিন্তু যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্তনদুগ্ধ পায় নাই, সেরূপ শিশুর শীতবাত-সহিষ্ণুতা অতি অল্পই হইয়া থাকে। শিশুর পক্ষে উপযুক্ত ব্যায়াম একান্ত আবশ্যক। ব্যায়াম বলিলেই মুগুর বা ডাম্বেল ভাঁজা বুঝায় না। শিশু যত দৌড়া দৌড়ি ও দুষ্টামি করিবে, ততই তাহার স্বাস্থ্য ভাল হইবে, ইহা আমাদের দেশের পিতা মাতারা প্রায়ই মনে রাখেন না। তাঁহারা শিশুদিগকে ছোট বেলা হইতেই গম্ভীর দার্শনিক করিতে চাহেন। পল্লীগ্রামের ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি ও দুষ্টামি করিতে বিশেষ অভ্যস্ত, এই জন্য সাধারণতঃ (ম্যালেরিয়ায় না ধরিলে) তাহাদের স্বাস্থ্য অতি উত্তম হইয়া থাকে।

শিশুর বস্ত্রাদি ও শরীর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়েও প্রায় অনেক মধ্যবিত্ত গৃহের গৃহিণীরা নিতান্ত উদাসীন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে অধিক অর্থব্যয় হয় না; অথচ ইহাতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক যথেষ্ট উন্নতি হয়, একথা সামান্য হইলেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার যোগ্য।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আবশ্যকতা বয়ঃস্থ লোকের অপেক্ষা শিশুর অনেক অধিক। রাত্রিতে শয়নকালে ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কায় সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ রাখা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের একটা নিতান্ত অনিষ্টকর অভ্যাস। সাধারণতঃ শিশুরা প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টাকাল নিদ্রা যায়, এতটা সময় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব ঘটিলে শোণিত শোধনের ও পুষ্টির বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে। সাক্ষাৎ সম্মুখের বায়ু শিশুর গাত্রে না লাগিতে দিয়া ঘরের মধ্যে যাহাতে প্রচুর বায়ু সঞ্চার হইতে পারে, এরূপ ভাবে দরজা জানালা খুলিয়া রাখা আবশ্যক। সময়োচিত পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া এরূপ করিলে, ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় না, ইহা সকলেরই নিজ নিজ বাড়ীতে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিশুর রক্ত মাংস বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত আকাশের নিম্নে প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা কাল তাহাকে খেলিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে অনেকেই এই নিয়মটী পালন করিতে পারেন।

এতদূর গৃহের কথা বলিলাম। শিশুদিগের জীবনের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ সাধারণতঃ স্কুল গৃহে কাটে,—সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বক্তব্য আছে। কলিকাতা ও বাঙ্গালার বড় বড় সহরের কয়েকটী স্কুল ভিন্ন অপর সমস্ত স্কুল ঘরগুলি শিশুদের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। প্রায় বায়ুর সঞ্চারবিহীন অন্ধকারময় নিম্নতলের ঘর গুলিতে শিশুদের আবদ্ধ রাখার ন্যায় নিষ্ঠুরতা যাঁহাদের ব্যবস্থায় সাধিত হয় তাঁহারা ধন্য। দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পিতা বাধ্য হইয়া নিজ নিজ প্রাণসর্ব্বস্বকে এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের হস্তে সমর্পণ করেন। এইরূপ স্কুল ও পাঠশালা গুলি উঠাইয়া দিয়া উচ্চ শুষ্ক উন্মুক্ত প্রান্তরেও ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া শত গুণে বাঞ্ছনীয়। যে সকল পিতামাতা বাধ্য হইয়া এইরূপ স্কুল সমূহে শিশুদিগকে পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদেরও এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের প্রতিবিধানের জন্য যত্নবান হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য এইরূপ গৃহে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিলে, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যলাভ করা প্রায় অসম্ভব।

সাধারণতঃ শিশুদিগকে নিম্নতলের ঘর গুলিতে এবং কলেজের ছেলেদের উপরিতলের ঘর গুলিতে শিক্ষাদান করা হয়। স্বাস্থ্যের হিসাবে ব্যবস্থাটা বিপরীত হওয়া উচিত; স্কুলে, কয়েক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত এক স্থানে বসিয়া থাকাও শিশুর স্বাস্থ্যের অনুকূল হইতে পারে না। সাধারণতঃ যে টিফিনের ছুটি হইয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না বরং অতি কদর্য্য বাজারের বা ফেরিওয়ালার খাবার লইয়া ছেলেরা সে সময়ে নিজ নিজ স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে ইটালি ও ইংল্যাণ্ডের বড় বড় ডাক্তারদের পরামর্শে বিলাতে প্রতি ঘণ্টায় ৪৫ মিনিট শিক্ষাদান ও ১৫ মিনিট ছুটীর ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মে কলেজ ক্লাসগুলিতেও এই-রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। স্কুল ক্লাসগুলিতে এরূপ ব্যবস্থা কেন প্রবর্ত্তিত হয় নাই তাহা জানি না।

ছোট ছোট শিশুদিগকে সামান্য দোষে প্রহার করা এককালে সকল স্কুলেই শিক্ষা দানের অঙ্গ ছিল। এই প্রথার অনিষ্টকারিতা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রহার বা তারণায় শারীরিক ও মানসিক বিকাশের যথেষ্ট ব্যাঘাত বটে, এবং শিশুর মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহানি হইতে থাকে। অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন শারীরিক পীড়ার জন্য শিশু অনেক দোষ করিয়া থাকে, সেই সকল প্রচ্ছন্ন শিশু-পীড়ার কথা পরে স্বতন্ত্র-ভাবে বলিতেছি। কিন্তু শারীরিক পীড়া বা ক্রটীর জন্য শিশুকে প্রহার করা যে কিরূপ নিষ্ঠুরতা তাহা শিক্ষক মহাশয় ও পিতামাতারা ভাবিয়া দেখিবেন।

বিলাতে ব্রিটিশ মেডিকাল এসোসিয়েসন নামে এক চিকিৎসক-সভা আছে, এই সভা সর্ব্বজন-মান্য। এই সভার পক্ষ হইতে সম্প্রতি ডাক্তার ওয়ার্ণার নামক একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার স্কুলসমূহে শিশুগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বানুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক লণ্ডনের স্কুলগুলিতে মোট প্রায় একলক্ষ শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন। এই রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, তাঁহার পরীক্ষিত শিশুদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু কোন না কোন শারীরিক পীড়া বা ক্রটীতে কষ্ট পাইতেছে। কাহারও শ্রবণশক্তি অল্প, কেহ কণ্ঠরোগে (Tonsilitis, Pharyngitis প্রভৃতিতে) পীড়িত। কাহারও দৃষ্টি-শক্তির দোষ আছে, সে জন্য পুস্তকাদি ভাল পড়িতে পারে না; কেহ অজীর্ণাদি নানা জটিল পীড়ায় আর্ত্ত, আর অধিকাংশ শিশুই যথোচিত পুষ্টি বা উপচয়ের অভাবে ক্ষীণ। যখন লণ্ডনে ইংরাজের দেশে এই দশা, তখন আমাদের এই দারিদ্র্য ও অযত্নের দেশে স্কুল সমূহের শিশুগণের মধ্যে যে কি দুরবস্থা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আজ পর্য্যন্ত এ দেশে এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান কেহ করেন নাই, করিলে বোধ হয় অর্দ্ধেক বা ততোধিক সংখ্যক স্কুলের ছেলে রুগ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। ঐই সকল শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার কি উপায় আমরা অবলম্বন করিয়াছি? বিলাতে শিশুগণের দুরবস্থা দেখিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পার্লামেণ্টে একটী আইন পাশ করা হইয়াছে। এই আইনে স্কুল সমূহের শিশুগণের স্বাস্থ্য বিচক্ষণ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিয়মিতভাবে রিপোর্ট দিতে হইবে, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এইরূপ আদেশ করা হইয়াছে। কেবল রিপোর্ট লওয়া নহে, সেখানকার বড় বড় লোকেরা শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া প্রত্যহ জ্ঞানের বিস্তার ও শিশু রক্ষার জন্য নানাবিধ আয়োজন অনুষ্ঠান করিতেছেন। বড় দুঃখের বিষয়, এ দেশে শিশুগণের দুরবস্থার মাত্রা অনেক অধিক হইলেও আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট

শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর বিকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলাম, এ প্রবন্ধে সকল কথা বলিবার স্থান নাই। এখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও বিকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

ইহা সকলেই জানেন যে, শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে মানসিক স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকিতে পারে না। সে জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রে লক্ষ্য রাক্ষা আবশ্যক সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, মানসিক আতঙ্ক, দুঃখ, ক্ষোভ প্রভৃতি অধিক হইলে শারীরিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। শিশুর মন ও শরীর অতি সুকুমার। তাহার মনের ও শরীরের স্বাস্থ্য এবং বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাহার শরীরের ন্যায় মনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক।

শিক্ষা—এই কথাটীর ঠিক অর্থ কি তাহা আমাদের দেশের পিতামাতারা ও শিক্ষক মহাশয়েরা প্রায়ই ভাবিয়া দেখেন না। কতকগুলি শব্দের সমষ্টি এবং তাহার অর্থ-রাশি দ্বারা মনকে ভারাক্রান্ত করিলেই "শিক্ষা" হয় না। শিক্ষার প্রধান ফল—মানসিক শক্তি সমূহের বিকাশ। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্ব লাভ। মনকে ভারাক্রান্ত

না করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইলে, মস্তিষ্কের যথোচিত পুষ্টি হওয়া আবশ্যক। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে শিশু যাবৎ অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের না হয়, তাবৎ তাহার মস্তিষ্ক বিদ্যারম্ভের উপযুক্ত হয় না। অতি বাল্য হইতে "মারিয়া ধরিয়া" লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিলে, মস্তিষ্কের শক্তি সমূহ অঙ্কুরেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। মস্তিষ্ক সমস্ত জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রধান আকর। তাহার শক্তি ক্ষয় আরম্ভ হইলে সর্ব্ব শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে। এইজন্য যে বালককে ১২ বৎসরে এণ্ট্রান্স পাশ করান হয়, তাহার শরীর ক্ষীণ ও জীর্ণ শীর্ণ হইতে দেখা যায়। বাল্যকাল হইতে পুস্তকের ভার স্কন্ধে চাপাইয়া শিশুর প্রাণবধের চেষ্টা এদেশে যেমন হয়, অন্য কোন দেশে সেইরূপ হয় না। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের পিতামাতারা দ্বাদশ বৎসরের বালক এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছে বলিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হন। সুখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মে আর বার বৎসরে এণ্ট্রান্স পাশ করা চলিবে না।

শিশু-জীবনের শিক্ষা মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনের নিকট যেরূপ হয়, অর্দ্ধশিক্ষিত শিক্ষকের নিকট কখনই সেইরূপ হয় না। হাতে খড়ি হইতে না হইতে শিশুকে অর্থশূন্য বিষয় সমূহ মুখস্ত করান আরম্ভ হয়; শিশুর মনোবৃত্তি বিকাশের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাদি করা হয় না। শিশুর পিতা সাধাণতঃ নিজের চাকরী বা অপর কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত, মাতা শিশু-শিক্ষার প্রণালী বা নিজের দায়িত্ব কিছুই জানেন না; এইজন্য শিশুর শিক্ষার ভার প্রায়ই স্নেহ-মমতাশূন্য শিক্ষক মহাশয়গণের হস্তে অর্পিত হয়। শিশুর শিক্ষা ও প্রতিপালনে চিন্তাশীলতা বিশেষ আবশ্যক। শিশু কোন দুষ্টামি করিলে প্রধান সাজাস্বরূপ তাহাকে পড়িতে বসাইয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য ইহা আরম্ভ হইতেই শিশুর মনে পাঠের উপর দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে। পড়িতে না বসিলে প্রহার করিয়া পড়িতে বসান হয়। যাহাতে পাঠে স্পৃহা বা অনুরক্তি জন্মে, সেজন্য কোন চেষ্টাই করা হয় না। ইহাতে শিশুর মানসিক বিকাশ অতি অল্প হইতে পারে। সেকালে পিতামাতার সহিত শিশুর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, এখনও অনেক পরিবারে আছে। এইরূপ পরিবারে শিশু পিতামাতার বাধ্য হয় এবং তাহার মানসিক শক্তির উত্তম বিকাশ হইয়া থাকে। আর যেখানে দায়িত্ব-বর্জ্জিত শিক্ষকের হস্তে শিশুশিক্ষার ভার ন্যস্ত, সেখানে শিশু বড় হইবার পূর্ব্বেই অবাধ্য, যথেচ্ছাচারী ও মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত হইতে থাকে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্নেহ ও আনন্দ প্রদান—শিশুশিক্ষার সাফল্যলাভের জন্য ইহাই পিতামাতার ও শিক্ষক মহাশয়ের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। যথাযথভাবে নিয়মিত স্নেহ ও আনন্দ প্রদান দ্বারা অসীম ফল লাভ করা যায়। স্নেহ ও আনন্দলাভ করিতে থাকিলে, জ্ঞানলাভের তৃষ্ণা শিশুর মনে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই তৃষ্ণারূপ দৃঢ়ভূমির উপর শিশুর মনকে স্থাপন করিতে পারিলে, অসংখ্য বিষয় শিখিলেও শিশুর মন ভারাক্রান্ত হয় না। তখন শিশু আপনা হইতেই নিয়ত নূতন বিষয় শিখিতে যত্নবান্ হয় ও তাহার জ্ঞানবৃত্তি সমূহের সুন্দর উন্মেষ হইতে থাকে।

শিশুরা স্বভাবতঃ আনন্দপ্রিয় ও কৌতূহলী। এই সহজ কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শিশুর মনোবৃত্তি সমূহ গঠন করিলে তাহার মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গ সহজে হইতে পারে না। শিশুর শরীর ও মনের বিকাশের জন্য তাহার সম্মুখে উচ্চ আদর্শ সমূহ সর্ব্বদা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ক্ষুদ্র আদর্শে মন ক্ষুদ্রই হইতে পারে। বাল্যকাল হইতে "চাক্‌রী হউক" বা "আর কিছু হউক, বা না হউক, হাতের লেখাটা হওয়া চাই" এইরূপ আশীর্ব্বাদ বা উপদেশ লাভ করিতে থাকিলে, শিশুর মানসিক বিকাশ কখনই যথেষ্ট পরিমাণ হইতে পারে না।

পিতা অপেক্ষা মাতার নিকট শিশুরা অধিক সময় অতিবাহিত করে। শিশুর চরিত্রগঠন ও মানসিক বিকাশের প্রধান সহায় স্নেহ। আমাদের দেশের মাতৃকুল শিশুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। মাতৃকুলের যাহাতে শিশু-পালন ও শিশুশিক্ষা বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে, সেজন্য এদেশে বিশেষ যত্ন হওয়া আবশ্যক।

শিশুর যথোচিত মানসিক স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য বাড়ীতে মাতাপিতার যেরূপ দায়িত্ব, বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের দায়িত্ব তদপেক্ষা অল্প নহে। গম্ভীর গর্জ্জনে ও

বেত্রাঘাতে শিশু-শাসন এবং পাঠ মুখস্থ করাইয়া শিক্ষাদান এখন ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে ; কিন্তু এই সমস্ত কুপ্রথার অনিষ্টকারিতা কিরূপ তাহা শিক্ষকশ্রেণী যে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না। এ দেশে কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীর প্রবর্ত্তনের জন্য রাজকীয় শিক্ষা-বিভাগ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের শিক্ষকগণ কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীর মূল সূত্রগুলি না বুঝিয়া আশানুরূপ ফলে বঞ্চিত হইতেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীর মূল সূত্র সমূহ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জর্ম্মান ভাষায় কিণ্ডারগার্টেন শব্দের অর্থ শিশুর বাগান। অদ্বিতীয় শিশুচরিত্রাভিজ্ঞ ফ্রোয়েবেল (Froebel) এই শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তক। তিনি মনে করিতেন, শিশু ভাবী মনুষ্যের অঙ্কুরস্বরূপ। তাহার যাহাতে স্বাভাবিক বিকাশ হয়, যাহাতে অঙ্কুরটী আভ্যন্তরীণ শক্তির উন্মেষে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের চরমসীমা প্রাপ্ত হয়—সেই উদ্দেশ্যে কিণ্ডারগার্টেন বা শিশুর বাগান এই নাম দিয়া ফ্রোয়েবেলের প্রথম স্কুল স্থাপিত হয়। যাহাতে প্রাকৃতিক জগতের অসংখ্য পরিদৃশ্যমান বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য শিশুর মনে তীব্র কৌতুহল জন্মে এবং সেই কৌতুহল যাহাতে যথোচিত সহায়তা প্রদানে শিশুকে স্বয়ং পূর্ণ করিতে দেওয়া হয়,—সেই উদ্দেশ্যেই এই কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত। মনোবিজ্ঞান বা Psychologyর অনুকূল নিয়মে শিশুকে স্নেহ ও আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া প্রথম শিক্ষাপ্রদানই এই প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষাদান করিলে, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং শক্তি সমূহ ক্রমে ক্রমে স্বতঃ বিকশিত হয়। চলিত কথায় যাহাকে "কাণ্ডজ্ঞান" এবং ইংরাজীতে যাহাকে Common sense বলে, কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে শিক্ষিত শিশুতে প্রায় উহার অভাব দেখা যায় না।

এই কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীর ফল সম্যক লাভ করিতে হইলে, শিক্ষকদিগের শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। যুবা ও প্রৌঢ়দের শিক্ষা দেওয়া অনেক কঠিন। স্নেহ, তীক্ষ্ণ বিবেক-শক্তি, কৌশল এবং শিশুচরিত্রাভিজ্ঞতা—এই সমস্ত গুণ শিশু-শিক্ষকের নিতান্ত আবশ্যক। খেলার মধ্যে কি করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়, শিশুর মিথ্যাবাদিতা, চৌর্য্য প্রভৃতি প্রবৃত্তি কেন জন্মিতেছে, তাহার কারণ নির্ণয় ও সেই কারণের প্রতিবিধান করা ও শিশুর হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয়কে এক সুরে বাঁধিয়া লওয়া সামান্য কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নহে।

প্রাচীনকালের শিক্ষাপদ্ধতির মূল সূত্র অনেকটা কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীর অনুরূপ ছিল। তখনকার পিতামাতার সহিত শিশুর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, তখন ধর্ম্ম ও সমাজের শিক্ষায় শিশুর চরিত্র মনুষ্যত্ব লাভের অনুকূল করিয়া গঠিত হইত। তখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে স্নেহের বন্ধন অতি দৃঢ় ছিল। গুরুর সাহায্যে, দৃষ্টান্তে ও যত্নে তখন শিক্ষার নানাবিধ সুযোগ ঘটিত। তখন স্বভাবের সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধির মধ্যে পালিত ও শিক্ষিত হইত বলিয়া শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য এবং বিকাশ অক্ষুণ্ণ থাকিত। প্রাচীন কালের সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋষিরা ও রাজারা সেই শিক্ষা-প্রণালীর উচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। বড় দুঃখের বিষয় এখন প্রাচীন কালের সেই সমস্ত প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবেশের সহিত এদেশের সনাতন শিক্ষা-প্রণালী বিকৃত ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং সামাজিক শিক্ষার পথ প্রায় বন্ধ হইয়াছে। তাহারই বিষময় ফল আমরা ভোগ করিতেছি। এ সময়ে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া প্রচলিত হইলে, দেশের অশেষ মঙ্গল হইতে পারে, একথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে।

এ স্থলে বলা আবশ্যক, বিদ্যোপার্জ্জনের সহিত শিশুর মনের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ হওয়াও বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগরিত করিতে হইলে, শিশুকে দেবালয়াদিতে লইয়া যাওয়া, জাতীয় ইতিহাস পুরাণাদির গল্প বলা প্রভৃতি বিশেষ আবশ্যব। সে কালের গুরু, পুরোহিত মহাশয়েরা এবং ঠাকুরমারা এ বিষয়ে সমাজের প্রধান সহায় ছিলেন। এখন সে আকারের না হউক, কতকটা সেইরূপ ছবির পুস্তকাদির আকারে জাতীয় ইতিহাসাদির গল্প শিশুদিগকে শিখাইবার অল্প উদ্যম দেখা যাইতেছে।

কিন্তু ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও ঈশ্বরে ভক্তি প্রভৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা এখনও যথোচিতভাবে হইতেছে না।

ভূগোল, খগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতির স্থূল কথাগুলি শিশুদিগকে এখন প্রায় বাল্যাবস্থাতে শিখান হয়। এইগুলি শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির বিশালত্ব ও সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা অনায়াসেই শিশুদের বোধগম্য করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

শিশুদের হৃদয় হইতে দর্প, অভিমান, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি দুষ্ট প্রবৃত্তি বাল্যকাল হইতেই যথাসম্ভব নির্ম্মূলিত করিবার চেষ্টা করা সুনিপুণ পিতামাতা ও শিক্ষকগণের আর একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

স্বার্থত্যাগ, স্নেহ, ভক্তি, ধৈর্য্য, পরোপকারিতা, সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়পরায়ণতা—শিশুদের মনে যেরূপ সহজে অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যুবা ও প্রৌঢ়জনের চিত্তে কখনও সেরূপ হয় না। দুঃখের বিষয়, শৈশবের স্বচ্ছ ক্ষেত্রে এই বীজগুলি বপন করিবার যত্ন অল্পই করা হইয়া থাকে।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং বিকাশের জন্য শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক, কিন্তু প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের দায়িত্বও অল্প নহে। আমরা আর কতদিন এ দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া থাকিব?*

শ্রীগণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, এম, এস।

বিশ্বাস।

আমি বিশ্বাস, এই বিশ্বজগতের শিয়রে আমি সোনার জীবন-কাঠি। আমি যখন যাহাকে স্পর্শ করি, তখন সে জীবন প্রাপ্ত হয়, আর যখন যাহার কাছ হইতে সরিয়া যাই সে মৃত্যুগ্রস্ত হয়। দেখিয়াছ, কত ধর্ম্ম, কত সম্প্রদায়, কত তাহার শাখা উপশাখা আমার নিশ্বাস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? বিশাল এই সৃষ্টির ভিতর এই সব পরমাণুগুলি—ফুৎকারে যাহা উড়িয়া যাইতে পারে—তাহা এক একটি জগৎ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কেন? আমি তাহাদের কেন্দ্ররেখা হইয়া দাঁড়াই বলিয়া, তাহাদের গতিবেগ আমাকে আশ্রয় করে বলিয়া, আমি তাহাদের আবর্ত্তনের কক্ষপথ হই বলিয়া তাহারা জাগিয়া উঠে, সুপ্তি ত্যাগ করিয়া, জড়তা মুক্ত হইয়া, শঙ্কা ছিন্ন করিয়া; কারণ জীবনের উত্তাপ দিয়া আমি তাহাদের স্পর্শ করি, তাহাদের শিয়রে দাঁড়াইয়া আমি অভ্যুদয়ের মন্ত্র পাঠ করি, তাহাদের প্রাণের ভিতর আমি স্থিতির গুরুত্ব অর্পণ করি! আমি বিশ্বাস, আমি বিশ্বলোকের শিয়রে সোনার জীবন-কাঠি!

আমি বিশ্বাস, আমি জগতের পতিত পত্রস্তূপের ভিতর আগুনের একটি রক্তোজ্জ্বল কণা! জগতের পতিত ভূমিতে বায়ু-বিতাড়িত হইয়া যে শুষ্ক পত্রসমূহ সঞ্চিত হইতেছে, আমি তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে আকাশস্পর্শী শিখায় জ্বালাইয়া তুলি, তাহার আবর্জ্জনা-মলিন ধূলিলাঞ্ছিত দেহের ভিতর হইতে দুঃসহ দীপ্তি স্ফুরিত করিয়া তুলি। তাহার সেই কোমল ভঙ্গুরতা—পদচাপে যাহা মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়—তাহা বজ্রের মত দৃঢ় করিয়া তুলি, বায়ুর মত প্রাবরক করিয়া তুলি, মহাসমুদ্রের দিগ্বিস্তৃত করিয়া তুলি! তোমরা হয় ত মনে করিতেছ যে আমি মুখে মুখে আড়ম্বরের জাল রচনা করিতেছি এবং আকাশগামী ভাবুকতার মিথ্যা সৃষ্টি করিয়া এই বর্ষার অবিচ্ছিন্ন-বৃষ্টিপাত-খিন্ন দিবসটির সমস্ত প্রমোদ-কল্পনা মাটী করিতে আসিয়াছি! কিন্তু শোন, একটা গল্প বলি।

জোয়ান ডি আর্ক, একটি চাষার মেয়ে মাত্র। ত্রয়োদশ বর্ষের সুকুমারী বালিকা—হয় ত তখনও সে পুতুল লইয়া খেলা করিত, প্রজাপতি ধরিতে ফুলের বাগানে ছুটিয়া বেড়াইত, তার পর রাত্রিতে মায়ের বিছানার পাশে ঘুম যাইত। ফ্রান্স তখন সমর-স্রোতে মগ্ন, চারিদিকে বিপ্লব, চারিদিকে বিপদ, চারিদিকে রক্তস্রোত। সেদিনও সে তাহার মায়ের কোলের কাছে অকাতরে ঘুমাইতেছিল, তাহার অনাগত ভবিষ্যৎ তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। জীবনে সে কখনও গ্রন্থ পাঠ করে নাই, এবং সেই নিভৃত পল্লীর নিভৃততম প্রান্ত ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। এক দিন রাত্রিতে ঈশ্বরের বাণী তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল, "উঠিয়া এস,

* কলিকাতা, সাহিত্য সভাতে পঠিত।

জোয়ান, ফ্রান্স তোমার বাহু-অর্জ্জিত ফলে শান্তিলাভ করিবে।" নিরক্ষর, বিদ্যাহীন, বোধহীন, জ্ঞানহীন, চাষার মেয়ে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কিন্তু প্রতিদিন সে আহ্বানের স্বর তাহার প্রাণের ভিতরে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল, অবশেষে সে তাহার পিতামাতাকে বলিল, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, ফ্রান্সের সমরবহ্নি আমি নির্ব্বাপিত করিব।"

নিরীহ কৃষক বেচারা কন্যার প্রলাপ-বাক্য শুনিয়া তাহাকে উন্মাদ-রোগ অধিকার করিয়াছে বলিয়া ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল ও অশেষ প্রকারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন আমি তাহার ভিতর প্রকাশিত হইয়া দাঁড়াইলাম, তাহার অন্ধকার হৃদয়কক্ষে দীপ জ্বালিয়া আমি তাহার দেবতার সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া দিলাম; তাহার সমস্ত শক্তিতে, সমস্ত চেতনাতে, সমস্ত অনুভূতিতে আমি আমার দাহিকা-শক্তির সংযোগ করিলাম, নিমেষের ভিতর তাহার হৃদয়ে বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিল, নিরক্ষর মূর্খ বালিকা, গভীর রজনীতে তাহার নিভৃত গ্রামের নিভৃত নীর ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সমর-সচিব তখন যুদ্ধের ফলাফল লইয়া ললাটে ভ্রূ-রেখা রচনা করিতেছিলেন, বালিকা বহু কষ্টে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সমর-সচিব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?"

নির্ভীক বালা অকুণ্ঠিত দ্বিধাহীন স্বরে বলিল, আমাকে যুদ্ধের অধিনায়কত্ব প্রদান করুন, আমি ফ্রান্সের ললাট-লিপি ফিরাইয়া দিব।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সমর-সচিব তাহাকে গ্রহণ করিলেন ও বহুতর পরীক্ষার দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রার্থিত পদ তাহাকে দান করিলেন। অবশেষে এক দিন রণ-ঢক্কার উচ্চ জয়নিনাদ তাহার বাক্যের সত্যতা সংশয়ান্বিত দেশবাসীর গৃহে গৃহে প্রেরণ করিল, স্বয়ং রাজা আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। তের বছরের মেয়ে; সেই অসংখ্য যুদ্ধকুশল সৈন্যের ভিতর মৃত্যুবাণের হানাহানির ভিতরে বিভীষিকা ও নিরাশার ভিতর অসম সাহসের সঙ্গে সে কি অসমকক্ষ যুদ্ধই না দান করিয়াছিল। ঝড়ের আকাশের স্তূপীকৃত তিমিরবর্ণ মেঘের উপরে বিদ্যুতের বহ্নিদীপ্ত রেখার মত সে চমকিয়া ফিরিয়াছিল, বিপক্ষের অক্ষৌহিনী সেনা তাহাতে দলিত মথিত হইয়া গেল, ফ্রান্সের অঙ্গণ হইতে ঘনায়িত অন্ধকার অপসৃত হইয়া গেল। এখন আমার কথায় তোমাদের আস্থা হইতেছে ত? শোন, আমি আবারও বলিতেছি—আমি বিশ্বাস, আমি বহ্নি, জগতের পতিত পত্রস্তূপের ভিতর আমি একটি রক্তোজ্জ্বল কণা।

আমি বিশ্বাস, আমি শক্তি, প্রাণহীন মৃত শবগুলির মধ্যে আমি একটা প্রচণ্ড, তীব্র বেগ। উত্তপ্ত বাষ্পের মত সমস্ত প্রতিষেধ দীর্ণ করিয়া আমি বাহির হই, ঝঞ্ঝার মত আমি পথশায়ী শিলাকে উড়াইয়া লইয়া যাই, যাদু-মন্ত্রের মত বিশ্বজগতের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করিয়া, আমি দাঁড়াই, তোমরা দেখ নাই, আমার এ বাহুযুগে আমি কতটা শক্তি ধারণ করি। শোন, আর একটী কাহিনী বলি! কিন্তু কি বলিতেছ? 'কোথায় সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ফ্রান্স—একটী ক্ষুদ্র কাহিনী শুনিবার জন্য এই মেঘ-মেদুর আকাশের স্নিগ্ধ শৈত্য ছাড়িয়া অতদূর যাইতে বলা!—এ নেহাৎ অত্যাচার!' আচ্ছা তবে তোমাদের গৃহ-প্রান্ত হইতে একটি দৃশ্য উদ্ঘাটন করা যাক্।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে লাহোর অঞ্চলে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার নাম বাবা নানক। মুসলমান সাম্রাজ্যে বাস করিয়া ভারতের প্রাচীন মৌলিকতা যখন লোপ পাইতেছিল এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যখন এক দিকে নির্ম্মম ক্রুরত্বকে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল ও অপর দিকে বিলাসিতার খরস্রোতে ধর্ম্মাচরণ ভাসাইয়া দিতেছিল, সেই যুগসন্ধ্যার ভয়াবহ ছায়ায় পতিত জাতির মাঝখানের দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "হিন্দু হও, মুসলমান হও, জাতিবিচার ত্যাগ করিয়া তোমরা এক পতাকার তলে মিলিত হও, কারণ পৃথিবীর একজন মাত্র স্রষ্টা—সেই একত্ব বন্ধনে তোমরা আবদ্ধ হও। তোমরা সেই অকালপুরুষ অলখ নিরঞ্জন দেবের আরাধনা কর, যাঁহাকে প্রাপ্তি-ই মনুষ্য-জীবনের চরম

উদ্দেশ্য। যে তাহা করে না সে মনুষ্যত্ব হইতে পতিত হয়, অমৃতত্ব হইতে পতিত হয়, কল্যাণ হইতে পতিত হয়, এই অশুভ পথে তোমরা চালিত হইও না।" আমি বিশ্বাস—আমি শক্তি। আমি চারিদিকে সেই মৃত শবগুলির ভিতরে নূতন জীবন ফুৎকারে ভরিয়া দিলাম, দলে দলে তাহারা জাগিয়া উঠিল; অবসাদ, জড়তা, মোহ—সূর্য্যের উদয়াভাসে রজনীর অন্ধকারের মত অপসারিত হইয়া গেল, নব-ধর্ম্মের নব-বিশ্বাসে বলিষ্ঠ হৃদয় লইয়া তাহারা শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। প্রবল ভূকম্পনে বিদীর্ণ পৃথ্বীগর্ভ হইতে সহসা উদ্ভূত ভীম পর্ব্বতের মত এই বলদৃপ্ত জাতির দিকে পৃথিবীর অপরাপর সভ্য জাতি বিস্ময়-চকিত হইয়া চাহিতে লাগিল! কি দুঃসহ তেজ তাহাদের, কি দুর্দ্দম শক্তি, কি প্রচণ্ড ধর্ম্মানুরাগ! দেখিতে দেখিতে নবম গুরু তেগ বাহাদুর কারারুদ্ধ হইলেন। ধর্ম্ম বিসর্জ্জনের মূল্যে তাঁহাকে স্বাধীনতা ক্রয়ের প্রস্তাব করিয়া পাঠান হইল, গুরু সদম্ভে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন ও আপনার মস্তক দান করিয়া শিখ-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিলেন। দশম গুরু গোবিন্দসিংহের অভ্যুত্থান সমগ্র শিখ জাতির উপরে একটি মহত্তর মহিমাকে বিকীর্ণ করিল, তাহাদের ধর্ম্মপ্রাণতার উজ্জ্বল উদাহরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া গেল! আমি বিশ্বাস, আমি শক্তি, জগতের প্রাণহীন শবগুলির ভিতরে আমি একটা প্রচণ্ড তীব্র বেগ!

আমি বিশ্বাস, আমি জলধারা! জগতের রৌদ্র বিদীর্ণ ক্ষেত্রগুলির ভিতর আষাঢ়ের নবনীলাঞ্জনকান্ত স্নিগ্ধ জলদ আমি—বিগলিত হইয়া অবতরণ করি! দিক্‌দিগন্তে ছায়া ঘনাইয়া আসে, শ্রী ভরিয়া উঠে, লাবণ্য নিবিড়তা প্রাপ্ত হয়, তৃষ্ণা মিটাইয়া, তাপ হরণ করিয়া, গ্লানি ধৌত করিয়া আমি আসি। মাঠে মাঠে ধান হিল্লোলিত হয়—তরুতল গুল্মে তৃণে উদ্ভিজ্জে আবৃত হয়, শ্যামলিমায় বসুন্ধরা পূর্ণযৌবনা বালার মত কান্তিময়ী হইয়া উঠে! আমি তোমাদের আর একটি দৃশ্য দেখাইব। তোমরা বলিতেছ, 'গৃহপ্রান্ত বলিয়া সুদূর উত্তর ভারতে লইয়া যাওয়াটা সুবুদ্ধির পরিচয় কি?' আচ্ছা, এবার তোমাদের আপনার ঘরে একটী অপরূপ চিত্র দেখাইব।

গৈরিক বসন ধারণ করিয়া জটামণ্ডিত শিরে নদীয়ার নবীন সন্ন্যাসী দেখা দিলেন, হৃদয়মণি হারাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরের ভিতর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, শচীদেবীর চোখের জলে ধরণী বিগলিত হইয়া যাইতে লাগিল, হরি নামে মাতাল গোরা জগৎ ভুলিয়া আপনা ভুলিয়া নদীয়ার পথে পথে প্রেম বিলাইতে লাগিলেন। নবদ্বীপ হইতে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে সে প্লাবন উঠিল; ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গৃহী সন্ন্যাসী সব তাহাতে ভাসিয়া উঠিল, খোল করতাল ও মৃদঙ্গের রোলের সঙ্গে মিলিত সুধাময় হরি নামের ধ্বনিতে আকাশ ভরিয়া গেল, জাতিবিচার, সামাজিক ভেদবুদ্ধি, বিধর্ম্মের বিদ্বেষ, ধৌত হইয়া তাহাতে ভাসিয়া গেল, হরি নামের এক অখণ্ড ঐকতান বাদ্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল; শুষ্ক তর্ক, কূট-সিদ্ধান্ত, জটিল জ্ঞান কোথায় ডুবিয়া গেল? কোথায় ছিলেন রূপ, কোথায় ছিলেন সনাতন—মুসলমান রাজার মুসলমান কর্ম্মচারী রাজস্বের তালিকা নির্দ্ধারণে ব্যস্ত হইয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা হরি নামের রোল তাঁহাদের কানে পৌঁছিল; দেখিলেন, কাঞ্চন-জিনি-বর্ণ জটাজুট-মণ্ডিত তরুণ গৌর সন্ন্যাসী জ্ঞানহারা হইয়া হরি নামে বাহু তুলিয়া নাচিতেছেন, চক্ষের জলে ধরণী ভাসিয়া যাইতেছে, ঘন ঘন দেহ রোমাঞ্চিত হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুটাইতেছেন, অষ্ট সাত্বিক বিকার সে সুঠাম কান্তিময় বপুতে বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, যে যেখানে আছে সে রূপ দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেছে, কোথায় যাইতেছে তাহাদের বিষয়াসক্তি, কোথায় যাইতেছে তাহাদের মোহান্ধ আত্মার দুশ্ছেদ্য জাড্য, তাহাদের হৃদয় হইতে তাহাদের চিরাভ্যস্ত পাপের কালিমা ধৌত হইয়া যাইতেছে; প্রবল ভগবদ্‌ভক্তি বৈশাখের নব-জলস্রোতের মত তাহাদের অন্তরে ভরিয়া উঠিতেছে; শিহরিত দেহে অশ্রুজলে ভাসিয়া তাহারা হরিবোল বলিয়া নাচিতেছে! অবিশ্বাস, ঘৃণা, জাত্যভিমান চলিয়া গেল, হাতে হাত ধরিয়া দুই ভাই ঐশ্বর্য্য রাজসম্মান পশ্চাতে ত্যাগ করিয়া কৌপীন সম্বল করিয়া বাহির হইলেন। নবদ্বীপে কীর্ত্তনের রোল দ্বিগুণ উছলিয়া উঠিল, কত জগাই মাধাই তাহাতে উদ্ধার

হইয়া গেল! আমি বিশ্বাস, আমি জলধারা. জগতের রৌদ্রবিদীর্ণ ক্ষেত্রের উপর, আষাঢ়ের নবনীলাঞ্জন-কান্ত স্নিগ্ধ জলদ আমি—আশা-ডমরুর তালে বিগলিত হইয়া অবতরণ করি!

আমি বিশ্বাস, আমি বিশ্রাম, ক্লান্তিখিন্ন মনুষ্যাত্মার আমি সুকোমল মাতৃক্রোড়। এস কে পরিশ্রান্ত আছ, কে দ্বন্দ্ববিক্ষত আছ, কে সংশয়ভীত আছ, জগতের অসীম প্রান্তরে পথহারা হইয়া কে কোথায় ঘুরিয়া মরিতেছ—শিশুর মত আমার অঙ্কে ফিরিয়া এস, আমি তোমাদের বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়া যাইব! ঐ যে দূরারূঢ় গিরি দেখিতেছ, তাহা আমি পলকে পার হইয়া যাইব; ঐ যে ভয়াবহ অরণ্য দেখিতেছ, আমি তাহার পথ বাহির করিয়া লইব; ঐ যে দারুণ অগ্নিকুণ্ড দেখিতেছ, আমি তাহার ভিতর দিয়া তোমাদের অঞ্চলে ঢাকিয়া লইয়া যাইব, তোমাদের সমস্ত ক্লেশ সমস্ত ভাবনা আমি হরণ করিয়া নিব!

দাঁড়াও, তোমাদের আরেকটি কাহিনী বলিব। কিন্তু তোমরা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছ, বলিতেছ "কাহিনী! ওরে বাবা! বঙ্গদেশের এই পূর্ব্বপ্রান্তে—ঘাট বাট যখন ধবল জলরাশি মগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে, মাঠ হইতে চাষারা যখন ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে—তখন নবদ্বীপযাত্রা! এ বিষম বিপদ! কিন্তু এবার তোমাদের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে হইবে না। চল, রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণের বিধি প্রণয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে একবার যাওয়া যাক্। ঐ দেখ পুত্র কন্যা গৃহ সব মমতা পরিত্যাগ করিয়া সাধ্বী স্বামীর চিতারোহণ করিতেছে, মুখে কি অপূর্ব্ব প্রসন্নতার শ্রী, চক্ষে কি অলোকসম্ভব দীপ্তি! বহ্নিশিখা-মধ্যবর্ত্তিনী ঐ অপরূপ মূর্ত্তির তুলনা—বলিতে পার জগতে কোথাও আছে কি? তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না, বলিতেছ যে আমি ভুল বলিতেছি। অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইতেন। কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি—অবিশ্বাসের দ্বারা তোমরা এই অলৌকিক দেবীত্বের অবমাননা করিও না;—মাঝে মাঝে তাহা হইত বটে এবং যখন তাহা করা হইত তখন যে তাহা ঘোরতর নৃশংসতার অনুষ্ঠান হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তবু, অনেকে স্বেচ্ছায় মৃত স্বামীর সহগামিনী হইতেন। সে কি মহিমাময় দৃশ্য, কি পুণ্যালোক-উদ্ভাসিত মূর্ত্তি! রক্ত পট্টাম্বরে, পুষ্পমাল্য-বিভূষিতা বধূ সিন্দুরোজ্জ্বল সীমন্তে অগ্নি-প্রবেশ করিতেছে, সে যেন প্রিয়তমেরই প্রেমালিঙ্গন, সে যেন সেই চির-ঈপ্সিত দয়িত-স্পর্শ! তোমরা দেখিতে পাও না বটে কিন্তু আমি তখন তাহাকে বেষ্টন করিয়া আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছি, অগ্নিশিখার দুঃসহ জ্বালাকে শীতল করিয়া দিয়াছি, মৃত্যুকে অমৃত করিয়া দিয়াছি, ভয়কে মধুর করিয়া দিয়াছি! আমি বিশ্বাস, আমি আশ্রয়, এস তোমরা আমার অঙ্কে বিশ্রাম করিবে এস!

সম্মুখে ঐ মহাসমুদ্র দেখিতেছ? আমি তাহার একমাত্র নাবিক। নিস্তব্ধ সৈকতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছি, এস তোমরা আমার নৌকায় উঠিবে এস! ঐ যে ঝড়ের বাতাস বেদনাবিদ্ধ ক্রুর বন্য জন্তুর মত গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, আমি তাহার ভিতর দিয়া নিরাপদে তোমাদের লইয়া যাইব, বহ্নিস্ফুরিত করিয়া আকাশে ঐ যে বজ্র মুহুর্মুহু হাঁকিয়া উঠিতেছে, তাহার ভয়াল ভ্রুকুটি হইতে আমি তোমাদের রক্ষা করিব, ওপারের সেই লুপ্ত রেখাটি—তোমাদের ভ্রান্ত মনোবৃত্তি ও চপল আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গে যাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না, এস, আমি তোমাদের তাহা দেখাইয়া দিব! কে উত্তরণার্থী আছ এস, কে বিরামাকাঙ্ক্ষী আছ এস, কে শান্তিলাভেচ্ছু আছ এস, আমি বিশ্বাস—আমি তোমাদের সুকোমল মাতৃক্রোড়,—কে শ্রান্ত কে আর্ত্ত আছ, এস আজ শিশুর মতন মাতৃবক্ষে ফিরিয়া এস!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

———

পূর্ব্ববঙ্গের উপাধিধারিণী মহিলাগণ।

বাঙ্গালা দেশের বিদুষী মহিলাদিগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভারত-মহিলায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ সংগ্রহ করাই কঠিন কার্য্য। সম্প্রতি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট বিভাগের উপাধিধারিণী মহিলাদিগের সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা লিখিতেছি, ইহার পরে সুবিধা হইলে অন্যান্য বিদুষী মহিলাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সর্ব্বাগ্রে মাননীয়া শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে তিনি এবং মাননীয়া শ্রীযুক্তা চন্দ্রমুখী বসু সর্ব্বপ্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের উপাধি লাভ উপলক্ষে কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

> "তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন,
> অই বেশ, ও উপাধি করেছি ধারণ।
> যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙ্গালীর মেয়ে"
> তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে।
> বেঁচে থাক, সুখে থাক, চির সুখে আর,
> কে বলিবে বাঙ্গালীর জীবন অসার?
> কি আশা জাগালে হৃদে কে আর নিবারে?
> ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!"

মিসেস্ গাঙ্গুলীর পৈতৃক নিবাস পূর্ব্ববঙ্গের একটি পল্লীগ্রামে। তাঁহার পিতা বহরমপুরে কর্ম্ম করিতেন। তা ছাড়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্য তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। এ জন্য দেশের সঙ্গে তাঁহার বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। মিসেস্ গাঙ্গুলী শৈশবকাল হইতে পশ্চিম বঙ্গে বাস করিয়াছেন। তিনি বেথুন কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। তার পর স্বদেশহিতৈষী, সুলেখক ও তেজস্বী পুরুষ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। গাঙ্গুলী মহাশয় বিক্রমপুরের বড় এক কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে পুরুষোচিত তেজ ও নারীর ন্যায় কোমলতা ছিল। তিনি তরুণ বয়সেই কুলীনকুমারীদিগের দুঃখ দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। অবশেষে পরিণত বয়সে নারীর দুঃখ দূর করাই জীবনের একটি ব্রত হইয়া দাঁড়াইল। এ জন্য তিনি রমণীদিগের উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীনতার অতিশয় পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। মিসেস্ গাঙ্গুলী স্বামীর উৎসাহে উৎসাহান্বিতা হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোন বঙ্গমহিলা মেডিকেল কলেজে পড়িতে সাহস পান নাই। কেমন করিয়াই বা সাহস পাইবেন? এক দিন বাঙ্গালীর ছেলের মেডিকেল কলেজে পড়া একটা বীরত্বের কাজ বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপ অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের ঐ কলেজে ভর্ত্তি হওয়া কি সহজ কথা? মিসেস্ গাঙ্গুলী যে লোকনিন্দার প্রতি দৃকপাত না করিয়া এবং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার গুরুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া পাঁচ বৎসর মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিলেন, ইহাতে তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার স্বামীর ন্যায় তেজস্বিনী রমণী।

মিসেস গাঙ্গুলী মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা পাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া কিছুদিন চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং এল, আর, সি, পি, উপাধি পাইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালীর মেয়ে চিকিৎসাকর্ম্ম করেন নাই। ইনি এই কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগের চিকিৎসার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। এ জন্য মহিলাগণ যে ইহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ আছেন, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

মিসেস্ গাঙ্গুলীর বাঙ্গলা ভাষায় রচনা লিখিবার শক্তি আছে, কিন্তু তাঁহার সময় নাই। তিনি বিলাত গমন করিয়া সুন্দর ভাষায় আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। উহা "সঞ্জীবনী"তে মুদ্রিত হইয়াছিল। মিসেস্ গাঙ্গুলী একবার কলিকাতার "ভারত-মহিলা-সমিতি"র উৎসবে একটি রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। রচনাটি "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। আমরা

"তত্ত্বকৌমুদী" হইতে উক্ত রচনার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমরা আজ এখানে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। এ বিষয়ে অনেকের অনেক মত হইতে পারে; আমার মতে আমাদের চারি প্রকারের কর্ত্তব্য আছে। এ সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে আমাদের সময় বৃথা যায় না এবং আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে নিজ নিজ জীবনকে সুন্দর ও প্রকৃতরূপে গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। সে চারি প্রকার কর্ত্তব্য কি? (১) আপনার প্রতি কর্ত্তব্য (২) পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য (৩) সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য (৪) জগতের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য।" * * * *

"স্ত্রীলোকের পরিবারের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা অত্যন্ত সুন্দর ও সুমহৎ। নারী স্বভাবতঃই কোমল-হৃদয়া ও করুণ-প্রাণা। গৃহে যাহাতে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করা নারীর কর্ত্তব্য। আমরা দেশে দেশে যুদ্ধ সংবাদ শুনিলে কাতর হই, রক্তপাত ও মানব-জীবন নাশের সংবাদে দুঃখিত হই, অথচ গৃহে যে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত হয় তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাই না। দেশে দেশে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে কলহ যে কারণে হয়, গৃহে অশান্তি অনেকটা সেই কারণেই হয়। সামান্য ব্যাপার, সামান্য কথা লইয়া আমরা চিরজীবন একটা অশান্তির ভার বহন করি। আমরা নিজের দোষ না দেখিয়া অপরের দোষ দেখি এবং সে বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাকে ক্রমশঃ বৃহৎ করিয়া তুলি; ইহার মূল কি? আমার মতে ইহার মূল কারণ অপ্রেম। ভালবাসা থাকিলে আমরা কখনও প্রিয়জনকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতাম না, বা অশান্তির অনল আরও প্রজ্জ্বলিত করিতাম না। * * *

আমাদের ধর্ম্মভ্রাতা ও ভগিনীগণের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা থাকা দরকার। কাহারও ভ্রম কিম্বা দুর্ব্বলতা দেখিলে ব্যথিতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বতঃই আমাদের ইচ্ছা হওয়া উচিত এবং এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কেহ যদি আমাদের দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দেন তাহা হইলে আন্তরিক সৎভাবের সহিত তাহা অনুধাবন করিয়া সংশোধন করিতে হইবে। অপরের প্রতি এ জন্য রোষ কিম্বা বিদ্বেষ উৎপন্ন যেন না হয়। নারীর সাহায্য ব্যতিরেকে আজ পর্য্যন্ত কোনও সমাজ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হয় তাহা করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা আমাদের স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, শিক্ষা ও ধর্ম্মলাভের জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন সেই সকল স্নেহময় ভ্রাতাগণ যাহাতে আমাদের জীবন, ব্যবহার ও তাঁহাদের সাধু ইচ্ছা সফল করিবার জন্য আন্তরিক উৎসাহ দেখিয়া পুলকিত ও তাঁহাদের শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করেন, তাহার চেষ্টা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।"

মিসেস্ গাঙ্গুলী প্রবন্ধের সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—"বিশ্ব-জগৎ এবং সমাজ যেন আমাদের দ্বারা ধন্য হয় এবং গৃহে যেন আমরা কল্যাণী কন্যা, প্রীতিময়ী ভগিনী, পরম স্নেহময়ী মাতা ও লক্ষ্মীরূপা গৃহিণী ও কোমলহৃদয়া সান্ত্বনা-দায়িনী বন্ধুরূপে জগতে অবস্থান করিতে পারি;—সেই মহান্ পরমেশ্বরের চরণে এই প্রার্থনা।"

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। মিসেস গাঙ্গুলীর দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী বি, এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন।

মিসেস গাঙ্গুলীর পর মাননীয়া শ্রীমতী কামিনী রায়ের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীর "আলো ও ছায়া রচয়িত্রী" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া মিসেস রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রকাশ করিব।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। ঐ গ্রামে বিস্তর ভদ্রলোক বাস করেন। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বৈদ্যগণ খুব সম্ভ্রান্ত। তাঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও ধনী লোক আছেন। আমি আটাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। একটি কারণে ঐ গ্রামের স্মৃতি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি সেইবার সর্ব্বপ্রথম নাটক অভিনয় দর্শন করি। বোধ হয় গ্রামের জমিদার বাবুদের বাড়ীতে কোন শুভানুষ্ঠান ছিল। সেই

অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাবুরা নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর অশ্রুমতী ও বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ অভিনয় হইয়াছিল। গ্রামখানির অবস্থা এখন কেমন, ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু তখন গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোহর ছিল। তৃণপূর্ণ মাঠ, হরিতবর্ণ লতা, পুষ্পিত বৃক্ষ ও একটি কলনাদিনী নদী গ্রামটির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। এই প্রকার মনোরম স্থান কবির জন্মভূমির যোগ্য বটে। এই গ্রামে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর মিসেস রায়ের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় বাঙ্গালাদেশের একজন খ্যাতনামা সুলেখক। তিনি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের তেজ ও ধর্ম্মভাবের কথা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। তিনি তরুণ বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

চণ্ডী বাবু নারীদিগের উচ্চশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য কন্যাদিগের সুশিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তা ছাড়া মিসেস রায়ের নিজেরই স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তিনি ১৪ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বাল্যকালে পিতার নিকট উত্তমরূপে গণিত শিখিয়াছিলেন। এই গণিতের জন্য তাঁহার শিক্ষক শ্যামাচরণ বসু তাঁহাকে লীলাবতী বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মিসেস রায় ষোল বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন; এই পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তার পর এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষা পাশ করেন। বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার পাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাটুটারী সিবিলিয়ান কেদারনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। অল্পদিন হইল রায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি মিসেস রায়ের একটি স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তিনি কবিত্ব শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আট বৎসর বয়স হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বয়োবৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ ও কবিত্ব শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। অবশেষে কবির নিকট বিশ্বের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। কবি জগতের রহস্য কথা অবগত হইয়া কাব্যে তাহা ব্যক্ত করিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কবির সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য "আলো ও ছায়া" প্রকাশিত হইল। আমরা প্রথম যে দিন "আলো ও ছায়া" দেখিতে পাইলাম, সে দিনের কথা আজও মনে আছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সুপণ্ডিত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় তখনও বিলাত গমন করেন নাই; তাঁহারই ঘরে "আলো ও ছায়া" বইখানি প্রথম দেখিতে পাইলাম। ইহার পূর্ব্বে এমন চমৎকার বাঁধান কবিতার বই আমাদের হাতে পড়ে নাই। বইখানির বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ইহার পর কবিবর হেমচন্দ্রের লিখিত ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কবি লিখিয়াছেন :—

"বাঙ্গলা ভাষার এরূপ কবিতা আমি অল্প পাঠ করিয়াছি। * * বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহারা লেখকের অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। * * কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি।"

কবির এই প্রশংসা পাঠ করিয়া আগ্রহের সহিত গ্রন্থখানি পড়িয়া শেষ করিলাম। এমন উৎকৃষ্ট কাব্য কে রচনা করিয়াছে, তা জানিবার জন্য মন আকুল হইয়া উঠিল। শুনিলাম মিসেস্ রায় এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। কোন মহিলা যে এই রকম গভীর চিন্তাপূর্ণ উচ্চ অঙ্গের কাব্য রচনা করিতে পারেন, তাহা তখন বিশ্বাস হইল না। বিশ্বাস না হইবার আরও কারণ ছিল। মিসেস্ রায়কে কোন কাগজে ত কখনও কোন কবিতা লিখিতে দেখি নাই; কবি বলিয়া তাঁহার নামও ত কেহ জানে না; তিনি কি হাতে কলম লইয়াই এমন চমৎকার কাব্য রচনা করিলেন? শেষে শুনিলাম যথার্থই কাব্যখানি তাঁহার রচনা। বনফুল যেমন আপনার সৌন্দর্য্য বনের মধ্যে পাতার আড়ালে ঢাকিয়া

রাখে, তেমনি গম্ভীরপ্রকৃতি কবি এত দিন আপনার সুন্দর কবিতাগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

কবি এ পর্য্যন্ত "আলো ও ছায়া" "নির্ম্মাল্য," "পৌরাণিকী" ও "গুঞ্জন" এই চারিখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ কবির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলেই সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আর একখানি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত করিবার জন্য অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন! কিন্তু তিনি যখন পাবনা হইতে কলিকাতায় আসেন, তখন সে কবিতার খাতাখানা হারাইয়া গিয়াছে।

মিসেস্ রায়ের কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই ভারত-মহিলায় আমার একটি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সমালোচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"আলো ও ছায়া" গ্রন্থের মধ্যে কবির আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যথার্থই কবি। তাঁহার প্রতিভা আছে, ভাব সম্পদ আছে, ভাষার উপরও আশ্চর্য্য অধিকার আছে। তাঁহার সৌন্দর্য্য গ্রহণের ও চিত্রাঙ্কনের শক্তিও সামান্য নহে। তাঁহার অঙ্কিত ছবির মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রেখাগুলি বর্ণে ও সুষমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। গ্রন্থকর্ত্রীর ধ্যানদৃষ্টি অতিশয় উজ্জ্বল। সে দৃষ্টি বিশ্ব মানবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এ জন্য কবি মানুষের মর্ম্মস্থানের গভীর প্রেমের কথা ও গভীর সুখ দুঃখের কাহিনী অকৃত্রিম ভাবে বর্ণনা করিতে পারেন। তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, বিশ্বের নরনারী হৃদয়ের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া গভীর প্রেম ও গভীর সুখ দুঃখ সকলই যেন তাঁহাকে দেখাইয়াছেন। তাই তিনি বিশ্ব মানবের প্রেম ও বেদনার কাহিনী অতিশয় প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন।"

গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা নিজস্ব। উহা সরল, মধুর, অথচ উহার শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। কবি শব্দবিন্যাসের একটি গূঢ় কৌশল অবগত হইয়াছেন। সেই জন্য খুব সংক্ষেপে এক একটি গভীর ভাবের কবিতা রচনা করিতে পারেন; এবং ছোট একটি কথার মধ্যে অনেকখানি ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া কবির আর একটি প্রশংসার কথা আছে। তাঁহার কবিতাগুলি এমন পবিত্রতা মাখানো, আন্তরিকতাপূর্ণ, সরল ও অকৃত্রিম যে, বাঙ্গালা ভাষায় এই রকমের কবিতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়!

এই এক বৎসর হইল "আলো ও ছায়া"র পঞ্চম সংস্করণ হইয়াছে। এই সংস্করণের একখানি সুন্দর বই আমরা উপহার পাইয়াছি। উহার মধ্যে একটি উৎসর্গ-পত্র আছে। কবি তাঁহার গ্রন্থখানি হেমচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কবি যে একটি নূতন কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার,
লুকাইয়া ক্ষুদ্র তনু, ঢালে গীত ধার,
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্র পাখী,
সেইরূপ আপনারে লুকাইয়া রাখি
তব স্নেহ-পত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান
লাজুক এ ভীরু কবি খুলি কণ্ঠ প্রাণ।
তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্ব্বাদ তব
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
বিংশতি বরষ ধরি যেই গীত হার
আজ লোকান্তর হ'তে তাই উপহার
লহ এ ভক্তের হাতে ;—আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা নয়!
বিংশ বরষের মম পুরাতন গীত
ভকতি-চন্দন-লিপ্ত নব-সুবাসিত
পাবে তুমি, আশা এই। আছে আশা আর,
পৌঁছে ধরণীর বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার।"

শ্রদ্ধেয়া কুমারী হেমপ্রভা বসু এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেথুন কলেজে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে-ছেন। কুমারী বসু বিক্রমপুরনিবাসী পরলোকগত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা এবং বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী। ইঁহার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। এই জন্য কুমারী

বসু এবং তাঁহার ভগিনীগণ উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভগিনীদিগের মধ্যে পরলোকগত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পত্নী মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু বৃদ্ধ বয়সেও "বামাবোধিনী" "সুপ্রভাত" প্রভৃতি কাগজে গদ্যে ও পদ্যে রচনা লিখিয়া থাকেন এবং শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকার মুকুল ও প্রবাসী পত্রে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

কুমারী বসু সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন। কিন্তু এক মুকুল ব্যতীত আর কোন কাগজে তাঁহার রচনা পাঠ করিবার যো নাই। বালকবালিকাদিগের যে নীতিবিদ্যালয় হইতে মুকুল প্রকাশিত হয়, কুমারী বসু নিজেই কি না সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, কাজেই বাধ্য হইয়া মুকুলের জন্য কিছু কিছু লিখিয়া থাকেন। আমরা ভারত-মহিলায় তাঁহার রচনা পাঠ করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব।

শ্রীমতী সুপ্রভা দাস বি, এ, পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। শ্রীমতী সুপ্রভার পিতা শ্রীযুক্ত কামিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বর্দ্ধমানের জজকোর্টের নাজির। কামিনী বাবুর নিবাস ঢাকা জেলার একটি পল্লীগ্রামে। তিনি তরুণ বয়সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে শ্রীমতী সুপ্রভা বেথুন বোর্ডিংএ থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন। মুরসিদাবাদের বর্ত্তমান এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ দাসের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

কুমারী কুমুদিনী মিত্র ও কুমারী বাসন্তী মিত্র দুই ভগিনী। ইঁহারা দুজনেই বি, এ, পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ইঁহাদের পিতা, এবং স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইঁহাদের মাতামহ। কুমারী কুমুদিনী ও কুমারী বাসন্তীর মাতৃঠাকুরাণী গদ্যে ও পদ্যে উত্তম রচনা লিখিয়া থাকেন। কিছুদিন তিনি অন্তঃপুর পত্রিকার সম্পাদিকার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমার বাবুর নিবাস ময়মনসিংহ জেলার একটি পল্লীগ্রামে। তিনি যখন ময়মনসিংহের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন, তখনই ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও সাধু অঘোরনাথের ধর্ম্মোপদেশে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি কন্যাদিগের সুশিক্ষার প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন। কুমারী কুমুদিনী এবং কুমারী বাসন্তী এই দুই ভগিনী "সুপ্রভাত" নামক মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন। কুমারী কুমুদিনী "শিখের বলিদান" ও মেরী কার্পেণ্টারের জীবনী" শীর্ষক দুইখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমাদের আশা আছে, ইঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া দেশের উপকার করিবেন। ইঁহারা দুই ভগিনী সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে ইঁহারা যখন ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীতগুলি গান করেন, তখন উপাসকদিগের অন্তরে ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

কুমারী সরোজিনী দাস নোয়াখালির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সদয়াচরণ দাস মহাশয়ের কন্যা। সদয় বাবুর নিবাস শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কুমারী দাস বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শুধু যে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নয়। তাঁহার অধ্যবসায় আশ্চর্য্য। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঢাকা বিভাগের বালিকাবিদ্যালয় সমূহের এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্‌পেক্ট্রেস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা-করি কুমারী দাসের চেষ্টায় স্ত্রী শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

শ্রীমতী সুষমা মৈত্র ও কুমারী রমা ভট্টাচার্য্য দুই ভগিনী। ইঁহারা পরলোকগত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কন্যা। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিবাস ফরিদপুর। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। শেষ বয়সে সন্ন্যাস- ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রামানন্দ ভারতী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কন্যাদিগকে ব্রাহ্মসমাজে রাখিয়া গিয়াছেন। কন্যাদিগের মধ্যে মধ্যমা কন্যা বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুষমা এবং কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী রমা বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে শ্রীমতী সুষমার বিবাহ হইয়াছে।

এইবার আমরা, শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাসের বিষয় কিছু লিখিব। মিসেস্ দাস স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়ের কন্যা। খাস্তগির মহাশয়ের নিবাস চট্টগ্রাম। ঐ অঞ্চলের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দ্বারা চট্টগ্রামের অনেক উন্নতি হইয়াছে; অনেক যুবক তাঁহার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এখনও খাস্তগির মহাশয়ের নামোল্লেখ করিলে, চট্টগ্রামবাসী লোকদিগের অন্তর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

খাস্তগির মহাশয় বড় ডাক্তার ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কলিকাতায় বাস করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য তিনি খুব চেষ্টা করিয়াছেন।

খাস্তগির মহাশয়ের চারি কন্যা। এক কন্যা মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পুত্রবধূ ছিলেন। এক কন্যার সঙ্গে সিবিলিয়ান বি, এল, গুপ্ত মহাশয়ের এবং আর এক কন্যার সঙ্গে চট্টগ্রামের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেনের বিবাহ হইয়াছিল। এই তিন কন্যারই মৃত্যু হইয়াছে। বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার এন্ দাসের সঙ্গে মিসেস্ দাসের বিবাহ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল ডাক্তার দাস পরলোক গমন করিয়াছেন।

মিসেস্ দাস এখন বেথুন কলেজের কর্ত্রী। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতে অনার পাশ করিয়াছিলেন। বেথুন কলেজ ব্যতীত কিছু দিন তিনি মহীশূরের রাজার মহিলা-বিদ্যালয়ের কর্ত্রী ছিলেন। মিসেস্ দাস সুন্দর বীণা বাজাইতে পারেন। এক সময় ব্রাহ্মসমাজের অনেক সায়ং-সমিতিতে বীণা বাজাইয়া তিনি মান্দ্রাজী ভজন গাইতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা আছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মোৎসাহী ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণই উক্ত সভার সভ্যপদ অধিকার করিয়া থাকেন। এই দুই তিন বৎসর হইতে মিসেস্ দাস উক্ত সভার সভ্য নিযুক্ত হইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের বালকবালিকাদিগের সুশিক্ষার জন্য একটি নীতি বিদ্যালয় আছে। মিসেস্ দাস উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। মিসেস্ দাসের সঙ্গে আলাপ করিলে তাঁহার ভদ্রতা, লজ্জাশীলতা ও নম্র ভাব দেখিয়া বড় আনন্দ হয়। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার রচনা লিখিবার অভ্যাস আছে। এক সময় "সখা ও সাথী" পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। আমাদের "ভারত-মহিলায়" প্রবন্ধ লিখিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু অবকাশ না থাকায়, লিখিতে পারেন নাই।

কুমারী প্রতিভা গুহ ও কুমারী শিশির কুমারী গুহ দুই ভগিনী। ইঁহারা ঢাকার শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ মহাশয়ের কন্যা। মথুর বাবু ধর্ম্মভীরু ও ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি। তিনি যৌবনকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কন্যাদিগকে উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত বেথুন কলেজে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমতী প্রতিভা ও শ্রীমতী শিশির দুই ভগিনী বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী প্রতিভা ঢাকা ইডেন ফিমেল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সেই সমাজের বালকবালিকাদিগের উন্নতির জন্য যথার্থ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ঢাকায় একটি নীতিবিদ্যালয় আছে। প্রায় পঞ্চাশটি বালক বালিকা উক্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। শ্রীমতী প্রতিভা ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এবং সহকারী সম্পাদিকা। তাহা ছাড়া অধিক বয়সের মেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য একটি সঙ্গত আছে। শ্রীমতী প্রতিভা ঐ সঙ্গতের সম্পাদিকা।

কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং মাননীয়া ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর কন্যা। ইনি ইঁহার জননীর ন্যায় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি ইঁহার অনুরাগ আছে।

কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত কলিকাতার খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কন্যা। ইনি এ বৎসর বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিবাস শ্রীহট্ট জেলায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

সুমিত্রা।

অয়ি গো সুমিত্রা দেবী, রাজেন্দ্রানী নির্ব্বাক প্রতিমা
চিরদিন দেখি তোমা ম্লানময়ী বিহীন গরিমা।
লজ্জানম্র বধূসম স্থির ধীর ভীতা সচকিতা!
কে তুমি গো শুচিস্মিতে নিগৃহীতা চির উপেক্ষিতা?
রাজরাণী তবু তোমা দীনা ক্ষীণা কেন দেখি মাতা?
দাসীসম সপত্নীর আদেশ পালনে ব্যস্ত সদা।
কি এক প্রচ্ছন্ন ব্যথা আছে যেন তোমার অন্তরে
তব ধৈর্য্যশীল হৃদি আবরিয়ে চিরদিন ধ'রে।
যখন দেখি গো তব প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণ কুমার,
স্বেচ্ছায় অগ্রজ সাথে হ'তে বনবাসে হল আগুসার,
বিদায় মাগিল যবে বন্দি তব পূত শ্রীচরণ,
না শুনিনু তব মুখে হা হুতাশ বিলাপ ক্রন্দন,
বারেক বারণ বাধা রোষ ক্ষোভ বিস্মিত আনন,
পাষাণী সপত্নী প্রতি না দেখিনু দোষ আরোপণ।
জগৎ ঘৃণিল যারে দিয়ে মাথে কলঙ্কের ডালি।
ভরে ভরে নিলে মা মস্তকে তুলি তার পদধূলি!
ভিক্ষালব্ধ চরু লয়ে সপত্নীর কাছে শত অনুনয়ে,
দুইটী যুগল রত্ন লভিলা গো সানন্দ হৃদয়ে!
সপত্নী নন্দন হস্তে চিরদাস রূপে করি সমর্পণ
তবু না দেখিতে পাই তার লাগি সন্তাপ কখন।
হে দেবী! বল্কল দেখি পরিধানে প্রাণের নন্দনে,
উর্ম্মিলা বধূর তব ম্লানমুখ বিদায়ের ক্ষণে—
দিয়াছিল কত ব্যথা হায় তব কোমল হৃদয়ে!
পাষাণ-প্রতিমা-হেন দেখি তোমা তবু দাঁড়াইয়ে,
শান্তভাবে দিতেছ বিদায় মাগো চাহি সকরুণে!
ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়া প্রতি কি কঠোর কর্ত্তব্য পালনে,
নীরবে করিছ ব্রতী ভ্রাতৃপ্রাণ লক্ষ্মণে গো মাতা।
বনবাসে ত্বরান্বিত করিছ কেমনে কহি ধর্ম্মকথা।
সহিতে বনের ক্লেশ উপদেশ দিতেছ কি মরি!
অয়ি শুদ্ধে, ধৈর্য্যশীলে, কি মহান্ আত্মত্যাগ তোরি!
গে'ছে কত যুগযুগান্তর তাই আজ দেখি সদা,
হিন্দুর পুরাণে তোমাদের পবিত্র অমৃত সম কথা—
আজ নর শুনিতে উৎসুক! শোক দুঃখ ভুলি,
তোমাদের চরিত আখ্যান মানে মহাতীর্থ বলি।
থাক হয়ে আজন্ম পূজিতা মাতা হিন্দু সতীগৃহে!
হিন্দুকুল হিন্দুভূমি থাক উজলিয়ে বাঁধি চির স্নেহে।

আদর্শ জীবনী-রচয়িত্রী।

যুগল সন্তানে সঁপি ভ্রাতৃ-সেবা-ব্রতে
হে জননি, কর নাই তুমি কিছু আশা,
তোমার অতুল স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা,
আনে নি উচ্ছ্বাস কভু জীবনের স্রোতে!
জগতের কোলাহল হ'তে চিরদিন
আপনারে দূরে স্থাপি নিখিল ভুবনে
দেখালে আদর্শ মহা নীরবে গোপনে
কেমনে করিতে হয় কর্ত্তব্য পালন!
এমন নিঃস্বার্থভাব, এমন সুন্দর
নিষ্কাম ধর্ম্মের ছায়া, কোথাও যে আর
পায় নি খুঁজিয়া মোর ব্যাকুল অন্তর—
তুমি কি মা শাপ-ভ্রষ্টা দেবী অমরার?
আজ মাগো সাধ যায় কহি সবে ডাকি'—
হো'ক ধন্য ওই পদে শুধু মাথা রাখি'!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জাপানে স্ত্রীজাতির রীতিনীতি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিবাহিতা মহিলা।

জাপানে কন্যাগণকে পঞ্চদশ কি ষোড়শ বর্ষে বিবাহ দেওয়া হয়। আমাদের দেশের ন্যায় জাপানেও বরের পক্ষ হইতে লোক যাইয়া ক'নে দেখিয়া আইসে। বরও ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে। তাহার যাওয়ার এমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। জাপানের স্ত্রীলোকগণ স্বামীকে দেবতা এবং নিয়তির অবতার বলিয়া সম্মান করেন। পরিণয়-কার্য্য নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। পরে ক'নে দেখা; তাহা বর বা অপর বন্ধুবান্ধব দ্বারা সম্পাদিত হয়।

অধিকাংশ স্থলেই বরকে বিবাহের পূর্ব্বে ক'নে দর্শনে যাইতে হয় না। অতঃপর উভয় পক্ষের পিতা বর ও ক'নে দর্শন করেন। তথায় ইহাকেই "পাকা" দেখা বলে। সেই স্থলেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া যায়। যথাকালে বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে ক'নে নানা অলঙ্কার এবং শ্বেত পোষাকে বিভূষিতা হইয়া অপর সঙ্গিনীগণের সহিত সভাস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাপানে শ্বেত পোষাক পরিধান করা দুঃখের চিহ্ন। অনেকে বলিতে পারেন তবে এহেন শুভক্ষণে— পরিণয় ব্যাপারে —দুঃখের পোষাক কেন? ক'নেকে বিবাহান্তে পিত্রালয় হইতে চির বিদায় লইতে হয়—That's a sign of her death to her home—সেই জন্যই মৃত্যুর পোষাক পরিধান করতঃ দুঃখ করিতে করিতে সভাস্থলে উপস্থিত হয়। যাহা হউক ক'নে যথাকালে পিতৃগৃহ হইতে স্বামী-গৃহে নীতা হইলে তথায় স্বামীর সহিত ক্ষুদ্র দু' পেয়ালা মদিরা পান করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। তথায় তাহার গাউন বদল করিয়া স্বামীপ্রদত্ত পোষাক পরিধান পূর্ব্বক বাহিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পরে বরের সঙ্গে আরও তিন পেয়ালা মদিরা পান করা হইলে উদ্বাহ-উৎসব সম্পন্ন হইয়া যায়। ইহার মধ্যে আমাদের দেশের ন্যায় বিবাহ কালে ভগবদুদ্দেশে মন্ত্রাদিও উচ্চারিত হয়। মন্ত্রের দুই চারিটি নমুনা—যথা ক'নের পিতা বলিলেন, "হে প্রভো, ভগবদাদিষ্ট কার্য্য জন্য অদ্য আমি আমার দুহিতাকে একটি নব পরিচিত মনুষ্যের হস্তে চিরজীবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যস্ত করিলাম।" বর বলিলেন, "আমি অদ্য জগৎপতিকে সহায় জানিয়া এই তরুণী ভার্য্যাকে গ্রহণ করিলাম। ইঁহাকে সম্পদে বিপদে যাবজ্জীবন ভরণ পোষণ করিবার ভার লইলাম। হে নিখিলেশ, আপনি আমাদের ধর্ম্মকার্য্যে সহায় হউন।" ক'নে বলিলেন, "আমি কায়মনোবাক্যে স্বামীসেবা-তৎপরা হইয়া তাঁহার প্রতি কার্য্যে সহায় হইব।" এই মন্ত্রগুলি আমাদের দেশের বিবাহের মন্ত্রের অনুরূপ। এইরূপ মন্ত্রের প্রথা বোধ হয় সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে জাপানে অতি অদ্ভুত রীতি বিদ্যমান ছিল। বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে স্বামীর বংশনাম পরিবর্ত্তিত হইত এবং তাহাকে স্ত্রীর বংশনাম গ্রহণ করিতে হইত। তাহার পুত্র জন্মিলে আবার পূর্ব্ব পিতৃপুরুষের নাম পুনঃ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা জন্মিত। এখন এই প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিবাহে গোলযোগ হইত বলিয়া অধুনা বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রী করিয়া লইতে হয়।

মিঃ আরনেষ্ট নামক জনৈক সাহেব বলেন, জাপানের যুবতী কুমারীগণ কখনও চঞ্চলা নহেন। তাঁহারা বিবিধ ভঙ্গিতে যুবকদিগের মন ভুলাইতে চেষ্টা করেন না। পিতা বা অপর গুরুজন তাঁহাদিগকে যে প্রকার পাত্রে সম্প্রদান করেন তাঁহারা তদ্রূপ ভর্ত্তাই গ্রহণ করেন। ইঁহারা বলেন, প্রজাপতিই (Destiny) তাঁহাদিগের এইরূপ পরিণয় সঙ্ঘটন করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার উপর মনুষ্যের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কুমারী অবস্থায় কালাতিপাত করিতে ইচ্ছুক নহেন! ইঁহারা বিবাহিতা হইয়া স্বামীগৃহে গমন পূর্ব্বক স্বামী ও তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে বাস করিতে থাকেন। তথায় ইঁহাদের অপর গৃহিণীগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে বাস করিতে হয়। কর্ত্রীঠাকুরাণী শ্বশ্রূ বা তৎস্থানীয়া অপর কেহ। স্বামী অপেক্ষা শ্বশুর শাশুড়ীর আজ্ঞা পরিপালনই তথায় তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। প্রকৃত পক্ষে তিনি তাঁহার শাশুড়ীর আজ্ঞাবহা পরিচারিকা। শাশুড়ী না থাকিলে বধূকে গৃহিণীপনা করিতে হয়। তখন তাঁহাকেই ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়। দাসদাসী থাকিলে খাটাইয়া লইতে শিক্ষা করিতে হয়। তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে সাধারণ লোকের সাক্ষাতে বাহির হয়েন না। যদি কখনও বাহির হইতে হয় তবে পরিচারিকাগণ সঙ্গে থাকে। জাপানের সম্রাজ্ঞী পর্য্যন্ত এই নিয়মের অধীন হইয়া চলেন। তাঁহার তো দাসদাসীর অভাব নাই কিন্তু স্বামীসেবা তিনিও স্বহস্তেই করেন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, স্বামীসেবা পরিচারক বা পরিচারিকাগণ দ্বারা কোন প্রকারেই সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং স্বামীসেবার কার্য্য স্বয়ং সম্রাজ্ঞীই করিয়া থাকেন।

অতি প্রত্যূষে জাপরমণীগণ শয্যা ত্যাগ করেন। তন্মধ্যে কুলবধূগণ সর্ব্বাগ্রে সুপ্তোত্থিতা হয়েন। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ভগবানের নাম করিয়া, সমস্ত রজনী যে আলোটি

টিপিটিপি জ্বলিতেছিল তাহা নির্ব্বাণ করেন। জাপানের সকল লোকেই রাত্রিকালে আলো জ্বালিয়া শয়ন করে। তৎপর পোষাকাদি করিয়া দাসদাসীগণকে জাগাইয়া থাকেন। শেষে প্রাতরাশের আয়োজন করেন। তাঁহাদের কার্য্যে অনুচরবর্গও সাহায্য করিয়া থাকে। সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইলে গৃহকর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ করান হয়। স্বামী বা গৃহকর্ত্তা ভোজনান্তে আফিসাদি বা অপর কর্ম্মকার্য্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে তাঁহার স্ত্রী দ্বারদেশে চন্দন, পুস্তক, ছত্র ও অপরাপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্তুত থাকেন। ইহাই তথাকার ব্যবস্থা।

বৃদ্ধাবস্থা ও বিশ্রাম।

বৃদ্ধাবস্থায় জাপরমণীগণ বিশ্রাম-সুখ অনুভব করেন। জাপানী নারীগণের হৃষ্টপুষ্ট ও সুগোল দেহ দর্শনে তাঁহাদিগকে স্বাস্থ্যের প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য নারীদিগের ন্যায় তাঁহাদের স্বাস্থ্য দীর্ঘস্থায়ী নহে। যাঁহার যত বয়স হউক না কেন জাপানী মহিলা প্রাণান্তেও আপনাকে পোষাক পরিচ্ছদে অল্পবয়স্কা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে ঘৃণা বোধ করেন। বৃদ্ধ বয়সে নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া তাঁহারা ভগবনের নাম করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তখন কত সুখী বলিয়া মনে হয়।

সামুরাই স্ত্রীগণ।

ইঁহাদের প্রভাবেই জাপান ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য জাপানবাসীগণ তাঁহাদের অত্যন্ত সমাদর করিয়া থাকে। এই সামুরাই স্ত্রীগণ ডেইমিয়স (Daimios) নামক শাসকশ্রেণীর স্ত্রীগণের দাসী ছিলেন। তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে অতি হীন কার্য্য করিতে হইত। তাঁহারা অন্দর-মহলের কুমারীগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও নৈশ-পরিচারিকার কার্য্য করিতেন। তাঁহারা যুদ্ধ করিতে পারিতেন। ধনী কুলীন ও উচ্চ বংশসম্ভূত কুমারীগণের তত্ত্বাবধান করিতেন ও পুরুষগণ অপর প্রদেশে রাজকার্য্যানুরোধে গমন করিলে তাঁহারাই শত্রুহস্ত হইতে স্ত্রীগণ ও রাজপরিবারগণকে রক্ষা করিতেন। তাহাতে যুদ্ধাদি পর্য্যন্ত করিতে হইত। সেই সময় এই বীর রমণীগণ তুলাসংযুক্ত পা-জামা, শক্ত টুপী ও বিশাল বল্লম ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা দীর্ঘ বর্শা ও ক্ষুদ্র তরবারি চালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহারা কথন কখনও দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহাদের নাম ও খ্যাতি অব্যাহত রাখিবার জন্য এবং স্বামীহন্তাকারীর বধসাধন মানসে তাঁহারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃতা হইতেন। ইহাতে তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতেও সঙ্কুচিতা হইতেন না। এক্ষণে জাপান-সম্রাটের আর সে দিন নাই। এখন তিনি বহু সৈন্যের অধিনায়ক, কিন্তু সেই সামুরাই স্ত্রীগণ এখনও বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা জাপানের এক প্রধান শক্তি। তাঁহারা এক্ষণে শিক্ষয়িত্রী ও ধাত্রীরূপে তথায় বিরাজিতা। তাঁহাদের তুল্য কার্য্যপটু পরিচারিকা আর দ্বিতীয় নাই। এখনও তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধকার্য্যের রিহার্সেল দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাণনাশক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্রাদির সাহায্যেই তাঁহারা প্রাচীন অভ্যাস অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। জাপানে এই শ্রেণীর স্ত্রীজাতি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। তাঁহাদের উদ্যোগেই তথাকার ললনাকুলের উন্নতি হইতেছে। ইঁহারাই জাপানবাসীগণকে উন্মাদনী শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

গেইষা স্ত্রী।

গেইষা (Gaisha) নামে জাপানের এক প্রকার শিক্ষিতা নর্ত্তকী-সম্প্রদায় আছে। ইহাদের জীবন তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। ইহাদের চরিত্রও পবিত্র নহে। তবে ইহারা বুদ্ধিমতী বটে।

শ্রীগণপতি রায়।

ম্যাডাম গঁ্যায়ো।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সময় হইতে কারাগারে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ম্যাডাম গঁ্যায়োকে নানা সহরে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। যে সকল নগরে গমন করিতেন, তিনি তথাকার জীবনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যখন আমি প্রথমে কার্য্যে বাহির হইলাম, তখন লোকে ভাবিল, আমি বুঝি, রোমান ক্যাথলিক মতে লোককে দীক্ষিত করিবার জন্য গমন করি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তাহা ছিল না; আমার আদর্শ আরও উচ্চ ছিল। এই আদর্শে আমি কোন দল প্রস্তুত করিতে

বাহির হই নাই, আমি ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিবার জন্যই বাহির হইয়াছিলাম। লোককে ক্যাথলিক মতাবলম্বী করি, এ আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি মানুষকে ভগবানের সাহায্যে যীশু সম্বন্ধে উচ্চ জ্ঞান দিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। দীক্ষিত ত কত লোক হয়, কিন্তু পবিত্র ধার্ম্মিক-জীবন কয়জনে যাপন করিতে পারে?"

আমরা ভগবানের উপর কতকটা নির্ভর করি, এবং কতকটা নিজ বুদ্ধি ও কর্ম্মের উপর নির্ভর করি; তাঁহাকে সকল অর্পণ করিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার উপর নির্ভর করিলে সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়; যে জীবনে এইরূপ নির্ভরশীলতা আছে তাহাই আদর্শস্থানীয়।

১৬৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনেভা নগরের ছয় ক্রোশ দূরে Gex (গেক্স) নামক স্থানে বাস করিতে যান; ইহার কিছুকাল পরে তিনি জেনেভা হ্রদের উপরিস্থিত থনো নামক স্থানে গিয়া বসতি করেন; কিন্তু পীড়িত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন; তৎপর টিউরিন্, গ্রেনোব ও মার্সেলিস্ ঘুরিয়া পুনরায় পাঁচ বৎসর পরে পারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার এই ভ্রমণের সময়ে লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিতে এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিত। তিনি বলিয়াছেন, "ভগবানের কৃপায় আমি দুই তিনটি পাদ্রিকে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহারা ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ এবং আভ্যন্তরীণ জীবন গঠন সম্বন্ধে প্রচলিত মত এবং প্রথা ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পূর্ব্বে আমার কুৎসা পর্য্যন্ত রটনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নূতন আকাঙ্ক্ষা দান করিলেন।" চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিকট লোক আসিতে লাগিল; সন্ন্যাসী, পুরোহিত, সাংসারী, এবং সধবা বিধবা কুমারী সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত অমৃতময় জীবনপ্রদ উপদেশ শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইত।

তিনি বলিয়াছেন, "আমি ঈশ্বরের কথা বলিতে এত ভালবাসিতাম, যে প্রাতঃকাল ছয়টা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত আমি ভগবৎ-কথা বলিতে বিরত হইতাম না। আমার কথোপকথনের সময়ে নূতন কথা বলিবার জন্য চিন্তা বা পাঠ করিবার অবসর পাইতাম না; কিন্তু ঈশ্বর আমার সঙ্গে ছিলেন, এবং তিনি লোকের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও অভাব আমাকে জানাইয়া দিতেন। এই সময়ে অনেকে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, কেহ কেহ মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইত, কেহ কেহ চেষ্টা করিতে করিতে তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিত। তাঁহার কার্য্য অদ্ভুত।"

তিনি পারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার শত্রুগণ—বিশেষভাবে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং বিমাতার চেষ্টায় তিনি সেণ্ট মেরিয়া মঠে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার কন্যাকে তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল এবং আট মাস ঐ মঠে তাঁহাকে বন্দীভাবে থাকিতে হইল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ফরাসীরাজের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি যে সকল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কারাগারে আগমনেও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, কারণ পত্রের দ্বারা তিনি তাঁহার প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার মত এবং বিশ্বাসের একজন প্রধান সহায় ভগবান্ মিলাইয়া দেন। ইনি সাধু ফেনিলোঁ। প্রচলিত বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া গ্যাঁয়ো বলিতেন, "ভগবান স্বয়ং হৃদয়ে শান্তি দান করেন এবং তাঁহার হস্তে জীবন দান করাই মুক্তির উপায়।" এইমত দিন দিন চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিলে, সকলে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইল। তাহারা বুঝিত, যথার্থ ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে পুরোহিতদিগের সমূহ ক্ষতি হইবে। মহাপণ্ডিত যাজক বোসে (Bossuet) অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ম্যাডাম্ গ্যাঁয়োর মুখবন্ধ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু উক্ত ফেনিলোঁ নামক সুপণ্ডিত যাজক গ্যাঁয়োর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে দুই দলে ভীষণ কলহ উপস্থিত হইল; বোসে (Bossuet) ফেনিলোঁকে (Fenelon) ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করিতেও ছাড়েন নাই। তাঁহার পক্ষে স্বয়ং রাজা চতুর্দ্দশ লুই ছিলেন, তাঁহার

ম্যাডাম গ্যায়োঁ

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

প্রভাবেই পোপ (Pope) দ্বাদশ ইনোসেণ্ট (ennocent) অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফেনিলোঁর একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশে বাধা দেন।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ক্রমে বোসে ম্যাডাম্ গ্যায়োর একজন প্রধান অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। ছয় মাসকাল তিনি তাঁহার মঠে পরম সুখে অতিবাহিত করেন। কিন্তু যখন তিনি ঐ স্থান হইতে প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,তখন গ্যায়োর শত্রুরা দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার বিরুদ্ধে লাগিল, এবং তাহাদের প্ররোচনায় রাজা ম্যাডাম্ গ্যায়োকে একটী দুর্গে বন্দী করিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। এখানে তিনি অতি সুখেই সময় কাটাইয়াছিলেন। তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,—"আমি অতি শান্তিতে কাল অতিবাহিত করিতাম, এবং যদি ভগবানের ইচ্ছানুসারে আমাকে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিতে হইত, তাহাতেও আমি দুঃখিত হইতাম না; আমি কারাগারে কতকটা সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সঙ্গীত রচনা করিতাম। আমি গান রচনা করিয়াই আমার পার্শ্বানুচরী La Guntiereএর সহিত গান গাইয়া উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতাম। আমরা দুই জনে মিলিয়া কি আনন্দেই ভগবানের নাম গাইতাম! সঙ্গীত করা ব্যতীত তখন আমার আর কোন কর্ম্মই ছিল না। আমি হৃদয়ে অপার আনন্দ উপভোগ করিতাম বলিয়া আমার চতুর্দ্দিকস্থ সকল বস্তুতেই জীবন্ত উজ্জ্বলতা দেখিতে পাইতাম। কারাগারের প্রস্তরসমূহ আমার নিকট মুক্তার মত বোধ হইত, এবং কারাগার আমার নিকট অতি মিষ্ট লাগিত।" ভগবানকে যাহারা ভালবাসে তাহারা বিপদের সময়ও প্রফুল্ল হৃদয়ে সকল কষ্ট ভুলিতে পারে। শ্রীমতী গ্যায়োও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

তিনি যখন এইরূপে ভগবানের গুণগানে বিভোর, তখন তাঁহার শত্রুরা তাঁহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটাইতে চেষ্টা করিল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বেষ্টাইল নামক ভীষণ দুর্গে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তিনি চারি বৎসর যাপন করেন। কারা-কষ্ট কি করিয়া বহন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছেন,—"হে ঈশ্বর, আমি বেষ্টাইলে থাকিয়া, তোমাকে বলিতাম, যদি তোমার ইচ্ছা হয় যে দেব মানবের নিকট আমাকে অপদস্থ করিবে, তাহা হইলে তোমারই পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হউক্! তোমার নিকট এই আমার একমাত্র প্রার্থনা, যে যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদিগকে তুমি সর্ব্বদা রক্ষা কর। জীবন, মৃত্যু অথবা কোন পাশবিক ক্ষমতা যেন তাহাদিগকে তোমার প্রেম হইতে বঞ্চিত করিতে না পারে। আমাকে যে যাহা বলে বলুক, তাহারা আত্মার কি করিতে পারে? আমাকে কেহ ত আমার মুক্তিদাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না! আমি যদি তোমার নিকট গ্রহণীয় হই, তবে আমাকে সকল জগৎ ঘৃণা ও তুচ্ছ করুক, আমার কোন আপত্তি নাই। তাহাদের প্রদত্ত আঘাত আমাকে দোষমুক্ত করিয়া নির্ম্মল করিয়া দিবে,এবং আমি শান্তি উপভোগ করিতে পারিব। তোমার কৃপা বিনা আমি নিতান্ত দীন। হে মুক্তিদাতা! আমি আপনাকে তোমার নিকট নৈবেদ্যস্বরূপ অর্পণ করিতেছি। আমাকে পবিত্র কর, আমি যেন তোমাকর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারি।"

চুয়ান্ন বৎসর বয়সে তিনি বেষ্টাইল (Bastile) হইতে মুক্তি লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পুনঃ ব্লয় (Blois) নগরের দুর্গে নির্ব্বাসন দেওয়া হইল; এইখানে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট পোনর বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "এইখানে আমি প্রচুর পরিমাণে ভগবানের প্রেমানন্দ ভোগ করিয়াছিলাম। বেষ্টাইল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমার ভগ্ন হৃদয় ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিল; কিন্তু আমার শরীর বার্দ্ধক্য বশতঃ দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল।"

তাঁহার এই অবস্থায়ও তাঁহার উপর শত্রুদের ক্রূর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তিনি অচল অটল ভাবে সত্যকে আঁকড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে ভক্তি ও বিশ্বাস যেন জ্বলন্ত ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে দলিল লিখেন, তাহা অতি চমৎকার! "আমি তোমারই নিকট হইতে সকল দ্রব্য পাইয়াছি, এবং আমি তোমাকেই সকল অর্পণ

করিয়া যাইতেছি। হে ঈশ্বর, তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর! আমি তোমাকে আমার শরীর ও আত্মা অর্পণ করিতেছি, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ কর। তোমা ছাড়া আমি কি দৈন্যে থাকি, তাহা ত তুমি দেখ! তুমি ত জান পৃথিবীতে তুমি ব্যতীত, আমি অন্য কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি আমার আত্মাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিতেছি,—ইহার মুক্তির জন্য আমি আমার কৃত কোন কর্ম্মের উপর নির্ভর করি না, সম্পূর্ণ তোমারই কৃপার উপর নির্ভর করিতেছি।”

১৭১৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে ম্যাডাম্ গ্যাঁয়ো নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তের ক্রোড়ে গমন করেন। ব্লয়ের গির্জ্জায় তাঁহার সমাধি হয়। এরূপ স্বর্গীয় পবিত্র জীবন সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার কিছুই নাই; এই জীবন প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় পবিত্র নির্ম্মল ও সুন্দর। খৃষ্টানদের মধ্যে ম্যাডাম্ গ্যাঁয়ো, মুসলমানদের মধ্যে রাবেয়া, এবং হিন্দুদিগের মধ্যে মীরাবাই ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী নারীদিগের নিকট উচ্চতম আদর্শ। পৃথিবীতে নারী জাতির উন্নতি না হইলে মানবজাতির মনুষ্যত্ব বিকাশ হইবে না। কিন্তু জীবন উন্নত করিতে হইলে আদর্শের প্রয়োজন; সেই জন্য এই আদর্শ মহিলার জীবন নারী-সমাজের সম্মুখে ধারণ করিলাম; আশা করি নারীজাতি ম্যাডাম্ গ্যাঁয়োর ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাসের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য করিবেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সরল কৃত্তিবাস ও সরল কাশীরাম দাস।

(সমালোচনা।)

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু উক্ত পুস্তক দুইখানি প্রকাশ করিয়া অনেক দিনের একটি অভাব দূর করিয়াছেন, বটতলায় ছাপাখানার ভূতদিগের দৌরাত্ম্য এবং অন্য কারণেও বাজারে চলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামদাসী মহাভারত, ইচ্ছাসত্ত্বেও, অনেকে বালক-বালিকাদিগকে পড়িতে দিতে পারিতেন না, অথচ ছেলেরা এমন দুইখানি উপাদেয় গ্রন্থের রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইতেছে বলিয়া কতই না ক্ষুব্ধ হইতেন। কেহ বা মূল রামায়ণ মহাভারতের আখ্যান গল্প করিয়া ছেলেদের শিখাইতেন। এ হেন সময়ে যোগীন্দ্র বাবুর সম্পাদিত সরল কৃত্তিবাস ও সরল কাশীরাম দাসের আবির্ভাব হইয়াছে—‘তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম।’ যোগীন্দ্র বাবু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত; তৎপ্রণীত ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী’ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য; ‘অহল্যাবাই’ স্ত্রী-পাঠ্য উৎকৃষ্ট পুস্তক। বালকবালিকাদিগের জন্য ইতিপূর্ব্বে যোগীন্দ্র বাবু ‘কবিতাপ্রসঙ্গ’ ও “আদর্শ কবিতা” প্রণয়ন করিয়াছেন। এরূপ সদ্ভাবপূর্ণ পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে বিরল। যোগীন্দ্র বাবু আমাদের দেশের বালকবালিকা-দিগকে প্রকৃতশিক্ষা দিতে ইচ্ছুক এবং এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য যোগ্য ব্যক্তি আমাদের দেশে অল্পই আছেন।

সরল কীর্ত্তিবাস ও সরল কাশীরাম দাস সর্ব্বত্রই প্রশংসিত হইয়াছে। সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু ত্রুটির কথা কেহ কহেন নাই। আমার সামান্য বিবে-চনায় পুস্তক দুইখানির স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সম্পাদকের মহদুদ্দেশ্য সাধনের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা করিলেও করিতে পারে মনে করিয়া সেই সকল ত্রুটির কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমে সরল কৃত্তিবাসের কথা বলিতেছি। আমার নিকট প্রথম সংস্করণের পুস্তক আছে, আমি তদবলম্বনেই আমার বক্তব্য বলিতেছি। পুস্তকের ১৭ এবং ১৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরামাদির জন্ম বিবরণ আছে; কিন্তু তিন রাণীর চারি পুত্রের মধ্যে কোন্ রাণীর পুত্রের নাম কি হইল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কৌশল্যার পুত্র হইলেন রাম, তাহা এই দুই ছত্র পাঠে কতক বুঝা যায়, যথা:—

“এতদিনে দশরথ মনেতে উল্লাস।
রাম জন্ম রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥”

পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে:—

“শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ;
এক অংশে চারি অংশ হইল নারায়ণ।”

এ বিষয় সম্বন্ধে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে :—

যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিরাম।
কৌশল্যা পুত্রের নাম রাখিলেন রাম ॥
পৃথিবীর ভার সহিবেন অবিরত।
কৈকেয়ী পুত্রের নাম হইল ভরত ॥
সুমিত্রার হইয়াছে যমজ নন্দন।
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ ॥

সরল কৃত্তিবাসে এই ছয় ছত্র থাকিলে ভাল হইত। অথবা যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার "আদর্শ কবিতার" "রামায়ণ-কথা" হইতে নিম্নলিখিত চারি ছত্র বসাইয়া দিতে পারিতেন, যথা :—

"কৌশল্যা দেবীর গর্ভে জন্মিলেন রাম।
প্রসন্ন কমল আঁখি দুর্ব্বাদল শ্যাম ॥
কৈকেয়ীর জন্মিলেন ভরত কুমার।
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন দুই পুত্র সুমিত্রার ॥

সরল কৃত্তিবাসের ১৫৬ পৃষ্ঠায় বিভীষণ রামকে কহিতেছেন যে, লক্ষ্মণকে আমার সহিত প্রেরণ করুন, আমরা গিয়া ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ ভঙ্গ করিব। তদুত্তরে :—

শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাবো লক্ষ্মণ ॥
একে ইন্দ্রজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর।
তাহাতে সঙ্কট পুরী লঙ্কার ভিতর ॥
বালক লক্ষ্মণ অতি সহজে কাতর।
ফল মূলাহারে আছে শীর্ণ কলেবর ॥
কষ্ট পেয়ে বলহীন তাই ভাবি মনে।
কেমনে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিত সনে ॥

"স্নেহ পাপশঙ্কী" বটে, তথাপি রাম ক্ষত্রিয় বীর, লক্ষ্মণও তাহাই, লক্ষ্মণ সম্বন্ধে রামের এরূপ নারীজন-সুলভ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। এ বিষয়ে আর একটু রং ফলাইয়া মাইকেল মধুসূদন লক্ষ্মণকে কাপুরুষের চূড়ামণি সাজাইয়াছেন। মধুসূদনের চরিত-লেখক যোগীন্দ্র বাবুকে আর সে কথা বেশী বলিতে হইবে না। এমত অবস্থায় ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত আট ছত্র বাদ দিলেই ভাল হইত। বাল্মীকির রামায়ণে রাম ইন্দ্রজিতের শৌর্য্যবীর্য্যের কীর্ত্তন করিয়া, কোনরূপ কান্নাকাটি না করিয়াই লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন যে, "বানর-সেনা পরিবৃত হইয়া তুমি ইন্দ্রজিৎকে নিধন কর। বিভীষণ অনুচর সহ তোমার পশ্চাৎ গমন করিবেন, তিনি ইন্দ্রজিতের সকল মায়ার বিষয় অবগত আছেন।" লক্ষ্মণ সে কথার উত্তরে কহিলেন, "যেরূপ হংসগণ পুষ্করিণীতে পতিত হয়, তদ্রূপ অদ্য মদীয় ধনুর্মুক্ত শর সকল রাবণির শরীর ভেদ করিয়া লঙ্কামধ্যে পতিত হইবে। আমার সুমহৎ ধনুর্গুণ-বিচ্যুত শর সকল অদ্যই সেই রৌদ্র রাক্ষসের শরীর ভেদ ও বিদারিত করিয়া ফেলিবে। কৃত্তিবাসের হাতে পড়িয়া বাল্মীকির রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া পড়ুক ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি কৃত্তিবাসের হাতে পড়িয়া বাল্মীকির আদর্শ-ক্ষত্রিয় রাম কথায় কথায় 'নাকের জলে চোখের জলে' হইয়া পড়েন তাহা হইলে, অন্ততঃ শিশুপাঠ্য সংস্করণে সে কীর্ত্তিটুকু বাদ দিয়া বাল্মীকির আদর্শ বজায় রাখিলেই বোধ করি ভাল হয়।

১৬৮।১৬৯ পৃষ্ঠায় গন্ধমাদন পর্ব্বত মস্তকে লইয়া হনুমানের শত্রুঘ্নের বাঁটুল খাইয়া জয়রাম শব্দে নন্দীগ্রামে পতন, ভরতশত্রুঘ্নের সহিত হনুমানের পরিচয়, ও ভরতের বাঁটুল দিয়া হনুমানকে শূন্যে তুলিয়া দেওয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এ ব্যাপারটা বাল্মীকির রামায়ণে নাই। এই গন্ধমাদন আনয়ন প্রসঙ্গে হনুর সহিত ভানুর কোলাকুলি ও হনুমান কর্ত্তৃক সূর্য্যকে বগলে দাবিয়া রাখার বিবরণ বাজারে চলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। যোগীন্দ্র বাবু সূর্য্যকে রেহাই দিয়াছেন। এ যাত্রায় ভরত শত্রুঘ্নকেও ছাড়িয়া দিলে ভাল হইত। কারণ ১৮৭ পৃষ্ঠায় রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিবার সময়—

হনুমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞাদান।
ভরতেরে সমাচার দেহ হনুমান ॥
নন্দীগ্রামে ভরতের যাইবে উদ্দেশে।
কহিবে সকল কথা অশেষ বিশেষে ॥

তদনুসারে হনুমান নন্দীগ্রামে গিয়া দেখিলেন,

"রত্নসিংহাসনোপরি শ্বেত-বস্ত্র পাতি।
তদুপরে পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি ॥

ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসার চর্ম্মে।
বশিষ্ঠ, নারদ লইয়া থাকে রাজকর্ম্মে॥
ভরত সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং অধিষ্ঠান।
অনুমানে ভরতে চিনিল হনুমান॥
উঠিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম।
যোড় হাত করি বলে আপনার নাম॥
হনুমান নাম মোর জাতিতে বানর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি, পবন কোঙর॥
যাঁহারে আনিতে গেলে ল'য়ে রাজ্য খণ্ড।
যাঁহার পাদুকাপরি ধর ছত্র, দণ্ড॥
বহু কাল দুঃখী আছ যাঁহার আশ্বাসে।
সেই রাম পাঠাইলা তোমার উদ্দেশে॥
শুভ বার্ত্তা কহে যদি পবন নন্দন।
উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন॥"

গন্ধমাদন-পর্ব্বত-মস্তকে হনুমানের সহিত যদি ইতি-পূর্ব্বেই ভরতের পরিচয় হইত, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত, যে হনুমান রামকে ভরতের কথা বলিতেন; তাহা হইলে রামও হনুমানকে বলিতেন না, যে ভরতকে সকল কথা 'অশেষ বিশেষে' বলিও; আর হনুমানও অনুমানে ভরতকে চিনিত না বা ভরতকে আত্মপরিচয় দিত না। ১৭৩ হইতে ১৭৯ পৃষ্ঠায় রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণের কাটামুণ্ড যোড়া লাগা, রাবণকে কোলে লইয়া রাবণের রথে অম্বিকার উপবেশন, রামের দুর্গাপূজা, দুর্গার রাবণকে ত্যাগ, হনুমানের ছদ্ম গণক বেশ ধারণ, মন্দোদরীকে ছলনা করিয়া রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন ও সেই মৃত্যুবাণাঘাতে রাবণবধ বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে এ সব কিছুই নাই! সরল কৃত্তি-বাসেও এই সকল বৃত্তান্ত না লিখিয়া বাল্মীকির রামায়ণ অনুসারে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পর লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করিলে রাম দ্বৈরথ যুদ্ধে ব্রহ্ম-অস্ত্রাঘাতে রাবণকে বধ করিলেন, এইরূপ লিখিলেই ভাল হইত। কেন, তাহা বলিতেছি। দুর্গোৎসব বাঙ্গালী হিন্দুর অতি আদরের বস্তু—বাঙ্গালীর উৎসবের মধ্যে দুর্গোৎসব প্রধান;—আবার আশ্বিনে যে দুর্গোৎসব হয় তাহা রাম-প্রতিষ্ঠিত পূজারই বাৎসরিক উৎসব। এরূপ স্থলে রামায়ণের মধ্যে দুর্গোৎসব গুঁজিয়া দিতে পারিলে বাঙ্গালী পাঠকের মনোহর হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে রামচন্দ্রের এবং দেবী দুর্গার গৌরবের হানি করা হয়। দুর্গা যদি রামের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া রাবণকে ত্যাগই করিলেন তবে রাবণকে কোলে লইয়া রথের উপর বসিলেন কেন? দেবীও কি অশিক্ষিত ধনী মানুষের মত অব্যবস্থিত চিত্ত এবং তাঁহার প্রসাদও কি ভয়ঙ্কর? আদৌ দেবীর উচিত হয় না পরদারাপহারী পাপপরায়ণ রাবণকে কৃপা করা; আবার একবার অভয় দিয়া পরমুহূর্ত্তেই সব ভুলিয়া ভক্তকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া আরও খারাপ। যে রাম সৈন্যবলে ও নিজবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া সীতার মত পতিব্রতা পত্নীর উদ্ধারের জন্য সাগর বাঁধিয়া এত দিন যুদ্ধ করিতেছেন তিনি, রাবণের রথে জলদবরণীকে দেখিয়াই একবারে হতবুদ্ধি হইয়া সীতা উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিলেন! অদৃষ্ট ও দৈবের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়া আমাদের দেশের লোকের নাকালের এক শেষ হইতেছে, এখন আর বাল্যকাল হইতেই যাহাতে তাহারা আদর্শ বীর রামকে দৈবনির্ভর-পরায়ণ না দেখে তাহা করাই সঙ্গত।

"লভে লক্ষ্মী সতত উদ্‌যোগী নরবর।
কাপুরুষ করে সদা দৈবেতে নির্ভর।"

আবার দুর্গা রাবণকে ত্যাগ করিয়া গেলেও কি নিস্তার আছে! এতদিনে বিভীষণের মনে পড়িল, যে রাবণের মৃত্যুবাণ না হইলে তাহার মৃত্যু হইবে না, এবং সে মৃত্যুবাণ আবার মন্দোদরী কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। একথা শুনিয়া হনুমান বলে যে, "কোন চিন্তা নাই! আমি যেমন করিয়া পারি মৃত্যুবাণ আনিতেছি; অমনি হনুমান এক বৃদ্ধ গণক সাজিয়া মন্দোদরীকে ঠকাইয়া রাবণের মৃত্যুবাণ আনিল। রাম সেই মৃত্যুবাণে রাবণকে বধ করিলেন, এই অংশটুকু বাদ দিলে উপাখ্যান ভাগের কিছুমাত্র অসম্পূর্ণতা ঘটিত না! কিঞ্চিৎ বৈচিত্রের অভাব ঘটিত বটে। বৈচিত্রের খাতিরে এমন কোন কথা বালকবালিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত হয় না, যাহাতে তাঁহাদের মনে এইরূপ বিশ্বাসের লেশ মাত্র জন্মে, যে রাম ছলনা ও চাতুরীর সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার

করিয়াছেন অথবা মিথ্যা জয়ী হইয়াছেন। রামায়ণের প্রধান শিক্ষা সত্যরক্ষা; যাহাতে সেই শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা, এমন কথা শিশুপাঠ্য পুস্তকে না থাকিলেই ভাল হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখিতে পাই, যে রামলক্ষ্মণের বদলে দশরথ বিশ্বামিত্রকে প্রথমে ভরত শত্রুঘ্নকে দেন, পরে বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিয়া রাজার প্রতি কোপ প্রকাশ করিলে দশরথ অবশেষে রামলক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দেন। যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার সম্পাদিত সরল কৃত্তিবাসে দশরথের এ কীর্ত্তি বাদ দিয়াছেন। সেইরূপ রাবণের মৃত্যুবাণের বিবরণ না দিলেই ভাল হইত। এইরূপে কয়েক স্থান বাদ দিলে পুস্তকের আকার কিছু কমিত সন্দেহ নাই, কিন্তু পুস্তকের প্রথম দিকে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান, সগর রাজার উপাখ্যান, এবং রঘু ও অজের উপাখ্যান দিলে সে অভাব পূর্ণ হইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

গৃহ শিক্ষা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(চৈত্র সংখ্যার পর)

কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা মিঃ গ্রেভিলের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হারবার্ট কিছু পূর্ব্বেই এই বাড়ীতে আসিয়াছে; মিসেস হ্যামিল্টন মনে করিয়াছিলেন, তিনি আসিতেছেন, হারবার্টের নিকট এই খবর শুনিয়া, মেরী তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে; মেরী তাঁহার আসিবার খবর পাইলে সর্ব্বদাই এরূপ করিত। কিন্তু আজ মেরীকে না দেখিয়া মিসেস্ হ্যামিল্টন একটু বিস্মিত হইলেন। একটু উদ্বিগ্ন অন্তরে তিনি মেরীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সে চক্ষের জলে ভাসিতেছে, আর হারবার্ট তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে। মিসেস্ গ্রেভিল সেখানে নাই। মেরী স্বভাবতঃ সংযতপ্রকৃতি, সহজে কাঁদিবার মেয়ে নয়, কিন্তু আজ হারবার্টও তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছে না দেখিয়া মিসেস্ হ্যামিল্টন বুঝিলেন, ঘটনা কিছু গুরুতর হইয়াছে।

এডওয়ার্ডকে বাহিরে যাইতে বলিয়া ধীরে ধীরে মেরীর নিকট যাইয়া তিনি তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন, এবং তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মেরী কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি তাহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিলেন।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে মিঃ গ্রেভিল বাড়ী আসিয়াছিলেন, এই এক মাস তিনি বাড়ীতেই ছিলেন। জুয়াখেলায় খুব জিত হওয়াতে প্রথম কয়েকটা দিন খুব ভাল ভাবেই কাটিয়াছিল। কিন্তু সে অতি অল্প দিন। তার পরেই তাঁহার নিত্যকর্ম্ম—তাঁহার স্ত্রীকে পদে পদে জ্বালাতন করা, এবং ছেলেটীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা—আরম্ভ হইল। পুত্র আলফ্রেডের বয়স সবে মাত্র ১২ বৎসর, কিন্তু গুণধর পিতা এই বয়সেই তাহাকে সর্ব্বপ্রকার কুসংসর্গে, জুয়াখেলায় ও রং-তামাসায় লইয়া যাইয়া থাকেন। মাতা পুত্রের দুর্দ্দশা ও ভাবী অকল্যাণের আশঙ্কা করিয়া যতই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন, পিতার মনে ততই আনন্দ হইতে লাগিল। মাতার কষ্টে মেরীরও মন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সে দিন প্রাতঃকালে আলফ্রেড নিকটবর্ত্তী একটা মেলায় আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য ও জুয়া খেলিবার জন্য পিতার নিকট যথেষ্ট অর্থ চায়। মিঃ গ্রেভিল পুত্রের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং তাহার প্রয়োজন মত অর্থ দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু মেরী দেখিল, মার মুখ ঐ প্রস্তাব শুনিয়া মড়ার মুখের ন্যায় পাংশুবর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু স্বামী গৃহে থাকা পর্য্যন্ত তিনি কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। স্বামী ঘরের বাহির হইয়া গেলে পুত্রও যখন তাঁহার পেছনে পেছনে বাহির হইয়া যাইবে, তখন তিনি নীরবে তাহার হাত ধরিয়া নিকটে টানিলেন। এমনি কাতর দৃষ্টিতে, এমনি ব্যথিত ভাবে তিনি পুত্রের মুখের দিকে তাকাইলেন যে সে চমকিয়া উঠিল। আলফ্রেড জানিত তাহার মা কেমন ধীর, শান্তপ্রকৃতি। অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা না হইলে কখনই তিনি এমন ভাবে তাহার দিকে তাকাইতেন না। কাতর অনুনয়ে জননী সন্তানকে তাহার সংকল্পিত আনন্দ

সম্ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। মার কাতরতায় সন্তানের প্রাণ গলিল। সে বলিল, সে এই মেলায় গেলে যদি তাঁহার মনে এত কষ্ট হয় তবে সে সেখানে যাইবে না। সে অত্যন্ত সরল ভাবেই মাতাকে এই কথা বলিয়াছিল কিন্তু পিতা তাহাকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে দিলেন না। মিঃ গ্রেভিল পুত্রের সংকল্প পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন এবং মার একটা খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা যে উচিত নয়, ইহাতে যে চিত্তের দৃঢ়তারই অভাব প্রকাশ পায় তাহা পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন। সুতরাং আলফ্রেড পুনরায় মেলায় যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। শুধু এখানে ক্ষান্ত হইলেও হইত। মিসেস্ গ্রেভিল যেখানে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেখানে উপস্থিত হইয়া মিঃ গ্রেভিল এক ঘণ্টা ধরিয়া মেরীর সম্মুখেই তাঁহাকে অশ্রাব্য কটুবাক্য শুনাইয়া দিলেন এবং শেষে এই বলিয়া শাসাইলেন, যে পুত্রের নিকট তাঁহার এরূপ পাদ্রিগিরির ফল এই হইবে, যে অতঃপর তিনি যখন বাড়ী থাকিবেন না তখন আর আলফ্রেডকে বাড়ী রাখিয়া যাইবেন না। এখন হইতে আলফ্রেড সর্ব্বত্র তাহার সঙ্গী হইবে। এই সকল কটূক্তি করিয়া তিনি পুত্রকে লইয়া অশ্বারোহণে মেলায় চলিয়া গেলেন। মিসেস্ গ্রেভিল নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তৎপর হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। মেরীর চীৎকারে দাসদাসীগণ আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহাকে শয়ন-গৃহে লইয়া গেল।

মিসেস্ হ্যামিল্টন কিছুক্ষণ তাঁহার বন্ধুর নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। মিসেস্ গ্রেভিল তাঁহার উপদেশে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

মিসেস্ হ্যামিল্টন যখন হারবার্ট ও এডোয়ার্ডকে লইয়া বাড়ী রওনা হইলেন তখন পথে কেহই কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন না। মিসেস্ হ্যামিল্টন বন্ধুর অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন। হারবার্ট ভাবিতে লাগিল, তাহার পিতা আর মেরীর পিতার মধ্যে কত প্রভেদ! তাহার প্রতি বিধাতার কি দয়া! এত দয়ার জন্য সে ভগবানের নিকট ত যথোচিতরূপে কৃতজ্ঞ হইতে পারিতেছে না! বাড়ী আসিয়াই সে দেখিল মিঃ হ্যামিল্টন তাহাদের অতিরিক্ত বিলম্বের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। হারবার্ট আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মিঃ হ্যামিল্টন অবাক্ হইয়া রহিলেন। অবশেষে হারবার্ট জননীর মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুতবেগে নিজের কুঠরীতে চলিয়া গেল। জননীর প্রতি দৃষ্টির অর্থ—হারবার্টের মন কেন আকুল হইয়াছে তিনি ত নিশ্চয়ই তাহা বুঝিয়াছেন, পিতাকে যেন তিনি তাহা বুঝাইয়া দেন! নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া হারবার্ট প্রায় এক ঘণ্টা দ্বার বন্ধ করিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল।

এডোয়ার্ড মাসিমার উপদেশ ভুলিয়া যায় নাই, কিন্তু রবার্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা তাহার নিকট এক মহা পরীক্ষার ব্যাপার হইল। অবশেষে অতি কষ্টে আত্মজয় করিয়া সে রবার্টের নিকট ক্ষমা চাহিল। মাসিমা তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া এমন প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিলেন যে, সেই এক দৃষ্টিতে ক্ষমা চাওয়ার সকল অপমান সে ভুলিয়া গেল।

জ্যোৎস্নায়।

মেঘের ফেণা ভেসে যায়
নীল সাগর-মাঝে রে,
শুভ্র সুরে কে বাজায়
নীরব শাঁখ আজি রে!
রূপোর হালে রূপোর পালে চন্দ্রতরী সাজে রে
নীল সাগর মাঝে রে!
ছড়িয়ে দিল ইন্দ্রজাল
ধরার শ্যাম তটে রে,
ছিল যা শুধু জঞ্জাল
তাও কি শোভা রটে রে,
রূপোর হাসি সুধার রাশি নীরব স্রোতে ছোটেরে
ধরার শ্যাম তটে রে!

সুর-কানন হ'তে ফুল
ঝরিয়া পড়ে কত রে,
তাহারি ভারে তারাকুল
আকাশ হ'ল নত রে,
কোথায় উড়ে গগন জুড়ে নীরবে শত শত রে
স্বপন-হাঁস কত রে!
স্বপন-রসে ডুবি মন
সুধায় ভ'রে যায় রে,
কাহারে যেন অনুখন
হৃদয় মাঝে পায় রে!
চাঁদের ন্যায় সেই যে ধায় ছড়িয়ে সুধা-ধার রে
সুধায় ভ'রে যায় রে!
সাদা ফেণায় একাকার
নীল সাগর মাঝে রে!
চেনা যে যায় মুখ তার
শঙ্খ তারি বাজে রে।
মধুর তার রূপ আমার হৃদয় ভরি সাজে রে,
শঙ্খ তারি বাজে রে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

গৃহিণীর সাজি।

ডিমের মোহনভোগ।

আমরা সাধারণতঃ যে মোহনভোগ আহার করিয়া থাকি, ডিমের মোহনভোগ তাহা অপেক্ষা আরও সুস্বাদু ও বলকারক। পাঁচ ছয়টি ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার সাদা অংশটা একটি পাত্রে ঢালিয়া তাহার সহিত আধ পোয়া আন্দাজ পরিষ্কার বাতাসার গুঁড়া মিশাইয়া খুব ফেটাইতে থাক, ফেটাইতে ফেটাইতে যখন সাবানের ফেণার মত হইবে তখন সামান্য একটু জাফরাণ বাটা বা ছোট এলাচের গুঁড়া মিশাইতে হইবে। তারপর আধপোয়া পরিমাণ ঘি আলে চড়াইবে, ঘৃত বেশ পাকিয়া আসিলে তাহাতে আধপোয়া সুজি দিয়া ভাজিতে হইবে, সুজির রং যখন লাল্‌চে হইয়া উঠিবে তখন পূর্ব্বোক্ত ডিমের শ্বেতাংশ তাহাতে ফেলিয়া দিবে, তারপর আর খানিকক্ষণ ভাজা হইলে উহাতে গোলাপজল, তদভাবে শুধু জল দিয়া নামাইতে হইবে। ইহাই ডিমের মোহনভোগ।

মুষ্টিযোগ।

(২৫) আদা ও আমআদা একত্র সেবন করিলে অর্শ ভাল হয়।

(২৬) ঘিয়ে ভাজা হরিতকী, পিপুল ও ইক্ষুগুড় এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্ব প্রকার অর্শ রোগ বিনষ্ট হয়।

(২৭) হরতকী ২ তোলা গোমূত্রে চারি দিবস ভিজাইয়া, বাটিয়া তুল্যপরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া খাইলে অর্শ ভাল হয়।

(২৮) ত্বকহীন কৃষ্ণতিল ২ তোলা, মাখন ২ তোলা, মিছরি ১ তোলা, কচি পদ্মপত্র ৷৷৹ তোলা ও ছাগদুগ্ধ এক ছটাক সেবন করিলে অর্শ আরাম হয়।

(২৯) অর্শরোগে রক্তস্রাব হইলে গরম জলে ফট্‌কিরি মিশাইয়া সেই জলে শৌচ করিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়।

(৩০) শূকরের রক্ত ও আফিং একত্রে অর্শের বলিতে লেপ দিলে, বলি পতিত হয়।

(৩১) বলিতে অত্যন্ত যাতনা থাকিলে, হরিণের শৃঙ্গ শানে ঘসিয়া লাগাইয়া দিলে অথবা গন্ধ-বিরজার ধুম তথায় দিলে, বেদনার আশু শান্তি হয়।

(৩২) একতোলা আতপ চাউল, আধতোলা চারা নিমের শিকড় সহ একত্রে বাটিয়া ৩।৪ দিন খাইলে অর্শরোগের শান্তি হয়।

(৩৩) শতধৌত ঘৃতদ্বারা প্রলেপ দিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

(৩৪) একটু ত্রিফলা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়।

(৩৫) সংন্যাসরোগ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সূচীবিদ্ধনাদি সংজ্ঞাজনক ক্রিয়া না করিলে রোগী অবিলম্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

(৩৬) অন্য আহার পরিত্যাগ করিয়া দুধের সহিত মহিষের মূত্র পান করিলে সাত দিবসের মধ্যে উদরীরোগ ভাল হয়।

(৩৭) কাঁচা হরিদ্রার সহিত কালমেঘের পাতা বা

নিমপাতা একত্রে বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার চর্ম্মপীড়া ভাল হয়।

(৩৮) কচি বাসকপাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রে বাটিয়া লেপ দিলে পাঁচড়া ভাল হয়।

(৩৯) নারিকেল তৈল, অল্প পরিমাণ গাঁজা ও চালমুগরার ফলের খোসা দিয়া আগুনে বেশ করিয়া কুটাইতে হইবে। উহা গরম থাকিতে মাখিলে চুলকানি ও খোস ভাল হয়।

(৪০) পোড়া ঘায়ে নারিকেল তৈলের সঙ্গে চুণের জল মিশাইয়া দিলে ভাল হয়।

নারী-সংবাদ।

নারীর বীরত্ব।

শ্রীমতী মালতী দেবী সরস্বতী নাম্নী জনৈক মহিলা একটী জলনিমজ্জনোন্মুখ বালকের জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া আশ্চর্য্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মালতী দেবীর নিবাস এটোয়া। গত ২৮শে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে তিনি যমুনা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৪টী শিশুসন্তান লইয়া আরও একটি মহিলা স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সন্তান চতুষ্টয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের বয়স মাত্র ৮ বৎসর। স্নানের পর সকলে তামাসা দেখিতেছে এমন সময় একজন স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া বলিল, রামচন্দ্র জলে ডুবিয়া গেল। অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ সেখানে তামাসা দেখিতেছিল, কিন্তু কেহই শিশুকে রক্ষা করিতে জলে নামিল না। মালতী দেবী কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি সাঁতার জানিতেন না। তথাপি আপন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিয়া তিনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বালকটীর হাতে ধরিয়া তিনি স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন, কতকদূর গেলে কয়েকজন সন্তরণপটু লোক তাঁহাদিগকে টানিয়া তীরে আনয়ন করে। মালতী দেবী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি সেই অবস্থায়ও দৃঢ় মুষ্টিতে বালকের হাতে ধরিয়া ছিলেন। গত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ রেল-পথে ভ্রমণ করিতে [illegible] শিশু রেলগাড়ীর জানালা দিয়া পড়িয়া যায়, শিশুর মাতা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া শিশুর সঙ্গে সঙ্গে রেলগাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়েন। অবশেষে শিশু ও মাতা উভয়কেই অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ স্থলে আপনার সন্তানের জন্য জননী জীবন বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন, আর মালতী দেবী পরের সন্তানের জন্য আপন জীবন বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এরূপ নারীর সার্থক জীবন! (লীডার)।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গনারী।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মেট্রিকুলেশন বা এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় বালিকাদিগের সফলতার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। সুখের বিষয় এফ, এ, (বর্ত্তমান ইণ্টারমিডিয়েট) ও বি, এ, পরীক্ষায়ও বালিকাগণ বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল:—১ম বিভাগ—এ, বি, মেরী ঘোষ (প্রাইভেট)। দ্বিতীয় বিভাগ—অমলা দাস (বেথুন কলেজ), সুষমা বিশ্বাস (ডাওসেসন মিশন), প্রীতিবালা ঘোষাল, আশালতিকা হালদার ও বিভুবালা সরকার (বেথুন কলেজ), বনলতা মজুমদার ও জ্যোতির্ম্ময়ী রায় (প্রাইভেট), নির্ম্মলা রায় ও ভক্তিলতা চন্দ (বেথুন কলেজ)। তৃতীয় বিভাগ—সুশীলা সেন (বেথুন কলেজ)।

বি, এ, পরীক্ষায় ৬টী মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—এ, জে, মোজেল (স্কটিস চার্চ্চ কলেজ), মিস্ এল, সুনীতি ঘোষ (ডাওসেসন মিশন), মেরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমারী গুহ, বিভা রায় ও জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত (বেথুন কলেজ)।

মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের কন্যা ইংরেজীতে যত নম্বর পাইয়াছেন অদ্যাবধি আর কোন বালিকা তত নম্বর পায় নাই।

শ্রীমতী রোশনলাল।

শ্রীমতী রোশনলাল লাহোরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও আর্য্যসমাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত রোশনলালের পত্নী। ইনি একজন বিদুষী মহিলা। অনেক দিন ধরিয়া ইনি বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া পঞ্জাব প্রদেশের নারীগণের কল্যাণের জন্য "ভারত-ভগিনী' নামক পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। আমরা এই সংখ্যায় তাঁহার একখানি চিত্র প্রকাশ করিলাম।

রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই।
(তদীয় প্রিয় শিষ্য শ্রীঅবনীকান্ত সেন কর্তৃক বিশেষরূপে গৃহীত বৃদ্ধ বয়সের চিত্র)

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৬ষ্ঠ ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩১৭। | ৪র্থ সংখ্যা।

সাহিত্যমহারথী কালীপ্রসন্ন।

কাল-চক্রের কুটীল আবর্ত্তনে, বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের একটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গেল। অভাগিনী বঙ্গ-জননীর অঞ্চল হইতে আর একটী উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িল। বাঙ্গালা-সাহিত্য-কুঞ্জের কল-কণ্ঠ কোকিল কালীপ্রসন্ন অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন।

যাঁহার সরস-সুমধুর লেখন-ভঙ্গী ও বিচিত্র রচনা-পদ্ধতিতে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে—বাঙ্গালা-সাহিত্য ধন্য হইয়াছে,—যাঁহার নিত্য নূতন চিন্তাশীলতায় ও ভাবের উদ্দীপনায় সমগ্র বঙ্গদেশ চমকিত হইয়াছে,—যাঁহার অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তির অজেয় আকর্ষণে বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে অমৃত রাশি উথলিয়া উঠিয়াছে,—যাঁহার অপ্রতিম প্রতিভায় দীনহীনা বাঙ্গালা-সাহিত্য ভক্তিপ্রীতি স্নেহ ও করুণার অমৃতরসে রঞ্জিত ও মহত্ত্ব ও মাধুর্য্যের সহিত পরিমিশ্রিত হইয়া সাহিত্য-জগতে সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে,—যাঁহার অমৃত-মধুর কোমল ঝঙ্কার বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জে সুচির বসন্তের সমাগম করিয়াছে,—যাঁহার চির-স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী বক্তৃতার কণ্ঠে, হিমালয়ের উচ্ছ্বসিত ঝর ঝর প্রবাহিত নির্ঝরিণীর মত কখন করুণা রাশি, কখনও বা আগ্নেয় গিরির মহাভয়ঙ্কর অগ্নিস্রাবের মত উদ্দীপনাপূর্ণ ভাবরাশি অনর্গল নিঃসৃত হইয়াছে,—সেই অসাধারণ কর্ম্মবীর—একাধারে বাগ্মী ও সুলেখক, বৈজ্ঞানিক ও কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক, অক্লান্তকর্ম্মা কালীপ্রসন্ন চিরকালের মত ইহ জগত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মা অমরধামে প্রস্থান করিয়াছে।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের আজ বড়ই দুর্দ্দিন। কেবল বাঙ্গালা-সাহিত্য বলিয়া নহে, আজ সমগ্র বঙ্গেরই দুর্দ্দিন বলিতে হইবে। এই সেদিন চির-দুঃখিনী বঙ্গ-জননীকে নিদারুণ শোক-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী রমেশচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন,—অল্প দিন হইল বিখ্যাতনামা সাহিত্যসেবী চন্দ্রনাথ দুঃখ-ক্লিষ্ট বঙ্গ-মাতার প্রাণে শোক-শেল নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন,—আর আজ আমাদের স্বনাম-সমুজ্জ্বল সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সাহিত্য-রথী কালীপ্রসন্ন সেই শোক-দুঃখ-জর্জ্জরিতা বঙ্গ-জননীর কোল শূন্য করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য-কুঞ্জের কল-কণ্ঠ কোকিল কালী-

প্রসন্ন তাঁহার পীযূষবর্ষী ঝঙ্কার চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া আজ কোন্ অজানিত রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার সুমধুর ঝঙ্কার নিত্য নূতনরূপে আর আমাদিগের কর্ণে কুহরিত হইবে না।

ইদানীং বাঙ্গালা-সাহিত্যের যেরূপ উন্নত অবস্থা, বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জ অধুনা সাহিত্যিকদলের যে সুমধুর কল-কল নাদে মুখরিত, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এইরূপ ছিল না। বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ তখন ঘোরতর অন্ধকারপূর্ণ। কিন্তু সুখের বিষয় বঙ্গের তদানীন্তন সাহিত্যাকাশ তমসাচ্ছন্ন হইলেও, জন কয়েক কৃতবিদ্য শিক্ষিত পুরুষ, যেন প্রাণে কি বুঝিয়া তখন বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হইলেন এবং নিশীথিনীর গভীর অন্ধকারে, নক্ষত্রমালার ন্যায়, আত্মপ্রকাশের যেন অধিকতর সুবিধা পাইয়া বঙ্গের সেই অন্ধকারপূর্ণ সাহিত্যাকাশে সহসা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। সেই সকল নক্ষত্রের মধ্যে কালীপ্রসন্ন এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তখন স্নেহ ও দয়ার উদ্বেল সাগর সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা-সাহিত্য-জগতে এক নূতন পথ খুলিবার অভিলাষে একান্ত যত্নপর। তখন সোমপ্রকাশের বিখ্যাত বিদ্যাভূষণ বাঙ্গালা রচনা-প্রণালীর বিবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত। তখন প্রতিভার পূর্ণ-প্রতিকৃতি মধুসূদন, জ্ঞানোজ্জ্বল রাজেন্দ্রলাল, সাহিত্য-সন্ন্যাসী অক্ষয়-কুমার, প্রীতিমান্ দীনবন্ধু, স্বনাম-সমুজ্জ্বল বঙ্কিম, জ্ঞান-গভীর রমেশচন্দ্র, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত এবং হৃদয়িক চন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের কৃতী সন্তানগণ পরম যত্নের সহিত বিবিধপুষ্পে দুর্লভ মালা গাঁথিয়া দীনা বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠে পড়াইতেছেন। কালীপ্রসন্নও তখন তাঁহার বান্ধবের বিবিধ প্রবন্ধমালায় বঙ্গীয় সাহিত্যিক মাত্রেরই বান্ধব। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা, কালীপ্রসন্ন যখন বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রথম প্রবিষ্ট, তখন বঙ্গদেশ একই কালে বহুসংখ্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের কল-কল মধুর-ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের কথায় বলিতে গেলে;—"তখন হেমের মৃদু ঝঙ্কারি শরোদ, নবীনের নিত্য আলাময় সুরবীণ, দুঃখ-ক্লিষ্ট দীনেশচন্দ্রের ত্রিতন্ত্রী ও অমায়িক রাজকৃষ্ণের একতারা বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জে এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিয়াছে।" হায়! বঙ্গদেশের ভাগ্যদোষে সেই সকল প্রদীপ্ত নক্ষত্রগুলির সকলেই কালের কুটীল আবর্ত্তে ধীরে ধীরে নিভিয়া গিয়াছে—বলিতে গেলে কালীপ্রসন্নই একরূপ তদানীন্তন বাঙ্গালা-সাহিত্য-গৌরবের শেষ নিদর্শন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের স্থান কোথায় সেই তত্ত্ব নিরূপণের সময় এখনও আসে নাই এবং সে আলোচনার সময় এই নহে, তবে এ কথা বলা যাইতে পারে, যে তাঁহার অভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে আসন শূন্য হইল তাহা শীঘ্র পরিপূরণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এবং আর কখনও পরিপূরণ হইবে কি না, তাহাও জানি না।

বঙ্গের আরও দুই চারিটী প্রতিভান্বিত প্রসিদ্ধ পুরুষের ন্যায়, রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয় একজন আত্মশিক্ষিত ব্যক্তি। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর স্কুলকলেজে বেশী না পড়িলেও, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি লাভ না করিয়া থাকিলেও, বর্ত্তমান বঙ্গে একজন অসাধারণ জ্ঞানবীর বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই, সেখান হইতে বাহির হইতে বাধ্য হন এবং চিরজীবন অতি কঠোর পরিশ্রম, প্রগাঢ় অধ্যবসায় এবং দৃক্‌পাতশূন্য একাগ্রতার সহিত ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অধ্যয়ন করিয়া, অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের মত জ্ঞানবীর কর্ম্মশীল পুরুষের অধ্যয়ন-প্রণালী, অধ্যয়ন সূত্রে আত্মোৎকর্ষ সাধনের পদ্ধতি, এবং জীবনবৃত্তের অনেক কথা, বঙ্গবাসী মাত্রেরই আলোচনার উপযুক্ত।

এই সংসারের শত সহস্র বালক, শত প্রকার আশা-পূর্ণ আনন্দ-প্রফুল্ল অভিনব যৌবনে পদার্পণ করিয়া, কতই না সুখের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, এবং মনে মনে, আপনার জীবন-সম্পর্কে কতই না উচ্চ ধারণা পোষণ করে, কিন্তু যেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন একটী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়, আর অমনই, জীবনের সকল আশা, সকল ভরসা, ও সকল উৎসাহ, নৈরাশ্যের অপার সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখে, এবং জ্ঞান-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া সংসার-স্রোতে গা ছাড়িয়া দেয়,—স্রোত যে দিকে

তাহাদিগকে পরিচালিত করে, তাহারা সে দিকেই ভাসমান তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যায়। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া, আপনার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টায়, মানুষ জ্ঞানের কোন্ উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারে, কালীপ্রসন্ন তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কালীপ্রসন্ন ১২৫০ সনে বিক্রমপুরের ভরাকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ। শিবনাথ সে কালের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুলিসের দারোগা ছিলেন। তাঁহার আপন বাড়ীতেই তৎকালোপযোগী একটী মক্তব ছিল। কালীপ্রসন্ন যখন তিন বৎসরের শিশু তখন তিনি এই মক্তবে ভর্ত্তি হন। বাল্যজীবনেই কালীপ্রসন্ন কোন কোন বিষয়ে আপনার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি মক্তবে পড়িয়া সমগ্র শিশুবোধক ও ঘরে বসিয়া রামায়ণ ও মহাভারত একবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ স্মরণশক্তি প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমগ্র কলাপ, বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ এবং দুইচারি খানি পারসী গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স সাত বৎসর মাত্র। ইহার পর তিনি ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হন, কিন্তু নানাকারণে তিনি পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াও তিনি জ্ঞান-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি কলিকাতায় গমন করিয়া ঘরে বসিয়া বিবিধ পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। অধ্যয়নে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সাত বৎসর তিনি কলিকাতায় থাকিয়া প্রগাঢ় অধ্যয়নে নিরত রহেন। এই সময় তিনি প্রতিদিন পনর ষোল ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি আপনার পঠিতব্য গ্রন্থখানিরে প্রাণারাধ্য দেব-বস্তুর মত অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

বাইশ বৎসর বয়সের সময় তিনি মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে ছোট আদালতের হেড্‌ক্লার্ক রূপে ঢাকায় আগমন করেন। কলিকাতায় থাকিতে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী বক্তৃতা প্রদান করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গলা বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন।

এগার বৎসর সরকারী কার্য্য করিয়া ১২৮১ সনে কালীপ্রসন্ন জয়দেবপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হন। সেই হইতে মাসিক আটশত টাকা বেতনে ২৭ বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ জীবনেও তিনি যুবকের উৎসাহে, সাহিত্যের সেবায় ব্রতী রহিয়াছিলেন।

১২৮১ সনে কালীপ্রসন্নের সর্ব্বজন মনোমোহ 'বান্ধব' প্রথমে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। 'বান্ধব' বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্য-পত্রে কোন স্থান অধিকার করিয়াছিল শিক্ষিত সমাজে তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থের নাম "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব।" তৎকালীন সুবিখ্যাত হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রিকায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, মাইকেল মধুসূদন যেমন বাঙ্গালার পদ্য-সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, ইনিও তদ্রূপ বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্যে সেরূপ এক নবযুগ আনয়ন করিবেন। কালীপ্রসন্নই এ দেশে উদ্দীপনাময়ী বাঙ্গালা-বক্তৃতার স্রষ্টা বা প্রথম পথ-প্রদর্শক। তিনি যখন ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সেই সকল সুদীর্ঘ, সর্ব্বজন হৃদয়োন্মাদিনী এবং তাঁহার চির-স্বভাবসিদ্ধ সেই এক প্রকার অনন্যলভ্য উদ্দীপনার তর-তর তরঙ্গময়ী বক্তৃতা শুনিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ চমকিত হইল। বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার শক্তি অনুভব করিয়া বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইল। বিশ্রুতনামা বাগ্মীরা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কালীপ্রসন্নের এক বক্তৃতা শুনিয়া ঢাকার ভূতপূর্ব্ব কমিশনার টয়েনবি সাহেব বহুলোকের নিকট মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"আমি এক শুনিয়াছি ইটালীর সঙ্গীত, আর শুনিলাম কালীপ্রসন্নের বক্তৃতা। এই দুয়ের কোন্‌টী অধিকতর মধুর ও মন-প্রাণ-প্রীতিকর তাহা বলিতে পারি না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীকান্ত সেন।

নারী-শক্তির অপচয়

(৫)

সম্প্রতি নারীজাতির মধ্যেও একটা জাগরণের স্পৃহা দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র কেবল রন্ধনশালাতেই আবদ্ধ নহে, পুরুষের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহাদের নিকটও প্রসারিত রহিয়াছে, এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য বল সঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। "The fittest will survive" এই সত্য স্মরণ করিয়া যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইবার জন্য বল সংগ্রহ না করে, মনুষ্যত্বের হিসাবে তাহাদের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। নারীকেও বিধাতা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তাঁহার সদ্ব্যবহার করিয়া মাথা তুলিবে, কেহই তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। প্রতি বৎসর মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে ভূষিতা হইয়া আমাদিগকে আশান্বিতা করিতেছেন। তাঁহাদের সাধনা সফল হউক, তাঁহাদের চরিত্র ভারতের অতীত নারী-গৌরব ফিরাইয়া আনুক, বিধাতার চরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা। পাশ্চাত্য নারীদের দুরবস্থা, কর্ম্মক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের সংঘর্ষ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলেন, আধুনিক "শিক্ষিত নারীদিগকে সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলায়, অর্থোপার্জ্জনের দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদেরই সুখের জন্য তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, কিন্তু দুর্ম্মতি বশতঃ তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন।" কিন্তু জীবন-সংগ্রাম ক্রমশঃ যেরূপ কঠোর হইতেছে, তাহাতে পুরুষেরা নারীজাতিকে অর্থচিন্তা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেও তাঁহারা সে চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। প্রাচীনকালে ভারতের ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থ প্রভৃতির প্রত্যেকের জন্য যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এখন দেশের অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা মনে না করিয়া কেবল সেই সকল ব্যবসায়ের অনুসরণ করিলে অন্ন যোটা ভার হইয়া পড়ে। সুতরাং হিন্দুসন্তান জুতা বিক্রয় করিতেছেন, ব্রাহ্মণ মৎস্য বিক্রয় করিতেছেন, এরূপ দৃশ্যও এখন দেখিতে পাওয়া যায়! অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি পুরুষদিগকে সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয় তবে কাল-স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া নারীর পক্ষে কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? পরন্তু প্রত্যেক জিনিষেরই ভাল মন্দ দুইটি দিক্ আছে, কেবল মন্দের দিক্‌টা আমাদের সম্মুখে ধরিলে চলিবে কেন? শিক্ষিতা পাশ্চাত্য রমণীদের দ্বারা জগতের অন্য সহস্র প্রকারের মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহাও দেখিতে হইবে।

গৃহকর্ম্ম এবং রন্ধন রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকে মনে করেন, এবং শিক্ষিতা-রমণী রন্ধনাদি সাধারণ গৃহকার্য্যে অমনযোগিনী হইবেন অনেকেই এরূপ আশঙ্কা করেন। কিন্তু শিক্ষিতা রমণীগণ রন্ধনাদি কার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন না, তবে তাঁহারা ইহাই তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিবার একমাত্র বিষয় বলিয়া মনে করেন না। শিক্ষাপ্রভাবে শৃঙ্খলা এবং সমস্ত বিষয়ের পারিপাট্য সাধন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সুচারুরূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেন। বাহিরের লোক সম্ভবতঃ এই জন্যই তাঁহাদিগকে গৃহকর্ম্মে উদাসীন বলিয়া মনে করেন। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে খাদ্য প্রস্তুত এবং কিরূপ খাদ্য কাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, কোন্ খাদ্যের কি গুণ, শিক্ষা ব্যতিরেকে এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভব নহে। রন্ধন অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাও শিক্ষা-সাপেক্ষ। পল্লীর রমণীগণ রন্ধনকেই তাঁহাদের জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করেন, যেন রন্ধন করিবার জন্যই জগতে আসিয়াছেন। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া যিনি যতক্ষণ রন্ধন-শালাতে থাকিতে পারিবেন তাঁর তত প্রশংসা, কিন্তু তাঁহাদের এই অসাধারণ পরিশ্রমের ফল শিশুদের পেটের ব্যারাম এবং বয়স্কদের অম্বল ভিন্ন আর বেশী কিছুই নহে। খাদ্য দেহরক্ষার প্রধান উপায়, সুতরাং যে স্ত্রী স্বামীর খাদ্য প্রস্তুতকে প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করে তাহার গলা টিপিয়া মারা উচিত হইতে পারে, কিন্তু সাত কোটী বঙ্গরমণীর স্বামী পুত্রের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য আত্মোৎসর্গের সুখকর ফল ত আমরা বিশেষ কিছু দেখিতে পাইতেছি না। রাজপথে অম্বলের ব্যারামের অবলম্বন দেক-

যষ্টি নতুবা বহুমূত্রের আধার স্বরূপ প্রকাণ্ড ভুঁড়ি বাঙ্গালী বীরের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে প্রতি বৎসর অসংখ্য শিশু কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে, চেষ্টা করিলে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। বিলাতে শিশুদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য অনেক বন্দোবস্ত রহিয়াছে। কেবল রমণীদের তত্ত্বাবধানে শিশুদের জন্য এক প্রকার আশ্রয়ভবন আছে। কারণ শিশুপালন নারী ভিন্ন পুরুষের পক্ষে সুসাধ্য নহে। এই সকল আশ্রমের পরিচর্য্যাকারিণীগণ স্নেহ ও আদর দিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলিকে আপন সন্তানের ন্যায় বশীভূত করিয়া তোলেন। শিশুপ্রকৃতির উপযোগী অথচ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসঙ্গত উপায়ে স্নান, আহার, নিদ্রা এবং ক্রীড়া প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের জন্য আশ্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তা ছাড়া অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্য জ্ঞান-চর্চ্চা, ক্রীড়া এবং শিক্ষার জন্য যে কতরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে তাহা ভাবিলে ইংরেজ কেন বড়, এ প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের মনে আপনা হইতেই উদয় হয়। শিশু মানবের ভাবী প্রতিনিধি সুতরাং ইহাদের উপর জগতের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। পাশ্চত্য রমণীগণ শুধু শিশুপালন দ্বারাই যে মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এইরূপ যে দিকে যাই সে দিকেই আমাদের দৈন্য দর্শনে ব্যথিত হইতে হয়। অন্যের সন্তানের ভার লওয়া দূরে থাকুক, আমাদের নিজের সন্তানদিগকেও প্রতিপালন করিতে জানি না। বিধাতা শিশুপালন, রোগীচর্য্যা প্রভৃতি পবিত্র এবং গুরুতর কার্য্য রমণী দ্বারা করাইবার অভিপ্রায়ে তাহাদের হৃদয়-বৃত্তি তদুপযোগী করিয়া গঠন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার অবাধ্য সন্তানের ন্যায় সে শক্তির অপব্যবহার করিতেছি।

চিত্রাঙ্কন কার্য্যে নারীর স্বাভাবিক প্রতিভা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা রমণীগণ বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে শরা, কুলা প্রভৃতি চিত্র উপলক্ষে যেরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা বিজ্ঞানসম্মত শিল্পকলার অনুমোদিত না হইলেও তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা সুনিপুণ চিত্রকারিণীরূপে পরিগণিত হইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সঙ্গীতে নারীজাতির স্বাভাবিক প্রতিভা দৃষ্ট হয়। ভগবানের করুণার নিদর্শনস্বরূপ মানবের সুকণ্ঠ আবহমানকাল হইতে তাঁহারই আরাধনায় নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। ঋষিদের মুখে নামগান শ্রবণ করিয়া বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যাইত। বস্তুতঃ এমন পবিত্র শক্তি ঈশ্বরারাধনায় প্রয়োগ করিলে গৃহপরিবার স্বর্গে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু নারীদিগের সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, মেয়েরা গান করিবে ইহা শুনিতেও অনেকে শিহরিয়া উঠেন! এইরূপ বাহিরের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্তঃপুরেও নারীদিগকে স্বকীয় শক্তি বিকাশের সুবিধা প্রদান করা হইতেছে না, তাহার ফল এই হইতেছে যে, গৃহ সংসারে নারীর ব্যক্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে, "স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" প্রভৃতি বিদ্বেষমূলক বাক্যসমূহে নারী এবং পুরুষের মধ্যে এমন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছে যে মানবরূপে নারীর যেন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

আমাদের জনৈক আত্মীয়ের অবস্থা এক সময় খুব ভাল ছিল, অনেক অর্থোপার্জ্জন করিতেন কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন না। একবার তিনি স্বদেশগামী জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে একটা গ্রাণ্ডপিয়ানো এবং টেবিল হারমোনিয়াম ক্রয় করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং বা পরিবারস্থ কেহই উহার ব্যবহার জানিতেন না বা জানিতে চেষ্টা করিতেন না, সুতরাং তাঁহারা গ্রাণ্ডপিয়ানো টেবিল রূপে এবং হারমোনিয়ামটিকে তদবধি দাঁড়াইয়া উচ্চ হইতে কোন জিনিষ নামাইবার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। ভারতরমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদের সেইরূপ মনে হয়, ভগবান তাঁহাদিগকে যে সকল শক্তির অধিকারিণী করিয়াছেন, ভারতীয় পুরুষগণ তাহার শোচনীয় রূপে অপব্যবহার করিতেছেন। বৎসর বৎসর অম্বুবাচী উপলক্ষে অসংখ্য লোক কামাখ্যা দর্শন করিতে আসেন।

বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে ভারতের তীর্থসমূহে অসংখ্য লোক গমন করিয়া থাকেন, ইঁহাদের ধর্ম্মোন্মত্ততা দেখিলে অবাক হইতে হয়! ইঁহাদের অধিকাংশই বিধবা, কেহবা অতি শৈশবে বিধবা হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতেছেন। একটু পুণ্য লাভের আশায় অতি সম্ভ্রান্ত বংশের বিধবারাও পথকষ্ট, অনশন অনিদ্রার ক্লেশ প্রভৃতি অম্লান চিত্তে সহ্য করিয়া অপূর্ব্ব মানসিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন! সারাজীবন আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পায়ে ঠেলিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তীর্থস্থলে পাণ্ডাদের গলাধাক্কা খাইয়াও তাঁহাদের পায়ে সমস্ত জীবনের ক্লেশলব্ধ অর্থ সমর্পণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন। এই মহান্ ত্যাগস্বীকার, যোগীঋষির সাধনার ধন বিষয়সুখে নিস্পৃহতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেন, আমাদের পুণ্যময়ী ভারত-জননীর বক্ষে এমন সন্তান কি কেহ নাই? যিনি জগতের মাতা, তাঁহার সন্তানগণ ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে আর তাহাদের ভগিনীগণ অধর্ম্মাচারী তীর্থকাকদের উদরপূর্ত্তি করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবেন ইহাই কি হিন্দুর ধর্ম্ম! যেখানে রোগী রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া জল জল বলিয়া চীৎকার করিতেছে, সেখানে শান্তির প্রস্রবণস্বরূপা ভারতীয় বিধবাদের শুশ্রূষাকারিণীরূপে উপস্থিতি কি জগতের গৌরবস্বরূপ হিন্দু-সন্তানদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ? দুর্ভিক্ষের তাড়নায় যখন দেশ উৎসন্ন যাইতে বসে, তখন সংসারে বন্ধনশূন্য বিধবাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ক্ষুধাতুরদের এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়া দিলে কি হিন্দুর দেবতা রাগ করেন? নিদাঘের আতপতাপিত পথিকের পিপাসা দূর করিবার জন্য জলদায়িনীরূপে বিধবাদের উপস্থিতি কি কল্পনার বিষয়? বিধবাদের স্বহস্তনির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা দরিদ্র শীতার্ত্তের শীত নিবারণের আশা কি একটা অসম্ভব ব্যাপার? বস্তুতঃ ভারতের বিধবা রমণীদের শক্তি এবং সৎকার্য্যে ইচ্ছা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে কেহই সাহায্য করিতেছেন না। সুতরাং অবোধ শিশুদের হস্তে মূল্যবান্ জিনিষের ন্যায় ইহার অপব্যবহার হইতেছে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মভাব পরিমার্জ্জিত এবং বিকশিত হইতেছে না! নানা উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদের প্রবল ধর্ম্ম-পিপাসার নিবৃত্তি করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা জগতের কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের আত্মারও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না। স্নেহ, করুণা প্রভৃতি যে সকল গুণরাজি দ্বারা বিধাতা মানবকে ভূষিত করিয়াছেন স্বার্থের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে বিশ্বজনীন প্রেমে তাহার পরিণতি হইতে পারে না। ইঁহাদের চিত্তপ্রবৃত্তি সুভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে মানবের কত মঙ্গল সাধিত হয়!

উপসংহারে আমার ভগিনীগণের নিকট একটী নিবেদন জানাইয়া আমার সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। আমরা এক জগজ্জননীর সন্তান এবং একই বঙ্গমাতার বক্ষে লালিত পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছি, সুতরাং আমরা পরস্পর এক অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। আমাদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যে যেন আমাদের চিন্তা ও কার্য্য পর্য্যবসিত না হয়, ভগবান আমাদিগকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন আমরা তাহা উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিয়া যেন আমাদের দেশকে শক্তিশালিনী করিতে পারি। বিধাতার অপরিসীম করুণা প্রভাবে আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাংসারিক হিসাবে সুখ সুবিধা প্রভৃতি ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা যেন মনে করেন, পথের প্রত্যেক ভিখারিনী আমদের অংশভাগিনী ভগিনী।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে পল্লীগ্রামের সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরও শিক্ষার অভাবজনিত দুরবস্থার কথা বর্ণন করিতে হইয়াছে। সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত ভগিনীগণও যেন মনে করেন, ইঁহাদের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তাঁহাদের অনেক করিবার আছে। প্রবল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। শিক্ষিতা ভগিনীগণ নগরে নগরে সমিতি সংগঠন করিয়া আত্মোন্নতি-সাধনে যত্নবতী হউন। আমাদের দুরবস্থা দর্শনে হৃদয় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই কত কথা বলিলাম, অনেক কথা গুছাইয়া বলিতে পারি নাই, অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিতে পারি নাই, আবার হয়ত অনেক অনাবশ্যক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। যদি

আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া একটী ভগিনীরও প্রাণে আত্মোন্নতি সাধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে তাহা হইলেই আমার রোদন সফল মনে করিব।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

পূর্ব্ববঙ্গের উপাধিধারিণী মহিলাগণ।

(২)

পূর্ব্ববঙ্গের উপাধিধারিণী মহিলাদিগের মধ্যে দুইটি রমণী অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম প্রেমকুসুম চৌধুরী ও সরলা দাস। প্রেমকুসুম চৌধুরী "আলো ও ছায়া"র কবির ভগিনী এবং স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা। চণ্ডী বাবু শুধুই তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়া নিবৃত্ত হন নাই, তাঁহার মধ্যমা কন্যা কুমারী যামিনী সেন মেডিকেল কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। তিনি এখন নেপালের মহারাজার মেয়ে-হাঁসপাতালের ডাক্তার। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী প্রেমকুসুম চৌধুরী বেথুন কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কাজ বেশী দিন করিতে পারেন নাই। বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর অল্পদিনই তিনি এই সংসারে বাস করিয়াছিলেন। কালের কঠোর হস্ত স্বামীর প্রেমের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে পরলোকে লইয়া গেল।

অতঃপর আমরা স্বর্গীয়া সরলা দাসের জীবন-চরিত সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সরলা তেইশ বৎসর ছয় মাস মাত্র সংসারে বাস করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ সময় স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরূপে অধ্যয়নে যাপন করিয়াছেন। এজন্য আত্মীয় স্বজন ও বিশেষ পরিচিত বন্ধু ভিন্ন আর কেহই তাঁহার মহত্বের পরিচয় পান নাই। তাঁহার জীবন-পুষ্প বর্ণে, গন্ধে ও সুষমায় বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু সে দৃশ্য অনেকেরই চক্ষে পড়ে নাই। ধনীর অট্টালিকায় টবের মধ্যে সুন্দর গাছটিতে সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠে; শুধু ঘরের লোকেরাই তাহার সৌন্দর্য্যটুকু দেখিতে পায় ও সুঘ্রাণে আকৃষ্ট হয়; তার পর সে ফুল ঝরিয়া পড়িয়া মৃত্তিকায় বিলীন হয়। তেমনি এই ধনীর কন্যা ধনীর গৃহে ফুলের মত ফুটিল, জীবনের সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে আত্মীয় স্বজনকে মুগ্ধ করিল; অবশেষে ঝরিয়া পড়িল; বাহিরের লোকেরা ইঁহার জীবনের শোভাও দেখিলেন না সুগন্ধেও আকৃষ্ট হইলেন না। তথাপি সরলা বাঙ্গলাদেশের একটি বিদুষী মহিলা বলিয়া, তাঁহার অল্পকালস্থায়ী জীবনের অসম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করিব।

সরলা রেঙ্গুনের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা। ইঁহার নিবাস চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামেই সরলার জন্ম হইয়াছিল। সরলার বয়স যখন সবে মাত্র ছয় মাস, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া রেঙ্গুন গমন করিয়াছিলেন। সরলা পাঁচ বৎসর বয়সের সময় রেঙ্গুনের মেথডিষ্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার চারি বৎসর পরেই তিনি রেঙ্গুন বিভাগের প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, এবং মাসিক আট টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

জানিনা মেথডিষ্ট স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ সরলার কানে কানে কি এক মন্ত্র শুনাইয়া শিক্ষার প্রতি আশ্চর্য্য অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন! অথবা সে কথাই বা বলি কেন? সরলা এক স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন লেখাপড়া শিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। সরলার ভিতর একটি প্রতিভা ছিল। তাঁহার পিতা সেই প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া সরলাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সরলা এগার বৎসর বয়সের সময় বেথুন বোর্ডিংএ ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পর সরলার সঙ্গে আমাদের আলাপ হইল। আমরা দার্জ্জিলিঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করিতাম। এই সময় সরলার বয়স তের বৎসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সরলতা ও হাসিখুসী ভাব দেখিয়া তাঁহাকে শিশু

বলিয়া মনে হইত! সরলা সময় সময় এমন দুই একটি প্রশ্ন করিতেন, শুনিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। একদিন আমাদের বাড়ীর কর্ত্রী বলিয়াছিলেন, "সরলা, তুমি বড় হইয়াছ, এখন তোমার সকলের সঙ্গে মেশা উচিত নয়।"

সরলা কহিলেন—"কেন? তাতে কি হয়? —বাবুকে আমি ভালবাসি, তাঁহার সঙ্গেও মিশিব না?"

সরলার কথা শুনিয়া গৃহকর্ত্রী হাসিতে লাগিলেন। সরলা তাঁহাকে কহিলেন—"আপনি হাসিতেছেন কেন? বলুন না তা'তে কি হয়?"

সরলার এই রকম সরলতার একটি কারণ ছিল। তিনি শৈশব কাল হইতে ধর্ম্মশীলা ইংরাজ মহিলাদিগের সংসর্গে বাস করিয়াছেন। রেঙ্গুনে কিছুকাল তাঁহাদের কনভেণ্টে থাকিয়া পড়িয়াছেন। এজন্য সরলাকে তাঁহার বাল্যকালে বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া বুঝা মুস্কিল হইত! তাঁহার মাথার সামনের দিকে ছোট ছোট কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল; তাঁহার মুখে পরিষ্কার ইংরাজী কথা; তাঁহার হাব-ভাব চলন-ফেরন ধরণ-ধারণ সকলই প্রায় ইংরাজ মেয়েদের মত। সরলা পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই ইংরাজীতে কথা বলিতেন। তাই কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গলা ভাষায় ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেন না। দার্জ্জিলিঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ দেখা যাইত।

সরলা খুব অল্প বয়সে সরলপ্রকৃতি ইংরাজ বালিকাদিগের সঙ্গে ছিলেন বলিয়া শুধু যে তাঁহার মধ্যে অপূর্ব্ব সরলতা দেখা যাইত, তাহা নয়। তিনি বাঙ্গালী-সমাজের অনেক রীতিনীতিই শিখিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী-সমাজ বলিয়া কেন, একটি তের বৎসরের বালিকার সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেরূপ জ্ঞান তাঁহার কোন সমাজ সম্বন্ধেই ছিল না। ইহাতে অপকার না হইয়া উপকার হইয়াছিল। পৃথিবীর কোন মলিন চিত্র তাঁহার চক্ষে পড়িত না; সংসারের কোন রেখাও তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত হইত না! শিশুর মনের মত তাঁহার হৃদয়টুকু এমন সরল ও সুনির্ম্মল ছিল যে, তাঁহার সঙ্গে মিশিলেই তাঁহার প্রতি কেমন একটি আকর্ষণ জন্মিত।

আমরা সরলার লেখাপড়া শিক্ষার কথাই বলিতেছিলাম। বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার কতটুকু জ্ঞান তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু সরলা বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) ফরাসী ভাষা ত্যাগ করিলেন এবং বাঙ্গলা ভাষায়ই এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন। আমরা ভাবিলাম, সরলা আর সকল বিষয়েই পাশ হইবেন, শুধু বাঙ্গলার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। তারপর যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন দেখিলাম সরলা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। বাঙ্গলা ভাষায় সকলের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "কেশবচন্দ্র প্রাইজ" প্রাপ্ত হইয়াছেন। সরলা দুবৎসর চেষ্টা করিয়াই উত্তম বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরলার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। সেই প্রতিভার সাহায্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের উচ্চ অঙ্গের কাব্যের সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। সরলা বিবাহের পর সময় সময় আমাদের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সরস ও সুমিষ্ট রচনাগুলি তাঁহার প্রিয় সামগ্রী ছিল। তিনি প্রায়ই লজ্জাবশতঃ আমাদের সম্মুখে কাব্য পাঠ করিতে চাহিতেন না; কিন্তু তবু দুই একদিন মধুর কণ্ঠে "চিত্রা"র রসমাধুর্য্যে-মনোহর কবিতাগুলি পাঠ করিতেন। সরলা সময় সময় আমাকে পত্র লিখিতেন। পত্রের মধ্যে সাহিত্য ও ব্রাহ্মসমাজের কথাই অধিক থাকিত। একটি পত্র এখনই আমার সম্মুখে আছে। উহাতে লিখিয়াছেনঃ—

"প্রদীপ পড়িয়াছি। রবি বাবুর কবিতাটী বড় ভাল লাগিয়াছে। "ভারতী" ও আসে। রবি বাবু প্রায় সমস্তই লিখিয়াছেন। * * Lecture টা অতি সুন্দর।

সরলা রবীন্দ্র বাবুর যে কবিতাটির কথা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এইঃ—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!

কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,
অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে ;
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

অতঃপর সরলা তাঁহার ষোল বৎসর বয়সের সময় এফ্, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম স্থান অধিকার করেন। ঠিক্ বলিতে পারি না, বোধ হয় সরলার পূর্ব্বে আর কোন মহিলা এফ্, এ, পরীক্ষায় এরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহার দুই বৎসর পরে সরলা বি, এ, পরীক্ষায় ইংরাজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার পাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম স্থান অধিকার করেন।

সরলা আর এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন নাই। তিনি আমাকে বলিয়াছেন—"কেহ কেহ আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এম, এ, পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমার পুরুষদের সঙ্গে বসিয়া পড়িতে ভারি লজ্জা হয়। তাহা ছাড়া আমার ভাই সুরেন যে বিরোধী। সুরেন বলে, "দিদি, তুমি যদি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হও, তবে আমি সে কলেজ ত্যাগ করিব।"

অবশেষে ১৮৯৭ সালের ১১ই অক্টোবর স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টারের সঙ্গে সরলার বিবাহ হয়। সাধারণতঃ এদেশের শিক্ষিত পুরুষেরাই বিবাহের পর সংসারে প্রবেশ করিয়া বিদ্যাদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন ; অনেক মহিলা যে সংসারের ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া বিদ্যাদেবীকে বিস্মৃত হইবেন, সে আর বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। সরলার জ্ঞানস্পৃহার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি ; সেই জ্ঞানস্পৃহার জন্য সরলা বিবাহের পরও অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি এক একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। সেই চিন্তাগুলি আবার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। আমরা তাঁহার দৈনন্দিন লিপির একটি স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। সরলা টেনিসনের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে লিখিয়াছেন :—

"২৪শে মার্চ্চ, ১৮৯৮।

"টেনিসনের Mrs, Vynerএরলিখিত চিঠিখানি এবং তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিগুলি বড়ই সুন্দর :—

"The only thing that makes life, when far away from home and friends, alone and in a wild country, beautiful and endurable is the strong and stern sense of duty, the consciousness that where God has placed us is our best to die, and that our most becoming posture is to accept our destiny with grateful humility ."

"এই সকল কথা অতি সত্য। কিন্তু এই রকম কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান ঠিক রাখা কতই কঠিন। যদিও আমাদের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে তাহা সহ্য করিয়া যাই ; এবং বলি যে, 'যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ; কিন্তু এই কথায় কি প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় ? ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে বিধান করেন, সেই বিধানকে কি নত মস্তকে মানিয়া লওয়া হয় ? এই রকম নির্ভর কখনইত অকৃত্রিম নহে। আমাদিগকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমাদের পক্ষে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ঈশ্বর তাহা জানেন এবং আমাদের আত্মার পক্ষে যাহা কল্যাণজনক, তিনি তাহাই বিধান করিতেছেন। আমাদের সুখ দুঃখ উভয়ের জন্যই পূর্ণ অন্তরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। আমাদের এই রকম অবস্থা হইলেই আমরা যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতেছি, একথা বলা সার্থক হইবে।"

সরলা অধিকাংশ সময় ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিতেন ; এজন্য তাঁহার কাছে ইংরেজী ভাষা, মাতৃভাষার মত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দৈনন্দিন লিপি ইংরাজী ভাষায় লিখিতেন। আমরা আমাদের রচনাটির সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে উঁহার বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিব।

সে কথা যা'ক। সরলা শুধু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ফরাসী

ভাষাও উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত ভাষার একখানি ভাল বই ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় কিছু লিখিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইত, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

সরলা। আমার জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিরাশ হইয়া পড়ি। আমি যে কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাই না। আপনি বলুন, আমি কি করিতে পারি?

আমি। তোমার বুদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, অন্তরে মহৎ আকাঙ্ক্ষা আছে; তুমি চেষ্টা করিলে অনেক ভাল কাজ করিতে পার।

সরলা। আপনি আর পণ্ডিত মহাশয় শুধু আমার প্রশংসাই করেন। আপনারা ত আমার কিছুই জানেন না।

আমি। আর কিছু না হয়, তুমি সাহিত্যের অনুশীলন কর। কাগজে পত্রে লিখিতে আরম্ভ কর। সে ত একটা মস্ত কাজ; তাহাতে দেশেরও উপকার হইবে, তোমার জীবনেরও উন্নতি হইবে।

সরলা। ঠিক্ বলিয়াছেন। সাহিত্যের সেবা খুব ভাল কাজ। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় যে আমার বিদ্যা! আমি চেষ্টা করিলে ইংরাজীতে কিছু লিখিতে পারি, সেরূপ লেখায় লাভ কি?

ইহার পর সরলা বাঙ্গলা ভাষায় রচনা লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি আগে সংস্কৃত শিখ, তাহার পর বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিও। সংস্কৃত না শিখিলে ভাষার উপর দখল জন্মিতে পারে না।"

সরলা রবীন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়াই সংস্কৃত শিখিবার জন্য সংকল্প করিলেন। বুঝি বা রবীন্দ্র বাবুর অনুরোধেই তাঁহাদের বাড়ীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় সরলাকে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সরলার ভাষা শিখিবার আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই সংস্কৃত অনেকটা শিখিয়া ফেলিলেন। কিন্তু হায়, দুরন্ত মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তাঁহার মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল; আর সংস্কৃত শেখাও হইল না, বাঙ্গলা ভাষায়ও কিছু লিখিতে পারিলেন না। পণ্ডিত বিদ্যার্ণব মহাশয় তাঁহাকে অল্পদিন মাত্র পড়াইয়াই তাঁহার সরলতায় ও সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইলেই তিনি সরলার গুণের কথা বলিতেন। সরলার একখানি জীবনচরিত লিখিবার জন্য তিনি কাগজ পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আজ লিখি, কাল লিখি বলিয়া আর তাঁহার লিখিবার সুবিধা হইল না।

সরলার বিদ্যাশিক্ষার কথা পাঠ করিলে, মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে একটু উৎসাহ বাড়িতে পারে; ইহা চিন্তা করিয়াই এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম। অতঃপর সরলার বিবাহিত জীবন, বিশেষ বিশেষ সদ্‌গুণ ও তাঁহার মহৎ আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে কিছু লিখিব।

পূর্ব্বেই সরলার বিবাহের কথা লিখিয়াছি। বিবাহের অনেক দিন আগেই বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। সরলা প্রথম সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন—"আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় পাশ না হইলে কিছুতেই বিবাহ করিব না।"

সরলার হৃদয় অতিশয় সরল ও কোমল ছিল বটে; তা বলিয়া তাঁহার দৃঢ়তার অভাব ছিল না। তিনি যতদিন বি, এ, পাশ করেন নাই, ততদিন বিবাহও করেন নাই। বি, এ, পাশ করার পর বিবাহ হইল। বিবাহের পূর্ব্বেই সতীশরঞ্জনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। পরে দুজনেই দুজনের ভালবাসায় আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের বিবাহ ঠিক্ হইয়া গেল। এ সম্বন্ধে সরলা তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন:—

"কিন্তু সে আশা এখন দূর করিলাম। এখন সংসারের কিছু কাজ করিতে, ভাই ভগিনীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে ও পিতামাতার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব, এইরূপ ভাবিতেছিলাম। এমন সময় সতীশ আসিয়া আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইলেন। তিনি বলিলেন, আমরা দুজনে জগতের কিছু কাজ করিব; এবং সেই কার্য্যে সতীশরঞ্জন আমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিবেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

কর্ম্মযোগ।

মানুষ যখন আপনার মনের ভিতর একটি বৃহৎ সত্যকে উপলব্ধি করে, তখন আমরা তাহাকে সর্ব্বরূপ খণ্ডতা-বর্জ্জিত দেখিতে পাই। আলোক যেমন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই আলোকরূপেই প্রকাশিত হয়, তেমনি তাহার আত্মগত অখণ্ড বিশেষত্ব সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের ভিতর আপনার স্বরূপকে ব্যক্ত করে; লোক-সমাজের খণ্ড ও পরিচ্ছিন্ন জীবন-যাত্রার উপরে তাহা বিশ্বলোকের দ্বারপ্রান্তে উদীয়মান এক-ই প্রভাতের মত উদিত হয়, তখন তাহাকে লইয়া কোনও বিরোধ বা দ্বন্দ্ব চলে না, অবজ্ঞা বা বিচার চলে না, রাজাধিরাজের মত সে লোক-চিত্তের চিরন্তন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আসনটি অধিকার করিয়া বসে, এবং চারিদিক্‌কার সংশয়ের দুর্ব্বলতা ও অস্থিরত্বার ভিতর বিরাম ও শক্তির আনন্দ আনয়ন করিয়া সে তাহাকে বিরোধের ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তি দান করে।

ভূ-প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া নাবিকেরা পৃথিবী পরিক্রমণান্তে যেমন সেই পূর্ব্বের যাত্রা-স্থানটিতেই আসিয়া পঁহুছাইয়াছিল; লোকচিত্ত তেমনি বিভিন্ন সমাজ ও দেশের পার্থক্যের মহাসমুদ্র দিয়া যাত্রা করিয়া পরিণামে সেই একটি স্থানেই আসিয়া পঁহুছায়। বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তার ভিতর তাই আমরা বিরোধ দেখিতে পাই না। প্রাচীন ভারতবর্ষে কর্ম্মের এমন একটি গৌরবময় স্থান ছিল, তাহা ধর্ম্মসাধনারই একটি পথস্বরূপ গণ্য হইত। পশ্চিম সাগর-পার হইতে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্রী মেরি করেলি এ বিষয় যাহা বলিতেছেন তাহা সেই সুমহান প্রাচ্য ধারণাটির সহিত আসিয়া মিলিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন—স্ত্রী কি পুরুষ, মানুষ বলিয়া যে আপনার পরিচয় প্রদান করে, সে কখনই কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতে পারে না, কারণ কর্ম্মহীনতাই সকল দুঃখের মূল। কিছুই করিতে না পারা—নিজের বা অপরের কোন কিছু প্রয়োজনে না লাগা—সে যেন জগতের চিরন্তন কর্ম্মশীলতার বাহিরে পরিত্যক্ত হওয়া! চারিদিক্‌কার সামঞ্জস্যের ভিতর সে যেন একটা প্রবল বিদ্রোহকে উদ্ধত করিয়া তোলা! বিধাতা মানুষকে যে সব সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন, কর্ম্ম তাহার ভিতর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, এবং মানুষ তাহার অন্ধতা মূর্খতার ভিতর দিয়া তাহার নিজের দ্বার-প্রান্তে যে সব অকল্যাণকে পুঞ্জীভূত করিয়াছে তাহার মধ্যে নিশ্চেষ্টতা সর্ব্বপ্রধান অনর্থ।

কেহ কেহ কাজ করাটাই একটা অভিশাপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সৃষ্টি-কাহিনীর ভিতর সেই যে একটি বাক্য--"তোমার ভূমি তোমার জন্য অভিশপ্ত হউক, তোমার জীবনের পরিশিষ্ট দিন দুঃখের ভিতর তুমি তাহার ফল ভোগ করিবে; যতদিন না তুমি মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হও, ততদিন তোমার ললাটের ঘর্ম্ম দ্বারা তুমি তোমার জীবিকা অর্জ্জন করিবে"—ইহার দ্বারা তাঁহারা আপনাদের মত সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে আমরা উক্ত বাক্যের উপর যতটা গুরুত্ব অর্পণ করিয়া থাকি, তাহা শুধু অন্ধতা বশতঃই করি, কারণ তাহাতে বহু পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের সমাবেশ সংঘটিত হইয়াছে, এবং অসংলগ্নতার দ্বারা তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

বিধাতা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বশেষে নর ও নারীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এই সৃষ্টির উপর তোমরা প্রভুত্ব কর।" আলস্য ও নিশ্চেষ্টতার দ্বারা যে ইহা সম্ভব নয়, এবং তাহা যে এই বাক্যের একান্ত বিরুদ্ধ তাহা প্রত্যক্ষ-ই দেখা যাইতেছে। স্পষ্টতঃই ইহা প্রকাশ করিতেছে যে শ্রমের দ্বারা তাহাকে তাহার এই অধিকার বজায় রাখিতে হইবে। কর্ম্মের ভিতরেই আমরা বিধাতার উদ্দেশ্যকে সফল করি, নিশ্চেষ্টতা স্বভাবের বিকৃতি, প্রকৃতির ভিতর তাহার স্থান নাই। প্রত্যেক পদার্থ সেখানে কর্ম্মশীল, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম প্রাণীও কর্ম্মচেষ্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বীজ যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অঙ্কুরোদ্গমের প্রয়াস পাইতে থাকে তখনও সে কর্ম্মশীল এবং পাখী যখন শাবকের জন্য তরুশাখায় নীড় রচনা করে ও তাহাদের আহারানুসন্ধানে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় তখনও সে কর্ম্মশীল, বিধাতার ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম সৃষ্টিকেও আমরা নিশ্চেষ্ট বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারি না, কারণ কিছুই বিশ্রাম

করিতেছে না। প্রত্যেকটি জিনিষ-ই গতিশীল, প্রত্যেকটি জীব-ই কর্ম্মশীল, শুধু মানুষ বিশ্রামের জন্য কণ্ঠস্বর প্রবল করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা সে তাহার জীবনান্তেও পাইতেছে না। তাহার পরিত্যক্ত দেহ হইতে আবার নূতন প্রাণীসমূহ জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং তাহার অনশ্বর আত্মা তাহার জীবন-কালের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলাফল লইয়া নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে। জগতের এই অনন্ত জীবন-প্রবাহে মৃত্যুর মত বিশ্রামও অসম্ভব।

প্রকৃতি আমাদের জননী। আমাদের জীবনের শিক্ষা আমাদের এই শ্রেয়সী মাতার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। সাহায্যের জন্য আমরা যখনই তাঁহার নিকটস্থ হই, তখনই তাঁহাকে নিবিষ্ট দেখি, মুহূর্ত্তকাল তাঁহার বিশ্রাম নাই। কর্ম্মের গুরুত্ব, সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম ও স্বল্প লাভের জন্য আমরা যখন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকি তখন প্রকৃতি জননী নীরবে আমাদের চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ত যে বিশ্বলোক—তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন ও তাহার সহিত সামঞ্জস্যের সুর রক্ষা করিয়া চলিতে ইঙ্গিত করেন।

আমাদের সম্মুখে প্রত্যহ এই যে সূর্য্য উদিত হইতেছে, ইহা কখনও বিশ্রাম গ্রহণ করে না। ভাল মন্দ, তুচ্ছ বৃহৎ সকলের উপরে সমভাবে সে আলোকপাত করিতেছে। সে কখনও কাহারও ধন্যবাদ পায় না, তাহার সম্পূর্ণতার দ্বারা সে তাহার অতীত স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। ঈশ্বরের প্রেমালোকের মত সে আমাদের জীবনকে সৌন্দর্য্যে ও স্বাদে ভরিয়া তুলিতেছে এবং সৃষ্টির এই আবরণের পেছনে যিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন আমাদের দৃষ্টিকে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিতেছে।

ঈশ্বরের প্রকৃতি খানিকটা এই সূর্য্যের মতন। তিনি আমাদের ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি আমাদিগকে নিপুণ ভাবে চালাইয়া নিতেছেন, আমরা সেই নিপুণতাকে আমাদের ক্ষমতা বলিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠি। ঈশ্বরার্চ্চনার যেগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠান—সেগুলি পালন করিয়া আমরা মনে করি যে তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। প্রার্থনা করিবার সময় আমরা শুধু ধনং দেহি পুত্রং দেহি বলিয়া থাকি এবং আমরা যাহা পাইয়াছি—তাহার কোনও অংশের যে আমরা যোগ্য নই, তাহা ক্বচিৎ ভাবিয়া দেখি, এবং ইহার বিনিময়ে যে আমাদেরও কিছু করা উচিত তাহা আমাদের মস্তকের ভিতর আদৌ প্রবেশ করে না। আমরা তাঁহাকে দিয়া আমাদের কাজগুলি করাইয়া লই ও তাঁহার উপর আমাদের আরামের উপকরণ যোগাইবার ভার সমর্পণ করি। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে পশু পাখী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উন্নততর জীবন যাপন করে, তাহারা জীবিকা স্বয়ং অর্জ্জন করে, দান গ্রহণ করে না। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা লইয়া আবেদন—শুধু আকাঙ্ক্ষার দৈন্য প্রকাশ করে। আমাদের প্রাণ ধারণের যাহা কিছু উপযোগী, স্বতঃই তিনি তাহা আমাদের দিয়াছেন, শুধু তাহার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে ও তাহার মূল্য কি, বুঝিতে হইবে, আমাদের কর্ম্মনিষ্ঠাকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। বিশ্ব-ভুবনের ভিতর আমরা এই কর্ম্মের-ই বিচিত্র বিকাশ দেখিতেছি, স্বয়ং বিধাতা কখনও নিষ্ক্রিয় থাকেন না। বিশ্বলোক যাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে—সৃষ্টির সেই অতি সুদূর মহান্ পরিণতির পথে আসিয়া প্রত্যেককে মিলিত হইবার জন্য তিনি আহ্বান করিতেছেন, যে প্রকারেই হউক আমাদের তাহার সহিত যোগ দিতে হইবে। যদি আমাদের নিজের জাড্য ও নিশ্চেষ্টতা কর্ম্মের এই সুপ্রশস্ত গতিপথ হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ঠ করে তবে আমাদের নিজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যের দ্বারাই আমরা আমাদের প্রকৃতি-জননীর নিকট গৃহীত হইব। যদি আমরা মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা বেশী কিছু না হই তবে আমরা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতররূপে ব্যবহৃত হইব না। আমাদের নিজেদের অবস্থার গঠন আমাদের নিজেদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, অপরের জীবনকে কেহই আকৃতি প্রদান করিতে পারে না। পিতামাতা সন্তানের জীবন গঠনে সহায়তা করেন বটে কিন্তু ভবিষ্যৎকালে তাহারা আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের দ্বারা পৃথক হইয়া পড়ে। প্রত্যেককেই আপনার মুক্তির জন্য আপন চেষ্টাকে উন্নত রাখিতে হইবে, বিশ্বজগতের ইহাই অনাদ্যনন্ত নিয়ম এবং ইহার বিরুদ্ধে আর কখনও কথা বলা চলে না।

ক্ষুদ্র হোক্ তুচ্ছ হোক্, বৈচিত্র্য ও প্রতিপত্তি হইতে যতই কেননা সুদূর হোক্, কর্ম্মের আত্মগত যে মহান্ গৌরবটি তাহাকে ধ্যান করিয়াই আমাদের হৃদয়কে আনন্দের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে কোনও কর্ম্মই ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ নয়, আমাদের এই অগণিত শ্রমজীবীর দল—অকথিত সহিষ্ণুতার সঙ্গে যাহারা এই সব বিপুলকায় কারখানাগুলির বিরাট যন্ত্রসমূহ চালিত করিতেছে ও তাহার সমস্ত দুঃসহ প্রচণ্ডতা নীরবে বহন করিতেছে, ইহারাই লোকসমাজের বাস্তব দেহ—শিরা—শক্তি—মাংসপেশী! সমাজকে ইহারাই ধারণ করিয়া আছে, সমাজের ভিতর ইহাদেরই স্থান পুরোভাগে, ইহাদের বাণীই বিধিবদ্ধ নিয়মের মত অলঙ্ঘ্য।

বিপুল এই বিশ্বচরাচর নীরবে আপনার কাজ করিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা যখনই কোনও বিরস কর্ম্মে নিযুক্ত হই, তখন আমাদের অসন্তোষকে কিছুতেই দমন করিয়া রাখিতে পারি না এবং প্রত্যেকের কাছেই তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতে বসিয়া যাই। স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকেই, তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিভিন্নতার ভিতর দিয়া তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতাকে সহস্র প্রকারে পোষণ করিতে থাকেন এবং নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষায়, যাহা অনায়ত্ত তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ দৃষ্টি চালনা করিতে থাকেন, কিন্তু যে চেষ্টার দ্বারা তাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহাকে কর্ম্মের ভিতর জাগ্রত করিয়া তুলিবার উদ্যম কাহারও নাই। আমরা বিস্মৃত হই, আমরা ঈর্ষ্যাদিগ্ধ চক্ষে যাঁহাদের সম্পদের প্রাচুর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকি—তাহা তাঁহাদের প্রভূত শ্রমের ফল মাত্র।

সত্য বটে শ্রমজীবীরা পরিশ্রমের পারিতোষিক সম পরিমাণে প্রাপ্ত হয় না। এই অসামঞ্জস্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতে গেলে অর্পিত কর্ম্মের প্রকৃতি ও কর্ম্মকর্ত্তার উৎসাহের পরিমাণ নির্ণয় আবশ্যক। সমস্ত হৃদয় ও অনুরাগের সহিত যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, জীবনের যে কোনও দিকেই সে পদক্ষেপ করুক না কেন সিদ্ধি ও পুরস্কার তাহার পুরোগমন করে, আধখানা মন লইয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পক্ষে তাহা অসম্ভব। প্রত্যেকেরই সমগ্র ভাবে একটি কাজ করা উচিত, অর্দ্ধেচ্ছু ভাবে ও অশোভনরূপে করা, শুধু নিয়োগ-কর্ত্তার প্রতিই অন্যায় সাধন নয়। নিজের শক্তি ও মানসিক ক্ষমতার তাহা অতি বৃহৎ অবমাননা। কর্ম্মের এই সমগ্রতাকে আমরা প্রকৃতির ভিতর কেমন ঐকান্তিক ভাবে দেখিতে পাই। গাছের ক্ষুদ্রতম পাতাটি গ্রহতারকার মতই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। প্রকৃতির দিকে যখনই আমরা দৃষ্টিপাত করি, তখনই বিশ্বস্রষ্টার সুমহান আদেশ ধ্বনিত হইতে শুনি—'যাহা কিছু তোমরা কর, তোমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতার দ্বারা কর।'

আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে কর্ম্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত লোক একান্ত বিরল। কাজ শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সাধারণতঃ একটা প্রবলতা দেখা যায়, এবং কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাটাই সকলের কাছে আনন্দপ্রদ। কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাই কৃতকার্য্যতার মূল। যত কিছু বৃহৎ আবিষ্কার তাহা এই কর্ম্মের ভিতর বিবেকনিষ্ঠতা ও ধৈর্য্যশীলতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; বিজ্ঞান অথবা আর্টের ভিতর ত্বরানিষ্ঠ লোক কখনও উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারে না। কিন্তু আজকাল চারিদিকে-ই এই ত্বরিতভাবের প্রবল আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে স্থির, সহিষ্ণু কর্ম্মশীলতা—সৌন্দর্য্য ও সম্পূর্ণতাকে নিত্য যাহা জন্মদান করে—আমি তাহার একান্ত অনুরক্ত ভক্ত, ত্বরান্বিত ব্যগ্রতাকে আমি একবারেই অনুমোদন করি না। তাড়াতাড়ি করিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহাই ব্যর্থ হয়; প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত, তাহার অপরিসীম মূল্যের গুরুত্বের দ্বারা বিবেচিত হওয়া উচিত। তাড়াতাড়িতে অনবধানতা আসিয়া পড়েই, শোভনত্ব ও সম্পূর্ণতার তাহা একান্ত বিরোধী।

ত্রুটির বিষয় বলিতে গেলেই আমরা শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা বেশ দেখা যায় যে শিক্ষার যখন এত বহুল প্রচার ছিল না, তখনকার কাজই বর্ত্তমান যুগ হইতে বহুতর শ্রেষ্ঠ ছিল। তখনকার ইমারৎ ও শিল্পের কাছে এখনকার চটুল আড়ম্বরময় অন্তঃসারহীন ইমারৎ ও শিল্প দাঁড়াইতে পারে না। প্রাচীন জিনিষ যে শুধু তাহার প্রাচীনত্বের জন্য আদৃত হয় এমন নয়, তাহার নিপুণত্ব ও সম্পূর্ণতার জন্যই

তাহার স্থান এত উচ্চে। আমাদের আধুনিক স্থপতিগণ চেষ্টার দ্বারা তাহার অনুকরণ করিতে পারিলেও তাহাকে অতিক্রম করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে আমাদের পিতৃপুরুষগণের সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব বিচারের ক্ষমতা আমাদের অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকেও তাঁহাদের বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল, কিন্তু এখন দারুণ সভ্যতার কবলে পড়িয়া পথপার্শ্বস্থ প্রত্যেক তরু ছায়া দানের অপরাধে কর্ত্তিত হইতেছে। সহরময় এইরূপ বৃক্ষরাজির উচ্ছেদ সাধন কি নির্ম্মমতার পরিচায়ক! এখনকার এই স্লেট ও লোহার বিশীর্ণ-মূর্ত্তি ছাদের তুলনায় তাঁহাদের রক্তবর্ণ টালির ছাদ কি শোভন শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ করে! ইহা নিশ্চয়, আমাদের জন্য তাঁহারা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের ভবিষ্য বংশধরগণের জন্য আমরা তদ্রূপ কিছু-ই রাখিয়া যাইতে পারিব না; আমরা নূতন কিছু সৃষ্টি করা অপেক্ষা যাহা আছে তাহা বহুল পরিমাণে বিনষ্ট করিতেছি।

মানসিক ক্ষমতার বিকাশের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, শিক্ষার প্রভূত বিস্তার সত্ত্বেও কোন দিকেই আমরা বৃহৎ প্রতিভার পরিচয় পাই না। আমাদের অমর কবি ও লেখকগণ সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শিক্ষা যখন সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে ছিল। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিকাশের কোন অনুকূলতা করে না, তাহা বহুর সঙ্গে এক সমতলে মিলিত হইবার চেষ্টায়, অধিকন্তু তাহাকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে ও তাহাতে মৌলিকতার চিহ্ন থাকে না। প্রত্যেক শিক্ষা বিভাগেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিকাশের জন্য উপযুক্ত স্থান রাখা উচিত। প্রত্যেকের ভিতরেই এখন কাজ শেষ করিয়া ফেলার একটা দুঃসহ ত্বরা দেখা যায়। ইহার মূলে একটি মাত্র চেষ্টা আছে, তাহা অর্থ-চেষ্টা। প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের দ্বারা আমরা আমাদের বংশধরগণের স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে চাই অথবা নিজেরা কর্ম্মহীনতার আরাম সম্ভোগ করিতে চাই। অনেকেই ইহাকে পার্থিব সুখের চরম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এক দিন আমার একজন চাকরাণী আমাকে দিন রাত লিখিতে দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল যে, যদি সে এইরূপ 'মহিলাত্ব' লাভ করিত তবে দিন রাত বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছুই করিত না। সুস্থভাবে ও প্রফুল্লতার সহিত জীবনযাপনের মূল কর্ম্ম; তাহা যত ক্ষুদ্র-ই হউক না কেন, তাহাতেই মনুষ্যজীবনের পূর্ণ সার্থকতা।

কর্ম্মের ভিতর একটি পবিত্রতা, একটা সুমহান্ দিব্য ভাব আছে। পৃথিবী-বিস্তৃত এই যে কর্ম্ম—ইহার অত্যুন্নত শিখর-দেশ সপ্তলোকের শীর্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে! সমস্ত বিজ্ঞান, শৌর্য্য ও আত্মদানের কাহিনীর ভিতর আমরা কর্ম্মের-ই বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাই! ইহাই যদি ঈশ্বরের অর্চ্চনা না হয় তবে আমি ঈশ্বরার্চ্চনাকে একটি শোচনীয় বিষয়ের মতই দেখিতে পাইব!

জীবন ও তাহার শ্রমের সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের কি আছে! হে আমার ক্লান্ত ভ্রাতৃগণ! কে তোমরা পীড়িতচিত্ত আছ, চাহ! অনন্ত কালের ভিতর তোমাদের সহযোগী ব্যক্তিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে একমাত্র তাহারাই অমর, মনুষ্যজাতির রাজত্বের তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক; ঋষির মত, দেবতার মত, বীরের মত তাহারা মনুষ্যজাতির নিত্য পূজার যোগ্য! তোমার ভাগ্য কঠিন হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিষ্ঠুর বলিও না, কারণ বিধাতা তোমার আপন জননীর মতই তোমার শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া দিতেছেন।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

সরল কৃত্তিবাস ও সরল কাশীরাম দাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সরল কৃত্তিবাস সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, এখন সরল কাশীরাম দাস সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ এ দেশে অনেকের নিকট স্বয়ং ভগবানরূপে পূজিত হইয়া চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছেন,—তাঁহার ভক্তগণ যত বেশী কুকর্ম্ম তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে পারেন

ততই তাঁহাদের ভক্তির গাঢ়তা প্রকাশ পায়। মূল মহাভারতে নানা ভক্তের হাতে কৃষ্ণচরিত্র বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের সারোদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কাশীদাসী মহাভারতের কৃষ্ণ মূল মহাভারতের কৃষ্ণকে ছলনা, চাতুরী প্রভৃতি কার্য্যে হারাইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, মূল মহাভারতের যে সকল স্থলে কৃষ্ণের ছলনা বা চাতুরীর কোনও প্রসঙ্গ নাই কাশীদাসী মহাভারতে তাহা আছে। কৃষ্ণের অযথা কলঙ্কের প্রসঙ্গ বাদ দিলে সরল কাশীদাসের অঙ্গহানি হইত না। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে লক্ষ্যভেদ ব্যাপারে বা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কৃষ্ণের নিকট নারায়ণী সেনা প্রার্থনায় বা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করণে, কৃষ্ণ যে কোনও ছলনা বা চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, মূল মহাভারতে তাহা নাই; কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতে আছে। সরল কাশীরাম ৬৯ পৃষ্ঠায়:—

টানিয়া ধনুক দ্রোণ জল-ছায়া চায়।
দেখিয়া হৃদয়ে চিন্তিলেন যদুরায়॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানা বিদ্যা, অস্ত্র, শস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয়॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কিছু চিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ্য নাহিক অন্যথা॥
এত ভাবি চক্র আচ্ছাদেন চক্রধর।
মৎস্য লক্ষ্য ঢাকি রহে সেই চক্রবর॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বীর আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রছিদ্র পথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগন মণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
তাহার পর কর্ণ ছাড়িলেন বাণ বায়ুবেগে ছুটে।
জলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হ'য়ে গেল।
তিলবৎ হ'য়ে বাণ ভূতলে পড়িল॥

মূল মহাভারতে দ্রোণ লক্ষ্য বিঁধিতে অগ্রসর হন নাই, এবং কর্ণ বিঁধিতে উদ্যত হইবামাত্র দ্রৌপদী বলেন যে, "আমি সূতপুত্রকে বিবাহ করিব না।" সুতরাং কর্ণ ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। কাশীরাম দ্রোণ ও কর্ণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কৃষ্ণের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। সরল কাশীদাসে লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গে দ্রোণ ও কর্ণের উল্লেখ না থাকিলেও কোনও ক্ষতি হইত না।

দুর্য্যোধনের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটায় দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়ে কৃষ্ণকে বরণ করিবার জন্য দ্বারকা নগরে আগমন করিলেন। দুর্য্যোধন অগ্রে আগমন করিয়া দেখিলেন কৃষ্ণ বহির্কক্ষে নিদ্রিত। দুর্য্যোধন কৃষ্ণের মস্তকের সন্নিধানে উত্তম সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্জ্জুন আসিয়া কৃষ্ণের পদতলে উপবিষ্ট হইলেন। নিদ্রাভঙ্গে কৃষ্ণ প্রথমে অর্জ্জুনকে দেখিলেন, পরে দুর্য্যোধনকে দেখিলেন। উভয়েই কৃষ্ণের নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইলেন। কৃষ্ণ কহিলেন যে, "আমি উভয়েরই প্রার্থনা পূরণ করিব, কারণ দুর্য্যোধন অগ্রে আসিয়াছেন এবং অর্জ্জুনের সহিত অগ্রে কথা কহিয়াছি। তবে অর্জ্জুন কনিষ্ঠ। অর্জ্জুনের কথা অগ্রে শুনিব। অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধ পরাঙ্মুখ আমাকে চাও, কি আমার এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা চাও,— আমার নারায়ণী সেনার প্রত্যেকে আমার তুল্য যোদ্ধা।" অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি তোমাকে চাই।" তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন অত্যন্ত প্রীত হইয়া নারায়ণী সেনা প্রার্থনা করিলেন। মূল মহাভারতের বিবরণ এই। ইহাতে কৃষ্ণের কপটতার কোন কথা নাই। কাশীদাসী মহাভারতে আর সবই মূলের অনুরূপ, কেবল বেশীর ভাগ এইটুকু যে কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের পূর্ব্বে আগমন জানিয়াও কপট নিদ্রায় রহিলেন। সরল কাশীরাম দাসের ৩২৫ পৃষ্ঠায় আছে:—

* * *

"সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় অলস যেন সিংহাসনোপরি॥
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার।
উঠিতে সম্মুখে দেখে কুন্তীর কুমার॥"

প্রথম তিন ছত্র বাদ দিলে সকল গোল মিটিয়া যাইত। সরল কাশীরাম দাসের ২৯৫ হইতে ২৯৮ পৃষ্ঠায় "—

ধনুর্দ্ধর নামের পরিচয় দান" বর্ণিত হইয়াছে। বিরাট-কুমার উত্তর বৃহন্নলাকে বলিতেছেন, "যদি তুমি অর্জ্জুন তাহা হইলে তোমার ধনঞ্জয় নামের কারণ বল।" অর্জ্জুন ধনঞ্জয় নামের পরিচয় প্রসঙ্গে এক মস্ত গল্প ফাঁদিলেন। নদের হস্তীনায় অবস্থানকালে কুন্তী স্বয়ম্ভু পাষাণ লিঙ্গ শিব পূজা করিতেন। গান্ধারীও প্রত্যহ ঐ শিবের পূজা করিতেন। রাজপত্নী বিনা অন্য কেহ সেই পূজা করিতে পারেন না, গান্ধারী ও কুন্তী উভয়েই প্রত্যহ শিবের পূজা করিতেন, কিন্তু পরস্পরের সাক্ষাৎ হইত না। দৈবাৎ এক দিন সাক্ষাৎ হইল। গান্ধারী বলিলেন, "তুমি এখানে কেন কুন্তী! শিবপূজা করিতে আসিয়াছ বুঝি?" কুন্তী বলিলেন, "আমি ত বরাবরই এই শিব পূজা করিতেছি, তুমি এখানে আসিয়াছ কেন বল?" অমনি--

"গান্ধারী বলেন রাঁড়ি এত গর্ব্ব তোর।
গোপনে পূজিস্ লিঙ্গ সংপূজিত মোর?
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী।
কোন্ ভরসায় তুমি পূজ শূলপাণি।

কুন্তী বলিলেন, "আমি বরাবর এ শিব পূজা করিতেছি, মধ্যে কিছু দিন স্বামীসহ পর্ব্বতে ছিলাম। দেশে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় এ শিব পূজা করিতেছি, এ কথা সকলেই জানে। তুমি আমার সহিত বৃথা কলহ করিও না।" এইরূপে দুই জনে ঝগড়া। শিব দেখিলেন মুস্কিল। তিনি সশরীরে আবির্ভূত হইয়া কহিলেনঃ—

সবাকার ইষ্ট আমি সবে পূজা করে।
কার শক্তি অছে মোরে অংশ করিবারে॥
তবে একজন যদি চাহ পূজিবারে।
এই মম দৃঢ় বাক্য কহি দোঁহাকারে।
কনকের দল হবে মাণিক কেশর।
সুগন্ধি সহস্র চাঁপা অতি মনোহর॥
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিহ লিঙ্গ তাহারি হইবে॥

শিবের কথা শুনিয়া গান্ধারী সন্তুষ্ট হইলেন এবং কুন্তীকে উপহাস করিয়া বলিলেন, "এইবার মহেশ্বর তোমারই হইলেন।" কুন্তী উপহাসের মর্ম্ম বুঝিয়া বাড়ীতে আসিয়া মনের দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন; রন্ধনাদি কিছুই করিলেন না। ভোজন কালে ভীম আসিয়া অন্ন চাহিলেন, কুন্তী উত্তর দিলেন না; কাঁদিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। অর্জ্জুন কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি চম্পক সংগ্রহ করিয়া দিব।" কুন্তী কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। অবশেষে অর্জ্জুনঃ—

দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
বায়ব্য যুগল মনোভেদী অস্ত্র মারি॥
কাটিয়া কুবের পুরী পুষ্পের কারণ।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ॥
সুগন্ধি কনকপদ্ম চম্পক মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হইল অপ্রমিত॥

তখন অর্জ্জুন কুন্তীকে বলিলেন, "স্নান করিয়া শিবপূজা করিতে যা'ন্।" কুন্তী শিবপূজা করিয়া ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ। গান্ধারীর পুত্রগণ শিল্পিগণ দ্বারা যে কনক চম্পক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন গান্ধারী সেই সকল চম্পক লইয়া পূজা করিতে আসিতেছিলেন। কুন্তীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্রগণকে গালি দিতে লাগিলেন। ধনপতিকে জয় করিয়া অর্জ্জুন মাতাকে শিবপূজা করাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁর নাম হইল ধনঞ্জয়। মূল মহাভারতে এ উপাখ্যান দেখি নাই। সমগ্র মহাভারত পাঠে মনস্বিনী গান্ধারীর প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা হয়। এই উপাখ্যান পাঠে সেই শ্রদ্ধার লাঘব হইবে। মূল মহাভারতে ধনঞ্জয় নামের কারণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—"অর্জ্জুন কহিলেন, আমি জনপদ জয় করিয়া ধনসংগ্রহ পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি, এই জন্য আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে।" এই অসার উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অর্জ্জুনের দশ নাম ও যে অংশে উত্তর শমী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বৃক্ষস্থিত এক একটি অস্ত্রের বর্ণনা করিতেছেন ও অর্জ্জুন সে গুলির পরিচয় দিতেছেন সেই অংশ দিলেই ভাল হইত। অথচ এ সকল কথার জন্য দুই পৃষ্ঠার বেশী লাগিত না।

মায়া-সরোবরে জল আনিবার জন্য যুধিষ্ঠির একে একে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবকে আদেশ করিলেন।

তাঁহাদের বিলম্ব দেখিয়া নিজে না গিয়া দ্রৌপদীকে পাঠাইলেন। যখন কেহই ফিরিলেন না তখন নিজে গেলেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতে এইরূপ আছে। সরল কাশীদাসেও এই অংশ রাখা হইয়াছে। মূল মহাভারতে দ্রৌপদীকে জল আনিতে পাঠাইবার কথা নাই। যুধিষ্ঠিরের এই বীরত্ব-কাহিনী ছেলেদের না জানাই ভাল। এজন্য সরল কাশীরাম দাসের ২৭০ পৃষ্ঠায় :—“সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল” হইতে ২৭১ পৃষ্ঠার “হইলে তাঁহার মৃত্যু স্পর্শি মায়া বারি” পর্য্যন্ত এই ষোল ছত্র বাদ দিলেই হইত।

সরল কাশীরাম দাসের ৩৬০।৩৬১ পৃষ্ঠায় ভীষ্মের নিকট দুর্য্যোধনের অনুযোগ এবং ভীষ্মের পঞ্চপাণ্ডব বধের প্রতিজ্ঞা ও তজ্জন্য তূণ হইতে পঞ্চ শর বাহির করিবার কথা এবং কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক ছলনার সাহায্যে ঐ পঞ্চ শর ভীষ্মের নিকট হইতে আনয়ন বর্ণিত হইয়াছে। ভীষ্ম পঞ্চ শর বাহির করিবার সময় বলিলেন,—

“পাণ্ডবে সমরে কল্য নাশিব এ শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥”

দেব দামোদরও ‘ছল’ করিতে ত্রুটি করিলেন না! গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে বর দিতে চাহেন। অর্জ্জুন তখন সে বর লন নাই। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লইয়া দুর্য্যোধনের নিকটে গেলেন এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া দিয়া তাঁহার মুকুট চাহিয়া লইলেন। সেই মুকুট মাথায় দিয়া অর্জ্জুন ভীষ্মের শিবিরে গিয়া হাজির হইলেন। ভীষ্ম মনে করিলেন, আবার বুঝি দুর্য্যোধন আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার আসিলে কেন?” দুর্য্যোধন অর্থাৎ ছদ্মবেশী অর্জ্জুন বলিলেন, “আপনার মহাকাল পঞ্চ শর আমাকে প্রদান করুন, তদ্দ্বারা আগামী কল্যের যুদ্ধে আমি স্বহস্তে পাণ্ডবগণকে নিধন করিব।” ভীষ্ম অর্জ্জুনের ছলনা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাকে পঞ্চশর দিলেন। অর্জ্জুন শর লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

“হেনকালে বাসুদেব দিলেন দর্শন।
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ॥”

তখন ভীষ্ম কৃষ্ণকে বলিলেন—

“আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে॥”

মূল মহাভারতে ঐ সকল কথা কিছুই নাই। কৌরব ও পাণ্ডব—উভয়েই ভীষ্মের তুল্য স্নেহের পাত্র। তবে ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিলেন কেন? তাহার কারণ এই :—পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে প্রকাশ হইলেন। উত্তরার পরিণয় হইল। পাণ্ডবেরা হস্তীনায় ধৌম্যকে প্রেরণ করিয়া, নির্ব্বিবাদে তাঁহাদের রাজ্য চাহিয়া পাঠাইলেন। দুর্য্যোধন গোঁ ধরিলেন—বিনা যুদ্ধে ‘তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি দিব না।’ ভীষ্ম প্রভৃতি দুর্য্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কর্ণ খুব আস্ফালন করিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্য লাভ করিয়াই অত স্পর্দ্ধা করিতেন। কর্ণের আস্ফালন শুনিয়া তাঁহাকে ভীষ্ম তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন যে, “চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে এবং বিরাট নগরে গোধন উদ্ধারকালে অর্জ্জুন তোমাদিগকে হারাইয়া দিয়াছে, তুমি বৃথা স্পর্দ্ধা করিও না।” তাহা শুনিয়া কর্ণ রাগিয়া বলিলেন, “পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না।” তখন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে বলিলেন, “কর্ণ যুদ্ধ করিবে না বলিয়াই যে পাণ্ডবেরা তোমার সেনানাশ করিবে, এমন হইতে দিব না। যুদ্ধ হইলে আমি তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিব।” পূর্ব্বকালের লোকদের স্বভাব এইরূপ ছিল যে, তাঁহারা যাহা একবার বলিতেন কদাচ তাহার অন্যথা হইত না। বলিতে গেলে ভীষ্ম এ বিষয়ে আদর্শ। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি হয়েন, কিন্তু দুর্য্যোধনকে কতগুলি নিয়মে বাধ্য হইতে হয়। যুদ্ধের প্রারম্ভে ভীষ্ম বলিলেন, “পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি সেনাপতি হইয়া তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিব, কিন্তু পাণ্ডবেরা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের হিতজনক পরামর্শ দিব, পাণ্ডবেরা আমার স্নেহের পাত্র, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না; শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রী ছিল, সে আমার সম্মুখে থাকিলে আমি যুদ্ধ করিব না। আমি সেনাপতি হইলে কর্ণ যুদ্ধ করিতে পাইবে না।” দুর্য্যোধন এই সমস্ত

নিয়মে বাধ্য হইয়া ভীষ্মকে সেনাপতি করিলেন। মূল মহাভারতের বিবরণ এই। এমত অবস্থায় ভীষ্মের পক্ষে পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ পঞ্চশর তূণ হইতে বাহির করা হইতে পারে না। সেই জন্য সরল কাশীরাম দাসের ৩৬০।৩৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন ছলে ভীষ্মের পঞ্চশর গ্রহণ বৃত্তান্ত একেবারে বাদ দেওয়া উচিত ছিল। বরং উদ্‌যোগ পর্ব্বের মধ্যে, ভীষ্ম যে নিয়মে ও যে কারণে দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিতে স্বীকার করেন তৎসম্বন্ধে কয়েক ছত্র যদি যোগীন্দ্র বাবু রচনা করিয়া দিতেন তাহা হইলে ছেলেরা ভীষ্ম-চরিত্র ভাল বুঝিতে পারিত। সরল কাশীরাম দাসের ৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রোণ বলিতেছেন,—

"আমি যদি সেনা পতি হইব সমরে।
তবে অস্ত্র না ধরিবে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
এতেক শুনিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ॥"

অথচ অভিমন্যুবধের সময় সপ্তরথীর মধ্যে দ্রোণও আছেন কর্ণও আছেন। মূল মহাভারতে ঐরূপ কোন কথা নাই। বরং ভীষ্মের শরশয্যার পর দুর্য্যোধন যখন কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভীষ্মের পর কে সেনাপতি হইবার উপযুক্ত স্থির কর; তখন কর্ণ বলিলেন যে, "নবাগত রাজন্যবর্গ মধ্যে সকলেই বীর, সকলেই সেনাপতি হইলে হইতে পারেন। কিন্তু সকলেই একসঙ্গে সেনাপতি হইতে পারেন না। দ্রোণ সকলের আচার্য্য, স্থবির ও ধনুর্দ্ধর দিগের অগ্রগণ্য; অতএব দ্রোণকেই সেনাপতি করুন।" তদনুসারে দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্ব্বে উদ্ধৃত চারি ছত্র বাদ দিলে সকল দিক বজায় থাকিত।

সরল কাশীরাম দাসের ১৩৬।১৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার কলহ বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয় মূল মহাভারতে নাই, থাকিলেও ছেলেদের জন্য সম্পাদিত মহাভারতে তাহা না থাকিলেই ভাল হইত। এই উপাখ্যানে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বা অতি ইতর নারীর ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন। দ্রৌপদীরই দোষ বেশী। হিড়িম্বা আসিয়া কুন্তীকে প্রণাম করিয়া—

যথায় দ্রৌপদী, ভদ্রা রত্নসিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে॥
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া পার্ব্বতী দেবী অন্তরে কুপিল॥

কুপিত হইয়া দ্রৌপদী হিড়িম্বাকে অনেক গালি দিলেন, হিড়িম্বাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি সুদ-সমেত দ্রৌপদীকে গালি ফেরত দিলেন। হিড়িম্বা বারংবার নিজের পুত্র ঘটোৎকচের গর্ব্ব করিতেছেন দেখিয়া

কহিতে লাগিলা কৃষ্ণা কুপিত অন্তর॥
পুনঃ পুনঃ যতেক কহিস্ পুত্র কথা।
পুত্রের করিস্ গর্ব্ব খাও পুত্রমাথা॥
কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবে পরাণ॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল॥
নির্দ্দোষ আমার পুত্রে দিলে তুমি শাপ।
তুমিও পুত্রের জন্য পাবে বড় তাপ॥
যুদ্ধ করি মরে পুত্র যায় স্বর্গ বাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চ পুত্র হইবে নাশ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বাইল॥"

অনিষ্ট যা হইবার তাহাত ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গেল, এখন আর কুন্তীর সান্ত্বনার ফল কি? কুন্তীর ব্যবহারটি অনেক উপদেষ্টার মত, যাঁরা আপৎকালে বা বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিপদ ঘটিয়া গেলে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করেন। মনে রাখিতে হইবে যে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার কলহ হইতেছে রাজসূয় যজ্ঞের সময়। সে সময় কেহই জানিত না যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইবে। পতিব্রতা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার জন্য অকালজাত আম্রের গল্পিকা-প্রসূত উপাখ্যানের ন্যায় এই দ্রৌপদী-হিড়িম্বা-কলহ সংবাদ সরল কাশীরাম দাসের পাঠক-পাঠিকাদের সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

মোটের উপর দেখিতে পাওয়া যায় যে কাশীরাম দাসের মহাভারতের যুধিষ্ঠির মূল মহাভারতের যুধিষ্ঠির অপেক্ষা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ক্রন্দন করিতে অধিক

পারদর্শী। যতদিন সংসার করিলেন ততদিন না হয় এত কান্নাকাটি কোন প্রকারে সহ্য গেল। কিন্তু রাজ্য-ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরের দীর্ঘ ছন্দের ক্রন্দনগুলি বিরক্তিকর নহে কি? দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীম প্রত্যেকের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির স্ত্রীলোকদের মত বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন,—এত যার সংসারে মায়া তাঁর সংসার ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিতে যাওয়া কেন? এই সব ক্রন্দন বাদ দিয়া যোগীন্দ্র বাবু যদি এই প্রসঙ্গে মূল মহাভারতের অনুযায়ী যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে কয়েক ছত্র রচনা করিয়া দিতেন তাহা হইলে মণি-কাঞ্চনের যোগ হইত।

মূল মহাভারতের যুধিষ্ঠির কিরূপে মহাপ্রস্থান করিতেছেন দেখুন।

"মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সহিত যোগ-পরায়ণ ও উপবাসনিরত হইয়া ক্রমাগত উত্তরদিকে গমন করিতে করিতে হিমালয় গিরি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদী নিতান্ত পরিশ্রম নিবন্ধন যোগভ্রষ্টা হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখেই ধরাতলে পতিত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ রাজপুত্রী দ্রৌপদী ত কখন কোন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই, তবে কি নিমিত্ত উনি ভূতলে নিপতিত হইলেন?' তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ, দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজি উঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাহিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন।" এইরূপে একে একে সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীম পর্ব্বতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিত-চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। সরল কাশীরাম দাসের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের 'বিলাপ বাদ দিলে দুই তিন পৃষ্ঠা বাঁচিয়া যাইত।

এইরূপ আবশ্যক অংশ বাদ দিয়া বনপর্ব্বে প্রহ্লাদ-চরিত্র এবং আদিপর্ব্বে দেবযানী ও কচের উপাখ্যান দিলে পুস্তকের উপকারিতা বৃদ্ধি হইত।

পরিশেষে উভয় পুস্তক সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা বলিতেছি। সরল কৃত্তিবাসে ও সরল কাশীদাসের অনেক স্থলেই কবিদ্বয়ের ভনিতা বাদ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে উপাখ্যানগুলি আমাদের নিকট কিছু ফাঁক ফাঁক লাগিয়াছে। কোন গান কেহ গাইলে এক একটি অন্তরার শেষে গানের প্রথম কয়েক ছত্র বা ধুয়া পাল্টাইয়া একবার গাইয়া পরে অন্য অন্তরা গাইয়া থাকেন; ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়; ধুয়া না গাইয়া বরাবর গানটি গাইয়া গেলে ফাঁক্ ফাঁক্ লাগে। তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের এক একটি উপাখ্যানের পর তাঁহাদের ভনিতা সম্বলিত দুটি ছত্র আমাদের মনের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে গাঁথিয়া রহিয়াছে। ভনিতা না থাকায় কৃত্তিবাস ও কাশী দাসের সহিত শিশুগণের পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিবে। প্রত্যেক উপাখ্যানের পর ভনিতা থাকিলে মোটের উপর রামায়ণের পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা এবং মহাভারতের দশ বার পৃষ্ঠা বেশী লাগিত। চিত্রগুলি ভালই হইয়াছে, তবে আরও কতকগুলি প্রচলিত চিত্র দিলে ভাল হইত; যথা ভীষ্মের শরশয্যা, দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ, অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধ প্রভৃতি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

গৃহশিক্ষা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার কয়েক দিন পর মিসেস হ্যামিণ্টন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া মিসেস গ্রেহামের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন। সিসিল গ্রেহাম তখন বাগানে বেড়াইতেছিল, পার্সি বয়সে সিসিলের ছয় বৎসরের বড়, কিন্তু বড় বলিয়া তাহার সঙ্গে মেশা অসম্মান মনে করিত না। সে সিসিলের সহিত বাগানেই রহিয়া গেল।

সিসিল জিজ্ঞাসা করিল, 'পার্সি, বৃহস্পতিবার তুমি মেলায় যাইবে না? সেখানে কত আমোদ হইবে! ঘোড় দৌড়, বুনো জন্তর খেলা—আরো কত কিছু! অবশ্যই তুমি যাবে?"

"আমি তার সম্ভাবনা বড় দেখি না।"

বিস্মিত হইয়া সিসিল বলিল, "তুমি যাবে না! সে কি? এই সেদিন আমি বলিতেছিলাম, তোমার মতন আমি যখন বড় হব, তখন আমার কত আনন্দ হবে, আমি তখন স্বাধীন হব, নিজের কর্ত্তা নিজেই হব।"

"সিসিল, আমি এখনও আপনাকে নিজের কর্ত্তা মনে করি না। কখনও কখনও আমার মনে হয়, আমি স্বাধীন হইলে বেশ হইত, আবার অন্য সময় মনে হয় যেমন আছি সেই ভাল। আর এই মেলায় ত যাওয়া হইতেই পারে না, মিঃ হাওয়ার্ড যে কাল আসিতেছেন।"

"কিন্তু আমোদ প্রমোদের জন্য ছুটী নেওয়া কি অন্যায়? আমার বোধ হয় আমার বাবার মত তোমার বাবাও কড়া মেজাজের লোক, এসব খেলা তামাসা তিনিও বোধ হয় পসন্দ করেন না, এগুলি দুর্নীতি মনে করেন, না!"

সিসিলের কথায় ঠাট্টার ভাব দেখিয়া পার্সি বিরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ রুক্ষভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা তোমার বাবার মত তুমি ঠিক জান?"

"হাঁ—জানি বই কি? তুমি আমার দিকে অমন করিয়া তাকাইতেছ কেন পার্সি! আমি ত অন্যায় কিছু বলি নাই। মার মুখে বার বার যাহা শুনিয়াছি, তাই বলিয়াছি।"

"তাই বলিয়া তুমি তোমার পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে? আর তাঁর যদি ইহাই মত হয় তবে তুমি কি করিয়া মেলায় যাবে? তিনি ত অনুমতি দিবেন না!"

"কিন্তু মা যে রাজি হইয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন এই কয়েকদিন যদি আমি বেশ শান্ত শিষ্ট ভাবে চলিতে পারি, তাঁকে বিরক্ত না করি, তবে তিনি আমাকে যাইতে দিবেন। তিনি ত এতে কিছু দোষ দেখিতে পান না! আর বাবার অনুমতির কথা বল কেন? তাঁর মতামতের উপর নির্ভর করিতে গেলে আমার আর কোথাও যাওয়া হয় না! তাঁর মেজাজ এত কড়া, যে তিনি ঘরে থাকিলে আমি খেলার কথা পর্য্যন্ত মুখে আনিতে সাহস করি না।"

"তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ সিসিল! তোমার প্রকৃত বন্ধু কে তাহা জান না। আমার বাবার সম্বন্ধে এমন ভাব আমি মনেও আনিতে পারি না।"

"কিন্তু তোমার বাবা আর আমার বাবাতে ঢের তফাৎ পার্সি! তোমার বাবা কখনও তোমাকে শাস্তি দেন না, অথবা তুমি কোথাও যাইতে একান্ত আগ্রহ দেখাইলে তাহাতে বাধা দেন না।"

"আমার কোন ইচ্ছা পালন করিলে যদি আমার অনিষ্ট হবে মনে করেন, তবে বাবা তা'তে অবশ্য বাধা দেন। বাবার শাস্তি যাহাতে পাইতে না হয় আমি সে জন্য সর্ব্বদাই ভাল ভাবে চলিতে চেষ্টা করি। তোমার মত আমি যখন আরো ছোট ছিলাম তখন বাবা আমার দুষ্টামির জন্য কত শাস্তি দিয়াছেন!"

"কিন্তু অন্য সময় তিনি তোমাকে আদর করিতেন। আমার বাবা যদি শুধু দুষ্টামির জন্য আমাকে শাসন করেন, আর যখন ভাল ব্যবহার করি তখন একটুও আদর করেন, তবে আমার কিছু দুঃখ ছিল না। যাক্, মিঃ হ্যামিল্টন কি তোমাকে মেলায় যাইতে বারণ করিয়াছেন?"

"ঠিক যে বারণ করিয়াছেন তা নয়। তিনি শুধু বলিয়াছেন, এসব আমোদে দিন কাটাইলে তাহা নিতান্তই ব্যর্থ যায়। আর এসব মেলায় প্রায়ই জুয়া-খেলা হয়। আমাদের বয়সের ছেলেদের তাহা দেখা তিনি ভাল মনে করেন না। আমার ঘোড়াটি নিয়া আমি যদি মেলায় রওনা হই, তিনি হয়তঃ বিরক্ত না হইতে পারেন। কারণ আমি এখন নিতান্ত ছেলে মানুষ নই। বাবা বলেন, এখন অনেক বিষয় আমাকে নিজেই মীমাংসা করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যাহা ঠিক মনে করেন না আমি তাহা করা ভাল মনে করি না, আমাকে শেষে তার মন্দফল ভুগিতে হইবে।"

"কিন্তু পার্সি, আমি যখন তোমার মত বড় হব তখন আমি কারো অধীনতা স্বীকার করিব না। আমি তখন তোমার মত পাড়া-গাঁয়ের শিক্ষকের নিকট পড়িব না, আমি তখন ইটনে পড়িব।" *

এই বলিয়া বুক ফুলাইয়া গর্ব্ব ভরে সিসিল বেড়াইতে

* ইটনের স্কুল বিলাতের একটি সুবিখ্যাত বিদ্যালয়।

লাগিল। পার্সি হাসিতে লাগিল। এমন সময় মা ডাকিলেন, সে মার সঙ্গে বাড়ী চলিল।

মিসেস্ হ্যামিল্টন আজ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, পার্সির মনটা কোনও গুরুতর চিন্তায় যেন ভারাক্রান্ত। মাতার সঙ্গে সঙ্গে সে নীরবে পথ চলিতেছিল। পার্সি নিজের অবিবেচনায় সময় সময় বড় মুস্কিলে পড়িত। মা ভাবিলেন, আজও তেমনই কিছু ঘটিয়াছে। তিনি তামাসার ভাবে তাহাকে তাহার বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্সির মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর না দিয়া মার সঙ্গে অন্য কথা আরম্ভ করিল। জননীও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন না; তিনি জানিতেন, পার্সি কোন ভুল করিয়া থাকিলে সে নিজেই তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। সন্তানের সুবুদ্ধির উপর তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল।

কতকগুলি কারণে পার্সি বেশ একটু মুস্কিলেই পড়িয়াছিল। পিতার নিকট নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার ষোল আনা পরিচয় না দিয়া সে আর উদ্ধারের আশা দেখিতেছিল না। সন্তানগণের প্রতি মিঃ হ্যামিল্টনের একটা দৃঢ় আদেশ ছিল, তাহারা কখনও ঋণ করিতে পারিবে না। তিনি এজন্য তাহাদিগকে হাত খরচের টাকা বেশী করিয়াই দিতেন। পার্সি কিছু অমিতব্যয়ী ছিল, তাহার দয়াও সময় সময় মাত্রা অতিক্রম করিত। জননী শৈশব হইতে সন্তানদের মনে সৌন্দর্য্য-বোধ যাহাতে ভাল করিয়া বিকশিত হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। পার্সির বেলায় ইহার একটু কুফলও ফলিয়াছিল। সে সুন্দর সুন্দর ছবি ও ভাল বাঁধান বই দেখিলেই কিনিতে ব্যগ্র হইত। সম্প্রতি কতকগুলি ছবির অত্যন্ত প্রশংসা শুনিয়া সে একজন দোকানদারকে সেগুলি আনাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিল। ছবিগুলি যখন আসিল তখন পার্সি হিসাব করিয়া দেখিল, একসঙ্গে মূল্য শোধ করিবার সাধ্য তাহার নাই। কাজেই দোকানদারের নিকট মূল্য বাকী না রাখিলে চলে না। সে তাহার নিকট ঋণী হইয়া পড়িল। পিতার ইচ্ছার এই বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাহার মনে অবশ্যই অত্যন্ত ব্যথা লাগিল, কিন্তু এখন আর উপায় নাই। এখন ছবিগুলি না কিনিলে দোকানদারের ক্ষতি হয়। মূল্যের অতি সামান্য অংশমাত্র সে প্রথম মাসে শোধ করিল। দ্বিতীয় মাসে নিজের হাত খরচের জন্য অতি সামান্য টাকা রাখিয়া সে ঋণের অর্দ্ধাংশ শোধ করিল। তৃতীয় মাসে ঋণের অবশিষ্টাংশ শোধ করিবার মত সমস্ত টাকা লইয়া সে দোকানদারের নিকট চলিয়াছে, এমন সময় পথে এমন এক দৃশ্য দেখিতে পাইল, যে ঋণ-শোধের কথা আর মনেই আসিল না। অনাহারক্লিষ্ট একটি বিপন্ন পুরুষের সঙ্গে পার্সি তাহার কুটীরে চলিল। দেখিল, একটি স্ত্রীলোকের মুমূর্ষু অবস্থা, তাহার পাশে একটি নবজাত শিশু, গৃহে আরও ২। ৩টি অর্দ্ধাশনে ক্লিষ্ট বালক বালিকা। পার্সির কোমল হৃদয় গলিয়া গেল। সে সমস্ত টাকা সেই লোকটিকে দিয়া তাড়াতাড়ি তাহার স্ত্রীর জন্য ডাক্তার আনিতে ছুটিল। বিপন্ন পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া যখন দোকানদারের কথা মনে পড়িল তখন তাহার সকল উৎসাহ ও পরদুঃখকাতরতা দূরে পলায়ন করিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সে পরের ধনে পোদ্দারি করিয়াছে, অপরের প্রাপ্য অর্থ দান করিয়াছে। দোকানদারের সঙ্গে আর দেখা না করিয়াই সে বাড়ী ফিরিল।

চতুর্থ মাসের ১লা তারিখেই পার্সির জন্মদিন পড়িয়াছিল। সেদিন একজন বন্ধুর বাড়ীতে তাহারা কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার কথা ছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পার্সি সেই পার্টি হইতে চলিয়া আসিলেই ভাল হয়, মিঃ হ্যামিল্টন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মীমাংসার ভার তিনি পার্সির উপরই রাখিয়াছিলেন। আমোদ প্রমোদ এতই জমিয়া উঠিল, যে পার্সি কিছুতেই আর মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সেখান হইতে আসিতে পারিল না। রাত্রি ভোজন পর্য্যন্ত তাহাকে সেখানে থাকিতে হইল। রাত্রির আমোদ আরও জমিয়া গেল। পাশের গ্রামে একজন নূতন পাদ্রী আসিয়াছিলেন, লোকটির আকার প্রকার, আচার ব্যবহার কতকটা অদ্ভুত রকমের। তাঁহাকে নিয়া ঠাট্টা তামাসা চলিতে লাগিল। তাঁহার চরিত্র ও আকৃতি বর্ণনা করিয়া ছড়া, কবিতা রচনা হইতে লাগিল। পার্সির বেশ কবিত্ব-শক্তি ছিল, সে তাড়াতাড়ি ৫। ৬টা ব্যঙ্গ

কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার কবিতাগুলি বাস্তবিকই সুন্দর হইয়াছিল, সেই কবিতা শুনিয়া সেখানে হাসির ফোয়ারা ছুটিল। সেই কবিতাগুলি পাইবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিল, কিন্তু পার্সি কিছুতেই কাহাকেও সেগুলি দিল না। পকেটে পূর্ব্বরচিত অন্যান্য কবিতার মধ্যে রাখিয়া দিল।

পরদিন এই আমোদ প্রমোদের স্মৃতি তাহাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল। কবিতাগুলি নষ্ট করিবার উদ্দেশে সে পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল। অন্যমনস্কতা বশতঃ সে জানিতে পারিল না, যে ব্যঙ্গ কবিতাগুলি রহিয়া গেল, ভাল ভাল কবিতা কয়টি ভস্মসাৎ হইল।

যে দোকানদারের নিকট হইতে পার্সি ছবিগুলি কিনিয়াছিল তাহার একখানা মাসিক পত্রিকা ছিল। লেখকদিগকে সে ভাল লেখার বিনিময়ে অর্থ দিত। পার্সি তাহাকে বাকী ঋণের আর কিয়দংশ নগদ দিয়া কিছু লেখা দিয়া অবশিষ্টাংশ শোধ করিবার ইচ্ছা জানাইল। দোকানদারের তখন লেখার বড়ই প্রয়োজন ছিল, তাড়াতাড়ি লেখা পাঠাইতে পার্সিকে অনুরোধ করিল। পার্সি বাড়ী ফিরিয়া দেখিল তাহাদের চাকর রবার্ট সেই দোকানদারের দোকানের দিকে যাইবার জন্যই বাহির হইতেছে। পার্সি তাড়াতাড়ি কবিতাগুলি বাহির করিয়া দোকানদারকে দিবার জন্য রবার্টের হাতে দিল। পড়িয়া দেখিবার আর অবসর হইল না। কবিতার সঙ্গে লেখকের নাম প্রকাশ না করিতে সে দোকানদারকে প্রতিশ্রুত করাইয়া আসিয়াছিল। কবিতাগুলি পড়িয়া দোকানদার তাহাকে জানাইল, সেগুলি পড়িয়া সে বড়ই প্রীত হইয়াছে, এবং পার্সির ঋণ তাহাতেই শোধ হইয়া গিয়াছে।

এই সংবাদে পার্সির মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া সে পিতার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিবে স্থির করিল। কারণ তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে ঋণমুক্ত হইবে। এত দিন পিতার নিকট এই ঋণের কথা গোপন রহিয়াছে, ইহাই তাহার অপরাধ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু যখন কবিতা প্রকাশিত হইল, তাহা দেখিয়া পার্সির চক্ষুস্থির! সে দেখিল, ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয়কে বিদ্রূপ করিয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছিল এবং যাহা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া তাহার ধারণা, তাহাই কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। লজ্জায়, ঘৃণায়, আত্মগ্লানিতে সে যেন মরমে মরিয়া গেল। একজন ধর্ম্মপ্রচারকের প্রতি এমন নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন বিদ্রূপ তাহাদ্বারা লিখিত হইয়াছে এবং তাহা সাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে! তাহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল।

এখন সে কি করিবে? অবিবেচকের মত কতকগুলি ছবি কিনিয়াই ত এই দুর্দ্দশা ঘটিল। পিতার নিকট গিয়া এখন সকল কথা খুলিয়া বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে? তাঁহাকে বলিবে, যে সে নিজে এই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক ব্যঙ্গ কবিতার রচয়িতা! না—কিছুতেই সে তাহা পারিবে না। তবে কি মাকে বলিয়া তাঁহাদ্বারা পিতার নিকট সুপারিস করাইবে? তাহাও ঠিক মনে হইল না। যদি সকল কথা বলিয়া অপরাধ স্বীকার করিবার মত সাহস হয়, পিতার নিকট নিজেই তাহা করিবে। কিন্তু যতই ভাবিতে লাগিল, কিছুতেই মনকে প্রস্তুত করিতে পারিল না। লেডি হেলেনের বাড়ী যাইবার পূর্ব্ব দিন তাহার মনের এই অবস্থা, সুতরাং মা যে তাহাকে সেদিন বিষণ্ণ দেখিবেন তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দুদিন পর পরিবারস্থ সকলে একত্রে বসিয়া আছেন এমন সময় লজ্জারক্তিম বদনে, ভীত-স্বরে হারবার্ট তাঁহার পিতাকে বলিল, সে আজ তাঁহার নিকট বিশেষ একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে। সে আরও বলিল, এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতেছে, কিন্তু পিতামাতাকে সে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিল, যে কোন অন্যায় কার্য্য সাধনের জন্য সে এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করে নাই। তাহার প্রার্থনা এই, পরদিবস কয়েক ঘণ্টার জন্য সে কোন চাকর বাকর সঙ্গে না লইয়া অশ্বারোহণে ৬।৭ ঘণ্টার জন্য স্থানান্তরে যাইতে চাহে।

মিঃ হ্যামিল্টন এই প্রার্থনায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, উপস্থিত সকলের মুখেই অত্যন্ত বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা গেল। হারবার্ট নিতান্ত শান্তশিষ্ট, অধ্যয়নই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা

প্রিয় কাজ, স্কুলের লেখাপড়া এত দিন কামাই হইয়াছে, মিঃ হাওয়ার্ড সবে মাত্র সে দিন ফিরিয়া আসিয়াছেন, আজ হঠাৎ সে এ কোন্ রহস্যময় অভিযানে যাইতে চাহে? সকলের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পার্সি মুখ তুলিয়া চাহিল কিন্তু অন্যান্যের ন্যায় বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিল না। মিঃ হ্যামিল্টন একবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর বলিলেন :- -বাবা হারবার্ট! তুমি আজ আমাদিগকে বড়ই বিস্মিত করিয়াছ। কিন্তু আমি অসঙ্কোচে প্রার্থিত বিষয়ে আমার সম্মতি দিতেছি। তোমার মার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতেছি, ইহাতে তাঁহারও সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তোমার বয়স এখন প্রায় ১৫ বৎসর। জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত তুমি কখনও তোমার কোন ব্যবহারে আমাকে কষ্ট দাও নাই। আজ তোমার ইচ্ছা পালন করিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ হইতেছে না। তোমার অভিপ্রায় কি, আমি তাহাও জিজ্ঞাসা করিব না, আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি, তুমি কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য যাইতেছ না।"

"বাবা, তোমায় শত শত ধন্যবাদ। আমি আশা করি —আমি কখনও এমন কাজ করিব না, যাহাতে তোমার বিশ্বাস হারাইতে হইবে।" বলিতে বলিতে হারবার্টের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তার পর মাতার পদপ্রান্তস্থিত টুলে বসিয়া বিনম্র মধুর বচনে বলিল, "মা আমার! তুমিও আমাকে বিশ্বাস করিবে? আমার যদি আসিতে একটু দেরী হয়, আমার জন্য অস্থির হইবে না? তুমি যদি আমাকে আশ্বাস না দেও তবে ত আমি মনে সুখ পাব না?"

"বাছা, তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস।" পার্সিও এডোয়ার্ডের দিকে চাহিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে যত বিশ্বাস করি এদের দুজনকে তত বিশ্বাস করিতে পারি না।"

পার্সি জননীর কথায় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করিল। তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিয়া মিসেস্ হ্যামিল্টন চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা পার্সি, আমার কথায় তোমার মনে এত ব্যথা লাগিবে, আমি ভাবি নাই। পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকেও গভীর বিশ্বাস করিব। কিন্তু তুমি নিজেও অনেক সময় বলিয়াছ, তুমি হারবার্টের ন্যায় শান্ত ও দৃঢ়চিত্ত হইতে পারিলে ভাল হইত।"

নিতান্ত নিরাশ অন্তরে পার্সি বলিল :—"নিশ্চয় মা! আমার অন্তরের সাধ, আমি যদি সকল বিষয়েই হারবার্টের মত হইতে হইতে পারিতাম!"

"বাছা, বয়স হইলে তুমিও শান্ত ও ধীর হইবে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি জান, আমি বিচিত্রতা কত ভালবাসি, আমার ছেলেদের মধ্যেও এই বিচিত্রতা দেখিয়া আমার আনন্দ হয়। বালকোচিত দোষ ত্রুটিশুদ্ধ আমার পার্সি আমার থাকুক, আমার হারবার্ট আমার থাকুক, আমার পার্সিকে হারবার্ট করিতে চাই না। তুমি দুঃখ করিও না বাবা, আমি তামাসা করিতে গিয়া তোমার মনে ব্যথা দিলাম।"

পার্সি মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিল। সে যখন উঠিল, জননী দেখিলেন, তাহার চোখে জল। ভিতরে কোন একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সন্তানের সরলতা ও সততা সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা জন্মে নাই।

পর দিন প্রাতঃকালে অন্য দিন অপেক্ষা অগ্রে গাত্রোত্থান করিয়া হারবার্ট দুই দিনের মত পড়া তৈয়ার করিল, তৎপর মাতাকে তাহার জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া অশ্বারোহণে গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল।

অপরাহ্নে অশ্বারোহণে যখন প্রফুল্লমুখে সে বাড়ী আসিল তখন পার্সি ব্যতীত অবশিষ্ট ছেলে মেয়েরা মহা কুতূহলী হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলে একবাক্যে সে কোথায় কি করিতে গিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সেই আনন্দ কোলাহলে পিতা কুতূহলী সন্তানদের এবং জননী হারবার্টের পক্ষ গ্রহণ করিলেন।

এমেলিন বলিয়া উঠিল, "মা ত হারবার্টের পক্ষ লইবেনই। মা যে সবই জানেন, হারবার্ট নিশ্চয়ই পূর্ব্বে তাঁহাকে সব বলিয়াছে।"

হারবার্ট বলিয়া উঠিল, "আমি কখনও মাকে বলি নাই।" মাও বলিলেন, "হারবার্ট আমাকে কিছুই বলে

নাই।" সেই মুহূর্ত্তে উপাসনার ঘণ্টা পড়িল। কৌতূহলী দল হারবার্টের রহস্যের কিছুই জানিতে পারিল না। শুধু এই মাত্র জানিল, সাড়ে ছয়টার পর সে কিছুক্ষণ মিসেস গ্রেভিলের বাড়ী ছিল।

সেদিন রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে পার্সি যখন তাহার শয়ন-কক্ষে বিষণ্ণ চিত্তে বসিয়া ভাবিতেছিল, তখন হারবার্ট ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎদিক হইতে তাহাকে স্পর্শ করিল। পার্সি মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হারবার্ট। হারবার্ট দুঃখপূর্ণ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "দাদা তুমি আমার সম্বন্ধে এত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছ কেন? আমার কোন কথা জানিতে কি তোমার একবারেই ইচ্ছা হয় না? আমার আজকার কাজ সম্বন্ধে তুমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি অকপটে তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতাম। তুমি ত আমার সম্বন্ধে এত উদাসীন আর কখনও হও নাই, তোমার এই উদাসীনতা আমার ভাল লাগিতেছে না।"

"প্রিয় হারবার্ট, গত তিন মাস আমি তোমার সঙ্গে মন খুলিয়া কথা বলিতেছি না, আমি কি করিয়া তোমার মনের কথা জানিতে চাহিব? তোমার অভিযানের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য অন্যদের মত আমিও উৎসুক হইয়াছিলাম, তবে তুমি যে কোনরূপ পরোপকারের জন্য গিয়াছিলে, তাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মনোভাব গোপন রাখিয়া আমি তোমার গোপন রহস্য জানিবার দাবী করিব কিরূপে?"

"তবে আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন কথা গোপন রাখিয়া কাজ নাই দাদা! কয়েক দিন যাবৎ আমি দেখিতেছি, তুমি যেন কি মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছ।"

তার পর দুই ভাইয়ে পরস্পরের নিকট পরস্পরের গোপনীয় কথা খুলিয়া বলিল। হারবার্ট অন্যান্য সময়ের ন্যায় আজ পার্সিকে সান্ত্বনা দিয়া বেশ প্রফুল্ল করিতে পারিল না। ব্যঙ্গ কবিতাটাই যত অনিষ্টের মূল। ঋণ গোপনের কথা প্রকাশ্য ভাবে পিতার নিকট স্বীকার করিয়া তাঁহার ক্ষমালাভ করা সম্ভব, কিন্তু ব্যঙ্গ কবিতার অপরাধ হইতে মুক্তির উপায় তাহারা খুজিয়া পাইল না। পার্সি যে তাহার রচয়িতা একথা প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও তাহা পিতামাতার নিকট গোপন করিবার কথা কাহারও মনে মুহূর্ত্তের জন্যও জাগিল না।

তারপর তাহার নিকট ঋণমুক্তির জন্য ধার চাহে নাই বলিয়া হারবার্ট পার্সিকে অনুযোগ করিল। পার্সি বলিল, "আমার অপব্যয়ের অপরাধের জন্য তোমাকে তোমার পবিত্র আমোদ ও আনন্দটুকু হইতে বঞ্চিত করিব! না না, বার্টি, আমাদ্বারা তাহা হইবে না। আমার অপরাধের ফল আমি ৫০ বার ভোগ করিতে রাজি আছি, কিন্তু ঐটুকু আমাদ্বারা হইবে না। আহা, আমার সাধ হয়, আমি যদি আবার আগের মত শিশু হইতাম! আর আমার শোবার সময় মা আসিয়া পূর্ব্বের মত আমাকে দেখিয়া যাইতেন! তখন দিবসের অনুষ্ঠিত যত অপরাধের কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলা কত সহজ ছিল! এখন যাও বার্টি, শোও গিয়া, রাত্রি অনেক হইয়াছে, তোমার অসুখ করিবে।

ভুতের ঘটকালী।

(১)

রমানাথ বাবু একটু উঁচু গলায় কড়া আওয়াজে বলিলেন, "সতীশ, তুমি আর আমাদের বাড়ী এসো না, বলে দিচ্ছি।"

সতীশ এই অপ্রত্যাশিত রূঢ় সম্ভাষণে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে?"

"আমা-দের বাড়ী আ-র তু-মি এস না, বুঝলে?"

সতীশ অবাক হইয়া রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাপারখানা সে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না।

রমানাথ ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ করে, চেয়ে রইলে যে? আমি ত না বুঝবার মত কিছু বলিনি। আমা-র বা-ড়ী এ-স না—ব্যস।"

"আজ্ঞে আমার অপরাধটা শুনতে পাইনে?"

"শুনতে পাবে না কেন? শোন—কারুর অজ্ঞাতে তার মেয়ের মন ভুলিয়ে নিজের প্রতি অনুরক্ত করাটা

ভদ্রতার পরিচয় নয়। আর অভদ্র লোকের প্রবেশ আমার বাড়ীতে নিষেধ। বুঝলে?"

"আজ্ঞে নলিনীকে আমি বিয়ে করব বলেই"—

"আ-হা, তুমি ত বিয়ে করবে, কিন্তু আমি যে তার বাপ—আমি তোমার মত একজন গরীবের সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়ে দেবো কি-না সে খবরটা নিয়েছিলে কি? আমার মেয়ের বিয়ে দেবো একটা গরীবের সঙ্গে! ভাল তোমার আক্কেল! এখন শুন্‌লে ত যা শোনবার—এখন এস।"

"একবার—"

"না না, একবার আধবার ওসব কিছু হবে টবে না। ওসব sentimental rubbish আমার কাছে নয়। নিজের ঘরে গিয়ে যত পার অভিনয় কর। এখন যাও, মেলা বকিও না।"

"আচ্ছা তবে একটা কথা বলুন। আমি যদি বড়লোক হ'তে পারি, তা হ'লে—"

"হাঁ হাঁ, তাতে আমার কিছু আপত্তি নেই। আগে তুমি বড়লোকই হও—একটা আলাদিনের প্রদীপ ট্রদীপের জোগাড় কর—তার পর সে হবে অখন।

কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত না তুমি আমার কন্যার যোগ্য হও ততদিন পর্য্যন্ত তুমি তাকে চিঠিও লিখ্‌বে না। প্রতিজ্ঞা কর।"—

সতীশ দুঃখে লজ্জায় অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া রমানাথের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

জগতের আলো তাহার চক্ষে নিভিয়া গেছে—বিশ্বছন্দ বেসুর বাজিয়াছে—সে চক্ষে আঁধার দেখিতেছিল, কানের মধ্যে শত ঝিল্লি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে অতি ধীরে পথ চলিতেছিল—কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানিতেছিল না। এমন করিয়া তাড়াইয়া দিল!! ছি! ধিক জীবনে! এত অপমানের কারণ কি—না, আমি দরিদ্র। যেমন করিয়া পারি অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে। ধনবান হইয়া আমার নলিনীকে আমি সেই অর্থপিশাচের কাছ থেকে কাড়িয়া লইব তবে আমি মানুষ। এ অপমানের ঐ প্রতিশোধ! হা ভগবান!

নলিনীও কি আমাকে ত্যাগ করিল? এ কি সম্ভব? কত দিন যে সে আমার কাছে তাহার অন্তর উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছে, সেখানে ত শুধু প্রেম, শুধু বিশ্বাস, নিষ্ঠা। সে আমার! সে আমার! নলিনী আমার!

নিজের দুঃখদীর্ণ হৃদয়টাকে কোনও রকমে সান্ত্বনা দিবার জন্য সতীশ উত্তেজিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, "সে আমার। নলিনী আমার!"

কিছুক্ষণ পরেই তাহার অন্তর প্রণয়মত্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে সকল গ্লানি বিস্মৃত হইয়া নলিনীর প্রণয়স্মৃতির মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

(২)

"নলিদি, জ্যাঠা মহাশয়ের যখন সতীশ বাবুকে অপছন্দ তখন তুই ভাই তার জন্যে এমন করে শরীর ঢালছিস্ কেন?"

"কমল, মন ত শাসনের বশ নয়। আমি কি করব, আমি পারছি নে।"

"তবে কি তুই জ্যেঠা মহাশয়ের অবাধ্য হবি?"

"খানিকটা হব না, খানিকটা হব। আমি তাঁর মেয়ে—বাহ্যিক নিষেধ সব মেনে চলব; কিন্তু অন্তরটা আমার—সেখানে ত তাঁর শাসন চলবে না।"

"তবে কি তুই ছায়ার জন্যে জীবনপাত করবি?"

"কমল, তুই বলিস্ কি? যাকে ভালবাস্‌তে শিখে অবধি ভালবাস্‌ছি, যে আমার জন্যে লাঞ্ছিত হ'য়ে গেল কমল, সে কি ছায়া? সে যদি ছায়া, তবে সত্যি কি কমল?"

"আচ্ছা, সতীশ বাবু ত গিয়ে অবধি কোন খবরও দিলেন না!"

"বাবা চিঠি লিখ্‌তেও বারণ করে দিয়েছেন।"

এমন সময় নলিনীর ছোট ভাই সন্তোষ হাসিতে হাসিতে লাফাইয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিতে আরম্ভ করিল, "বড়দি, বড়দি, শুনেছ, সতীশ বাবু বিলেত যাচ্ছে।"

নলিনী অবাক হইয়া প্রশ্নব্যাকুল দৃষ্টিতে সন্তোষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমল বলিল, "তোকে কে বল্লে?"

"কে বলবে আবার—সতীশ বাবু বল্লে। আমরা ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলুম। দেখলুম বাগানের

এক কোণে ঝোপের আড়ালে সতীশ বাবু একলাটি চুপটি করে বসে রয়েছে। আমি ছুটে গেলুম। তখন সতীশ বাবু আমায় বল্লে। সতীশ বাবু জাহাজের খালাসি হ'য়ে যাচ্ছে—সে বেশ মজা, ষ্টিমারের ভাড়া দিতে হবে না। সতীশ বাবু আমায় বল্লে—বড়দিকে বল্‌তে। বুঝ্‌লে বড়দি। বড়দি, বাবা কোথায়? বাবাকে বলে আসি।"

সন্তোষ ছুটিয়া বাবার সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

নলিনী কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে নিজের ব্রেসলেট খুলিয়া ফেলিতে লাগিল।

কমল বলিল, "ওকি নলিদি, ওসব খুলছিস কেন?"

নলিনী সজল চোখে কমলের দিকে চাহিয়া বলিল, "কমল, তিনি খালাসি হয়ে কোন অজানা দেশে অর্থের সন্ধানে যাচ্ছেন,—শুধু এই পোড়াকপালির জন্য; আর আমি এই সব অনাবশ্যক ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্‌ব!"

"জ্যাঠামশায় দেখিলে কি বল্‌বেন?"

"যা খুসি বল্‌বেন, আমি তাঁর অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকব সেই আমার মৃত্যুর অধিক। তার বেশী অপমান সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

"নলিদি, সতীশ বাবু যদি বড় লোক না হ'তে পারেন। তা হলে কি হবে ভাই! তা হলে ত জ্যাঠামশায় তোর অন্য জায়গায় বিয়ে দেবেন।"

"তার আগে মর্‌ব। মরা ত আমার হাতে।"

কমল সভয়ে নলিনীর হাত চাপিয়া বলিল, "না ভাই, তুই অমন কথা মুখে আনিস্ নি—আমার বড় ভয় করে।"

(৩)

অনেক কাল সতীশের আর কোন খবরই পাওয়া যায় নাই। নলিনী বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোথায়ই বা সে সন্ধান করিবে, কেই বা তাহাকে সন্ধান দিবে? তবু সে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া আছে।

বছর আড়াই পরে একদিন সকল খবরের কাগজে একটি ছোট প্যারাগ্রাফ পড়িয়া নলিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। সতীশচন্দ্র মজুমদার নামক একটি যুবক, হাইড্রোসিয়েনিক এসিড পান করিয়া ইডেন গার্ডেনের এক নিভৃত কোণে আত্মহত্যা করিয়াছে।

এই কি সতীশের বিলাতযাত্রা? নলিনী এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। ঘন ঘন তাহার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

সেই দিনই বৈকাল বেলা একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে নলিনীকে বলিল, "আমার স্বামী সতীশ বাবুর বন্ধু। সতীশ বাবু আপনাকে একটা ঘড়ী উপহার দিয়েছেন। আমার স্বামীর কাছে আছে। আপনি একজন লোক পাঠিয়ে সেটা আনিয়ে নেবেন। আর যদি আপনি বলেন, আমরা পাঠিয়ে দিতেও পারি।"

নলিনী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সতীশের উপহার! মৃত্যুকালেও তিনি আমাকে ভুলেন নাই! তাঁহার স্মৃতিটুকু আমার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আমি চিরজীবন তাহা রক্ষা করিব। কখনও তাঁহার প্রেমের অমর্য্যাদা করিব না—কখনও না, কখনও না।

নলিনী অপরিচিতাকে মিনতি করিয়া বলিল, "আপনাকে আমি বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আপনি দয়া করে যদি ঘড়িটি নিয়ে আসেন ত আমার বড় উপকার হয়। বাবা টের পেলে আন্‌তে দেবেন না। কাল দুপুর বেলা—যখন বাবা বাড়ীতে থাকবেন না, তখন যদি নিয়ে আসেন।" নলিনী কাঁদিয়া ফেলিল। কমলও চোখ মুছিতে লাগিল।

অশ্রু-আকুল মিনতিতে বাধ্য হইয়া অপরিচিতা ঘড়ীর দৌত্য স্বীকার করিয়া গেল।

(৪)

সতীশের উপহার সুন্দর একটি মার্ব্বেল পাথরের ক্লক ঘড়ী। বেশী বড় নয়। টেবিলের উপর বসান যায়।

নলিনী ঘড়ীটিকে হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত প্রণয় দিয়া বরণ করিয়া লইল। আপনার শয়নকক্ষে শয্যার শিয়রে একটি ছোট টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। সে নিজহাতে নিত্য তাহার ধূলা ঝাড়ে, ফুল দিয়া সাজায়। ঘড়ীটি যে সতীশের শেষ উপহার!

নলিনী অবসর পাইলেই ঘড়ীটির কাছে গিয়া বসে। ঘড়ীর টিক টিক শব্দ, টুং টাং বাজনা যেন কোন পরলোক হইতে সতীশের হৃৎস্পন্দন বহন করিয়া আনিয়া নলিনীকে

শুনাইতেছে। রাত্রি হইলেই নলিনী আপনার ঘরে খিল দিয়া বসে—আর অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া ঘড়ীটি দেখে। বাড়ী নিশুতি—নলিনী ঘড়ীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল যেন সতীশ তাহাকে ডাকিয়া জাগাইতেছে—

"শুন নলিনী খোল গো আঁখি
এখনো ঘুম ভাঙিল না কি ?"

নলিনী মনে করিল স্বপ্ন। কিন্তু না, স্বপ্ন ত নয়। স্পষ্ট সতীশেরই কণ্ঠ। সতীশ বলিতেছে—

"তুমি আমারি যে তুমি আমারি
মম বিজন-জীবন-বিহারী ?"

সে স্বরে কি প্রাণভরা প্রেম প্রতি শব্দের ভিতর দিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। কি করুণ মিনতি ভরে সতীশ বলিতেছে—

"ভালো বেসে সখি, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো—তোমার
মনের মন্দিরে !
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো—তোমার
চরণ-মঞ্জীরে !"

কি প্রণয়-ব্যাকুল করুণ প্রার্থনা ! সতীশ মরণের পারে গিয়াও নলিনীকে ভুলিতে পারে নাই। তাহার অতৃপ্ত প্রণয়ের আকুল ক্রন্দন আজও নলিনীকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া উঠিতেছে। নলিনী ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল—ঘড়ীর ডালাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার উপর সতীশের আবছায়া মুখ ;—সেই ছায়ার মুখে তেমনি স্নিগ্ধ হাসি মাখানো, প্রণয়বিভোর চোখ দুটি তেমনি প্রশান্ত ; ছায়ার ভিতর হইতেও যেন প্রগাঢ় প্রণয় ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া নলিনীর মন আনন্দে বিস্ময় ভরে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তার পর নিত্য রাত্রে নলিনী এইরূপ বাণী শুনিতে লাগিল। ভয়ও করে—কিন্তু না শুনিয়াও থাকা যায় না। নেশার মত নলিনীকে পাইয়া বসিল। ঘড়ীতে যেমন বারটা বাজে অমনি মিনিট দশেক সতীশের ছায়া করুণ কণ্ঠে প্রণয় নিবেদন করিয়া বিদায় লয়।

ক্রমে ক্রমে নলিনীর মন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে সদাই অন্যমনস্ক থাকে। থাকে থাকে চমকিয়া উঠে। তাহার দৃষ্টি উদাস। মুখ মলিন।

কমল দেখিয়া দেখিয়া এক দিন বলিল, "নলিদি, তোর হয়েছে কি কি ? দিন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিস্। এমন করে' শরীর আর ক'দিন বইবে।"

"বইবে ঢের দিন। আমার আর কোনও দুঃখ নেই, তিনি আমাকে এখনও তেমনি ভালবাসেন।"

কমল হাসিয়া বলিল, "তুই আবার থিয়জফিষ্ট হলি কবে থেকে যে পরলোকের তত্ত্ব জান্‌ছিস্ ?"

"হাসি নয় কমল। সত্যি সত্যি। তিনি নিজ মুখে রোজ আমায় বলে যান।"

কমল নয়নদ্বয় যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওমা বলিস্ কি দিদি !

নলিনী বলিল, সত্যি কমল। তিনি রোজ আমার সঙ্গে কথা বলেন।"

ভয়ে কমলের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। বুক দুর্‌দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুখ শুকাইয়া গেল।

নলিনী বলিল, "ভয় কি কমল ! সে কণ্ঠস্বর তেমনি মিঠে, তেমনি আবেগভরা, তেমনি প্রণয়পূত।

প্রথম প্রথম আমার ভয় করিত। কিন্তু এখন আর একটুও ভয় করে না। বরং তাঁর কথা না শুনে এখন থাক্‌তে পারি নে। মনে হয় আর একটু যদি থাকেন। একবার যদি ভাল করে' বেশীক্ষণের জন্যে দেখা দেন !"

কমল অতিমাত্র ভীত হইয়া বলিল, "তবে কি অল্প করে' অল্পক্ষণের জন্যে দেখা দেন নাকি ?"

হঁ্যা কমল, আবছায়া শুধু সেই হাসিভরা মুখখানি দেখ্‌তে পাই।"

"দেখ্ নলিদি, তুই রাত্রিতে আর একলা থাকিস্‌নে। তুই আমার ঘরে শুস।"

সে রাত্রে কমল জোর করিয়া নলিনীকে নিজের ঘরে শোয়াইল। প্রতীক্ষায় জাগরণে নলিনীর রজনী প্রভাত হইল, কিন্তু সে রাত্রে আর সতীশের প্রণয়বচন সে শুনিতে পাইল না।

কমল বলিল, "কৈ নলিদি, সতীশ বাবু ত কৈ কথা বললেন না। তুই নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিস।"

"না কমল। তিনি হয় ত তোর সামনে লজ্জায় আসতে পারেন নি। আমি আর তোর কাছে শোব না।"

নলিনী পুনরায় নিজের ঘরে শয়ন করিতে লাগিল এবং প্রতি রাত্রে তেমনি করিয়া ঘড়ীর গায়ে সতীশের মুখ ফুটিয়া উঠে এবং কোথা হইতে তাহার কণ্ঠে প্রণয়-শ্লোক ধ্বনিত হয়। নলিনী ভাবিল, "তিনি শুধু আমার এই ঘরটিতেই আসেন। এই ঘর আমার পরম তীর্থ।"

কমল যখন শুনিল যে সতীশের অশরীরী বাণী আবার শোনা যাইতেছে তখন এক দিন সে রমানাথ বাবুকে বলিল, "দেখ জ্যেঠামশায় নলিদি রোজ রোজ সতীশ বাবুর ভূতের সঙ্গে কথা বলে।"

রমানাথ বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভূতের সঙ্গে কথা বলে কিরে? নলির সঙ্গে তুইও পাগল হলি না কি?"

"পাগলামি নয় জ্যেঠামশায়। নলিদি রোজ রোজ ভূতের কথা শোনে।"

রমানাথ হাসিয়া বলিলেন, "ওসব হিষ্টিরিয়ার খেয়াল।"

"খেয়াল নয় জ্যেঠামশায়। সত্যি সত্যি জেগে জেগেই শোনে।"

রমানাথ বলিলেন, "তোদের এত করে লেখাপড়া শেখালাম তবু তোরা ভূতের ভয় করিস। আজকাল থিয়জফিষ্ট ছাড়া অমন বোকা কেউ আছে তা ত জানতাম না।"

কমল একটু অপ্রস্তত হইয়া বলিল, "আমি ঠিক বিশ্বাস করিনে, কিন্তু নলিদি যেরকম করে' বলে—"

"ও! নলি বলে! তুই শুনিস নি ত? নলির কথায় তুই অমনি বিশ্বাস করলি। দেখছিস্ ত তার মনের অবস্থা! নলিকে তুই একলা শুতো দিস্‌নে। তোর কাছে শোয়াস্।"

"এক দিন শুইয়েছিলাম। কিন্তু নলিদি শুইতে রাজি নয়। সতীশ বাবুর ভূত লোকের সামনে আসে না। সেদিন রাত্রে আসে নি।"

"ওঃ হোঃ! লাজুক ভূত বটে! দেখ্‌লি কমলি, ওসব নলির মস্তিষ্কের আর স্নায়ুর দুর্ব্বলতা। আমি ডাক্তার মল্লিককে কল্ দেবো এখন। তুই কিন্তু রাত্রে নলির কাছে শুবি—বুঝ্‌লি।"

কমল স্বীকৃত হইয়া গেল। ডাক্তার মল্লিক আসিয়া nervin tonic ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। নলিনী কিন্তু কিছুতেই নিজের ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র শুইতে রাজি হইল না। অগত্যা কমলই নলিনীর ঘরে গিয়া শুইল, নলিনী অনেক আপত্তি করিল; অনুনয় বিনয় মিনতি ক্রন্দন তর্জ্জন আস্ফালন সব নিস্ফল হইল, কমল কিছুতেই ঘর ছাড়িয়া নড়িল না।

এইরূপ লড়ালড়ি করিতে করিতে রাত হইয়া গেছে। নলিনী ক্ষুণ্ণ মনে চুপ করিয়া পড়িয়া আছে, কমলের অল্প তন্দ্রা আসিয়াছে। এমন সময় বারটা বাজিল। আর অমনি সতীশের কণ্ঠ বলিয়া উঠিল—

"শুন নলিনী খোল গো আঁখি।" সে স্বর কমলের কানে গেল। কমল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া যাহা দেখিল ও শুনিল তাহাতেই তাহার চক্ষু স্থির। সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

নলিনী বলিল, "শুনলি কমল? এখন বিশ্বাস হয়?"

"বিশ্বাসের চোটে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে নলিদি! তুই ঐ ভুতুড়ে ঘড়ীটা ঘর থেকে বিদেয় করে দে। ঐটে এসে অবধি এই বিপদ আরম্ভ হয়েছে।"

"তা কি পারি কমলি, ওযে আমারই প্রভুর দান!"

সকাল হইতেই কমল মুখখানি ভয়ানক পাংশুল ও লম্বা করিয়া রমানাথকে বলিল, "জ্যেঠামশায়, নলিদির কথা সব সত্যি। আমি কাল রাত্রে নলিদির ঘরে শুয়েছিলাম। ঠিক যেই বারটা বাজল আর অমনি সতীশ বাবুর ছায়ামূর্ত্তি কথা কইতে লাগিল—এ আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"

রমানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হিষ্টিরিয়া এমনি সংক্রামক যে দুর্ব্বল স্নায়ুর লোক সহজেই আক্রান্ত হয়। তোকেও দেখছি রোগে ধরল!" কমল একটু অভিমানমিশ্র বিরক্তির স্বরে বলিল, বিশ্বাস হয় না। তুমি নিজে একদিন শুয়ে দেখনা ব্যাপারখানা কেমন।"

রমানাথ বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে। আজই আমি নলির ঘরে শোবো। কিন্তু তুই নলিকে একথা বলিসনে।"

খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে রমানাথ নলিনীর ঘরে গিয়াই দরজায় খিল দিলেন। নলিনী কত কাকুতি মিনতি করিল, কাঁদিল তবু দরজা খুলিল না।

কিন্তু সকালে রমানাথ যখন নলিনীর ঘর হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহার মুখের ভাব পরম উপভোগ্য দেখিবার মতো, লজ্জা বিস্ময় ভয় সন্দেহ সেখানে নিজের নিজের ছাপ রাখিয়া গেছে। কমল জিজ্ঞাসা করিল "জেঠামশায় কেমন? ঠিক ভূত কি না?"

রমানাথ বলিল, "আরে রাম রাম! বড় বেয়াড়া বেহায়া, ভূত! মেয়ের প্রণয়সম্ভাষণ গুলো অক্লেশে কিনা বাপের কানে গুঞ্জন করে' গেল! আরে ছ্যা ছ্যা! আমি যত বলি ও সতীশ আমি আমি—আমি নলিনী নই, নলিনীর বাবা রমানাথ? কে শোনে সে কথা! সটান সব বেফাঁশ কথা আমার কানে বলে গেল। আরে ছ্যাঃ?"

ভূতের আর কোনই কিনারা হইল না। রমানাথের প্রতিবেশী মহেশ্বর বাবু থিয়জফিষ্ট, তিনি শুনিয়া বলিলেন, "ও সব astral body, fifth plane এ বিচরণ করে। মর্ত্ত্যের কেউ খুব আবেগভরে তাদের চিন্তা কর্‌লে তারা মর্ত্ত্যের লোককে clairvoyance দান করে, তাতে করে অশরীরী ছায়া দেখা যায়, কথাও শোনা আশ্চর্য্য নয়। এর তত্ত্ব মহাত্মারা সব জানেন। তবে দুঃখের বিষয় তাঁরা সব তিব্বতের দুর্গম গিরিগুহায় বাস করেন।"

(৫)

ভূতের উপদ্রব অপেক্ষা লোকের উপদ্রব রমানাথের অসহ্য হইয়া উঠিল। থিয়জফিষ্ট, রোজা, গুণী, খবরের কাগজের রিপোর্টার, কৌতুকদর্শী প্রভৃতির দিবারাত্র আনাগোনায় বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কেহ বলে গয়ায় পিণ্ড দেও, কেহ বলে সিন্নি মানো, কেহ বলে তিব্বতে মহাত্মার শরণাপন্ন হও গিয়া; কেহ বলে বাড়ীটা বেচিয়া ফেল, কেহ বলে শীঘ্র নলিনীর বিবাহ দিয়া দেও, কেহ বলে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যাও। হিতৈষীদের বিবিধ উপদেশের তাড়নায় রমানাথ ক্ষেপিয়া উঠিবার উপক্রম। নলিনী দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। বিবাহের কথা বলিলে সে কাঁদে। আর ব্যাপার শুনিয়া ভূতের ভয়ে কোন লোকই তাহাকে বিবাহ করিতেও রাজি হয় না।

রমানাথ বিরক্ত হইয়া একদিন বলিয়া উঠিল "আঃ কি কুকর্ম্মই করেছিলাম সতীশকে তাড়িয়ে। তাড়ালাম তাড়ালাম, হতভাগাটা কিনা বিষ খেয়ে অপঘাতে মরে শেষে ভূত হল। এসব উৎপাতের চেয়ে সতীশ জামাই হওয়া যে ঢের ভালো ছিল। এখন নলিনী যাকে বিয়ে কর্‌তে চাইবে তার সঙ্গেই বিয়ে দেবো—আর না বলছিনে। দেখ্‌ কমল, তোর কাকে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে হয় বলে ফেল—"

কমল লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল। দেখিল সিঁড়িতে উঠিতেছে সতীশ।

কমল থতমত খাইয়া নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। একি! দিনের বেলা ভূতের আবির্ভাব!

সতীশ হাসিয়া বলিল, "কি কমল! এতকাল পরে দেখা হল, হাসিমুখে অভ্যর্থনা না করে অমন করে' চেয়ে রইলে যে?"

কমল সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "সতীশ বাবু!"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "কেন কমল, এতে কোন সন্দেহ হচ্ছে নাকি?"

কমল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তা হ'লে বেঁচে আছেন?"

সতীশ হাসিমুখে উত্তর করিল, "সেই-রকমই ত মনে হচ্ছে। তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে নাকি?"

"তা'হলে আপনি মরেন নি!"

বেঁচে যখন আছি, তখন আর মরা হয়ে উঠে নি।"

"আপনি ভূত নন!"

আপাততঃ বর্ত্তমান!"

"যাক তা হলে বাঁচা গেল। আপনি তা হলে যমের বাড়ীর ভূত নন।"

"না, আপাতত বিলেত ফেরত সিভিলিয়ান। কিন্তু হঠাৎ যমের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সম্ভাবনাটা মনে উদয় হল কেন?"

"অনেক দিন আপনার খবর পাওয়া যায় নি। হঠাৎ

একদিন খবরের কাগজে দেখা গেল, একজন কে সতীশ মজুমদার বিষ খেয়ে ইডেন গার্ডেনে মরেছে। তেমন মরণ আপনার মতো কবি ব্যর্থপ্রণয়ীরই উপযুক্ত মনে ক'রে আমরা ঠিক করলাম সে ব্যক্তি আপনি। তারপর সেই দিনই আপনার উপহার এক ভূতুড়ে ঘড়ী এসে হাজির। সেটার ভিতর আপনার চেহারা আর স্বর—সে এক বিষম ভুতুড়ে কাণ্ড। মণিলাল বাবুও এমন ভুতুড়ে কাণ্ড দেখেন নি।"

সতীশ ওহো করিয়া খুব হাসিতে লাগিল। খানিক হাসিয়া বলিল, "তোমার জ্যাঠামশায় আমাকে চিঠি লিখতে পর্য্যন্ত বারণ করেছিলেন। তাই বিলেতে গিয়ে অনেক খরচ করে ঐ ঘড়ীটি তৈরি করাই। ঠিক বারোটা রাত্রে ঘড়ীর ডালার পেছনে একটা বিদ্যুতের আলো জ্বলে ওঠে আর ওর সঙ্গে ফনোগ্রাফ বেজে ওঠে। ঘড়ীর ডালার হাল্কা রঙ্গে আমার মুখ আঁকা আর ফনোগ্রাফে আমার কণ্ঠ ধরা। নলিনীকে সান্ত্বনা দেবার এই একটা ফন্দি অনেক ভেবে বের করেছিলুম। এ দেখছি হিত করতে বিপরীত হয়ে গেছে, আমি মরে গেছি মনে করে নলিনী বিয়ে করেনি ত?"

"বিয়ে? সহমরণে যেতে বসেছে। ঐ নলিনী আসছে। সতীশ বাবু, আপনি একটু আড়ালে যান, হঠাৎ আপনাকে দেখলে মুস্কিল হবে।"

পাশের ঘর হইতে নলিনী বাহিরে আসিয়া সতীশের হাত ধরিল। অশ্রুপরিম্লান চোখদুটি সতীশের মুখের উপর সতৃষ্ণভাবে রাখিয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "চল বাবাকে প্রণাম করে আসি।"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাণ-পুষ্প।

আমার পরাণ যেন হাসে,
ফুলেরি মতন অনায়াসে;
চাঁদের কিরণ তলে,
বরষার ধারা জলে,
শিশিরে কিবা সে মধুমাসে;—
ফুলের মতন অনায়াসে।
সব সঙ্কোচ শোক
কুণ্ঠা শিথিল হোক্,
আপনারে মেলিয়া বাতাসে;
নবনীত-নিরমল
খুলিয়া সকল দল
সার্থক হোক্ মধু-বাসে;—
ফুলেরি মতন অনায়াসে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নারী-কীর্ত্তি।

সংবাদপত্র পাঠে, শিক্ষিত পাঠকপাঠিকাগণ শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেবী ও শ্রীমতী চপলাসুন্দরী দেবীর নরহত্যা-মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত আছেন।

এই তেজস্বিনী বালিকাদ্বয়, স্বীয় সতী-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে প্রকার অদ্ভুত সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমগ্র নারীজাতিরই গৌরবের বিষয়।

জগতের যাবতীয় সভ্যসমাজেই স্ত্রীজাতির সতীত্ব একটি অমূল্যরত্ন; হিন্দুললনাগণের পক্ষে সতীত্বই স্ত্রীজাতির একমাত্র সারধর্ম্ম। সেই অমূল্যরত্ন, সেই সারধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুললনাগণ যুগযুগান্তর ধরিয়া অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যে যুগে এই ভারতবর্ষ সভ্যতার আদর্শে সমগ্র জগতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল, সরলা চপলা সেই যুগের বালিকা নহেন; যে যুগে এই ভারতবর্ষে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া সতীবৃন্দ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন উঁহারা সেই যুগের সতী নহেন; যে যুগে জগদ্বিখ্যাত বীরাগ্রগণ্য রাজপুতকুলসম্ভূতা সতী-ললনাগণ, সতীধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই যুগের ললনাও নহেন; কিংবা বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের—সুশিক্ষিতা, স্বাধীনপ্রাণা, স্বাবলম্বনপ্রয়াসিনী সিমন্তিনীও নহেন; এমন কি তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের স্কুলকলেজে পড়া, সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলাসমাজের বালিকাও নহেন

শ্রীমতী চপলাসুন্দরী দেবী ও শ্রীমতী সরলাচন্দ্রা দেবী।

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

পক্ষান্তরে তাঁহারা পল্লিনিবাসী নিতান্ত নিরীহ ও দুর্ব্বল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ক্ষীণাঙ্গিনী কন্যা, অসূর্য্যম্পশ্যা বঙ্গকুলবধূ, এবং আজন্ম পল্লীসমাজের ভীরুস্বভাবা অশিক্ষিতা রমণীগণের সংসর্গে, হিন্দু অন্তঃপুরের অলঙ্ঘনীয় অবরোধ প্রাচীরের এক কোণে, অবগুণ্ঠিত মস্তকে অবস্থান করিয়াও সতী-তেজের যে জ্বলন্ত আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আমরা নিম্নে এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ভট্টাচার্য্য সহোদর দুই ভাই। কুঞ্জমোহনের পত্নীর নাম সরলা ও প্যারীমোহনের পত্নীর নাম চপলা। সরলার বয়স ১৯ বৎসর ও চপলার বয়স ১৮ বৎসর।

কুঞ্জমোহন ও প্যারীমোহনের জ্ঞাতি ভাই শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য অবস্থাপন্ন লোক, নিঃসন্তান; কাজেই একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বিনোদবিহারী। বিনোদের বয়স ২০ বৎসর। লেখাপড়া ভাল শিখে নাই বরং স্বভাব দোষে মদের মহেশ্বর ও গাঁজার গঙ্গাধর হইয়া সাধারণ পোষ্যপুত্রদলের সর্ব্ববিধ গুণে গুণধর হইয়াছিলেন। শুনা যায় সেই গ্রামে বিনোদের ন্যায় আরও কয়েকটি গুণধর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহারা সকলে জুটিয়া একটি গুণ্ডার দল গঠন করিয়াছিলেন। আরও শুনা যাইতেছে যে বিগত দুই তিন বৎসর যাবৎ এই গুণ্ডাদলের জ্বালায়, সেই গ্রামের অনেক গৃহস্থেরই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ঐ দলের কয়েকটি গুণধর সরলা ও চপলার পেছনে লাগিয়া, তাঁহাদের সতীত্ব হরণ করিবার অভিপ্রায়ে, নানা প্রকার প্রীতি প্রলোভন ও উৎপাত উৎপীড়ন করিয়া আসিতেছিল। সরলা চপলা উহাদের উৎপাত সহ করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের নিজ নিজ স্বামীকে, স্বীয় আত্মীয় স্বজনকে ও অবশেষে বিনোদের পিতামাতাকে পর্য্যন্ত ঐ সকল কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কাহারও দ্বারা কোন প্রতিকার হয় নাই। বিগত ১৩১৬ সনের ১১ই চৈত্র শুক্রবার রাত্রিতে সরলার স্বামী ঢাকা যাওয়ায় সরলা ও চপলা এক ঘরে শয়ন করেন। রাত্রি অনুমান ১২টার সময় উভয়ে একবার বাহিরে যান এবং ফিরিয়া আসিবার সময়, তাঁহাদের অনতিদূরে ঐ দলের দুইটি গুণ্ডাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া কবাট বন্ধ করেন। কিন্তু বিছানার নিকট যাইয়া দেখেন যে বিনোদবিহারী পূর্ব্বেই ঘরে ঢুকিয়া রহিয়াছে। ঘরে বাহিরে সমানে গুণ্ডার আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহারা ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতঃ সরলা বিনোদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া কতকটা আপোষের ভাব দেখাইলেন। বিনোদ তখন সফলকাম মনে করিয়া, একেবারে শয্যায় উঠিয়া, অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া পড়িল ও সরলার হাত ধরিয়া অসদভিপ্রায়ব্যঞ্জক কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সরলাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে চপলা চঞ্চলগতিতে বিনোদের অলক্ষিতে একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরী আনিয়া তড়িৎবেগে বিনোদের গলদেশে সবলে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। বিনোদ তখন সরলার হাত ছাড়িয়া দিয়া, চপলার হস্তস্থিত ছুরী সহ হাত জড়াইয়া ধরিল। এ দিকে সরলা একখানা দা' দিয়া বিনোদকে উপর্য্যুপরি—আঘাত করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেবের জবানবন্দীতে প্রকাশ, চপলার ক্ষীণ হস্তের প্রথম আঘাতই এত গুরুতর হইয়াছিল যে, সেই এক আঘাতেই তৎক্ষণাৎ বিনোদের পঞ্চত্ব পাইবার কথা; সুতরাং বিনোদ আর বেশী সময় ধরিয়া থাকিতে পারিল না—অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। চপলা তখন সেই ভীষণ ছুরীর দ্বিতীয় আঘাতে বিনোদের অনিবার্য্য পাপতৃষ্ণার চিরনিবৃত্তি করিয়া দিলেন।

অতীব দুঃখের বিষয় যে হতভাগা বিনোদ তাহার চৌদ্দ পোনর বৎসর বয়স্কা পরমাসুন্দরী বালিকা পত্নীকে বিধবা করিয়া গিয়াছে।

অতঃপর সরলা ও চপলা দেখিলেন যে, বাহিরের গুণ্ডাদ্বয় তখনও বাহিরে থাকিয়া দরজায় আঘাত করিতেছে। সুতরাং তাঁহারা, সমস্ত রাত্রি নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে, রক্তাক্ত বসন, শত্রুর শবদেহ নিয়া, ঘরে বসিয়া

রহিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে গ্রামের প্রাজ্ঞ, প্রবীণ ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিলেন। কিছুকাল পর পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট আসিলে তাঁহারা অপরাধ স্বীকার করিয়া জবানবন্দী দিলেন।

যথাসময়ে দারোগা শ্রীযুক্ত নাজিরুদ্দিন আহাম্মদ ঘটনাস্থলে তদন্তে আসিয়া যথাবিধি অনুসন্ধান করতঃ বালিকাদ্বয়ের অমানুষিক কীর্ত্তি ও তাঁহাদের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাদিগকে চালান দিলেন।

মোকদ্দমা মুলতবী থাকা কালে, সম্ভবতঃ কোন বিশেষ কারণে ঢাকার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হঠাৎ একদিন আসামীদিগকে তলব দিয়া উঁহাদের জামিন না-মঞ্জুর করতঃ হাজতের হুকুম প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ সেই দিনই ঢাকায় সদাশয় জজ মিঃ নিউবোল্ড সাহেব জামিন মঞ্জুর করায় বালিকাদ্বয়কে হাজত ভোগ করিতে হয় নাই। অতঃপর নারায়ণগঞ্জের সবডিবিসনেল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সিটন সাহেবের নিকটেই মোকদ্দমার প্রাথমিক প্রমাণ গৃহীত হয় এবং তিনি বালিকাদ্বয়কে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াও দয়াবশে তাঁহাদের জামিন বহাল রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাদীপক্ষ তৎসম্বন্ধে বাধা প্রদান করায় জামিন দেওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত বলিয়া তিনি সে বিষয়ে অস্বীকৃত হন। কিন্তু সেই দিনই ঢাকার পূর্ব্বোক্ত সদাশয় জজ সাহেব জামিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করায় বালিকাদ্বয়কে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

গত ১৯ শে জুন তারিখে দায়রার বিচারের দিন ছিল। শুনানির তারিখে ঢাকার খ্যাতনামা সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন, যে এই মোকদ্দমার আসামীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডযোগ্য কোনই প্রমাণ নাই, একন্য তিনি সদাশয় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মার সাহেবের আদেশানুসারে এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে এবং আসামীদ্বয়কে মুক্তি দিতে প্রার্থনা করেন। জজ সাহেব বাহাদুর শরৎ বাবুর প্রার্থনামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া দিয়া বালিকাদ্বয়কে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করতঃ মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই সদাশয়তাপূর্ণ ব্যবহার ও ন্যায়বিচার দ্বারা ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ সাহেব সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

আবর্ত্তন।

হের ওই শীতাংশুর শুভ্রহাসি-নীচে
ছোট বড় উর্ম্মিমালা বক্ষ স্ফীত করি,
উদ্গারিয়া ফেন মাত্র ক্ষণ দীপ্তি পেয়ে,
কুল্ কুল্ স্বনে শেষে যেতেছে ডুবিয়ে।

সুখ দুঃখ-ক্রীড়নক মানবো তেমনি—
উঠি এ ঘটনাপূর্ণ সময়-সাগরে
দু'দিনের তরে শুধু হেন স্ফীত হয়ে
মিশে যায় পুনরায় অনন্ত সময়ে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

আর্য্য-নারীর পাদুকা ব্যবহার।

১। ভারতের আর্য্য নারীদের মধ্যে পুরাকালে জুতা ব্যবহার যে প্রচলিত ছিল বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে তাহার একটি প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

'সংযুক্ত নিকায়' গ্রন্থে কথিত আছে যে বেরহচ্চানি গোত্রের এক বিদুষী ব্রাহ্মণ রমণীর কাছে এক শিষ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। সেই শিষ্য আয়ুষ্মান্ উদায়ী নামক একজন ভিক্ষুর নিকট ধর্ম্মকথা শুনিয়া মুগ্ধ হয় এবং গুরুর নিকট তাহার প্রশংসা করে। সেই সাধুর নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে রমণীর ইচ্ছা হয়। সাধুকে তিনি নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। পাদুকা পরিধান করিয়া তিনি চৌকিতে উপবেশন করিলেন যে —"হে শ্রমণ, তোমার ধর্ম্ম কি ?" সাধু—উত্তর করিলেন যে "হে ভগ্নী, ধর্ম্মালোচনার উপযুক্ত সময় যখন উপস্থিত হইবে তখন আসিয়া বলিব।"

(সংযুক্ত নিকায় ৩৫ ১৩৩।৮)

এই আখ্যায়িকায় আমরা দেখিতে পাই যে বিদুষী ব্রাহ্মণ-মহিলা পাদুকা পরিধান করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে বসিয়াছেন।

২। তারপর মৃচ্ছকটীক নাটকের ৪র্থ অঙ্কে বসন্তসেনার মাতার বর্ণনা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহাতেও তাহার পাদুকা পরিশোভিত পদযুগলের উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

স্বর্গীয়া সরলা দাস বি, এ।

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

৬ষ্ঠ ভাগ। ভাদ্র, ১৩১৭। ৫ম সংখ্যা।

নিবেদন।

ধন দিয়ে মোরে রাখনি ভুলায়ে,
ধন্য তুমি হে প্রভু,
দিয়েছ দৈন্য, প্রেম-নিধি হ'তে
বঞ্চিত নহি তবু।

যার সহচর বিলাস বাসনা
মোহ সন্দেহ ঈর্ষা ছলনা,
করুণা মমতা যে করে হরণ—
চাহিনা সে ধন কভু।

প্রভু, যাচি করযোড়ে,
কর্ম্মের পথে চলিতে জগতে
শক্তি দেহগো মোরে।

পদমান দিয়ে ঘিরিয়া আমায়
রাখনি রুদ্ধ করে,
উদার বিশ্ব-মানব সমাজ
মুক্ত আমার তরে।

আছে জগতের যত দীনজন
সবাকার সাথে প্রেম-বন্ধন;
খ্যাতিমানহীন এ দীনের ঠাঁই
দিয়েছ সবার ঘরে।

প্রভু যাচি আঁখি জলে
রাখ কৃপা করে লাঞ্ছিত মোরে
তোমার চরণ তলে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

ডরোথি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, কিন্তু কবি-ভগ্নী ডরোথি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের নাম অতি অল্প লোকের নিকটই পরিচিত। আজ আমরা, ভারত-মহিলার পাঠকপাঠিকাগণকে, এই মনস্বিনী রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উপহার দিব। ইনি আপনার কবি-ভ্রাতা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; এবং আজীবন ভ্রাতার সঙ্গী থাকিয়া, তাঁহাকে সকল প্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যসমূহের জন্য, ইংরেজি সাহিত্য এই মনস্বিনী রমণীর নিকট কতদূর ঋণী, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডরোথির জন্ম হয়। নয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। এই সময় হইতে তিনি পেনরিথ (Penrith) সহরে মাতামহীর নিকট বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে হ্যালিফেক্স (Halifax) নামক বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া, ডরোথি নিজেই একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার জীবনের মধ্যে এই সময়টাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ। এই স্থানে তাঁহার প্রতিবাসীগণ, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করিতেন। তিনি ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আমি আমার প্রতিবাসীগণের অন্যায় ব্যবহার কিছুতেই সহ্য কবিতে পারি না, কেবল একমাত্র ভ্রাতৃ-স্নেহই আমাকে শান্তি দিয়া থাকে।" এই পেনরিথে আত্মীয় এবং প্রতিবাসীবর্গের ব্যবহারে সত্য সত্যই তাঁহার জীবন নিতান্ত ভারবহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পিতামহ অতিশয় উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার মাতামহী দুঃখে কষ্টে ডরোথির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন না। ডরোথি অপরিসীম ভ্রাতৃ-স্নেহ-শালিনী রমণী ছিলেন, কেবল একমাত্র ভ্রাতৃ-স্নেহ স্মরণ করিয়াই, তিনি এই সকল দুঃখ কষ্ট অক্লেশে সহ্য করিতেন। তিনি একবার তাঁহার এক বন্ধুকে তাঁহার ভ্রাতার বিষয় লিখিয়াছিলেন ;—"আমি যে পুনঃ পুনঃ তোমাকে তাঁর (ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের) কথা লিখি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবে। যখন আমি তাঁর কথা তোমায় লিখি, তখন তাঁহার অপরিসীম স্নেহ আমাকে আর সব ভুলাইয়া দেয়। তুমি ত তাঁকে জান না! তাঁর মধ্যে এমন একরূপ লাবণ্য ও সরলতা আছে—যাহা দেখিলে তাঁকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না। তুমি নিশ্চয়ই উত্তরে লিখিবে, 'তুমি নিতান্তই অন্ধ।' আমি স্বীকার করি ইহা সত্য, এবং আমি বেশ জানি, আমার ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমি তাঁকে যত সুন্দর দেখি, তিনি তত সুন্দর নহেন। আমি ইহাও বেশ জানি, যে সকল গুণাবলীর দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত মনে করি, তাঁহার অর্দ্ধেকাংশই আমার স্নেহ-সৃজিত। কিন্তু জানিও, আমার স্নেহময় ভ্রাতা আমার সহিত কথা কহিতে যেরূপ সুখানুভব করেন, এরূপ আর কিছুতেই নহে। আমার স্নেহের ভাই যখন আমার সহিত কথা কহেন, তখন তাঁহার বদনমণ্ডলে এরূপ একটী স্বর্গীয় হাসি দেখা দেয়—যাহা আমি যথার্থই খুব ভালবাসি।" তিনি আর এক পত্রে লিখিতেছেন ;—"উলিয়াম আমাকে নিয়মিত পত্র লেখেন, যথার্থই তিনি একজন স্নেহময় ভ্রাতা।" আমরা এই সকল পত্র হইতে, এই দুই ভ্রাতা ভগিনীর ভিতর কিরূপ ভালবাসা ছিল, বেশ জানিতে পারি। ভ্রাতার সৎকার্য্যে ভগিনী উৎসাহ না দিলে এবং ভগিনীর সৎকার্য্যে ভ্রাতা সাহায্য না করিলে, পৃথিবীতে অতি অল্প সৎকার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ডরোথি ও উলিয়ামের জীবনী প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে, আমরা আদর্শ ভ্রাতা ও ভগিনী দেখিতে পাই। এই দুই ভ্রাতা ও ভগিনী বাল্যকালে কিরূপ সুখে কাটাইয়াছিলেন—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের অনেক কবিতা হইতে, আমরা তাহা জানিতে পারি। তাঁহারা সর্ব্বদাই নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদে নিযুক্ত থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই এই কবিভাবাপন্ন ভ্রাতা-ভগিনী উভয়েই প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিলেন। কখন দূর্ব্বাদল শোভিত উপত্যকা-ভূমে আবার কখনও বা উপলখণ্ড মণ্ডিত অধিত্যকাতে এই ভ্রাতা ভগিনী খেলিয়া বেড়াইতেন। কবি পরজীবনে বালক কালের কাহিনী স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রজাপতি (A Butterfly) নামক কবিতাতে কহিয়াছেন ;—

Sweet childish days, that were as long
As twenty days are now."

কবি তাঁহার "The Butterfly" নামক অপর একটী কবিতাতে, তাঁহার ভগিনী কিরূপ কোমল প্রকৃতির ছিলেন—তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যত্র কহিয়াছেন, এই কোমল প্রকৃতিই তাঁহার জীবনের উপর এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ডরোথি এক স্থানে লিখিয়াছেন, যে তিনি তাঁহার ভ্রাতার নিকট গল্প করিতেন—"আমি প্রজাপতি ধরিতে, প্রজাপতির পিছনে পিছনে ছুটিতাম, পাছে ধরিলে মারা যায়, এই ভয়ে ধরিতাম না। উইলিয়ম আমাকে বলিতেন—'তিনি স্কুলে গিয়া সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি ধরিয়া মারিয়া ফেলিতেন।" উল্লিখিত কবিতায়, তাঁহাদের শৈশবের ক্রীড়া-কাহিনী এবং ভগিনীর কোমল প্রকৃতির বিষয় কবি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"Oh pleasant, pleasant were the days
The time, when, in our childish plays,
My sister Emmeline * and I
Together chased the butterfly !
A very hunter did I rush
Upon the prey : with leaps and springs
I followed on from brake to bush ;
But she, God love her ! feared to brush
The dust from off its wings."

'হায়! শৈশবের সে কি সুখের দিন গিয়াছে! ভগ্নী এমেলিন ও আমি প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটিতাম। কঠোর-হৃদয় ব্যাধের মত আমি প্রজাপতিগুলি ধরিতাম, কিন্তু তাহাদের আঘাত লাগিবে ভয়ে আমার বোন তাহাদিগকে ছুঁইতেই চাহিত না।'

কবি তাঁহার অপর একটী কবিতাতে কহিয়াছেন ;—'আমাদিগের পিতার বাগানের পশ্চাতে একটী উপত্যকা হইতে ডারেণ্ট (Derwent) নদী এবং দুর্গ সমূহের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যাইত। এই স্থানটী গোলাপ এবং নানারকম সুন্দর সুন্দর পুষ্পে সর্ব্বদা আচ্ছাদিত থাকিত। খেলা করিতে করিতে, একদিন আমরা এস্থানে, নীল-ডিম্ব পরিপূর্ণ একটী পাখীর বাসা দেখিতে পাই। আমি এবং ভগিনী প্রত্যহই এই বাসাটী দেখিয়া যাইতাম। এইরূপে কবি তাঁহাদিগের জীবনের কত ছোট বড় কাহিনী, কবিতাকারে গাঁথিয়া, কবিতাগুলি বাস্তবিকই সুখপাঠ্য করিয়া গিয়াছেন। কবি ভগ্নীর সম্বন্ধে অন্যত্র কহিয়াছেন :—

"Such heart was in her, being then
A little Prattler among men.
The blessing of my later years
Was with me when a boy.
She gave me eyes, she gave me ears ;
And humble cares, and delicate fears ;
A heart, the fountain of sweet tears ;
And love, and thought, and joy."

কবি বলিতেছেন, তাঁহার ভগ্নীই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও হৃদয়বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

কবি অন্যত্র আপন ভগিনীর কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন :—

"Her voice was like a hidden bird that sang
The thought of her was like a flash of light
Or an unseen companionship ; a breath
Of fragrance independent of the world."

এইরূপে আমরা কবির প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই তাঁহার স্নেহময়ী ভগ্নীর কথা দেখিতে পাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভগিনী ডরোথিকে অতি গভীর ভাবে ভালবাসিতেন। ডরোথি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার সরলতা ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ পাইত। তাঁহার ন্যায় স্নেহময়ী ও ধার্ম্মিকা রমণী সচরাচর বড় অধিক দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি কখনও দুঃখে, কষ্টে বিচলিত হইতেন না। তাঁহার ভিতর কোন দোষ ছিল না। কবি কহিয়াছেন ;—

"Guilt was a thing impossible with her."

'কোন দোষ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল।'

ডরোথির হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে তাঁহার ভ্রাতা একজন অতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, ডরোথি ভ্রাতাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পান

* কবিতাতে ভগিনী 'ডরোথিকেই' কবি 'এমিলিন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিই তাঁহার ভ্রাতাকে প্রকৃতির মহৎ এবং গভীর ভাবের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন; প্রকৃতপক্ষে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য সমূহের জন্য ডরোথির নিকটই আমরা ঋণী। কবি ইহার উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন ঃ—

She preserved me still a poet
Made me seek beneath that name
And that alone my office upon earth."

'তিনিই আমাকে কবি করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে কবি-জীবন যাপনই যে আমার নিয়তি তিনিই আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।'

এই মনস্বিনী রমণী ভ্রাতার সহিত ইউরোপ খণ্ডের প্রায় সকল স্থান দর্শন করিয়া, অসাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনি কহিয়াছিলেন, "আমার বাঁচিয়া থাকার আর কোন আবশ্যক নাই।" বস্তুতঃ এক কথায় বলিতে গেলে এই ভ্রাতা ভগিনীদ্বয়ের জীবন এইরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছিল, যে একের জীবন, অন্যের জীবন না জানিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই ভ্রাতা ভগিনীর কথা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, হায়! ভারত-মহিলাগণ কত দিনে তাঁহাদের ভ্রাতাদিগের এরূপ ভগ্নী হইতে পারিবেন!

১৮৫৫ খৃঃ অব্দের ২৫শে জুন ৮৩ বৎসর বয়সে এই পুণ্যশীলা রমণী দেহত্যাগ করেন। ভ্রাতার সমাধির পার্শ্বেই, তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার সমাধি-স্তম্ভের উপর, ডরোথির স্বহস্ত লিখিত, এই দুই পংক্তি খোদিত করিয়া দিলে, তাঁহার সমাধির উপযুক্ত হয় ঃ—

(1) Our heaven-ward guide is holy love,
It will be our bliss with saints above."

শ্রীপ্রফুল্লশঙ্কর গুহ।

সাহিত্য-মহারথী কালীপ্রসন্ন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোন্ দিকে যে কালীপ্রসন্নের প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পায় নাই, তাহা বলা কঠিন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা নীরব কর্ম্মবীর,—সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অথচ প্রশান্তস্বভাব জ্ঞান-বীর সাহিত্যশূর বঙ্গদেশে বোধ হয় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সাহিত্য-রথীদিগের মধ্যে যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকে এক একটা দিক্ অন্ধকার করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের স্থান কেহই পূরণ করিতে পারে নাই। কালীপ্রসন্নও বাঙ্গালা-সাহিত্য-কুঞ্জের একটা বৃহৎ দিক্ একেবারে অন্ধকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি তাঁহার কীর্ত্তির জয়-স্তম্ভগুলিকে প্রদীপ্ত আলোক-স্তম্ভের মত উদ্দীপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কালীপ্রসন্নের স্বাদু-মধুরা ও স্বভাব-সুফলা কীর্ত্তি, অসংখ্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে চিরকাল সুখ-শান্তি বিতরণ করিয়া তাঁহাদিগের আনন্দ ও প্রীতি উৎপাদন করিবে। আমরা আমাদের জনৈক বৃদ্ধ আত্মীয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, বঙ্গের চিন্তা-সমুদ্রে এক নূতন তরঙ্গ তুলিয়া, তাঁহার প্রভাত-চিন্তা যে সময় প্রথম বাহির হয়, তখন বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সকল দিকেই একটা কল-কল আনন্দধ্বনি উঠিয়াছিল। বাঙ্গালী, বাঙ্গালা-ভাষার নূতন শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন তাঁহার রচিত প্রত্যেক গ্রন্থেই, তাঁহার জ্ঞান ও প্রতিভার সুবিমল জ্যোতি ঢালিয়া দিয়া গ্রন্থগুলিকে সৌন্দর্য্য ও শক্তি-মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা লেখার নূতন ও পুরাতন বহুবিধ বাধা রীতির মধ্যেও আপনার বলে আপনি, একটি কোমল-মধুর সরস-শব্দ-সুখোচ্ছল অভিনব রচনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া, বাঙ্গালা-ভাষার বৈভব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ লিখিবার, বক্তৃতা করিবার ও কথা বলিবার ভঙ্গী বা পদ্ধতি বড়ই মধুর ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ছিল। সেই ভঙ্গী সম্পূর্ণই তাঁহার নিজস্ব। কালীপ্রসন্নের নিত্যনৈমিত্তিক কথিত বাক্যগুলিও সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত। যখনই তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বসিয়াছি, তখনই তাঁহার সেই কথামৃত পান করিতে করিতে আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়াছি। অনেকেরই ধারণা, কালীপ্রসন্নের লিখিত বাঙ্গালা-রচনা কেবলই সংস্কৃত শব্দবহুল এবং দুর্ব্বোধ। এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁহারা নিজে তাঁহার গ্রন্থের দুইটি পংক্তি না পড়িয়া, অন্যের কথায় নির্ভর করিয়া, উঁহাকে একান্ত

দুর্ব্বোধ বলিয়া আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন! ইহা বাস্তবিকই লজ্জার কথা। যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে কালীপ্রসন্নের কোন একটি প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন, যে পূর্ব্বোক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, তাঁহার গভীর চিন্তা-প্রসূত বিষয়সমূহের গুরুত্ব ও ভাবের উচ্চতা, তাঁহার ভাষাকে এক নূতন বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়াছে, এবং তজ্জন্য অনেক সময় সাধারণ পাঠকসমূহের পক্ষে উহা সহজ-বোধ্য নহে; কিন্তু তাই বলিয়া, কালীপ্রসন্নের ভাষা কখনই শ্রুতিকটু বা দুর্ব্বোধ নহে। তাঁহার সকল লেখাই ভাবাত্মক, কিন্তু সুরুচিপূর্ণ ও সুমধুর।

এক দিন আমরা কতিপয় কলেজ-বন্ধু একত্র হইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। সাহিত্য-বিষয়ক অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে, আমাদের জনৈক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বাঙ্গালা-সাহিত্যসম্পর্কে আমরা কাহার লেখার অনুসরণ করিব? তিনি উত্তর করিলেন;—"এই প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত হইয়াছে কি?" তার পর মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাঁহাদের লেখার অনুসরণ করিবে, আমিও বোধ হয়, তাঁহাদের একজন। তোমরা এই প্রশ্ন বরং কুঞ্জকে * জিজ্ঞাসা কর।" অন্য একজন বন্ধু বলিলেন,—"আপনার লেখা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন।" তিনি বলিলেন,—"তোমরা বাঙ্গালীর ছেলে,—এই কথা বলিতে তোমাদের লজ্জানুভব করা উচিত নয় কি? অথবা তোমাদেরও দোষ নাই,—কারণ বঙ্গদেশ কথাত্মক সাহিত্যের গ্রাম অতিক্রম করিয়া এখনও ভাবাত্মক সাহিত্যের গ্রামে পঁহুছিবার পথ পায় নাই।"

কালীপ্রসন্নের কথায় যে কিরূপ একটা মাধুর্য্য ও মাদকতা ছিল, তাহা যাঁহারা তাঁহার কথা না শুনিয়াছেন, তাঁহারা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। তিনি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যে বাক্য প্রয়োগ করিতেন তাহাতেও মধুরতা থাকিত। এক দিন তাঁহার কোন পার্‌সনেল্ ক্লার্কের প্রতি একটি কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হন। আমি সেই দিন তাঁহার নিকটেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাঁহার ক্লার্ককে এইমাত্র বলিলেন,—"দেখ, তোমরা আমার সঙ্গে ঐ রকম রঙ্গ ভঙ্গ করিও না।" তাঁহার সুমিষ্ট তিরস্কার বাক্যেও অনেকে আপ্যায়িত ও কৃতার্থ হইত।

কালীপ্রসন্ন অধ্যয়ন-তৃষ্ণায় চিরকালই আকুল ছিলেন। তিনি বলিতেন, "আমার যে বয়স হইয়াছে, ইহার দ্বিগুণ বয়স পাইলেও আমার এই তৃষ্ণার তৃপ্তি হইবে কি না সন্দেহ।" আমি যখনই সেই জ্ঞানবীর মহাপুরুষের নিকট গিয়াছি, তখনই তাঁহাকে তাঁহার সেই সুবৃহৎ গ্রন্থালয়ের মধ্যে, সেই প্রগাঢ় ধ্যান-মগ্ন মহাযোগীর ন্যায় অধ্যয়ন-নিমগ্ন দেখিতে পাইয়াছি। এক দিন পঞ্চম বর্ষীয় একটি শিশু, তাহার অভিভাবকের সঙ্গে 'বান্ধব-কুটীরে' আসিয়াছিল। কালীপ্রসন্নকে দেখিয়া, বাড়ী যাইয়া শিশু তাহার মায়ের নিকট বলিয়াছিল,—"মা! আজ আমি এক মহাদেব দেখিয়া আসিয়াছি।" বস্তুতঃ অধ্যয়ন-নিরত কালীপ্রসন্নকে দেখিলে ধ্যাননিরত মহাদেবের চিত্রই যেন নেত্রসম্মুখে ভাসিয়া উঠিত।

কালীপ্রসন্ন বিনয়ের অবতার ছিলেন। যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, সে-ই তাঁহার চির-স্বভাবসিদ্ধ বিনয়-সৌজন্যে আপ্যায়িত হইয়াছে। নিজে জ্ঞান ও প্রতিভায় পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত হইলেও তিনি অন্যদীয় গুণের নিকট বিনীত ও অবনত হইতে স্বভাবতঃই প্রগাঢ় প্রীতি অনুভব করিতেন। ছোট বড়—ধনী নির্দ্ধন, সকলেই তাঁহার বিনয়ে মুগ্ধ হইত। সেই স্বর্গগত মহাপুরুষ, এই দরিদ্র প্রবন্ধ-লেখকের বাসায় যে দিন প্রথম আগমন করেন, সেই দিন তাঁহার তামাক সেবন করিবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী বাসা হইতে, আমি একটি ভাল আলবোলা আনয়ন করিবার উপক্রম করিলে, তিনি বাধা দিয়া বলিলেন,—"ছিঃ, তুমি আমার স্বভাব-সম্পর্কে একান্তই অনভিজ্ঞ,—তোমাদের ভৃত্যের হুকাটি হইলেই ত আমার চলিতে পারে।" প্রতিভার সঙ্গে বিনয় মিশিয়া তাঁহার চরিত্রকে এক অমূল্য ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তিনি বিনয়ী ছিলেন বটে, কিন্তু আত্মাভিমান-বর্জ্জিত ছিলেন না। তাঁহার অভিমান কাহাকেও পীড়া না দিয়া

* জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ এম, এ। তিনি সেই দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সুন্দর একখানি স্বাভাবিক বর্ম্মের ন্যায়, স্বসম্মান ও আশ্রিতজন-সম্ভ্রম রক্ষায়ই চিরনিরত ছিল। বস্তুতঃ তাদৃশ অভিমানও মানব-প্রকৃতির একটি আভরণ।

কালীপ্রসন্ন প্রীতি-স্নেহের এক সমুদ্র ছিলেন। অতি পাষাণপ্রাণ মনুষ্যও তাঁহার প্রাণভরা ঢল-ঢল প্রীতিতে একেবারে দ্রবীভূত হইত। তাঁহার হৃদয়টি প্রীতির উচ্ছ্বাসে সততই পরিপূর্ণ রহিত। আমার জনৈক সুহৃৎ কর্তৃক ক্ষুদ্র সাহিত্য-সেবীরূপে, আমি যে দিন সেই সাহিত্য-মহারথীর নিকট প্রথম পরিচিত হই, সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা। সেই দিন তাঁহার নিকট যে কত স্নেহ—কত আদর—কত সরস-মধুর প্রীতি-সম্ভাষণ লাভ করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাঁহার পদ-প্রান্তে বসিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-প্রাণে বাঙ্গালা-সাহিত্যের শত শত অফুরন্ত কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমি কত দিন আত্মহারা হইয়াছি। সেই সকল কথার আলোচনা করিলে হয়ত এই সমগ্র পত্রিকাখানিতেও উহার স্থান সংকুলান হইবে না। যদি সুযোগ ও সুবিধা পাই তবে তাঁহার জীবনী লিখিয়া সেই সকল কথা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইব।

কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ ছিলেন। উভয়েই প্রতিভার পূর্ণ অবতার। তিনি যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রেরই সুহৃদ ছিলেন তাহা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেব, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথিদিগের প্রায় সকলের সহিতই তাঁহার প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ ছিল। সেই দিন চন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া আমার নিকট বলিয়াছিলেন,—"আর এখন বাকী রহিলাম আমি। হায়! এই সকল সুহৃদ-বিয়োগ প্রাণে [illegible] বাজিতেছে। যাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া মি[illegible]— আনন্দে হাসিয়াছি, বিষাদে [illegible] ও গল্পে প্রগাঢ় প্রীতি [illegible] সকলেই একটি একটি ক[illegible] এইক্ষণ আমাকেও প্রস্তুত হইতে হইবে। [illegible] আবার বলিলেন,—"আমি জীবনে অনেকবার ভাঙ্গন-কূলের বিষাদ-সংগীত কানে শুনিয়াছি। রাজবল্লভের সোণার রাজনগর যখন পদ্মার ভয়ঙ্কর তরঙ্গ-গ্রাসে ধীরে ধীরে ডুবিতে বসিয়াছে,—তখন মাঠের কৃষক যেমন তাহার কাঁধের লাঙ্গল [illegible] কাঁদিয়াছে, আমিও তেমনি আমার হাতের কলমটা [illegible] কাঁদিয়াছি। আর আজি আমি আমার এই বৃদ্ধ জীবনে কাঁদিতেছি,—বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাঙ্গন-কূল দর্শনে। বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্র এই কয়টি বৎসর যাবত ভাঙ্গন-কূলের কি যে ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, বুঝি না।" বাস্তবিকই আজ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাঙ্গন-কূলের দিন পড়িয়াছে। একের বিয়োগ-বিলাপ-ধ্বনির বিরাম হইতে না হইতেই, বাঙ্গালী আবার বিয়োগ-ব্যথায় দগ্ধ হইতেছে।

এইক্ষণে, তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও প্রতিভা সম্পর্কে দুই চারিটা কথার আলোচনা করিয়া বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিব। কালীপ্রসন্ন তাঁহার অতুলনীয় এবং চিন্তাপূর্ণ সরল-মধুর প্রবন্ধমালা দ্বারা যে সকল ভাব ও কথা বাঙ্গালা-সাহিত্যে আনয়ন করিয়াছেন তাহাতে বঙ্গভাষা চিরকাল সৌন্দর্য্যশালিনী বলিয়া গৌরব লাভ করিবে। বাঙ্গালার লেখকগণকে তিনি এক উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙ্গালা-ভাষায় যে অত্যুৎকৃষ্ট চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, তিনি তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা-ভাষায় বহুসংখ্যক নূতন শব্দ, নূতন কথা এবং নূতন ভাব দান করিয়া তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের শোভা ও সম্পদ বাড়াইয়াছেন। বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন বাস্তবিকই এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার লেখায়, বক্তৃতায় ও কথায় এমন একটুকু স্বাতন্ত্র্য—এমন একটুকু মাধুর্য্য এবং এমন একটুকু কবিত্ব ছিল, যাহা অন্যে পরিলক্ষিত হয় না।

কালীপ্রসন্ন কোন দিনও অনুবাদের আশ্রয় লন নাই। একখানি গ্রন্থও কাহারও কোন গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া লেখেন নাই। কিন্তু তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের অগাধ-সমুদ্র শুষিয়া, আপনার অপূর্ব্ব প্রতিভার উদ্ভাবনী শক্তি সাহায্যে বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে অমৃত রস-ধারা ঢালিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর প্রাণে চিরকাল আনন্দ দান করিবে। কালীপ্রসন্নের ভাষা কলকলায়মানা তরঙ্গিণীর মত;—কোথাও মৃদু হাস্য—কোথাও অট্টহাস্য; কোথাও

প্রীতিরমধুর সম্ভাষণ,—কোথাও ভীতিজনক প্রমত্ত গর্জ্জন। পাঠকপাঠিকাগণের পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহার রচিত নিশীথ-চিন্তার নদীর জল শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকপাঠিকা দেখিবেন, কালীপ্রসন্নের প্রীতির আদর্শ কত উচ্চ—কত মহান্। তিনি লিখিয়াছেন :—

"মনুষ্যের প্রেমে আমার খুব বেশী বিশ্বাস নাই। মনুষ্য-বর্ণিত প্রেমিক এবং প্রেমিকায়ও আমার গাঢ় শ্রদ্ধা নাই। আমি অমন আধ আধ ভালবাসা ভালবাসি না! প্রেমের অমন ভ্রমর-বৃত্তিতায়ও ভুলিয়া রহিতে চাহি না। যে প্রেম আঁখির পলকে পরিবর্ত্তিত হয়, আতপ-তপ্ত কুসুমের মত দেখিতে দেখিতেই শুকাইয়া যায়, অথবা ব্রততীর ন্যায় বাতাহত হইলেই ছিন্ন হইয়া পড়ে,—যে প্রেম সুখে এক, দুঃখে আর, সম্পদে এক, বিপদে আর, যখন নূতন তখন এক, এবং যখন পুরাতন তখন আর, কুকবির কুহকাচ্ছন্ন চঞ্চল মনুষ্যই তাহা লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে। আমার প্রেমের আদর্শ ঐ কুলুকুলু ভাষিণী মৃদু হাসিনী তরঙ্গিণী। অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী. বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ক্ষণিক সুখে অথবা ক্ষণিক দুঃখে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, ভারতের ভূতকীর্ত্তিস্বরূপ চির-কীর্ত্তনীয় মহাপুরুষদিগকে অনায়াসে ভুলিতে পারিয়াছে;—যাঁহাদিগের পদরজঃস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছিল, যাঁহাদিগের অপ্রতিম প্রতিভায় ও তেজঃপ্রভায় ভারতভূমি দেবভূমি এবং ভারতবাসীরা আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিল, যাঁহাদিগের অলৌকিক শক্তির অজেয় আকর্ষণে ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ ও করুণার অমৃত-রসে রঞ্জিত এবং মহত্ত্ব ও মাধুরীর সহিত পরিমিশ্রিত হইয়া এই পার্থিব জগতে সভ্যতার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিল,—যাঁহাদিগের কবিজন-স্পৃহণীয় পৌরুষ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া কবিতা আপনিই এক সময়ে প্রেমাধীনা দেব-কন্যার ন্যায় ভারতের অনন্তকুঞ্জে কোকিলার মত কণ্ঠে মধুর গীত গাইয়াছিল, ভারত-সন্তান সেই প্রাণাধিকপ্রিয় প্রাণারাধ্য পুরুষ-প্রবরদিগকে অকাতর মনে পাসরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যের গৌরব-সহচরী সিন্ধু ও ভাগীরথী, নর্ম্মদা ও গোদাবরী, আমার ঐ সরযু ও যমুনা পুত্র-শোকাতুরা জননী কিংবা পতিশোক-বিবশা বিধবার ন্যায়, আজি বিংশতি শতাব্দীর সুদূর ব্যবধানেও ভারত-বীরদিগের পুরাতন কথা কহিয়া কহিয়া পথ-শ্রান্ত পথিককে শোক ও বিস্ময়ের বিচিত্রভাবে অভিভূত করিতেছে;—তটস্থিত তরুলতা এবং তরুশাখাস্থিত বিহঙ্গ-নিচয়কেও শোকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া রাখিতেছে; এবং যাহার শরীরে শোণিতের কিঞ্চিন্মাত্রও সঞ্চার আছে, যাহার হৃদয়যন্ত্র প্রায়-নিস্পন্দ ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় এখনও একটুকু একটুকু স্পন্দিত হইতেছে, ঐ ম[illegible]স্পর্শী নৈশ-বিলাপ তাহাকেও আকুল ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে।"

কালীপ্রসন্ন ভক্তিপ্রবণ ছিলেন। সমুদ্রে যেমন জলের উচ্ছ্বাস, তাঁহার হৃদয়েও সেইরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হইত। যাঁহারা তাঁহার রচিত "ভক্তির জয়" এবং "মা না মহাশক্তি" নামক গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে ভক্তির আবেশে তাঁহার হৃদয়টি কিরূপ প্রফুল্ল। জাতীয় ভাবেও তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। "মা না মহাশক্তি" নামক গ্রন্থের কোন একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন;—

"এখনকার এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বলা, সুখ-সৌভাগ্য-বিলাস-বিলোলা, সমুন্নত সভ্যতা যখন সুদূর স্বপ্নকথার মতও মনুষ্যের চিত্তে প্রবেশ করে নাই;—মনুষ্য যখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলেই, বন্যজীবের ন্যায়, ভূগর্ত্তে কিংবা বৃক্ষকোটরে বাস করিয়াছে,—বন্যজীবের ন্যায়, দলে দলে ও পালে পালে, ঘুরিয়া ফিরিয়া, শুধুই আহারের অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এবং পশুপক্ষীর অপক্ক মাংস খাইয়া, অথবা একে অন্যের বুকের রক্ত চুষিয়া, কেমন একপ্রকার অমানুষ-উল্লাসে, অসুরের মত অট্টহাস্যে হাসিয়াছে, ভক্তিতত্ত্বের জন্মস্থান-রূপিণী, বেদ-বেদান্ত-প্রসবিনী পুণ্য-[illegible] সেই সময়েও, মনুষ্যজাতিকে, মনীষিভক্ত-[illegible] পবিত্র কণ্ঠে উপদেশ করিয়াছেন,—[illegible] ভয় [illegible] না। যিনি এই চরাচর জগত লইয়া [illegible] বিলাইবার জন্য চিরকাল চিদান[illegible] সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা—সর্ব্বার্থসাধিকা—শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা, — সর্ব্বভূত স্থিতা, — সর্ব্বস্বরূপা,—সারাৎসারা, জগন্মাতা অভয়াই তোমার মা।

তুমি মাতৃহীনের ন্যায় বৃথা বিলাপ করিয়া বিষাদে ডুবিও না। তুমি বিশ্বাসে অটল ও ভক্তিতে আনন্দসিক্ত হও, এবং মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অথবা স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাও।”

তাঁহার রচিত নিশীথ-চিন্তা, প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা, ভক্তির জয়, প্রমোদলহরী, জানকীর অগ্নিপরীক্ষা, মা না মহাশক্তি এবং ছায়াদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থরাজি বাঙ্গালা-সাহিত্যের গৌরবময় অলঙ্কার। তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ [illegible]-বক্ষে কৌস্তুভের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের বক্ষে চিরকাল বিরাজ করিবে। তাঁহার সুনিপুণ হস্ত-রচিত ঐ সকল সাহিত্যগ্রন্থের জন্য আজ বাঙ্গালা-সাহিত্য লইয়া আমরা বিশেষ গৌরব করিতে পারি। তাঁহার নিশীথ-চিন্তার 'নদীর জল,' 'রাত্রিকাল' 'চন্দ্রবদন,' 'আশার ছলনা,' 'তারা ও ফুল' এবং 'বিরহ'—প্রভাত-চিন্তার 'নীরব কবি;' 'অভিমান,' 'জীবনের ভার,' 'প্রকৃতি ভেদে রুচি ভেদ,' 'রাজা ও প্রজা,' মনুষ্যের জীবনচরিত', 'মহত্ত্ব ও মিতব্যয়', এবং 'বিনয়ে বাধা',—নিভৃত-চিন্তার 'অমৃত', 'ঐহিক অমরতা', 'বিরাটপুরুষ', 'লোক-রঞ্জন', 'লোকারণ্য', ও 'অশ্রুজল'—মা না মহাশক্তির মাতৃপ্রেম-সম্বলিত সুচিন্তিত দর্শনিক বিশদ ব্যাখ্যা, ভক্তির জয়ের সেই মহাভক্ত হরিদাসের সুমধুর জীবন-বৃত্ত,—জানকীর অগ্নিপরীক্ষার মূর্তিমতী পবিত্রতা ও আদর্শ সতীত্বের সমুজ্জ্বল মনোমদ অমিয়-কাহিনী, এবং ছায়াদর্শনের অত্যদ্ভুত কৌতূহলপূর্ণ পারলৌকিক কাহিনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন,—সাহিত্যে তাঁহার কি অসামান্য অধিকার,—তাঁহার জ্ঞান কত গভীর,—পাণ্ডিত্য কি প্রগাঢ়,—চিন্তাশক্তি কত উচ্চ,—ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয়খানি কিরূপ আতট-পূর্ণ। বঙ্গের কোন কোন পণ্ডিত তাহাকে কার্লাইল বলিতেন,—কেহবা এমার্সনের সঙ্গে তাহার তুলনা দিতেন,—কেহ তাঁহাকে [illegible] সঙ্গেও তুলনা করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের [illegible] কালীপ্রসন্ন এই তিনের কেহই নহেন,—কালীপ্রসন্ন [illegible] কালীপ্রসন্ন এবং এই [illegible] তাঁহার গৌরব বেশী। যতদিন বাঙ্গালা-সাহিত্য থাকিবে,—যতদিন বাঙ্গালীর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন কালীপ্রসন্নের [illegible] মনুষ্য-স্মৃতির সুবর্ণ-মন্দিরে শোভনাক্ষরে লিখিত রহিবে'।

শ্রীঅবনীকান্ত সেন।

খাজনা।

(১)

বৈশাখের [illegible] রৌদ্রে ক্ষেতে কাজ করিয়া স্বেদ-সিক্ত ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে সেখ মদন নিড়িনি হাতে ঘরে ফিরিল। তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। সূর্য্য চারিদিকে অনল-কণা নিক্ষেপ করিতেছিলেন, আর বাতাস সে অগ্নিরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছিল। অদূরস্থিত নদীর তট-ভঙ্গের শব্দ, তরঙ্গের গর্জ্জন—বাতাসের আকুল শ্বাস—গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের তীব্র উত্তেজনা দিকে দিকে প্রচার করিতেছিল। প্রকৃতিসুন্দরী হাস্যময়ী নহেন—এখন গম্ভীরা ও ক্রোধময়ী। নদীর তীরে ক্ষুদ্র শ্যামগ্রাম। মদনের গৃহপ্রাঙ্গন হইতে নদীর চঞ্চল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছিল। নদীর অপর পারে গ্রামের পর গ্রাম তার পর—অতি দূরস্থিত গ্রামের প্রান্ত-নিলীন তরু-শ্রেণী মসিরেখার মত দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে।

মদন বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল—জীর্ণ ঘরের বারান্দায় তাহার স্ত্রী ফতিমা কোলের ছেলেটিকে দুধ দিতেছে; মায়ের পাশে উলঙ্গ দেহে আট বছরের পুত্র আবদুল দাঁড়াইয়া 'খেতেদে মা, খেতেদে মা', বলিয়া কাঁদিতেছে।

ফতিমা মদনকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে একটি জীর্ণ মাদুর আনিয়া বারান্দায় পাতিল এবং সেখানে কোলের ছেলেটিকে শোয়াইয়া সত্বর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া মদনের হস্তে দিল।

ছিলিম নিঃশেষ করিয়া মদন বলিল—"ফতিমা, আবদুল কাঁদ্‌ছিল কেন? এখনও ভাত খায়নি বুঝি?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ফতিমা বলিল—"আজ ঘরে চাল নেই—দু'বাড়ী তিনবাড়ী ধার চাইতে গিয়েছিলুম—দিলে না! কালকের যে দু'টো আমানি রয়েছে তা ওকে দিলে তুমি কি খেতে? তা যা আছে তোমার সঙ্গেই খাবে।"

"আচ্ছা, আমাদের ত একরকম হ'ল, তুমি কি খাবে?"

"আজকে আমার পেট্‌টা বড় দরদ কচ্চে,—কিছু খাব না!"

ফতিমা বলিল—"এমন ক'রে আর কয়দিন চল্‌বে?

আজ আবার তুমি ক্ষেতে চলে গেলে জমিদারের পেয়াদা খাজনার জন্ত তাগাদা দিয়ে গেছে, সে বলে গেছে, যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে খাজনা না পায় তবে আমাদের এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিবে।” একথা বলিতে বলিতে ফতিমার হু'নয়ন বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মদন গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—“কাঁদ্‌ছিস্ কেন ফতি? এই কথা, আচ্ছা তুই কাঁদিস্‌নি, খোদা আছেন, তিনিই সব দেখবেন, এবার ফসলের অবস্থা ভাল দেখাচ্চে। যা, একটু তেল দে দিখিন,” এই বলিয়া পত্নীর নিকট হইতে তেল চাহিয়া লইয়া নদী হইতে পিতা পুত্রে স্নান করিয়া আসিয়া সেই হু'টি আমানি ভাত খাইয়া দাওয়ায় বিছান মাহুরে ঘুমাইয়া পড়িল। এত কষ্টের মধ্যেও মানুষের ঘুম হয়?

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপ তখনও কমে নাই। নাশ ঝোপের এবং সুপারি নারিকেলের মাথায় তখনও সূর্য্যের স্তিমিত-রশ্মি স্বর্ণাভ হইয়া জ্বলিতেছিল। এমনি অপরাহ্নে শ্যামগ্রামের রায় বাবুদের নায়েব দীনবন্ধু দত্ত দিবা নিদ্রার অবসানে কাছারী ঘরের বারান্দায় একখানা জলচৌকির উপর বসিয়া হাই তুলিতে তুলিতে ভৃত্য হনুমান সিংহকে ডাকিতেছিলেন। বেচারা হনুমান সিং তখন তাহার জাতভায়াদের পাশে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে—'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই' রবে নবদূর্ব্বাদল শ্যামকলেবর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ব্যক্ত করিতেছিল। তাহার শ্রোতাগণের মধ্যে সকলেই পশ্চিমদেশবাসী পাল্কীর বেহারা, কাজেই তাহারা ত্রেতাযুগের শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব্ব মহিমা-বাণী শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। হনুমান সিংহ প্রভুর আহ্বানে প্রস্থান করিলে তাহার সঙ্গীগণও একে একে অন্তর্হিত হইল।

শ্যামগ্রামের কাছারী রায় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের জমিদারী ভুক্ত। এখানে দেবেন্দ্র বাবুর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। দেবেন্দ্র বাবুরা প্রাচীন জমিদার বংশ, নবাব সরফরাজ খাঁর আমলে ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ নিজ কৃতিত্ব প্রভাবে সনন্দ পাইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ জমিদার-বংশ বহুদিন হইতেই লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু শিক্ষিত যুবক জমিদার। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থায় তথা কথিত ফ্রেণ্ডের দলে মিশিয়া চরিত্রহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক ফোঁটা মধু পড়িলে পিপীলিকার অভাব হয় না, এক্ষেত্রেও তাহার অভাব হয় নাই, দেশেও বহু কুসঙ্গী জুটিয়াছিল—তিনি সর্ব্বদা সে সকল ইতরশ্রেণীর বন্ধুবর্গের অলীক তোষামোদে মুগ্ধ হইয়া অধঃপতনের চরম গহ্বরে উপনীত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বপুরুষগণের সুযশ ও সুনাম একেবারে লোপ পাইয়াছিল। নিজে জমিদারী কার্য্য কিছুই দেখিতেন না, দেখিবার শক্তিও তাঁহার আর ছিল না। দেওয়ান শ্রীদাম দাস যাহা করিতেন তাহাই হইত, কোনরূপে তিনি নিজ নামটা স্বাক্ষর করিয়া দিয়াই আপনাকে বিপন্মুক্ত মনে করিতেন। সুচতুর দেওয়ানজী মহাশয়ও বাবুর বিলাস-স্রোতের যাহাতে হ্রাস না পায় সে জন্য কৌশল-জাল বিস্তার করিতে একটুও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এ হেন জমিদারের কুচক্রী মন্ত্রী শ্রীদাম দাসের মধুর সম্পর্কান্বিত ব্যক্তি দীনবন্ধু দত্ত শ্যামগ্রামের নায়েব; কাজেই এ কথা বলিলেও চলে যে দত্তজার অসাধারণ প্রতাপ। দীনবন্ধু দত্তের অখণ্ড প্রতাপে বাঘে মোষে একঘাটে জল খাইত, এইরূপ অত্যাচারী নায়েব সে অঞ্চলে কেহই ছিল না। ইনি রূপে গুণে আবার 'তোমারি তুলনা তুমি এ মহী-মণ্ডলে।' সেই মদ, আফিং, চরস সেবিত সুদীর্ঘ সুপুষ্ট দেহযষ্টি, ঢোলকের ন্যায় উদর, সুকৃষ্ণ গাত্রবরণ, টাকপড়া মাথা, কোটরগত লোহিত নয়ন-যুগল তাহার নায়েবি পোষ্টের মস্ত সার্টিফিকেট।

দত্তজা মহাশয় হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তর মন্থর গমনে আসিয়া কাছারীতে উপবেশন করিলেন এবং যে প্যায়াদা মদন সেখের বাড়ী খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিল তাহার তলব নিলেন। প্যায়াদার প্রমুখাৎ মদন সেখের খাজনা দেওয়ার অক্ষমতা শুনিয়া নায়েব মহাশয় ভীষণ হুঙ্কারে তখনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কাছারীতে আনয়ন করিবার জন্ত দুইজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিলেন।

(৩)

রাত্রি প্রায় এক প্রহর, গ্রামের ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। সারাদিনের পরিশ্রের পরে নিরীহ গ্রামবাসিগণ সকলেই

নিদ্রার কোলে আরাম উপভোগ করিতেছ। চারিদিক নীরব। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝোপে ও ঘন বিন্যস্ত তরু শ্রেণীর শাখায় শাখায় ঘর্ষণ জনিত খস খস খটাখট্ শব্দ ও গ্রাম্য কুকুরের চীৎকার ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইতেছিল না। সংসারে যার সুখ নাই—হৃদয়েও তার শান্তি নাই। নিদ্রা শান্তির পরিচায়ক। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে কোটি কাটি নক্ষত্র নয়ন মেলিয়া চাহিয়া আছে। দরিদ্র কৃষক-দম্পতি বিনিদ্র নয়নে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিজেদের দুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করিতেছিল। ফতিমা বলিতেছিল, "কেন এমন হইল, হায়! আমার যখন সাদি হয়েছিল, তখন এ বাড়ীতে গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান দেখেছি, কোন দুক্ষু কষ্ট ছিল না—আর দেখ্তে দেখ্তে এ কয় বছরের মাঝে কেমন হয়ে গেল। খোদা! খোদা! আমাদের দয়া কর।"

সে কথা আর বলিস্‌নে ফতি, ও বছরের আকালেই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে, লাঙ্গল জোয়াল বেঁচে, গরু বাছুর বেঁচেও ত খাওয়া জুট্‌লো না, বুড়ো বাপ মা না খেতে পেয়ে মরে গেলো, এখন কি করি, জমিদারের খাজনা কোথেকে দি, এ মাসের ভিতর খাজনা ছাপ্ কর্‌তে না পারলে ভিটেমাটি যে ছাড়্‌তে হ'বে।"

"সাত পুরুষের ভিটেমাটিই বা ছাড়্‌বে কি করে? আর এই ছেলে মেয়ে গুলোরই বা উপায় কি? আমরা না হয় না খেয়ে দু'দিন রইলেম, বাছারা ত আর ক্ষিদে সইতে পারে না।"

বাহির হইতে কঠোর স্বরে কে ডাকিল 'মদন'। মদন চঞ্চল চিত্তে সত্বর বাহিরে আসিয়া দেখিল, জমিদারের দু'জন বরকন্দাজ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। উভয়েই তাহার পরিচিত। সুদিনে তাহারা কতদিন আসিয়া মদনের ক্ষেতের আখ, শশা, কুমড়া প্রভৃতি ফল মূল এবং দু'তিন পসারী ধান্য লইয়া গিয়াছে, আর আজ তাহারাই কৃতান্তের মত নায়েবের কঠোর আদেশ অকুণ্ঠিত চিত্তে পৌরুষতার সহিত ব্যক্ত করিল। মানুষ এমনি স্বার্থপর বটে। ফতিমা ভীতচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া সব শুনিতেছিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার হৃদয়, একটা ভারি বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। যখন সে দেখিতে পাইল তাহার স্বামীর করুণ মিনতি উপেক্ষা করিয়া দুর্দ্দান্ত পিশাচদ্বয় তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছে তখন শঙ্কিতা কৃষাণ-রমণী কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, সে উন্মাদিনীর মত দৌড়িয়া আসিয়া উহাদের মধ্যে পড়িয়া—বলিল, "ওগো! আজ রাত্রির মত ছেড়ে দাও, কিছু খায়নি—কাল কাছারিতে যাবে।" পাষণ্ডেরা তাহার মিনতি শুনিল না,—অশ্রুবিগলিতা দরিদ্রা রমণীর করুণ বাক্যে তাহাদের হৃদয়ে একবিন্দু করুণার সঞ্চার হইল না! তাহারা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মদনকে লইয়া অগ্রসর হইল। পথে যাইতে যাইতে মদন বলিল, "ভয় কি ফতি, খোদা আছেন।"

(৪)

কাছারী ঘরে নায়েব মহোদয় বসিয়াছেন। রাত্রি একটু গভীর হইয়া আসিয়াছে। আফিমের নেশাটাও একটু জমিয়া আসিয়াছিল, কাজেই অর্দ্ধস্তিমিত লোচনে তিনি কাগজ পত্রের পাতা উল্‌টাইতেছিলেন। ফরাসের চারি পাশে খাতা পত্র ছড়ান, মুহুরীরা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তখনও লিখিতেছে। কেরোসিনের লেম্পের আলোকে সমগ্র ঘরটি উজ্জ্বলরূপে আলোকিত। ঘরখানা আটচালা। চালের একোণে সেকোণে কালির ঝুল ঝুলিতেছে। চারিদিকে বারান্দা –মাঝখানে কাছারী বসে। ফরাসের চাদরখানা মসীবর্ণে চিত্রিত। নায়েব মুহুরী প্রত্যেকের সম্মুখেই এক একটা ছোট হাত বাক্স। চৌকির পাশে খান দুই বেঞ্চ ও অর্দ্ধভগ্ন একখানা চেয়ার। গ্রামের এক প্রান্তে নায়েবের কাছারী বিরাজিত। সম্মুখে খোলা মাঠ, মাঠের পর নদী। চারিধারে আম, কাঁটাল সুপারি নারিকেল তেঁতুল প্রভৃতি গাছের সারি। বাঁশের ঝোপ ঝাপের পেছনে একটা বহুদিনের প্রাচীন পুকুর। কাছারী ঘরে কলমের খস্ খস্ এবং অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগরিত তন্দ্রামুগ্ধ নায়েব মহাশয়ের বিকট নাসিকাধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। এমন সময়ে পেয়াদা রামতনু বলিল, "হুজুর মদনকে এনেছি।" নায়েবের নেশা ছুটিল, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিলেন, "শালা কোথায়?" মদন নায়েব মহাশয়ের এতটা সম্পর্কীয় হইয়াও কিন্তু কম্পান্বিত কলেবরে সেলাম

করিয়া অশ্রুভরা কণ্ঠে বলিল, "হুজুর রাত্রিতে কেন তলব করেচেন?" বিকট চীৎকারে কাছারী ঘর প্রতিধ্বনিত করিয়া নায়েব বলিলেন, "পাজীবেটা কিছু জান না? পাঁচ বছরের বকেয়া খাজনা বাকী, শালা কেবল ফাঁকী দিয়ে বেড়াচ্ছ? দে শালা মনিবের খাজনা দে।"

মদন একে একে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার শোক-কাহিনী ব্যক্ত করিল। সর্ব্বশেষে বলিল, "আপনি ত সকলি জানেন, আকালে কি কিছু আমার রেখে গেছে? মহাজনের এক পয়সাও শুধ্‌তে পাচ্ছিনি, কে ধার দিবে বলুন? ধার পেলে কি আর জমিদারের টাকা ফেলে এবারকার ফসলের অবস্থা ভাল দেখাচ্ছে, আর মেরে কেটে তিন চারটা মাস অপেক্ষা করুন।"

পাপের সহিত যাহাদের বন্ধুত্ব হইয়া যায় তাহাদের কঠিন হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হয় না। সংসারে যাহারা মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা ইহা প্রতি মুহূর্ত্তেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পাপের নিত্য সাহচর্য্যে হৃদয় এতদূর কঠোর হয় যে দয়ামায়া বলিয়া কোন পদার্থ তাহাদের অন্তরে স্থান পায় না। পাপিষ্ঠ দীনবন্ধু দত্তের হৃদয়ও তেমনি কঠিন পাষাণে গড়া। মদনের বাক্যে তাহার দয়ার পরিবর্ত্তে বরং ক্রোধানলই বৃদ্ধি পাইল। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "ওসব গ্যাকামি রাখ্, দিবি কি না বল।"

'কি করে দেই হুজুর?'

'বুঝেছি, অমনি হবে না,—ওরে রামা, মার শালাকে পঁচিশ জুতো।' যেমন যম রাজা, তেমনি তাহার দূত। হুজুরের আদেশ বাণীর সঙ্গে সঙ্গেই রামতনু পেয়াদা জল্লাদের মত সেই জীর্ণ শীর্ণ ক্লান্ত হতভাগাকে কাছারী ঘরের বারান্দায় আনিয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। সেই নিশীথে হতভাগা মদনের করুণ চীৎকারে নিদ্রার শান্তি সুখের মধ্যেও নিরীহ গ্রামবাসীগণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সাহায্য করিতে আসিল না। 'খোদা, খোদা,' এই আমার অদৃষ্টে লিখেছিলে?" তার পর রুধিরাক্ত কলেবরে হতভাগা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রক্ত মাংসে গঠিত পিশাচ মানুষ এ দৃশ্যেও নীরবে রহিল কিন্তু আঙ্গিনার পাশের একটা কুকুর জানি না কেন প্রহারকারীকে বিকট হুঙ্কারে দংশন করিতে গিয়াছিল। আর আকাশে একটীও তারকা ছিল না—তারকা-খচিত আকাশ তখন নিবিড় জলদাবৃত ছিল।

(৫)

সে দিন সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি হইতেছিল। বড় বাদলা। ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য! ঝড়ের সহিত প্রবল বারি-ধারার ঘন বর্ষণে মেঘে ভীমমন্দ্রে, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত। পথ ঘাট জলে ভরা। এমনি দুর্য্যোগে, এমনি প্রবল বর্ষণের দিনে শ্যামগ্রামের একখানা ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যস্থিত এক দরিদ্রা কৃষক-রমণীর হৃদয়ে ইহা অপেক্ষাও ভীষণ ঝড় প্রবাহিত হইতেছিল। ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে মদন সেখ মৃত্যু শয্যায় শায়িত। শয্যার পার্শ্বে অভাগিনী কৃষক-রমণী এক দৃষ্টে রুগ্ন পতির মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। ছেলে মেয়ে দু'টি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মিট্ মিট্ করিয়া একটী দীপ জ্বলিতেছে, বাতাসে উহার শিখাটি কাঁপিতেছে! সেই প্রহারের পর হইতেই মদনের জ্বর। সে জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িল না। গ্রামের বিচক্ষণ আনন্দ কবিরাজ মহাশয় প্রাণপণে রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না, আজ মদনের অবস্থা বড় খারাপ। সে প্রলাপ বকিতেছিল। হায়! বিধাতা, এ সংসারে কি তুমি দরিদ্রের মুখের পানে চাহ না? রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মদনের অন্তিম লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পাইল। চক্ষের তারা বিস্ফারিত হইল, হতভাগিনী ফতিমা উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "ওগো! তুমি আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছ?"

পরপারের যাত্রী মদন ক্ষীণ স্বরে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "খাজনা দিতে যাচ্ছি ফতি, খাজনা দিতে যাচ্ছি, ভয় কি? খোদা আছেন!" এমন সময়ে একটা দমকা বাতাসে ঘরের প্রদীপটা নিবিয়া গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে একটী অভাগিনীর চিরজীবনের আশা-প্রদীপও নিবিল।

ফতিমার করুণ চীৎকারে প্রতিবেশীবর্গ আসিয়া দেখিল, মদনের অমর আত্মা বহুক্ষণ দেহ-পিঞ্জর ফেলিয়া পলাইয়াছে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

———

কাল্পনিক প্রেম।

কাল্পনিক প্রেম—অকস্মাৎ যাহা হৃদয়কে উধাও করিয়া দেয় এবং সমস্ত চেতনাকে বেদনায় পীড়িত করিয়া তোলে—মানুষের সমস্ত মনোবৃত্তির ভিতর বোধ হয় তাহা অপেক্ষা সাংঘাতিক কিছু নাই। ফুলের চারাগুলির মূলের ভিতর দিয়া যে রসধারা সঞ্চালিত হইবার সময় ভূমিকে ফুল পল্লবের পুলকে স্পন্দিত করিতে থাকে, ইহা ঠিক তাহারি মতন। মনুষ্যাত্মার তাহার সঙ্গীকে লাভ করিবার জন্য এই যে আকুলতা—যাহাকে ব্যক্ত করা যায় না, প্রকাশ করা যায় না—তাহাকে তরুমূলের ভিতর স্পন্দমান ঐ পুলকাঞ্চিত রসধারার মতই রুদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। ইহার ভিতর এমন একটি শুভ্র পবিত্রতা আছে যে মানুষের নিম্ন বাসনা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর ভিতর যে কেহ ইহা লাভ করিয়াছে তাহার ভাগ্য নিঃসন্দেহই ঈর্ষ্যাযোগ্য। কিছুই সে তখন ক্ষুদ্র বলিয়া দেখে না, তুচ্ছ বলিয়া মনে করে না, এবং পৃথিবীর যেগুলি মহান্ দৃশ্য, তাহার ভিতর সে বিশ্ব-দেবতার হাস্য-চিহ্ন উপলব্ধি করে। প্রকৃতি তখন তাহার সমস্ত মনোহারিত্ব লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

কিন্তু এই সমস্ত সৌন্দর্য্য ও আনন্দ সত্বেও এই কাল্পনিক প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা একটি করুণারই ব্যাপার। সংখ্যাতীত দুঃখ ইহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, জীবন-স্বপ্নের অবসান জনিত দারুণ তিক্ততা ইহা বিস্তার করিয়াছে। কত হৃদয় ইহা হইতে ভগ্ন হইয়াছে। জীবন-প্রভাতে অপরূপ আলোক-বিম্বের মত ইহা আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয় এবং আমাদের সামাজিক-জীবনের প্রারম্ভ সময় সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র অবস্থার ভিতরে আমরা ইহার নিষ্ফল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে থাকি। এই অসম্ভবের পশ্চাতে ধাবিত ব্যক্তি সকলের মধ্যে কবিই ধন্য, কারণ তিনি নিজে এই কাল্পনিক প্রেমকে বয়ন করেন। কাল্পনিক প্রেমের সমস্ত আবেগকে তিনি মধুর শব্দের ভিতর দিয়া ঝঙ্কৃত করিয়া তোলেন, কুহকের মত তাহা শ্রোতার হৃদয়ে তাহার জীবনের তরুণ স্বপ্নকে জাগ্রত করিয়া তোলে, তাহার উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে চকিত করিয়া তোলে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, কলাবিৎ তাঁহার এই অপূর্ব্ব শক্তিটিকে নিজেই অনুভব করেন এবং যদি তিনি নিজের হৃদয় সম্পূর্ণ পাঠ করিতে পারিতেন তাহা হইলে স্বীকার করিতেন যে মানুষের নিঃসঙ্গ আত্মার কাছে আনন্দ অপেক্ষাও মধুর এই আকুলতাময় বেদনাটিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তিনি একটী বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

"নিঃসঙ্গ আত্মা"—এই বাক্যটিকে আমি বিশেষ রূপেই প্রয়োগ করিতেছি, কারণ মনুষ্যাত্মা সম্পূর্ণই একক। মানুষ নিঃসঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং অধিকতর নিঃসঙ্গ ভাবে এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। স্নেহ ও ভালবাসা হইতে যে পাথেয়ই সে সঞ্চয় করুক না কেন, তাহার এই নিঃসঙ্গতাকে সে কখনই বিস্মৃত হয় না। তাহার অন্তরের ভিতর নিরন্তর জাগে—একটা গম্ভীর স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা—অনন্ত কাল যাহার উপর ছায়া রচনা করিয়া আছে! কেন যে ইহা স্বতন্ত্র প্রাণীরূপে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কেন যে একটি স্বতন্ত্র দেহে আবদ্ধ হইয়া কতগুলি বিশেষ কর্ম্ম ও বিশেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছে এবং পরে তাহা হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা—একটা বিস্ময়াবহ প্রয়োজনের শাসন—যাহার ভিতর তাহার নিজের অংশ ও স্থান ঠিক চিনিয়া লইতে পারিতেছে না। কিন্তু তবু ইহা অস্তি, এবং ইহাকে অস্বীকার করিবার যো নাই। কাল্পনিক প্রেম—পার্থিব এবং অপার্থিব—বিশেষ-রূপে এ দুইএর কোনটাই নয়, দুইএর সংমিশ্রণে জাত ইহা একটি অব্যক্ত মধুর ভাব—ইহা যদিও কোন বিধিবদ্ধ যুক্তির শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ হইতে পারে না, তবুও ইহাই জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠতম আর্টের, সঙ্গীতের ও কবিতার মূলভিত্তি। মানুষ যাহা—শুধু তাহা লইয়াই যদি থাকিতে হইত তবে পৃথিবীতে কোন আর্ট থাকিত না। পুরুষ ও নারীর মহিমাময় আদর্শ আমরা যখন মনোমধ্যে রচনা করি এবং আমাদের এই অভিরাম সৃষ্টিকে কাল্পনিক প্রেমের দ্বারা মণ্ডিত করি, তখন তাহার ভিতর দিয়া দেবতারা আমাদের অভিভাষণ করেন। পশুর সঙ্গে এক সমতলে আমরা এখনও দাঁড়াই নাই, এবং আমাদের

ভবিষ্যতেও সেরূপ কোন গুরুতর আশঙ্কা নাই। বাস্তব নাস্তিকেরা ও কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মপ্রচারকেরা—বর্ত্তমান যুগের মতই অতীত যুগেও অন্ধকার বিস্তার করিতেছিলেন, জগতের গতিপথে প্রতিরোধকারী শিলার মত তাঁহারা বিদূরিত হইয়াছেন এবং এখনও হইবেন, কারণ প্রকৃতি কখনও প্রতিশোধকে ক্ষমা দ্বারা মুক্তি দান করেন না। জোলার জঘন্য আধিভৌতিকবাদ (Materialism) ও তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ—তাঁহারা—যাঁহারা আপনার অহং ছাড়া আর কোন দেবতার কাছে মস্তক নমিত করেন না—ইঁহাদের নৈতিক অধোগতির চিহ্ন সৃষ্টির বিরাট ইতিহাস হইতে চিহ্নহীন হইয়া একদিন মুছিয়া যাইবে ও বিশ্ব-জগতের চিরন্তন সত্য আদর্শই তাহার উপর দীপ্ত হইয়া ঝলকিয়া উঠিবে। মনুষ্যাত্মা তখন তাহার আলোক অনুসরণ করিয়া চলিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইবে। কাল্পনিক প্রেমও খানিকটা ইহারই মতন, তাহার আদর্শকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নতুবা উন্মার্গগামী জৈব প্রবৃত্তির ভিতর তাহাকে মরিতে দিতে হইবে।

কাল্পনিক প্রেমের বিরুদ্ধে যাহা কিছু আছে সমস্ত স্বীকার করা সত্ত্বেও ইহা সত্য যে কাল্পনিক প্রেম আর্টের ভিত্তিপ্রস্তর। প্রকৃত আর্টিষ্ট মাত্রেরই ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। প্রত্যেক নূতন চিন্তায়—প্রত্যেক উৎপাদক কর্ম্মে কাল্পনিক প্রেম পথপ্রদর্শন করে, এবং তাহার চারিদিক হইতে বিস্ময় প্রকাশিত হইতে থাকে; এ যেন এক মায়াবী জগতের কলঙ্ক-লাঞ্ছিত মূর্ত্তির উপর দিয়া তাহার মায়াদণ্ড ছোঁয়াইয়া যায়—আর আলোকে উল্লাসে সৌন্দর্য্যে তাঁহার অন্ধকার ললাট প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে! আনন্দকে প্রবলতার দ্বারা স্পন্দিত করিয়া তোলে, সূর্য্যালোকের ভিতর সে আরেকটি অপরূপ দীপ্তি সংযোগ করে, চন্দ্রকরের স্বপ্নময় কুহকের ভিতর সে আরেকটি অপূর্ব্ব জ্যোতি আনয়ন করে, ফুল পল্লবের বিচিত্রতার ভিতর সে আরেকটি বিচিত্রতা অর্পণ করে। সে যেন একটা পূর্ণ প্রবল খর তটিনী—সহসা উদ্বেল হইয়া উঠিয়া বিশ্বভুবনের উপর দিয়া আপনার ফেনিল জল ছড়াইয়া দিয়াছে, তাহার নির্ম্মলতা সকলকে নির্ম্মল করিয়া তুলিয়াছে! কুহক স্বরূপ এই প্রেমকে—বাস্তব জীবনে কি কল্পনার ভিতরেও যে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে নাই—জীবন তাহার অন্ধকার—গ্রহ নক্ষত্রের আলো তাহার কাছে নির্ব্বাপিত। এই কাল্পনিক প্রেমকে যে জাগ্রত করিতে সমর্থ সে শ্রেয়োযুক্ত সন্দেহ নাই। জীবনে যে কল্পনা স্বপ্নটির নিকট আমরা পঁহুছিতে পারিব না,—জীবনের পরপার পর্য্যন্ত অনুসরণ করিবার শক্তি আমরা তাহা হইতে লাভ করিব। তাহার বহুধা বিভক্ত পথ বেদনা অপেক্ষা নিবিড় আনন্দে আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিবে এবং সম্পদ হইতে পদগৌরব হইতে শ্রেষ্ঠতর এই মন্ত্রপূত কবচটি—আমাদের উচ্চতর জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনয়ন করিবে! জগতের সমস্ত বাস্তব বিভীষিকা তখন ইহার নিঃশ্বাসে উড়িয়া যাইবে—আশার মাধুর্য্যে চির সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া বসুন্ধরা অনন্ত যৌবনে আমাদের চক্ষের কাছে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

পূর্ব্ববঙ্গের উপাধিধারিণী মহিলাগণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বিবাহের পর সরলা আপনাকে অতিশয় সুখী মনে করিতেন। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন:—

"এক সময় ভাবিতাম, আমি বিবাহ করিব না। এখন বুঝিতেছি, বিবাহে কত সুখ!"

বিবাহের পর শুধু যে সরলাই সুখী হইয়াছিলেন, তাহা নয়। সরলার গভীর প্রেমে, মধুর ব্যবহারে, সরলতায় ও সদ্‌গুণে তাঁহার স্বামী অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার মহাশয় কতকগুলি কথা ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমরা উহার কয়েকটী স্থানের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। মিষ্টার দাস লিখিয়াছেন:—

"সরলা তাঁহার স্বামীর জন্য কি করিয়াছিলেন, তাহা

বর্ণনা করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, বলিতে গেলে তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার চেষ্টায়ই হইয়াছে। সরলা স্বামীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই সাহায্য করিতেন। সরলার সাংসারিক জ্ঞানের অভাব ছিল বটে, কিন্তু ভিতরে এমন এক স্বাভাবিক কর্ত্তব্য জ্ঞান (Instinct) ছিল যে, তাঁহার কি করা উচিত, কি করা অন্যায় ইহা সর্ব্বদাই বুঝিতে পারিতেন। তিনি স্বামীকে কি গভীর ভাবেই ভালবাসিতেন এবং স্বামীর ভালবাসা পাইবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতাই ছিল! * * সরলা স্বামীর মঙ্গলের জন্য কিরূপ চিন্তা করিতেন, তাহা তাঁহার ডায়েরীর নিয়োদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা যায়ঃ---

'আমি চাই, আমার স্বামী যেন সর্ব্বতোভাবে মহৎ হন। কারণ তাহাতেই মানুষের গৌরব। আমার স্বামীকে যখন বিবেকানুমোদিত মহৎভাব পূর্ণ কথা বলিতে শুনি, তখন আমিও অতিশয় গৌরব অনুভব করি। কর্ত্তব্য ঈশ্বরবাণীর কঠোর-প্রকৃতি-দুহিতা; (Duty is the stern daughter of voice of God) এই কর্ত্তব্যের আদেশ-পালন-জনিত সুখই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ। কিন্তু এই আদেশ পালন করা অত্যন্ত কঠিন। আমি যদি কর্ত্তব্যপরায়ণা ও মহৎভাব-সম্পন্না নারী হইতে পারিতাম! * * তাহা হইলে আমার স্বামীর অনেক সাহায্য করিতে পারিতাম।"

সরলার স্বামী তাঁহার সম্বন্ধে অন্য একস্থানে লিখিয়াছেনঃ—"সংসারের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। সচরাচর সংসারের যে সকল কার্য্য পুরুষেরা করিয়া থাকেন, সে সমস্ত কার্য্যও তিনি করিতেন।"

এস্থানে একটা কথা। এ দেশের বিস্তর লোকের শিক্ষিতা নারীদিগের সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাঁহারা মনে করেন, মেয়েরা খুব লেখা পড়া শিখিলে কোন রকম গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। কেমন করিয়াই বা পারিবেন? তাঁহারা নিজের পাঠ, নিজের চিন্তা, নিজের সুখ ও সুবিধা এবং নিজের খুঁটিনাটি লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। কাজেই স্বামীর সেবা, সন্তান-পালন ও ঘরকন্না--ইহার কোন কাজেই তাঁহাদের মন বসিবে না। কিন্তু সরলা সুশিক্ষিতা ও সম্পদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও উত্তমরূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং সেবাদ্বারা স্বামীকে সুখী করিতে পারিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে সরলা রান্না করিতে যাইতেন। তাঁহার স্বামী যে কয়েকটী তরকারি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, তিনি সময় সময় সেই কয়েকটি তরকারি স্বহস্তে রাঁধিতেন।

সরলার সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেনঃ—

"সরলা কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, আমি তাহার কিছুই জানি না। তবে সরলা যে তাঁহার চারিবর্ষব্যাপী বিবাহিত জীবনের দ্বারা, যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তৎপ্রতি স্বামীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।"

আমরা জানি না, সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি গৌরবের বিষয় আছে। যে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার মহদ্‌গুণ বর্ণনা করেন, সে স্ত্রীর নারীজন্ম সার্থক। তদ্ভিন্ন যিনি জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া, স্বামীর সকল অভাব পূর্ণ করেন, স্বামীকে সবল করিয়া তোলেন; এবং স্বামীর সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া তাঁহার সকল কার্য্যকে শ্রীসম্পন্ন করেন,—সে নারীর উচ্চশিক্ষা সার্থক; সে নারী যদি রান্নাবান্না ভাল না জানেন, কিম্বা ঘরকন্নায় একটু শিথিল ভাব প্রকাশ করেন; সে জন্য আমরা কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করিব না। সাত টাকার জায়গায় দশ টাকা মাইনে দিলেই ত একজন ভাল রাঁধুনী জুটিতে পারে; ঝি-চাকর থাকিলেও কাজ ঠেকিয়া থাকে না; কিন্তু জীবন-সংগ্রামে কে সঙ্গিনী হইতে পারে? অসম্পূর্ণ জীবনকে কে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে? হৃদয় মাহাত্ম্যে কে পুরুষকে মহৎ করিয়া তুলিতে পারে? যে নারী তাহা পারেন, তাঁহার স্থান পৃথিবীর অনেক ঊর্দ্ধে। তিনি সংসারের গুটিকয়েক কার্য্য নাই বা শিখিলেন?

অতঃপর সরলার কতকগুলি সদ্‌গুণের উল্লেখ করিব। তাঁহার সরলতার কথা পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি, আরও

কিছু বলিব। সরলতাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। যেমন একটী সুন্দর বৃক্ষে পুষ্প ও ফলের সমাবেশ হয়, তেমনি সরলার জীবনে সরলতা ও জ্ঞানের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার নামটী ঠিক হৃদয়ের ভাবের উপযোগী হইয়াছিল। তাঁহার নির্ম্মল ও হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেই তাঁহাকে সরলতার প্রতিমা বলিয়া মনে হইত। সরলার স্বামী এই সরলতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"সংসারের ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা ও নিকৃষ্ট ভাব সম্বন্ধে বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। বিবাহের পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশিয়া মানুষের শঠতা ও মন্দ অনেকটা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক সাধুতার প্রতি এমনই বিশ্বাস ছিল যে, কেহ কোন লোকের কুকার্য্যের উল্লেখ করিলে সহজে তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। বলিতেন, "এমন কথা কেন বলিতেছেন? ঐ রকম খারাপ কাজ কি মানুষে করিতে পারে?" * * তিনি নির্ম্মল কাচখণ্ডের ন্যায় পবিত্র ছিলেন। সংসার তাঁহাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারে নাই। * * লোকে যাহাকে শুভ্র মিথ্যা (White lie) বলে, সে শুভ্র মিথ্যাই হউক, আর কৃষ্ণ মিথ্যাই (Black lie) হউক, জ্ঞাতসারে তিনি কোনরূপ মিথ্যাই বলিতেন না।"

সরলার অধিক বয়সেও তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ছেলে মানুষের মত সরল ছিল, সে বিষয়ে আরও দু'একটা কথা বলি। সরলার বিবাহের পর আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। প্রথমেই তিনি তাঁহার স্বামী মিঃ দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহার একখানা ফটোর দিকে আমার চোখ পড়িল। আমি বলিলাম, "ফটোখানা ত মন্দ হয় নাই।" তিনি বলিলেন, "ওখানা কি ভাল হয়েছে? আমাকে বোকা মেয়ের মত দেখাচ্ছে।"

"দেখুন, এ বিষয়ে আপনাকে একটা মজার কথা বলি। বিবাহের পর আমি আমার বোনদের সঙ্গে— বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমরা যখন চলিয়া আসিলাম, তখন সে বাড়ীর একটি স্ত্রীলোক আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই মেয়েটি দুর্গামোহন বাবুর পুত্রবধূ হ'য়েছে? মেয়েটিকে দেখে যে বোকা বলে মনে হয়। ওর চেয়ে ওর বোনেরাই ত বুদ্ধিমতী।"

ইহার পর আর একটি স্ত্রীলোক বলিলেন—"মেয়েটি যে বি, এ, পাশ করেছে।" তখন অন্য স্ত্রীলোকটি বলিলেন—"বটে! তাই নাকি? তবে ত মেয়েটি বোকা নয়।"

শুনিয়া আমি খুব হাসিলাম। তার পর সরলা বলিলেন, "দেখুন, আজ আমাকে একটা গল্প শুনাতে হবে, তা নইলে কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না।" আমি বলিলাম— "এখন ত আর তুমি সেই দার্জ্জিলিংএর সরলা নও; এখন বড় হয়েছ, বি, এ, পাশ করেছ, এ বয়সে আর কি গল্প শুনিবে?"

সরলা কহিলেন—"না, তা হইবে না, গল্প একটা শুনাইতেই হবে। আপনি বাঁকীপুরের বোর্ডিংএর ছেলেদের পেয়ে আমাদের ভুলেই গিয়েছেন।" এই ত কত মাস পরে দেখা করতে এসেছেন।"

আমাকে বাধ্য হইয়া রবীন্দ্র বাবুর একটি ছোট গল্প শুনাইতে হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—এখনও ইঁহার ছোট ছেলেটির মত সরলতা রহিয়া গিয়াছে।

সরলার কোমল হৃদয় দয়ায় পূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে দুই একটি কথা লিখিব। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গরীব দুঃখীর বন্ধু। সরলার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। সরলা নিজের বৃত্তির টাকা হইতে গোপনে তাঁহার হস্তে অর্থ প্রদান করিতেন; তিনি সেই টাকায় গরীব ছেলেদের সাহায্য করিতেন। সরলার দয়া ও দান সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী লিখিয়াছেন ঃ—

"সরলা অতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন। তাঁহার দানের বিষয় প্রকাশ হইলে বড়ই লজ্জিত হইতেন। এ জন্য গোপনে দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। পরীক্ষায় পাশ করিয়া এক হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই টাকার একটি পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় করেন নাই। আমি শুনিয়াছি যে, তাঁহার একজন শিক্ষকের অভাবের সময় বৃত্তির টাকা হইতে দুই শত টাকা দান করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে সরলার মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও ধর্ম্মভাবের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। সরলার মর্ম্মের নিভৃত স্থানে একটি মহৎ আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তাঁহার মধ্যে অনেক উন্নত ভাব পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু তাঁহার একটু প্রশংসা করিলেই তিনি বলিতেন—"আপনারা আমার সকল কথা জানেন না বলিয়াই প্রশংসা করেন। আমার যে ভারি রাগ, তাহা কি জানেন?"

সরলার অন্তরে কি রকম একটা মহৎ আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা বলিতেছি। বাল্যকালে যখন রেঙ্গুনে ছিলেন, তখন কন্‌ভেণ্টের মেয়েরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। মেয়েরা সকলেই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের কথা সরলার চিত্তে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সে জন্য সরলা ভাবিতেন, আমি যখন লেখাপড়া শিখিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই কিছু ভাল কাজ করিব। নচেৎ আমার জীবন নিষ্ফল হইয়া যাইবে। এই ভাবটি সরলার হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য অনেক সময় তিনি চিন্তা করিতেন। কিন্তু কোন্ কাজ তাহার পক্ষে উপযুক্ত, কোন্ কাজে হস্তার্পণ করিলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধে তিনি ডায়েরীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রিল। জগতে চিরস্থায়ী কিছু করিয়া যাইতে হইবে। কিছু না করিয়া, আমার অস্তিত্বের কোন চিহ্ন না রাখিয়া, যেমন সংসারে আসিয়াছিলাম, তেমনি যেন চলিয়া না যাই।"

"১০ই আগষ্ট। আমার মনে হয় আমি শীঘ্রই মরিব। জানি না কেন এ ভাব আমার মনে উদয় হয়। আমি কাঁদিতেছি। হায়, আমি কাহারও জন্য কিছু করিতে পারিলাম না। এমন কি, সতীশের জন্যও না। প্রায়ই মনে করিতাম কিছু না কিছু করিতে পারিব। কিন্তু দেখিতেছি, আমাতে কোন পদার্থ নাই। এত দুর্ব্বল, আমি কি করিব বুঝি না। আত্মজীবন লইয়াও সুখী নহি, কাহারও জন্য এ পৃথিবীতে কিছু করিতেছি না। আমার জীবন নিতান্তই অসার।"

অন্যত্র:—

——"যদিও বাল্যকাল হইতে জর্জ্জ ইলিয়ট-উল্লিখিত "অদৃশ্য গায়কদলের" সঙ্গে যোগ দিবার জন্য আমার উচ্চাভিলাষ, তথাপি আমার মনে হয় না যে, আমি কোন কাজ করিতে পারি। এই আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস আমার জীবনের এক মহৎ দোষ। ইহা আমার অতিশয় অনিষ্ট করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বর আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন; আমার এই জীবনকে পৃথিবীতে থাকিবার উপযুক্ত করুন।"

সরলার মহৎ আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে তাঁহার স্বামী লিখিয়াছেন:—"সরলার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যখন তাঁহার স্বামী ব্যারিষ্টারীতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন এবং যখন সরলা আপনাকে কোন কাজের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন মহৎ কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন।"

সরলার অন্তরে পবিত্র ধর্ম্মভাব লুক্কায়িত ছিল। তিনি ভক্তিভাবে উপাসনায় যোগদান করিতেন। প্রতিদিন রাত্রে ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করিয়া একটি প্রার্থনা পাঠ করিতেন। তাহার পর শয়ন করিতে যাইতেন।

সরলার এইরূপ ধর্ম্মভাব ছিল বলিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল। তিনি শান্ত মনে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনায় যোগদান করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে গমন করিলে, আনন্দের আর সীমা থাকিত না। শাস্ত্রী মহাশয় ছেলেদের ধর্ম্মোন্নতির জন্য একটি সোমবারীয় সমিতি করিয়াছিলেন। সরলা শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিয়াছিল —"আপনি ছেলেদের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির জন্য মণ্ডে মিটিং করিয়াছেন, মেয়েদের জন্যও ঐরূপ কিছু করুন। আমরা মেয়েরা প্রতি সপ্তাহে আপনার কাছে যাইব।"

সরলা তাঁহার মর্ম্মস্থানে ধর্ম্মভাব কিরূপ গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ডায়েরী পড়িলে বুঝা যায়। আমরা ডায়েরীর একটা স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"This love is wholly selfish and is no love at all, since it does not smite the chord of

self and make it pass out of sig t but only strikes it out louder and brings it more into prominence. I don't think I was so selfish before. Now I want Satish to think of me and love me and me alone and no one else. I sometimes feel afraid when I think this morbid love I have for S will make me forget everything and every body and God will be displeased and take him away from me. Oh God, I cannot think of it. As I am writing my eyes are filling. Oh God, I hope Thou will moderate my love and make it pure and holy and just what thou wouldst like it to be. Oh God, help me to love Thee and be of some use to Thee."

"আমার (স্বামীর প্রতি) এই যে ভালবাসা, ইহা স্বার্থে পূর্ণ এবং ইহা প্রকৃত ভালবাসা নয়। কারণ ইহা আমার আমিত্বের তন্ত্রীকে ছিন্ন করিয়া দেয় না; আমিত্বকে দৃষ্টির বহির্ভূত করে না; বরং আরও উচ্চ হইতে উচ্চতর সুরে ইহাকে বাজাইয়া তোলে। আমার মনে হয় না যে আমি আগে এতটা স্বার্থপর ছিলাম। এখন আমি ইচ্ছা করি সতীশ কেবল আমাকেই ভালবাসুন, আমারই চিন্তা করুন, আর কাহারও নহে। সময় সময় আমার এ কথা মনে করিয়া ভয় হয় যে, সতীশের প্রতি আমার এই অসঙ্গত ভালবাসার জন্য আমি আর সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তিকে ভুলিয়া যাইব; এবং তখন ঈশ্বর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবেন। উঃ! ঈশ্বর, আমি এই কথা ভাবিতে পারি না। লিখিতে লিখিতে অশ্রুতে আমার চক্ষু পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হে প্রভু, আমি আশা করি, তুমি আমার ভালবাসাকে সংযত ও পবিত্র করিবে, তুমি এই ভালবাসা যেরূপ হওয়া উচিত মনে কর, সেইরূপই করিয়া লইবে। হে ঈশ্বর, তোমাকে ভালবাসিতে এবং তোমার কোন কাজের উপযুক্ত হইতে আমাকে সাহায্য কর।"

কি সরল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ধর্ম্মভাব! স্বামীর প্রতি যে ভালবাসা, তাহাকেও সংযত করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা! নারীর সরল চিত্ত ভক্তিতে আর্দ্র হইলে, সে হৃদয়ে কিরূপ নির্ম্মল ও নিঃস্বার্থ ভাব বিকশিত হয়, তাহাও এই ডায়েরী পড়িয়া বুঝিতেছি।

কিন্তু হায়, এত করিয়া যাঁহার গুণের কথা বর্ণনা করিতেছি, দুরন্ত ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ১৯০১ সালের ২৮শে নবেম্বর বেলা সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ তাঁহার পেটে ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হইল। কলিকাতার ডাক্তারেরা আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সরলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত বেদনা সহ্য করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

সরলার মৃত্যুর পর অনেক পুরুষ ও মহিলা দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্বামীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "মেসেঞ্জার" ও "তত্ত্বকৌমুদী" তাঁহার মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ১৮২৩ শকের ১লা পৌষের "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকা হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি:—

"তিনি সুগৃহিণী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন। সমাজের ও দেশের সেবা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি মেসেঞ্জার পত্রিকাতে সময় সময় লিখিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে অনেক আশা ছিল।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

মিলন।

(১)

লণ্ডন সহরের প্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সোমার্স পরিবারের বাস। সোমার্সদম্পতি ও তাঁহাদের একমাত্র পুত্র জর্জ্জকে লইয়া এই পরিবার। তাঁহাদের কুটীরখানি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জর্জ্জের পিতামাতা বৃদ্ধ হইয়াছেন সুতরাং তাহার উপরই এই পরিবারের ভার অর্পিত। তাহাদের কুটীরের সম্মুখে এক

টুক্‌রা জমি আছে, জর্জ্জ নিজের হাতে তাহাতে নানা প্রকার ফলমূলের গাছ ও শাকসবজী রোপন করে; আর সেই গ্রামের অধিবাসীদের নানাপ্রকার কাজ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতেই তাহাদের তিন জনের বেশ সচ্ছন্দেই চলিয়া যায়। শুধু অর্থ থাকিলেই মানুষ সুখী হয় না। মনের প্রকৃত শান্তি থাকিলে সামান্য অবস্থায়ও মানুষ সুখী হয়। এই সোমার্স পরিবার তাহার দৃষ্টান্ত। তাহাদের ঐশ্বর্য্য নাই, কায়িক পরিশ্রমে দিন কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাদের যে ধন আছে অনেক রাজা মহারাজার ঘরেও তাহা পাওয়া যায় না। সেই অমূল্য ধন—মনের শান্তি।

জর্জ্জের বয়ক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর। তাহার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, উন্নত ললাট, সুদৃঢ় বাহুযুগল ও বিশাল বক্ষঃস্থলের অন্তরালে একটি কোমল, সুন্দর, সহানুভূতিপূর্ণ প্রাণ পরের দুঃখ মোচনে সতত তৎপর রহিয়াছে। এই বলিষ্ঠদেহ তরুণ যুবক গ্রামবাসী সকলেরই পরম স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি রবিবার প্রাতে দেখা যায়, যুবক জর্জ্জ ধর্ম্মপুস্তক লইয়া বৃদ্ধ জনক জননীর হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে গির্জ্জা অভিমুখে চলিয়াছে। গ্রামখানির অবারিত প্রাকৃতিক দৃশ্য এই পুণ্যপ্রভাতে তাহার নিকট বড়ই মনোরম বোধ হয়। সেই রমণীয়তার মধ্যে ভগবানের অদ্ভুত লীলা দেখিয়া তাহার প্রাণ বিশ্বজননীর চরণে লুটাইয়া বলিয়া উঠে—'ধন্য, তুমি ধন্য!'

(২)

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে ;—এই শান্তিময় পরিবারে এইবার বুঝি অশান্তির সূচনা হইল! দুর্ভিক্ষে দেশ ছাইয়া পড়িয়াছে। জর্জ্জ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অন্নের সংস্থান করিতে পারে না। সে ত একা নয়, তাহার উপর বৃদ্ধ জনকজননীর ভার। অনেক ঘুরিয়া সে একখানি জাহাজে কাজ লইল; সারা দিন সেখানে কাজ করে, সন্ধ্যার সময় বাটীতে ফিরিয়া আসে, তবু তাহার মুখে অসন্তোষের রেখামাত্র নাই। নিজের অন্নের অর্দ্ধেক বিতরণ করিয়া যখন সে আহার করিতে বসে, সে অন্ন তাহার নিকট কি মিষ্ট! সে ভাবে, আহা! আজ একজনকেও ত আহার দিতে পারিয়াছি!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়—আজ জর্জ্জ কোথায়? অন্য দিন ঠিক সন্ধ্যার সময়ই সে ধীরে ধীরে তাহাদের কুটীরের প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া গৃহের বারাণ্ডায় আসিয়া জননীকে আলিঙ্গন করিত—কর্ম্মক্লান্ত দেহের সকল অবসাদ স্নেহময়ী জননীর প্রীতিচুম্বনে দূর করিত। বৃদ্ধ জনক কম্পিত চরণে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া প্রার্থনা করিতেন, "ভগবান ইহার মঙ্গল কর।" কিন্তু আজ সে কোথায়? বৃদ্ধা জননী সেই পূর্ব্বেরই মতন একখানি পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয় লইযা পুত্রের আশায় বসিয়া আছেন, বৃদ্ধ জনক অন্য দিনেরই মতন গৃহের ভিতরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু জর্জ্জ ত আজ আসিতেছে না! সোমার্স দম্পতি পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় ক্রমেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন। কি করিবেন, এই বিপদে প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই যে তাঁহাদের সম্বল নাই। তাই অনাহারে অনিদ্রায় ব্যাকুল প্রার্থনায় তাঁহাদের অন্ধকার রাত্রি প্রভাত হইল। শান্তিময় পরিবারে অশান্তির প্রথম রাত্রি কাটিল!

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; আজ সারা গ্রামখানি ভরিয়া এ কি ভীষণ সংবাদ!—জাহাজখানি গত কল্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভীষণ জলদস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোন্ অকূলে ভাসিয়া গিয়াছে; স্থিরতা নাই। জর্জ্জের জন্য সকল প্রতিবেশীদের প্রাণ আজ বেদনা অনুভব করিতেছে। কে সাহস করিয়া এই পুত্রপ্রাণ সোমার্স দম্পতির নিকট এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিবে! আহা! তাঁহাদের অন্ধের যষ্ঠি, নয়নের মণির সংবাদ পাইবার জন্য তাঁহারা যে আশা পথপানে তাকাইয়া আছেন! কে এমন পাষণ্ড যে তাঁহাদের নিকট বলিয়া আসিবে, "ওগো তোমরা আজ চক্ষু হারাইয়াছ!" জল দস্যুগণ কাহারও প্রাণ রক্ষা করে না, তাহা সকলেরই জানা আছে, তবে কোন্ আশার বাণী আর তাঁহাদের শুনাইবে! অবশেষে তাহারা একখানি সংবাদপত্র বৃদ্ধের নিকট পাঠাইয়া দিল। প্রথমেই বৃদ্ধ পড়িলেন, "জলদস্যুগণ গত কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে—জাহাজখানি আক্রমণ ও অধিকার করিয়া অকূলে ভাসাইয়া দিয়াছে। হতভাগ্য আক্রান্ত ব্যক্তিগণের ভাগ্যে যাহা আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।" বৃদ্ধ অনেকক্ষণ

নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন সমস্ত জগতে এক খানি অন্ধকারের আবরণ ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। যখন সমস্ত অন্ধকার হইল তখন তাঁহার চক্ষু আপনাপনিই বন্ধ হইল—"হায় ধর্ম্ম!" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ সোমার্স মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন—জন্মের মতন তাঁহার আত্মা ইহসংসার ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেল। আজ বৃদ্ধার নিকট অশান্তির দ্বিতীয় রাত্রি আসিতেছে! আজ তাঁহার সকল জ্বালা সকল বেদনা একা সহিতে হইবে, কালও রাত্রে স্বামীর সহিত মিলিয়া দুঃখের বোঝা বহিয়াছিলেন, আজ রাত্রে শূন্য হৃদয় খানি একা একাই হু হু করিয়া জ্বলিবে, কেহ নাই, আজ তাঁহার সংসারে কেহ নাই! অনাথিনী বিধবা আজ একা।

(৩)

দিন যায়, রাত্রি যায়, সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সকলের বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া সে চলিয়া যায়। কাহারও নিকট সে অনুভূতই হয় না, আবার কাহারও নিকট সময় বিষম বোঝা। সুখের সাগরে যে ভাসিতেছে সময় তাহার কাছে নিঃশব্দে চলিয়া যায়; দুঃখের বেদনা সহিয়া সহিয়া যাহার দিন কাটিতেছে সময় তাঁহার কাছে বড়ই ভারবহ। যে প্রকারেই হউক দিন সকলেরই যায়। বৃদ্ধারও দিন কাটিতেছে। সংসারের প্রাণ-প্রিয় ধন হারাইয়া তিনি এখন সেই চিরবন্ধুর শরণ লইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতিবাসীগণ দয়া করিয়া তাঁহার আহার যোগাইয়া থাকে। আজ রবিবার; গত সপ্তাহের প্রাতঃকালের কথা বৃদ্ধার মনে হইতেছে। সে দিন কত সুখে কত শান্তিতে পতিপুত্রের সহিত গির্জ্জায় গিয়াছিলেন, আর আজ অন্তর-ভরা বেদনা লইয়া, কম্পিত দেহে সেই গির্জ্জার পথ বাহিয়া তিনি চলিয়াছেন, কেহ ত তাঁহাকে যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে না! স্বামীপুত্রের স্মৃতি আজ তাঁহাকে বড়ই ব্যাকুল করিয়াছে। বৃদ্ধা গির্জ্জায় বসিয়াছেন; আজ গির্জ্জায় অনেক লোক আসিয়াছেন, সকলেই প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু ঐ ভগ্নপ্রাণা রমণীর অন্তরের মর্ম্মস্থল হইতে যে করুণ প্রার্থনা ধ্বনিত হইতেছে তাহার ন্যায় সরল প্রার্থনা কি কেহ করিতেছেন?—নিশ্চয়ই না। তাঁহার মুখ দেখ, কি সুন্দর ভাবাবেগে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছে! দেখ আর একটি প্রাণ কি এমন একাগ্র হইয়া যুক্তকরে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছে?

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, জননীর শোকজ্বালা কিছু পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু সময় সময় আবার জ্বলিয়া উঠে। আজ রবিবারে প্রাতে তিনি গির্জ্জায় গিয়াছিলেন। এখন অপরাহ্নে কুটীরের সম্মুখে বারাণ্ডায় চক্ষু মুদিয়া বসিয়া অতীতের কথা ভাবিতেছেন। হঠাৎ একি! কাহার সুখস্পর্শে, কাহার কোমল আহ্বান ধ্বনিতে তাঁহার সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! বৃদ্ধা আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, এ যে তাঁহারই অন্তরের ধন, তাঁহার কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে! প্রবল জলদস্যুর হাতে পড়িয়া জর্জ্জ জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের অনুনয় বিনয় করিয়া সে তাহাদের দাস হইয়াছিল। তাহারা তাহাকে প্রাণে মারে নাই, কিন্তু কঠিন অত্যাচারে জীবনে মারিয়া রাখিয়াছিল, অতিরিক্ত অত্যাচার জর্জ্জের দেহ সহিতে পারে নাই। অবশেষে দুরন্ত যক্ষ্মাকাশ তাহার দেহ অধিকার করিয়া প্রতি ক্ষণে তাহাকে মরণের পথে চালিত করিতেছিল। সে ত মরিবেই, এই ভাবিয়া প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিযোগে একখানি জীবনতরী (Life boat) লইয়া সে পলাইয়া আসিয়াছে। তার বড় সাধ ছিল বাল্যলীলাভূমি তাহার প্রাণের জন্মভূমিতে দেহভার ত্যাগ কবিবে, তাই সে তাহার জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ করিবার জন্য আজ প্রেমময়ী জননীর চরণ-তলে উপস্থিত!

পুত্রের কঙ্কালের ন্যায় চেহারা দেখিয়া জননীর প্রাণ আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিল! তিনি তাহাকে ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর লইয়া জীর্ণ শয্যায় শয়ন করাইলেন। নিজে পুত্রের শিয়রে বসিয়া তাহার জ্বরতপ্ত কপোলে হস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীগণ সংবাদ পাইয়া জর্জ্জকে দেখিতে আসিতে লাগিল। কিন্তু কি দেখিতে পাইল?—জীবনপ্রদীপ প্রায় নির্ব্বাপিত।

এই অবস্থায় সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ রবিবার; প্রাতঃকালে দলে দলে লোক গির্জ্জায় চলিয়াছে। জর্জ্জ ডাকিল, "মা!" জননী উত্তর দিলেন, "কেন বাবা!"

"মা, গির্জ্জায় চল!" মা কহিলেন, "বাবা, তোমার অসুখ সারিলে যাইব।" জর্জ্জ একটু হাসিল, সে হাসি ত পৃথিবীর নয়! সে হাসি জননীর ধমনীতে ধমনীতে তড়িৎ প্রবাহ ছুটাইয়া দিল,—তিনি বুঝিলেন, পুত্র চলিয়াছে— তাহার সাধের গির্জ্জায় চলিয়াছে! জর্জ্জ কহিল, "মা, আমার বুকের উপর একবার হাত রাখ।" মাতা হাত রাখিলেন; জর্জ্জ মাতার হস্ত বুকে চাপিয়া ধরিয়া প্রার্থনা করিল, "হে প্রভু, আমাকে ডাকিয়াছ, আমি যাইতেছি, আমার এ অভাগিনী জননীকেও লইয়া চল। স্বর্গে আমাদের জন্য শান্তি-কুটীর রচনা কর, যেখানে আমাদের তিন জনের পরমসুখের মিলন হইবে।" তারপর ধীরে ধীরে তাহার অন্তিম শ্বাসটুকু বহিল, বহিয়া অনন্তশূন্যের কোন্‌খানে মিলাইয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল না।

প্রতিবাসীগণ আজ জর্জ্জের পবিত্র দেহখানি লইয়া সৎকার করিতে চলিল, সঙ্গে চলিলেন বৃদ্ধা জননী। আজ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে এমন কেহ নাই। আজ তিনি গম্ভীরভাবে সমস্ত প্রাণ খুলিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন :—

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।"

পুত্রের দেহ কবরস্থ হইয়াছে, বৃদ্ধা হাটুগাড়িয়া কবরের উপর বসিয়া প্রার্থনা ও গান করিতেছেন, কাহারও ক্ষমতা নাই তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া লয়। ক্রমে সকলে ফিরিয়া যাইতে লাগিল, কেবল দুইটী প্রতিবাসী দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে সান্ধ্যসূর্য্য পশ্চিমগগণে চলিয়া পড়িলেন। কর্ম্মক্লান্ত মানুষ বিশ্রাম আশায় পথবাহিয়া গৃহপানে চলিতেছে, তখন বৃদ্ধাও চির-বিশ্রামের আশায় অতিকষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাহিতেছেন :—

"পরিশ্রান্ত জনে প্রভু লয়ে যাও সংসার-সাগর পারে"—

গাহিতে গাহিতে তাঁহার আত্মাও ধীরে ধীরে সংসার-সাগর-পারে চলিয়া গেল।—প্রাণপ্রিয় পতি ও পুত্র অগ্রে গিয়া যেখানে শান্তি-কুটীর রচনা করিয়াছেন চির-বাঞ্ছিতদ্বয়ের সহিত চির-মিলনে মিলিত হইতে তিনিও সেখানে চলিয়া গেলেন।

শ্রীস্নেহমলিনী বসু।

তোমার প্রেম।

শোনালে আমায় তুমি অপূর্ব্ব ভারতী,
দেখালে তোমার প্রেম অনিন্দ্য মূরতি,
যার জ্যোতি মোর প্রতি চিরস্থির রয়,
সুখে দুখে সমভাবে হয়ে শান্তিময়,
লয়ে যায় ঊর্দ্ধপথে শুভ্ররথে মোরে,
মুহূর্ত্ত রাখে না ফেলি অন্ধকার ঘোরে,
যুক্ত করে তোমাসাথে, মুক্ত করে প্রাণ।
ব্যক্ত করে অমৃতের নিবিড় সন্ধান।
জানায় সবার মাঝে তুমি একেশ্বর,
পূর্ণ করি আছ ভরি ধরিত্রী অম্বর।
বিরাজিছ শূন্য মাঝে তুমি হে একাকী,
নিশিদিন মেলি এক নির্নিমেষ আঁখি।
একাকী তুমিহে সর্ব্ব রহস্য আধার
জাগিছে তোমার প্রেমে আনন্দ অপার।

শ্রীহেমলতা দেবী।

স্বর্গীয় রামদুর্ল্লভ মজুমদার। *

(অ.স্থশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পঠিত)

অনুমান ১২৫৫ বঙ্গাব্দে, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাহেতগ্রাম নামক পল্লীতে পিতৃদেব জন্মগ্রহণ করেন। আমার পিতামহেরা তিন ভাই ছিলেন, পিতৃদেব সেই পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। সুখের বিষয়, এই অত্যাদরে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

এখনকার মত তখন লেখা পড়া শিক্ষার সুবিধা ছিল না, উচ্চশিক্ষা কলিকাতা ও বড় বড় সহরের আশে পাশেই আবদ্ধ ছিল। ময়মনসিংহের এই সুদূর পল্লীতে

* সম্পাদিকার পারিবারিক ঘটনার সহিত পাঠকপাঠিকার সম্বন্ধ যৎসামান্য। কিন্তু আমার পিতৃদেব একজন আদর্শ-চরিত্র মানুষ ছিলেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী পাঠকপাঠিকাগণের অপ্রীতিকর হইবে না মনে করিয়া তাহা ভারত-মহিলায় প্রকাশ করিলাম। ভাঃ মঃ সঃ।

তাহার তরঙ্গ তখনও পৌঁছায় নাই। পিতৃদেব লিখিয়াছেন, "সেই সময় দেশে নূতন শ্রেণীর পাঠশালা বা বিদ্যালয় ছিল না, জমিদারী ও মহাজনী হিসাবপত্র রাখিতে জানাই শিক্ষা বলিয়া পরিচিত ছিল।" নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এবং দেশের শিক্ষার যখন এই দশা, সেই সময়ে বাস করিয়া পিতা যে করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ অবগত হইলেই আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে একজন দৃঢ়ব্রত, নির্ভীক ও আত্মনিষ্ঠ মানুষের চিত্র ভাসিয়া উঠে।

পিতৃদেব জমিদারী সেরেস্তার কাজ কর্ম্ম চালাইবার মত লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া পার্সী পড়িতে আরম্ভ করেন। তৎপর আমার পিসীমাতার বিবাহ উপলক্ষে যখন আমাদের বহু আত্মীয় স্বজন আমাদের বাড়ীতে সম্মিলিত হন তখন তাঁহার ইংরেজী পড়িবার কথা উত্থাপিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি আমার খুল্লপিতামহের বাসাবাড়ীতে থাকিয়া নূতন প্রণালীর বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য ময়মনসিংহ গমন করেন, এবং সদর বঙ্গবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয়ই এখন হার্ডিঞ্জ স্কুল নামে পরিচিত। পিতা আড়াই বৎসর বাঙ্গালা পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তৎকালে আমার বিদ্যাশিক্ষার স্পৃহা অতীব প্রবল ছিল, পূজার বন্ধের সময় বিদ্যালয়গুলি খুলিবার পূর্ব্বেই আমি বাড়ী হইতে ময়মনসিংহে চলিয়া আসি। ইংরেজী জানা লোক এত বিরল ছিল যে আমাকে Sp lling পড়াইবার লোকও স্কুল বন্ধের সময় পাইলাম না। একজন আফিসে এপ্রেন্টিস ছিলেন, তিনি মাত্র ইংরেজী অক্ষর কয়টা লিখিয়া দিলেন। আমি তাহা দেখিয়াই অক্ষর পড়িতে ও লিখিতে আরম্ভ করিলাম।"

বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি ময়মনসিংহ জিলাস্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সমগ্র হৃদয় মন অধ্যয়নে নিয়োগ করিয়া পাঁচ বৎসর মাত্র ইংরেজী পড়িয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি লাভ করেন।

ইংরেজীস্কুলে অধ্যয়ন সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন মহাশয় বাবার সমপাঠী ছিলেন। বাবা লিখিয়াছেন, "তিনি স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের আত্মীয় ও তাঁহার বাসায় থাকিতেন, সেই উপলক্ষে স্বর্গীয় মহাত্মার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং ব্রাহ্মসমাজের কথাও শুনিতে পাই। তখন ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় রবিবার প্রাতে সমাজের কার্য্য হইত। সঙ্গীত হইত এবং আদিসমাজের পুস্তক হইতে আরাধনা ও প্রার্থনা পঠিত হইত। সেই সময় ছাত্রদিগের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য "মনোরঞ্জিকা" নামে ইংরেজী স্কুলে একটী সভা ছিল। সেই সভাতে স্কুলের উর্দ্ধতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রগণ সভ্য হইতে পারিতেন এবং সভাতে আসা যাওয়াতে ছাত্রদিগের মধ্যে পরস্পর একটা সৌহার্দ্দ-বন্ধন হইত। সভাতে রচনা পাঠ ও বক্তৃতা হইত। চরিত্র গঠন বিষয়ে সভার খুব শক্তি ছিল, শিক্ষকেরা এই সভার সভ্যদিগকে চরিত্রবান বলিয়া জানিতেন। আমার মনে আছে, এক বৎসর স্কুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সচ্চরিত্র যে ছাত্র, তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে স্থির হইল, এবং পুরস্কারের উপযুক্ত ছাত্র মনোনয়নের ভার মনোরঞ্জিকা সভার সভ্যদিগকে দেওয়া হইল, এবং তাঁহারা যাঁহাকে মনোনীত করিলেন তিনিই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন। ঐ সভার অধিবেশন রবিবারে হইত এবং একটী প্রার্থনা পাঠ করিয়া কার্য্যারম্ভ হইত।" পিতা এই মনোরঞ্জিকা সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এবং তদ্দ্বারা চরিত্রগঠনে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

তৎপর ঢাকায় আসিয়া বাবা ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আর্ম্মাণীটোলার বাড়ীতে হইত, বাবা এখানেও যোগ দিতে আরম্ভ করেন। ঢাকা কলেজ হইতে এফ, এ, পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পড়িতে যান। সেই বৎসরে একটী কুলীনকন্যাকে তাঁহার কয়েকটী আত্মীয় হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজে নিয়া আসাতে হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। কন্যার হিন্দু আত্মীয়বর্গ আদালতের আশ্রয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন, সেই আন্দোলনে পিতৃদেব বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত সংস্কারকগণের দলভুক্ত হন ও তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করেন।

এইরূপে উত্তরোত্তর ব্রাহ্মসমাজে যাতায়ত করা ও তাহার পক্ষপাতী হওয়াতে পিতামহদেব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ; কিন্তু পিতৃদেব ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ ছিন্ন করিতে সম্মত হইলেন না, বরং ইহাতেই জীবনের ভবিষ্যৎ আদর্শের আভাস পাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাহার ফলে তাঁহাকে কিছু দিন অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্রও বিচলিত হন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ যে তাঁহার কত প্রিয় ছিল তাহা তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা বিশেষরূপে জানেন।

বি, এ, পাশ করিয়া পিতৃদেব জলপাইগুড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার চাকুরী-জীবন আশ্চর্য্য সাহসের সুন্দর পরিচয় প্রদান করে। জলপাইগুড়ি সে সময়ে নিতান্ত দুর্গম স্থান ছিল, গোযানে যাতায়াত করিতে হইত, এবং পথও স্থানে স্থানে শ্বাপদসঙ্কুল ছিল। অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হন। পুনঃ পুনঃ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি সেখানকার কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং দেওঘর হাইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তখন বৈদ্যনাথ দেওঘর রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই। দার্জ্জিলিং হাইস্কুলের শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেওঘর স্কুল পরিত্যাগ করেন। তখন দার্জ্জিলিং রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। কিছুকাল দার্জ্জিলিংএ কর্ম্ম করিয়া তিনি আসাম গোয়ালপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

দার্জ্জিলিং স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় পিতৃদেব বিবাহ করেন। তাঁহার গোয়ালপাড়া অবস্থানকালে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্ম হয়। দিদির বয়স যখন সবে আট দিন তখন বাবাকে বদলী হইয়া তেজপুর যাইতে হয়। এই সময়ে জননীদেবী ও শিশু কন্যাকে লইয়া মাল-জাহাজে ১৫ দিনের পথ যাওয়া বিপদসঙ্কুল বলিয়া বাবা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তেজপুর গমন কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিতে আবেদন করিলেন, কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হইল না। এই ঘটনায় চাকুরীতে পরাধীনতার ক্লেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া তিনি এই সময় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। বিনা পরীক্ষায়ই সে সময়ে ঐ অঞ্চলে কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ওকালতী করিতে দেওয়া হইয়াছিল। সে সময় নওগাঁ সহরে ব্রাহ্মদিগের একটী পরিপুষ্ট মণ্ডলী ছিল। স্বর্গীয় গুণাভিরাম বড়ুয়া, পদ্মহাঁস গোস্বামী, শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্ত প্রভৃতি প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মগণ তখন নওগাঁ বাস করিতেন। তাঁহাদের আকর্ষণে পিতৃদেব তেজপুর পরিত্যাগ করিয়া নওগাঁয় ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ওকালতী আরম্ভ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, পরীক্ষা পাশ না করিলে বি, এল, পাশ-করা উকীলদিগের পশ্চাতে পড়িতে হয়, এজন্য তিনি আবার ঢাকায় আসিয়া Law class-এ ভর্ত্তি হন এবং বি. এল, পাশ করেন।

নওগাঁই পিতৃদেবের জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। ৩০ বৎসরের অধিক কাল তিনি সেখানে বাস করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘকালে নওগাঁ তাঁহার অস্তিত্বের সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছিল। তিনি আট বৎসর কাল একাদিক্রমে সহরের মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন। সহরের বাহ্য সৌষ্ঠব অণুতে অণুতে পিতৃদেবের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিতেছে। সহরে কোন সদনুষ্ঠান, কোন মহৎকার্য্যের প্রারম্ভে সকলেই সর্ব্বাগ্রে পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিত। তিনি দীন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, কত অসহায় লোক তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য, পরামর্শের সাহায্য, ব্যবহারাজীবের সাহায্য পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কঠিন বিপদে পড়িলে লোকে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট বিপদের কথা বলিয়াই যেন মনে করিত, অর্দ্ধেক বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। জীবনে এরূপ ঘটনা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাইয়াছি। তিনি এখানে যখন রোগ-শয্যায় শায়িত, তখনও কত লোক কত প্রকারের বিপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছে ; সে শুধু আর্থিক সাহায্য নহে, পুত্র পিতার নিকট, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের নিকট যেমন সকল বিষয়েই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার নিকট সহর ও মফঃস্বলের বহু লোক সেইরূপ চিঠি লিখিয়াছে। পিতৃদেবের মৃত্যুতে শুধু আমরাই পিতৃহীন হই নাই, ভদ্র ইতর বহু লোক আপনাদিগকে পিতৃহীন মনে করিয়া হায় হায় করিতেছে। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ টেলিগ্রামে নওগাঁ পৌঁছিলে ডেপুটী

কমিশনার সেদিনের মত কাছারী বন্ধ করেন এবং প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন। সহরবাসী জনসাধারণ এক শোক-সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করেন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, নওগাঁতে এমন সর্ব্বব্যাপী শোক আর কখনও দেখা যায় নাই।

মহৎ জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব এইখানে যে তাহা আপনাতে আবদ্ধ না থাকিয়া নিজের বাহিরে সমস্ত বিশ্বে আপনাকে বিলাইয়া দেয়। পিতৃদেবের এই গুণটী বিশেষ-ভাবে ছিল। পরের হিতের জন্য নিজের সুখদুঃখ লাভক্ষতি তিনি কিছুই দেখিতেন না। অর্থ সকলেই উপার্জ্জন করে, কিন্তু অর্থের প্রকৃত ব্যবহার সকলে জানে না। তাঁহার অন্তর অতি উদার, অতি উন্নত ছিল, তিনি জীবনে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং সেই অর্থ দুঃস্থ ও বিপন্ন লোকের সাহায্যে অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। বনফুল যেমন নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া আপনার সুগন্ধ বিতরণ করে, পিতৃদেবও সেইরূপ নীরবে আপনার চরিত্র-সুগন্ধ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় যে কত প্রশস্ত ছিল, অপরের সাহায্য ও উপকারের জন্য তিনি সর্ব্বদাই কিরূপ প্রস্তুত থাকিতেন, আসামস্থ বন্ধুগণ তাহা বিশেষ অবগত আছেন। পিতা ওকালতী ব্যবসায় করিতেন, কিন্তু তিনি অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সকল সময়েই যাহারা বিপন্ন, দীন দুঃখী, বিনা অর্থে অথবা তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সামান্য অর্থ লইয়া তাহাদের পক্ষই সমর্থন করিতেন। পিতা আপন মহৎ হৃদয়ের গুণে নওগাঁবাসী সকলের, এমন কি প্রায় সমস্ত আসামের লোকের হৃদয়ে অতি উচ্চ আসন পাইয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার সুবিবেচনা সঙ্গত যুক্তিযুক্ত পরামর্শ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। পিতা বিভবশালী লোক ছিলেন না, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাও ছিল না, তিনি শুধু সত্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও হৃদয়ের মহত্বের গুণে জনসাধারণের ও রাজপুরুষগণের হৃদয়ে এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

স্বাবলম্বন তাঁহার চরিত্রের আর একটী বিশেষত্ব। এমন আত্মনির্ভরপরায়ণতা সাধারণ মনুষ্যের ভিতরে সচরাচর দেখা যায় না।

পিতৃদেবের হৃদয় সমুদ্রের ন্যায় গভীর ছিল, কিন্তু এমন নিস্তরঙ্গ, ভাবে পরিপূর্ণ অথচ ভাবের বহিঃপ্রকাশ-বিহীন হৃদয় আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। যাঁহারা অল্পদিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার আভ্যন্তরীণ পরিচয় কিছুতেই ভাল করিয়া পাইতেন না। অন্তঃসলিলা ফল্গু যেমন লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হয়, তেমনি তাঁহার গভীর হৃদয়ের উন্নত ভাবসমূহ আপন অন্তরেই প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কাজ করিত। কোন দুর্ব্বহ চিন্তা কখনও তাঁহাকে বিচলিত করিত না, কোন দুঃখে কখনও তিনি আকুল হইতেন না। আমার পিতামাতার মধ্যে যেমন গভীর দাম্পত্য-প্রেম বিদ্যমান ছিল এমন সচরাচর দেখিতে পাই না। জননী দেবী বহুদিন রোগ-শয্যায় পড়িয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া গিয়াছেন, মাতার ন্যায় যত্নে বাবা দীর্ঘকাল আমার জননীর সেবা করিয়াছেন। কিন্তু যখন মা পরলোক গমন করেন তখনও তিনি স্থির প্রশান্ত, যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই! শুধু নীরবে দুফোঁটা অশ্রুপাত করিয়াছেন মাত্র। কোনও সুখে বা আনন্দে তিনি উচ্ছ্বসিত হইতেন না। তাঁহার গম্ভীর প্রশান্ত হৃদয়ের ছবি কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া ভীতকে অভয় ও দুঃখীকে সান্ত্বনা দান করিত। কত বিপন্ন কুলি তাঁহার দয়ায় বিপন্মুক্ত হইয়াছে, কত দরিদ্র নিরপরাধ লোক তাঁহার নিঃস্বার্থ সাহায্যে মুক্তিলাভ করিয়া দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, মুক্ত হস্তে তিনি তাহা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে অর্থ সাধারণতঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী উপযুক্ত পাত্রেরাই পাইত। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও অশিক্ষিত বহুল রক্ষণশীল স্বগ্রামবাসীগণ তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত—তাহার কারণ, তিনি সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাহাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং প্রয়োজন মত আত্মীয়স্বজনকে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার অর্থ সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আজ কাল অনেকেই উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছে। গ্রামস্থ অনেকেই তাঁহার অর্থ সাহায্য চাহিয়াছে, তিনি সর্ব্বদাই সানন্দে

তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। জননী দেবীর স্মৃত্যর্থে প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া তিনি স্বগ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে জননী দেবীর নামে যে স্থায়ী ফণ্ড করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ আসামেরই জন্য। লোক-দেখান দান তাঁহার ছিল না, হৃদয়ে যাহা ভাল করিয়া অনুভব করিতেন, তিনি সেই বিষয়েই দান করিতেন, ইহাতেই দানের প্রকৃত সার্থকতা। তাঁহার এই প্রকার দানশীলতা কাগজে পত্রে উঠিত না, লোকেও খুব কম জানিত, কিন্তু তাঁহার হৃদয় ইহাতেই চরিতার্থ হইত। দাতা সমবেদনার অশ্রু মোচন করিতে করিতে যে অর্থ দান করেন লোকে না জানিলেও ভগবানের নিকট তাহাই শ্রেষ্ঠ দান।

তাঁহার যে কি অসীম ধৈর্য্য ছিল, তাহা যে দেখিয়াছে সেই অবাক্ হইয়াছে। প্রায় বিশ বৎসর কাল তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিয়াছেন। দুরন্ত ব্যাধি তিল তিল করিয়া তাঁহার শরীর ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছিল। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে তাঁহার ৩।৪টা কার্ব্বঙ্কল জাতীয় ফোড়া হইত ও তাহার সবগুলিতেই অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে হইত। কোন কোনটা ২।৩ বার পর্য্যন্তও অস্ত্র করিতে হইয়াছে। বাবা যে কি শান্তভাবে সে যন্ত্রণা সহ্য করিতেন, ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন। এত অসুখ, এত যন্ত্রণা সত্বেও তিনি কখনও আপন কর্ম্মে বিরত হন নাই, এমনই কর্ম্মশীল জীবন তাঁহার ছিল যে কিছুতেই তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। অবশেষে ১৯০৯ সনের জানুয়ারী মাসে রোগ ভীষণতর আকার ধারণ করিল। এমন যে তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি তাহা ম্লান হইয়া গেল, মস্তিষ্ক একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল, শরীর ক্রমেই অধিকতর জীর্ণ ও অশক্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তিনি শারীরিক গ্লানি অপেক্ষা কার্য্যের অভাবেই অধিক কষ্ট অনুভব করিয়াছেন। এ সংসারে কোন কাজ করিবার শক্তি যখন রহিল না তখন পরলোকে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রবাস হইতে গৃহে যাইবার সময় যেমন ব্যাকুল আগ্রহ জন্মে ঠিক সেই ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৯১০ সনের ১০ই আগষ্ট বুধবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় ঢাকা নগরীতে তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমপিতার শান্তি-ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিল।

উপযুক্ত বয়সে পিতা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করিবার কিছুই নাই, কিন্তু এমন পিতা হারাইয়াছি বলিয়াই শোক সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সংসারে তাঁহার প্রায় কোন সাধই অপূর্ণ রহে নাই, কোন কর্ত্তব্য তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান নাই। সংসারে কয়জন লোকের পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব হয়? সুতরাং বলিতে পারি, তিনি ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। পিতা পরমপিতার ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন, এখন প্রার্থনা এই ঃ—পিতার উপযুক্ত সন্তান যেন হইতে পারি।

হে পরম দেবতা, আমার পিতাকে এ সংসারে হারাইয়াছি, কিন্তু তোমাতে যেন তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাই। তোমাতে বাস করিয়া তিনি দিনে দিনে তোমারই চরিত্র তোমারই প্রকৃতি লাভ করিতেছেন। এখন আমার নিকট পিতা যাহা চাহেন, স্বর্গীয়া জননী যাহা চাহিতেছেন, তাহা আর তুমি যাহা চাও তাহা অভিন্ন হইয়া যাইতেছে। আশীর্ব্বাদ কর, তোমাদের তৃপ্তিসাধন যেন আমার জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সংসারে আমার কোন কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে না। প্রতিদিন তোমার মধ্যে জনকজননীকে যেন দেখিতে পাই, তাঁহারা এখন স্বর্গের দেবতা, দেবজীবন লাভ করিয়া তাঁহাদের উপযুক্ত সন্তান যেন ইহলোকেই হইতে পারি। পিতার জন্য আর কি প্রার্থনা করিব, তিনি তোমারই বুকের ধন, তোমার বুকে তাঁহাকে রক্ষা কর।

গুজরাতে দিওয়ালী উৎসব ও গরবা গান।

বাংলার যেমন শারদীয় উৎসব,—মহারাষ্ট্রে তেমনি গণপতি-উৎসব এবং গুজরাষ্ট্রে দিওয়ালী-উৎসব সর্ব্বপ্রধান ; এই উৎসব উপলক্ষে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতে খুব আনন্দ ও উৎসাহের স্রোত পরিলক্ষিত হয় ;

কিন্তু ইহা বাংলার শারদীয়-উৎসবের সমশ্রেণীস্থ হইলেও সমতুল্য নয়; তবে আড়ম্বরের আধিক্য না থাকিলেও আনন্দের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই।

দিওয়ালী বাংলাদেশের দীপান্বিতা-উৎসবের নাম; এ দেশীয় বর্ণপ্রকরণে কথাটা হয়, দিবালী। শব্দপ্রকরণে অন্তস্থ ব'এর উচ্চারণ 'ওয়া' বলিয়া ইহার উচ্চারণ "দিওয়ালী" হইয়াছে। দিওয়ালীর উজ্জ্বল দীপশিখা-উদ্ভাসিত দৃশ্য গরবার সুন্দর নৃত্য গীতে মুখরিত করিয়া বড় সুন্দর ও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে।

দিওয়ালী যেমন গুজরাত-আনন্দের সম্মিলিত অভিব্যক্তি, গরবা গানও গুজরাতের স্বাধীন রমণীগণের তেমন হৃদয়াভরণ। গরবা গান প্রত্যেক গুজরাত রমণীর জীবন-সহচর। ক্ষুদ্র বালিকা হইতে বৃদ্ধা সকলেই এই গরবা নৃত্যগানে অভ্যস্ত ও অনুপ্রাণিত। পথে, ঘাটে, দেবমন্দির-প্রাঙ্গণে সর্ব্বত্র গরবা গানের চক্রমণ্ডল। রমণীর পায়ে রুনুঝুনু নূপুর বাজিতেছে, হেলিয়া দুলিয়া করতালি দিতে দিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গরবা গান গাইতেছে। সকল হাতের করতালি এক সঙ্গে বাজিতেছে, প্রতি চরণক্ষেপে গানের মধুময় লয় হ্রস্ব দীর্ঘ অনুসারে ঝঙ্কৃত হইতেছে। দিওয়ালী উৎসবের সময় গরবা গানের সমধিক প্রাবল্য দেখা যায়। গরবা গান বার মাসই উৎসব-আনন্দে পূজা-পার্ব্বণে বিশ্রাম-বিলাসে সঙ্গীত হইয়া থাকে। দিওয়ালী উৎসব তিন দিন স্থায়ী হয়। সন্ধ্যা-আগমনীর কালিমা-আবরণ মুছাইয়া দিয়া দিওয়ালীর দীপ্ত দীপশিখা-সমুজ্জ্বল আনন্দ-বিহ্বল উৎসব-মহিমা নগরপল্লীর প্রতি ঘরে ঘরে ফুটিয়া উঠে। সারা রজনী ভরিয়াই দিওয়ালীর আনন্দ-হিল্লোল ধ্বনিত হয়। তিন দিন ভরিয়া গুজরাতের সর্ব্বত্র আহার বিহার ও ভূষণ বসনের বিশেষ পরিচর্য্যা দেখা যায়। দিওয়ালীর পূর্ব্বে সকলেই নূতন বসন ভূষণ ক্রয় করে; নীল, সবুজ, রক্ত, হরিৎ বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রাস্তা ঘাট আলোকিত করিয়া তোলে। দিওয়ালীর পূর্ব্ব দিন প্রতি বাড়ীর সম্মুখে আলপণা দিয়া থাকে; দিওয়ালীর দিন রাত্রিতে ঘটপূজা হইয়া থাকে। পর দিবস স্ত্রী পুরুষ সকলে মন্দিরে দেব দর্শনে গমন করে। সেই দিন বৈকাল হইতেই পরস্পরের সহিত দেখা শোনা করা, আত্মীয় পরিজনের বাড়ীতে উপহার প্রেরণ ইত্যাদি চলিতে থাকে। দিওয়ালীর সময় প্রায় সকলেই আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে মিষ্টদ্রব্য উপহার প্রেরণ করে। এই দিওয়ালীর সময়ে গুজরাতের জাতীয় অন্তঃকরণে একটা বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের স্রোত দেখা যায়।

ধনী দরিদ্র সকলেই উৎসব-তরঙ্গে ভাসমান হয়। দিওয়ালীর পর শুক্ল একাদশী হইতে দেব-দিওয়ালী আরম্ভ হয় এবং পূর্ণিমা রাত্রে দেব দিওয়ালী পরিসমাপ্ত হয়। এই সময়ও দীপাবলী দ্বারা গৃহ, মন্দির ইত্যাদি সুসজ্জিত করা হয়।

গরবা গানে ধর্ম্মচর্চ্চা, নীতিউপদেশ, সামাজিকচর্চ্চা, প্রকৃতি বর্ণনা, রহস্য-সঙ্গীত প্রভৃতি সকলই থাকে। মীরাবাই রচিত প্রেম-সঙ্গীত ও ভর্ত্তৃহরির ধর্ম্ম-সঙ্গীতই এ দেশে সবিশেষ প্রচলিত। আধুনিক যুগের কবি দলপতরামের কবিতা ও সঙ্গীত, পৌরাণিক কবি নরসিংহ মেহেতা ও প্রেমানন্দের ভক্তিবিষয়ক গান, সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ এমন কি নিরক্ষর কৃষকরমণীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নে মীরাবাই রচিত একটী গান লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

"মহীলেশে মারু মোহনলাল মহীলেশে মারু লাখ
বে লাখনু মাট নন্দাশে শোভিনু সারু।
তমে বনমালী ন করো আলী তমে বহুবারু ফুল
পড়ে তেনি চৌদশ গুম্বে লোক বোলে ঘ্যারো।
মীরা বাই কহে, প্রভু গিরধর না গুণ চরণকমলে বারু।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।
গুজরাত।

সোণামণি।

[বিক্রমপুরের চাঁদরায়ের কন্যা সোণামণিকে দ্বাদশ ভৌমিকের প্রধান ভৌমিক ইশাখাঁ মসনদালি, যেরূপেই হউক নিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, নানা সূত্র হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। সোণামণি যে বাঙ্গালী রমণী ছিলেন, তাহা মনে পড়িলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া

উঠে। নারায়ণগঞ্জের অদূরবর্ত্তী শীতল-লক্ষা নদীর পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থিত সোণাকান্দা নামক স্থান সোণামণির নামের সহিত সংশ্লিষ্ট; সেখানে এখনও একটা দুর্গের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। নিম্নে বিবৃত ঘটনা ১৫৯৮-১৬০০ খৃঃ এর মধ্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। চাঁদরায়ের পুত্র কেদার রায় সোণামণির অগ্রজ ছিলেন।]

১

পড়েছে যুদ্ধে মসনদালি
ইশাখাঁ ভৌমিক বীর,
রাজ্য তাঁহার, ভৌমিক যত
লুটিবে, করিল স্থির ;—
শীতল-লক্ষা দুর্গ প্রাসাদে,
আকুল হইয়া সোণামণি কাঁদে
কিরূপে হইবে রাজ্য রক্ষা
ভাবিয়া হ'ল অধীর ;—
শুনিল যখন পড়েছে যুদ্ধে
ইশাখাঁ ভৌমিক বীর।

২

বার্ত্তাবহ বার্ত্তা লইয়া
কহিল আসিয়া ধেয়ে,
"রণপোত আর শত্রু সৈন্যে
চৌদিক গেছে ছেয়ে ;
ভৌমিক যত আসিয়াছে সাজি,
অগ্রণী তব অগ্রজ আজি,
প্রহরী তোমার অনেক সৈন্য
পালিয়েছে প্রাণ ভয়ে ;"
বার্ত্তাবহ অশুভ বার্ত্তা
কহিল আসিয়া ধেয়ে।

৩

সিংহীর প্রায় বিষম বিপদে
গর্জ্জি উঠিল নারী—
"জীবন থাকিতে স্বামীর রাজ্য
কারেও দিবনা ছাড়ি।"
আঁখি জল দ্রুত মুছিয়া ফেলিয়া
কোষের হতে কৃপাণ লইয়া
জলদ মন্দ্রে সৈন্য সবারে
আদেশে হুহুঙ্কারি,
"রুদ্ধ করহ দুর্গ দুয়ার
রাজ্য দিবনা ছাড়ি!"

৪

শীতল-লক্ষা শান্ত বক্ষে
জাগায়ে প্রতিধ্বনি,
উঠিল ঊর্দ্ধে যুদ্ধ নিনাদ
প্রলয়ের গরজনি।
কাঁপায়ে পৃথ্বী, কাঁপায়ে বিমান
বুম্ বুম্ ডাকে ভৌমিক কামান।
গুরুম্ গুরুম্ বজ্র নিনাদে
উত্তরে সোণামণি ;
স্তব্ধ চকিত, চৌদিকে সকলে
প্রলয় ভীষণ গণি।

৫

এমনি করিয়া বহুদিন ধরে
দুর্গ রক্ষা হয়,
অটল, অচল হিমাচল প্রায়
দুর্গ দাঁড়ায়ে রয় ;
খাদ্য যা'ছিল ফুরাইল ক্রমে,
রক্ষীবর্গ দিনে দিনে কমে,
সোণামণি কহে ডাকিয়া সবারে
"মরণ সুনিশ্চয়—
এস সবে তবে একত্র মরিব,
জয় জগদীশ জয়।"

৬

নিজ হাতে বালা দীপ্ত মশাল
তুলিয়া লইল ধীরে,
নিজ হাতে বালা এ ঘর ও ঘর
অগ্নি যুক্ত করে।
হুহু করি শিখা উঠিল জ্বলিয়া
প্রলয় লোলুপ জিহ্বা মেলিয়া,
দেখিতে দেখিতে চৌদিক রাঙ্গিয়া
আরোহিল অম্বরে,

বাঙ্গালী রমণী কীর্ত্তি কাহিনী
জগতে জানাবা' তরে।

৭

রজনী তখন গভীরা, আঁধার
ধরার মাঝারে রাজে—
ঢেউগুলি সব শ্রান্ত শয়ান
শীতল-লক্ষা মাঝে ;
সারাদিন বায়ু বহিয়া বহিয়া,
সন্ধ্যা আগমে পড়েছে ঘুমিয়া,
নিশাচরগণ সময় বুঝিয়া
বাহির হয়েছে কাজে ;
ঢেউগুলি সব শ্রান্ত শয়ান
শীতল-লক্ষা মাঝে।

৮

সহসা বিদারি নৈশ শান্তি
শতেক বজ্রপ্রায়,
ভীষণ শব্দে, ভীম সে দুর্গ
চূর্ণ হইয়া যায়।
সুপ্ত সৈনিক চমকি জাগিল
ত্রস্ত হস্তে অস্ত্র ধরিল—
কোথায় দুর্গ! কোথা সোণামনি ?
কোন স্বরগেতে রাজে ?
কুলু কুলু উঠে রোদনের ধ্বনি
শীতল-লক্ষা মাঝে। *

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

---

* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সোণামণির বিষয় লইয়া শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ ভারতমহিলায় একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তিনি ঘটনাটিকে যেরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন, আমাদের বোধ হয় তাহা ঠিক ঐতিহাসিক নহে। তিনি তাঁহার বিবৃতরূপ বিবরণ কোথায় পাইলেন জানি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আমাদের প্রদত্ত বিবরণই ঐতিহাসিক। সোণামণির বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রবন্ধাকারে ভারতমহিলায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। লেখক।

ভারতে নারীজাতির অবস্থা।

পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য মিঃ জে, রামসে মেক্‌ডোনেল বিগত বৎসর সপত্নীক ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। মিসেস্ মেক্‌ডোনেল অত্যন্ত উদারতা ও সহানুভূতির সঙ্গে ভারত-রমণীগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাঁহাদিগের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া গিয়াছেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটী মহিলা-শিল্প-সম্মিলনীতে ভারতীয় নারী-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন।

মিসেস্ মেক্‌ডোনেল বলেন, ভারতের সমস্ত জাতির চিন্তা ও জীবনের উপর ভারত-রমণীগণের প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইংরাজেরা কদাচিৎ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে কোন সংবাদ পাইয়া থাকেন। কারণ, ভারতের অধিকাংশ নারীই পরদানশিন। খুব নিকট আত্মীয় ভিন্ন অপর পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের বাক্যালাপ ত দূরের কথা, দেখা সাক্ষাৎও কম ঘটে। অবশ্য পাশ্চাত্য সংস্কারের আলোক যাঁহাদিগের ঘরে ঢুকিয়াছে তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। মিসেস্ মেক্‌ডোনেলের মতে পাশ্চাত্য নারী অপেক্ষা ভারত-নারীদিগের পুরুষ ও সন্তানের উপর প্রভাব অনেক পরিমাণে অধিক ; পরিবারের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ অধিকতর সুমিষ্ট ও সুদৃঢ় ; ইহার প্রথম কারণ, ভারতে পারিবারিক বন্ধন ধর্ম্ম ও সমাজনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় কারণ ভারত-রমণীগণ বহির্জ্জগত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পাশ্চাত্য রমণীগণের দৈনিক জীবনের সঙ্গে আত্মীয় অনাত্মীয় কত পুরুষ, কত রমণীর যোগ রহিয়াছে! কিন্তু ভারত-রমণীগণের সম্বন্ধ শুধু নিকট আত্মীয়গণের মধ্যেই আবদ্ধ, তাই তাঁহাদিগের অবিভক্ত প্রভাব পুরুষদিগের জীবনগুলিকে কোমল স্পর্শ দ্বারা যেমন সরস ও সুশোভন করিয়া তোলে তেমনটা পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায় না।

ভারতীয় নারী-জীবনের বিশেষত্বের মূলে দুইটা কারণ লক্ষিত হয়। প্রথম বাল্য-বিবাহ, দ্বিতীয় বিবাহের পর বহির্জ্জগতের সহিত নারীদিগের বিচ্ছেদ।

পুরাকালে হিন্দুদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রথা প্রচলিত

ছিল না। পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই বিষয়ে কোনরূপ অনুশাসন নাই। ভারতবাসী বারংবার মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে; তাহারই ফলে বিজেতা-দিগের হস্ত হইতে রমণীগণকে নিরাপদ করিবার নিমিত্ত এদেশে বাল্য-বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়। নারীদিগেরই কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাঞ্জাবে—চেনাব কেনেল-উপনিবেশে (Chenub Canal Colony) এখন ভারত-বর্ষের বিভিন্ন অংশ হইতে লোক আসিয়া বাস করিতেছে। এ স্থান পূর্ব্বে মরুভূমি ছিল। ইহার আদিম অধিবাসী জংলী নামক এক উষ্ট্র ব্যবসায়ী যাযাবর জাতি। পূর্ব্বে জংলীদিগের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সহিত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকের বিবাহ হইত। তাহারা বাল্যকালে বিবাহ করিয়া এত শীঘ্র নিজের স্বাধীনতা হারাইতে ইচ্ছা করিত না। কিন্তু আজ কাল বালি-কাদিগের দ্বাদশ কিংবা চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতেই তাহাদিগকে বিবাহ দিবার নিমিত্ত জংলী পিতা-মাতা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। শুধু দশ বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্ত্তনটী ঘটিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, জংলীরা তাহাদিগের নবাগত প্রতিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে না। পূর্ব্বকালেও এরূপ কোনও অনিবার্য্য কারণে ভারতে বাল্য-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আজকাল হিন্দু মুসল-মান সকলের মধ্যেই ইহা প্রচলিত।

ইয়ুরোপে যেমন বালিকারা বালিকা-জীবন উপভোগ করিবার সুযোগ পায়, ভারতবর্ষে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। ইহা অবশ্যই ইয়ুরোপীয়দিগের বিস্ময় উৎপন্ন করে। নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট বালিকাদিগকে পথেঘাটে বেড়া-ইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে প্রায়ই নয় দশ বৎসরের বালিকাদিগকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা বিবাহিতা; তাহাদের পোষাকেই বিবাহিতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। কলকারখানায় দেখা যায়, নয় বৎসর অপেক্ষা ন্যূন বয়স্কা বালিকারাও বিবাহিতার নিদর্শন সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়াছে।

পাশ্চাত্য সংস্কারের ফলে আজকাল ভারতবর্ষে দু একটী বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্য-বিবাহ-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে পার্শী ও ব্রাহ্মসমাজের নাম উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যালোকে সংস্কৃত কোন কোন হিন্দু পরিবারেও অবিবাহিত সপ্তদশ অষ্টাদশ বর্ষীয়া বালিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

পরদার অন্তরালে ছোট ছোট বালিকাগুলি কেমন সুন্দর, কেমন মাধুরীমাখা, কেমন পোষাক পরিচ্ছদে সুশোভনা! দেখিলে মনে হয় যেন বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাহারা জননীর গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিবার কতই অনুপযুক্ত! সৌকুমার্য্যের কোমল চিহ্নটী তখনও তাহাদের সুন্দর আকৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই, অথচ তাহারা হয়ত দুই তিনটী শিশু সন্তানের জননী কিংবা একটী বহু পরিবারের প্রধানা গৃহিণী। বাল্য-বিবাহের কুফল ডাক্তারেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার ফলে অপূর্ণাবয়ব বালিকা-মাতা ও শিশু উভয়েরই মহা অনিষ্ট হয়।

ইয়ুরোপে বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ ও রমণী পরস্পরকে মনোনয়ন করিয়া লয়। ভারতবর্ষে বাল্য-বিবাহ প্রথার ফলে এইরূপ মনোনয়ন (Courtship) খুব কম দেখা যায়। মিসেস্ মেক্‌ডোনেল বলেন যদিও পাশ্চাত্যদেশে সকল সময় ঠিক্ আদর্শ মত মনোনয়ন প্রথাকে মানিয়া চলা হয় না, তবুও এদেশের বিবাহ-প্রথা অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠ, একথা নিসংশয়ে বলা যাইতে পারে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ভারতে পারিবারিক জীবনে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ খুব সুন্দর ও মাধুর্য্যপূর্ণ।

ভারতে বিবাহের প্রধান কাঠিন্য এবং কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে বাল্যকালেই সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত পিতা-মাতার উৎকণ্ঠার মূলে একটা প্রধান কারণ দৃষ্ট হয় যে, হিন্দুদিগকে স্বজাতির মধ্যেই কন্যার বিবাহ দিতে হয়; সুতরাং পাত্র খুঁজিবার ক্ষেত্র নিতান্তই সঙ্কীর্ণ; কোন ব্যক্তি এই সামাজিক অনুশাসনকে অমান্য করিয়া চলিলে সমাজের নিকট তাহাকে জবাবদিহি হইতে হয়। তাহাকে যত লাঞ্ছনা সহিতে হয় বিলাতে রাজপুত্র ঝাড়ু-দারের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেও এতটা লাঞ্ছনা ও

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা

নির্য্যাতন সহিতে হয় না। ধর্ম্ম এবং সমাজ উভয়েই তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে। এই সকল বর্ণগত বৈষম্যে ইংরাজেরা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। অনেক ভারতবাসী বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁহাদের প্রবল প্রয়াস সামাজিক শাসনের নিকট নিষ্ফল ও চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তবুও সকল দিকেই সামাজিক স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত একটা সংগ্রাম জাগিয়াছে।

বিবাহের পর নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে গৃহ-কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় না। পথে, ঘাটে, মাঠে, দোকানে, কারখানায় সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের যাতায়াত; তাহারা খাটিয়া খায়। কিন্তু তাহারাও পাশ্চাত্য স্ত্রীলোক-দিগের অপেক্ষা অপরিচিত পুরুষদিগের সহিত অনেক বেশী পরিমাণে ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলে।

শ্রমজীবী শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর নারীরা বিবাহের পর হইতেই কঠোরতর পরদার অন্তরালে বাস করে। ইঁহাদিগের গৃহে পরদা, বাহিরে পরদা; পাল্কী গাড়ী রেলওয়ে ষ্টেসন সর্ব্বত্রই পরদা। ইংরাজ-মহিলারাও মাঝে মাঝে গৃহ হইতে পুরুষদিগকে বাহির করিয়া দিয়া আমোদ আহ্লাদের জন্য পরদানশিন স্ত্রীলোকদিগের সম্মিলন করেন।

মিসেস্ মেক্‌ডোনেল বলিতেছেন, সর্ব্বক্ষণ পরদার অন্তরালে বাস করিবার অর্থ তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি মাঝে মাঝে পরদার অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহা তাঁহার নিকট নিতান্তই অসম্ভব ঠেকিয়াছে। সহরতলীর বাহিরে সন্তানহীনা কয়েকটী নারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া বাস্তবিকই তাঁহার দুঃখ হইয়াছে। এতটা একাকিত্বের মধ্যে বাস করা সামাজিক-জীব—মানুষের পক্ষে কি সম্ভব?

যে নারী-জাতি বংশানুক্রমে চিরদিন—বাল্যকাল হইতে মৃত্যু অবধি—সমস্ত বহির্জগত হইতে বিযুক্ত হইয়া অধীনতার মধ্যে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা যদি পাশ্চাত্য সংস্কারকে আদর করিয়া গ্রহণ করেন কিংবা তাঁহাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ-প্রচলিত সামাজিক স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করেন, তবে তাহা কি সৌভাগ্যের কথা! ইহা কি কম বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয়? কিন্তু তাহা হইলে ইঁহারা বিলাতের নির্ব্বাচনাধিকার-প্রার্থিনী (Suffragettes) দল অপেক্ষাও ভীতির কারণ হইতেন এবং এক সময় ইংলণ্ডে নারীদিগের উচ্চশিক্ষা লাভের নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়া যে সকল ইংরাজ-মহিলা সমাজের হাতে নির্ম্মম ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, সংস্কার-প্রার্থিনী ভারত-রমণীগণের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয় হইত।

সতী-দাহ-নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ এই দুয়ের মধ্যে খুব কাছাকাছি সম্বন্ধ। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ-প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সে সময় আঠার হাজার ভারতবাসী প্রিভিকৌন্সিলের নিকট ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করেন। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন অল্প দিনের মধ্যেই থামিয়া যায়। যদিও বহু ইংরাজ এই সতীদাহ-প্রথার বিবরণ শুনিয়া ভারতবর্ষ ও ইহার সামা-জিক রীতিনীতির স্থান সভ্যজগতের বহু নিম্নস্তরে নির্দ্দেশ করেন তবুও উদারহৃদয়া মিসেস্ মেক্‌ডোনেল ইহার ভিতরকার সার কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়া-ছেন। তিনি বলেন, স্বামী-বিরহ-কাতরা রমণীর জগতে কোন আসক্তি নাই, স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া পরলোকে স্বামীসেবায় রত থাকিবে—ইহা কি সুন্দর ভাব! আত্ম-ত্যাগের কি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! কিন্তু যদি ইহা স্বেচ্ছা-প্রসূত না হয় কিংবা স্বামীজ্ঞান রহিতা শিশু-বিধবার উপর আরোপ করা হয় তবে ইহা কি ভীষণ! কি নির্ম্মম কঠোর অত্যাচার!

যদিও গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ নিবারণ করিয়া বিধবা-দিগকে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত পোড়াইয়া মারা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাহাদিগকে জীবনে মারিয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। খুব অল্প সংখ্যক বিধবারই পুনরায় বিবাহ হইয়া থাকে। জগতের সকল সুখ, সকল আনন্দ হইতেই তাহারা বঞ্চিত—যাহা নারীজীবনকে মধুর, সরস ও শোভন করিয়া তোলে, তাহাই ভারতের সহস্র সহস্র রমণীর নিকট দুর্লভ। বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার গতি অতি ধীর। কারণ যিনি বিধবার পাণিগ্রহণ করিবেন

তাঁহাকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত কঠোর সামাজিক শাসন অপেক্ষা করিয়া থাকে, আত্মীয় বন্ধু হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়।

শিক্ষাই নারীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একমাত্র উপায়। ইংরাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করিয়া ভারতবর্ষের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। বহু লোক এখন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু নারীরা এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। নারীরাও যাহাতে পুরুষদিগের সমান উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, এই নিমিত্ত আন্দোলন চলিয়াছে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে ১৮০৭ খৃঃ সর্ব্বপ্রথমে মিশনারীরা ভারতবর্ষে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র গবর্ণমেণ্ট, পার্শী, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উচ্চ শিক্ষার জন্যও কলিকাতায় বেথুনকলেজ এবং লক্ষৌতে 'উইমেন্স' কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার পুরুষরমণী সকলের জন্যই উন্মুক্ত। অনেক ভারতমহিলা ইংরাজমহিলা হইতে অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই বিজাতীয় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই গৌরবের কথা। ভারতবর্ষে অনেক মহিলা-চিকিৎসকও দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজমহিলা এখনও আইনশিক্ষার অধিকারিণী নহেন কিন্তু পার্শীরমণী কুমারী কর্ণেলিয়া সোরাবজী আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা ভারতবর্ষে খুবই অল্প। এখনও প্রচুর পরিমাণে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু শিক্ষার পথে অনেক বাধা বর্ত্তমান। অধিকাংশ বালিকা যাহারা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, কোন রূপ শিক্ষার পরিপক্কতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বাল্য-বিবাহ এবং বিবাহের পর পরদা—ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান অন্তরায়।

পুরুষশিক্ষকের নিকট বয়স্কা বালিকারা পড়িতে পারে না। এত অল্পবয়সেই বালিকাদিগের বিবাহ হয় যে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবার জন্য স্ত্রীলোক পাওয়াও কঠিন। কয়েকজন বিবাহিতা ও বিধবা মহিলা কোন কোন স্থানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছেন। সম্প্রতি পরদানশিন স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত দু একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা বহু শ্রম ও ব্যয়সাধ্য।

সহৃদয়া ইংরাজমহিলা মিসেস্ মেক্ডোনেল অত্যন্ত সহানুভূতি ও উদারতার সহিত ভারতরমণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখীন উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার করুণ-হৃদয় কাঁদিতেছে, তাই ইঁহাদিগের শিক্ষার জন্য আকুলভাবে তিনি পাশ্চাত্য এবং এদেশীয়দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। (মডার্ণরিভিউ হইতে সঙ্কলিত) শ্রীমন্মথনাথ দাসগুপ্ত।

গৃহশিক্ষা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার ৪।৫ দিন পরে প্রাতরাশের সময় মিঃ হ্যামিণ্টন পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"এমেলিন, ৫।৬ সপ্তাহ পূর্ব্বে মিঃ মর্টন নামে একজন ধর্ম্মাচার্য্য মিঃ হাওয়ার্ডের গির্জ্জায় উপাসনা করিয়াছিলেন, তোমার মনে আছে?"

"খুব মনে আছে! আহা! ভদ্রলোকের অথর্ব্ব আকৃতি এবং দুর্ব্বল কণ্ঠস্বর কি ভুলিবার জিনিষ! তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কার প্রাণে না সহানুভূতির সঞ্চার হয়?"

মিসেস হারকোর্ট জিজ্ঞাসা করিলেন:—"জন্মাবধি বুঝি তাঁহার শরীরে এই খুঁত? তিনি যখন বেদীতে বসিয়াছিলেন, তখন যেন কি রকম একটা কষ্ট অনুভব করিতেছিলেম!"

মিঃ হ্যামিণ্টন বলিলেন,—"না, জন্মাবধি তাঁর চেহারা এরূপ নয়। পাঁচবৎসর পূর্ব্বেও তাঁহার চেহারা বেশ ভাল—শুধু ভাল নয়, অনিন্দনীয় ছিল। তিনি দিব্যকায় সুপুরুষ ছিলেন, সদ্বংশে অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। হঠাৎ তাঁহার পিতামাতার অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। অনেক দুঃখ কষ্ট সহিয়া তাঁহারা লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহাকে অক্সফোর্ডে পাঠাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া সমগ্র দেহমন দিয়া তিনি অধ্যয়নে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। একমাত্র মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, লেখাপড়া শিখিয়া পিতামাতার দুঃখ যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও দূর করিতে পারেন। অধ্যবসায়, উন্নত মানসিক শক্তি ও নির্ম্মল চরিত্রগুণে তিনি কয়েকজন অতি সদাশয় সমপাঠীর বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন ছাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার জমিদারীর মধ্যে প্রচুর বৃত্তি দিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মাচার্য্য করেন। নয় মাসকাল সেখানে তিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি ভোগ করেন। তাঁহার সুন্দর কর্ম্মস্থানে তাঁহার পিতামাতা পরম সুখে বাস করিতেছিলেন, এবং পুত্রের জন্য যত কষ্ট করিয়াছিলেন, সকলই সার্থক হইয়াছে মনে করিতেছিলেন। শীতকালের এক দুর্য্যোগ রজনীতে তিনি ১০ মাইল দূরস্থিত কোন দরিদ্র কৃষকের গৃহে অন্তিম অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য কার্য্যের জন্য আহুত হইয়াছিলেন। রাস্তা দুর্গম ছিল। কিন্তু সে জন্য তিনি কর্ত্তব্যপ্রথ হইতে বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। যথা সময়ে স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া তিনি রাত্রেই ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথে তাঁহার অশ্ব পদস্খলিত হইয়া আরোহীসহ একটা গভীর গহ্বরে পতিত হয়। পরদিন মৃত অশ্বের নিম্নে মৃতপ্রায় অবস্থায় তাঁহাকে পাওয়া যায়।"

পার্সি ও হারবার্ট ব্যতীত সকলে অনুচ্চস্বরে এক সঙ্গে ভীতিসূচক চীৎকার করিয়া উঠিল। পার্সি দুইহাতে তাহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল। হারবার্ট একান্ত মনোযোগের সহিত তাহার দিকে চাহিয়াছিল, সকলের সঙ্গে যোগ দিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। সকলেই মিঃ হ্যামিল্টনের কথায় এত নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে এই দুই ভাইয়ের অবস্থার প্রতি কাহারও দৃষ্টি একেবারেই আকৃষ্ট হয় নাই। মিঃ হ্যামিল্টন বলিতে লাগিলেন ;—"আঘাত এত গুরুতর হইয়াছিল, যে কয়েক মাস পর্য্যন্ত তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দোলায়মান ছিলেন। অবশেষে বাঁচিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু ক্রমাগত কয়েক বৎসর আর কোন কাজ করিবার সামর্থ্য রহিল না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সুন্দর কর্ম্মটী পরিত্যাগ করিতে হইল। আবার তিনি পিতামাতার গলগ্রহ হইলেন। আর যে কোনও দিন তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন, সে ভরসা আর রহিল না। তাঁহার সেই সুন্দর চেহারা কদাকার হইয়া গেল, এজন্য তিনি লোকের নিকটে আসিতেও সঙ্কুচিত হইতেন। তাঁহার পূর্ব্ব সুকণ্ঠ অতি মৃদু ও মিষ্টত্ববর্জ্জিত হইয়া পড়িল। অদৃষ্টের এই নূতন ব্যবস্থা মানিয়া লইতে তাঁহাকে যে কঠিন মানসিক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহাতে তিনি আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একজন সহৃদয় বন্ধু অনুগ্রহ করিয়া নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইয়া দেন, তাহাতে স্বাস্থ্য একটু ভাল হইয়াছে। সেই বন্ধুটীই তাঁহার পিতাকে লণ্ডনে একটী কর্ম্ম দিয়াছেন। পুনরায় কোথাও ধর্ম্মাচার্য্যের কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদেরই সঙ্গে একত্র বাস করিবার জন্য তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে এখান হইতে ৮ মাইল দূরে একটী সামান্য গ্রামে অতি সামান্য বৃত্তিতে তিনি ধর্ম্মাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কেরোলিন। তোমার সঙ্গে তাঁর কবে পরিচয় হইয়াছে বাবা! আমাদের নিকট তুমিত তাঁর কথা কখনও বল নাই।

মিঃ হ্যামিল্টন। না মা! সেই রবিবার তিনি যখন মিঃ হাওয়ার্ডের পরিবর্ত্তে উপাসনার কাজ করিয়াছিলেন, তখন আমি প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়াছি, পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার সকল খবর জানিবার জন্য আমার মন বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। মিঃ হাওয়ার্ড তাঁহার সকল খবরই সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট এসকল সংবাদ পাইয়াছি। একবৎসর যাবৎ মিঃ মর্টন আমাদের এত নিকটে আছেন, কিন্তু সর্ব্বদাই অবস্থাপন্ন লোকের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। ঘটনাক্রমে হঠাৎ মিঃ হাওয়ার্ড তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতিতে মিঃ-মর্টন নিজের সঙ্কোচ কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছেন এবং মিঃ হাওয়ার্ডেরই একান্ত অনুরোধে সেদিন আমাদের গির্জ্জায় উপাসনা করিয়াছিলেন। আশা করি মিঃ হাওয়ার্ড ক্রমে তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতেও আনিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু।

জন্ম—১৭ই ভাদ্র, ১২৫১ বঙ্গাব্দ।

মৃত্যু—৬ই আষাঢ়, ১৩১৭।

ধীরে ধীরে দেশের শ্রেষ্ঠ লোকগণ চলিয়া যাইতেছেন। মহাত্মা চন্দ্রনাথ বসু সাহিত্যের সেবা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, আপনার উন্নত চরিত্র-বলে দেশের সর্ব্বসাধারণের ততোধিক শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। সুলেখক ও পরম চরিত্রবান লোক বলিয়া বাঙ্গালী চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিবে। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে আমরা তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি উপহার দিলাম।

কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

জগৎ-বরেণ্যা, নারীকুলভূষণা কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ৯০ বৎসর বয়সে গত ১৩ই আগষ্ট অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা আগামী সংখ্যায় তাঁহার বিস্তৃত জীবনচরিত প্রকাশ করিব।
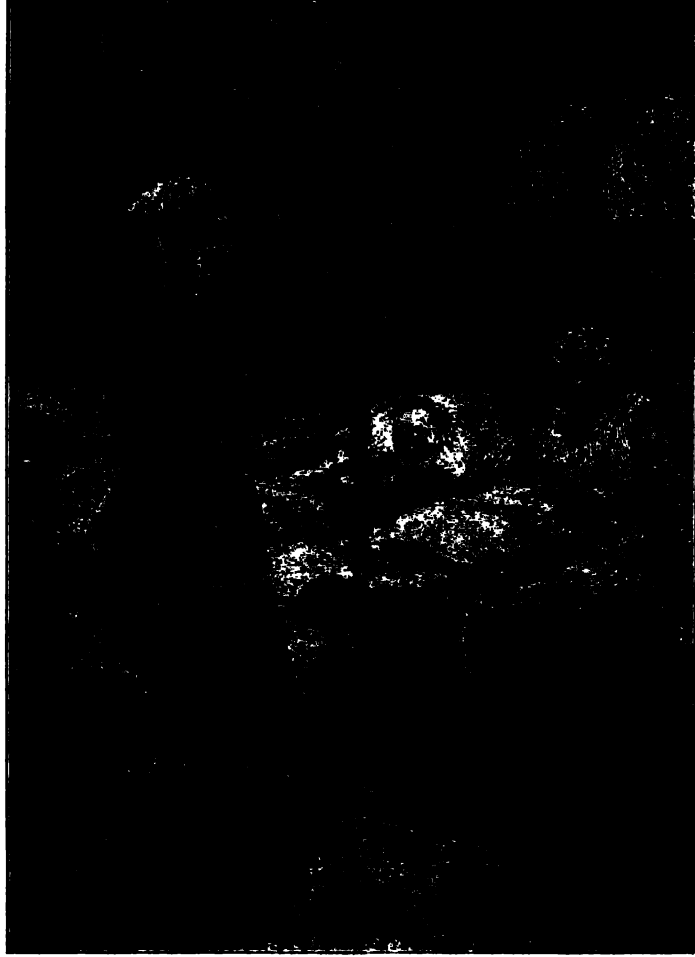
রোগী-সেবা-নিরতা কুমারী নাইটিঙ্গেল

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৭ম ভাগ। | আশ্বিন, ১৩১৭। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সাহিত্যসেবা।

যদিও দুঃখ এড়াইয়া সুখকে লাভ করিতে প্রত্যেককেই চেষ্টিত দেখা যায়, তবুও এমন লোক খুব কম আছেন যিনি বলিতে পারেন সুখের প্রকৃত পন্থা কি। সুখকে খুঁজিতে গিয়া কত বিচিত্রতারই না সৃষ্টি হইয়াছে। কত খেলা, কত কৌতুক, কত পানাহার, কত উৎসব আমোদ—তাহার শেষ নাই। সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে যে, তাহাদের অস্থির ও চঞ্চল ইচ্ছার তৃপ্তি সাধনই তাহাদের সেই ঈপ্সিত ধন মিলাইয়া দিবে। কিন্তু সেই মহা সমুদ্র হইতে জলপ্রবাহ উৎসারিত করিয়া আনিবার জন্য তাহারা যে সঙ্কীর্ণ অগভীর খালগুলি কাটিয়াছে—তাহার দুর্ব্বল স্রোতকে তাহারা শত আয়াসেও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, দুদিনেই তাহা শুখাইয়া উঠিতেছে। তাহার কৃত্রিমতার অভিশাপ তাহাকে কেবলই স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডতার দ্বারা আক্রান্ত করিতেছে, বহু চেষ্টায়ও সে তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না।

কিরূপ জীবন সর্ব্বাপেক্ষা সুখী, এ সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন। অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাদিগকে বলিতে পারি যে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী জীবন সাহিত্যিক জীবন। ষোড়শ শতাব্দীর কবি সার হেনরি ওটন লিখিয়াছিলেন, "সৎ চিন্তা যাহার ধর্ম্ম, সরল সত্য যাহার ঐকান্তিক নৈপুণ্য; পরের ইচ্ছা দ্বারা যাহাকে নিয়ন্ত্রিত হইতে হয় না—তাহার জীবন ও শিক্ষা কি সুখময়!" বিশেষ করিয়া তৌল করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে একমাত্র সাহিত্যিক জীবন এই আদর্শের কাছে পঁহুছাইতে পারে। সৎচিন্তা ও সরল সত্যের অনুসরণ এবং অপরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে না হওয়া—এ কি আনন্দময় জীবন! কি গৌরবময় স্বাধীনতা! সাহিত্যিক জীবনের প্রধান আনন্দই হইতেছে এই আত্মনিষ্ঠ ক্ষমতা—নির্ভরের অভাবে যাহা লতার মত নমিত হইয়া পড়ে

না, পরন্তু বনস্পতির মত আকাশে বাহুবিস্তার করে; ও এই মুক্তভাবে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করা—লাভ ও ক্ষতির বিচারবুদ্ধি দ্বারা যাহাকে প্রতিনিয়ত খর্ব্ব করিতে হয় না, পরন্তু বিশ্বলোকের মাঝখানে যাহা স্বমহিমায় উর্জ্জ্বল হইয়া দীপ্তি পাইতে থাকে! লেখকের আসনে যিনি উপবেশন করেন রাজ্যেশ্বর অপেক্ষাও একটি বৃহত্তর পদ তিনি অধিকার করেন; স্বয়ং প্রকৃতি পরিচারিকা হইয়া তখন তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করে, প্রত্যেক রুদ্ধদ্বার তাঁহার হস্তস্পর্শে আপনি উদ্‌ঘাটিত হয়, প্রত্যেক রহস্য তাঁহার কাছে যাচিয়া আত্মপ্রকাশ করে, এবং আবহমান নিত্যকাল তাহার সভ্যতা, জাতিসমূহের উত্থান পতন ও জীবন যাপনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত চিত্র লইয়া একখানি অপরূপ নাট্যচিত্রের মত তাহার কাছে প্রকাশিত হইতে থাকে!

গ্রন্থ, লেখকের চিত্ত ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে এবং আমাদের প্রধান ব্যাকুলতা যখন সেই প্রকাশটুকুকে আপনার চিত্ত ও অনুভূতির ভিতর গ্রহণ করা—তখন যে গ্রন্থ আমরা পাঠ করি তাহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইলেও বা অন্তকার তারিখে রচিত হইলেও তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে! প্লেটো কবে দর্শন শাস্ত্রের জটিল সমস্যার সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন তাহা জানিয়া আমাদের কি দরকার? লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে বসিয়াও শত শত বৎসরের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা আমাদের নিভৃত গৃহকোণে নিত্য তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতেছি; আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধি ও মূঢ় সংশয়কে তাঁহার অমরত্ববাদের ভিতর শোধিত করিয়া লইতেছি, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট! মানব-সভ্যতার সেই আদি-যুগে জয়-ললাটিকাঙ্কিত-ললাট কোন্ কবি বীণায় তাঁহার কি মহাগীতির ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন,—এই অনাদ্যনন্ত বায়ুর মত, দীপ্তির মত, নভোর মত তাহা আমাদের স্তন্যদান করিতেছে, লালন করিতেছে,—আমরা কখনও তাহা হারাইব না, তাহা কখনও দূর হইবে না, বিনষ্ট হইবে না, মহা সমুদ্রের নিত্য কল্যাণের মত তাহা আমাদিগকে বেড়িয়া নাচিতেছে, ফুলিতেছে, দুলিতেছে, ছড়াইয়া পড়িতেছে, মগ্ন করিয়া দিতেছে! রামগিরির বিচ্ছিন্ন উচ্চ শিখরে একদিন আষাঢ়ের নব মেঘ দিয়াছিল।—কোন অস্তমিত যুগের সে ইতিহাস! কাশপুষ্প-ধবল নদী-সৈকতের পুলক্ প্রাণে বহিয়া সুন্দরী জলদ-বধূর কজ্জল রেখাদীপ্ত কৃষ্ণ চক্ষের বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষে স্মৃতি ও অগুরু-গুগ্‌গলের ধূমে শুষ্ক কেশপাশের সৌরভ বিহ্বল কবি, কেতকী ও কদম্ব কেশরের রেণুর স্পর্শে আকুল কবি, সঘন বারিপাত ও দর্দ্দুরের কোলাহলের শব্দে কবে বিরহী যক্ষের প্রিয়া-বিচ্ছেদক্লেশ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে মানব-সমাজের কি সম্বন্ধ! কিন্তু প্রতি বর্ষে যখন আষাঢ়ের নব মেঘ গুরু গর্জ্জনে আসিয়া উদিত হয়, তখন বিশ্বের মানস-পদ্মে নিঃশব্দে কবির কল্পনাভিষেক-পূত সেই একটি বিরহীর প্রিয়বিরহের বিশেষ দুঃখ মূর্ত্তিমান বিরহ-ব্যথার মত আসিয়া দাঁড়ায়—প্রত্যেক হৃদয়তন্ত্রী তখন ঝঙ্কারে বাজিয়া ওঠে, প্রত্যেক চক্ষু তখন অশ্রুতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, মুহূর্ত্তের জন্য প্রত্যেকের তখন মনে হয়, আকাশে ঐ যে মন্থরগামী বিদ্যুল্লতা-বিলসিত নব-নীলাঞ্জন-কান্ত মেঘ—সে যেন তাহারই দৌত্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে!

সাহিত্যিক জীবন আমাদিগকে সঙ্গ গ্রহণের ক্ষমতা দান করে। আমাদের আপন হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা—রুদ্ধদ্বার কক্ষের মতন শুধু যাহা আপনার রৌদ্ররঞ্জিত ক্ষীণ সঞ্চয়ে ক্লিষ্ট হইয়া আছে—জগতের সমস্ত মনস্বীগণের বৃহৎ ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার আলো, উন্নত চিন্তা ও সদাকাঙ্ক্ষার সুবাতাস তাহাকে তাহার ক্ষুদ্রত্বের বেষ্টন হইতে পলকে বাহিরে লইয়া গিয়া আলোকে সৌরভে সঙ্গীতে পুলকে মগ্ন করিয়া দেয়! তাহার চারিদিকে এই যে একটি অপূর্ব্ব জগৎ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে তাহা তাহাকে একটা বৃহৎ বিচরণের ক্ষেত্র প্রদান করে, তাহাকে সসীম হইতে অসীমে লইয়া যায়!

সাহিত্যিক জীবনই যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী জীবন এ কথা হয় ত অনেকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বিবেচ্য আছে। বিশ্ব-ভুবনের আরাধ্যা এই কলা-লক্ষ্মীকে তাঁহারা যখন পূজাপুষ্প প্রদান না করিয়া তাঁহাকে দিয়া কেবল মাত্র ঘরের দাসীপনা করাইয়া লইতে চান, ও ব্যবসায়ের লালিত্য-হীন পরুষ হলে তাঁহাকে যুড়িয়া দিয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত ফসল

ঘরে তুলিতে চান—তখন তিনি হাসিয়া অন্তর্হিত হন, অবমানিতা লক্ষ্মীর শূন্য পীঠে অলক্ষ্মী আসিয়া তখন গর্ব্বে উপবেশন করেন! মূঢ়তা ও মিথ্যা গর্ব্ব সাহিত্যের আসন রক্ষা করিতে পারে না এবং যে বুদ্ধি অতিকায় কূর্ম্মের মতন আপনার পৃষ্ঠের খোলাটাকে টানিয়া চলিবার ভারে ভূমি হইতে মস্তক উঠাইবার শক্তি হইতে চির-বঞ্চিত—তাহা সাহিত্য-মন্দিরের উচ্চ সোপান অতিক্রম করিতে পারে না। কথামালার সেই কচ্ছপটির মতই তাহাকে সে স্বর্গপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে হয়। প্রকৃত লেখক—যিনি লেখকত্বের অধিকার ও দায়িত্বকে রক্ষণ করিতে সমর্থ হন—বিশ্ব-জগতের উপরে তিনি প্রভু—তিনি সম্রাট—তাঁহার ক্ষমতা বিশ্বস্রষ্টার মতই অপরিসীম।

অবশ্য ইহা হইতে এমন কিছুই প্রমাণিত হইতেছে না যে সাহিত্যিক জীবন কাঠিন্য-বর্জ্জিত। আলোকের প্রকাশের জন্যই যে অন্ধকার—আনন্দের অনুভূতির জন্যই যে বেদনা তাহা কে অস্বীকার করিবে! সাহিত্যিক জীবনেও দুঃখ আছে, বহ্নির মত তাহা চিত্তকে দগ্ধ করিয়া নম্র করে ও কঠিন আঘাতে তাহার সমস্ত অশোভনত্ব চূর্ণ করিয়া তাহাকে নব সৌন্দর্য্য দান করে, তাহার সমস্ত ভঙ্গুরত্বকে সংঘর্ষণের উপযোগী করিয়া বিজয়ের শক্তিতে দ্রঢ়িষ্ঠ করিয়া তোলে; প্রভাত-আকাশের দীপ্তিকে অন্ধকার করিয়া এই যে পুঞ্জে পুঞ্জে জলগর্ভ মেঘ চলিয়াছে—ইহারই মতন সে বেদনা সান্ত্বনার জলকণা-সিঞ্চিত। ইহা নিসংশয়েই বলা যায় যে দারিদ্র্য যখন সাহিত্যিকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যমুখে তিনিই তাহাকে স্বাগতোক্তি করিতে সমর্থ হন; কারণ যেই পরিমাণে তাঁহার অন্তরের প্রয়োজন বড়িয়া যাইতে থাকে সেই পরিমাণে তাঁহার বাহিরের প্রয়োজন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে থাকে। মহেশ্বরের মাথায় পূজার্থী যখন দুগ্ধ ও গঙ্গোদক ঢালে তখন তাহা যেমন তাঁহার শিলা-অঙ্গ হইতে বিগলিত হইয়া পড়ে—তেমনি সুখৈশ্বর্য্যের কামনাকে সাংসারিক জীবনের সংস্কারে যখন সাহিত্যিকের মাথায় চড়াইতে থাকেন তখন তাহা "কল্প ধেনুর অমৃত দুগ্ধ-ধারায় গলিয়া পড়িয়া যাইতে থাকে—তিনি শুধু বলিতে থাকেন :—

শুধু বাঁশী খানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণ মন খুলি,
পুষ্পের মত সঙ্গীত গুলি
ফুটাই আকাশ ভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দ লোক করি বিরচন
গীত-রস-ধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলি জালে ;
ধরণীর শ্যাম করপুট খানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর অর্থ ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া
করে দিয়ে যাব বসন্ত কায়া
বাসন্তী-বাস-পরা।
ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটু খানি নবীন আভায়
রঙ্গিন্ করিয়া দিব,
সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর,
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পার ছুটি নিব।

বিদ্বেষ ও বিমুখতা যখন সাহিত্যিকের মাথার উপর বৃষ্টিধারার মতন নামিতে থাকে, তখন তাহা বেদনা অপেক্ষা কৌতুকেরই অধিক সৃষ্টি করে; শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে চিরদিনই লাঞ্ছিত হইয়া আসিতেছে!

"সূর্য্য দুঃখ করি বলে নিন্দা শুনি স্বীয়,
কি করিলে হব আমি সকলের প্রিয়?
বিধি কহে ছাড় তবে এ সৌর সমাজ
দু চারি জনেরে লয়ে কর ক্ষুদ্র কাজ।"

মহতের এই দুঃখ! ইহা শুধু আজিকার কবিকণ্ঠে গীত একটি সঙ্গীত নয়, ইহা আবহমান কালের বাস্তব সত্য! ভার্জ্জিলকে প্লিনি মস্তিষ্কহীন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন,

এরিষ্টটল সিসিরো এবং প্লুটার্ক কর্ত্তৃক মূর্খ গর্ব্বিত এবং দুরাকাঙ্ক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছিলেন। প্লেটো ডিমিক্রিটাসের গ্রন্থরাজি ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সফোকলস্ তাহার নিজের সন্তানগণ কর্ত্তৃক উন্মাদ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, হোরেস্ গ্রীক কবিগণের কাব্য হইতে অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মানবসভ্যতার আদিযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত ইহা এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। মিলটন সাহিত্য-জগতে উচ্চতম স্থান অধিকার করার অপরাধে সলম্যাসিয়াস নামক এক নিতান্ত ক্রূরপ্রকৃতি ব্যক্তির উদ্গীর্ণ হলাহলে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিলেন। সলম্যাসিয়াস শুধু তাঁহার রচিত গ্রন্থই আক্রমণ করিত না—সাধারণের চিত্তকে তাঁহার প্রতি বিমুখ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে কদাকার, খর্ব্বাকৃতি ও ভীষণমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিত। কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল, মিলটন "কদাকার" "খর্ব্বাকৃতি" ও "ভীষণমূর্ত্তি" না হইয়া সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে সৌন্দর্য্যবান্ সুপুরুষ—তখন সে তাহার চেহারা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে ঘৃণ্যতম কুৎসার দ্বারা সকলের কাছে হেয় করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু সত্য চিরদিন মিথ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে না, যেমন মেঘ সূর্য্যকে স্পর্দ্ধিত-গর্ব্বে আবৃত করিয়া দাঁড়ায়, মুহূর্ত্ত পরে গলিয়া ঝড়িয়া পড়িবার জন্য; সলম্যাসিয়াসের নাম পৃথিবীর পতিত পত্রস্তূপের সঙ্গে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে—মিলটন ইংলণ্ডের সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়া অনন্ত কালের জন্য অবস্থান করিতেছেন। মহত্ত্ব চিরদিনই এইরূপ লাঞ্ছিত হইয়া আসিতেছে; সাধারণ লোক—যে, সকলের সঙ্গে এক সমতলে দাঁড়াইয়া আছে—সেই শুধু সকলের বন্ধুত্ব লাভের অধিকারী হয়। এমার্সন বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি মহৎ হইতে ইচ্ছা কর তবে আত্মনিষ্ঠ ও আত্মরতি হও, জগতের বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষার দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর।"

পর্ব্বত যেমন তাহার উচ্চত্বের জন্যই ঝড়ের বেগ দ্বিগুণ সহ্য করে, তেমনি সাধারণ হইতে যিনি উচ্চ হইয়া দাঁড়াইবেন—বিদ্বেষের বেগ তাঁহাকেই অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে; স্বয়ং প্রকৃতি তাহার পরীক্ষা-মন্দিরের দ্বার খুলিয়া জয়ার্থী বীরের এই অপরাজিত শক্তি পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য বসিয়া আছেন, জয়ী হইয়া যিনি সেখানে দাঁড়াইবেন প্রকৃতি আপন হস্তে তাঁহার ললাটে কল্যাণ-ললাটিকা অঙ্কিত করিয়া দিবেন। গৌরব তাঁহারই যিনি শত্রুকে বীর্য্যের দ্বারা জয় করেন, আনন্দ তাঁহারই যিনি অন্যায়কে মথিত করিয়া ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করেন, গর্ব্ব তাঁহারই যিনি দুষ্ক্রিয়াকে আপনার হাতে উচ্ছেদ করেন, এবং দুঃখের দ্বারা যাহা সাধন করা যায় বিশেষত্ব তাহারই!

লাভ ও ক্ষতি সাহিত্যিক জীবনে তুল্যাংশেই গ্রহণ করিতে হয়। যে সৃজনী শক্তি সৃষ্টির ভিতর দিয়া আনন্দকে স্পন্দিত করিয়া তোলে, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের যে অখণ্ড যোগটি কলা-লক্ষ্মীর অতুল বৈভব উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখায়, যে মধুর সৌন্দর্য্যানুভূতি আত্মার নিগূঢ় বক্ষে পুলকের ঝঙ্কার প্রেরণ করে, যে চেতনা প্রতিভার আলোকস্পর্শে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া ওঠে, যে মহিমাময় গৌরবরশ্মি কল্পনা হইতে ক্ষরিত হয়, যে সন্তোষ, যে শান্তি, যে প্রীতি জগতের সমস্ত মহত্ত্বে ধ্রুব বিশ্বাস হইতে জন্ম গ্রহণ করে—এই আত্মরতি ও আত্মতৃপ্তির দুয়ারে দুর্য্যোগ-নিশার বজ্রগর্জ্জিত ঝঞ্ঝার মত আসিয়া পড়ে কি? সাধারণের অনুরাগ ও প্রশংসার পার্শ্বেই সাধারণের নিন্দা ও বিদ্বেষের তীব্র জ্বালা, রাশীকৃত স্বকপোল কল্পিত মিথ্যা, ব্যঙ্গচিত্র ও তীব্র বিদ্রূপ! চরিত্র লইয়া জীবন লইয়া—ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়োজনীয় নিষ্প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যাপার লইয়া লোকের স্বেচ্ছাগঠিত মতামত, সমালোচনা, চিত্র-চিত্রন, দুর্ণাম আর প্রতিদ্বন্দী লেখকের দিক্ হইতে উদ্গীরিত প্রচুর গরল!

কিন্তু তবু ও রাজ্যেশ্বর অপেক্ষা সাহিত্যিকের স্থান উচ্চতর। যে মহাসাগরের স্রোত-ধারার জন্য তৃষিত লোকসমাজ একাগ্র চেষ্টায় প্রণালীর পর প্রণালী খনন করিতেছে—তাহা শুধু সাহিত্যের স্বচ্ছ নির্ম্মল ধারাটির ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিত্তে আসিয়া মিলিতেছে, যে ভূমি বারিপাতের অভাবে শুষ্ক কঠিন হইয়া রৌদ্রতাপে জ্বলিতেছে তাহার উপর দিয়া সে অক্ষয় নির্ঝরধারা মধুর কলগীতি গাহিয়া বহিয়া আসিতেছে, দুপাশে তাহার তরুর শীর্ণ শাখা নব পল্লবে মুঞ্জরিয়া উঠিতেছে, কর্কশ

তুমি তৃণমণ্ডিত হইয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কুহককন্যার মত তাহার ভিতর নামিয়া আসিতেছে কত্রমূর্ত্তি ছায়া, নিদ্রা, শান্তি, তৃপ্তি, আশা, বিশ্বাস,—একি আনন্দ! কি উল্লাস! কি হর্ষ! *

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

মীরাবাই

(১)

মেরাতা রাজপুতনার একটী ছোট সহর। বিকানীর হইতে যোধপুর যাইবার পথে সহরটী অবস্থিত। এই নগরে রাঠোর বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম রতন সিংহ। মীরাবাই তাঁহারই কন্যা।

জগতে যে সকল পূজনীয়া রমণী আত্মীয় স্বজন ও সমাজের নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়াও ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছেন, মীরাবাই তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইঁহার জন্মে ভারতবর্ষের নারীজাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে।

১৫০৪ খৃষ্টাব্দে মীরা বাইয়ের জন্ম হয়। মীরার জননী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। মার সাহায্যে বাল্যকালেই মীরার কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

মীরা যখন ছেলেমানুষ তখন তাহাদের রাজবাড়ীর ধারদিয়া বিবাহের একটী খুব জমকাল মিছিল যাইতে-ছিল। রাজপুরীর সকল মেয়েরাই মিছিল দেখিতে ছাদের উপর দৌড়াইয়া গেল। মীরার মা তখন নির্জ্জন দেখিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া পূজা করিতে বসিলেন। ভগবানের পূজা করিয়া তিনি এত আনন্দ পাইতেন যে মিছিলের গোলমালে যোগ দিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

মা এইরূপে ভগবানের পূজায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাহা দেখিয়া মেয়েরও খেলা ধূলা ভাল লাগিত না।

মীরাও মার পাছে পাছে পূজার ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে একদিন আব্দার করিয়া মাকে বলিল, "মা আমার কি বিয়ে হবে? আমার বর কোথায় বলনা মা?" মা ছোট মেয়েটীকে বুকে টানিয়া আদর করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তারপর ঘরের দেবতার দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেবতাই তোর স্বামী।" সরলা বালিকা মার কথা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল। স্বামীর সম্মুখে নূতন বধূ যেমন ঘোমটা দেয় মীরাও তেমনি মাথায় ঘোমটা টানিয়া মার কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। জননী বোকা মেয়েটীর রঙ্গ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বালিকা মীরার চেহারাটী বড়ই সুন্দর ছিল। কাঁচা সোনার মত উজ্জ্বল বর্ণ। দেখিতে ঠিক যেন একখানি দেবীপ্রতিমা। আবার তাহার গলার স্বরও খুব মিষ্ট ছিল। মীরার গান শুনিয়া মেরাতার নরনারী মুগ্ধ হইত।

মীরা অল্প বয়সে বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি নিজে গান রচনা করিয়া কীর্ত্তন করিতেন। তার কবিত্ব ও গানের সুখ্যাতি অল্পদিনের মধ্যে নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

রাজপুতনার মধ্যে মেবার রাজবংশ খুব সম্মানিত। এই দেশে অনেক বড় বড় বীর জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশের মান রক্ষার জন্য বাদশার সঙ্গে লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়াছেন। শক্তিতে ও সম্মানে রাজপুতনায় তাহাদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। এই মেবারের রাজা রাণা সঙ্গ মীরার রূপ গুণের কথা শুনিয়াছিলেন। তাই নিজের ছেলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। মেবারের রাণার সঙ্গে সম্বন্ধ করা রাঠোর বংশের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা ছিল। তাই মীরার পিতা আনন্দের সহিত এই বিবাহে সম্মত হইলেন। তখন মীরার বয়স মাত্র বার বৎসর। তাঁহার বিবাহে আদৌ মন ছিল না। কারণ তিনি তাঁহার দেবতাকেই একমাত্র স্বামী বলিয়া মনে করিতেন। অন্য কাহাকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেমন করিয়া? বিবাহের খবর শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতে পারিলেন না। ১৫১৬ খৃঃ অব্দে মেবারের যুবরাজ ভোজরাজের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। রাজার বিবাহ! ভোজরাজ খুব ধুমধাম করিয়া সৈন্য সিপাহী লোকলস্কর লইয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন।

---

* মেরী করেলির Happy Life শীর্ষক প্রবন্ধের সারাংশ অবলম্বনে লিখিত।

বিবাহের সময় কনের বর প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পুরনারীরা মীরাকে প্রদক্ষিণ করিতে লইয়া যাইতেছিল। মীরা কিন্তু বরের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না, সোজা-সুজি মন্দিরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে যাওয়ার সময় উপস্থিত হইল। সঙ্গীরা নানাবিধ অলঙ্কারে মীরার সুন্দর দেহ খানি সাজাইয়া দিল। মা চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে আদর করিয়া তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। শ্বশুরবাড়ী গিয়া এ সকল পাগ্‌লামি না করে সেই জন্য সকলেই কত উপদেশ দিলেন, কিন্তু মীরার প্রাণে কাহারও কথা প্রবেশ করিল না। তিনি পাগলিনীর ন্যায় অস্থির হইলেন; ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিয়া লুটোপুটি করিতে লাগিলেন।

শ্বশুরবাড়ীর সকলের তীব্র শাসনের মধ্যে মীরা তাঁর প্রাণের হরিকে ত এমন স্বাধীন ভাবে আর ডাকিতে পারিবেন না। সেইখানে তাঁর ভগবানের আরাধনার ব্যাঘাত ঘটিবে। মীরা এই ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উপায় নাই। বিবাহ যখন হইয়াছে তখন শ্বশুরবাড়ী যাইতেই হইবে।

মীরা এখন রাজবধূ কিন্তু ধন জন মণি মুক্তায় তাঁর মন বসিল না। এমন কি মেবার-রাজকুমারের গভীর ভালবাসাও তাঁহার চিত্তকে ভোগের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। তাঁহার চিত্ত দিন রাত ভগবানের চরণেই লাগিয়া থাকিত।

রাজবধূ মীরার সম্মুখে একটী পরীক্ষা উপস্থিত হইল। মেবারের রাণী পুত্রবধূকে বলিলেন, "হরিনাম ছাড়িয়া তুমি ভগবতীর আরাধনা কর, তা হইলেই নারীজীবন সার্থক হইবে।" মীরা তাঁহার উপাস্য দেবতা হরিকেই প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছিলেন। তাই ভগবতীর পূজা করিতে অস্বীকার করিলেন। পুত্রবধূর অবাধ্যতা রাণীর অসহ্য হইল। তিনি কুপিত হইয়া রাণার নিকট মীরার নামে অভিযোগ করিলেন। "নূতন বধূ এখনই আমাকে মানিয়া চলিল না। ভবিষ্যতে তাঁহাকে লইয়া ঘর করা পোষাইবে কিনা সন্দেহ।" রাণা ক্রোধে অধীর হইয়া মীরাকে শাসন করিতে ছুটিয়া গেলেন। সকলেই ভয়ে অস্থির হইল যে আজ কি একটা কাণ্ডই ঘটিয়া বসে। রাণার রাগ ত সহজ রাগ নয়। শেষে রাণী নিজেই অনেক বলিয়া কহিয়া রাণার ক্রোধের শান্তি করিলেন। রাণা বিরক্ত হইয়া অন্তঃপুরের বাহিরে মীরার থাকিবার জন্য ভিন্ন একটী বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিলেন!

মীরার ভালই হইল। সংসারের কোলাহল হইতে দূরে আসিয়া তিনি আরও প্রাণ খুলিয়া ভগবান্‌কে ডাকি-বার সুযোগ পাইলেন। সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিল, কিন্তু ভগবান তাঁহাকে আরো বেশী করিয়া গ্রহণ করিলেন। রাজ্যের যত সাধু সন্ন্যাসীদের অবাধ যাওয়া আসার কথা ক্রমে রাজপরিবারের লোকদের কাণে উঠিল। তাহারা কিছুতেই এই অপমান সহিতে প্রস্তুত নহেন। ননদিনী উদয় বাই মীরাকে শাসন করিবার জন্য উগ্রমূর্ত্তিতে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি রাজকুলবধূ হইয়া রাস্তার যত সাধু ফকিরের সঙ্গে বসিয়া গল্প কর, এ কি রকম স্বভাব? ভজন করিতে চাও ত নির্জ্জনে করিলেই হয়। তুমি যে আমাদের রাজকুলের কলঙ্ক হইয়াছ দেখি-তেছি।" মীরা নীরবে সকল তিরস্কার শুনিলেন। তারপর করযোড়ে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, "হে প্রভু আমার শাশুড়ী নিষ্ঠুর, ননদিনী বিবাদিনী, আমি কি করিয়া এত কষ্ট সহিব। কিন্তু হে গিরিধর, তোমার জন্য মীরা সকল নিন্দা গ্লানি ও তিরস্কার সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে।"

"হে প্রভু তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই। সাধুর সঙ্গ করিয়াছি বলিয়া আমি সংসারের সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনও ক্ষোভ নাই, কারণ আমি হৃদয়ে যে প্রেমের বীজ রোপন করিয়াছিলাম অশ্রুজলে বার বার তাহা সিক্ত করিয়াছি। আমি সংসা-রের ভয় লাজ বিসর্জ্জন দিয়াছি। লোকে আমার কি করিতে পারে? প্রভুর প্রতি মীরার প্রেম অবিচলিত। ইহাতে যাহা হয় হউক।"

উদয় বাই পিতার নিকট গিয়া মীরার অবাধ্যতার কথা বলিলেন। রাণা ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। চরণা-মৃতের মধ্যে বিষ মিশাইয়া মীরাকে পান করিতে

পাঠাইলেন। মীরা কিছুই জানেন না। তিনি সরল বিশ্বাসে চরণামৃত মনে করিয়া সেই বিষ পান করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব করিলেন, তাঁহার সোনার অঙ্গ কাল হইয়া উঠিল। তখন মীরা বুঝিতে পারিলেন যে, নিষ্ঠুর শ্বশুর ছল করিয়া তাঁহাকে বিষ পান করাইয়াছেন।

কিন্তু জীবন গেলে কে হরির নাম প্রচার করিবে? প্রভুর কাজ ত হইল না। এই দুঃখে মীরা কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর আত্মসংবরণ করিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গাইয়া উঠিলেন, "রঞ্জো! আমার হৃদয়-বিহারী, কেহ বলে মীরা কলঙ্কিনী, কেহ বলে ঘোমটা না দিয়া বক্ষের আবরণ খুলিয়া মীরা নৃত্য ও কীর্ত্তন করে। রাণা বিষের পাত্র পাঠাইয়াছেন, মীরা আনন্দে তাহা পান করিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ গিরিধরই তার স্বামী; মীরা কিছুতেই তাহার সেবা পরিত্যাগ করিবে না।"

এদিকে রাণা মীরার মৃত্যুসংবাদ শুনিবার জন্য আশা করিয়া রহিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপায় এ যাত্রা তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল। আবার প্রাণ ভরিয়া তিনি হরিনাম প্রচার করিতে পারিবেন এই আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন "হে রাণা, তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছ বলিয়া আমি একটুও দুঃখিত নহি। তোমার পুত্র আমার স্বামী নহে। ভগবানই আমার স্বামী, আমি তাঁহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি। তাঁহার অধম পতিত ভক্ত আমার আত্মজন। আমি সেই ভগবৎ সেবা না করিয়া থাকিব কেমন করিয়া!"

বিষ পানেও মৃত্যু হয় নাই শুনিয়া রাণা মীরার গৃহের সম্মুখে পাহারা নিযুক্ত করিলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে "সাধু বা ফকির মীরার গৃহে গমন করিলে তিনি নিজে হাতে তাহাকে হত্যা করিবেন।"

মীরা অনেক সময় একা উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতেন। পাহারাওয়ালা একদিন শুনিতে পাইল যে মীরা যেন ঘরের মধ্যে কাহার সহিত কথা বলিতেছেন। সে দৌড়িয়া রাণার কাছে গিয়া বলিল, 'মহারাজ মাতাজী দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে যেন কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন।" রাণা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মীরার ঘরের দিকে ছুটিলেন। সূর্য্যের আলোকে তাঁহার খোলা তরবারি খানা ঝক্ মক্ করিতেছিল। রাণা দরজার কাছে গিয়া গভীর গর্জ্জনে মীরাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই গোপনে কাহার সহিত কথা বলিতেছিস্ শীঘ্র বল্, আমি তাহাকে হত্যা করিব।" মীরা দরজা খুলিয়া দিলেন, তাঁহার চিত্ত নির্ভীক। দৃষ্টি ঈশ্বর-প্রেমে উজ্জ্বল। তিনি ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আমি প্রভুর সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম।" রাণা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। "কে তোর প্রভু, কোথায় সে শীঘ্র বল্।" মীরা উত্তর করিলেন, "এই যে তিনি আমার সম্মুখে, আমার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন।" মীরার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া রাণা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি লজ্জিত হইয়া অধোবদনে ফিরিয়া গেলেন।

দিল্লীর সম্রাট আক্‌বর সাহের ধর্ম্মমত খুব উদার ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। মীরাবাইর একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তির কথা তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল। মীরাবাইর সুমধুর কীর্ত্তন শুনিতে তাঁহার খুব ইচ্ছা হইল। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক "তানসেন" তখন আক্‌বরের সভায় ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাদশাহ একদিন ছদ্মবেশে মীরাবাইর গৃহে উপস্থিত হইলেন। মীরার মধুর সঙ্গীতে সম্রাট ও তানসেন মুগ্ধ হইলেন। একগাছি বহুমূল্য হার সম্রাট মীরাকে উপহার দিলেন। মীরা সন্ন্যাসিনীর মত থাকিতেন, বহুমূল্য হার তিনি গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। আক্‌বর ছল করিয়া বলিলেন, "আমি একদিন উপাসনা হইতে উঠিয়া পথে এই হার ছড়া পাইয়াছি। তার পর ভাবিতেছিলাম যে, কোন একজন সাধু মহাত্মাকে ইহা দান করিব। আজ আপনাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার একান্ত ইচ্ছা যে এই হার আপনি গ্রহণ করেন।"

মীরা আক্‌বরের কথায় বিশ্বাস করিয়া হারছড়া গ্রহণ করিলেন। তার পর এই হারের কথা রাণার কর্ণগোচর হইল। রাণা জহরী ডাকিয়া হার পরীক্ষা করিলেন। জহরী বলিল যে ভারতবর্ষে এইরূপ মূল্যবান হার আর

নাই। রাণা মীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কে এই হার দিয়াছে? মীরা বলিলেন যে, একজন ধনী মীরার ভজন শুনিয়া এই হার উপহার দিয়াছেন। তাঁহার নাম তিনি জানেন না। মীরা কি করিয়াই বা আক্‌বরকে চিনিবেন। তিনি তো বাদশাহের বেশে আসেন নাই। রাণার কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি অনুসন্ধান করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, আক্‌বরই ছদ্মবেশে আসিয়া মীরাকে এই হার দান করিয়াছেন। মীরার স্বামীও একথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার চরিত্রে তাঁহারা অযথা সন্দেহ করিতে লাগিলেন।

মুসলমান বাদসাহ হিন্দু-রাজার কুলবধূকে হার উপহার দিয়াছেন ইহা রাজপরিবারের সহ্য হইবে কি করিয়া? তাঁহারা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া মীরায় মৃত্যু-চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে, কৌটার মধ্যে তীব্র বিষধর গোক্ষুর সাপ বন্ধ করিয়া রাণা মীরার নিকট পাঠাইলেন। তিনি ভাবিলেন যে মীরা কৌটা খুলিবামাত্র সেই সর্প তাঁহাকে দংশন করিয়া সংহার করিবে। মীরা সরল বিশ্বাসে কৌটা খুলিলেন অমনি সেই ভীষণ সর্প ফণা তুলিয়া গর্জন করিতে করিতে তাঁহাকে দংশন করিবার জন্য অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মীরা বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু নিকটে। তিনি একটী গান ধরিলেন, তাঁহার মধুর কণ্ঠের ঝঙ্কারে সাপটিও থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। চোখের জলে মীরার গণ্ড ভাসিয়া যাইতেছিল। সঙ্গীতের মধ্যে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। তাঁহার সেই ভক্তি-বিহ্বল দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়া সর্পের হৃদয়ও যেন গলিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ফণা গুটাইয়া চলিয়া গেল। ভগবানের কৃপায় এ যাত্রাও মীরার জীবন রক্ষা পাইল।

অহঙ্কারী রাণার জ্ঞানচক্ষু এখনও ফুটিল না। তিনি মীরাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকে মীরাকে দেবী মনে করিয়া ভক্তি করিত। নিত্য নরহত্যায় যাহারা অভ্যস্ত তাহারাও এই ভক্তিমতী রমণীর গায়ে হাত তুলিতে সাহস করিল না।

কোন কৌশলে মীরাকে বধ করিতে না পারিয়া নির্দ্দয় শ্বশুর ধর্ম্মপ্রাণা বধূকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি রাজবংশকে কলঙ্কিত করিতেছ। আমরা তোমার মৃত্যু কামনা করিয়া থাকি, তুমি যে কোনও উপায়ে হউক মৃত্যুকে বরণ করিও।"

মীরা তখন নীরবে মৃত্যুর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার চিরবন্ধু চিরনির্ভর অগতির গতি হরিকে স্মরণ করিলেন। শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দীন ভিখারিনীর ন্যায় ছেঁড়া কাপড় পড়িলেন।

রাত্রির ঘন অন্ধকার চারিদিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত নগরী নীরব। রাস্তায় কোন লোকজন নাই। রাজকন্যা ও রাজবধূ মীরা সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দীনা ভিখারিনীর ন্যায় পথের বাহির হইলেন। একমাত্র সঙ্গী তাঁহার হৃদয়দেবতা। অন্তর সেই দেবতার প্রেমেপূর্ণ।

ভিখারিনী মীরা একাকিনী নদী তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সেই অসহনীয় হৃদয়-বন্ধু হরির নিকট নিবেদন করিলেন। নদী যেন তাঁহারই দুঃখে তাঁহারই সুরে সুর মিলাইয়া কুল কুল শব্দে বহিতেছিল। সেই পবিত্র নদীর তাপহরা শীতল জলে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পরে অচেতন অবস্থায় মীরা তীরে ঠেকিলেন এবং ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিলেন। তিনি তখন কাঁদিয়া বলিলেন, "হে হরি, কেন এই অভাগিনীর অসার জীবন রক্ষা করিলে? আমিত মরিবার জন্যই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। হে নাথ, কেন তুমি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলে?"

সেখান হইতে উঠিয়া মীরা লোকালয়ের দিকে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ দুর্ব্বল। অনাহারে তিনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ সময়ে এক গোয়ালা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। মীরা তাহার কাছে বৃন্দাবন যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত মীরাকে দেখিয়া গোয়ালার দয়া হইল। সে তাঁহাকে দুধ খাইতে দিল। মীরা দুধ পান করিয়া একটু সবল হইয়া বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করিলেন। সাক্ষাৎ ভক্তির মূর্ত্তি মীরা যে পথ দিয়া যাইতেন তাহার দুই ধার ভগবানের প্রেমের ধারায় প্লাবিত হইত।

মীরার সেই মধুর সঙ্গীতে পাপীর পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত। তাঁহার ভক্তিবিগলিত অশ্রুধারায় দুঃখী ও পাপীর হৃদয় জুড়াইত। মীরা আসিতেছেন শুনিয়া কত দূর দূরান্তর হইতে কত লোক আসিয়া পথের ধারে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত। সকলে মনে করিত যে, এই দেবী পাপী উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া তিনি বৈষ্ণব সাধু জীব গোস্বামীর সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি কোনও স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন না। মীরা সেই কথা শুনিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি জানিতাম, যে বৃন্দাবনের সকল ভক্তই রাধা, আর সেই ভগবানই একমাত্র আত্মাবিহারী পুরুষ। আজ বুঝিলাম, যে ভগবানের আর একজন শরিক আছেন।" গোস্বামী মীরার কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি পরে মীরার সহিত দেখা করিলেন। মীরার ভক্তিপূর্ণ ভজন ও কীর্ত্তন শুনিয়া সাধু মুগ্ধ হইলেন। মীরাও বৃন্দাবনের রাস্তায় রাস্তায় হরিনাম গান করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এ দিকে মীরার গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মেবারের অবনতি আরম্ভ হইল। ধর্ম্মপ্রাণা মীরার অবমাননায় ক্ষুব্ধ হইয়া সাধু ভক্তেরা রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সাধারণে রাণাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অবশেষে রাণার চৈতন্য হইল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহার পুত্রবধূ সামান্য স্ত্রীলোক নহেন, ঈশ্বর-প্রেমে দেশকে পবিত্র করিবার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনুতাপে দগ্ধ হইয়া তিনি মীরার কাছে লোক পাঠাইলেন। কয়েক জন ব্রাহ্মণ রাণার দূত হইয়া মীরাকে রাজ্যে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন। তাঁহারা প্রথমে অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। অবশেষে যখন কিছুতেই মীরা ফিরিয়া আসিতে সম্মত হইলেন না তখন ব্রাহ্মণেরা হত্যা দিয়া রহিলেন। মীরাকে তাঁহারা বলিলেন, "তিনি যদি ফিরিয়া না যান তবে তাঁহারা সেইখানেই আত্মহত্যা করিবেন।" মীরা বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। গৃহ ছাড়িয়া তাঁহার প্রাণ এখন বিশ্বমন্দিরের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সে প্রাণ ত আর ফিরিতে চাহে না। মীরা কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি তাঁহার হৃদয়ের কথা হৃদয়-দেবতার নিকটে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত মন প্রাণ সঙ্গীতের সুরের সহিত উত্থিত হইয়া গেল। তিনি তখন তন্ময় হইয়া আসিয়াছেন। এই সঙ্গীতের মাঝখানে তাঁহার আত্মা দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া বিশ্ব-আত্মার সহিত মিলিয়া গেল।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

বিচ্ছেদ।

এই বিশাল বিশ্ব-যন্ত্রে অবিরাম মহান বিচ্ছেদ-সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে ;—সে সঙ্গীত বড়ই বেদনাময়, বড়ই করুণ, বড়ই মধুর, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। এই বিচ্ছেদ,—অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিচ্ছেদ, আর বেশী কিছুই নয়।

আচ্ছা, আমরা অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিচ্ছেদে এত নিগূঢ় বেদনা অনুভব করি কেন? অতীতকে কি আমরা ফিরিয়া পাইতে চাই? বোধ হয় না। বাল্যে যে জিনিষ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছি, বর্ত্তমানে কি সেই জিনিষ ঠিক তেমনি ভাবে গ্রহণ করিতে পারি? নিশ্চয়ই না। তবে এই তীক্ষ্ণ অথচ সান্ত্বনা-পূর্ণ বেদনা কেন অনুভব করি? বোধ হয়, অতীতের সুখ-দুঃখময় স্মৃতি যে ভাষার-অতীত অনুভূতি বহন করিয়া আনে, তাহাই পরম উপভোগ্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। বাল্যের যে আত্মহারা আনন্দের ভাব এখন পৃথিবীর রাজত্ব পাইলেও ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তাহার স্মৃতিই সুখ, কিন্তু বড়ই অশ্রুময় সে সুখ। সেই স্মৃতিই বুঝি জীবনের অবলম্বন!

সকলেই বোধ হয় এই বেদনা অনুভব করেন! কিন্তু কবিদের হৃদয়েই বিশ্ব-বেদনা ঝঙ্কৃত হইয়া সঙ্গীতময় হইয়া উঠে। তাই তাঁহারা বিশ্ববাসীর মুখপাত্র হইয়া বিগলিত হৃদয়ে গাহেন, আর বিস্মিত হইয়া অনুসন্ধান করেন—"এ করুণ সঙ্গীত কোথা হইতে আইসে,—এত ব্যথা কেন?"

"Tears, idle tears, I know not what they mean,
Tears from the depth of some divine-despair,
Rise in the heart, and gather to the eyes,
In looking on the happy autumn fields,
And thinking on the days that are no more"

Tennyson.

"আঁখি-জল, অর্থশূন্য, উদ্দেশ্যবিহীন,
অনির্দ্দেশ্য হাহাকারে লইয়ে জনম—
উঠে চোকে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল ভেদি,
চেয়ে থাকি যবে আমি শারদ প্রভাতে
ঢল ঢল, হাস্যময়ী প্রকৃতির পানে,
উকি দেয় যবে মনে হারাণ অতীত!"

সর্ব্বত্রই এই বিচ্ছেদ সঙ্গীত! হেমচন্দ্র গভীর বেদনাভরে গাইলেন ঃ—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!"

বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে এতখানি বিচ্ছেদই হইয়া গিয়াছে যে, পুরাতন চন্দ্রের উদয় এখন অনাবশ্যক, না হইলেও চলিতে পারে,—কাজেই অসহ্য;—হৃদয়কে শীতল না করিয়া শুধুই দহন করে। জীবন এমনই অসহ্য অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, যে শত পুরাতন চন্দ্র আসিলেও আর আলোকিত হইবার নহে। আর এক স্থানে তিনি গাহিয়াছেন ঃ—

ছিন্ন তুষারের প্রায়, বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে;
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ শত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্নদুর্গ প্রাকারে।

জীবনের বিফলতার কি হৃদয়বিদারক চিত্র! বাল্যে কত আশা, কত উদ্যম, কত স্ফূর্ত্তি,—কিন্তু এখন?

মাইকেল তাঁহার অদ্ভুত জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে দাঁড়াইয়া কাঁদিলেনঃ—

আশায় ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে!
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?

* * * *

দিন দিন শক্তিহীন, তেজোহীন দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায়!

কি কাতরোক্তি! শূল-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদের মত!

আমাদের রবীন্দ্রনাথের বীণায় বিশ্বের অনন্ত অনুভূতির চরম ঝঙ্কার বিবিধ ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে; যিনিই হৃদয় দিয়া তাঁহার সমস্ত কবিতা পড়িয়া দেখিয়াছেন, তিনিই বোধ হয় বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে বিচ্ছেদের সুর তাহাতে কত প্রবল! কিন্তু ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই,—

"We look before and after
And pine for what is not;
Our sincerest laughter
With some pain is frougt;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

Shelly.

সম্মুখে পশ্চাতে চেয়ে চেয়ে,
যাহা নয়, কাঁদি তারি তরে;
প্রাণভরা হাসিতে মোদের
কি যেন বিষাদ রহে ভ'রে;
মিষ্টতম সঙ্গীত তাহাই,
তীব্রতম অশ্রু যাহে ঝরে!

যখন প্রাণ ভরিয়া উঠে, তখন স্বতঃই কবির চোকে জল উথলিয়া উঠিতে থাকে;

নদী ভরা কূলে কূলে ক্ষেতে ভরা ধান
আমি ভাবিতেছি ব'সে, কি গাহিব গান!
কেতকী জলের ধারে, ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে বকুল বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ।

* * *

পাখীর প্রমোদ গানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল!

দোয়েল দোলায়ে শাখা, গাহিছে অমৃত মাখা,
নিভৃত পাতায় ঢাকা কপোত যুগল।
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল!"

আর এক দিক দেখুন;—দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, আশা ভরসা ধীরে ধীরে মরীচিকার মত অন্তর্হিত হইতেছে,—

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে
পারে যারা যাবার, গেছে পারে;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে!
ফুলের বার নাইক আর, ফসল যার ফললনা,
চোকের জল ফেল্‌তে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঞ্জের আলো জ্বল্‌ না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

তখন স্বতঃই মর্ম্ম মন্থন করিয়া আকুল আহ্বান উঠে—

ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়!

তখন স্বতঃই অতীতের শত স্মৃতির তীব্র যাতনায় ছট্‌ ফট্‌ করিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে—"পার কর, ডুবিয়ে দেও সমস্ত স্মৃতি,— নিভিয়ে দেও আমাকে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হইতে!

কবি আর এক জায়গায় স্ত্রীলোকের বধূ-জীবন ও গৃহিণী-জীবনের এক মনোরম বিচ্ছেদ-দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। কয়েকজন তরুণী "কক্ষে লইয়া ঝারি" জল আনিতে চলিয়াছে, অতীত-বধূজীবন গৃহিণী জানালায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন,—

ওরা চলেছে দীঘির ধারে।
ঐ শোনা যায় বেণুবন ছায়
কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
শেষ হয়ে গেছে জল ভরা আজ,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।
ওরা চলেছে দীঘির ধারে—
আমি কোন্‌ছলে যাব ঘাটে
শাখা-থরথর পাতা-মর-মর
ছায়া-সুশীতল বাটে!

* * *

একি শুধু জল নিয়ে আসা?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কি কব, কি আছে ভাষা!
কতনা দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে
কত কাঁদা কত হাসা!
একি, শুধু জল নিয়ে আসা?

* * *

ওগো দিনে কতবার করে'
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে!

* * *

আজ ভরা হয়ে গেছে বারি।
আঙিনার দ্বারে চাহি পথ পানে
ঘড় ছেড়ে যেতে নারি।
দিনের আলোক ম্লান হয়ে আসে,
বধূগণ ঘাটে যায় কল হাসে,
কক্ষে লইয়া ঝারি।
মোর ভরা হয়ে গেছে বারি।

কি মর্ম্মভেদী হাহাকার,—"ভরা হয়ে গেছে বারি!" অতীতে আমার কত-কি ছিল;—আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, উৎসব, কলহাস্য—সবই ছিল। এখনও সংসারে তাহার সকলই আছে, কিন্তু আমার আর তাহাতে যোগ দিবার অধিকার নাই। আমি গণ্ডির বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। বসিয়া বসিয়া সারা জীবন দেখিব, আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব।

বস্তুতঃ সংসারে প্রতিনিয়তই এই বিচ্ছেদ-দৃশ্য অভিনীত হইতেছে। ইহা বড়ই মর্ম্মভেদী, কিন্তু ইহাই উত্তপ্ত মানব-জীবনে স্নিগ্ধ প্রলেপ, বিচ্ছেদ অনুভব করিবার শক্তিই প্রকৃত হৃদয়বত্তার পরিচায়ক। মাঝে মাঝে নয়ন-জল ঝরে বলিয়াই বোধ হয় পৃথিবী এতদিন সরস আছে, নচেৎ সমস্ত সাহারা মরুভূমি হইয়া যাইত!

সেইদিন স্বপ্নে দেখিলাম, একটী যৌবন-কৈশোরের মধ্যবর্ত্তিনী বালিকা অতি করুণ কণ্ঠে গাহিতেছে:—

"আর পুতুল খেলবনা,—আরত পুতুল খেলবনা!" পুতুল-খেলাকে বিদায় দিতে যে বালিকার জীবনের কতখানি অংশকে বিদায় দিতে হইতেছে তাহা বালিকার করুণ মুখচ্ছবি, এবং অতি করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বুঝা যাইতেছিল! এই পুতুল-খেলা যে জীবনের এক প্রধান অংশ ছিল; ইহার অভাবে যে জীবনটা ফাঁকা হইয়া যাইবে! তথাপি, লতা যেমন, যে পত্রের স্নিগ্ধ ছায়াতলে এতকাল বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, পুরাতন হইলে তাহাকে নির্ম্মম ভাবে পরিত্যাগ করে, এখন পুতুল-খেলাকেও ঠিক সেই ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। রাখিয়াও সুখ নাই, এখন সংসারে নাট্যে জীবন্ত পুতুল খেলা আরম্ভ করিতে হইবে; কিন্তু বিদায় দিতেও হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়! কি তীব্র বিচ্ছেদ-সঙ্গীত!

পূর্ণিমা রজনীতে একদিন আমাদের গ্রামের ছোট খালটীর পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। জ্যোৎস্নায় ও জলে মাখামাখি করিয়া, ঝিকিমিকি করিয়া কি মনোরম হাস্যই হাসিতেছিল, তাহাই এক দৃষ্টে দেখিতেছিলাম। মধ্যে মধ্যে দুই একটী অন্ধকারময় পানা অনাহুত রসভঙ্গকারীর মত সেই ঝিকিমিকির উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল। খালের ওপারে বাগানের কলাগাছগুলি সমীরণের সঙ্গে মহা আলাপ জুড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের তলে আলোকে আঁধারে মিলিয়া ছুটাছুটি খেলিতেছিল। এমনি সময়ে সেই জ্যোৎস্নাময় নৈশ প্রকৃতি প্লাবিত করিয়া একটী ডিঙ্গিনৌকার মাঝি আবেগ-কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—"এতদিনে শ্যাম ব্রজলীলা সাঙ্গ হল।" কি যে হইয়া গেলাম বলিতে পারি না। মন যেন উজান বাহিয়া কত যুগযুগান্তের প্রান্তে ছুটিয়া চলিল। অতীতের মুখ হইতে যেন একখানা যবনিকা সরিয়া গেল,—একটী করুণ দৃশ্য মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠিল। ব্রজের গোপাল ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়াছেন। যেই স্থানে তিনি বসুদেবের কোল হইতে নামিয়া যশোদার কোলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, যেখানে তাঁহার শত স্নেহ, ভালবাসা, অভিলাষ, আশা একে একে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, যেখানে প্রভাত হইলেই রাখালগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে গোষ্ঠে লইয়া যাইতে আসিত, যেখানে তিনি মাখন চুরি করিতেন—শত স্নেহের অত্যাচারে সকলকে ব্যতিব্যস্ত রাখিতেন, যেখানে তিনি কালীয়দমন করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন,—যেখানে বাঁশরীর রবে যমুনা উজান বহিত, কদম্ব শিহরিয়া ফুটিয়া উঠিত—গোপীগণ পাগল হইয়া ছুটিত,—সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আজি কর্ম্মবীর কর্ম্মের আহ্বানে সংসারে ছুটিয়া বাহির হইতেছেন! সমস্ত ব্রজবাসী আজ কাঁদিয়া রথচক্রের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িতেছে, কৃষ্ণের হৃদয়ের মধ্যে যে কি হইতেছে তাহা তিনিই জানেন;—তবু যাইতেই হইবে! তখন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কি ক্রন্দন উঠে না—"এত দিনে শ্যাম, ব্রজলীলা সাঙ্গ হল?" কি পূর্ণ বিচ্ছেদ সঙ্গীত!

এক দিন এক বাউল আমাদের উঠানে বসিয়া নিমাই-সন্ন্যাসের হৃদয়দ্রাবী গান গাহিতেছিল। সে গাহিতেছিল,—"ভাইরে, আমার সন্ন্যাসের কথা মায় যেন শোনে না!" তারপরে আর কি গাহিল, আমার কানে আসে নাই। আমার মনের মধ্যে কেবল ঐ এক লাইনই গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছিল। বিশ্ব-বেদনার বীণা হৃদয়ের মধ্যে বাজিয়া উঠিয়াছে, মানবের তাপদগ্ধ হৃদয়ের আকুল আহ্বান হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; এইরূপ সময়ে প্রেম ও শান্তির প্রস্রবণ যাঁহার হৃদয়ে আছে, সেকি গৃহ-কোণে আবদ্ধ থাকিতে পারে? যাইতেই হইবে, তবুও, হৃদয়ের একটী প্রিয়তম সূত্রে যে আঘাত পড়ে! সে যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না,—সমস্ত অতিক্রম করিয়া আকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠে;—"আমার সন্ন্যাসের কথা মায় যেন শুনে না!"

আমাদের বাঙ্গালা দেশে পিত্রালয় হইতে কন্যা বিদায়ের সময়, এই বিচ্ছেদ-সঙ্গীতের বিষাদময় বেহাগ রাগিণী বাজিয়া উঠে। কি নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ! শৈশবাবধি যে স্থানের সহিত হৃদয়ের প্রতি তন্তু,—প্রতি প্রবৃত্তি, নিগূঢ় ভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, আজ সবলে সেই সমস্ত উৎপাটিত করিয়া, এক অচেনা অজানা স্থানে সেই সকল স্থাপিত করিতে হইবে!

কিন্তু প্রকৃত বিচ্ছেদের এখানেই আরম্ভ নহে। এখনও পিত্রালয়ের প্রত্যেক তৃণটী পর্য্যন্ত হৃদয় শোণি-

ত্তের তুল্য প্রিয়। হৃদয়ের সহিত যতক্ষণ যোগ থাকে ততক্ষণ আর বিচ্ছেদ কোথায়?

মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল। স্বামীর আদরে, শ্বশুর শ্বাশুরীর যত্নে পিত্রালয়-বিচ্ছেদ বেদনাও কথঞ্চিৎ ভুলিয়া রহিল। ক্রমে শ্বশুরালয়ের প্রতিও একটু টান হইল। কিছুদিন পরে কত আগ্রহের সহিত পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল! আসিয়া দেখিল,—একি! সব যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! যে সকল সখিগণের সঙ্গে এই সেই দিনও প্রাণ খুলিয়া খেলা করিয়া গিয়াছে, আজ যেন তাহাদিগকে নিতান্তই বালিকা মনে হয়! যে সব খেলা খেলিয়াছে, তাহা যেন নিতান্তই ছেলে-মানুষি বলিয়া বোধ হয়! মনে হয়, এই স্থানটাই যেন ঠিক তাহাকে মানাইতেছে না;—কিসের যেন অভাব! এই সময় হইতেই বিচ্ছেদের পূর্ণ আরম্ভ! এখন হইতেই পিত্রালয়—"A hope, a love, still longed for"—একটা আশা, একটা আকর্ষণ, একটা চির-বাঞ্ছা,—কিন্তু পাইলেও ঠিক পূর্ব্বের মত তৃপ্তি নাই!

অনেকেই বোধ হয় "অভিমন্যু বধ" যাত্রার অভিনয় শুনিয়াছেন। অভিমন্যু বধটাই একটা অতি করুণ বিরাট বিচ্ছেদ ব্যাপার। সমস্তটাই কারুণ্যে পরিপূর্ণ। অভিমন্যু যখন বুকভরা ভালবাসা লইয়া গাহে,—"তুমি মম সুধা সম চির-জীবনের" তখনও মনে হয় যেন এই হর্ষোচ্ছ্বসিত স্বরের মধ্যেও একটা করুণ সুর লাগিয়া রহিয়াছে। এই চির-জীবন' যে অচিরাৎ কত হ্রস্ব হইয়া পড়িবে তাহার ভাবনা-ই কি আমাদিগকে পীড়া দেয় না?

তারপরে কিশোরী উত্তরা যখন গাহেন,—

> "বালিকা বয়সে ছিলাম স্ববশে
> কোন জ্বালা সখি ছিল নারে।"

তখন এই নবীনা কিশোরীর অতীত বালিকা বয়সের জন্য, আমাদের মনে কি এক করুণা-পূর্ণ সহানুভূতি জাগিয়া উঠে না? সে এমনই একটা জিনিষ হারাইয়াছে, যাহা আর ফিরাইবার নহে, যাহা নাই বলিয়াই হৃদয়ে একটা হাহাকার উঠিতে থাকে। কিন্তু যাহা পাইয়াও সুখ নাই;—যাহার স্মৃতিই এখন শান্তি। বর্ত্তমানে এই "জ্বালাই" তাহার জীবনের পরমার্থ।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এক মহান ব্যাপার,—ছাত্র জীবন হইতে সংসার-জীবনে পাদক্ষেপ। আমরা হারাই কি?—আনন্দ কৌতূহল, উদ্যম, উৎসাহ, লঘু-চিত্ততা, স্বাধীনতা। আর পাই কি? অশান্তি, অনুৎসাহ, নির্জ্জীবতা, অধীনতা, কাপুরুষতা, ক্ষুদ্রচিত্ততা, স্বার্থপরতা! কি ভীষণ বিনিময়! পরজীবনে যখনই আমরা আমাদের পুরাতন স্কুল কলেজের নিকট দিয়া যাই, তখনই মনে হয়,—সংসার বৃক্ষের ফল খাইয়া ঐ স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি, ইহজনমে আর পুনঃ প্রবেশাধিকার পাইব না।

এইরূপই সংসার! সময় চলিয়া যাইতেছে,—কাহারও সাক্ষাৎ বিচ্ছেদের জন্য সে অপেক্ষা করে না—

> "আপনার মনে আপনার ভাবে
> অশ্রুসিক্ত পদে চলিয়া যায়;
> শুনে না কাহারো রোদনের রব,
> কারো মুখ পানে ফিরে না চায়।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

পরিণাম।

গ্রামের প্রান্তে ছোট একখানি কুটীর। ভিতর হইতে প্রবলভাবে নাড়া পাইয়া জানালার কপাট দুইখানা বাহিরে পড়িয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে, একটি লোক বাহিরে লাফাইয়া পড়িল। শুষ্ক মূর্ত্তি, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, ওষ্ঠ কাঁপিতেছে। তার হাতে একখানা ছুরি, তখনো তাহা হইতে ফোঁটাফোঁটা রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল!

চারিধার নিস্তব্ধ। ভোরের আলো তখনো ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। বিস্ফারিত চক্ষে, একবার চারিধারে চাহিয়া, লোকটি, মাঠের উপর দিয়া, বনের পানে ছুটিল!

প্রায় আধ ঘণ্টা দ্রুত ছুটিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে একটা ঝোপের কাছে আসিয়া সে বসিয়া পড়িল! কপাল হইতে ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে—কাঁটায় পা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বসিয়া, ছুরি দিয়া, সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল! গর্ত্ত হইলে, তাহার ছুরিখানা পুঁতিয়া সে মাটি চাপা

দিল, এবং উপরে, ঘাসের চাপড়া ভরিয়া, সেই শিশির-সিক্ত জমির উপর, সে পা ছড়াইয়া বসিল। বসিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল—কোন শব্দ নাই! চারিদিকে তখন অবিচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ করিতেছিল!

সূক্ষ্ম পরদার মত,রাত্রির অন্ধকার সরিয়া যাইতেছিল, এবং ধীরে ধীরে তাহারি পিছনে, অস্পষ্ট আলো ফুটিয়া উঠিতেছিল! সেই অস্পষ্ট আলোকে চারিধার ছায়ার মত দেখাইতেছিল!

তাহার মনে হইল, জগতের শেষ দিনে, শেষ মুহূর্ত্তে, যেন সে এই বিশাল প্রান্তরে একা বসিয়া আছে—জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই—জীবনের এতটুকু চিহ্নও কোথা নাই! মূক প্রকৃতির সম্মুখে, সে যেন, আজ, কাহারও শেষ আহ্বানটির জন্য বসিয়া আছে! কি-এক মোহ তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল।

সহসা কিসের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। পথে গরুর গাড়ী চলিতেছিল। দূর হইতে তাহারি শব্দ, যেন, কেমন অদ্ভুত-মত শুনাইতেছিল!

ধীরে ধীরে প্রকৃতি জাগিতেছিল! পাখীর দল নিমেষে কুহরিয়া উঠিল! দোয়েল, মিষ্ট রাগিণীতে, সারা গগন ভরিয়া তুলিল! বিধাতার আশ্বাস সঙ্গীত, দূর আকাশের বক্ষ ভেদ করিয়া, যেন, রমণীর অঙ্গে স্নিগ্ধ ধারার মত, ঝরিয়া পড়িল! অসংখ্য পাখীর গানে, ধরণীর প্রভাতী-স্তোত্র, নিমেষে, চারিধারে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবং পূর্ব্ব-গগন উদ্ভাসিত করিয়া লোহিত সূর্য্য তাহাদেরি সহিত বন্দনা-গীতে যোগ দিল। চারিধারে কি-এক অপূর্ব্ব আনন্দদ্যুতি ফুটিয়া উঠিল!

লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল! তার দেহ কাঁপিতেছিল—মাথা ঘুরিতেছিল!

ঝোপের পাতাগুলা সরাইয়া, সন্তর্পণে, সে চারিধারে চাহিল! ঐ না, কার পায়ের শব্দ শুনা যায়? ঐ না, দূরে? না, পাশে? না, শুধু, মনের ভ্রম! সে খুনী—খুন করিয়া পলাইয়াছে, তাই তার এত আতঙ্ক!

ঝোপের মধ্য দিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া সে চলিল! জঙ্গলে, নিবিড় জঙ্গলে, গিয়া আশ্রয় লইবে! যেখানে কেহ আসে না, কেহ থাকে না—জনপ্রাণী নাই—এমন স্থানে গিয়া, তবে, সে বিশ্রাম লাভ করিবে, আরাম পাইবে—এখানে নয়, এখনি কেহ ধরিয়া ফেলিবে!

সারাদিন বেচারা পথ চলিল! গাছের পাতার ফাঁক দিয়া তারি দুই-চারিটা কিরণ-রশ্মি বনে নামিতেছিল! গাছের তলায় সে বসিল। কিন্তু, না,—শান্তি নাই, বিরাম নাই! ক্ষুধার জ্বালায় সে অস্থির হইল! গাছে কি ফল নাই? একটিও? তৃষ্ণায় যে, সে একান্ত কাতর! নিকটে কোথাও কি একটু জল মিলিবে না? তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল! কাঁটার ঝোপ ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়াছে, অমনি, সে দেখে,—সর্ব্বনাশ!—দুইটা লোক! উপায়?

একজন কহিল, "কে হে তুমি, বনের মধ্যে?"

ভয়ে তার রক্ত হিম হইল! মুখ সাদা হইয়া গেল! থমকিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল! কি বলিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। দ্বিতীয় লোকটি কহিল, "তোমার অত খপরে কাজ কি? বনে কাঠ ভাঙতে এসেছে!"

আঃ, এ যাত্রা, সে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে ত!

লোক দুইটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল!

আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। এবার, খুব সাবধানে! পথের ধারে, কোনমতে না গিয়া পড়ে, সে বিষয়ে সে সতর্ক হইল! দূরে, একটা নিবিড় ঝোপের ধারে, জল দেখিয়া, দুই হাতে গাছের ডালপাতা সরাইয়া যেমন, সে অগ্রসর হইবে, দেখে,—কি বিপদ—একটা লোক ডোবার ধারে দুই পা মেলিয়া খাইতে বসিয়া গিয়াছে। সে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল! রুটিতে চিনি মাখাইয়া, বাঃ, দিব্য মুখে তুলিতেছে—একটুকরা কি চাহিলে পাওয়া যায় না? দিবে কেন? কাড়িয়া লইলে হয় না? পা টলে, হাত কাঁপে, বলে আঁটিয়া উঠিবে না—শেষে কি রীতিমত গোল বাধিয়া যাইবে। চুপি চুপি সে সরিয়া আসিয়া, একবার, আকাশের পানে চাহিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "হা ভগবান্, জগতে কোথাও কি আজ আমার স্থান নাই?"

তাহার মনে হইল, জগতে সকলে সুখে আছে—কাহারো কোন দুঃখ নাই, সেই শুধু যত-কিছু যন্ত্রণার তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে!

কাতর দৃষ্টিতে আবার সে তাহার পানে চাহিল! কি আরামেই লোকটি আহার করিতেছে! কুকুরবিড়ালকে, যেমন, একটুকরা আহার ফেলিয়া দেয়, তেমন করিয়াও, যদি তাকে আজ, কেহ একটুকরা দেয়—আহা! অন্ততঃ, একটুখানি জল! কিন্তু সম্মুখে যাইতে সাহস হয় না! সহসা সে শিহরিয়া উঠিল! "ঐ—ঐ—সব সন্ধান পাইয়াছে।" সে চাহিয়া দেখিল—যেন, অসংখ্য লোক ছুটিয়া আসিতেছে! সে-ও ছুটিল!

ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায় চলিয়াছে, তাহা সে জানে না! একটা ঝোপের পাশে আসিয়া আবার সে বসিল! তখন, দূরে, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছিল! তাড়াতাড়ি সে একটা গাছে চড়িল।

অদূরে, অশ্বপৃষ্ঠে, দুইজন প্রহরী আসিয়া উপস্থিত! একজন কহিল, "এই ক' ঘণ্টায়, কোথায় সে পলাল? বনটা আতিপাতি খোঁজা হচ্ছে—পাওয়া যাচ্ছে না!"

গাছের উপর, ভালো করিয়া, সে ডাল আঁকড়িয়া ধরিল—নিশ্বাস রোধ করিল—কি জানি, যদি কেহ তাহা শুনিয়া ফেলে!

প্রহরী দুইজন চলিয়া গেল! ক্রমে তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইল!

সে ও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! যেন, তার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে! কিন্তু ক্ষুধা—বিষম ক্ষুধার জ্বালায়, বনের মধ্যে যে তাকে মরিতে হইবে, তাহার উপায় কি? তবু সে গাছ হইতে নামিল না! আজ দুই দিন সে কিছু খায় নাই!

গাছের শাখায়, পাতার আড়ালে সে বসিয়া রহিল। তার পর, যখন আকাশে অসংখ্য তারা ফুটিল, ধরণী আবার নিদ্রার নীরবতায় আচ্ছন্ন হইল—তখন সে ধীরে ধীরে গাছ হইতে নামিল।

গাছের তলায়, চক্ষু মুদিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল, "হতভাগা, রাক্ষসের মত, স্ত্রী-পুত্রকে মারিয়া, পলাইয়া, কোথায় চলিয়াছিস! কোথায় গিয়া জুড়াইতে চাস! ফাঁসির ভয়ে বনে বনে এমন অনশনে ঘুরিয়া, কতদিন, কাটাইবি! এই আতঙ্ক, এই বিভীষিকা লইয়া বাঁচিয়া সুখী হইবি! কেমন শাস্তি—তবু, অপরাধের তুলনায়, কত লঘু! আহা, সাধ্বী স্ত্রী, অসহায় সন্তানগুলা!—"

বসিয়াই, সারা রাত কাটিল। তার পর, প্রভাতের আলো ফুটিল! তার মাথাটা রি-রি করিয়া উঠিল! আর সে পারে না—প্রচণ্ড ক্ষুধার যন্ত্রণা! না হয়, ধরা পড়িবে,—কিন্তু চাই, অন্তত এক টুকরা রুটি! চাই-ই!

পা আর চলিতে চাহে না! ভূমিতে দেহভার লুটাইয়া দিতে সাধ হয়! তবু চলিতে হইবে! হারে, মানুষের বাঁচিবার সাধ! অঙ্গ হইতে ঘাসের টুকরা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, সে উঠিল! নিকটে সরাই ছিল! সেইদিকে সে চলিল! ধীর, মন্থর গতি—মাতালের মত, তার পা টলিতেছিল!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে, সে গ্রামে আসিল। ঐ না, কুঞ্জের মত, পাতায়-ঘেরা সরাই দেখা যায়! আঃ, এ যেন স্বর্গ! সরাইয়ের কর্ত্তা কহিল, "কি দেব তোমাকে ভাই?"

"রুটি, আর একটু মদ!"

"শুধু রুটি, আর মদ? তা কেন,—একটু পনীর?"

"না—শুধু রুটি আর মদ—পনীর নয়! আমার কাছে অত পয়সা নাই!"

"পয়সার জন্য ভাবিয়ো না! তোমার যে রকম চেহারা দেখিতেছি, কতকাল খাও নাই—দামের জন্য ভাবনা নাই!"

অদূরে গির্জ্জার ঘড়ি বাজিল! লোকটি শিহরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের শব্দ, ও?"

"কেন? গির্জ্জার ঘড়ি! আজ যে রবিবার! তুমি কি খ্রীষ্টান নও? এখনি দেখিবে, কত লোক আসিবে এখানে!"

মুখে সে রুটি তুলিতেছিল,—ভয়ে, রাখিয়া দিল। কত লোক আসিবে! সর্ব্বনাশ! সে ভাবিল, তবে পলাই! কিন্তু সহসা পলাইলে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা—সন্দেহ করিবে যে! মাথায় হাত রাখিয়া, সে ভাবিতে লাগিল! কি ভাবিতেছিল, নিজেই তাহা জানিত না! উঠিতে যাইবে, এমন সময়, সে শুনিল, "এই যে পুলিশের দারোগা আসছেন!"

তার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। মাথার রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল।

দারোগাকে দেখিয়া, কোণের বেঞ্চে, সে শুইয়া পড়িল, —যেন, কত নিদ্রাতুর! কাহাকেও সন্দেহের কোন কারণ দিবে না, সে ঠিক করিয়াছিল।

ক্রমে আরো তিন-চারিজন লোক আসিয়া জমিল।

দারোগা কহিল, "আর পারি না—রবিবারেও ছুটি নাই। কুকুরের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছি! কোথায় শিকার তার সন্ধানই নাই!"

একজন কহিল, "রবিবারেও কাজ! কি এমন ব্যাপার, হে?"

আর একজন কহিল, "চোর, আর কি!"

দারোগা কহিল, "চোর কি? খুনী আসামী! স্ত্রী ও তিনটা ছেলেকে খুন করিয়া পলাইয়াছে—এমন কথা কখনো শুনিয়াছ?"

"সর্ব্বনাশ! ধরা পড়ে নাই?"

"না।"

"তাইত, লোকটার নাম কি?"

"পিরি পিকার্ড।"

"খুনের কারণ, কি?"

"কারণ আর কি? তার প্রহারের জ্বালায় সাধ্বী স্ত্রী কাঁদিয়া দিন কাটাইত। ছেলেগুলা তিনদিন অনাহারে থাকে, কাজেই সে পাঁচ বাড়ী ভিক্ষা করিয়া ছেলেগুলার মুখে অন্ন দেয়। এই তার দোষ! না খাইয়া, মরে নাই—তাই পিকার্ড সকলকে খুন করিয়া নির্ঝঞ্ঝাট হইয়াছে! বদমায়েশ, পাজী, অমন লক্ষী স্ত্রীর গায়েও হাত তোলে!"

"লক্ষীছাড়াটা এখনো ধরা পড়ে নাই? সকলে মিলিয়া সন্ধান করি, চল! আজ রবিবার—অন্য কাজকর্ম্মও নাই ত!"

"বেশ কথা"—একসঙ্গে লোকগুলা গর্জ্জিয়া উঠিল।

পিকার্ডের মনে হইল, কে যেন সহস্র কামান দাগিল!

দারোগা কহিল, "এই দেখ, তার ছবি। এখন, বোধ হয়, তাকে দেখিলে চিনিবে!"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! কোন ভুল নাই।"

পিকার্ডের নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম করিল। দারোগার কথার প্রতি বর্ণ, মুগুরের মত, যেন তার গায় বাজিতেছিল! তার মনে হইতেছিল, আর কতক্ষণই-বা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক! এত আলো, এখনি সব নিভিয়া যাইবে!

ভারী বুটের শব্দ করিয়া দারোগা পিকার্ডের দিকে আসিল, কহিল, "এই যে, তোফা, একজন ঘুম দিচ্ছে! কে, এ? ওহে, একবার এদিকে চাও,—তোমার মুখখানা দেখি! আমাদের একটি বন্ধুকে পাওয়া যাচ্ছে না—এত খুঁজছি—দেখি, তুমি ত সেই নও?"

সেই মুহূর্ত্তে, পিকার্ড মুখ ফিরাইল। তার মুখ, মরার মত সাদা হইয়া গিয়াছিল! চোখের তারা দুইটা যেন ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! গা-ও ছম-ছম করিতেছিল।

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই ত সে! নিশ্চয়!"

ধরিবার জন্য, দারোগা যেমন হাত বাড়াইবে, অমনি সে কুপিত ব্যাঘ্রের মত তার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। হঠাৎ টাল সামলাইতে না পারিয়া, দারোগা পড়িয়া গেল। অপর লোক গুলা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের ভাঙা জানালা গলিয়া, পিকার্ড একেবারে বাহিরে লাফাইয়া পড়িল! এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া গেল! যেন, একটা স্বপ্ন।

তারপর, ছুট, ছুট, ছুট! দিক-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুট দিল!

অনেকটা পথ ছুটিয়া, মাঠের মধ্যে আসিয়া সে বসিয়া পড়িল। আর ছুটিবার শক্তি নাই! একটু না জিরাইয়া লইলে, এখনি পড়িয়া যাইবে!

যেমন বসিয়াছে, অমনি একটা মিশ্র কোলাহল শুনা গেল। কিসের শব্দ? ইঃ, তাহারি অনুসরণে যে অসংখ্য লোক ছুটিয়াছে! আর উপায় নাই! শ্রান্ত, শ্বাসরুদ্ধ পিকার্ড হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল! সে দৃষ্টির সহিত শরীরের সমস্ত রক্ত যেন ছুটিয়া বাহির হইবে! চারিদিকে ভূমি সমতল—একটা ছোট পাহাড় নাই, গহ্বর নাই, এমন-একটা গাছের ঝোপও নাই—যে সে লুকাইয়া বাঁচে! এ কোথায় সে ছুটিয়া আসিয়াছে! কোন্ পথে?

তবু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে! শেষ চেষ্টা। নিতান্ত অলসের মত, সে আত্মসমর্পণ করিবে না! শরীরটাকে কোনমতে টানিয়া সে একটা পুষ্করিণীর ধারে গেল! ধীরে ধীরে জলে নামিয়া, গলা অবধি ডুবাইল—তীরের লম্বা ঝোপগুলা মাথার উপর টানিয়া, সে বেশ একটী আবরণের সৃষ্টি করিল! এবং ভূমিলগ্ন বৃক্ষের মত, যেন শিকড় গাড়িয়াছে, এমন নিশ্চলভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যখন জলটুকু স্বচ্ছ দর্পণের মত স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন পুষ্করিণীর তীরে প্রায় বিশজন চৌকিদার আসিয়া পৌঁছিল! অশ্বের হ্রেষা ও মানুষের চীৎকারে স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

দারোগা কহিল, "কোথায় গেল সে শয়তান?"

একজন কহিল, "আশ্চর্য্য! পাঁচ মিনিট আগে এধারে, তাকে আমি স্পষ্ট দেখেছি! আর এখন এসে দেখি, কোথাও সে নাই! নাক গুঁজে লুকোবে, এমন একটা ইঁদুরের গর্ত্তও ত এখানে দেখি না!"

আর একজন কহিল, "পুকুরে ডুব দেয়নি ত?"

দারোগা কহিল, "তা হলে গেল কোথায়? এমন স্থির জল, পুকুরে লুকোবার লোকও ত সে নয়!"

পিকার্ড সব কথা শুনিতেছিল! জীবনের আশা সে ছাড়িয়াই দিয়াছিল।

সকলে পুকুরের ধারে আসিল। একজন কহিল, "বিদ্যুতের মত গতিতে লোকটা পলাল! সকলের চোখে এমন করে ধুলা দিলে? ছিঃ।"

দারোগা কহিল, আর যা-ই করুক, তাকে আমি খুঁজিয়া বাহির করিবই! নরকে গিয়াও যদি সে লুকায়, তবু নিস্তার নাই! এখন, ঘোড়াটাকে একটু জল খাওয়াইয়া লই!"

দারোগা ঘোড়াকে হাঁকাইয়া পুকুর-ধারে আনিল! যেখানে পিকার্ড বড় লতাগুলা টানিয়া আড়াল করিয়া লইয়াছিল, ঘোড়া ঠিক সেইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘাড়টা ঝুঁকিতেই ঘোড়া কি এক ঘ্রাণ পাইল—পিছু হটিয়া, একেবারে, মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল! ঘোড়ার তপ্ত নিশ্বাস পিকার্ডের গালে লাগিয়াছিল!

দারোগা ঘোড়ার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "এর আবার হল কি?"

কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই সেখানে যাইবে না! ঘুরিয়া, দূরে গিয়া, সে জল পান করিল! দারোগা কহিল, "আমি এখন গ্রামের সীমানার দিকে যাই; পলাইবার ত, এখন সেই একমাত্র পথ। সেটা রোধ করি!"

তার পর, দারোগা ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া গেল! চৌকিদারের দল তাহার অনুসরণ করিল। পিকার্ড, আবার এখন একাকী।

শীতে তার হাত-পা জমিয়া গিয়াছিল। তবু সে অনেকক্ষণ-অবধি জল ছাড়িয়া, তীরে উঠিল না। যখন সে উপরে আসিল, তার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া জল ঝরিতেছে! মাথায় ঘাসের রাশি লাগিয়াছে, আর পুকুরের সেওলা ও পানা! মুখখানা বিশ্রী হইয়া গিয়াছে! উপরে উঠিয়া, চারিধারে, বেশ করিয়া, একবার সে চাহিয়া লইল! শীতে তার দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া যাইতেছিল! অস্পষ্ট স্বরে সে কহিল, "আঃ! বাঁচিয়া গিয়াছি!"

আবার ভাবিল, "বাঁচিয়াছি, বটে! কিন্তু কতক্ষণের জন্য? সীমানায়, দারোগা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! সারা দেশে হুলস্থূল বাঁধিয়া গিয়াছে! সকলে আমারি সন্ধানে ফিরিতেছে! একটি শত্রুর বিরুদ্ধে, সমস্ত দেশের অভিযান! পাগলা কুকুরের মত, আমাকে, সকলে তাড়াইয়া ফিরিতেছে! মুহূর্ত্ত বিরাম নাই! এমন নিষ্ঠুর, পাষাণ, মানুষ! শুধু, মানুষ কেন? ভগবানও আজ আমার প্রতি বিরূপ! যথেষ্ট হইয়াছে—আর আমি সহ্য করিতে পারি না!"

ভাবিতে ভাবিতে অঙ্গ হইতে পানা ও ঘাসগুলা সে ঝাড়িয়া ফেলিল।

সেই স্তব্ধ বিজনতায়, দুই হাতে মাথা ঢাকিয়া স্থির হইয়া সে বসিয়াছিল, বসে মাঝে-মাঝে শিহরিয়াও উঠিতেছিল! তার চারিপাশে যেন কাহারা সব ঘুরিতেছে-ফিরিতেছে! এমন বাঁচিয়া লাভ কি!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সে কহিল, "তাই হোক, ভগবান!" তার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল!

উঠিয়া সে আবার গ্রামের পথে চলিল! সেই গ্রাম, যেখান হইতে কিছু পূর্ব্বে সে পলাইয়া আসিয়াছে!

এক ঘণ্টা পরে পিকার্ড আসিয়া, আবার সেই সরাইয়ের দ্বারে দাঁড়াইল। সেখানে একদল লোক জটলা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই যে, খুনী পিকার্ড!" পিকার্ড কহিল, —অকম্পিত তার কণ্ঠস্বর, দৃঢ় ও স্থির —পিকার্ড কহিল, "হাঁ, আমি খুনী পিকার্ড—ধরা দিতে আসিয়াছি, চৌকিদারগুলাকে খপর দাও! আর ছুটিতে বা হাঁটিতে পারি না।"

পিকার্ড শান্তভাবে একখানা বেঞ্চের উপর বসিল। দুইজন চৌকিদার তখনি আসিয়া উপস্থিত হইল! পিকার্ড নিমেষে আহাদিগকে চিনিল—বনের মধ্যে, ইহাদিগকে দেখিয়াই সে গাছে চড়িয়াছিল।

আপনার দুই হাত সে বাড়াইয়া দিল। চৌকিদারেরা হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া, থানার দিকে তাহাকে লইয়া চলিল। পশ্চাতে উৎসাহী দর্শকের দল সারি গাঁথিয়া অনুসরণ করিল।

থানায়, হাজত-ঘরের লৌহ-কপাট যখন বাহির হইতে রুদ্ধ হইল, তখন অন্ধকার ঘরের ভিতর ভূমিশয্যায় পড়িয়া, পিকার্ড অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, "আঃ, এতক্ষণে আরাম পাইয়া বাঁচিলাম।"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা ও সংস্কার।

মানব প্রকৃতির বিশেষত্ব আত্মোন্নতির চেষ্টা। মানুষ কখনও এক অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। জ্ঞানালোকের ঈষৎ আভাস প্রাপ্ত হইলে আরও অধিকতর আলোক প্রাপ্ত হইবার জন্য মানব-হৃদয় ব্যাকুল হয়। মানব-হৃদয় পরিবর্ত্তন চাহে এবং মানব ক্রমোন্নতি সাধনের জন্য আগ্রহান্বিত।

শিক্ষাই উন্নতি সাধনের উপায়। ইহা যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধে সত্য তেমনি সমাজ সম্বন্ধে। শিক্ষা দ্বারা মানব-হৃদয় যেমন উন্নত হয় তেমনি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে সমাজে যে পরিমাণে জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হয় সেই সমাজের রীতিনীতি সেই পরিমাণে সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত হয়। অতএব শিক্ষার নিত্য সহচর সংস্কার। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও রুচি সংস্কৃত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ লোকে মনে করে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র মানসিক উন্নতিসাধন। বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানার্জ্জনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য;—কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে বস্তুতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য তিন প্রকার—(১) শারীরিক উন্নতিসাধন, (২) মানসিক উন্নতিসাধন ও (৩) নৈতিক চরিত্র-গঠন। যে শিক্ষা এই ত্রিবিধ উন্নতি-সাধনে সমর্থ হয় সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষানামে অভিহিত হইতে পারে।

শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—স্নায়ু সবল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সমূহের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য স্বাভাবিক রূপে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন।

মানসিক শিক্ষাদ্বারা বিচারশক্তি (reasoning power), স্মৃতিশক্তি (memory), ও কল্পনাশক্তি (imagination) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, হৃদয়ের ভাবসমূহ (emotion) অর্থাৎ স্নেহ, প্রেম, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি বিকশিত হয় এবং ইচ্ছাশক্তি (will-power) প্রবল ও প্রখর হয়।

শিক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য নৈতিক চরিত্র গঠন—ইহাদ্বারা একদিকে লোকের যেমন সত্যাসত্য ও হিতাহিত জ্ঞান জন্মে অপরদিকে তেমনি হৃদয় বিনয়, নম্রতা ও মধুরতাতে পরিপূর্ণ হয় এবং সুখ দুঃখ ও বিপদরাশির মধ্যে হৃদয় স্থির, ধীর ও অটল থাকিবার শক্তি লাভ করে।

এই মানসিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব, ইহার উন্নতিতেই মানুষ দেবত্ব লাভে সমর্থ হয়।

যে শিক্ষা কেবল শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে কিন্তু মানব চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ করিতে সমর্থ হয় না সে শিক্ষা জীবনের প্রকৃত উপকারী না হইয়া অনেক সময় অনিষ্ট সাধনেই রত হয়। পক্ষান্তরে ক্ষীণ ও ভগ্নদেহ লইয়া মনের উন্নতিসাধন বিড়ম্বনা মাত্র। অসুস্থ শরীরে

মনোবৃত্তির সম্যক বিকাশ সম্ভবপর নয়। কিন্তু শারীরিক বল-সম্পন্ন ও মানসিক বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে শ্রেষ্ঠ হইয়া যদি মানুষ চরিত্র-হীন হয় তবে সে পশু অপেক্ষাও অধম। চরিত্রহীন মনুষ্য ও বন্য পশু উভয়েই তুল্য। অতএব নৈতিক চরিত্র গঠনই মানবের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু মানবহৃদয় ক্রমোন্নতিশীল—সুতরাং মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন মানবের প্রধান লক্ষ্য হইলেও শারীরিক উন্নতিবিষয়ে উদাসীন হওয়া কখনও সঙ্গত নহে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা। শরীর হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মনকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চরিত্রগঠন প্রয়োজন। নৈতিক চরিত্রগঠন, বুদ্ধি ও বিদ্যার্জ্জন মনের সম্যক বিকাশমাত্র। শারীরিক বিষয়ে মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে প্রভেদ অতি অল্প। মনোবৃত্তির সম্যক উন্নতি সাধন দ্বারাই মানুষ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই সাধন বা শিক্ষার উন্নতিতেই মানুষ জগৎ-সৃষ্টিতে স্রষ্টার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছে ও জগতে অমরত্বলাভে সমর্থ হইয়াছে। এই পৃথিবীতে ভগবানের পরিচয় পাইলেই জীবন সত্য ও সার্থক হয় এবং তাঁহার পরিচয় না পাইলেই মানবজীবন বৃথা। ইতরপ্রাণী এই আত্মোন্নতিতে অসমর্থ এবং স্রষ্টার অনুসন্ধানে বঞ্চিত।

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা মানুষ যত উন্নত হইবে ভগবানের তত্ত্ব সেই পরিমাণে বুঝিতে পারিয়া আপনাকে সেই পরিমাণে দেবত্বের অধিকারী করিতে সমর্থ হইবে।

শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত সুখের কারণ। পৃথিবীতে মানবসমাজে নানাবিষয়ে যে সুখ সম্পদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, শিক্ষাই তাহার মূল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য যাহা মানবসমাজকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করিয়াছে এবং যদ্দ্বারা মানবসমাজের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, সকলের মূলেই শিক্ষা।

সংস্কার শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল। যে দেশে যে সমাজে শিক্ষার যে পরিমাণে বিস্তার ও উন্নতি সাধন হইয়াছে সেই দেশে, সেই সমাজে পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক রীতিনীতি সেই পরিমাণে উন্নতি ও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে। শিক্ষিত লোক সংস্কারের পক্ষপাতী। শিক্ষিত সমাজ কখনও কুসংস্কার, কুরীতি ও অসাধুতার সংস্কার না করিয়া থাকিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে শিক্ষার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে চিরদিন সমাজে কুসংস্কার, কুনীতি ও অসাধুতা প্রবেশ করিয়াছে।

এই জন্যই আমরা দেখিতে পাইতেছি, যখন যে দেশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সকলেই জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কারের যথাবিধি চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে এই শিক্ষা ও সংস্কারের ভাব যেরূপ সুস্পষ্ট বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল পৃথিবীতে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তৎপর আধুনিক সময়ে আমরা প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামও উল্লেখ করিতে পারি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণ সাধন, অর্থাৎ মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে শিক্ষার এই ত্রিবিধ ফল অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষা বিস্তার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়া জাতীয় জীবনে যে ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ফল কিছু কিছু এখন বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে রামমোহন রায় হইতেই এ দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সূচনা হয়। তাঁহার চেষ্টায় তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু তৎপর অনেক কাল পর্য্যন্ত শিক্ষাবিস্তার কেবল পুরুষজাতির মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়। শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ যে সাহায্য করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষাসংস্কার (বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার) ও সমাজ সংস্কার অর্থাৎ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ রহিত করা, বালবিধবার বিবাহ প্রচলন, জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজ যে পথপ্রদর্শক, ইহাতে আর সন্দেহ

নাই। এখন সংস্কারের ভাব নানা প্রণালীতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজেও অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এখনও অতি সামান্য পরিমাণেই সংঘটিত হইয়াছে। শুনিয়াছি এখনও এদেশে শিক্ষোপযোগী বালকদিগের মধ্যে মাত্র শতকরা কুড়িটী এবং বালিকাদিগের মধ্যে দুইটীর অধিক শিক্ষা-প্রাপ্ত হইতেছে না। যে দেশে শিক্ষার গতি এরূপ শোচনীয়, সে দেশে সংস্কার কার্য্য কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

দেশের অশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। নারীজাতির উচ্চশিক্ষা এখনো দেশের অনেক শিক্ষিত লোকেরও অনুমোদিত নহে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আজ কাল গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিস্তারের জন্য অধিকতর মনোযোগ ও অর্থব্যয় করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণের আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছেন, সন্দেহ নাই।

সকল দেশেই শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও এই কথা প্রমাণ করে। বর্ত্তমান সময়ে দেশের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন নারী জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা কিছুতেই বিদূরিত হইবে না।

যে পরিমাণে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হইতেছে সেই পরিমাণে দেশের ও সমাজের কার্য্যে নারী-জাতির দায়িত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যে নারীজাতির জীবন্ত সাহায্য (intelligent co-operation) ব্যতীত দেশ-হিতৈষীগণ কিছুতেই দেশের ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সফলকাম হইতে পারিবেন না। অতএব আমাদের সকলের কর্ত্তব্য, নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াও আমাদের পরিবারের, সমাজের ও স্বদেশের শিক্ষা ও সংস্কার কার্য্যে যতটুকু সম্ভব, সাহায্য করিতে ত্রুটী না করি। ভগবান আমাদের সহায় হউন, তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকোপরি বর্ষিত হউক!

শ্রীপ্রতিভা গুহ।

গৃহশিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এমেলিন। মিঃ মর্টন কিসের ভয়ে এত সঙ্কুচিত হন বাবা! দুর্ঘটনা বশতঃ তাঁহার চেহারা এমন খারাপ হইয়া গিয়াছে; এমন নিষ্ঠুর কে আছে যে এজন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে?

মিঃ হ্যামিণ্টন। হাঁ মা, আছে বৈ কি? অনেক লোক গির্জ্জায় যায় ধর্ম্মভাব হইতে নয়; শুধু আচার্য্যকে দেখিতে আর উপদেশের বচনমাধুর্য্য উপভোগ করিতে! তাহাদের মতের সঙ্গে না মিলিলেই তাহারা তীব্রভাবে সেই উপদেশের সমালোচনা করে। এই শ্রেণীর লোকের নিকট মিঃ মর্টন ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র ত হইবেনই। কিছু দিন মিঃ মর্টন টরিংটন গির্জ্জায় উপাসনা করিয়াছিলেন, লোকে লোকারণ্য! যখন এত লোক দেখিলাম তখনই মনে হইল, এদের অনেকে শুধু তামাসারই জন্য গির্জ্জায় যাইতেছে। আমার আশঙ্কা অবশেষে সত্যই হইল।

মিসেস্ হ্যামিণ্টন। কি হইয়াছে?

মিঃ হ্যামিণ্টন। আমি সে দিন মিঃ মর্টনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে অনেক ভাল ভাল কথা হইল। কিন্তু আমি আগাগোড়া লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার মনটা সেদিন যেন অতিরিক্ত পরিমাণে বিষণ্ণ! অবশেষে আমার আন্তরিক সহানুভূতিতে একটু সাহস পাইয়া তিনি হ্যারিসের সাপ্তাহিক পত্রিকার একটা কবিতার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। মিঃ মর্টন বলিলেন, "ভগবান্ আমাকে যে দুঃখ দিয়াছেন, তাও যেন যথেষ্ট নয়। মানুষও আমাকে এই ভাবে আক্রমণ করিয়া তাদের সহৃদয়তার পরিচয় দিতেছে! অবশ্য এতে কাহারও নাম নাই, কিন্তু বিদ্রূপের লক্ষ্য যে আমি তাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।" মিঃ মর্টনের এই করুণ উক্তির উত্তরে আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। অতি দক্ষতার সহিত কবিতাটি লেখা, সুতরাং বিদ্রূপটা নিতান্তই মর্ম্মভেদী হইয়াছে। এরূপেও মানুষ শক্তির অপব্যবহার করে!

মিস্ হারকোর্ট। কি আশ্চর্য্য! হ্যারিস এই

কবিতাটী প্রকাশ করিল! তাহার পত্রিকায় ত ব্যক্তিগত বিদ্রূপাদি প্রকাশিত হয় না!

মিঃ হ্যামিণ্টন। পত্রিকাখানি সুসম্পাদিত নয়। হ্যারিস এত উঁচুদরের লোক নয় যে, একটা কবিতা বাহির হইলে যদি কাগজ দ্বিগুণ বিক্রী হয় তবে নীতির খাতিরে তাহা হইতে বিরত হইবে। আমি তখনই তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার ঘরে বিক্রীর বাকী যত কাগজ ছিল কিনিয়া আনিয়াছি, এবং তাহাকে খুব তিরস্কার করিয়াছি। সে অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সে দুঃখটা যে বড় আন্তরিক নয় তাহা তাহার কথার ভাবেই বেশ বুঝিয়াছি। সপ্তাহ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে সুতরাং পত্রিকার প্রচার যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। যদি আমি লেখককে একবার পাইতাম তবে বুঝাইয়া দিতাম, সে শুধু নিষ্ঠুর নয়—মহা অপরাধী।

কেরোলিন। কিন্তু বাবা! লেখক হয়ত মিঃ মর্টনের ইতিহাস কিছুই জানে না।

মিঃ হ্যামিলটন। তাতে তার দোষের কিছু লাঘব হয় না। আমি অনেকবার তোমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কথা বা কার্য্যে মানুষের হৃদয়ে আঘাত করা গুরুতর অন্যায়। অপরকে যে বেদনা দেওয়া হয় তাহা অল্প হউক কি অধিক হউক তাহাতে বড় আসে যায় না, কাজটাই অন্যায়।

মিসেস্ হ্যামিণ্টন। দেখ! লেখক হয় ত এরূপ শিক্ষা কখনও পায় নাই। হাসি ঠাট্টার কবিতা দুর্ভাগ্যক্রমে লোকের নিকট এতই শ্রুতিসুখকর যে কাহারও প্রাণে যে আঘাত লাগিবে সে কথা হয় ত লেখকের মনেই জাগে নাই। শুধু একটু প্রশংসা পাইবার লোভে, মজা করিবার জন্য লিখিয়াছে। আমাদের বেশী কঠোর হওয়া উচিত নয়; কারণ আমরা জানি না—

মিসেস্ হ্যামিণ্টন তাঁহার কথা শেষ করিতে পারিলেন না। পার্সি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। মনের কষ্টে তাঁহার প্রায় বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। মিসেস্ হ্যামিণ্টনের কথা শেষ না হইতেই সে অতি কষ্টে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মাগো—মা—অমন কথা বলিও না—" পার্সি আর কিছু বলিতে পারিল না। মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সবলে আত্মসংবরণ করিয়া সে সোজা দাঁড়াইয়া তাহার অপরাধ সরল ভাবে, অকপটে, স্বীকার করিল। সে যে তাহার দ্বিতীয় মাসের হাতখরচের টাকা কিরূপে একটী দরিদ্রের সাহায্যার্থে খরচ করিয়াছিল, সে কথাটা শুধু গোপন করিল। হারবার্ট কথা কহিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু পার্সি অতি অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাহাকে নীরব থাকিতে অনুরোধ করিল।

মিঃ হ্যামিণ্টন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কৃত কর্ম্মের জন্য পার্সি কিরূপ মনঃকষ্ট পাইতেছে, তিনি তাহা বেশ বুঝিয়াছেন। সে অতি মহত্বের সহিত তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। তীব্র ভাবে তাহাকে তিরস্কার করা আর ভাল দেখায় না। তথাপি তিনি কঠোর স্বরে তাহাকে বলিলেন, "ইচ্ছাপূর্ব্বক যে তুমি মিঃ মর্টনের মনে আঘাত দেও নাই, তাহা জানিলাম। কিন্তু তুমি কিরূপে তোমার হাতখরচের টাকাগুলি উড়াইয়াছ আমার নিকট তাহা গোপন করিলে, সুতরাং তোমার আরও কিছু অপরাধ গোপন রাখিলে। দেখ, আমি তোমাকে কখনও শাস্তি দিব না। তোমার বয়স হইয়াছে। তোমার নিজের মনই তোমার শাস্তি বা প্রশংসার ব্যবস্থা করিবে। তোমার চিত্ত যদি দৃঢ় হইত—আমি ভ্রান্তি বশতঃ মনে করিয়াছিলাম তোমার চিত্ত সুদৃঢ়—তাহা হইলে সঙ্গদোষ তোমাকে ওরূপ কবিতা লিখিতে প্রলুব্ধ করিত না। এখন তোমার দুর্ব্বলতার ফল তুমি ভোগ কর। যে দুঃখ-কষ্টে ক্লিষ্ট তুমি এমন একজন লোককে অতি নিষ্ঠুর ভাবে আরো ক্লেশ দিলে। তোমার আমার মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন এখন ছিন্ন হইল। যাও, স্কুলে যাইবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।"

এই কথা বলিয়া মিঃ হ্যামিণ্টন সবেগে গৃহত্যাগ করিলেন। পার্সি কাতর দৃষ্টিতে মাতার দিকে তাকাইল। মিসেস্ হ্যামিণ্টন এতই বিমর্ষ, এতই অভিভূত হইয়াছিলেন, যে পার্সি তাহা সহিতে পারিল না। দ্রুতবেগে বাহির হইয়া সে স্কুলের দিকে চলিল। হারবার্ট তখন জননীর নিকট পার্সির সেই বিপন্নকে সাহায্য করিবার কথা বলিল, জননীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পার্সি যখন দোষ স্বীকার কালে এই কথাটি গোপন করিতেছিল তখন সকলেই বুঝিয়াছিল যে সে কিছু গোপন করিতেছে। মিসেস হ্যামিল্টন এজন্য এতক্ষণ বড়ই উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলেন। হারবার্টের কথা শুনিয়া তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা দূর হইল। পার্সি যদিও ইহাতে অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছে তবু ইহার মধ্যে যে অতি বড় মহত্বের পরিচয় আছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি তখনই একথা বলিবার জন্য স্বামীর নিকট ছুটিয়া গেলেন।

মিঃ হ্যামিল্টন তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি চিরদিনই আমার শান্তিবিধায়িনী। তোমার কথা শুনিয়া মন অনেকটা হাল্কা হইল। কিন্তু বল দেখি, পার্সি ত এই সামান্য প্রলোভনটুকু সামলাইতে পারিল না, ভবিষ্যতের প্রলোভনের তুলনায় ইহা ত প্রলোভনই নয়, সে তখন কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে? তবে তুমি যাহা বলিতেছ তাহাও সত্য মনে হয়। এমন সত্যপ্রিয়তা, সদাশয়তা ও অকপটতা চরিত্রে বর্ত্তমান থাকিতে সে অন্যায়ের পথে কখনও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিবে না। আচ্ছা বল দেখি, এখন উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে কি করা যায়? এখন ত মর্টনের সহিত আমার মেশাই কঠিন। সকল জানিয়া শুনিয়া ত এখন এমনভাবে চলিতে পারি না যে, কবিতাটার রচয়িতা কে আমি তাহা জানি না!

মিসেস্ হ্যামিল্টন। আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি আগে পার্সির সঙ্গে কথা বলি, তারপর যা হয় করা যাইবে।

অপরাহ্নে খেলিবার অবসরকালে এমেলিন বাহিরে বাগানে খেলিতে গেল না। 'বড় গরম' এই বলিয়া তার মার বসিবার ঘরে চলিয়া গেল—উদ্দেশ্য মার কাছে জানিয়া লইবে তাহার বাবা কোথায়। কিন্তু মাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, মিঃ হ্যামিল্টন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। সে তাঁহার হাটুর উপর গিয়া বসিল এবং মুখখানি সোহাগে পূর্ণ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

মিঃ হ্যামিল্টন বলিলেন, "কি গো এমেলিন, তুমি কি বর চাইবে?—খুব একটা কিছু চাইবার আছে বুঝি?

এমেলিন। "তুমি কি করিয়া জান্‌লে বাবা!"

মিঃ হ্যামিল্টন। কেন, তোমার চক্ষের দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারিতেছি।

এমেলিন। আমার চোখ দুটা তা'হলে বড়ই বিশ্বাসঘাতক! আচ্ছা আমি কি চাই তাহারা তাও বলিয়াছে?

মিঃ হ্যামিল্টন হাসিয়া বলিলেন, "না, সে ভারটা তোমার জিহ্বার উপর আছে।"

মিসেস্ হ্যামিল্টন হাসিয়া বলিলেন, "আমি কিন্তু তাহাও বুঝিয়াছি!"

এমেলিন। আমি তোমাকে বলতে চাই বাবা! তুমি— এইটুকু মাত্র বলিয়া এমেলিন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মাতা বলিলেন, "তুমি এই বলিতে চাও, যে বাবা যেন পার্সির উপর আর রাগ না করেন—না?"

এমোলিন। হাঁ বাবা, মা ঠিক অনুমান করিয়াছেন। বাবা, তুমি তাকে ক্ষমা কর। আহা! দাদা বড় মনঃকষ্ট পাইয়াছে। তুমি বকিবার পূর্ব্বেই সে বড় ক্লেশ পাইয়াছে। আর তুমি মনে করিয়াছিলে, দাদা তার টাকা কোন অন্যায় কাজে উড়াইয়াছে, তা'ত করে নাই! সে খুব একজন গরীব লোককে সেই টাকাগুলি দিয়াছে। আমরা কোন দয়ার কাজ করিলে তুমি ত কত ভালবাস বাবা! তুমি পার্সিকে ক্ষমা কর,—ক্ষমা করবে বাবা?

মিঃ হ্যামিল্টন। তোমার মা দেখিতেছি যাদুকর, আর মেয়েটী একটী উকীল! আচ্ছা, যদি আমি কাল থেকে তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করি, তা' হলে?

এমেলিন। তা'হলে তুমি আরো লক্ষ্মী বাবা, আমার সোণা বাবা।

এই বলিয়া চুম্বনের পর চুম্বনে সে তার বাবাকে অস্থির করিয়া তুলিল; তার পর আনন্দে নাচিতে লাগিল। মিঃ হ্যামিল্টন তখন তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা এমেলিন, আমি ত তোমার কথা শুনিলাম, এখন তুমি একবার আমার কথা শোন।" তৎক্ষণাৎ এমেলিন আবার পিতার উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মিঃ হ্যামিল্টন। তুমি আগে আমায় বল ত, পার্সি হ্যারিসের কাছে লেখা পাঠাইতে না হয় ভুলই করিয়া-

ছিল, কিন্তু আদৌ মিঃ মর্টনকে লক্ষ্য করিয়া কবিতা লেখাটা কি তাহার ভাল হইয়াছিল ?

এমেলিন। না বাবা! নিশ্চয়ই এ কাজটা দাদা ভাল করে নাই। আমি নিশ্চয় জানি, দাদা যদি সে দিনের আমোদে একটু বেশী উত্তেজিত হইয়া না পড়িত, তবে কখনই এমন কবিতা লিখিত না। সারাদিন শুধু আমোদ—আমোদ, এত আমোদে যে মাথা ঠিক রাখাই কঠিন। মিঃ মর্টনের প্রাণে আঘাত দিবার জন্য যে দাদা কবিতাটা লেখে নাই, সে নিশ্চয়। দাদা যে তার সঙ্গীদের অপেক্ষা এ সব বিষয়ে পেছনে নয়, শুধু এই বাহাদুরীটা লইবার জন্যই কবিতাটা লেখা হইয়াছিল। আর ভিতরে শক্তি থাকিলে এমন উত্তেজনার সময়ে এমন ভাব মনে আসা কি স্বাভাবিক নয় বাবা! কিন্তু আমার দাদা পার্সি ইচ্ছা করিয়া একজন ধর্ম্মাচার্য্যকে ঠাট্টা করিবে, এমন কথা তুমি কখনো বিশ্বাস করিয়ো না বাবা! কিছুতেই না।

মিঃ হ্যামিল্টন। বেশ বলিয়াছ মা! কিন্তু আমার ইচ্ছা অমান্য করিয়া সে যে ধার করিল, তুমি তাহা সমর্থন করিবে কি করিয়া!

এমেলিন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই দাদা সেটা অন্যায় করিয়াছে। কিন্তু বাবা! দাদা যখন সেই ছবিগুলির অর্ডার দিয়াছিল, তোমাকে অমান্য করিবার ভাব নিশ্চয়ই তাহার মনে জাগে নাই। তুমি ত জান বাবা, দাদা কিছু অধৈর্য্য।"

মিঃ হ্যামিল্টন। তবু মেয়ে সমর্থন করিতে ছাড়িবে না! পার্সি কি জানে, সে কেমন উকীল পাইয়াছে ?

এমেলিন। না বাবা! দোহাই তোমার, তুমি দাদাকে এ কথা বলিও না।

(ক্রমশঃ)

"বাবু" বয়কট।

ছোট বেলায় দেখিয়াছি, গ্রামের জমিদার ভিন্ন কেহই "বাবু" নামের অধিকারী হইতেন না। অন্য ভদ্রলোকের কথা দূরে থাকুক জমিদারের বাড়ীতেও যিনি পাল্কীতে চড়িয়া, পাল্কীর আগে পাছে ধাবিত অসিহস্ত দারওয়ানের দ্বারা নিজের ক্ষমতা সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন, সেই লম্বোদর মাংসপিণ্ড, বুদ্ধির জাহাজ, প্রবল প্রতাপান্বিত দেওয়ান মহাশয়ও বাবু নামের যোগ্যপাত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন দেওয়ান মহাশয়। অন্যান্য ভদ্রলোক মুখুয্যা মহাশয়, সান্যাল মহাশয়, সেন মহাশয়, ঘোষ মহাশয় নামে আমন্ত্রিত হইতেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা চাকুরীর খেতাবেই পরিচিত, সঙ্গে বাবুর বড় নাম গন্ধ ছিল না। যেমন আলা সদরামীন, সদরামীন, মুন্সেফ্, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সেরেস্তাদার, পেশকার, দারোগা, জমাদার, মুন্সি, বক্সি প্রভৃতি। সম্মুখে হইলে "মহাশয়" গিয়া সেই সেই খেতাবের ডাইন ধারে গা ঘেঁষিয়া বসিত।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন "বাবু" নাম লাভ করিলেও, উপাধি লাভের পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের "বাবু" সম্মানে সম্মানিত হইবার সৌভাগ্য হয় নাই। তিনি রায় মহাশয়, হদ্দ দেওয়ানজী নামে সম্বোধিত হইতেন।* ভাগ্য-বিধাতা উকীলদিগেরও আর অতিরিক্ত ভাগ্য-বিধান করেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ভিতরেও গুরুঠাকুর মহাশয়, পুরোহিত, পুরুৎঠাকুর, তদ্ভিন্ন ভট্টাচার্য্যি মহাশয় বা চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিলেন। যাঁহারা নবদ্বীপে গিয়া ১০।১৫ বৎসর থাকিয়া "পোড়ামা তলায়" ঘটা করিয়া পূজা দিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের শিখা বর্দ্ধনের মত নামেরও খানিকটা বর্দ্ধন হইত। যেমন তর্কালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার বা বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি। দেওয়ানের সঙ্গে গা ঘেঁষিয়া বসিয়া "মহাশয়ের" তৃপ্তি হইল না, তর্কালঙ্কারের, বিদ্যারত্নেরও একাসনে গা ঘেঁষিয়া বসিতে প্রবৃত্তি হইল। এই ত গেল, সেকালের কথা।

মধ্যযুগে বঙ্কিম বাবুর মত সকলেই বাবু হইলেন। কেবল বেচারা দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীমোহন সরকার আসর বজায় রাখিলেন। কলিকাতার নাটু বাবু, ছাতু বাবুর মসনদে বসিতে কালীপ্রসাদ ঘোষ, খেলাত্ ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর বংশীয়েরা, দত্ত বংশীয়েরা বা ধনকুবের মল্লিকেরা কেহই সাহস

* ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম অবস্থায় কালেক্টরীর একজন করিয়া দেওয়ান থাকিতেন। রাজা রামমোহন রায় রঙ্গপুরে এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

করিলেন না। মফঃস্বলে কিন্তু জমিদারের সে মর্য্যাদা রহিল না। সেই জমিদারের চোখের সামনে সেই জমিদারেরই ভুক্তাবশিষ্ট রোটিতে যাহারা পুষ্ট-দেহ—সেই দেওয়ান, পেশকার, জমানবীশ, সুমারনবীশ, মুন্সি, বক্সি সকলেই "বাবু" হইলেন। আর যাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মিষ্ট সম্বোধনে গৃহে ও খোলা যায়গায় কখনও কখনও সম্মানিত, তাঁহারা যে "বাবু" হইবেন, সে বিষয়ে ত দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। মফঃস্বলের কোন রাস্তায় কিঞ্চিৎ জল ছিল বলিয়া —র বুট ভিজিতে পারে, আশঙ্কায় যিনি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া অপর পারে অতি সন্তর্পণে নামাইয়া দিলেন, বা নামাইয়া না দিলেও ন্যায় শাস্ত্রানুসারে যাঁহার এইরূপ যোগ্যতা আছে, ইঁহারা উভয়েই যে বাবু নামের যোগ্য সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত।

কলিকাতায় ময়রা, সেকরা একজনে রসগোল্লাকে রসাক্ত করে, অপরে গিনি সোনার একটি লাঙ্গুল প্রস্তুত করিয়া ঘড়ীর সঙ্গে গলায় ঝুলাইয়া দেয়; সুতরাং তাহারা স্বতঃসিদ্ধ বাবু। দেখিতে দেখিতে পণ্ডিতের নামের সঙ্গেও "বাবু" নামের সংযোগ হইল; কখন কখনও লেখিকার কর্ণ তাহার শ্রাবণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আবার কলিকাতায় ঝি মহলে কোন কোন বড় ঘরের মেয়েরাও 'দিদি বাবু' বলিয়া পরিচিতা হইলেন! আমি কিন্তু ব্যাকরণের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া কোন বৈয়াকরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ প্রয়োগ হইবে, মহাশয়?" তিনি বলিলেন, "বাবু শব্দ যখন অকারান্ত বা আকারান্ত নয়, তখন "বাব্বী" হইবে, ইহাতে তোমার সংশয় হইবার কারণ কি?" আমি বুঝিলাম, শিক্ষিতা ভগিনীগণ ইংরেজির হিড়িকে পড়িয়া ইংরেজী চাল চলনের অনুকরণে 'ঘোষা' না হইয়া 'ঘোষ' হইয়াছেন, 'সেনা' না হইয়া 'সেন' হইয়াছেন, 'উপাধ্যায়ী' না হইয়া 'উপাধ্যায়' হইয়াছেন। এখানেও সেইরূপ দেশী ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণদিগকে নমস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছেন।

পুরুষদিগের ধৃষ্টতা যেমন সহ্য হয় না, স্ত্রীদিগের একান্ত পৌরুষভাবে কেমন পরুষভাব আসিয়া দুঃখিত করে। এইটি প্রচলন হইবার সম্বন্ধে আর একটি কারণ আছে। ব্রাহ্মণ[illegible]জাতির স্ত্রীলোকের উপাধি ছিল "দাসী"। এই অসম্মানের উপাধি ধারণে ভাগিনীদিগের একান্ত আপত্তি; কিন্তু উৎকল ব্রাহ্মণদিগের ভিতরে অনেকের 'দাস' উপাধি আছে, তাঁহারা আভিজাত্য ও স্বশ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কোন কোন সন্ন্যাসীর 'দাস'—কোন কোন শ্রমণার দাসী উপাধি ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে অধিকাংশ পুরুষের দাস, অধিকাংশ মহিলার দাসী উপাধি অতীত যুগ হইতে রহিয়াছে। যখন কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির দাস বলা যায় না, তখন বলিতে হইবে, এ দাস দাসী জগতের। জগতের দাস দাসী হইবার সৌভাগ্য ক' জনের আছে! জগতের দাস দাসী হইলেই ত জগন্নাথের দাস দাসী হওয়া যায়। দাস ও সেবকের অর্থে কোন প্রভেদ নাই। এখন ত শিক্ষিত যুবকেরা সেবক (যেমন "স্বেচ্ছাসেবক?") সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছেন। তাহাতে লজ্জিত না হইলে, দাস হইতে লজ্জিত হইবার কারণ কি?

শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহাদিগের যথাক্রমে শর্ম্মা, বর্ম্মা, গুপ্ত, দাস, এই কয়েকটী উপাধির সৃষ্টি করিয়া স্ত্রী সাধারণের জন্য "দেবী" উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে আর জাতিগত পার্থক্য রাখেন নাই। আমার বোধহয়, পূর্ব্বে সর্ব্ববর্ণ সাধারণের মহিলারা অবলীলাক্রমে এই "দেবী" উপাধি গ্রহণে সমর্থা ছিলেন। এখনও কোচবিহার ও পাঙ্গার * রাণীরা—"দেবী" উপাধিতে অলঙ্কৃতা রহিয়াছেন। মধ্য যুগে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের একটী ভুলে শূদ্রামহিলাদিগের "দাসী" উপাধি হইয়াছে। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, রঘুনন্দন এই ব্যবস্থা স্থির করিতে যাইয়া বচনের অর্থে অনেক টানা হেচড়া করিয়াও সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। আমি শিক্ষিতা ভগিনীদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সকলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নির্ব্বিশেষে ঋষিকল্পিত এই "দেবী" উপাধি গ্রহণ করিয়া জাতীয়তা রক্ষা করুন, ঋষিদিগের উপরে সম্মান প্রদর্শন করুন ও এবিষয়ে ইংরেজি অনুকরণের বর্জ্জন করুন! মেয়েমানুষ হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিতে যাওয়া বড়ই ধৃষ্টতা। স্মার্ত্তপণ্ডিত ও প্রবীণ সম্পাদক আমার উপরে

* রঙ্গপুরের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত পরগণা।

খড়্গহস্ত হইবেন। সেবার নারীজাতির উপানদ ব্যবহারের কথা বলাতেই প্রবীণ সম্পাদক ২।৪টি বুলি ঝাড়িয়া তবে সোয়াস্তি পাইয়াছেন। বলিতে কি, আমরা ত মা, দিদি-মা, শাশুরী ঠাকুরাণীর আচার, আচরণ সমস্তই বজায় রাখিয়াছি; বিলাসিতা কাহাকে বলে জানি না। বিলাসিতার সময়েরও নিতান্ত অভাব, ব্রাহ্মণের মেয়ে; বাড়ীতে গৃহদেবতা আছেন, শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর বালকেরাও আছে, অতিথির শুভাগমনেও গৃহ পবিত্র হয়। ইঁহাদিগের সপর্য্যা, গৃহদেবতার পূজোপকরণ সংগ্রহ ও সজ্জিত করা, স্বহস্তে রন্ধন ইত্যাদিতে আর সময় কি থাকে যে বিলাসিতা করিব? বিবাহাদি শুভকর্ম্মে সসম্মানে আহুত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য সামান্য পরিচ্ছদে গেলেও কর্ম্মকর্ত্তা কৃতার্থ হইয়া যান। আজও মফঃস্বলের মত সহরে বা পল্লীগ্রামে কলিকাতার মত পরিচ্ছদের সম্মান হয় নাই। উপানদের ব্যবহার কখনও করি নাই, করিবও না, প্রবৃত্তিও নাই। পূর্ব্বে কি ছিল, বলিয়াছি; বিলাসিতার জন্য নয়, স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত, বলিয়াছি। ইহাতেই ত প্রবীণ সম্পাদকের নিকট মহাপাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। প্রবীণ সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "বৎস, তুমি কি তোমার ঠাকুরদাদার সময়ের আচার ব্যবহার বজায় রাখিয়াছ? তিনি কি সর্ব্বদা জুতো ব্যবহার করিতেন? সে সময়ে কি এইরূপ রঙ্গিন মোজা, বার্নিস করা জুতো, সার্ট ও চুলের কলপ ছিল? তোমাদিগের ভিতরে ষষ্ঠি বর্ষ বয়স্ক পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে অনেকেই যে নাতিনী—নাতিনী বলিলেও ঠিক বলা হয় না—নবম বর্ষ বয়স্কা কুমারীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য বরবেশে সজ্জিত হও। মেয়েটার ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহার জন্য অনুমাত্র চিন্তা কর না, ইহাতে আচার, শাস্ত্র, ধর্ম্ম সমস্তেরই রক্ষা হইল; কেমন?" ৪৮ বৎসর বয়সের পরে শাস্ত্রে বিবাহের বিধান নাই। এককথা বলিতে যাইয়া অন্য কথার অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। সকলের নিকটে সেজন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা।

সে সময়ের বিলাত-ফেরতারা যেমন বাঙ্গালা ভাষা, দেশীয় আচার ও দেশীয় পরিচ্ছদের উপরে ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, সেইরূপ "বাবু" উপাধির উপরেও তাঁহাদিগের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তাঁহারা ছিলেন "মিষ্টার," আর পত্নীকে গাউন পরাইয়া "মেম সাহেব" না বলাইয়া ছাড়িতেন না। এক্ষণে সে হাওয়া বদ্‌লিয়াছে। এক্ষণে বিলাত প্রত্যাগতদিগের ভিতরে আর সে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এই হিড়িক না পড়িত তবে এতদিনে বিলাত-প্রত্যাগতেরাও "বাবু" উপাধি গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমানে কিসের জন্য যে কর্পূরের মত "বাবু" উপাধিটি উবিয়া গেল, ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালী বাবুরা ফস্ করিয়া বেচারা "বাবু"টিকে বয়কট করিলেন। আসামের সহিত পূর্ব্ববঙ্গকে গভর্ণমেণ্ট এক করিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গালীরা ত ঘোর নারাজ; অথচ তাঁহারা আসামীর উপাধি "শ্রীযুত", "শ্রীমান্" সাদরে গ্রহণ করিয়া নামের সঙ্গে যে "বাবু"র একটুকু সম্বন্ধ ছিল তাহাও ঘুচাইয়া দিতেছেন। "বাবু" বেচারা এমন কি দোষ করিয়াছে যে, তাহাকে এমনভাবে একঘরে করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, "বাবু" শব্দের কোন মূল পাওয়া যায় না; ও শব্দটি সাহেবদিগের সৃষ্ট, তাঁহারা আমাদিগকে তাচ্ছল্যার্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন। আমার বিশ্বাস, ইউরোপীয়ানদিগের ভিতরে যাঁহারা প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহারা এদেশবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিজাতি "আর্য্য" নামে পরিচিত জানিয়া ভারতবাসী সকলকেই আর্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সাহেবেরা এ দেশী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকেরা "আর্য্যা", সুতরাং "আ'রয়া"; এই "আ'রয়া" হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকৃষ্ট জাতীয়া পরিচারিকাকে "আয়া" বলিতে আরম্ভ করেন। সাহেবেরা সেইরূপ নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করেন বলিয়া কি আমরা আর্য্য জাতীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব না? না, আর্য্য, আর্য্যা হইব না? সাহেবেরা আজও সেরূপ নিকৃষ্ট অর্থে "বাবু" শব্দের ব্যবহার করেন না।

"বাবু" শব্দটির আজগবি সৃষ্টি হয় নাই। সংস্কৃতে "ভাব" শব্দের অর্থ পণ্ডিত; "ভাবুক" শব্দের অর্থ কল্যাণ। ইহার কোন একটি শব্দ হইতে "বাবু" শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে, মাননীয় ব্যক্তির সম্বোধক অনেক স্থলেই "বাব"

শব্দের * ব্যবহার আছে। এই "বাব" শব্দের সহিত "বাবু" শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমি স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকের শ্রুতি আবৃত্তি করিতে নাই, সুতরাং উহা উদ্ধৃত করিয়া নিজে পাপী হইতে চাই না, পাঠকপাঠিকাদিগকেও আর পাপে লিপ্ত করিতে চাই না।

শ্রীজগদীশ্বরী দেবী।

স্বর্গগত গিরিশচন্দ্র সেন।

প্রসিদ্ধ নারী-হিতৈষী, মহিলা-পত্রিকার সম্পাদক ও নববিধান সমাজের প্রচারক পূজনীয় গিরিশচন্দ্র সেন আর ইহলোকে নাই। বহুকাল রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি গত ৩১শে শ্রাবণ ইহলোক ত্যাগ করিয়া বিশ্ব-জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ভারত-মহিলার পাঠকপাঠিকাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয় সম্ভবতঃ ১২৪২ সনে বৈশাখ মাসে ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে দেওয়ান বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ মাধবরাম সেন, মাতার নাম জয়কালী দেবী। তাঁহার খুল্ল প্রপিতামহ ৺ দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায় নবাব আলী-বর্দী খাঁর সময়ে মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে একটী উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। অতীব পুণ্যাত্মা বলিয়া তাঁহার খুব সম্মান ছিল। পাঁচদোনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত, এখনও দেওয়ান দর্পনারায়ণ মহাশয়ের যশঃ ও খ্যাতি সুবিদিত।

শৈশবকাল হইতেই স্বর্গগত সেন মহাশয়ের ধর্ম্মভাব খুব প্রবল ছিল। ফুলতোলা পূজার আয়োজন করা, পূজা করা, হরিলুট দেওয়া, এসব তাঁহার শৈশবের খেলা ছিল। তাঁহার জননী জয়কালী দেবীর মুখে শুনিয়াছি, দুই বৎসর বয়ঃক্রম হইতে তাঁহার ভক্তিভাব দেখা গিয়াছিল। তাঁহার পিতা ৺ মাধবরাম সেন সাত্ত্বিক-প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনিও সন্ধ্যা পূজায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন, এবং চির জীবন সৎভাবেই কাটাইয়া গিয়াছেন। পিতার সন্ধ্যাপূজার সময় তিনি চুপ করিয়া নিকটে বসিয়া এক মনে কি ভাবিতেন, কোন সময় স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেন; দুই তিন বৎসরের বালককে এইরূপ এক মনে ধ্যান করিতে দেখিয়া তাঁহার পিতৃদেব অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতেন, এবং সর্ব্বদাই তাঁহার পত্নীকে বলিতেন, আমাদের এ ছেলে খুব ধার্ম্মিক হইবে, এবং আমার বংশ ধর্ম্মভাবে উজ্জ্বল করিবে। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতামাতা বড়ই স্নেহ করিতেন। তিনি যখন যাহা আব্দার করিতেন, তাঁহারা তাহাই প্রদান করিতেন। ৪।৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি একদিন তাঁহার জননীকে কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে বলেন! অনেক জিদ্ করায় অবশেষে তাঁহার মাতা বালকের কথানুসারে চক্ষু বুজিয়া থাকেন। তিনি মাতার বসা ঠিক হয় নাই বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন এবং নিজে কেমনে পদ্মাসন করিয়া ভগবানের ধ্যান করেন, তাহাই দেখান। প্রত্যুষে স্নান করিয়া তিনি গোপাল, অন্নপূর্ণা, গণেশ ইত্যাদি বিগ্রহ অতি ভক্তিভাবে পূজা করিতেন।

নবম বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার বিয়োগে তাঁহার ধর্ম্মকাজে কে সহায় হইবে, এই বলিয়া আকুল হইয়া তিনি ক্রন্দন করেন। জননী জয়কালী দেবী তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন, যে তুমি কোন ভাবনা করিওনা, আমি তোমার সকল অভাব পূর্ণ করিব। তুমি তোমার পূজার নিমিত্ত যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। বাড়ীতে রীতিমত দোল দুর্গোৎসব হইত; বিগ্রহ ঠাকুরের রোজ দু বেলা পূজা হয়, তিনিও তাঁহার পূজার জন্য রীতিমত আয়োজন করিতেন। তাঁহার জন্য সবই ভিন্ন বন্দোবস্ত ছিল। সময় সময় ঠাকুরকে বিচিত্র বসনে সজ্জিত করিয়াছেন, গহনাও প্রদান করিয়াছেন। স্নেহময়ী জননীও পুত্রের মনস্তুষ্টির জন্য এ কাজে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পারস্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে মহাব্বতনামা, বহর দানেশ, সেকন্দরনামা রোকাতে ইয়ার মোহম্মদ, ইত্যাদি বড় বড় পারস্য গ্রন্থ, পূর্ণ বা আংশিকরূপে অধ্যয়ন করেন। তৎপর ময়মনসিংহ সহরে নকল-

---

* [illegible]ণ্যক, ৬ অধ্যায়।

নবিশী করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সময় ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার এক টাকা মাত্র উপার্জ্জন হইয়াছিল। সেই সময়ে ময়মনসিংহে একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হয়, তিনি নকলনবিশী পরিত্যাগ করিয়া সেই পাঠশালায় সংস্কৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন এবং কুমার-সম্ভব, রঘুবংশ, বাল্মিকী রামায়ণ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা ইত্যাদি পুস্তক পাঠ করেন। সেই সময়েই তাঁহার সংস্কৃত কবিতা রচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে। তাঁহাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৮ কবিরত্ন হরচন্দ্র রায় এক একটী সমস্যা পূরণ করিতে দিতেন, তিনিও শ্লোকের অন্ত্যচরণ পাইয়া সেই ভাব অবলম্বনে প্রথম তিন চরণ পূরণ করিয়া দিতেন। উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ পড়িয়াই এরূপ সমস্যা পূরণের ক্ষমতা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইতেন। তৎপর সংস্কৃত কবিতায় ষড়ঋতু বর্ণনা করিয়াছিলেন। অবশেষে বনিতা-বিনোদ নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, এবং ঢাকা-প্রকাশে লিখিতে আরম্ভ করেন। স্ত্রী-শিক্ষায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, কিরূপে স্ত্রীজাতির উন্নতি হইবে এই ভাব তাঁহার মনে সর্ব্বদাই জাগরিত ছিল। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য স্বীয় গ্রামে চেষ্টা উদ্যোগ করিয়া বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। স্ত্রীলোকের জ্ঞানোন্নতির জন্য বামা-বোধিনী পত্রিকায় বহুকাল নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহারই প্রস্তাবে এবং উদ্যোগে "পরি-চারিকা" পত্রিকা বাহির হয়। স্বীয় গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার সবিশেষ যত্ন ছিল। তিনি যখনই বাড়ী যাইতেন তখনই নানা স্থানের দ্রব্য বালিকাদিগকে পারিতোষিক দিতেন। এখনও সেই বিদ্যালয় ৪৪ বৎসর পর তাঁহারই স্মৃতি বহন করিতেছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহ পূজার প্রতি আস্থা তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হইতে লাগিল, ঈশ্বর আছেন এই মাত্র বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ময়মনসিংহ নগরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইল। ১৮৮৭ শকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, সাধু অঘোরনাথকে নিয়া ময়মনসিংহ আগমন করেন। তিনি কেশব বাবুর বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণ করিতে দুবেলাই তথায় গমন করিতেন। কেশব-চন্দ্রের উপদেশে তাঁহার জীবনের স্রোত ফিরিয়া গেল। তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ব্যাপারে এসলাম ধর্ম্মের পতাকা বহন করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের আগমনের দুই বৎসর পর ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ময়মন-সিংহ গমন করেন। তাঁহার তেজস্বী বক্তৃতায় সকলেই তাঁহার ভাবে আকৃষ্ট হন। সেই সময়ে বিজয়কৃষ্ণের সহবাসে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

২১ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই তিনি বিবাহিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে গভীর অনুরাগ দেখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলেই নানা উপায়ে তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু পত্নী ব্রহ্মময়ী স্বামীর ধর্ম্মে চির অনু-কূল ছিলেন। ব্রহ্মময়ীর একান্ত সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় বিশেষরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, তিনি নানারূপ নির্য্যাতনে এবং প্রতিবন্ধকতার দরুণ সময় সময় নিরুৎসাহ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পত্নীর অনন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিয়া তিনিও হৃদয়ের কালিমা দূর করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সময় সময় তাঁহার পত্নী তাঁহাকে নানারূপ বিপদ-পরীক্ষায় কত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী অল্প বয়সেই পর-লোকে গমন করেন। ব্রহ্মময়ীর ধর্ম্মে কিরূপ বিশ্বাস ও দৃঢ়তা ছিল, তাহা তাঁহার স্বামী-লিখিত জীবনী পড়িয়াই সম্যকরূপ উপলব্ধি করা যায়।

পত্নী-বিয়োগের পর হইতেই তাঁহার মন সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, আর সংসারে আবদ্ধ থাকিতে চাহিলেন না। তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করাইতে তাঁহার জননী ও অন্যান্য আত্মীয়েরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই সময়ে তিনি ময়মনসিংহ জিলাস্কুলের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কাজ করিতেন। সাধু অঘোরনাথ পুনরায় ময়মনসিংহ আসিলেন এবং তাঁহারই গৃহে আতিথ্য-স্বীকার করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার সময়ে অঘোরনাথ নানা বিষয়ে উপদেশ

দিতেন। সেন মহাশয়ের সেই সময়ের কথা তাঁহার আত্ম-জীবনী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "নিত্য উপাসনায় আনন্দলাভ করিয়াছি, আমি কখনও নিরাশ ও নিরুৎসাহ হই নাই। মহাপাপীর প্রতি যে ভগবানের বিশেষ করুণা প্রকাশ পায়, আমার জীবন তাহার সাক্ষী; বিশ্বাস করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিলে কখনও বঞ্চিত হইতে হয় না, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিব।" দিন দিন তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। চির জীবন তিনি পবিত্রভাবে যাপন করিয়া গিয়াছেন। নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন না, কিছুতেই সেই কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। লোক-নিন্দা অথবা লোক-ভয়ে কোন কাজ করিতেন না। কারো কোন অন্যায় ব্যবহার দেখিলে প্রাণে কষ্ট অনুভব করিতেন। বিলাসিতা দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

পশ্চিম-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ছুটী নিয়া তিনি ভক্ত বিজয়-কৃষ্ণ ও সাধু অঘোরনাথের সঙ্গে কলিকাতা গমন করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ 'ধর্ম্ম-তত্ত্বে' প্রকাশ করেন; উহা পড়িতে বড়ই সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহী। ছুটীর পর পুনরায় ময়মনসিংহ আসিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া পুনরায় এক পরীক্ষায় পতিত হইলেন। নানারূপ ঘটনা বশতঃ তিনি মনের কষ্টে ময়মনসিংহ চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ময়মনসিংহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিয়া থাকিতে তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ সহধর্ম্মিণীর তিরোধানের পর হইতেই বিষয়বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি দীর্ঘকালের ছুটী নিয়া আসিলেন, পরে চিরকালের জন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ১৮৭২ সালে মহাত্মা কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতাশ্রমে' বাস করেন। এই সময় হইতে আমিষ ভক্ষণ ত্যাগ করেন; অবশিষ্ট জীবন নিরামিষ ভোজন করিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন।

ভারতাশ্রমে কিছু দিন অবস্থিতি করিলে পর, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের আদেশে উক্ত আশ্রমের স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর তিনি ঢাকায় আসিয়া 'বঙ্গ-বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক হ'ন। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ অল্পকাল পরেই তিনি ঢাকা ছাড়িয়া পুনরায় কলিকাতা আগমন করেন। ১৮৯৫ শকে তিনি প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইয়া বিদেশে প্রচার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ আসাম প্রদেশে গমন করেন। সে অঞ্চলে নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন। ফিরিয়া আসিবার সময় জাহাজে অবস্থিতি কালে কবিবর সেখ সাদির প্রসিদ্ধ বুঁস্তা নামক নীতি-পূর্ণ পারস্য পদ্য গ্রন্থ বঙ্গভাষায় গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তৎপর আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনকে বুঁস্তার প্রেমমত্ততা পরিচ্ছেদের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া প্রচার-ক্ষেত্র হইতে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, 'এই অমূল্য উপহার পাইয়া আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমাকে এইরূপ উপহারই দিবে।' আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন যখন মহাপ্রচারে বহির্গত হ'ন, সেই সময় তিনিও উত্তর বঙ্গ, পূর্ব্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গে প্রায় সকল স্থানেই প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি পুনরায় নিজাম হায়দ্রাবাদ, করাচীবন্দর, লাহোর, মুলতান প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছেন। ভারতের বহু প্রসিদ্ধ স্থানেই তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মশিক্ষা উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। মুসলমানজাতির মূল ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ আয়ত্ত করিবার জন্য ১৮৭৬ সালে ৪২ বৎসর বয়সের সময় তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে আরব্য ভাষা চর্চ্চা করিতে গমন করেন। আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি পারস্য ও আরব্য পুস্তক হইতে অনুবাদ করিয়া কোরাণসরিফ, মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবন-চরিত তিন ভাগ, হদিস চার ভাগ, তাপসমালা ছয় ভাগ ইত্যাদিতে প্রায় ৩৫ খানা পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন। যে মুসলমান ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষিতসমাজে অজ্ঞাত ছিল, সেই শাস্ত্র তিনি অনুবাদ করিয়া ধর্ম্ম-জগতে এক অভিনব ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সমগ্র হদিস তিনি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবেন। কিন্তু দীর্ঘকাল রোগ-যাতনা ভোগ করায় তাঁহার

শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা।

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

এ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। বঙ্গীয় মুসলমানসমাজ যে তাঁহার নিকট কত ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি যত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার উপস্বত্ব তিনি নিজে এক পয়সাও জীবনে ভোগ করেন নাই. তাঁহার সমস্ত পুস্তকের উপস্বত্ব স্বদেশ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় বড়ই কোমল ছিল, আমাদের তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। বহুকাল রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে ঢাকা আসিয়া আত্মীয় স্বজন সকলের সম্মুখে সদজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় মাননীয় শ্রীযুক্ত কে. জি. গুপ্ত মহাশয় তাঁহার সেবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন। জীবনের কার্য্য অবসানান্তে ৭৬ বৎসর বয়সে ঢাকা-নগরীতে গত ৩১শে শ্রাবণ তারিখে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

শ্রীসৌদামিনী সেন।

৺ কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

মূর্ত্তিমতী দয়ারূপিনী কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ফ্লোরেন্সের একজন প্রসিদ্ধ সম্পদ-শালী ব্যক্তি ছিলেন, ইংলণ্ডেও তাঁহার মূল্যবান জমিদারী ছিল। পিতার যত্নে নাইটিঙ্গেল সাহিত্য, গণিত ও লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা এবং সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় অল্প বয়সেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

নাইটিঙ্গেল পরম রূপবতী ও কৃষাঙ্গী ছিলেন। তাঁহার সুন্দর সুকোমল দেহখানি দেখিলে মনে হইত, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়া বিলাসবাসনার মধ্যে কালযাপন করিবার জন্যই বুঝি তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই সুকোমল দেহের অভ্যন্তরে একখানি অতি সুকোমল হৃদয় ও অতি সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান ছিল। হৃদয়ের কোমলতা ও সবল ইচ্ছা—এই দুই মিলিয়া তাঁহাকে জগতের সেবাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিল। শৈশবে পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিবার যে সংকল্প প্রাণে জাগ্রত হইয়াছিল সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর কাল সেই পবিত্র ব্রত পালন করিয়া ৯০ বৎসর বয়সে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতঃ জগত-জননীর প্রিয় কন্যা গত ১৩ই আগষ্ট তাঁহার মাতৃক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন।

শৈশবেই নাইটিঙ্গেলের অন্তরে দুঃখীর দুঃখ মোচনের ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছিল। শুধু মনুষ্য নয়, পশুপক্ষীর প্রতিও তাঁহার এই করুণা প্রসারিত হইয়াছিল। কাহারো চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখিলে, একটী পশুকে রুগ্ন বা আহত দেখিলে সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। অতি অল্প বয়সে তিনি একদিন একজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁহার পিতার জমিদারীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একজন পরিচিত মেষপালকের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মেষগণ অরক্ষিতভাবে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে। যে প্রকাণ্ড কুকুর তাহাদিগকে পাহারা দিত সে তথায় নাই। অনুসন্ধানে জানিলেন, এক দুষ্ট বালকের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে কুকুরের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কৃষক বলিল, কুকুরটী যখন আর তাহার কাজে লাগিবে না, তখন সে তাহাকে বসাইয়া বসাইয়া খাওয়াইতে পারিবে না, তাঁহাকে বধ করিয়া ফেলিবে। দয়াময়ী ফ্লোরেন্স এই কথা শুনিয়া প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন, তিনি মেষপালকের এই নিষ্ঠুর প্রস্তাবের জন্য তিরস্কার করিলেন এবং অবিলম্বে কুকুরটীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন, কুকুরের পদ ভগ্ন হয় নাই, গুরুতররূপে আহত হইয়াছে মাত্র। তৎক্ষণাৎ নিজের পরিধানের ফ্লানেলের জামা ছিঁড়িয়া তিনি কুকুরটীর আহত স্থানে গরম জলের সেঁক দিতে লাগিলেন। ৩।৪ দিন মধ্যে সে আরোগ্য লাভ করিয়া আবার তাহার নির্দ্দিষ্ট মেষ-রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

সামান্য ইতর জীবের প্রতি যাঁহার এত দয়া মানুষের প্রতি তাঁহার কত প্রেম ছিল সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিপন্নের সাহায্য, পীড়িতের শুশ্রূষা ও শোকার্ত্তের সান্ত্বনা করিয়া তিনি অতি অল্প বয়স হইতে গভীর পরহিতৈষণার পরিচয় দিতেন।

ক্রমে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার রূপ লাবণ্য ততই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ধনসম্পদও তাঁহার প্রচুর ছিল। অনেক সুপুরুষ তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী

হইয়াছিলেন, কিন্তু নাইটিঙ্গেলের মন সেদিকে গেল না। যে জীবে দয়া শৈশবাবধি তাঁহার হৃদয়ে ক্ষুদ্র স্রোতের আকারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যৌবনে হৃদয়-বৃত্তিগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রবল স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিল এবং তিনি তাহাতেই আপনার ধনসম্পদ জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন। সংসারে মানুষ সুখের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘোরে, কিন্তু সুখ পায় না, অর্থের উপর বুক রাখিয়া হৃদয় জুড়াইতে চায়, কিন্তু প্রাণ তাতে শীতল হয় না। বিলাসে অঙ্গ ঢালিয়া পরিতৃপ্তি লাভের আশা করে, কিন্তু অতৃপ্তির আগুন তাহাতে আরো জ্বলিয়া উঠে; মানুষ যখন আপনাকে ঈশ্বরের সেবায় এবং পরের সেবায় ঢালিয়া দেয় তখনি নিরবদ্য শান্তি সুখ তাঁহার প্রাণ পূর্ণ করে। ভগবানের বিশেষ কৃপায় প্রথম বয়সেই তিনি সেই পবিত্র সুখের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, আর কিছুতেই তাঁহার মন ভুলিল না। রোগীর শুশ্রূষা করাই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া স্থির করিলেন। ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি সুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। একটা হাঁসপাতালের শুশ্রূষাকারিণীর পদ গ্রহণ করিয়া তাহাতে আরো পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ইউরোপের নানাস্থানে মহামারী উপস্থিত হইলে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া মহামারীগ্রস্ত নর-নারীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সহিত ইংরেজ জাতির এক যুদ্ধ হয়। সে ভীষণ যুদ্ধের কাহিনী পড়িতে পড়িতে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। ২৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য সেই যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র সৈন্য হত ও আহত হইয়া সেখানে এক প্রলয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যত্নে নারীজাতিকে দূরে রাখা হইয়াছিল। সেই ধ্বংস-লীলা দেখিতে কোন্ নারীরই বা আগ্রহ জন্মে! কিন্তু পুরুষগণ যুদ্ধ করিয়া যখন পরিশ্রান্ত হইল, যখন দুই ক্রোশ ব্যাপী স্থান রোগীর শয্যাতে পূর্ণ হইয়া গেল, যখন মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬০ জনে গিয়া দাঁড়াইল, সেনাপতি তখন দেখিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ব্বলা নারীকে না ডাকিলে চলিবে না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পীড়িতের শুশ্রূষার জন্য তখন নারীদিগের নিকট এক নিবেদন-পত্র প্রচার করিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ৪২ জন শুশ্রূষাকারিণী লইয়া সেই মরুক্ষেত্রে পবিত্র মন্দাকিনীর শীতল জলধারা বর্ষণ করিতে চলিলেন।

স্কুটারীর রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, সহস্র সহস্র আহত সৈনিকের চীৎকারে স্থানটী যেন নরক-সমান হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও হাত নাই; কাহারো পা নাই, কাহারও চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, কাহারো মুখ ভয়ানক বিরূপ হইয়াছে। সেবাসুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত নাই, যে সকল সুশ্রূষাকারী পুরুষ সেবা করিতেছে তাহারাও নিতান্ত হৃদয়হীন। পীড়িতেরা কেহ ক্ষুধায় চীৎকার করিতেছে, কেহ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলের জন্য চেঁচাইতেছে, সেবকগণ তাহা বড় একটা গ্রাহ্যই করিতেছে না। কোমল-হৃদয়া নাইটিঙ্গেল এই দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলেন, তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র দমিলেন না, অচিরে প্রবল উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে সহস্র মুমূর্ষু ও তাহাদের হৃদয়ভেদী চীৎকারের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করিয়া শুশ্রূষা করা কি সামান্য শক্তির কার্য্য! কিন্তু নাইটিঙ্গেল নারী হইয়াও অমিত শক্তির অধিকারিণী। তিনি সুশিক্ষিতা, কোমলহৃদয়া হইলেও সুদৃঢ়চিত্তা। শাসনের ক্ষমতা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে ছিল। মহাকোলাহলের মধ্যে তিনি শান্তি স্থাপন করিলেন, বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নারীর কোমল অথচ দৃঢ় হস্তের স্পর্শে সেখানে যুগান্তর উপস্থিত হইল।

পীড়িতগণ নাইটিঙ্গেলের ও তাঁহার সঙ্গিনীগণের সেবা শুশ্রূষায় যেন নব-জীবন লাভ করিল। তাঁহার সস্নেহ ও সুকোমল ব্যবহারে রোগীদের মুখে নূতন স্ফূর্ত্তি দেখা দিল। ভীষণ রণক্ষেত্রে গুরুতররূপে আহত হইয়াও তাহারা মাতাভগিনী ও স্ত্রীপুত্রকন্যার অভাব যেন অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল।

এই সময়ে সিবাষ্টোপলের হাঁসপাতালের ভারও নাইটিঙ্গেল ও তাঁহার সঙ্গিনীদিগের উপর পড়িল। কঠোর শীতে একটা সেঁতসেঁতে গৃহে রোগীরা বাস করিত তাহা-

দের পরিধানে প্রচুর বস্ত্রও ছিল না। অন্যান্য ব্যবস্থা স্কুটারী হাঁসপাতালের মতই ছিল। পথ্য ঔষধ কিছুই যথাসময়ে মিলিত না। ক্ষতগুলি ভালরূপে পরিষ্কার করা হইত না। নাইটিঙ্গেলের হাতে পড়িয়া এখানকারও শ্রী ফিরিয়া গেল। রাঁধুনীর কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া রোগযন্ত্রণায় রোগীদিগকে সান্ত্বনা দান, শুশ্রূষা করা, স্বদেশে তাহাদের বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি নানা কার্য্য তিনি নিজেই করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনীগণ এসকল বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিত। কিন্তু তিনি রোগীদিগের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, আর কেহই তেমন পারে নাই। ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিতে চাহিলে অথবা অস্ত্র প্রয়োগের আবশ্যক হইলে রোগীরা ডাক্তার ও অন্যান্য শুশ্রূষাকারিণীর কথায় কর্ণপাত না করিলেও নাইটিঙ্গেলের অনুরোধ কিছুতেই অগ্রাহ্য করিত না। কত সময় হাঁসপাতালে মহা কোলাহল উপস্থিত হইত, রোগীদের চীৎকার গালাগালিতে সকলে অস্থির হইত, কিন্তু নাইটিঙ্গেল গৃহে প্রবেশ করিলেই সকলে শান্তভাব ধারণ করিত।

স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া আহত সৈনিকদিগের নিকট সমবেদনা জানাইয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। সকল সৈনিক যাহাতে তাহার মর্ম্ম একসঙ্গে ও শীঘ্র শীঘ্র অবগত হইতে পারে, সে জন্য নাইটিঙ্গেল তাড়াতাড়ি সেই চিঠির কয়েকখানি প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া হাঁসপাতালের প্রতিগৃহে এক একখানি পাঠাইয়া দিলেন। মহারাণী লিখিয়াছিলেন, "কুমারী নাইটিঙ্গেল এবং তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী মহিলাগণ অনুগ্রহ করিয়া আহত সৈনিকগণকে জানাইবেন যে, তাহাদের স্বদেশানুরাগ, বীরত্ব ও কষ্টের কথা তাহাদের রাণী কখনও ভুলিতে পারিবেন না। তিনি তাহাদের দুঃখে সর্ব্বদাই কাতর এবং তাহাদের সংবাদ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল।" সৈনিকগণ এই চিঠি শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল এবং "ঈশ্বর আমাদের মহারাণীকে রক্ষা করুন" এই বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

সৈনিকদিগকে সুখী করিবার ইচ্ছা নাইটিঙ্গেলের প্রাণে কত প্রবল ছিল তাহা এই ঘটনায় অতি সহজেই অনুভব করা যায়। মহারাণীর চিঠিখানি প্রতি গৃহে গৃহে লইয়া পাঠ করিয়া শুনাইলেই হইত, কিন্তু মাতৃভাবে পূর্ণ হইয়া নাইটিঙ্গেল বুঝিলেন, বাড়ীতে একটা ভাল জিনিষ আসিলে কোন জননীর ছোট ছোট সন্তানগণ যেমন সকলেই একসঙ্গে তাহা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, তেমনি এই সকল রোগক্লিষ্ট সৈনিক যত শীঘ্র সম্ভব মহারাণীর চিঠিখানি শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তাই তাড়াতাড়ি তিনি সকলকে চিঠিখানি একসঙ্গে শুনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কর্ম্মটী সামান্য বটে, কিন্তু ইহার অন্তরালে তাঁহার কোমল হৃদয়ের অতি সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে।

এই সময় অতিরিক্ত শ্রমে নাইটিঙ্গেলের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। কিন্তু পীড়িত সৈনিকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কিছুতেই তাঁহার মন প্রস্তুত হইল না। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ডাক্তারদিগের আদেশে তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে হইল। কিন্তু ভাল করিয়া আরোগ্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ক্রিমিয়ায় ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার সন্তানতুল্য সৈনিকেরা আত্মীয়স্বজন বিহীন হইয়া অযত্নে কষ্ট পাইবে, তিনি কোন্ প্রাণে দূরে পড়িয়া থাকিবেন?

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হইল, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ-সৈন্য দেশে ফিরিয়া চলিল, নাইটিঙ্গেলও দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশবাসী মহাসমারোহে তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু বিনীত-হৃদয়া নাইটিঙ্গেল বলিলেন, তিনি এত সম্মানের উপযুক্ত নহেন। তিনি নীরবে আপনার পল্লীভবনে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ইংলণ্ডবাসী তাহাদের কর্ত্তব্য ভুলিল না। নাইটিঙ্গেলের স্মৃতিকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য তাহারা পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিল। নাইটিঙ্গেল দেখিলেন, এই টাকাগুলির সদ্ব্যবহার হওয়া দরকার। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হাঁসপাতালের সংস্রবে একটি শুশ্রূষাকারিণী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে একটা বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান করিলেন। তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে একজোড়া হীরক-বলয় উপহার দিলেন।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময় আহত ইংরেজ-সৈনিকদিগের কষ্টের বিবরণ শুনিয়া তিনি দুঃখে অভিভূত হইলেন। শুশ্রূষা সম্বন্ধে নানা পরামর্শ দিয়া তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে চিঠি লিখিতেন। ভারতের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া তিনি চিঠি লিখিতেন। ভারতবর্ষের নারীজাতির উন্নতির কথাও তিনি যথেষ্ট চিন্তা করিতেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি "শুশ্রূষা" সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের হাঁসপাতালসমূহের উন্নতির জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই সকল পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি তাঁহার পল্লীভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানেই নীরবে শান্তভাবে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিয়া গত ১৩ই আগষ্ট পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে যেন কোন সমারোহ না হয় তিনি এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। তদনুসারে অতি সাধারণ ভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কফিনের সঙ্গে আমাদের সম্রাট-মাতা আলেকজান্দ্রা একটী ফুলের মালা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষুদ্র একখানি কার্ডে লেখা ছিল, "নিজের পরিশ্রম ও বীরত্বের দ্বারা যিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সৈনিকদিগের শুশ্রূষাকারিণী দলের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, আর্ত্ত মানবের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকারিণী মহিলার প্রতি সম্মানের চিহ্ন। ২০শে আগষ্ট; ১৯১০। আলেকজান্দ্রা দ্বারা প্রেরিত।"

শৈব্যা।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা হিন্দু-পুরাণের এক অতি গৌরবের সামগ্রী। হরিশ্চন্দ্র-পত্নী শৈব্যার পতি-ভক্তি ও আত্মত্যাগ ভারত-রমণীর গৌরবের বস্তু। স্বামীর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তিনি সহ্য করেন নাই এমন দুঃখ ছিল না। রাজরাণী হইয়া তিনি ভিখারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র—গভীর দুঃখের সময় সান্ত্বনার একমাত্র স্থল রোহিতাশ—ভগবান অবশেষে তাহাকেও হরণ করিলেন। তথাপি শৈব্যা মুহূর্ত্তের তরে পতির নিন্দা করিলেন না, তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন না। তিনি জানিতেন, পতি ধর্ম্মের জন্যই নিজে এত দুঃখ সহিতেছেন, স্ত্রীপুত্রকেও দুঃখ-ভাগী করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভোগবিলাসিতার দিনে শৈব্যা-চরিত্রকে উজ্জ্বল ভাবে নারীজাতির সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক। আমরা ভবিষ্যতে ভারত-মহিলায় এ বিষয়ে আরো আলোচনা করিব। অদ্য মৃতপুত্র-ক্রোড়া শৈব্যা এবং শবদাহীবেশে হরিশ্চন্দ্রের প্রতিকৃতি পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিলাম।

সেবাব্রত পরায়ণা ভগিনী ডোরা

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

৬ষ্ঠ ভাগ। | কার্ত্তিক, ১৩১৭। | ৭ম সংখ্যা।

নারীর উন্নতি—প্রতীচ্য দেশ।

দূরত্বের ভিতর একটা মোহ আছে, সন্ধ্যাকাশের অকারণ বর্ণোচ্ছ্বাসের মত তাহা আমাদের চিত্তের উপর একটা অলোক আলোক-স্বপ্ন বয়ন করিতে থাকে। নারীর উন্নতি—(প্রকৃত শব্দ ব্যবহার করিতে গেলে যাহাকে উন্নতি না বলিয়া advantage—সৌকর্য্য বলিতে হয়)—প্রতীচ্য দেশে বৃহত্তর বলিয়াই সাধারণতঃ কল্পিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে সেখানকার বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠতমা গ্রন্থকর্ত্রী মেরি করেলি যাহা বলেন তাহা "নারীর উন্নতি" ও "অভিশপ্তা ইভ"-এ ভাবান্তরিত করিলাম।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নারী-সমাজের ভিতর যে বিভিন্নতা—তাহার একটা দিক এই খণ্ড রচনা দুটির মধ্য দিয়া একটি সুস্পষ্ট আকারে দেখা যাইতেছে, এখানে আমরা একটা হৃদয়কে দেখিতে পাইতেছি,—সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান দিন পর্য্যন্ত নারী যে অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার সমস্ত বেদনা সেখানে থিতাইয়া দানা বাঁধিয়াছে! একটা উত্তপ্ত নিশ্বাসে তাঁহার প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক ভাব ঝলসিত হইয়া বাহির হইতেছে, রক্তাক্ত হইয়া দেখা দিতেছে; ইনি যেন সৃষ্টির সেই আদিম জননী;—নিগৃহীতা কন্যাগণের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্তুতে যেন ক্ষত রচনা করিয়াছে, তাই তিনি বিশ্ববাসীর দুয়ারে দুয়ারে, ন্যায় ও অনুকম্পাকে জাগ্রত করিবার জন্য তাঁহার প্রবল কণ্ঠস্বর প্রেরণ করিতেছেন! জগৎ জুড়িয়া যে লৌহচক্র নারীকে নিষ্পেষিত করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া তাঁহার নেত্র যেন বহ্নি উদ্গার করিতেছে!

প্রবন্ধের ভিতর হইতে নিষ্প্রয়োজনীয় স্থানগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ আমাদের এই প্রাচ্য ভূমিতে সেই কথাগুলি কিছুতেই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষের কন্যাগণ—মাতৃরূপে শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি তাঁহারা পাইয়াছেন, বরদায়িনী দেবীর মত তাঁহারা নিত্য সম্পূজিত হইয়াছেন, অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী বলিয়া তাঁহারা স্বামীর অগ্রে শ্রীস্বরূপিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের নেত্রনীর গৃহের অভিসম্পাতরূপে গণ্য হইয়াছে, ব্রত, যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণের সময় তাঁহারা পার্শ্বে না দাঁড়াইলে তাহা বিফলতায় ও মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে! পুরুষের চিন্তার পুরোভাগে, জীবনের পুরোভাগে, কর্ম্মের পুরোভাগে, কীর্ত্তির পুরোভাগে, ধ্রুবতারার মত তাঁহারা আলোকপাত করিয়াছেন; এই স্বচ্ছ নির্ম্মলধার পুণ্যতোয়া উৎসটি ভারতবর্ষের সমস্ত কাব্য মহাকাব্যের প্রবাহ যোগাইয়াছে,—বর্ষার দিনে গিরিশৃঙ্গে বিগলিত মেঘের নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণের মত তাহা লোকহৃদয়ের সমস্ত চেতনা ও অনুভূতির ভিতর দিয়া বহিয়া আসিয়া তাহাকে তরঙ্গে, কল্লোলে, ফেণপুঞ্জে ক্ষুব্ধ, তাড়িত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে!

প্রাচীন-ভারতবর্ষ তাহার কন্যাগণের সম্বন্ধে একটী অতি প্রবল, অতি একান্ত, অতি বিশুদ্ধ মর্য্যাদানিষ্ঠাকে তাহার বক্ষঃকুহরে লালন করিয়াছিল এবং সে ঔদার্য্য আকাশের মত এত বিশাল যে ভারতবর্ষ তাহার পরিধিকে কোন দিক দিয়া দাবিয়া না দিয়া আমাদের এই অসীম নীলাম্বরেরই মত তাহাকে অনন্ত বিস্তৃতির অবকাশ দিয়াছিল। এই মর্য্যাদানিষ্ঠাকে তুচ্ছ বলিয়া সে কখনও অবহেলা করে নাই, ক্ষুদ্র বলিয়া লঙ্ঘন করে নাই, তাহার সমস্ত শক্তিমত্তার দ্বারা সে তাহাকে বৃহৎ অনবনমনীয় করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহার সমাজ রচনার এই কেন্দ্রবিন্দুটিতে সে তাহার সমস্ত তেজ তপোলব্ধ অস্ত্রের স্থৈর্য্যের দ্বারা সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার এই বলিষ্ঠ মর্য্যাদানিষ্ঠার সহিত যখন কিছুর তিলমাত্র সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, কুসুমধন্বার আয়ুধক্ষেপে ভগ্নধ্যান রুদ্রের মত এই আত্মসমাহিত অনাড়ম্বর মৌনী সাধক তখন সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া নির্ম্মম কঠোরতায় ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সে কাহাকেও ক্ষমা করে নাই, কিছুর প্রতি দৃক্‌পাত করে নাই, বজ্রের মত ধ্বংসের শিখায় সে তাহাকে শোধন করিয়া লইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারত—আমাদের এই উভয় মহাকাব্যে কি আমরা তাহারই সুচিত্রিত আলেখ্যটিকে দেখিতে পাইতেছি না? সমগ্র ভারতবর্ষ কৃষ্ণার বেণী বন্ধনের পণের যে মূল্য যোগাইয়াছিল ও সীতার অপহরণের যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল তাহার স্মৃতি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নয়—অতীত ভারত হইতে ভবিষ্যৎ ভারতের চিত্তপথে তাহার চিরন্তন প্রবাহটি কোথায় বহিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান ভারতের সমস্ত বিস্মৃতি অবনতি ও বিচ্যুতির ভিতর আপনার ধীর কলস্বরকে জাগ্রত ও ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতেছে!

এই "আর্য্যা"-গণের ও "দেবী"-গণের নিকট প্রাচীন ভারতবর্ষ কখনও ন্যূনতার জন্য কুণ্ঠা বোধ করেন নাই! তাহার প্রাচীনতম ঋকগুলির ভিতর বহু রমণীর নাম আমরা দেখিতে পাই, এবং তাহা পুরুষ রচয়িতাগণের সঙ্গে সম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিতই কি শতাব্দীর পর শতাব্দী উচ্চারিত ও অধীত হইয়া আসিতেছে না? প্রাচীন ভারতবর্ষ! সমবেত বিদ্বন্মণ্ডলীর ভিতর বসিয়া তাহার বিদুষী কন্যা যখন ব্রহ্ম নিরূপণের তর্কে সহস্রাধিক পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়াছিল, তখন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার আশায় কি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল না? অতএব নিঃসন্দিগ্ধরূপে ইহা বেশ বলা যায় যে, "এব্রাহামের যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত" নারীসমাজের ইতিহাস প্রতীচ্য ভূখণ্ডে যেরূপে প্রকটিত হইয়াছে, প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার ভয়াবহ অভিযোগের ভিতর হইতে সম্পূর্ণ বাহিরে! আমাদের এই অননুকরণীয়, অনুপমেয় মহিমাময় ভারতবর্ষ! পুরুষ ও নারীর মঙ্গলময় যে মিলন, পরস্পরে নির্ভরশীল গৌরবময় যে বন্ধন, জীবনের সার্থকতার পথে পরস্পরের যে সুপবিত্র অবস্থান—তাহা তাহার দিব্য উদার দৃষ্টিতলে পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছিল, এবং সে এই মহিমগৌরবদীপ্ত পরিপূর্ণতাকে আনন্দস্পন্দিত হৃদয়ে তাহার সমাজবন্ধনের ভিত্তি করিয়া গড়িয়াছিল! আমাদের সেই একান্ত মর্য্যাদানিষ্ঠ পূজাবিনম্র শ্রদ্ধাশীল ভারতবর্ষ—স্বাধীন, সভ্যতালোকঝলসিত প্রতীচ্য ভূখণ্ড হইতে প্রকাশিত নারীর মর্য্যাদাহীনতার এই দারুণ তিক্ত অভিযোগে আজ হয়ত বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু তথাচ,

সত্য যদি বলিতে হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বহুজাতির মিলনক্ষেত্র ও বহুতর প্রকৃতির দ্বারা বহুধা বিভক্ত বর্ত্তমান ভারতের পশ্চিমের সিন্ধুতট হইতে উত্থিত এই অভিযোগকে সর্ব্বথা অস্বীকার করিবার শক্তি নাই। সভ্যতার শিখর দেশে দাঁড়াইয়া প্রতীচ্য দেশ যখন উষার আলোকে আসন্ন প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছে, তখন বর্ত্তমান ভারত নিম্ন সমতলের ছায়ান্ধকার ভূমিতে দাঁড়াইয়া তাহার লুপ্ত প্রভাতের পুনরুদয়ের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে! জড়তার মৃত্যু হইতে উত্থিত বিশ্বের নারীমণ্ডলী আজ জননী ভগিনী পত্নীরূপে পুত্র সহোদর ও স্বামীর কাছে তাঁহাদের চিরন্তন প্রাপ্য অধিকারের দাবী যাজ্ঞা করিতেছে, অব্যাহত অবিচলিত অনুরাগে তাহাদের রক্তসিক্ত অতীতকে হৃদয় হইতে ধৌত করিয়া স্মিত মুখে তাহারা অপেক্ষা করিতেছে—"Wandering perchance any of them will ever help to do her justice, will ever place her where she should be as the acknowledged queenly help meet of her stronger but less enduring partner!" (তাহারা ভাবিতেছে সম্ভবতঃ পুরুষের ভিতর হইতে কালে এমন কেহ আসিয়া দাঁড়াইবে যে তাহাদের সুবিচার প্রাপ্তির সহায়তা করিবে এবং যেখানে তাহাদের প্রকৃত স্থান—সেই থানটিতে তাহাদের পঁহুছাইয়া দিবে! তাহাদের বলিষ্ঠ সঙ্গী—সহিষ্ণুতায় যে তাহাদের সমকক্ষ নয়—তাহাদের সাহায্যকারিণী হইয়া সগৌরবে তাঁহারা তাহার পাশে দাঁড়াইবে!)

সর্ব্বশেষে নিবেদন এই যে, পাঠক পাঠিকাগণ যাঁহারাই এ প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাঁহারা অবশ্য মনে রাখিবেন, যে এই প্রবন্ধোক্ত মতামত আমার নিজের মতামত নহে। 'আমাদের দেশে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক জননীত্বের পুণ্যালোকে সমুজ্জ্বল। পুরুষ এখানে নারীর কাছে নতজানু হইতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং নারী—আপনাকে দান করাই যাহার জীবনের পরম চরিতার্থতা—নির্য্যাতিত হইয়াও সে সেই নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রুদ্র মন্ত্র পাঠ করে না। নারী—হোক সে ক্ষুদ্র, হোক সে দুর্ব্বল—তবু সে যে গৃহের লক্ষ্মী, সে যে জীবনে শান্তি, সে যে ক্লেশে স্বস্তি—সে যে শ্রীরূপিণী, আনন্দরূপিণী, কল্যাণরূপিণী—পুরুষের দর্পিত দৈহিক বল—যাহা শুধু ধ্বংশ করিতে পারে কিন্তু গঠন করিতে পারে না, যাহা শুধু সংগ্রহ করিতে পারে কিন্তু সংযোজন করিতে পারে না, যাহা শুধু অর্জ্জন করিতে পারে কিন্তু রক্ষা করিতে পারে না—আপনি তাহার নিকট শ্রদ্ধায় নম্র-শির হইয়াছে। আর নারী—দীপের মত জ্বলিয়া তাহার গৃহ আলোকিত করিয়াছে, উষার মত আপনি নিঃশেষ হইয়া তাহাদের জীবন দান করিয়াছে বারির মত আপনি মলিন হইয়া তাহাদের গ্লানি হরণ করিয়াছে! আমাদের এই ভারতবর্ষ—পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক এখানে ঠিক এমনিটি, অতীত কালেও ইহা এমনি ছিল এবং বর্ত্তমান কালেও—এখনও—এমনিটি-ই আছে। 'দেবী' বলিয়া ভারতবর্ষ যাহার পায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে—তাহার শ্রেষ্ঠত্বকে মানিয়া নিতে সে গর্ব্বিত হইয়াছে, লজ্জায় শির নত করে নাই। এমন পিতা কে আছেন যিনি কন্যাকে যশের উর্দ্ধতম শিখরে আরোহণ করিতে দেখিয়া আনন্দাশ্রু মোচন না করেন এবং তাহার নিকট আপনার পলিত শির অবনত করিতে গর্ব্ব বোধ না করেন? এমন ভাই কে আছেন যিনি আপনার ভগিনীকে প্রতিষ্ঠার উচ্চপথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পুলকে বিহ্বল না হন এবং তাহার সহায়তায় আপনাকে জয়যুক্ত মনে না করেন? এমন স্বামী কে আছেন যিনি আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে উচ্চ সাধনার সফলতার মহিমালোকে মণ্ডিত দেখিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে না করেন এবং জীবনের দুর্গম পথে তাহার প্রসারিত বাহু গ্রহণ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে না করেন?

বৈদেশিক জাতিগণ ভারতের অবরোধবাসিনী 'দুর্ভাগিনী' কন্যাগণের কথা স্মরণ করিয়া করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাই যদি স্বাধীনতা হয়—পুরুষের জীবনের ভয়াবহ দ্বন্দ্বক্ষেত্রের ও প্রতিযোগিতার প্রচণ্ড সংঘর্ষণের উদ্গীর্ণ হলাহলের ভিতর তুল্য স্থান গ্রহণ করাই যদি বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতিপাদ্য বিষয় হয় তবে তাহা কতটা বাঞ্ছনীয় তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই বোধগম্য, সে বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

"আলোকেরে চল অনুসরি
ন্যায় যাহা কর তা পালন,
মানব—সে অর্দ্ধ অধিকারী
নিজ ভাগ্য করিতে শাসন!
যত দিন নাহি পাও দেখা
মৃত্যুহীন অমর দেবীরে—
সমাধির শূন্য মন্দিরেতে—
অনুসরি চল ধীরে ধীরে!

(টেনিসন, লক্সলি হল, ষষ্টি বর্ষ পরে)

"ষষ্টি বর্ষ পূর্ব্বে! বর্ত্তমান যুগের আমাদের নিকট ইহা অতি সুদীর্ঘ সময় ও খানিকটা অন্ধকার যুগের মত! বিস্মিত হইয়া আমরা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে থাকি, যে তখনকার লোকগুলি কিরূপ প্রকৃতির ছিল! ইতিহাস তখন আমাদের হাতে ধরিয়া লইয়া যায় এবং ঐন্দ্রজালিক কবচের মতন আমরা তাহার ভিতর দিয়া পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠতমা সম্রাজ্ঞী প্রাতঃস্মরণীয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক দেখিতে পাই। কত বৃহত্তম ব্যক্তি, অতীত কত সুপরিণত ধী-শক্তির প্রকাশ,—যাহার অনশ্বর ফল এখনও আমাদের সাহচর্য্য করিতেছে—কিন্তু যাঁহাদের পার্থিব অবস্থান তাঁহাদের স্বীকার করিতেছে না—তাঁহাদের আমরা তাহার ভিতর একত্রিত দেখি। পিছন ফিরিয়া চাহিতে গেলে—আমাদের মধ্যে যাহা ছিল তাহা স্মরণ করিয়া একটা প্রবল আক্ষেপ আমরা বহুল পরিমাণে শুনিতে পাই। ক্ষমতাবান্ এবং প্রাধান্য-বান্ ব্যক্তি—যেমন বড় লেখক, বড় চিন্তাশীল ব্যক্তি, বড় সমাজ-সংস্কারক—নিশ্চয়ই আমরা ইঁহাদের অভাব-গ্রস্ত এবং তাঁহাদের একান্ত ঐকান্তিক ভাবে পাইতে চাই। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মই এই যে, যখন আমরা এক দিক দিয়া লাভ করি, তখন আমাদের অপর দিক দিয়া ক্ষতি অনিবার্য্য। সুদূর অতীত কালে আমরা যাহা হারাইয়াছি, সম্মুখবর্ত্তী যুগে আমরা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ করিয়াছি। এই বহমান বর্ষগুলির ভিতর দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা যে বৃহত্তম পরিবর্ত্তনটি আমাদের মধ্যে আসিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ আমাদের স্ত্রী-সমাজে—থ্যাকারে এবং ডিকেন্স যখন তাঁহাদের বিস্ময়াবহ উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, স্যারলোটি ব্রন্ট যখন তাঁহার নারী-প্রতিভায় জগতকে চমকিত করিয়াছিলেন এবং জর্জ্জ ইলিয়ট যখন স্কটের আসন অধিকার করিয়া সারলোটি ব্রন্ট অপেক্ষা বৃহত্তর প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন—সেই তখনকার স্ত্রী-সমাজে! পুরুষ তখন তেজবীর্য্য সম্পন্ন ছিল, মেয়েদের পথ ক্বচিৎ উজ্জ্বল দেখা যাইত—অথবা পরিষ্কার কথায় বলিতে গেলে—মেয়েদের স্বাভাবিক উজ্জ্বল গুণগুলি—বিধিদত্ত শক্তির মত যাহা তাহাদের প্রকৃতি-গত—তাহাকে বিকাশের দ্বারা পূর্ণতার ভিতর লইয়া যাইবার সুযোগ তাঁহাদের এত কম ছিল যে তাহারা তাহা পারে নাই! মেয়েরা কোনও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিলে পুরুষ তাহাকে অশোভন ও বিশ্বসংসারের রীতির বহির্ভূত বলিয়া মনে করিত এবং কিছুতেই তাহাকে মুক্তভাবে প্রশংসা করিবার যোগ্য মনে করিত না। বেশী হউক আর কম হউক, খানিকটা ইহা হইতেই স্যার ওয়াণ্টার স্কট্ জেন অষ্টেনকে এবং থ্যাকারে স্যারলোটি ব্রণ্টকে তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সময় যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, মেয়েরা ততই সাহিত্য এবং আর্টের নানা বিভাগে এক-জনের পর আর একজন আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল; পুরুষেরা তখন তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এত দিনকার আগ্লান রাজ্যে ইহারা অনধিকার প্রবেশ করিতেছে ভাবিয়া তাঁহাদের ললাট ভ্রুকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। সেই পিছনে দাঁড়ান এবং বঙ্কিম দৃষ্টিপাত জীবন-সংগ্রামে শুভ্রবসনা রমণী-যোদ্ধাগণের দ্রুত এবং অব্যাহত পুরোগতির সঙ্গে বরাবর সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে; অদমনীয় সাহসের স্বর্ণ-কবচ পরিধান করিয়া, সহিষ্ণুতার বর্ম্মে আবৃত হইয়া বিশ্বাসের তরবারির দ্বারা সজ্জিত হইয়া এই স্বল্প সংখ্যক যোদ্ধা প্রতিদিন নূতন জয় অর্জ্জন করি-তেছে; একটি বৃহৎ দলে এখন তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ দেখা যাইতেছে, প্রতিদিন নূতন শক্তি ও নূতন শৃঙ্খলায় তাহারা যাত্রা আরম্ভ করিতেছে—নির্ভীক—অবিচলিত—আপনাদের অধিকার ও মুক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প—হটিয়া যাওয়া হইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে তাহারা

প্রস্তুত। বাঁচিবার অধিকার তাহারাও লাভ করিতে চায়, পুরুষের আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তি অপেক্ষা বৃহৎ কিছু তাহারা পাইতে চায়, কুমারী—পত্নী—জননী—রমণীত্বের এই তিনটি দিকে তাহারা আপনাদের যোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, এবং তাহাদের নৈতিক ক্ষমতা ও মনস্বিতা দ্বারা তাহাকে সহনীয় করিয়া তুলিতে চায়!

উচ্চশিক্ষিতা এবং মনস্বী নারীগণের নিকট সম্ভবতঃ ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ—পুরুষেরা যখন বারংবার এই কথাটিকে প্রমাণিত করিতে চান যে "মেয়েদের সৃষ্টিশক্তি নাই; রন্ধনশালায়, শিশুপালনে ও শিশুর শয্যাপার্শ্বেই তাহাদের যোগ্যস্থান।" নিশ্চয়ই! মেয়েরা তাহা তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তমরূপে পরিচালনা করিতে পারে! বিশেষতঃ শিশুর শয্যাপার্শ্বে—যেখানে তাঁহাদের পুরুষপ্রকৃতি জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

এমন কোনও বিষয় নাই—আগ্রহের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মেয়েরা যাহা পুরুষের মতই সহজ ভাবে ও সার্থকতার দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারে না—যদি পুরুষেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাদের পথ ছাড়িয়া দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সম্মানে মেয়েরা যখন ভূষিত হয় এবং বিস্মিত জগত যখন তাহাদের দিকে বিহ্বল চক্ষে চাহিয়া থাকে, তখন আপনাদের প্রকাশিত অশ্রদ্ধা দ্বারা তাঁহারা হাস্যরসের অবতারণা করিতে থাকেন!

মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষদের ধারণা সব দিক হইতে জড় করিয়া একটি প্রশস্ত আকারে দেখিতে গেলে, পুরুষদের দিক হইতে সামান্য সাধারণ জ্ঞানেরও অতি শোচনীয় কৌতুকাবহ অভাব দেখা যায়! প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে—পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে কিম্বা প্রকাশ্য স্থানে—তাঁহারা তাহাদের ক্ষমতাকে লঘু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কখনও ক্লান্ত হন না, তাহাদের অর্জ্জিত জয়ের প্রতি অবজ্ঞার কটাক্ষপাত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন না, তাহাদের পরিচ্ছদপ্রিয়তা, গল্পপ্রিয়তা ও অবিরাম ভাষণের সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রাচীন ব্যঙ্গ বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হন না—যদিও তাঁহাদের কৌতুকের ভিতর তাঁহারা ভুলিয়া যান যে তাঁহারা নিজেরাও উক্ত অভিযোগ হইতে (বিশেষতঃ বহুভাষণ সম্বন্ধে) মুক্ত নন। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে মেয়েরা—তাহাদের ক্ষুদ্র চম্পকাঙ্গুলির ভিতর তাঁহাদের যতটা নিরুপায় ও নিঃসহায় ভাবে জড়াইয়া রাখিতে পারে—ততটা তাঁহারা আর কোনোদিক্ হইতে ভয় করেন না।

তথাচ সমস্ত যুগের ভিতরেই—ঐতিহাসিক গবেষণাকারীগণ ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ যতদূর যাইতে পারেন—পুরুষ, জীবনের উচ্চতম আদর্শের মানস-মূর্ত্তিগুলি নারীমূর্ত্তির ভিতর দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। সৌভাগ্য, খ্যাতি, বিচার, ললিত কলা এবং বিজ্ঞান—প্রত্যেকটি মূর্ত্তিই প্রীতিদ্বারা কল্পিত হইয়া পুরুষের হস্তে গঠিত হইয়াছে। কারণ আপনার মনের ভিতর তাঁহারা জানিয়াছেন যে মেয়েদের বিশ্বস্ততা, সাহস, সততা, নির্ম্মলতা—তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাই তাঁহারা তাহাকে রমণীর মত করিয়া রমণীরূপে প্রকাশিত করিতে ক্লান্তিবোধ করেন নাই। তাঁহারা যখন তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান করেন, তখন যে তাহারা একটা বৃহৎ ক্ষমতাকে পরিচালনা করিতে পারে, ইহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকিয়া—তাঁহারা যখন তাহাদের প্রবল মনস্বিতাকে বহুবিধ রীতি ও নিয়মের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে ও নিরস্ত করিতে প্রয়াস পান, তখন—অধিকাংশ আদর্শকেই নারীমূর্ত্তিতে গঠিত করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ বিচার দান করিয়া তাঁহারা একটা খাপছাড়া বিরুদ্ধ প্রকৃতির সন্তোষ অনুভব করিয়া থাকেন।

প্রকৃতির মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ—তাহাই নারীমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা, প্রেম, বিশ্বাস, কল্পনা, ভাগ্য, নীতি, বিজ্ঞান, সমস্ত মহনীয় গুণাবলী ও ললিত ভাবকে পুরুষের উচ্চতম প্রতিভা নারীমূর্ত্তিতে ও নারীপ্রকৃতিতে জগতের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে। ইহা হইতেই বেশ সহজে বোঝা যায় যে পুরুষ সর্ব্বদাই আপনার মনের ভিতর, সৃষ্টির মধ্যে নারীর প্রকৃত স্থান ও প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের নিজেদের সুবিধার জন্য তাঁহারা যে সব নিয়ম রচিত করিয়াছেন তাহার দ্বারা তাঁহারা—তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও জয়শীল এই প্রাণীগুলির দ্রুত পুরোগতির পথে তাঁহাদের সাধ্যমত প্রতিবন্ধক স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন! এখন

—নারী জগতের কার্য্যে এবং উন্নতিতে একটা গুরুতর দিক্ স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, পুরুষেরাও একটা অস্পষ্ট আতঙ্কে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন। প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক ব্যবসায়েই তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন, রমণী সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া উচ্চতর মানসিক ক্ষমতায় অধিরোহণ করিতেছে. শিক্ষার সমতল হইতে সমতলান্তরের মধ্য দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে এবং তাহার গমন-পথে সে শিখিতেছে যে পুরুষের প্রবৃত্তির কাছে, তাহার জৈববৃত্তির কাছে অবিচারিত বশ্যতাই তাহার স্বত্ব নয়! আব্‌দেরে ছেলের মত অমনি তাঁহারা চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন "মেয়েদের কোনও সৃষ্টি-ক্ষমতা নাই, কোনো মৌলিকতা নাই, কোনো চরিত্রবল নাই. আর্টের ভিতর তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা অতি নগণ্য!

কিন্তু হে আমাদের শ্রেষ্ঠতরগণ, থাম! ভাবিয়া দেখ, কত অন্যায় সুযোগ তোমরা পাইয়াছ! এব্রাহামের সময় হইতে নারীকে তোমরা তোমাদের পালিত পশুর সঙ্গে একত্রিত করিয়া রাখিয়াছ এবং উভয়ের প্রতি সমান বৃহৎ ঔদাসীন্যে তোমাদের কশা উদ্যত করিয়াছ? এখানেও তোমরা ক্ষান্ত হও নাই—গৃহপালিত পশুর সঙ্গে তাহার সমান মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছ! শতাব্দীর পর শতাব্দী তোমরা স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছ—এখন মেয়েদের পালা পড়িয়াছে। আর্টের ভিতরে তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহা নগণ্য বলিতেছ? স্বীকার করি কাব্যের ভিতরে তাহারা কোনো বৃহৎ স্থান অধিকার করে নাই। যথা—রমণী সেক্সপিয়র আমরা কখনও পাই নাই। কিন্তু একথা বলার সঙ্গে ইহাও বলিতে হয় যে, অন্য কোনো পুরুষের দ্বারাও সে পদ পূর্ণ হইবার আশা আমরা করি না। তথাচ—আমি ইহা স্বীকার করি না যে মেয়েরা কোনও দিন দান্তে (Dante) বা শেলি হইতে পারিবে না! কারণ একথা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে যে মেয়েদের শিক্ষা এই সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং এই প্রথম তাহাদের সুযোগ দান করা হইয়াছে!

সঙ্গীত ও সুরযন্ত্রের ভিতরও মেয়েদের ক্ষমতা অপ্রচুর বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি, সর্ব্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর গান গুলির অধিকাংশেরই রচয়িতা—রমণী। কিছুদিন হইল মিস্ ব্রাইট নাম্নী একজন মহিলা ড্রেস্‌ডেনে এমন একটি বিশুদ্ধ তান-লয় সম্পন্ন নির্দ্দোষ সুরযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে ড্রেসডেনের বিখ্যাত সঙ্গীত-সভা তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। কুহকের মত তাহা প্রত্যেক শ্রোতার চিত্তকে আবিষ্ট ও বিহ্বল করিয়া দিত।

মানসিক ক্ষমতার স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রামের ভিতর মেয়েদের একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আইন—যাহা আমরা দেখিতেছি—তাহা পুরুষের জন্য পুরুষের দ্বারাই রচিত হইয়াছে, মেয়েদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনো বিধিবদ্ধ শাসন তাহার ভিতর নাই। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ইহার ফল স্বরূপ যে শোচনীয় ও হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলি দেখিতে পাই, তাহার একটি মাত্র উল্লেখ করিলেও যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যায়। আমাদের নারীসমাজ তাই রমণী আইন ব্যবসায়ীর ধারণাকে অন্তরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছে, তাহারা আশা করিতেছে যে, যখন তাহাদের তীক্ষ্ণ মেধা 'ন্যায় সঙ্গত বিচার" নামক বৃহৎ ও অনবনমনীয় জটিল যন্ত্রণা ভেদ করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবে তখন তাহারা আপনাদের জন্য তাহার ভিতর কিছু সাধন করিতে পারিবে। এখন অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে পুরুষের সংযমহীন পাশবিকতা ও তজ্জন্য অপর পক্ষের অধোগতি আইনের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছে এবং তাহার প্রতীকারের কোনো পথ মুক্ত নাই! আমারা পোর্শিয়ার মত রমণী-আইন-ব্যবসায়ী চাই. যাঁহাদের তীক্ষ্ণ মেধা সঙ্কটের জটিল জাল হইতে নির্গমনের পথ আবিষ্কার করিবে। পুরুষেরা ইহার ভিতর যখন প্রবেশ করেন তখন শুধু নিরাশ ভাবে তাহার ভিতর হাবুডুবু খাইয়া মরিতে থাকেন, কারণ অন্ধ কখনো অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে না তাহাতে উভয়েই পথের ধারের নালায় পতিত হয়।

ভৈষজ্য বিভাগেও মেয়েরা নিশ্চিত জয়চিহ্ন অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রাচ্য-

জাতিরা—যাঁহারা নিজের শ্রেণীরই অপর একজনের কাছে তাঁহাদের অন্তঃপুরিকাগণকে উপস্থিত হইতে দেওয়া অপেক্ষা দারুণ রোগযন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া নিষ্ঠুর মৃত্যুর কবলে তাঁহাদের পতিত হইতে দেওয়া সন্তোষজনক মনে করেন—তাঁহাদের অন্তঃপুরে রমণী-চিকিৎসক ও রমণীসার্জ্জন যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহার অপরিসীম মূল্যের উপরে আর কিছু নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। বিজ্ঞানের এই শাখায় মেয়েদের কাজ দুঃখক্লিষ্ট মনুষ্য-সমাজের নিকট প্রতিদিনই যে অধিকতর মূল্যবান হইয়া উঠিতেছে ইহা সকলে অবগত থাকা সত্ত্বেও আমরা সেদিন একটি ঘটনা দেখিয়াছি, যাহাতে একজন স্ত্রীলোক হাউস্ সার্জ্জন্ বলিয়া অভিহিত হইবে এই জন্য অনেকগুলি পুরুষ একটি হাঁসপাতালের কার্য্যত্যাগ করিয়াছিলেন! যদিও, উক্ত পদের জন্য যিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নৈপুণ্য ও কার্য্যকারী শক্তি তাঁহাদেরই সমতুল্য ছিল এবং উক্ত পদ অধিকার করিবার মত সমস্ত গুণে তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন! একজন স্ত্রীলোকের কার্য্যকরী ক্ষমতাকে সম্মান করা অপেক্ষা কর্ম্মত্যাগ তাঁহাদের বিবেচনায় শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। খানিকটা অনাবশ্যকরূপে আমি এখানে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম, কিন্তু এটি শুধু একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ—শুষ্ক তৃণটুকুর মত যাহা বাতাসের গতিমুখ দেখাইয়া দিবে।

বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজ গ্রহণ করিয়া মেয়েরা একটি সুবৃহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের আরও করিবার রহিয়াছে। কি নিয়মে ছেলেদের শিক্ষা প্রদান করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার তাঁহারাই যোগ্যপাত্র, এবং তাঁহাদের পরিদর্শন-কার্য্য কোনও অসঙ্গতির দ্বারা দুষ্ট হইবার নহে। একজন পুরুষ পরিদর্শক পঞ্চম বর্ষীয় বালকদের মানসিক গণনা-শক্তির শোচনীয় অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। একজন পুরুষেই উহা সম্ভবে, মেয়েরা কখনও এরূপ বৃহৎ অসঙ্গত বিবেচনার পরিচয় প্রদান করিবে না! প্রসঙ্গ ক্রমে এই সময়ে আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার পদ্ধতির উপর একবার দৃষ্টিপাত করা বোধ হয় কিছু অশোভন হইবে না। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু বিধি—পুরুষেরা তাহা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং মেয়েরা এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতে পান নাই!

১। তিন বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ছেলেদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ-কাল নির্ণীত হইয়াছে এবং পঞ্চম বর্ষের সময় স্কুলে ভর্ত্তি না হইলে তাহাদের উপর শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

২। স্কুল-পরিদর্শকেরা চতুর্থ-বর্ষ-বয়স্ক শিশুর অঙ্ক-বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের রিপোর্ট শিশুদের "মানসিক গণনা শক্তির শোচনীয় অভাবের" বিবরণে পূর্ণ থাকে।

৩। পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বেই ছোট ছোট মেয়েগুলিকে দুই ঘণ্টা হইতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত সূচীকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সুকুমার বয়সে সূচীকর্ম্ম তাহাদের দৃষ্টিশক্তির গ্লানি করিতে থাকে, কচি কচি মেয়েগুলির উপর এইরূপ ২।৩ ঘণ্টা ব্যাপী পরিশ্রমের বিধান, সময়ের অপচয় ও নিষ্ঠুরতা মাত্র।

৪। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে স্কুলে ডেস্ক্, ব্ল্যাক বোর্ড, শ্লেট এবং বইএর ছড়াছড়ি হয়, কিন্তু তাহাতে শিশুর স্বাভাবিক কার্য্যকরী শক্তির "বিকাশ" স্কুলের ঐক্যতানের সুর যোগাইতেই ব্যয়িত হয়। সাধারণতঃ যাহা করান হয়, তাহা ছাড়িয়া আর কিছু করিতে চাহিলে তাহাদিগকে "অশিষ্ট" আখ্যায় অভিহিত করা হয়, প্রত্যেককেই একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই বিষয় সম্পাদিত করিতে বাধ্য করা হয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই ঠিক এক রকমের বাড়ী, এক রকমের চেয়ার, এক রকমের টেবিলই তৈয়ারি করা চাই ও প্রত্যেকটি ইট ঠিক একই মুহূর্ত্তে টেবিলের উপর রাখা চাই।

৫। পুরুষ-পরিদর্শক সত্ত্বেও শিশুরা ঘুমাইয়া পড়ে। ঝিমাইতে ঝিমাইতে তাহাদের ললাট ডেস্কে বারংবার আঘাত পাইতে থাকে, এবং কঠিন বেঞ্চের উপর মস্তক সম্মুখে রাখিয়া যখন তাহারা বাহুকে উপাধান করিয়া ঘুমাইতে থাকে, তখন তাহাদের কোমল মেরুদণ্ড ধনুর মত আকুঞ্চিত হইয়া থাকে।

৬। শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রধানতঃ শারীরিক শাস্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে, এবং ভয়কেই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা

বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এখানে আমি সারজন গর্ষ্টের লিখিত একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"শিশুদের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার ভাবুকতা নয়। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আইন যাহাদের তৈয়ার করিয়া তুলিবার জন্য—এই শিশুগণই একদিন আমাদের সেই উন্নত বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র হইয়া দাঁড়াইবে, ইহারাই সেই ভবিষ্যৎ কালের নাগরিকবর্গ—যাহারা আমাদের রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা হইবে। আমরা যদি তাহাদের সুকুমার বয়সের একান্ত অনুপযুক্ত কঠোরতার দ্বারা শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলি, যদি আমরা তাহাদের ক্ষুদ্র দেহগুলিকে বৃহৎ উচ্চ ডেস্কের অসমতার দ্বারা আকুঞ্চিত করিয়া তুলি, যদি আমরা অনুচিত সময়ে সম্পন্ন সূচীকর্ম্ম দ্বারা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করিয়া দেই ও তাহারা যাহা ধারণা করিতে পারে না, এমন সব বিষয় তাহাদের অধিগত করিতে দিয়া তাহাদের পীড়িত করিয়া তুলি—তবে, আমরা কখনও আমাদের বিদ্যালয়ের যোগ্য ছাত্র পাইব না, এবং রাজ্য রক্ষার যোগ্য নাগরিক কখনও লাভ করিব না।"

উপরে যাহা উল্লেখ করা গেল, তাহা ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্য্যে মেয়েদের অধিকার অখণ্ডনীয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। শিশুদের শিক্ষার পক্ষে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কি উপযোগী হইবে, স্বভাবতঃই তাঁহারা তাহা জানে। শিশুর মানসিক শক্তিগুলি কি উপায়ের দ্বারা পূর্ণরূপে বিকশিত ও সুমার্জ্জিত হইবে, তাহা তাহাদের মাতৃ-হৃদয়ের সহানুভূতি—বিধিদত্ত দানের মত বংশানুক্রমিক ভাবে যাহার উপর তাহাদের নিত্য অধিকার—সহজেই তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

পার্লিয়ামেণ্টের ভিতর মেয়েদের আসন গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমার কি অভিমত অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। বেশ পরিষ্কার ভাবেই আমি বলিতে পারি যে, আমি তাহা হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি। মেয়েরা—যাহারা সর্ব্ববিধ সৌকুমার্য্যের পুরোবর্ত্তিনী—তাঁহারা হাউস অব কমন্সএর উত্তপ্ত বিতণ্ডার ক্ষেত্রে অবতরণ করিলে, তাঁহাদের শালীনতারক্ষা সন্দেহ-স্থল হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে আমি বলিতে পারি যে আমি মেয়েদের [illegible] পুরুষোচিত কাজে ও পুরুষোচিত ক্রীড়ায় যোগদান ভয়াবহ অসঙ্গত মনে করি, তাহাতে রমণীর রমণীত্ব বিনষ্ট হয়। মেয়েদের সম্বন্ধে সকলেই বেশ প্রবলতার সঙ্গে বলিয়া থাকেন যে, তাহাদের সুগৃহিণী ও সুপাচিকা হওয়া উচিত, বস্তুতঃই তাহা তাহাদের হওয়া দরকার। রন্ধনে যে অনভিজ্ঞা হয় সে কখনও সুগৃহিণী হইতে পারে না, এবং গৃহিণীপনায় যে অনভিজ্ঞা হয় সে কখনও সুপাচিকা হইতে পারে না। এই দুইটী বিষয়ের ভিতর একটী অভিন্নত্ব আছে এবং তাহা আর্থিক হিসাবের সঙ্গে গার্হস্থ্য-স্বচ্ছন্দতার জন্ম দান করে। কিন্তু পুরুষেরা যাহা চান—মেয়েদের সমস্ত উদ্যম ও একাগ্রতাকে রন্ধন ক্রিয়ায় ও গৃহিণীপনায় নিয়োজিত রাখা—তাহা শুধু একটী সুমহৎ শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অপচয় মাত্র; যুদ্ধবিভাগের একজন শ্রেষ্ঠতম বীরকে কেবল মাত্র রসদ সংস্থানের শৃঙ্খলা সাধনার্থে নিযুক্ত করার মতই তাহা ভয়াবহ অনুচিত।

তাহাদের পায়ের এই মরচেধরা শিকলগুলি ভগ্ন করিয়া মুক্ত মনুষ্যের গৌরবময় জীবনের ভিতর পদক্ষেপ করিবার সময় মেয়েদের একটী বৃহৎ বিষয়কে সর্ব্বদাই স্মরণ করিতে হইবে ও তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাদের নব মুক্তির পুলকে তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। মানসিক ক্ষমতায় পুরুষের সঙ্গে সম অধিকারের দাবী করিয়া—বাহিরের প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের সহিত তাহার পার্থক্য বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে, নইলে সে অধিকার তাহারা রক্ষা করিতে পারিবে না। পুরুষের আত্মনির্ভর ও ব্যক্তিগত বিশেষ গুণাবলী ছাড়া আর কিছুরই অনুকরণ মেয়েদের জীবনের সঙ্গে খাপ খাইবে না, ইহা যেন তাহারা বিস্মৃত না হয়। মেয়েদের ভিতর যাহারা পুরুষের মত পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং পুরুষের মত করিয়া চলে, তাহারা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীরই বাহিরে গিয়া পড়ে, আর যাহারা আচারে, ব্যবহারে, পরিচ্ছদে, জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে ও প্রত্যেক বিষয়ে আপনাদের রমণী-স্বভাবসিদ্ধ সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যকে রক্ষা করিয়া চলে—তাহারা শুধু পুরুষের সঙ্গে এক সমভূমিতে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না—তাহারা তাহা হইতেও আপনাদের ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করে, পুরুষ তখন দেবীজ্ঞানে তাহাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

স্বভাবতঃই, পুরুষ নিজে যাহা অনুকরণ করিতে পারেন না, তাহাকে অর্চ্চনার ভাবে দেখিয়া থাকেন। পুরুষ যখন স্বেচ্ছাচারিতার বশে নৈতিক শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে থাকেন তখন মেয়েরা তাহার ক্ষুদ্রতম বিধানটীও ধীরভাবে পালন করুক, পুরুষ যখন উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পাশবিকতার পরিচয় প্রদান করেন, তখন মেয়েরা শুচিতা ও নির্ম্মলতার দ্বারা পূজার্হা হউক, ঘোড়দৌড় ও তাসের বহু নীতিবিরুদ্ধ খেলায় পুরুষ যখন আপনার বিবেকবুদ্ধিকে খর্ব্ব করিতে থাকেন, তখন মেয়েরা তাহার ভিতর হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে অবস্থান করিয়া, এবং পুরুষের নৈতিক শিথিলতার উপরে ও পারিবারিক জীবনের পবিত্র বন্ধনের অবহেলার উপরে তাঁহাদের বলিষ্ঠ প্রতিষেধ স্থাপন করিয়া নীরবে আপনাদের কাজ করিতে থাকুক। প্রত্যেক শিল্পে, প্রত্যেক আর্টে তাহারা আপনাদের উন্নতি প্রতিষ্ঠা করুক, পুরুষের খেয়াল এবং খুসীই যেন তাহাদের একমাত্র নির্ভর না হয়।

নারী—পুরুষের অশোভনত্ব ও রূঢ়ত্বের বিপরীত সৌকুমার্য্য ও শোভনত্বের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে; তাহার সকল চেষ্টার ভিতরে তাহার সেই মৌলিক ও ব্যক্তিগত বিশেষ গুণগুলি পার্থক্যের প্রবলতা দ্বারা তাহারা সুস্পষ্ট করিয়া তুলুক। অবশ্য পুরুষ—মেয়েদের এই "ব্যক্তিগত বিশেষ গুণকেও" বহুদিন পর্য্যন্ত অস্বীকার করিবেন, কিন্তু আমরা—যাহারা—পুরুষের ব্যক্তিগত বিশেষ গুণের মতই তাহাকে নিশ্চিত ও ধ্রুব বলিয়া জানি—কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিব না, তাহা হইলেই এক দিন তাহা স্বীকৃত হইবে। ইপ্সিত গন্তব্য স্থানের প্রতি অগ্রসর হইতে, মেয়েদের—সকল উন্নতির যাহা প্রধান শিক্ষা—তাহা অবশ্য অধিগত করা চাই, তাঁহাদের মনে রাখা চাই যে তাহা পুরুষের পাণ্ডুলিপি হওয়া নয়, তাহা প্রত্যেক দিকে আপনাদের পার্থক্যকে রক্ষা করা। এই উপায়ের দ্বারাই তাহারা পুরুষের সঙ্গে মানসিক ক্ষমতায় সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবে—এবং তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে পারিবে।" *

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

* ভাদ্রের সংখ্যা ভারতমহিলায় প্রকাশিত "কর্ম্মযোগ"—নামক প্রবন্ধ মেরি করেলির "Imaginary Love" নামক প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ, ভ্রমক্রমে তাহা উক্ত সংখ্যায় লিখিয়া দেওয়া হয় নাই এবং আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত "সাহিত্যসেবার" ভিতর উদ্ধৃত কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "পুরস্কার" শীর্ষক কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার উদ্ধৃত চিহ্নও দেওয়া হয় নাই।

তুমি ও আমি।

(১)

তুমি শান্তি-শীতল শ্যাম জলধর
বর্ষা-গগন-বুকে!
আমি রৌদ্র-তাপিত মরুভূ কঠোর
রয়েছি ঊর্দ্ধমুখে!
যুগ-যুগ ধরে দারুণ তৃষায়
জ্বলে দাবানল শুষ্ক হিয়ায়,
তোমার অতুল সুধা-কণিকায়
সে তৃষা মিটিল কই?—
নিমেষ না যেতে করি 'হায়' 'হায়'
সব টুকু শুষি' লই'!

ওগো,—
তুমি শান্তি-শীতল শ্যাম জলধর
বর্ষা-গগন-বুকে!
আমি রৌদ্র-তাপিত-মরুভূ কঠোর
রয়েছি ঊর্দ্ধমুখে!

(২)

তুমি স্নিগ্ধ জ্যোছনা-ছায়া-আবরণ
পুণ্য-মধুর-গেহ!
আমি তীর্থ-তলাসী পথিক নূতন
শ্রান্তি-কাতর-দেহ!
অবশ চরণ নাহি চলে আর
লুটাতে শরীর চাহে কতবার,
মুক্ত তোমার মরম-দুয়ার,
নাহি হয় তবু ঠাঁই!
চির-চঞ্চল চিত্ত আমার
শুধু করে 'যাই' 'যাই'!

ওগো,—
তুমি স্নিগ্ধ জ্যোছনা-ছায়া-আবরণ
পুণ্য-মধুর-গেহ!
আমি তীর্থ-তলাসী পথিক নূতন
শ্রান্তি-কাতর-দেহ!

(৩)

তুমি স্বর্ণ-শিকলি—পুতলি মায়ার
নিঠুরতর ভবে !
আমি কুঞ্জ-বিহারী পাখী-সুকুমার
বদ্ধ তোমাতে কবে !
আকুল কণ্ঠে গাহি কিবা গান
নাহি বুঝি সুর, নাহি বুঝি তান,
পলে পলে লয়ে তব স্নেহ-দান
তৃপ্তি নাহি যে পাই !
কাঁদে নিশিদিন সকল পরাণ
'আরো চাই' 'আরো চাই' !
ওগো,—
তুমি স্বর্ণ-শিকলি—পুতলি মায়ার
নিঠুরতর ভবে !
আমি কুঞ্জ-বিহারী পাখী-সুকুমার
বদ্ধ তোমাতে কবে !

(৪)

তুমি স্পর্শ-অতীত শ্রেষ্ঠ সাধনা
স্বর্গ-শোভনা দেবী !
আমি শূন্য-হৃদয় ব্যর্থ-কামনা
ক্ষুদ্র ভিখারী কবি !
তুচ্ছ ভাষার শত আয়োজনে
অর্ঘ্য সাজাতে চাহি ও চরণে,
হাস তুমি শুধু অয়ি সুনয়নে,
আশা যে মিটেনা মোর !
এখনো পাইনি সে 'বর' জীবনে
মিলনে রহিতে ভোর !
ওগো,—
তুমি স্পর্শ-অতীত শ্রেষ্ঠ সাধনা
স্বর্গ-শোভনা দেবী !
আমি শূন্য-হৃদয় ব্যর্থ-কামনা
ক্ষুদ্র ভিখারী কবি !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মার্কটোয়েন্।

আমেরিকার মার্কটোয়েনের নাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। কয়েক মাস হইল তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পরিহাসরসিক মার্কটোয়েন তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির বলে জনসাধারণের হৃদয় এমনি অধিকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুতে অনেকে আত্মীয় বিয়োগ-জনিত কষ্ট অনুভব করিতেছেন। রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই মার্কটোয়েন বিরচিত গল্পগুলি পড়িয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের লোকেরা মার্কটোয়েনকে কেবলমাত্র হাস্যরসিক বলিয়াই জানিতেন। অনেকেই তাঁহার রচনার পক্ষপাতী ছিলেন ;—কিন্তু লোককে হাসানো ছাড়া তাঁহার রচনার যে আর কোনও গুণ আছে এরূপ বড় একটা কেহ মনে করিতেন না। সেই জন্য, মার্কটোয়েন প্রথমবার ইংলণ্ডে আসিলে সেখানকার লোকেরা মনে করিলেন, 'বেশ একটী সং পাওয়া গিয়াছে ;—কিন্তু তাঁর বক্তৃতার ধীর মন্থর গতি, তাঁর সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালী এবং তাঁর গল্পের দৈর্ঘ্য দেখিয়া লোকে ক্রমেই বুঝিতে পারিল, যে কেবলমাত্র হাসিখুসী ছাড়া এ লোকটীর চরিত্রের মূলে বাস্তবিকতা নিহিত রহিয়াছে।

মার্কটোয়েনের মৃত্যুর পর তৎসম্বন্ধে অনেক গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গল্পটীতে তাঁহার চরিত্রের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্কটোয়েন কাহাকেও কোন কথা কহিলে সে মনে করিত যে মার্কটোয়েন বুঝি তামাসা করিতেছেন,—তামাসা না করিয়া প্রকৃতপক্ষে কোনও কথা যে মার্ক-টোয়েন কহিতে পারেন সে কথা কেহ সহজে ভাবিতে পারিত না। একবার মার্কটোয়েন একটী কবিতা রচনা করেন। কবিতাটী গম্ভীর ভাবের হওয়ায় সেটী ছাপান হয় নাই। একবার কোনও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সমক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য মার্কটোয়েনের নিমন্ত্রণ হয়। তাঁহার কোনও বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি পূর্ব্বোক্ত অপ্রকাশিত কবিতাটী এই বক্তৃতা উপলক্ষে পাঠ করিতে

সম্মত হন। বক্তৃতার উপসংহার কালে মার্কটোয়েন বলিলেন, "ভদ্রমহিলাগণ, এইবার আপনাদের সমক্ষে আমার রচিত একটী কবিতা পাঠ করিব।"—এই কথা শুনিবামাত্র সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন মার্কটোয়েন বলিলেন, "আপনারা হাসিবেন না। আমি তামাসা করিতেছি না। এটী বাস্তবিক গম্ভীর ভাবের কবিতা।" কিন্তু ইহাতে শ্রোত্রীবর্গের হাস্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। বক্তা দেখিলেন, মহাবিপদ! তাঁর মনের প্রকৃত ভাব কেহই বুঝিতে চাহিতেছেন না;—তখন তিনি করিলেন কি, কবিতাটী যে কাগজে লেখা ছিল সেই কাগজখানি পকেটে পূরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, আপনারা যখন কিছুতেই আমার কথা মানিতেছেন না তখন আমি আর এ কবিতা পাঠ করিব না;"—আর সভাস্থ সকলে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

অন্যান্য পরিহাসরসিকদিগের ন্যায় মার্কটোয়েন মানবজীবনে হাসিকান্নার মিশ্রণ দেখিতে পাইতেন। তাঁহার হাসির ভিতর দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইত। তাঁহার নিজের জীবনই এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল।

মার্কটোয়েন নিজের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন:—ল্যাংডন নামক একজন ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় তাঁহার ভগ্নীর হস্তীদন্তনির্ম্মিত একটী প্রতিকৃতি ছিল। ঐ প্রতিকৃতির মুখ দেখিয়া মার্কটোয়েন এমন মোহিত হয়েন যে ছবিটির প্রেমে হাবুডুবু খাইতে থাকেন এবং আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়া সেই মহিলাকে খুঁজিয়া বাহির করেন। সেই মহিলা তিন বার মার্কটোয়েনের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করেন। তথাপি মার্কটোয়েন পশ্চাৎপদ হন নাই। অবশেষে সেই মহিলা মার্কটোয়েনকে বিবাহ করিতে সম্মত হন।

এই মহিলার পিতাকে মার্কটোয়েন যে ভাবে এই সংবাদ দেন, তাহাতেও মার্কটোয়েনের নিজত্ব দেখা যায়। মার্কটোয়েন তাঁহার বাঞ্ছিতার পিতার নিকট গিয়া বলেন যে, "মহাশয়, আপনার কন্যার ও আমার মধ্যে আপনি কি কিছু লক্ষ্য করিতেছেন?" মহিলার পিতা প্রথমে হতবুদ্ধি, তার পর বিরক্ত হইয়া বলেন, "না, আমি কিছু লক্ষ্য করি নাই।" মার্কটোয়েন উত্তর করেন, 'লক্ষ্য করুন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন।' এইরূপ অদ্ভুত ভাবে যে বিবাহের আরম্ভ ও পরিণতি তাহা পরিনামেও অতিশয় সুখের হইয়াছিল।

অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রথম দৃষ্টিতে ভালবাসা জন্মিয়া বিবাহ হইলে সেই বিবাহ প্রায়ই সুখ ও শান্তিপ্রদ হয় না, বিশেষতঃ যদি সংসারে আর্থিক অসচ্ছলতা থাকে। মার্কটোয়েনের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। তিনি পত্নীর প্রেমে অতিশয় সুখী ছিলেন; তাঁহার বিবাহিত জীবন মধুময় ছিল। প্রেমপরায়ণা প্রিয়তমা প্রিয়বাদিনী পত্নীর অকালবিয়োগে মার্কটোয়েন যে মর্ম্মবেদনা ভোগ করিয়াছিলেন, কালিদাস হইলে তিনি পত্নীবিরহে কাতর হইয়া নিশ্চয় বলিতেন,

"গৃহিণীঃ সচিব সখি মিথঃ।
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বং
বদ কিং ন মে হৃতম্।"

অর্থাৎ তুমি আমার গৃহিণী, সচিব, রহস্যে সখী এবং ললিতকলায় প্রিয় শিষ্যা ছিলে। নির্দ্দয় মৃত্যু তোমাকে হরণ করিয়া আমার কি না হরণ করিল, বল।

মার্কটোয়েন নিজের পুস্তকে যখনই পত্নীর প্রসঙ্গ করিয়াছেন তখনই তাঁর সম্বন্ধে অতিশয় প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁর পত্নী অতিশয় স্নেহপরায়ণা, অতিশয় মনস্বিনী, ধর্ম্মভীরু ও অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন।

আমাদের দেশে শাস্ত্রে আছে,

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তেরমন্তে তত্র দেবতাঃ।"
নারী হি জননী পুংসাং, নারীস্ত্রীরুচ্যন্তে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গৃহে গৃহস্থানাং নারীপূজা গরীয়সী।"

আমেরিকার শাস্ত্রে এরূপ কোনো কথা আছে কি না জানি না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান্‌গণ কর্ত্তৃক "নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে।"

আমেরিকার নারী, কন্যা, গৃহিণী ও জননীরূপে আদৃত, সম্মানিত এবং পূজিত হইয়া থাকেন। গৃহে তাঁহার অশেষ প্রতিপত্তি;—প্রকৃতপক্ষে তিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নারীজাতির প্রতি সম্মানে মার্কটোয়েন

খাঁটি আমেরিকান্ ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর যে সকল প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন, তিনি সেই প্রশংসাবাদের যোগ্যপাত্রী ছিলেন। সার ওয়াল্‌টার স্কট প্রভৃতি বাণীর সেবকদিগের ন্যায় মার্কটোয়েনের মনে সাধ ছিল যে, তিনি অর্থশালী হইবেন, তাহা হইলে আর শেষ জীবনে তাঁহাকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য লেখনী চালনা করিতে হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক পুস্তক প্রকাশক সম্প্রদায়ের অংশীদার হন। এই প্রকাশক সম্প্রদায় বড় বড় পুস্তক প্রকাশ করেন। কিন্তু বিপদ, সম্পদ, লাভ, লোকসান, সকল ব্যাপারেই আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রকাশকসম্প্রদায়ের কারবারের অবনতি ঘটে। ইহার পরিচালকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেউলিয়া হয়েন;—তাঁহাদের উপর ঋণের গুরুভার চাপে।

মার্কটোয়েন ইচ্ছা করিলে তাঁহার পাওনাদারদের সহিত একটা রফাবন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। এবং তাঁহারাও কিছু বাদকাট দিয়া লইতে স্বীকৃত ছিলেন। এ সম্বন্ধে মার্কটোয়েন তাঁহার পত্নীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, "না, তা করা হইবে না। পাওনাদারদের কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত মিটাইয়া দিতে হইবে।" ন্যায়পরায়ণ মার্কটোয়েনের অন্তঃকরণও ইহাতে সায় দিল। পাওনাদারদের সমস্ত পাওনা মিটাইয়া দিয়া মার্কটোয়েনকে কপর্দ্দকশূন্য হইতে হইল। এজন্য ৬০ বৎসর বয়সে নূতন করিয়া ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রেন্ধনচিন্তার বোঝা তাঁহাকে মাথায় করিয়া লইতে হইল। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তিনি ইংরাজী যাঁহাদের মাতৃভাষা এরূপ লোকদিগের নিকট বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই প্রকারে নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়ানো যে কিরূপ শ্রমসাধ্য, কিরূপ বিরক্তিকর ও কিরূপ জীবনীশক্তি ক্ষয়কারী ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে সহজে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু সংসার-সংগ্রামে প্রকৃত বীরের ন্যায়—মার্কটোয়েন এ সকল কষ্ট গ্রাহ্য না করিয়া ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ হাস্যরসের তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতে লাগিলেন।

আত্মীয় স্বজনের অকাল মৃত্যুজনিত শোকে মার্কটোয়েনকে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার, তৎপরে তাঁহার পত্নীর অকালে মৃত্যু হয়। আত্মীয় বিয়োগে তিনি যে নিরন্তর কি তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, সময় সময়, তাঁহার বক্তৃতাতেও তাহার আভাস পাওয়া যাইত। এ সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

মার্কটোয়েনের শেষবার ইংলণ্ড গমন উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ ইংলণ্ডের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সমবেত হইয়া একটী ভোজ দেন। ভূরিভোজনের পর ইংরেজসমাজে বক্তৃতা করিবার রীতি আছে। এই সভায় অনেকেই বক্তৃতা করিয়া মার্কটোয়েনের অশেষ প্রশংসাবাদ করিলেন। যথারীতি এই সকল প্রশংসাবাদের উত্তরে কিছু বলিবার জন্য মার্কটোয়েন দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি সভাস্থল হাস্যমুখরিত হইয়া উঠিল। মার্কটোয়েন পরিহাসরসিকতার স্রোত বহাইতে লাগিলেন। নিজেকেই কতবার তাঁর বিদ্রূপের বিষয়ীভূত করিলেন। এইরূপে একটী ঘণ্টা হাসি ঠাট্টায় কাটিয়া গেল। তারপর অকস্মাৎ, কোনরূপ পূর্ব্বাভাস না দিয়াই, মার্কটোয়েনের কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি অল্প কয়েটী কথায় গাঢ়স্বরে তাঁহার হৃদিস্থিত চিরান্ধকারের সহিত এই উজ্জ্বল হাস্যমধুর সভার পার্থক্যের কথা বলিলেন,—তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা ও পত্নীর অকাল মৃত্যুর কথা বলিলেন। অমনি, যেন কোনও মন্ত্রবলে, সেই আনন্দকোলাহলপূর্ণ সভাস্থলে, শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে মার্কটোয়েনের দুঃখের পসরা পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার চারিটি সন্তানের মধ্যে দুইটীমাত্র জীবিত ছিল। এই দুইটীর মধ্যে একটী আজন্মপীড়িত এবং সকল কার্য্যে অক্ষম ছিল। এই অক্ষম সন্তানটী পিতামাতার অধিক স্নেহের পাত্রী হইয়াছিল। মার্কটোয়েনের হৃদয় এমনি কোমল ছিল যে তিনি তাঁহার সন্তানগুলিকে ঠিক তাহাদের মাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। এই অক্ষম সন্তানটীকে ভবিষ্যৎদারিদ্র্যের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইবার আশায়

মার্কটোয়েন তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে সেই অক্ষম বালিকাটী স্নানাগারে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মার্কটোয়েন সুখদুঃখের অতীত লোকে প্রস্থান করিলেন। (সংকলিত)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি, এল।

আমি, দাদা ও বউদিদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমাদের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিয়া যাইতেছিল। জগতে যে অনেক দুঃখ আছে, আমরা তাহা বুঝিতেই পারিতাম না। অকস্মাৎ এক শোক আসিয়া আমাদের পরিবারে প্রবেশ করিল। শোকের সঙ্গে এক ধর্ম্মপ্রচারকও গৃহে প্রবেশ করিলেন। তীর্থস্থানের পাণ্ডারা যেমন নিরীহ যাত্রীদিগকে পাইয়া বসে, তেমনি ধর্ম্মপ্রচারক আমার বাবাকে পাইয়া বসিলেন। পদ্মানদীর একটানা স্রোতের প্রতিকূলে হাওয়া উঠিয়া জলের মধ্যে তরঙ্গ তুলিয়া দেয়; সেইরূপ সেই প্রচারক আমাদের সুখের একটানা স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পরিবারের ভিতর একটা অশান্তির ঢেউ তুলিয়া দিলেন। সে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার আগে আমাদের ঘরের কথা বলিয়া রাখি।

বাবাই আমাদের গৃহের কর্ত্তা। তাঁহার নাম সারদা প্রসাদ চৌধুরী। আমার নাম হেমলতা ও আমার দাদার নাম অরবিন্দ। বাবা হাইকোর্টের উকিল। ওকালতিতে যথেষ্ট পশার; তাহা ছাড়া তাঁহার ক্ষুদ্র একটি জমিদারী আছে। তিনি তরুণ বয়সে খ্রীষ্টানদিগের একটি কলেজে পড়িতেন; সেই সময়ই সমাজের প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে। তাহার পর অনেক দিন হিন্দুসমাজে ছিলেন; অথচ সামাজিক নিয়মগুলি মান্য করা আবশ্যক মনে করেন নাই। তাঁহার শিবরাম তেওয়ারির হাতের মাছের ঝোলের চেয়ে রহিম বাবুর্চ্চির তৈরী মুরগির মাংস অতিশয় উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া মনে হইত। আমরা সর্ব্বদাই পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুসরণ করিয়া চলিতাম; কিন্তু কোন দিন যে ঠাকুর দেবতার পায়ে ফুল দিয়াছি, তাহা মনে হয় না। পৃথিবী জুড়িয়া প্রকাণ্ড যে একটা ধর্ম্ম আছে, তাহার কোন খবর আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিত না।

এ সকল সত্ত্বেও বাবা হিন্দুসমাজেরই একজন। কিন্তু সমাজের এই ক্ষীণ যোগসূত্রটুকু সহজেই ছিন্ন হইয়া গেল। বাবা একবার পূজার ছুটিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ইউরোপে গমন করিলেন। ভাবিয়াছিলেন কথাটা গোপন থাকিবে। কিন্তু তাহা থাকিল না। বাবা যখন প্যারিসে, তখন হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেবও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন হোটেলে দুজনে দেখাশুনা হইয়া গেল। সাহেবের মনে বড় আনন্দ হইল; তিনি সে আনন্দ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কলিকাতায় উকিল পীতাম্বর বাবুকে লিখিলেন :—

"প্রিয় পীতাম্বর বাবু, দেখুন ত সারদা বাবুর কেমন সাহস! তিনি সমাজের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া ইউরোপে আসিয়াছেন। আশা করি আগামী দুর্গোৎসবের ছুটিতে আপনিও ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন।"

পীতাম্বর বাবুর সঙ্গে বাবার সদ্ভাব নাই; তাই তিনি বাবাকে জব্দ করিবার জন্য কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। সেই হইতে হিন্দুসমাজে আর আমাদের স্থান রহিল না। কিন্তু সেজন্য বাবাকে কোন দিন দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। তিনি প্রকাশ্যভাবে সমাজের বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন; দাদা বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে বিলাত পাঠাইলেন। আমি লরেটোতে পড়িতে ও গান বাজনা শিখিতে লাগিলাম।

তাহার পর আমার দাদা বিলাত হইতে বিজ্ঞান শিখিয়া, কলিকাতায় আসিয়া একটি কলেজের অধ্যাপক হইলেন। আমি এফ, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াও পরীক্ষা দিলাম না; গণিতের অধ্যাপক স্পষ্টই বলিয়া দিলেন—"তুমি ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অনেক ভাল ছেলেরও যশোরশ্মি ম্লান করিতে

পারিবে, কিন্তু আঁকের অঙ্কই ফেল হইয়া যাইবে।" এ কথার পর আর কোন্ মেয়ে পরীক্ষা দিতে সাহস পায়? পরীক্ষা দিলাম না বলিয়া যে পড়াও ছাড়িয়া দিলাম, তাহা নয়। আমার বাবা ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত; সেক্সপীয়রের নাটকের উৎকৃষ্ট স্থানগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ; আমি বাবার কাছে ইংরাজীসাহিত্য পড়িতে লাগিলাম।

এই সময় আমি দাদা ও বউদিদি মাতালের মত আমোদে প্রমোদে মাতিয়া উঠিয়াছিলাম। ঘরে একটুকু পড়া ভিন্ন আর কোন কাজ ছিল না। গান, বাজনা, হাসি গল্প, নভেল পড়া, খুব জাঁকালো পোষাক পরিয়া ইভ্‌নিং-পার্টি ও থিয়েটারে যাওয়াই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সহসা আমার ছোট ভাই সতীশ মারা গেল। বাবা সকলের চেয়ে সতীশকেই বেশি ভালবাসিতেন। সতীশের শোকে তিনি যখন শয্যাশায়ী, তখন তাঁহার শৈশবকালের বন্ধু হরিতারণ বাবু আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারক; জীবনটা পঞ্জাবেই কাটাইয়াছেন; অল্প দিন মাত্র কলিকাতা সহরে আসিয়াছেন। কিন্তু জানি না এই মার্কিনের ধুতি-পরা, চটি পায়, ঢিলে জামা গায় ও দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী লোকটির কি এক ইন্দ্রজাল জানা ছিল; বাবার যে গর্ব্বিত মস্তক হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের নিকটও সকল সময় নত হয় নাই, আজ সেই মস্তক তাঁহার নিকট নত হইল। প্রচারক মহাশয় ধর্ম্মের কথা কহিয়া বাবাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বাবার উপর মায়া-কুহক বিস্তার করিলেন। এই সময় হইতেই আমাদের পারিবারিক স্নেহ-প্রীতির বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল ও আমাদের গৃহে দারুণ অশান্তি প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রচারকেরা ধর্ম্মের কি গোঁড়া! তাঁহারা সকল জিনিসের মধ্যে অধর্ম্মের বীভৎস মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়া, সেই মূর্ত্তির ভয়ে মূর্চ্ছা যায়! বাবা যে ওকালতি কর্ম্ম করিয়া মাসে চার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন, প্রচারক তাহার মধ্যে অধর্ম্মের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। বাবা তাঁহারই কুমন্ত্রণায় পড়িয়া হাইকোর্টে যাওয়া বন্ধ করিলেন। তাঁহার আইনের কেতাব ও ল-রিপোর্ট বৈঠকখানায় কীটের উদরস্থ হইতে লাগিল; মক্কেলদের আসা-যাওয়া রহিত হইল; তিনি গীতা, ভাগবত ও চৈতন্য-চরিত পড়িয়া এবং প্রচারকের সঙ্গে ধ্যান-ধারণা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন।

এতটা করিয়াও প্রচারক মহাশয়ের আশা মিটিল না। তিনি আমাদের পারিবারিক আমোদ প্রমোদ বন্ধ করিয়া, তাহার জায়গায় ধর্ম্মের একটা শুষ্ক কঠোর মূর্ত্তি খাড়া করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সকল অপ্রয়োজনীয় মুরব্বিয়ানা কে সহ্য করিবে? দাদা ভয়েতে বাবাকে কিছু বলিতে পারিলেন না; কিন্তু মাকে কহিলেন—"তোমরা কি চাও একটা বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ভবঘুরে লোকের জন্য আমরা ঘর ছেড়ে চলে যাব?"

মা। সে কি কথা?

দাদা। একজন বাইরের লোক ধর্ম্মের মুখস পরে লম্ফ ঝম্প করে আমাদের পরিবারের সীমার মধ্যে এসে পা বাড়াবে, আর তার দশ আঙ্গুলের বড় বড় নখগুলি আমাদের কোমল স্নেহের সম্পর্কের মধ্যে বসাতে চাইবে, তা আমরা কেমন করে সহ্য করব?

মা। কথার ছিরি দেখ! তোর বাবা যাঁকে ভক্তি কচ্ছেন, তাঁর সম্বন্ধে কি ঐ রকম তাচ্ছল্য করে কথা কওয়া ভাল?

দাদা। বাবাকে ত ভূতের মত পেয়ে বসেছে; নইলে কি তিনি ঐ লোকটির কথায় ওকালতি ছেড়ে দিতেন? প্রচারকের কুহকে পড়ে বাবার আর মাথার ঠিক নেই। আমি শরীরের জন্য একটু একটু মদ খাচ্ছি, বাবা তা এতদিন ধরে দেখে আসছেন, কিছু বলেন নাই; আর আজ ঐ প্রচারকের কুমন্ত্রণায় মদ ছাড়াবার জন্য আমার উপর জুলুম আরম্ভ করেছেন।

মা। তুই যে মদ খেতে আরম্ভ করেছিস, আমার কাছে তা বলতে তোর লজ্জা হল না? ঐ কু-অভ্যাসের জন্য বউ যে কত দুঃখ করে, তা কি তুই জানিস?

দাদা। সে ডাক্তারী বই পড়ে নাই বলে দুঃখ করে। বেশি করে মদ খাওয়া নিশ্চয়ই খারাপ। কিন্তু যাদের একটু ঠাণ্ডা লাগলেই মাথা কন্ কন্ করে, গা ব্যথা করে,

তাদের পক্ষে খুব কম করে একটু একটু মদ খাওয়াই ভাল। তাতে অষুদের কাজ করে।

আমি হাসিয়া উঠিলাম এবং কহিলাম—"আচ্ছা দাদা, তোমার কোন্ ডাক্তারী কেতাবে এমন কথা লেখা আছে, আমায় খুলে দেখাও। তুমি তার উল্টা কথা দেখ্‌তে চাও ত আমি একজন ফরাসী ডাক্তারের বই খুলে দেখাতে পারি।"

দাদা। আচ্ছা নয় মানলাম, একটু মদ খাওয়াই অন্যায়। কিন্তু এত দিন ধরে থিয়েটারে যাচ্ছি, কোন দিন ত কোন দুর্নীতির ভূতে আমাদের পায় নি, বাবাও কিছু বলেন নি; আজ ঐ গোঁড়ার জন্য থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ হয় কেন?

মা। বন্ধ হয় তোমাদের স্বভাবের দোষে। রবিবার সন্ধ্যাকালে বাড়ীতে উপাসনা হবে, তোমরা তাতে কেউ থাক্‌বে না। পাঁচটা বাজলেই পুরুষ-মেয়ে ঝি-বউ সকলে পোষাক করে থিয়েটার দেখতে বেরুবে। শুধু কি তাই? আমি এখন বুঝতে পেরেছি, সেখানে খারাপ মেয়েগুলো নাচ গান করে, ভদ্রলোকের না যাওয়াই ভাল।

দাদা। উপাসনা মান্‌লে ত উপাসনায় থাকব? আচ্ছা নয় ধর, ঈশ্বর বলে কেউ আছেন; কিন্তু তিনি হ্যান্, তিনি ত্যান্ এই রকম করে ঘণ্টাখানেক না বক্‌লেই চলবে না? তিনি কি ধনীদের মত খোসা-মোদ-প্রিয়? আমরা চাটুকারের মত গুটিকয়েক প্রশংসার কথা বল্লেই তিনি খুসী হবেন, আর ঐ খোঁড়া প্রচারকের মত ধর্ম্মের ছালা আমাদের পিঠে বেঁধে দিবেন? লেখাপড়া শিখেও এ সব কথা কি করে বিশ্বাস করব? ঈশ্বর থাকেন ত তিনি তাঁর কাজ নিয়ে থাকুন, আমরা আমাদের কাজ করে যাই।

মা। তুই কথায় কথায় সেই প্রচারক ভদ্রলোকটিকে গালি দিস কেন? তাঁর দোষ কি? আমরা শোকের আগুনে জলে পুড়ে মারা যাচ্ছিলাম, তিনি এসে সান্ত্বনা দিয়েছেন; এই কি তাঁর অপরাধ? তিনি তোদের ভালবাসেন, মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন; তাই ভালোর জন্যই তোর বাবাকে সুপরামর্শ দিচ্ছেন; তোরা উল্টা বুঝিস কেন? তাঁর কি কিছু স্বার্থ আছে?

দাদা। আমাদের কি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গো! এমন বান্ধব আর একটি খুঁজে পাওয়া ভার! তুমি বলছ কোন স্বার্থ নেই? একটু সবুর কর, স্বার্থ যে কি তা বিলক্ষণ টের পাবে। লোকটি যে অত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, শেষে বুঝতে পারবে ওসব ভণ্ডামি; আসল কথা, চাকরী বাকরী করে না, খেতে পায় না; বাবার মাথায় হাত বুলায়ে কিছু পকেটে পুরবে; তার পরই সরে পড়বে।

আমি বলিলাম—"মাগো তাই না কি!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাবা বুদ্ধিমান। তিনি দাদার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। বুঝি বা মা'র কাছেও কিছু কিছু শুনিলেন। তাই একদিন দাদাকে ডাকাইয়া কহিলেন—

"তুমি কি আমার সঙ্গে এক বাড়িতে একত্র বাস করতে চাও?"

দাদা। সে কথা কেন জিজ্ঞেস কচ্ছেন?

বাবা। কেন জিজ্ঞেস কচ্ছি তা স্পষ্ট করেই বলি। আমি যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করি, যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে শান্তি পেয়েছি; আমার সন্তানদের জোর করে সে ধর্ম্মের মধ্যে আন্‌তে চাই নে; তারা তাদের বিশ্বাস অনু-সারে চলুক; আমি কেন তাদের স্বাধীনতায় হাত দেব? কিন্তু তারা উচ্ছৃঙ্খল হবে না, আমার ধর্ম্মের প্রতি ও ধর্ম্মগুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করবে না;—আমি কি এতটুকু আশা করতে পারি নে?

দাদা অধোবদনে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাবা পুনর্ব্বার কহিলেন—"তোমার সঙ্গে আর বেশি কথা বলার সময় নেই। তুমি সংযত ও সাবধান হয়ে চল্‌তে চেষ্টা কর। যদি তা না পার, তবে তোমার এ গৃহ ত্যাগ করা-ভিন্ন আর কি উপায় আছে? তা হলে আমার সম্পত্তির উপর দাবি-দাওয়া করাও বোধ হয় ভাল কাজ বলে মনে কর্‌তে পারবে না।

বাবা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু আমিও যে তাঁহার ধর্ম্মের ও ধর্ম্মপ্রচারকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, তাহা তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। এজন্য বাবা আমাকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া কহিলেন—

"তুমি সংস্কৃত ভাষাটি উত্তমরূপে শিক্ষা কর, ইহাই আমার ইচ্ছা। এজন্য প্রচারক মহাশয়কে তোমার শিক্ষক নিযুক্ত করেছি। তাঁর সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি অসাধারণ।"

কি বিপদ! যে অঙ্কশাস্ত্রের নামে ভয় পাই, যদি যমরাজার অনুচর স্বয়ং চিত্রগুপ্ত আমার প্রাইবেট টিউটার হইয়া সেই অঙ্কশাস্ত্রই আমাকে শিক্ষা দিতে চাহেন, আমি তাহা শিখিতেও রাজি আছি; তবু এই শুষ্ক প্রকৃতির কাটখোট্টা ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট সংস্কৃত শিখিতে প্রস্তুত নই। কিন্তু বাবার কাছে যে মনের কথা খুলিয়া বলিব এমন সাহস নাই। সাহস করিয়া বলিলেও বাবা ক্ষুব্ধ হইবেন। কাজেই নিরুপায় হইয়া প্রচারক মহাশয়ের নিকটই সংস্কৃত পড়িতে স্বীকৃতা হইলাম।

অতঃপর একদিন পড়িবার ঘরে একখানি চেয়ারে বসিয়া শারদীয় আকাশের অনুপম শোভা দর্শন করিতেছি; উদ্যানের প্রস্ফুটিত শেফালিকা ফুলের সুগন্ধ আমার অন্তরে একটি মোহের সঞ্চার করিতেছে, মধুর বায়ুহিল্লোলে চিত্তে কেমন একটি সুখস্বপ্ন জাগিয়া উঠিতেছে; এমন সময় আমার গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীরাকৃতি প্রচারক মহাশয় প্রবেশ করিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম মাথা নোয়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিব না; শুধু ভদ্রতার অনুরোধে দূর হইতে একটি নমস্কার করিব; যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাকে প্রণাম করা কপটতা মাত্র। কিন্তু প্রচারক মহাশয় যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যেন এক অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন,

"মা, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি; তুমি জ্ঞান লাভ কর; ধর্ম্মে তোমার মতি হো'ক।"

মা! ইটি নূতন কথা বটে। এই ত আমার বাইশ বৎসর বয়স, আমাকে ত এমন স্নেহভরা মধুরকণ্ঠে কেহই মা বলিয়া সম্বোধন করেন নাই! আমার হৃদয়ের তার কেমন এক নূতন সুরে বাজিয়া উঠিল।

ইহার পর প্রচারক মহাশয়ের স্নেহের মধুর স্পর্শ আমার নারীপ্রকৃতির কোমল পুষ্পদলের উপর গিয়া লাগিল; পুলকে হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল; আমি প্রসন্ন মনে তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিখিতে লাগিলাম।

আমি আগে মনে করিতাম, প্রচারক মহাশয় শুধু একটু সংস্কৃতই জানেন; উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক থাকিলে তিনি কি ধর্ম্মের অত গোঁড়া হইতে পারিতেন? আর এখন দেখিতেছি, তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার পাণ্ডিত্যের তুলনায় দাদার জ্ঞান কতটুকু?

তবু আমি তাঁহার জ্ঞানের চেয়ে হৃদয়মাধুর্য্যেই অধিক আকৃষ্ট হইয়াছি। কঠোর প্রস্তরের ভিতর যেমন নির্ম্মল উৎসবারি লুক্কায়িত থাকে, তেমনি ইঁহার বৈরাগ্যপ্রবণ প্রকৃতির অন্তরালে স্নেহ এবং করুণার অমৃত উৎস লুক্কায়িত আছে। তাঁহার স্নেহের সুধা-ধারায় স্নাত হইয়া, শিশির ধৌত পুষ্পদলের মত আজ আমার জীবনকে পবিত্র মনে করিতেছি।

আমার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া দাদা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন—"নারীপ্রকৃতি এই রকমই বটে! কয়েক মাস আগে তুমিই না আমার সঙ্গে বসে প্রচারকের হাব-নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ কর্‌তে? আর আজ তোমার মুখে তাঁর প্রশংসা ধরে না!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রচারক মহাশয়কে এখন জেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকি। তিনি আমাকে আপনার কন্যার মতই ভালবাসেন। তাঁহার বয়স এই ষাট বৎসর। সংসারে কেহই নাই। আমার ইচ্ছা তাঁহার মনের মত হই। কিন্তু কিছুতেই তাহা হইতে পারি না;—ধর্ম্মের দিকে আমার মনই যায় না; আমি শুধু আমোদ প্রমোদ করিয়াই সুখ পাই।

জেঠা মহাশয় আমাকে কতই ধর্ম্মোপদেশ দেন। বলেন—

"স্বর্ণাভরণে নারীর দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মের রত্নরাজিতে নারীর হৃদয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠে। পাদপের কোমল শাখায়ই কুসুম বিকশিত হয়; তেমনি রমণীর সুকুমার অন্তঃকরণেই ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সরসীর স্বচ্ছনীরেই চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে রমণীয় শোভা ধারণ করে; সেইরূপ নারীর নির্ম্মল মনে

ঈশ্বরের প্রেমজ্যোতি প্রকাশিত হলেই, সে দৃশ্য অতি সুন্দর হয়। মা, তোমার পবিত্র মুখখানি যেমন প্রস্ফুটিত মনোহর শতদলের মত সুন্দর, তেমনি তোমার জীবন ভক্তি ও করুণায় সুন্দর হয়ে উঠুক।"

আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিলাম—"আমার যাতে ধর্ম্মের দিকে মন যায়, সেজন্য আপনি কত চেষ্টা কচ্ছেন, কিন্তু আমার মন শুধু সুখই চায়; সুখের জন্য আমি সব কর্‌তে পারি।"

জেঠা। সুখ ত সকলেই চায়। আমি কি সুখ চাই নে? কিন্তু প্রকৃত সুখ কোথায়? ধর্ম্ম ভিন্ন আর ত কিছুতে প্রকৃত সুখ দেখতে পাই নে। তা হলে শোন, আমার জীবনের কথা বলি। একদিন আমি সুখের লালসায় গৃহ ছেড়ে পথে বের হয়েছিলাম। সুখ মায়ামৃগের মত চোখের সাম্‌নেই নৃত্য করে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু রামচন্দ্র যেমন সীতাও হারালেন, হরিণও ধরতে পাল্লেন না; তেমনি আমি আমার দেবভাবও হারালাম, সুখও আমাকে ধরা-ছোঁয়া দিল না। এই সময় অকস্মাৎ বিধাতার কৃপা দিব্যরশ্মি হয়ে আমার কাছে প্রকাশিত হল; আমি নূতন দৃষ্টি লাভ করে সুখের নূতন মূর্ত্তি দেখতে পেলাম। বুঝলাম মানুষের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্যই সকলে সুখ সুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যাঁর জ্ঞান অনন্ত, প্রেম অনন্ত, সৌন্দর্য্য অনন্ত—সেই সত্য সুন্দর পুরুষের প্রেম ভিন্ন মানুষ সংসারের কোন্ ক্ষুদ্র বস্তু সম্ভোগ করে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? কবি বলেছেন—

"হয় ত ঘুচিবে দুঃখ-নিশা,
এক প্রেমে তৃপ্ত হবে
জগতের সর্ব্ব-প্রেম তৃষা।"

ঠিক কথা! আমি এই সত্যই উপলব্ধি করে ঈশ্বর দর্শনের জন্য সাধন আরম্ভ কর্‌লাম। আমার প্রভু আমাকে দর্শন দিলেন; তাঁর অনুপম রূপমাধুরীতে হৃদয় মুগ্ধ কল্লেন; তাঁর সুমধুর প্রেমে আমার সুখের বাসনা চরিতার্থ হল।"

এইরূপ ধর্ম্মের কথা বলিতে বলিতে জেঠা মহাশয় আত্মহারা হইলেন; তাঁহার অন্তরে ভক্তিরস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, অশ্রুজলে গণ্ডদ্বয় সিক্ত হইয়া গেল। আমার মনে হইল, আমি মর্ত্ত্যের মানবী হইয়াও এক দেবপুরুষের সম্মুখে অবস্থান করিতেছি।

কিন্তু হায়, কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আমার স্নেহময় পিতা সংসারের মায়া ত্যাগ করিলেন। শোকের অন্ধকারে আমাদের সমস্ত গৃহ আচ্ছন্ন হইল, আমাদের সকলের হৃদয় হইতেই সুখশান্তি অপগৃহিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাবার মৃত্যুর পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। জেঠা মহাশয়ের মধুর ধর্ম্মোপদেশে আমরা এক রকম শান্ত হইয়াছি। আমার মা ধর্ম্মের দিকে বড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তিনি জেঠা মহাশয়ের নিকট প্রকাশ্যভাবে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে দাদার আর ক্রোধের সীমা নাই। কিন্তু তিনি সুচতুর; তাই মনের ভাব গোপন রাখিয়া মাকে ও আমাকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তা, মাকে হাত করা বড় সহজ নয়। তবে আমাকে হাত করিতে পারিবেন। আমি দাদাকে বড় ভালবাসি।

আমার দুর্ব্বলতা যে কোন্ জায়গায়, সে কথা দাদার বেশ ভাল করিয়াই জানা ছিল। তিনি বুঝিতেন, আমি সুন্দর মানুষ বড় ভালবাসি; আমি লোকের ভালবাসা পাইলে আর কিছুই চাহি না; কেহ ভালবাসিয়া মিষ্টি কথা বলিলে আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়।

দাদা এই কথা বুঝিতেন বলিয়াই আমার বিবাহের জন্য একটি পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন। অবশ্য পাত্রটি তাঁহারই মনের মত হওয়া চাই;—যেন চোরে চোরে মাসতাতো ভাই হইয়া দাঁড়াইতে পারে। নতুবা আমাকে হাত করিবার সুবিধা হইবে কেন?

ইহার পর একটি ঘটনা ঘটিল। ছি ছি, তাহা লিখিতে বড় লজ্জা হয়। ভারি ত আমার রূপ! এই রূপ দেখিয়া একজন শিক্ষিত যুবক মুগ্ধ হইবেন কেন?

যুবকের নাম শৈলেন্দ্রনাথ। তিনি কলিকাতার বনেদি ঘরের ছেলে। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত গমন করিয়াছিলেন।

সেখানে কি শিখিয়াছেন, তাহা জানি না; আমি কিছুই জানি না; শুধু বউদিদির মুখে কয়েকটি কথা শুনিয়াছি মাত্র। এ বিষয়ে বউদিদির সঙ্গে দাদার যে সব কথা হইয়াছিল, তাহা সময়কালে শুনিতে পাই নাই। অনেক দিন পরে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা এই :—

একদিন দাদা বউদিদিকে কহিলেন—"হেম খুব সুন্দরী; স্বর্ণ চাঁপার মত গায়ের রং, গোলাপ ফুলের মত মুখ, তুলিতে আঁকা ছুটি ভুরু;—কেমন, তাই না?"

বউদি। মাগো! দিনেদুপুরে বোনের নামে কবিতা! কি হয়েছে বল দেখি?

দাদা। সেই যে হেমকে একদিন ইভনীং পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিলুম—মনে নেই? সে দিন শৈলেন্দ্রনাথ তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

বউদি। সত্যি না গল্প?

দাদা। আর দুষ্টুমি করো না; আমি বুঝি বোনের নামে গল্প বানাচ্ছি?

বউদি। শৈলেন্দ্রনাথ কে?

দাদা। ধনীর ঘরের ছেলে। বেশ লেখাপড়া জানে। আমি আগেই তাকে জানতুম; তবে ভাল করে আলাপ ছিল না। আজ খুব আলাপ করে এসেছি।

বউদিদি। ছেলেটি দেখতে কেমন?

দাদা। সে আর কি বলব? আমাদের দুজনায় দেখাশুনা হবার আগে তুমি যদি তাকে দেখতে, তা হলে তোমাকে লাভ করবার সৌভাগ্য আর আমার হত না।

বউদি। যাও; তুমি যে কি ছাই বল আমার একটুকু ভাল লাগে না।

দাদা। সত্যি বলছি, এমন সুপুরুষ খুব কমই দেখা যায়।

বউদি। ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কেমন?

দাদা। স্বভাব-চরিত্র? ডিটেকটিব হ'য়ে সে বিষয়ে কোন গুপ্ত অনুসন্ধান আবশ্যক মনে করি নাই। তবে সে একজন সুশিক্ষিত যুবক, ভাবুকতায় তার প্রতিভা বিকৃত হয় নাই! সে যে ধর্মের প্যাগড়ি মাথায় বেঁধে নীতির লাঠি হাতে নিয়ে স্থানে অ-স্থানে সোর-গোল করে বেড়ায় না, তা আমি জানি।

বউদি। কথার রকমটা একবার দেখ!

দাদা মায়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মা জেঠা মহাশয়ের অনুমতি চাহিলেন। তিনি কহিলেন—

"এই রকম ছেলের সঙ্গে হেমের বিয়ে? তা ত কিছুতেই হতে পারে না। আমি শৈলেনের বাপকে বেশ চিনি। তিনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি। সিবিলিয়ান হবার জন্য ছেলেকে বিলাত পাঠিয়েছিলেন। শৈলেনের প্রতিভা আছে। সে মনোযোগ দিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই সিবিলিয়ান হতে পারত। কিন্তু তা পড়ল কই? এক মেমকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠল। বাপও তেম্নি চালাক; খবরটি পাওয়ামাত্র পীড়ার মিথ্যা সংবাদ রচনা করে ছেলেকে টেলিগ্রাম কল্লেন। মৃত্যুকালে পাছে-বা বাপের লোহার সিন্দুকটি হস্তান্তর হয়, সেই ভয়ে শৈলেন্দ্র তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে এল। তার বাবা দ্বিতীয় বার আর তাকে বিলাত পাঠাতে সম্মত হন নাই।

মা। শুধু মেমকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল? বিলাতে আর ত কোন গোলমাল করে নাই?

জেঠা। সে কথা আর বলতে চাই নে। আপনি আপনার ছেলেকে একটু সন্ধান করতে বলুন। তা হলে সবই জানতে পারবেন।

জেঠা মহাশয় এ সব কথা আমাকে কিছুই বলিলেন না; তিনি এবং আমার মা বিবাহ সম্বন্ধে একটি কথাও আমাকে জানিতে দিলেন না। দাদা ত সব কথাই গোপন রাখিয়াছেন। ইহার ফল যা হইল, তাহা সকলই আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

মায়াপুরী।

ভ্রমণবৃত্তান্ত ও তীর্থদর্শন।

বিগত ২রা আষাঢ় (১৩১৭ শাল) মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ করিয়া ১২ টার ট্রেণে বারাণসী হইতে যাত্রা করিলাম। ঝম্‌ঝম্ শব্দে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। গাড়ীতে কিছুমাত্র ভিড় নাই। এখনও হিন্দুস্থানী সাধারণ লোকে বাঙ্গালী বাবুদিগকে একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে, তাহারা দূরে বসিল। আমি এবং সেণ্ট্রাল্ হিন্দু কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীর একটি বাঙ্গালী ছাত্র উভয়ে নানা বিষয়ে গল্প করিতে করিতে চলিলাম। গোমতী-সেতু পার হইলেই রেলপথের উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বেলফুলের ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাহার পর, আমরা আদি কবি বাল্মীকির কবিত্ববিকাশিনী তমসা নদীর সেতু প্রাপ্ত হইলাম। তমসা স্বল্পায়তনা স্রোতস্বতী,—আঁকিয়া বাঁকিয়া পশ্চিমাভিমুখে (কান্যকুব্জের দিকে) চলিয়াছেন। অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় লক্ষৌ নগরে উপনীত হইলাম। ষ্টেসনে লোকে লোকারণ্য। নবাবী সহর, নানাবিধ বিলাস-দ্রব্য ফল ফুল মিষ্টান্নে প্লাটফরম্ পরিপূর্ণ। পয়সা পয়সা বেল ফুলের মালা। ফুলগুলি গজমুক্তার ন্যায় বৃহৎ ও উজ্জ্বল। এত ফুলের মালা বিক্রীত হইতেছে যে, ষ্টেসন সৌরভে ভরপুর হইয়াছে। আট দশটা সুমিষ্ট আম পয়সায়, কিন্তু এখানকার সুপ্রসিদ্ধ সবেত আমের জোড়া চারি পয়সা। উত্তম খরবুজা এক সেরের মূল্য এক পয়সা। তখনও বৃষ্টি হইতেছিল, কিছু ফল ক্রয় করিয়া ট্রেন্ হইতে অবতরণ করিলাম। এখান হইতে বাঙ্গালী ছাত্রটি বিনীতভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সিক্‌রোলে একটী বাঙ্গালী ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ব্রহ্মচারী পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু পুত্রের প্রতি ব্যবহার একান্ত মর্ম্মভেদ। পুত্রটির বয়স অনুমান দশ বৎসর, সুন্দর এবং নধরদেহ; তেমন ক্লেশসহিষ্ণু বলিয়া মনে হইল না। পরিধানে ক্ষুদ্র কৌপীন, সূত্রনির্ম্মিত পৈতার সহিত কঠোর কুশনির্ম্মিত ত্রিদণ্ডি বিশিষ্ট যজ্ঞোপবীত। একখানি ক্ষুদ্র গৈরিক বসন দ্বারা মৃগচর্ম্ম আঁটিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। নগ্নপদ এবং মস্তকে প্রযত্নসম্ভূত জটাভার। হাতে দণ্ড এবং কমণ্ডলু। এ বেশ যে কিছু ক্লেশকর তাহা নহে, উপনয়নের সময় সকলকেই এরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হয়। কিন্তু এই বাদলার দিনে পথে চলার পক্ষে ঐরূপ বেশ নিতান্ত অনুপযুক্ত। সিক্‌রোল ষ্টেসনে বসিয়া থাকার সময় বালকটিকে দুই একটি পাণিনীয় সূত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা বেশ বলিয়াছিল এবং দুই একটি ঋক্‌বেদের সূক্তও বেশ আবৃত্তি করিয়াছিল। সেই অবধিই বালকটি যেন আমার প্রতি একটু অনুরক্ত হইয়াছিল। তাড়াতাড়িতে এক গাড়ীতে উঠা ঘটে নাই। বালকটি আমাকে দেখিয়াই নিকটে আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন;—"মহাশয়! আমি কিজন্য ইহাকে ব্রহ্মচারী করিয়াছি এবং হরিদ্বারেই বা কেন যাওয়া তাহার উদ্দেশ্য শুনুন।" শেষে তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার মর্ম্ম এই বুঝিলাম যে এই বালক-ব্রহ্মচারীটিকে তিনি সংস্কৃত কাব্য বর্ণিত--"মহর্ষি" প্রস্তুত করিবেন। কাশীতে থাকিলে বালকটির প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্য হরিদ্বারে কোন বিজন স্থানে রাখিবার জন্য যাইতেছেন। যাহা হউক, বালকটির মুখ শুষ্ক এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং শীতে কাতর দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম;—

"রাস্তায় ইহাকে কিছু খাইতে দিয়াছিলেন?"

"কি করিয়া দিব, একবারের অধিক ত কিছু খাইতে পারে না।"

"ফল কিংবা জলে দোষ কি?"

"গাড়ীতে কেমন করিয়া আহার করিবে?"

"কেন, কোন ষ্টেসনে নামিয়া আহার করিতে পারিত?"

"তাহাতে ত স্নান করা আবশ্যক?"

"মুখ হাত পা ধুইয়া গা মুছিয়া ফেলিলেই চলিত?"

* আমার একটি ছাত্রের কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে ভারতবর্ষের কয়েকটি পণ্ডিত-বহুল স্থানে যাইতে হইয়াছিল, এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি তাহারই অন্তর্গত। প্রবন্ধান্তরে সেই কার্য্যটির বিষয় প্রকাশিত হইল।

"আমি সেরূপ ইচ্ছা করি না।"

"এখন কিছু আহার করিতে দিন্।"

"না কা'ল হরিদ্বারে গিয়া একেবারে যাহা হয় আহার করিবে।"

শেষে বহু তর্কবিতর্কের পর ভট্টাচার্য্য একটু নরম হইলেন এবং যৎকিঞ্চিৎ ফল ও একটু কলের জল বালককে দিলেন। আমিও সন্ধ্যা শেষ করিয়া কিছু মিষ্টান্ন ও ফল আহার করিয়া লইলাম।

লক্ষ্ণৌতে পৌঁছার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে হরিদ্বারে যাইবার গাড়ী আসিল। গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড়, পূর্ব্বেই আমি বিছানা ও জিনিসপত্র সহ একটি বেঞ্চি অধিকার করিয়াছিলাম, বালকটি তাহার একাংশে শয়ন করিল। পরদিন প্রত্যূষে যখন বাঁশবেরেলীতে পৌঁছিলাম, তখন বিলক্ষণ জোরে জল হইতে ছিল। প্রায় আটটার সময় রামপুর ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ষ্টেসন হইতে এক ক্রোশ দূরে সহর। ডানদিকে সহরে যাইবার প্রশস্ত রাজপথে বিলক্ষণ জনতা। সুসজ্জিত একটি হস্তীর পশ্চাতে কতকগুলি উষ্ট্র আসিতেছে। ষ্টেসনের বামভাগে অট্টালিকাশোভিত একটি পুষ্পোদ্যান প্রস্ফুটিত গোলাপ ও বেলফুলে সুশোভিত এবং দক্ষিণদিকে বহুদূর ব্যাপী আম্রকানন পীত লোহিত ও হরিদ্বর্ণ আমের ভারে শাখা-প্রশাখাগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এই উর্ব্বর প্রদেশটি দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত। রামপুর সহরে এক নবাব বাস করেন তিনিই এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। রামপুর ষ্টেসনে বিবিধ বিলাসদ্রব্য বিক্রীত হয়। এখানকার পশমী চাদর অতি প্রসিদ্ধ। ষ্টেসন হইতে গাড়ী ছাড়িলেই রেলপথের উভয় পার্শ্বে কেবল শস্যশ্যামল ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। প্রায় নয়টার সময় রামগঙ্গার সেতু অতিক্রম করিয়া ষ্টেসনে গাড়ী থামিল। ঐ দিন দশহরা, রামগঙ্গার উভয় তীর স্নানার্থিনী হিন্দুমহিলাদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তাঁহাদের নীল, পীত, লোহিত নানারঙের পরিচ্ছদে আজ নদীসৈকতের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। মেলা বসিয়াছে, অসংখ্য কন্দ মূল ফল ও মিষ্টান্নের দোকান সারি সারি দেখা যাইতেছে। এদিকে ব্রহ্মচারী বালকটি বেঞ্চের সঙ্গে নেতাইয়া পড়িয়া আছে। তাহার পিতা এক একবার টানিয়া তুলিয়া বসাইতেছেন, সে বসিতে পারিতেছে না, মাথা ঘুরিতেছে বলিয়া শুইয়া পড়িতেছে। কুশের উপবীতে শরীর ক্ষতবিক্ষত, দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে, অস্ফুটস্বরে জল খাব জল খাব বলিতেছে। আমি ভট্টাচার্য্যকে বলিলাম—"আপনি এখানে নামিয়া বালকটির হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া দিন, এখানে আজ সমস্ত দ্রব্যই পাইবেন। দীর্ঘ পথের টিকিট সুতরাং আপনি দুই দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন। তাহা না করুন, আজ বিকালবেলার ট্রেণে হরিদ্বারে যাইবেন।" তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমার পরামর্শে কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না।

কিছুক্ষণ পরেই মুরাদাবাদ জংসনে গাড়ী পৌঁছিল। এখান হইতে একটি রেলপথ লাহোরের দিকে ও অপরটি হরিদ্বারের দিকে গিয়াছে। এইখানে কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার লোক আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তখনি হরিদ্বারে টেলিগ্রাম করিয়া দিল। বুন্দকী ষ্টেসনের পর দক্ষিণভাগে পাথরগড়ে বহু হিন্দু-কীর্ত্তি—পরিত্যক্ত মঠ মন্দির অট্টালিকা ও প্রাচীর দেখিতে পাওয়া গেল। তাহার পর, নাজিমাবাদ জংসন প্রাপ্ত হইলাম। এই ষ্টেসন হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে একটি শাখারেলপথ গড়বাল রাজ্যের কুমায়ুন পর্য্যন্ত গিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস বর্ত্তমান কুমায়ুন জেলাই নল রাজার শাসিত প্রাচীন নিষধরাজ্য। ঐ রাজ্যে অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলে দেবপ্রয়াগ নামক একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। দেবপ্রয়াগের যাত্রীরা এখানে নামিয়া অপর গাড়ীতে উঠিল। চন্দাক ষ্টেসন অতিক্রম করিলেই মনে হইতে লাগিল আমরা ক্রমশঃ উচ্চভূমিতে উঠিতেছি। বালাবলী ষ্টেসনের পরই বাণগঙ্গা। বাণগঙ্গারও উভয় তীরে দশহরা মেলা বসিয়াছে। দুইটা বাজিয়া গেলে আমরা লুকসার জংসনে উপস্থিত হইলাম। কি ভীষণ জনতা! চতুর্দ্দিকে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কেবল জনসমুদ্র। পাণ্ডাদের কি সুন্দর বন্দোবস্ত! মহাজনতায় অসংখ্য গাড়ীর মধ্যে ঠিক আমাদের গাড়ীতে কুম্ভকর্ণের লোক আসিয়া হাজির। কেবল আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কোন্ আসবাব

আপনার?" আমি উহা দেখাইয়া দিলে কতক নিজে কতক মুটের মাথায় দিয়া আমাকে নামিতে সংকেত করিল। আমি অবিলম্বে নামিয়া পড়িলাম। ট্রেণ আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া দেরাদুন অভিমুখে ছুটিল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছেলেটিকে অতিকষ্টে নামাইলেন, তখন তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি বলিলাম, "আগে উহার মুখে জল দিন্।" তিনি ছেলেটিকে লইয়া ইঁদারার দিকে গেলেন। আমি পাণ্ডার অনুসরণ করিলাম। ঐ দিবস নয়টার পর হইতেই আকাশ মেঘমুক্ত হওয়ায় রবিকিরণ ক্রমশঃই তীক্ষ্ন হইতেছিল, লুক্সারে যেন উহা অসহ্য হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের পাদদেশে ষ্টেসনের প্লাট্‌ফরম্ রৌদ্রে আগুণ হইয়া উঠিয়াছে। এ প্লাট্‌ফরম্ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আর এক প্লাট্‌ফরমে যাইতে হইবে। মাঝখানে গর্ত্তের মত নিম্নভূমি। সেইটা পার হইলে একটি প্লাট্‌ফরম্ ও ষ্টেসনঘর। সেই ষ্টেসনঘর অতিক্রম করিলে যে প্লাট্‌ফরম্, তাহাতেই হরিদ্বারের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। সেই গর্ত্তের মধ্যে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে, সকলেই আগে যাইতে চাহিতেছে কিন্তু বিষম ঠেলাঠেলিতে দুই চারিজনের অধিক উপরে উঠিতে পারিতেছে না। পাণ্ডা সে দিকে না গিয়া আমাকে লইয়া একটু ঘুরিয়া নিষিদ্ধ পথে ষ্টেসনঘরে প্রবেশ করিল এবং মুটেসহ অফিসের মধ্যদিয়া গিয়া প্লাটফরমে উপস্থিত হইল। তাহার পর, যে গাড়ী সম্মুখে পাইল সেই গাড়ীতে আমার জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া বেঞ্চীর মাঝখানে বসাইয়া দিল। গাড়ীটি হিন্দুস্থানী লোকে পূর্ণ কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। ইতিমধ্যে একটা বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী যুবা একটি নয় দশবর্ষ বয়স্কা সুন্দর ফুট্‌ফুটে বালিকা ও দুইটি অতি বড় ট্রাঙ্ক একটি পোর্টম্যাণ্ট সহ আমাদের গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। উভয় বেঞ্চীর মাঝখানে ট্রাঙ্কের উপর বালিকাটিকে বসাইয়া চিরপরিচিতের ন্যায় আমার হাতের উপর বালিকার হাত রাখিয়া উত্তেজিতস্বরে হিন্দীতে বলিলেন "ইহাকে দেখিবেন, ইহার রক্ষার ভার আপনার উপর রহিল।" বালিকা মূল্যবান্ বস্ত্রও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা পোর্টম্যাণ্ট ও ট্রাঙ্কে কি আছে তাহাও জানি না। যাহা হউক, আমি আশ্বাস দিয়া বলিলাম, "কোন ভাবনা করিবেন না, আপনি কোথায় যাইতেছেন?" যুবক বলিলেন, তিনি লক্ষৌ সহরবাসী, হরিদ্বার তীর্থে যাইতেছেন। তাঁহাদের বাটীর গৃহিণীও দুই তিনটি যুবতী তাঁহার সঙ্গে আছেন। স্ত্রীলোকের গাড়ী পূর্ণ, পুলিশ আর লোক উঠিতে দিতেছে না। যোগ চলিয়া যায়, যে কোন প্রকারে স্ত্রীলোকদের গাড়ীতে তুলিতেই হইবে। হয়ত তিনি এ গাড়ীতে নাও যাইতে পারেন।" এই কথাগুলি বলিয়া যুবক ছড়িখানি ঘুড়াইতে ঘুড়াইতে লক্ষৌ হরিদ্বান বলিয়া চীৎকার করিয়া জনসমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম বাঙ্গালীকে ইঁহারা যথার্থই শ্রদ্ধা করেন, নচেৎ এত হিন্দুস্থানী গাড়ীতে থাকিতে আমার উপর বালিকাটির রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন কেন? মিনিট দুই তিন পরেই গাড়ী ছাড়িল, আমি একটু চিন্তিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে যুবা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া গাড়ীর জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন "পরিবারদিগকে গাড়ীতে তুলিতে পারিয়াছি।"

নিবিড় অরণ্য, পর্ব্বতমালা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্রবিণী অতিক্রম করিয়া গাড়ী উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। প্রথম ষ্টেশনের নাম জোয়ালাপুর। উক্ত ষ্টেশনের অনতি দূরস্থ গ্রামটি বিলক্ষণ সমৃদ্ধ। ঐ গ্রামে বহুসংখ্যক বেণে ছাত্রি ও ব্রাহ্মণের বাস। কয়েকটি মন্দির ও অট্টালিকার অরণ্যমধ্যবর্ত্তী গ্রামটি বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। আর দুইটি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া তিনটা বিশমিনিটের সময় হরিদ্বার ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এখানেও কুম্ভকর্ণের লোক মজুত। ষ্টেসন হইতে তীর্থক্ষেত্র প্রায় এক মাইলের পথ; দেখিতে দেখিতে একাওয়ালা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল। ব্রহ্মকুণ্ডের ঠিক উপরে বাসা স্থির হইল। স্থানীয় দৃশ্যটি কি মনোহর! অনন্ত আকাশতলে হিমগিরির উপরি ভাগে বাণলিঙ্গ শিবের ন্যায় চূড়াশোভিত একটি উন্নত পর্ব্বত। উহা হইতে গঙ্গা-প্রবাহ বেগে পতিত হইয়া অতি চঞ্চল গতিতে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। গঙ্গা অপেক্ষা প্রাচীনা নদী পৃথিবীতে আর নাই। ঋগ্‌বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে গঙ্গার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিকগণ বলেন;—'গঙ্গা

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা এবং তিনি শিবের জটায় ও ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিয়া শেষে ভাগীরথের তপস্যা প্রভাবে ভারতভূমে অবতীর্ণ হন। এই কথাটি অতি সত্য, রূপক দ্বারা প্রচ্ছন্ন বলিয়া সাধারণের অবোধ্য। গঙ্গা বিষ্ণুপাদ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বেদে বিষ্ণু ও আদিত্য একই দেবতা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পাদ অর্থ কিরণ। অতএব বিষ্ণুপাদে সূর্য্যমণ্ডলে বাষ্প সঞ্চিত হইয়া মেঘে পরিণত হয়, সেই মেঘ হইতে জল হরিদ্বারের সমীপস্থ বাণলিঙ্গ শিবের আকার বিশিষ্ট হিমালয় শিখরে পতিত হয়। ঐ শিখরব্যাপী অরণ্যরাজিই জটা। সেই জটামধ্যে প্রস্রবণ রূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে অর্থাৎ ব্রহ্মকুণ্ডে পতিত হইয়া থাকেন। সেখান হইতে ভারতে আগমন করেন। বিষ্ণু পুরাণে ঐ ভাবের কয়েকটি শ্লোক আছে। যথা;—

আকাশ মণ্ডলে ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল অবস্থান করে, সেই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে মেঘ অবস্থিত। উহাই বিষ্ণুর তৃতীয় পাদ। সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই সর্ব্ব পাপ (মালিন্য) বিনাশিণী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়া থাকে (১)।"

> ধ্রুবেব সর্ব্ব জ্যোতিংষি জ্যোতিঃষন্তোমুচো দিবি।
> যে যেষু সন্ততা বৃষ্টি বৃ'ষ্টে শ্চাপোহথ পোষণম্॥
> এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকং।
> ততঃ প্রবর্ত্ততে গঙ্গা সর্ব্বপাপহরা সরিৎ॥
>
> (বিষ্ণুপুরাণ)

সংস্কৃত নানা গ্রন্থে গঙ্গার উৎপত্তি ও ভারতবর্ষে প্রবেশ সম্বন্ধে নানা উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে (১)। তৎসমুদয় অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা। যথা সময়ে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে উপনীত হইলাম। পর্ব্বত চূইতে পতিত গঙ্গার প্রধান প্রবাহ কুল্ কুল্ ধ্বনিতে সোজা কনখলের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ঐ প্রধান প্রবাহ হইতে একটি শাখা বাহির হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডের ভিতর দিয়া আবার গিয়া প্রধান প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রধান প্রবাহের তীর দিয়া গবর্ণমেণ্ট একটি পাষাণময় সুদীর্ঘ প্লাট ফরম্ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন শাখা-প্রবাহের দুই দিকে দুইটি সেতু আছে। সুতরাং ধরিতে গেলে উক্ত প্লাটফারম্‌টি ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর ভাগ হইতে কুশাবর্ত্ত তীর্থ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ব্যাপী। হরিদ্বারে যে সকল তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়, উহার চৌদ্দ আনা প্রায় রমণী। উঁহাদের অনেকই গড়বালরাজ্য পঞ্জাব ও কাশ্মীরের অধিবাসিনী। ঐ সকল রমণী পরমা সুন্দরী। গাড়োয়ালের অধিবাসীরা চম্পক-দামগৌরী, পঞ্জাবী মহিলারা অতসী পুষ্প বর্ণাভা এবং কাশ্মীর বাসিনী দের দেখিলে মনে হয় যেন দুধে আলতায় মিশাইয়া উঁহাদের গাত্রবর্ণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। একদল উঠিতেছেন, একদল নামিতেছেন, একদল সংকল্প পাঠ করিতেছেন, একদল জলে নিমজ্জিত হইতেছেন। আর বহুসংখ্যক রমণী ব্রহ্মকুণ্ডের জলে সন্তরণ করিতেছেন। তাঁহাদের দেখিয়া মনে হইতেছে যেন ব্রহ্মকুণ্ডের জলে শত শত শ্বেত পদ্ম ভাসিতেছে। হরিদ্বারের জল যথার্থ ই অমৃতোপম। দশহরার পূর্ব্বে বৃষ্টি হয়, সুতরাং গৌরিক ভূমি দিয়া পরিস্রুত হওয়ায় জলেরবর্ণ ঈষৎ লোহিতাভ হইয়াছে, তথাপি উহার মাধুর্য্য কত? যখন জলে নামিয়া সংকল্প পাঠ করিতেছিলাম, তখন মনে হইতেছিল যেন শরীরের নিম্নভাগ কেহ কাটিয়া লইতেছে, কিন্তু স্নান করিয়া কি যে শান্তি পাইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যেন দেহের সমস্ত পাপ, সমস্ত ব্যাধি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তীর্থশ্রাদ্ধ পরদিনের জন্য রাখিয়া দিয়া বাসায় ফিরিলাম। কাশী হইতে উৎকৃষ্ট আতপ, মুগের ডাল সৈন্ধব এবং তরকারী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, এখানকার ঘৃত এবং দুগ্ধের সাহচর্য্যে একরূপ দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন করা গেল।

এখানকার জলের এমনি গুণ যে আহার করার পনর মিনিট পরে আর আহার করিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। সাড়ে পাঁচটার সময় প্লাট ফরমে বেড়াইতে বাহির হইলাম। তখনও সহস্রাংশুর সুবর্ণ-কিরণ ভাগীরথীর পরপারে পর্ব্বতগাত্রে বৃক্ষ পত্রের অগ্রভাগে ঝিক্ ঝিক্

(১) বাল্মীকি-রামায়ণ বিষ্ণুপুরাণ, দেবীভাগবত, স্কন্দপুরাণ (হিমবৎখণ্ড) ভবিষ্য-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে গঙ্গার উৎপত্তি ও ভারতবর্ষে প্রবেশের বিষয় পাঠ করুন।

(২) পূর্ব্বে সরল প্রবাহটি বোধ হয় ছিলনা, ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্য দিয়াই প্রধান প্রবাহের গমনপথ ছিল।

করিয়া জ্বলিতেছিল। কিন্তু নগরের শ্রেণীবদ্ধ সমুন্নত অট্টালিকাসমূহের পার্শ্বে বলিয়া প্লাট্‌ফরমটি সম্পূর্ণ ছায়াময় এবং সুশীতল। গ্রীষ্মপ্রধান উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা জানেন কেমন করিয়া নিদাঘকালে দিনযাপন করিতে হয়। ভাগীরথী কুলুকুলুধ্বনিতে বহিয়া যাইতেছেন, একেবারে সেই জল ঘেঁসিয়া সতরঞ্চের উপর বিছানার চাদর পাতা হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত মহিলারা মণ্ডলী করিয়া তাহাতে বসিয়াছেন। এদেশের ভদ্রঘরের মেয়েরা প্রায়ই শুভ্রপরিচ্ছদ ভালবাসেন। সকলেরই পরিধানে সূক্ষ্মপেড়ে পাতলা ধূতি, গায়ে ফিন্‌ফিনে শাদা আঙ্‌রাখা এবং জরির পাড়ওয়ালা শুভ্র ওড়নায় শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ আবৃত। সুরনদীর সীকরসংসর্গী মৃদু পবন সুন্দরীদিগের গায়ের ওড়নার কিয়দংশ উড়াইয়া ধীরে ধীরে বহিতেছে। কতকাল পরে কত দূরস্থ বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, প্রাণ খুলিয়া কত সুখ দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ফেরিওয়ালারা তাঁহাদের মনোযোগ ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। তাহারা দহিবড়া (দধিতে নিমজ্জিত একপ্রকার বড়া), সাড়ে বত্রিশভাজা, চেনাচুর প্রভৃতি সহ তাঁহাদের মজ্‌লিশের পার্শ্বে আসিয়া আবেদন করিতেছে। অনেক সুন্দরীর হস্তেই দহিবড়ার জন্ম সার্থক হইতেছে। প্লাটফরমের মাঝখান দিয়া সভাসমিতি বসিয়াছে। হরিদ্বারে আসিলে দেখা যায় ভারতবর্ষে বিধবার সংখ্যা কত অধিক। কেহই পরিণতবয়স্কা নহেন। সভাসমিতির বক্তৃতায় বেশীর ভাগ ইঁহারাই যোগ দিয়া থাকেন। এক স্থানে একটি বিধবা রমণী "গো-রক্ষা কর" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। আহা, বিধবাদের আগ্রহ কত! কেহ বক্তৃতাকারিণীর কেহ কেহ বা শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের অবিশ্রান্ত বাতাস করিতেছেন। আমি একটু দাঁড়াইলাম অমনি এক বিধবারমণী দাঁড়াইয়া "আই-এ মহারাজ" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, আমি কিছুক্ষণ শুনিয়া গেলাম। আরও কয়েকটি সভা বসিয়াছে, কোথাও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কোথাও আর্য্যধর্ম্মের বক্তৃতা হইতেছে, সর্ব্বত্রই বিধবার আধিপত্য। দক্ষিণভাগে কুশাবর্ত্ততীর্থের নিকটে অল্পসংখ্যক কাশ্মীরী রমণী মজলিস্ করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ কেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহাদের পরিচ্ছদ অতীব কদর্য্য। ইঁহারা পুরুষের মত পাজামা পরেন এবং টাইট্‌ জামা গায়ে দেন। ঐরূপ পরিচ্ছদে পূর্ব্বভাগ নরাকৃতি ও নিম্নভাগ সর্পাকৃতি নাগকন্যাদের মত দেখায়। যিনি এই ডানাকাটা পরীদের ঐরূপ পরিচ্ছদের বিধান করিয়াছেন, তাঁহার মত রুচিহীন বোধ হয় জগতে দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যদি কাশ্মীরী সুন্দরীদের বাঙ্গালীর মেয়ের মত পরিচ্ছদ ও বাঙ্গলা উপন্যাসের মত ভাষা হইত, তাহা হইলেই বিধাতার নির্ম্মাণকৌশলের যথার্থ সার্থকতা হইত। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় পাণ্ডার পুত্রের সহিত বাসায় ফিরিবার সময় দেখিলাম প্লাট্‌ফরমের মধ্যে যে সকল ফাঁক ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সভাসমিতি বন্ধ হইয়াছে, ফেরিওয়ালারা প্রস্থান করিয়াছে, সব নীরব নিস্তব্ধ। আজ আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত, নীলনভোমণ্ডল হইতে সুধাংশু দেব যেন অর্দ্ধশয়ানাদের মুখের উপর জ্যোৎস্না ছড়াইয়া দিয়া তারাগণের সহিত মিট্ মিট্ করিয়া হাসিতেছেন। হরিদ্বার আজ দশমীতে জ্যোৎস্না-সাগরে অবগাহন করিয়াছে, তজ্জন্যই পর্ব্বত বন গঙ্গাজল প্লাট্‌ফরম্ অট্টালিকা সমস্তই জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্ভাসিত। সায়ংকাল হইতেই দীপদানের ঘটা আরম্ভ হইয়াছে। একটি দুটি চারটি যাহার যেরূপ শক্তি ভাগীরথীর স্রোতে দীপ ভাসাইয়া যাইতেছে। এক রাজা এবং রাণী কয়েক সহস্র দীপ ভাসাইতে হুকুম দিয়াছেন। তাঁহাদের আদিষ্ট দীপগুলির নির্ম্মাণে বেশ নৈপুণ্য আছে। দীপাধারগুলি কাগজে নির্ম্মিত সুতরাং শীঘ্র নিভিবার বা ডুবিবার সম্ভাবনা নাই। রাজার বন্ধু বান্ধব এবং প্রতিবেশীরা সেতুর পার্শ্ব হইতে পর্য্যায়ক্রমে দীপগুলি ছাড়িতেছে। আর ঐ সকল দীপ স্রোতোবেগে ভাগীরথীর মধ্যভাগে গিয়া সমসূত্রপাতে দক্ষিণাভিমুখে ছুটিতেছে। উহাতে গঙ্গাবক্ষে এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

কাল।

("হাইন" হইতে)

রাখ সখা তব অই সুকোমল কর
আমার এ বুকের উপর!
অনুভব করে দেখ এর অভ্যন্তর
কি কঠোর বাজে নিরন্তর!
প্রাণের প্রকোষ্ঠে এক সূত্রধর বসি
নিরমম কঠোর আঘাতে
ভাঙিতেছে পিঞ্জরেরে তথা দিবা নিশি,
মরণের পালঙ্ক গড়া'তে।
একান্তে বসিয়া তথা দুরন্ত ঘাতিছে
আঘাতের উপরে আঘাত,
বহুদিন হ'তে ঘুম চোখ ছেড়ে গেছে,
তাই মরি জেগে দিন রাত!
প্রিয়বন্ধু, চিনিয়াছ যদি এ হৃদয়,
শুধু এই অনুগ্রহ চাই—
পাই যেন মরণের শ্যামল শয্যায়
শীঘ্র শু'য়ে ঘুমাইতে ভাই!

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

ভুল ভাঙ্গা।

(১)

মাসিক পত্রিকার গল্পপাঠ শেষ হইলে শৈল, ঘড়ির দিকে চাহিল।

রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে, পরেশের এখনও দেখা নাই! শৈল বারান্দায় আসিয়া দেখিল—খাবার তেমনি ঢাকা রহিয়াছে, কোথায় পরেশ!

পরেশের বাড়ী ফেরা সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। তবে রাত্রি এগারটার মধ্যে সে অন্যদিন বাড়ী ফিরিতই। আজিকার এ বিলম্ব দেখিয়া শৈল উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এখানে বাড়ীর লোক ভাবিয়া সারা—ফিরিতে রাত্রি হইবে সে কথাটা বলিয়া গেলেই হইত—এখন পথে কত বিপদ হইতে পারে—শৈল অস্থির হইয়া পড়িল।

আজ পাঁচ বৎসর শৈলের বিবাহ হইয়াছে। বিবাহিত জীবনের শেষ দুই বৎসরে সে বুঝিয়াছিল—তাহাদের প্রেমের বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে—এখন আর সে অনুরাগ নাই, সে আবেগ নাই—এ যেন নিতান্তই একটা কর্ত্তব্যপালন।

বিবাহের পর কি একটা গোল বাঁধিয়া পিতামাতার সহিত তাহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। স্বামীর প্রেমে সে অভাব শৈল কোন দিন অনুভব করিতে পারে নাই—আর এখন সেই শৈল—সেই স্বামী—কিন্তু সে প্রেমোন্মাদনা কোথায়?

অবশেষে পিতার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ করিয়া পরেশ চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইল। কথাটা শৈলের ধনী পিতামাতার জানিতে বাকী রহিল না। কিন্তু তাঁহারা কিছুমাত্র টলিলেন না।

প্রত্যহই বুকভরা আশা লইয়া পরেশ চাকুরীর সন্ধানে বাহির হয় এবং গভীর রাত্রে সে ফিরে। শৈল জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "এখনও ত সুবিধা করতে পারছি না!" শৈল কহে, "এমন কাঁহাতক ঘুরবে—তার চেয়ে একটা ব্যবসা কর!"

পরেশ বলে "ব্যবসা! ব্যবসা ত করিব, কিন্তু টাকা!" শৈল উত্তর দেয়—"আমার গহনাগুলো বেচে ফেলো—সেই টাকা নিয়ে ব্যবসা কর।"

পরেশ—"সর্ব্বনাশ, গহনা বেচিব, না, না!"

শৈল জানালার ধারে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল। এক আকাশ নক্ষত্র নীরবে যেন কি একটা পরামর্শে বসিয়া গিয়াছে! তাহার মনে হইল যেন তাহারই বিরুদ্ধে চারিধারে একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলিয়াছে! তাহারই দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া বিরাট আকাশ যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময় বাড়ীর দ্বারে একটা গাড়ী আসিয়া থামিল। পরেশ। পরেশ গাড়ী হইতে নামিল—কিন্তু তার একি বেশ! পরিধানে কোট পেণ্টুলেন, মাথায় সাহেবী টুপি, হাতে ব্যাগ।

শৈলকে দেখিয়া পরেশ কহিল, "একি, তুমি এখনও জেগে আছ শৈল, এত রাত হয়েছে!"

শৈল কথা বলিতে পারিল না। কি একটা বেদনা তার বুকখানাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

পরেশ কহিল, "একটা সুখবর আছে শৈল,—এতদিন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছিলাম—আজ সাহেবের নজর পড়ায় আমার মাহিনার বন্দোবস্ত হয়েছে, আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা করে দেবে—আর একটা কাজের ভার দিয়াছে, সেটা করতে পারলে একেবারে একশ' টাকা পাব।" বলিয়া শৈলের হাতে দুখানি নোট দিয়া কহিল, "এটা আগাম খরচের জন্য পেয়েছি।"

শৈল আহ্লাদে গদগদ হইয়া কহিল, "আঃ, এত দিনে দেবতা মুখ তুলেছেন। পাঁচটা টাকা দিও, আমি আসছে পূর্ণিমাতে ঠাকুরের সিন্নি দেব।"

পরেশ বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, শৈল কহিল, "কোন্ আফিসে চাকরি হ'ল?"

"সে সব এখন বল্‌তে বারণ আছে; এমনকি আমাকে লিখে দিতে হয়েছে যে কারুর কাছে—স্ত্রীর কাছে অবধি সে কথা বলতে পারবো না।"

শৈলর মনে আঘাত লাগিল। সে আজ স্বামী হইতে এতদূর সরিয়া গিয়াছে—তাহাদের মধ্যে এতখানি ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে। সামান্য লোকের মত স্বামীর গোপন কথা শুনিবার অধিকার অবধি সে হারাইয়া বসিয়াছে। তার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, কোনমতে সে আত্মসম্বরণ করিল।

(২)

ইহার পর একদিন পুত্রের বিবাহোপলক্ষে শৈলর পিতামাতা তাহাকে লইতে আসিলেন। পরেশ আপত্তি করিল না। শৈল শিশু পুত্রটীকে কোলে লইয়া বহুদিন পরে পিতার আদর, মাতার স্নেহের মধ্যে আবার আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। হারানিধি ফিরিয়া পাইলে মানুষ যেমন অধিক আগ্রহে তার দ্বিগুণ সমাদর করে, পিত্রালয়ে আসিয়া শৈল স্নেহের সেই অমৃত ধারা আকণ্ঠ পান করিল। কিন্তু তবু মনে একটা কাঁটা ফুটিয়া আছে! সহস্র সুখ সহস্র আদরের মধ্যেও সেটা যখন খচ্ খচ্ করিয়া উঠে তখন বেদনার আর সীমা থাকে না। শৈল ভাবিল কোন দিন্ সে বুঝি এই বেদনায় নিশ্বাস রোধ হইয়াই মরিবে।

এ ক'দিন পরেশ একবারও আসে নাই; ইহা যে পূর্ব্বে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! চাকরি, কাজ,—তুচ্ছ চাকরি, তুচ্ছ কাজ—যাহাতে প্রিয় জনকে দেখিবার এমন এক মুহূর্ত্ত অবসর মিলে না!

বিবাহের পর মাতা কন্যায় সংসারের কথা হইতেছিল। পরেশের চাকরির কথা উঠিলে শৈল কহিল, "কোথায় চাকরি তা বলতে বারণ আছে; কখনো রাত আটটায় ফেরে, কখনো বারটায়। আবার দুএক রাত দেখাই নেই।" বলিতে বলিতে শৈলর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছিল।

মাতা কহিলেন, "এমন কথাও ত কখনো শুনিনি, যে চাকরের একটা বাঁধা সময় নেই রাতদিন কাজ, মোটে ছুটি নেই, তলবের ঠিক ঠিকানা নেই, আর আফিসের নাম ধাম নেই!" পরেশের চাকরিটা শৈলর কাছে একটা দুর্ব্বোধ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল।

কতদিন স্বামীর কাছে অনুযোগ করিয়াছে কিন্তু পরেশ হাসিয়া উত্তর দিত, "আমাকে বুঝি সন্দেহ হয় রাতে বাড়ী ফিরি না বলে!"

শৈল তবু ছাড়ে না, "সত্যি, কোন্ আফিসে চাকরি বল না!" পরেশ সে কথা উড়াইয়া দিয়া কহিত, "বারণ-শৈল, তা না হলে তোমাকে আর বলি না।"

শৈলর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠে—তার নারীমর্য্যাদায় আঘাত লাগে! তাহাকে একথাটী বিশ্বাস করিয়া বলা যায় না? হায় পুরুষ, এত কঠিন তুমি! হৃদয়ের বেদনা বুঝিবারো কোন সামর্থ্য নাই তোমার!

(৩)

সেদিন শনিবার শৈলকে লইয়া পরেশ 'ষ্টারে 'বিষবৃক্ষ" অভিনয় দেখিতে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর দরওয়ান আসিয়া কহিল, "এখনই যাইতে হইবে।"

পরেশ ভিতরে আসিয়া কহিল, "তাইত, শৈল, আজ

আজ আমার থিয়েটারে যাওয়া হচ্ছে না। লোক এসেছে, এখনি আফিসে যেতে হবে।"

শৈল স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তার মাথার রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

পরেশ কহিল, "তুমি বরং ওবাড়ী থেকে পণ্টুকে ডাকাও, সে তোমাকে থিয়েটারে নিয়ে যাবে—কি বল ?"

"থাক্ সে আমি যাব না।"

"কি করব বল, মনিবের চাকর, যা বলবে তা শুনতে হবে ত! আচ্ছা আসছে হপ্তায় ঠিক নিয়ে যাব।" পরেশ আর বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেল।

শৈল গিয়া জানালার ধারে বসিল। তখন রাস্তা দিয়া 'বেলফুল' হাঁকিয়া যাইতেছিল। কলিকাতা সহরের ধূলাচ্ছন্ন রাজপথে গ্যাসের আলোগুলা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এমন সময় পাশের ঘরে শিশু কাঁদিয়া উঠিল। শৈল তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া পড়িল।

শিশুকে বুকে চাপিয়া সে ভাবিল, এমন করিয়া ত আর থাকা যায় না! যেমন করিয়া পারে সে পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে। এমন অবজ্ঞা, অত অনাদর—ইহাও কি অদৃষ্টে ছিল!

রাত্রি দুইটার সময় পরেশ গৃহে ফিরিল—শিশুকে কাছে লইয়া শৈল তখন নিদ্রা যাইতেছিল। পরেশ কাহাকেও জাগাইল না।

ভোরে উঠিয়া আবার পরেশ বাহির হইয়া গেল। শৈলর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সমস্তদিন সে আর গৃহে ফিরিল না, শৈলও কিছু আহার করিল না।

সন্ধ্যার সময় বাঙ্গালা খবরের কাগজ লইয়া সে কোন মতে মন স্থির করিবার উদ্যোগ করিল। কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ একটা সংবাদ তার চোখে পড়িল। "লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড। এই সহরের বুকের উপর এক অমানুষিক কাণ্ড ঘটিয়াছে। শুক্রবার রাত্রি প্রায় বারোটার সময় চিৎপুরে অলকা নাম্নী এক গণিকাকে কে হত্যা করিয়াছে। সে রাত্রি গৃহে তাহার দাসদাসীরা কেহই ছিল না। তাহার গহনা প্রভৃতি কোন জিনিস চুরি যায় নাই। কেবল কণ্ঠহারের ধুকধুকিটী পাওয়া যাইতেছে না। তাহাতে তাহার নাম খোদা ছিল। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে। হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য কমিশনার সাহেব পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।" এমন সময় পরেশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "শৈল, রাগ করেছ তুমি? কিন্তু কি করি বল, আমার কোন হাত নেই। যখন চাকর হয়েছি তখন মনিবের কথা মান্‌তেই হবে, না হলে উন্নতির আশা থাকে না। সে দিন থিয়েটারে না গিয়ে ভালই করেছি; 'বিষবৃক্ষ' ত আরও দুএকবার দেখেছ, আগামী শনিবার নূতন বই আছে—খুব সম্ভব ছুটী পাব। সেদিন নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

শৈল কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পারিল না; কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল।

পরেশ কহিল, "আজ খেয়ে দেয়ে একটু পরে আবার আমাকে বাহির হইতে হইবে! হয়ত রাত্রিতে ফিরিব না। যদি না ফিরি ত ভেবোনা।" শৈল কোন কথা বলিল না। স্বামীর সৃষ্টিছাড়া চাকরির উপর ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইতেছিল। সে স্বামীর প্রতি একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তার মনে সন্দেহের রেখা গভীরতর হইয়া উঠিল। কি এ কাজ! কি এ আচরণ!

শৈল উঠিয়া আহারাদির বন্দোবস্তের জন্য নীচে নামিয়া পাচিকাকে সমস্ত বুঝাইয়া আবার উপরে আসিল।

উপরে আসিয়া দেখে পরেশ ঘরে নাই! কোথায় গেল!

পরেশের টেবিলের ড্রয়ারে চাবি লাগানো ছিল। ড্রয়ারের আঙটা ধরিয়া সে টানিল। মনে কেমন একটা তার কৌতূহল জাগিয়াছিল।

ড্রয়ার টানিতেই সম্মুখে সে দেখে একটা সোনার ধুক্‌ধুকি! তাহাতে নাম লেখা রহিয়াছে; 'অলকা'; তখনি সংবাদপত্রের সেই হত্যাকাণ্ডের কথা তার মনে পড়িয়া গেল! নিমেষে একটা বীভৎস ঘটনা তার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ড্রয়ার ঠেলিয়া পাশের ঘরে যাইয়া সে শুইয়া পড়িল! তার মাথা ঘুরিতেছিল!

বরোদা-রাজনন্দিনী কুমারী ইন্দিরা দেবী

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

চিত্ত স্থির করিয়া, সে ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া স্বামীকে এখন সে রক্ষা করে! এ কলঙ্ক, এ লাঞ্ছনা কি দিয়া সে ঢাকা দেয়! সহস্রমুখে যখন এই কথা ধ্বনিত হইয়া উঠিবে তখন কি সে লজ্জা! কি সে অপমান!

শৈল ভাবিল, সব কথা স্বামীকে সে স্পষ্ট করিয়াই বলিবে! সে সব কথা জানিয়াছে—আজ স্বামীর সমস্ত গুপ্তরহস্য তাহার চক্ষে ধরা পড়িয়াছে। ঘৃণা-লজ্জা সব ত্যাগ করিয়া এখন এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে ত!

পরেশ আসিয়া কহিল, "শৈল, এখনি আমাকে একটা দরকারী কাজে বাহিরে যেতে হচ্ছে। ফিরব কিনা জানি না। পরেশ সিঁড়িতে আসিয়া আবার ফিরিল। শৈলকে কহিল, "দেখ হয়ত দুচারিদিনের জন্য আমার কোন খবরও না পেতে পার। ফিরিতেও না পারি। কিন্তু ভেবোনা কিছু। যদি আমি কোন লোক পাঠাই ত তার হাতে আমার ব্যাগটা দিও, আর কিছু খাবারও সঙ্গে দিও, বোধ হয় বিদেশে যেতে হবে, ঠিক বলতে পারছি না এখন!" পরেশ বাহির হইয়া গেল। বিদায়ের সময় খোকাকেও সে একবার কোলে লইল না। খোকার প্রতিও তার এত অবহেলা। বিছানায় পড়িয়া শৈল কাঁদিতে লাগিল।

কি করিবে, কি উপায়ে সে স্বামীকে বাঁচাইবে! শেষে সে স্থির করিল, পিত্রালয়ে যাইবে, পিতামাতার নিকট কাঁদিয়া সব কথা বলিবে। ঝিকে ডাকিয়া তখনই সে অদূরে পিসীর বাড়ী পত্র দিল, যেন যামিনী দাদা কালই তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসে। সব ঠিক-ঠাক, কেবল যামিনী দাদা আসিলেই হয়।

পরেশের ব্যাগ লইতে লোক আসিল। শৈলের অধীরতা আরো বাড়িল।

(৪)

পরদিন বৈকালে যামিনী আসিলে শৈল ঝি ও বিশ্বস্ত ভৃত্য রামলালের নিকট চাবি দিয়া আপনার গহনা-পত্র ও খোকাকে লইয়া ষ্টেশনে যাত্রা করিল। তার পিত্রালয় নৈহাটীতে।

শৈলকে গাড়ীতে রাখিয়া যামিনী টিকিট কিনিতে গেল। রাস্তাদিয়া যাত্রীর দল ট্রেণের জন্য দ্রুত চলিয়াছে—খড়খড়ির ফাঁকদিয়া শৈল তাহা দেখিতেছিল। এমন সময় সে সহসা শুনিল, কাগজওয়ালা—হাঁকিতেছে, "আজকার কাগজ বাবু—চিৎপুরের খুনী গ্রেপ্তার!" শৈল চমকিয়া উঠিল। একখানা কাগজ সে তখনি কিনিয়া ফেলিল। কম্পিতহৃদয়ে অধীর বেদনায় কাগজ খুলিয়া সে দেখে, বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"খুনী গ্রেপ্তার।"

"বিচক্ষণ ডিটেক্টিভ শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ঘোষ আজ সকালে মোগলসরাই ষ্টেশনে রামকুমার দে নামক এক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এই যুবক চিৎপুরের অলকা বেওয়াকে হত্যা করিয়া সন্ন্যাসীবেশে পলাইতেছিল।"

* * * *

যামিনী আসিয়া ডাকিল, "শৈল নেমে এসো, আর দেরি নাই—"

শৈলর চমক ভাঙ্গিলে সে কহিল, "আমার শরীরটা কেমন খারাপ বোধ হচ্ছে দাদা, নৈহাটী গিয়া কাজ নেই আর, বাড়ী ফিরে চল!"

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

বরদা-রাজনন্দিনী ইন্দিরা দেবী।

সময়ের একটি শুভ লক্ষণ এই দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ও এখন বাণী-আরাধনার প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশের রাজামহারাজাদিগের মধ্যে সুশিক্ষিত লোক প্রায় দেখা যাইত না, কিন্তু এখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে বাধ্য হইয়াই রাজকুমারদিগকে অন্ততঃ নামতঃ কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিতে হয়। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতই বিদ্যানুরাগী হইয়া পড়েন। ভারতবর্ষের করদ ও মিত্র রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও অর্জ্জন করিয়াছেন। অধিকতর সুখের বিষয় এই যে, এই বিদ্যানুরাগ এখন এই সকল রাজান্তঃপুরেও প্রবেশ করিতেছে। বরদার রাজকুমারী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তঃ-

পুরিকাগণের সম্মুখে অতি সুন্দর আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে রাজকুমারীর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে প্রকাশ করিলাম।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী ইন্দিরা জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়স হইতেই ইনি মাতৃভাষা মহারাষ্ট্রী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১০।১১ বৎসর বয়সেই মহারাষ্ট্রী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং তৎসঙ্গে ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। বরদার রাজপ্রাসাদে রাজকুমার ও কুমারীদের জন্য যে বিদ্যালয় আছে সেখানে পড়িয়া তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেন।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশের রাজান্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে মহিলাগণ যেমন সুশিক্ষা লাভ করিতেন, নৃত্যগীত, চিত্র, শিল্প প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহারা তেমনি দক্ষতা লাভ করিতেন। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় প্রণালীর মধ্যে যাহা গ্রহণীয় আছে তাহা গ্রহণ করিয়া সুশিক্ষিত বরদারাজ ও তাঁহার সুশিক্ষিতা মহিষী রাজকুমারীকে অতি সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি শুধু সাহিত্যে ও কলাবিদ্যায়ই জ্ঞান লাভ করেন নাই, অশ্বারোহণ, বন্দুক পরিচালন, ইত্যাদিতেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

রাজকুমারী এই অল্প বয়সেই পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান স্থান সকলই দেখিয়াছেন এবং এই বয়সেই পিতামাতার সঙ্গে দুইবার ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। এবং সম্প্রতি তৃতীয় বার ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া এখন পিতামাতার সঙ্গে আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ড গমন করেন তখন ইংলণ্ডের ইষ্টবোরণ বালিকা-বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রীরূপে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করেন। সেই সময়ে তিনি ইংলণ্ডে ভদ্রপরিবারের বালিকাদিগের সহিত মিশিয়া ইংলণ্ডের পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

রাজকুমারী যে সুন্দর মানসিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহার প্রভাব তাঁহার চরিত্রেও অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারীজনোচিত কোমলতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রে, বিশেষ দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ব্যবহার অতি সরল ও অমায়িক, তাহাতে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। রাজকুমারী হইয়াও তিনি সাধারণ বালকবালিকাদিগের সহিত মিশেন এবং তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়! অনাথ দুঃখীর প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান এই কুমারী-রত্নকে সুপথে রক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবিনী করুন ও ভারতনারীর কল্যাণ সাধনে ব্যবহৃত করুন, এই প্রার্থনা।

মুসলমান ধর্ম্ম।

ডাক্তার ব্যাজার নামক একজন নিগ্রোলেখক ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের কণ্টেম্পোরেরী রিভিউয়ে লিখিয়াছিলেন—

“আলেক্‌জাণ্ডার রস নামক একজন ইংরাজ কর্ত্তৃক কোরাণ, ফরাসী হইতে ইংরাজি ভাষায় প্রথম ভাষান্তরিত হয়। তিনি ভূমিকাতেই পাঠককে সম্বোধন করিয়া লিখিতেছেন :—সদাশয় পাঠক, এক সহস্র বৎসর পরে এই মহা প্রতারক আরব, ফ্রান্সের মধ্য দিয়া এক্ষণে ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহার কৃত ভ্রমের খিচুড়ি আলকোরাণ (যাহা বিকৃত পিতার উপযুক্ত বিকৃত সন্তান ও তাহারই দগ্ধ মস্তকের ক্ষতগুলির ন্যায় ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বাক্যরাশিতে পরিপূর্ণ) ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে।” ডাক্তার বলেন “আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভাষারীতি দুইশত বৎসরের শিক্ষায় যদিও অনেক শিষ্টতা লাভ করিয়াছে এবং পূর্ব্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানেরও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি বহু ইংরাজের মনে এখনো যে কোরাণ ও তাহার রচয়িতার সম্বন্ধে মোটামুটি উপরিউদ্ধৃত বর্ণনার অনুরূপ ধারণাই রহিয়া গিয়াছে তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ইংরেজের এ সম্বন্ধে যে ধারণা তাহা এইরূপ :—

কোরাণের ধর্ম্মমত শুদ্ধ একেশ্বরবাদ, তাহার বিধান-গুলি একেবারে চূড়ান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়, ইহার প্রবর্ত্তক নিজ ধর্ম্মমতের বহির্ব্বর্ত্তী সম্প্রদায় সমূহকে নিঃশেষে ধ্বংস করিবার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা বিশেষ ভাবে আদিষ্ট হইয়াছেন এইরূপ বার্ত্তার ঘোষণাকর্ত্তা—ইহার নরক পার্থিব অগ্নির দ্বারা জ্বালাময় ও ইহার স্বর্গ ইন্দ্রিয়সুখভোগের উপকরণে পরিপূর্ণ। এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ, এই মতটী যিনি স্বীকার করেন ও ইহার জন্য যিনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব দেশ ও আপন প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হন তিনিই আদর্শ মুসলমান। তিনি যেমনই অজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়াসক্ত হউন না কেন, তথাপি তিনি বিশ্বাসীর সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভের যোগ্য। যে মনুষ্যত্বের সমস্ত সত্য হইতে ভ্রষ্ট অথচ কেবল এই সাম্প্রদায়িক মত ও পদ্ধতিতে যে বিশ্বাস রাখে তাহার জন্য স্বর্গলোকে হুরীগণ অপেক্ষা করিয়া থাকে।

মেজর অস্‌বর্ণ তাঁহার ইস্‌লাম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"অদৃষ্টবাদই মুসলমান ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ। ঈশ্বর যে একটী নির্ব্বিচল অদৃষ্টের মত ইহাই কোরাণের মূলগত ধারণা। মুসলমানের হৃদয়ে ও বুদ্ধিতে এই মতটাকেই অক্ষয় ভাবে দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই মতেরই শোষণকর প্রভাবে বিশ্বনিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আস্থা মানুষের চিত্তে মূল বিস্তার করিতে ও ফল ফলাইতে পারে নাই।

অথচ মেজর অস্‌বর্ণ ইহার কিছু পরেই এক জায়গায় বলিয়াছেন, "মুসলমান ধর্ম্ম যে পাঁচটী স্তম্ভের উপর স্থাপিত প্রার্থনা তাহার মধ্যে একটী।" নির্ব্বিচল অদৃষ্টের মত কোন একটী অপরিবর্ত্তনীয় ও অনমনীয় বস্তুর উদ্দেশে প্রার্থনার ব্যবস্থা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এবং কোরাণের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির সঙ্গেই বা অস্‌বর্ণের উক্তির কিরূপে সঙ্গতি হয়?

১। "পাপ করিয়া যে কেহ ঈশ্বরের দিকে ফিরিবে ও আপনাকে সংশোধন করিবে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাহার দিকে ফিরিবেন, কারণ ঈশ্বর ক্ষমাবান ও দয়াময়।"

২। "তোমাদের প্রভু একটি দয়ার বিধানে নিজকে বদ্ধ করিয়াছেন অতএব তোমাদের মধ্যে যদি কেহ অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করে এবং পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় ও আপনাকে সংশোধন করে তবে তিনি (ঈশ্বর) তাহার প্রতি নিশ্চয়ই কৃপাবান হইবেন।"

৩। "পরে তিনি তাহাদের দিকে ফিরিলেন; যাহাতে তাহারা তাঁহার দিকে ফিরিতে পারে, কারণ তিনিই ঈশ্বর যিনি ফেরেন, যিনি দয়াময়।"

৪। "ইহা কি তাহারা জানে না যে যখন তাঁহার (ঈশ্বরের) সেবকগণ অনুতাপের সহিত তাঁহার (ঈশ্বরের) দিকে ফিরে ঈশ্বর তখন তাহা গ্রহণ করেন।"

৫। "ঈশ্বর তাহার দিকে ফিরিয়াছিলেন, কারণ তিনি ফিরিতে ভালবাসেন, তিনি দয়াময়।"

৬। "যাহারা আমার দিকে ফিরে, আপনাকে সংশোধন করে এবং সত্যকে প্রচার করে আমিও তাহাদের দিকে ফিরি, কারণ আমিই তিনি যিনি ফেরেন, যিনি দয়াময়।"

কোরাণ অদৃষ্টবাদ প্রচার করে,এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এইরূপ আরো অসংখ্য শ্লোক কোরাণ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কোরাণ ঠিক ইহার বিপরীত শিক্ষাই দিয়া থাকে।

মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে মেজর অস্‌বর্ণের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"মদিনায় পৌঁছিতেই, যিনি ছিলেন ধর্ম্মগুরু তিনি হইলেন অত্যাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রনৈতিক—এবং কাবার পুত্তল-মূর্ত্তিগুলি লব্ধ-বিজয় সেনানায়কের আদেশে ধূলিসাৎ হইয়া গেল,তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-সংস্কারকের মানস-শক্তির প্রভাবে রূপান্তরিত হইল না। বৈষয়িক আধিপত্য লাভের চেষ্টায় তিনি গুপ্তাঘাতের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তিনি নরহত্যায় কুণ্ঠিত ছিলেন না, তিনি বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত আদেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভকালে তাঁহার যে আধ্যাত্মিক নম্রতা ছিল তাঁহার পার্থিব প্রতাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে আপনাকে তিনি প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সমান করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

উল্লিখিত রচনার মধ্যে শেষ কয়েকটী বাক্য যারপর নাই বিস্ময়কর, কারণ ইহা নিতান্ত অল্পবিশ্বাসী মুসলমানের নিকটেও নিদারুণ পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। প্রমাণ স্বরূপে আমরা মহম্মদের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। মহম্মদ বলেন :—

"আমি একজন মানুষ অপেক্ষা বেশী কিছু নই; তোমাদিগকে যখন আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন আদেশ করি তোমরা তাহা গ্রহণ করিও, আর যখন আমি সাংসারিক সম্বন্ধে তোমাদিগকে আদেশ করি তখন আমি মানুষ ছাড়া আর কোন কিছুই নহি।"

"জিহাদ" সম্বন্ধে মেজর অস্‌বর্ণ নিম্নোক্ত রূপ ব্যাখ্যা করেন।

"যাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিহিংসা বহন করিয়া লইয়া যাওয়াই মুসলমানের বিশেষ কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। যে পর্য্যন্ত ইহারা কর না দিবে সে পর্য্যন্ত ইহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে, তাহার পরে তাহারা যেমন করিয়া খুসী নরকের দিকে অগ্রসর হইতে থাক্, কাহারো বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। মহম্মদ যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই নিষেধ করিয়াছেন তখন অবশ্যই অন্যত্র তাহাদের যুদ্ধ-পিপাসা মিটাইবার আদেশ দিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে অধিকার লাভের অনুজ্ঞা ইহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মের এই জিনিষটা অসভ্য বর্ব্বর জাতির মনকে খুব বশ করিয়াছে। এই ধর্ম্ম তাহাদের নিকট হইতে উচ্চতর জীবনের উদ্দেশ্যে কোন সাধনার দাবী করে না। তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াই তাহারা স্বর্গে ইন্দ্রিয়-ভোগসুখের আনন্দকে চিরন্তন করিয়া তুলিতে পারে, তাহাদের ধর্ম্ম তাহাদিগকে এই আশা দিয়াছে। মুসলমান আপনাদিগকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে নির্ব্বাচিত বলিয়া জানে, এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাহারা অকথ্য ঘৃণার সহিত নরকাগ্নির ইন্ধন বলিয়াই গণ্য করে। যেখানে তাহাদের ক্ষমতা আছে সেই খানেই বিধর্ম্মীগণকে পদদলিত করা ও হত্যা করাই তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ত্তব্য, এই তাহাদের বিশ্বাস। বিধর্ম্মীগণের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের আদেশ কোরাণের নবম সুরায় লিখিত।"

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোরাণের নবম সুরায় এরূপ অনুশাসন নাই। যে সকল আরব একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করে অথচ মূর্ত্তিপূজাও পরিত্যাগ করে নাই, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন, এই সুরায় তাহারই উল্লেখ আছে। মেজর অস্‌বর্ণ তাঁহার পুস্তকের আরম্ভেই আবার এইরূপ লিখিয়াছেন—"যে ঈশ্বরের কথা মহম্মদ বলিয়াছেন তিনি অজ্ঞাত ঈশ্বর নহেন;— এই ঈশ্বরকে যখন তাঁহার জাত-ভাই সকলেই জানে তখন পুত্তল পূজা করিলে তাহাদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না।"

খ্রীষ্টান বা য়িহুদিদের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আদেশ কোরাণের কোন স্থানে লিখিত হয় নাই বরং এমন অসংখ্য বাক্য আছে যাহাতে তাহাদের প্রতি জ্ঞানীজনোচিত ঔদার্য্য প্রকাশের উপদেশ আছে। এই বিষয়ে কোরাণের কতকগুলি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

১। "বাইবেলের মানুষদের সহিত তোমরা মিলিত হইও, বিরোধ করিও না, কেবল যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদের সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা, তোমরা বলিও যে যাহা আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং যাহা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে উভয়ই আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর একই।"

২। "ঈশ্বর তোমাদেরও প্রভু আমাদেরও প্রভু, তোমাদের কাজ তোমরা কর, আমাদের কাজ আমরা করি; আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাদ যেন না ঘটে। ঈশ্বর আমাদের সকলকে এক করিবেন, এবং আমরা সকলেই তাঁহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।"

৩। "বাইবেলের মানুষদিগের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং তিনি তাহাদের কাছে যাহা প্রেরণ করিয়াছেন ও আমাদের কাছে যাহা প্রেরণ করিয়াছেন ঈশ্বরের নিকট নত হইয়া তৎপ্রতি তাহারা শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।"

মুসলমান ধর্ম্মের মূল উপদেশ গুলির মধ্যে খৃষ্টানদের প্রতি শত্রুতার কথা কোথাও নাই। যেমন খৃষ্টানদের

মধ্যে গোঁড়া এবং ধর্ম্মান্ধ আছে মুসলমানদের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়, কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে উদার সহিষ্ণুতারই পরিচয় পাই। সাধারণতঃ মুসলমানেরা খৃষ্টানদিগকে অবিশ্বাসী বলিয়া সম্ভাষণ করে এই যে প্রবাদ খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা একবারে অমূলক। কি কোরাণ, কি শিক্ষিত মুসলমান কদাচ খৃষ্টানদের প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করে না।

"মহম্মদ এবং মুসলমান ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে আমরা নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করি ঃ—

মুসলমান শাসনকর্ত্তারা কোথায় কবে কি অন্যায় করিয়াছে তাহা সন্ধান করিয়া দেওয়া ইংরাজের মত শ্রেষ্ঠতাভিমানী জাতির পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক—অথচ খৃষ্টান ইতিহাস হইতে ঠিক তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট উদ্ধৃত করা যাইতে পারে একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। কিন্তু মুসলমানদের দ্বারা যে সকল বীরোচিত ও লোকহিতকর কার্য্য সাধিত হইয়াছে এবং সাহিত্য বিজ্ঞানে তাহারা যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহারই আলোচনা নিঃসন্দেহ জ্ঞানী ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রীতিকর ও তাঁহার পাঠকদের পক্ষে মঙ্গলজনক।

শ্রীহেমলতা দেবী

ঋষির সাধনা। *

মহা সে তাপস গ্রামের মাঝারে
ফিলেমন্ তাঁর নাম,
বিধির অসীম সুদূর সাধনা
লাভ করিবারে চান।
সংসার হতে রহি দূরে দূরে
ধ্যানে থাকি নিরবধি,
সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা তাঁহার
সব রহস্য ভেদি।
এক দিন যত দীন নরনারী
কেঁদে পড়ি' তাঁর পায়ে
শীর্ণ শরীর জীর্ণ বসন
শুধু সাহায্য চাহে!
ফিলেমন্ রাগি' কহিলা ভীষণ
উদ্ধত রোষ-ভরে
"দিবি না কি তোরা সাধনা সাধিতে?
ফিরে চলে যারে ঘরে।
ভীষণ পাতক দুরন্ত সব
না লভি কাহারও সঙ্গ
এই নির্জ্জনে আমার এ ধ্যান
এসেছে করিতে ভঙ্গ!"
ফিরে গেল সেই সব নরনারী
অতি ক্ষুধার্ত্ত চিত্ত
আজিকে তাদের কেহ নাহি হায়!
দিতে তাহাদের বিত্ত!
ফিলেমন্ ঋষি ভীষণ কোপেতে
না দেখি' উপায় অন্য
প্রবেশিল এক বনের মাঝারে
ঘুচাতে আপন দৈন্য!
না পশে সেথায় সূর্য্যের কর
নাহি কোনো কিছু শব্দ
বসিল সেথায় ঋষি ফিলেমন্
ধ্যানাসনে নিঃস্তব্ধ!
রচিল ক্ষুদ্র কুটীর একটি
ভাঙ্গি বৃক্ষের শাখা—
সিদ্ধির লাগি চক্ষু মুদিয়া
ধ্যান করে ঋষি একা!

* * *

সেদিন মধুর প্রভাত হয়েছে
জেগেছে ভীষণ বন,
ধ্যানেতে মগ্ন রয়েছেন তবু
মহাঋষি ফিলেমন্।
একটি বিহগ, বিচিত্র রঙ্গে
অঙ্কিত তার পাখা,
গান করেছিল কোমলকণ্ঠে
আহা! যেন সুধামাখা!

---

* ইংরাজি হইতে অনূদিত। লেখক।

গানের তানে বাল্যের স্মৃতি
জাগে মানবের মনে—
সুখ-দিন গুলি স্বরের সনে
ভেসে আসে নিজ প্রাণে।
দ্বিজ গান শুনে উঠি' সাধু রাগি
দেখে কুটীরের দ্বারে
একটি বিহগ গাহে সঙ্গীত,
—তাঁর মন নিল হ'রে!
ভাবিল সাধক—'এ কোন পাতক,
আমার ধ্যানের প'রে
ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছে হেথা,
দ্রুত ছুটি' গিয়া ঘরে—
টানিয়া আনিল বৃহৎ দণ্ড
করিতে পাখীর হানি;
আঘাতে মিলাল মৃত্যুর মাঝে
একটি ক্ষুদ্র প্রাণী!
একি! ঝলসিল কুটীরের দ্বার
কোন্ মহাঋষি বরণে
আসিলেন একি!—করুণার রাজা
একটি পাখীর মরণে।
নির্ব্বাক এবে ফিলেমন্ সাধু;
কহিলেন্ তাঁরে বিধি—
"রে পামর! তোর সাধনার লাগি
হরিলি একটি নিধি।
সে সরল প্রাণ সহজ ভাবেতে
গান গেয়েছিল হেথা—
ডুবায়ে তোমার প্রার্থনা বাণী
ধ্বনেছিল মোর সেথা!
তোর প্রার্থনা হতে এ'যে ছিল
সহস্র গুণে ভালো,
এই গানে এই গহন বনেতে
এসেছিল মোর আলো!
আমার সাধনা নহেক কখন
অরণ্য মাঝে বসি',
নির্ব্বোধ ওরে, মহামূঢ় নর!
যেথা শত-লোক হাসি,
উচ্ছ্বসি' উঠে সরল করেছে
সকল-মানব-প্রাণ,
ধ্বনিত সেথায় সকল সময়
মম মঙ্গল-গান।
সেথা-ই আমার আসন বিরাজে
নহেক তামস বনে,
আমাকে দেখিবি সবার মাঝারে
প্রেমে গানে প্রাণে মনে।
থাক্ এইখানে শতাব্দী ধরি'
এই দিনু আমি শাপ,
সাধনা তোর ত হয় নি সত্য
করেছিস শুধু পাপ!"
এতেক বলিয়া চলি গেল ধীরে
বিধাতা স্বরগ-রাজ্যে,
ফিলেমন্ ঋষি থাকিল সেথায়
রত আপনার কার্য্যে!
এখনো দেখিবে একটি বৃদ্ধ
লম্বা তাহার কেশ
ভীষণ বেশেতে বনেতে নিবসি'
জীবন করিছে শেষ!

* * * *

হে প্রিয় তোমার মঙ্গল কাজ
যে করিছে নিশিদিন,
প্রার্থনা তার করেছ পূর্ণ
নাহি তার প্রাণ ক্ষীণ।
তোমার কার্য্য যে লয়েছে হাতে
সে যে উপাসনা তব
ভরি' দাও তুমি প্রেমে ও গন্ধে
আনন্দে নব নব।
এই জগতেতে এই লোকালয়ে
তোমারি কার্য্য আছে—
যে জন ঠেলিয়া যায় চলি' তাহা,
সে তোমায় নাহি যাচে।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

বড়লাটের নবনির্ব্বাচিত আইন-সদস্য
শ্রীযুক্ত সৈয়দ আলি ইমাম।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

৬ষ্ঠ ভাগ।	অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।	৮ম সংখ্যা।

অভিশপ্তা ইভ্।

(পশ্চিমের অভিযোগ)।

বিধাতার সৃষ্টির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা ধূর্ত্ত পুরুষ জাতীয় সর্প যখন মনুষ্য জাতির আদিম জননীকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তখন বিধাতা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার দুঃখ বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিব।" বলা বাহুল্য যে, এই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। সৃষ্টির এই প্রাচীন কাহিনীর বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া নারীর জীবনে দুঃখ এত বর্দ্ধিত ও বিরাম বিহীন হইয়াছে যে তাহা ভাবিতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটা মনের কাছে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। একটি ধূর্ত্ত প্রাণীর দ্বারা প্রতারিত ও তাহার বলিষ্ঠ সঙ্গীটির দুর্ব্বল ইচ্ছার দ্বারা প্ররোচিত ইভ্ এবং তাহার জাতীয় প্রত্যেকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে—এ অতি বৃহৎ নিষ্ঠুর অবিচার ও সম্পূর্ণ অত্যাচার-প্রণোদিত। কিন্তু তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত ইহাই ইভের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। "আমি তোমার দুঃখ বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিব!" দুর্ভাগিনী ইভ্! দুঃখ তাহার উপর এমন বর্ব্বর ভাবে, বর্দ্ধিত ভাবে পুঞ্জীকৃত করা হইয়াছে যে আজ পর্য্যন্তও ইহুদীদিগের একটি আচারে পুরুষেরা মেয়েদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকে পৃথক্ ভাবে উচ্চারণ করে, "এই বিশ্বের রাজা প্রভু পরমেশ্বর তুমি ধন্য, যেহেতু তুমি আমাদিগকে রমণী করিয়া সৃষ্টি কর নাই।" তাহাদের অর্চ্চনার গৃহে তাহাদের জননী-জাতিকে এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক অপমান করিতে তাহারা একটুও কুণ্ঠিত হয় না। যদি আমরা ঐতিহাসিক প্রমাণ গ্রহণ করি, তবে দেখিতে পাই, প্রাচীনতম কাল হইতে ইহুদীরা নারীকে তাহাদের অশ্ব এবং কুকুর অপেক্ষাও হীন জন্তুর মত ব্যবহার করিয়াছে। ভারবাহী পশুর মত তাহাকে দিয়া

তাহারা দ্রব্য বহন করাইয়াছে, (মেয়েরা কচিৎ আপনাদের প্রতিভাকে জানিতে পারিয়া তাহাকে যোগ্যরূপে প্রযুক্ত করিয়াছে)। মাঠে ক্ষেত্র কর্ষণের সময় তাহাদিগকে বলীবর্দ্দের সঙ্গে একত্রে নিযুক্ত করিয়াছে, পণ্যদ্রব্যের মত তাহাকে বিক্রয় করিয়াছে এবং বন্ধুবর্গের সহিত আদান প্রদান করিয়াছে, নিজেদের অযোগ্য বহু জঘন্য ভাবে তাহাদের ব্যবহার করিয়াছে—এবং তাহাও শুধু সাময়িক খেয়ালের পরিতৃপ্তি ছাড়া বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই, ভাঙ্গা খেল্‌নার মত তাহার পর সে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই দূরে নিক্ষেপ কি ভাবে হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা যায় না, কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়াছে নতুবা গৃহবিতাড়িত হইয়া অনাহার ও ক্লান্তিতে পথের ধারে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে। বাইবেলে বর্ণিত ইহুদীরা নারীর দুঃখ কিছুমাত্র যে বোধ করিতেন, এমন মনে হয় না। "ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র বলিয়া তাঁহারা উক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নারী—যাহারা এই নির্ব্বাচিত জাতির জননী—তাহারা—তাহাদের বীরোচিত কোমলভাব অথবা বিবেচনার উপরে কোনো দাবী আনয়ন করিতে পারে নাই!

কালের দীর্ঘ তরুবীথির দূর-দৃশ্যের ভিতর দিয়া প্রাচীন কাহিনী-কথিত ইডেনের দিকে ফিরিয়া চাহিলে—যে সময় ইভ্ ধূর্ত্ত শয়তানের প্রলোভন-বাক্যে মোহিত হইয়াছিল—সেই সময় হইতে সে ভীরু অ্যাডামের নিকট হইতে যে অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিয়াছে তাহার উল্লেখ একটি ভয়াবহ অমানুষিকতার সূচীরূপে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন বাইবেলের কাহিনী অনুসারে পুরুষ তাহার স্বেচ্ছাচারিতার পূর্ণ অধিকারই গ্রহণ করিয়াছে! "বিধাতা নারীকে বলিয়াছেন (পুরুষ তাহার নিজের সুবিধার জন্য যে এই গল্পের আবিষ্কার করিয়াছে—যদিও সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই), "পুরুষের আকাঙ্ক্ষাই তোমার আকাঙ্ক্ষা হইবে ও সে তোমার উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিবে!" পুরুষ সে বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে, উন্নত ও অনুন্নত সমস্ত জাতির ভিতরেই সে নারীকে লৌহ-দণ্ডের দ্বারা শাসন করিয়াছে!, খ্রীষ্টধর্ম্ম এই অত্যাচারের রাজত্বের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহা নিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কারণ খ্রীষ্টের জন্মের সঙ্গে রমণীত্বের এক অভিনব আদর্শ ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল। নারী তাহার সমস্ত গৌরবের ভিতর দিয়া কিরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং ভবিষ্যৎকালে সে কি অর্জ্জন করিতে পারে—গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে তাহার একটা অস্পষ্ট ধারণা দেখা যায়, কারণ জীবনের সমস্ত মহত্তম ভাব গুলি—যেমন—সত্য, সৌন্দর্য্য, বিচার, ভাগ্য, খ্যাতি, জ্ঞান—তাহাদের ভাস্করদিগের দ্বারা মহিমাময়ী নারীমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা একটি বিস্ময়কর সত্য যে, সভ্যতার সেই উষাবেলায় জগতে সাহিত্য এবং আর্ট যখন প্রথম উন্মেষিত হইতেছিল, এবং পুরুষ আপনার অহং জ্ঞানের চারিদিকে যখন নিখিল সৃষ্টি-রচনাকে সমবেত করিয়া সাজাইতেছিল—তখন—দয়া, বিচার ও জ্ঞানের মূর্ত্তিকে আপনার দ্বারা প্রকাশিত করিতে সে কুণ্ঠায় থামিয়া দাঁড়াইয়াছিল! প্রত্যক্ষতঃই, সে আপনাকে নৈতিক ধর্ম্মের প্রতিভূরূপে জগতের সম্মুখে প্রস্তর মূর্ত্তিতেও উপস্থিত করিবার অযোগ্যতা মনে মনে স্বীকার করিয়াছিল। সেই পৌত্তলিকতার দিনে—নারীরূপে গঠিত মানুষের সমস্ত মহৎ গুণাবলীর নিকট জানু পাতিয়া পুরুষ আপনার একটি শোভন মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তাহার পূজামন্দিরে নারীর সৌন্দর্য্যময় মুখমণ্ডল ও মাধুর্য্যললাম তনু তাহাকে অভিবাদন করিয়াছে, ভিনাস্ ও ডায়েনা রূপে তাহাকে প্রসন্ন হাস্যে প্রীত করিয়াছে, সৌভাগ্য ও সুযোগের দেবী রূপে তাহার আশীর্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়াছে, যুদ্ধযাত্রার সময় অথবা বিজয়ী হইয়া ফিরিবার সময় যশ ও জয়ের মূর্ত্তিতে তাহাকে আশীষ দান করিয়াছে—এই সমস্তই—নারীর নিষ্ঠুর ও দীর্ঘ পরীক্ষার দিবসান্তে, তাহার উন্নততর ভবিষ্যৎ ও শুভ সম্ভাবনার এবং তাহার কথঞ্চিৎ শাপমোচনের অস্ফুট আকার ও ছায়া মাত্র! তাহার সেই শুভ দিন যে নিকটবর্ত্তী, তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে, অভিশপ্তা ইভের সুসময় আরম্ভ হইয়াছে! এখন একমাত্র ভয়ের বিষয় এই যে পাছে সে তাহার স্বাধীনতার সীমা ছাড়াইয়া স্বেচ্ছাচারিতার ভিতর গিয়া পড়ে। শাপ ব্যতীতই হোক্ আর শাপের জন্যই হোক্ ইভ্ স্বভাবতঃই

বিশ্বাসপরায়ণ, অনুভূতিশীল। নিষিদ্ধ ফলের বৃক্ষ সম্বন্ধে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, তাহা সে সহজেই বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং ধূর্ত্ততার কুহকে মুগ্ধ হইয়া সহজেই সে "ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে ভয়ঙ্কর প্রাণী" তাহার বাক্য শ্রবণ করিতে উদ্যত হয়।

অভিশপ্তা ইভ্! বিশ্বসৃষ্টির জননী! মনুষ্যজাতি তাহার অঙ্ক হইতে নবীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহার আশা, আনন্দ ও প্রেমকে সে মূর্ত্তিমান্ করিয়া প্রকাশিত করিতেছে! অবিচলিত সহিষ্ণুতার সহিত সে নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে ও করিতেছে, প্রতারিত হইয়াও নব বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে। তাহার মধুর বিশ্বাসপরায়ণতা চির-নবীন রহিয়াছে, এবং শয়তান—এই মুক্ত পথটির ভিতর দিয়া চিরকালই প্রবেশের সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার অভিশাপ—বৃহৎ প্রেম ও বিশ্বাসের অপরাধেই কি উচ্চারিত হয় নাই?

সাহিত্যের ভিতরেও নারীর নাম ও যশকে পুরুষ কতবার অপহরণের চেষ্টা করিয়াছে—তাহা এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। রমণী-রচিত কত গ্রন্থ পুরুষের সাহায্য দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে! জর্জ ইলিয়টের নভেল মিষ্টার লিউজ এর সাহায্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিনিয়ত অভিযুক্ত হইয়াছে!

কিন্তু তবুও অভিশপ্তা ইভ্—তাহার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ভগ্ন আদর্শ, চূর্ণীভূত আশা, অপহৃত প্রেম—তাহার অভিশাপের সমগ্র ভারে নিষ্পেষিত হওয়া সত্বেও—সৃষ্টির ভিতর সে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তাহার নিষ্ফলতা—তাহার দুর্ব্বলতা তাহার শাপ—তাহার প্রেম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং ভীরু অ্যাডামের অক্ষুণ্ণ প্রশ্রয় তাহাকে নৈতিক বিচ্যুতি ও জড়বাদের ভিতর নিয়া ফেলিয়াছে! যৌবনের উষায়, অ্যাডামকে সন্তুষ্ট করাই তাহার প্রথম আকাঙ্ক্ষা স্বরূপে উদিত হয়—ইহা ঠিক্ সেই আকাঙ্ক্ষা—সৃষ্টির প্রারম্ভে, তাহাদের পরস্পরের প্রথম পরিচয়ের দিনে, যে আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে তাহাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইতে দিয়াছিল। সে তাহাকে মুগ্ধ করিতে চায়, তাহাকে জয় করিতে চায়, সহস্র প্রকারে সে তাহার কাছে আদর লাভ করিতে চায়, আপনাকে তাহার জীবনের চারিদিকে অবিমোচ্য রূপে বেষ্টন করিতে চায়, এবং এই লক্ষ্যটিতে যদি সে পৌঁছাইতে পারে তবে সে অখণ্ডনীয় রূপে সুখী ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হয়। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে যখন সে জানিতে পারে যে, যাহার উপর তাহার চিন্তা কেন্দ্রীভূত সে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না—সে যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে সেই প্রেম যখন পরীক্ষার মুখে ভঙ্গুর ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে—যখন সহৃদয়তা ও ভদ্রোচিত ব্যবহারের পরিবর্ত্তে অনিষ্টের সঙ্গে অপমান তাহার উপর পুঞ্জীভূত হইতেছে—তখন তাহার সমস্ত শোভন ও কোমল মনোবৃত্তি বিকৃত হইয়া যায়; এবং যদিও সে সহ্য করিতে হইবে বলিয়াই তাহার সমুদয় ক্লেশ সহ্য করে তবুও, সে তাহার স্মৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং সুযোগ পাইলেই তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের এই স্মৃতি ও অবিচারের প্রতিশোধেচ্ছা হইতে পতিত স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়! কিন্তু তবুও আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এই পতিত স্ত্রীলোকেরা জন্ম অবধিই পতিত ছিল না—ইভের প্রকৃতিগত সেই আকাঙ্ক্ষাটির সহিত তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং সে আকাঙ্ক্ষা নিজেকে তৃপ্ত করা নয়—শুধু তাহার সঙ্গীকে সন্তুষ্ট করা! তাহাদের সহজাত সংস্কারের সঙ্গে জাত এই চেষ্টাটির ফলে তাহারা যখন শুধু নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, ঘৃণা প্রাপ্ত হয় ও পরিত্যক্ত হয় এবং সময়ে সময়ে নিষ্ঠুরতম বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিদান পাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাই প্রদান করিতে উদ্যত হয়—তখন তাহাদের বেশী কিছু দোষ দেওয়া যায় না। নির্দ্দোষ বিশ্বাস ও বিশ্বস্ত প্রেম নারীজীবনের শ্রেষ্ঠভাগ, ইহাতে যখন কোনও ভীরু অ্যাডামের স্পর্শ পাশবিকতা আনয়ন করে—তখন সেই নারী তাহার আত্মার হত্যার ক্ষতিপূরণের দাবী নিশ্চয়ই উপস্থিত করিতে পারে!

অভিশপ্তা ইভ্! আপনাকে প্রতারিত দেখিয়াও তাহার প্রেম অব্যাহত আছে; আশা যখন তাহাকে পরি-ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখনও সে—যাহা কখনও লাভ করিতে পারিবে না তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে!

যে প্রার্থনার উত্তর সে কখনও পাইবে না তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেছে! তবুও সে ভবিষ্যৎবংশীয় পুরুষদের গর্ভে ধারণ করিয়া তেমনি স্নেহাতুর ভাবে পালন করিতেছে এবং ভাবিতেছে তাহাদের মধ্য হইতে এমন কেহ কি কখনও বাহির হইয়া আসিবে না যে তাহাকে সুবিচার করিবে এবং যেখানে তাহার স্থান সেই খানটিতে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে! তাহার বলিষ্ঠ সঙ্গী—সহিষ্ণুতায় যে তাহার সমকক্ষ নয়—তাহার সাহায্যকারিণী হইয়া সগৌরবে সে তাহার পাশে দাঁড়াইবে! দুর্ব্বলা, বিশ্বাস-পরায়ণা, প্রেমময়ী অভিশপ্তা ইভ্‌! সে তাহার অভিশাপের ভারে নুইয়া পড়িতেছে! কিন্তু ঐ মেঘ সরিয়া যাইতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ উষার আকাশে আলোক-রেখা দেখা দিতেছে! ইডেনে উচ্চারিত তাহার চিরজীবনের সেই অভিশাপ অপেক্ষাও বৃহত্তর অভিশাপ তাহাদের স্পর্শ করিবে যে তাহার জীবনের ভার বাড়াইতে অগ্রসর হইবে! *

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

মায়াপুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পর দিন প্রাতঃকালে কুশাবর্ত্তে স্নান ও তীর্থকৃত্য শেষ করিয়া নয়টার সময় কনখল যাতায়াতের জন্য এক একা ভাড়া করিলাম। এদেশে ছত্রির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অধিকাংশ একাওয়ালাই ছত্রি, সুতরাং উহারা স্বাভাবিক শিষ্টতা গুণে একা হাঁকাইবার সময় পথের লোকের সঙ্গে বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করে। দশহরার মেলার কয় দিন রাস্তায় অত্যন্ত ভিড়। জোয়ালাপুর ও কনখলের রমণীরা প্রতিদিন দল বাঁধিয়া মেলায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র নরনারী পদব্রজে ষ্টেসনে গতায়াত করে। একাওয়ালা প্রবীণা রমণীর দল দেখিলেই "হট্‌ যাইয়ে মাই" বলিয়া সাবধান করে এবং যুবতীর দল দেখিলে "হট্‌ যাও বাইজী" বলিয়া ঘোড়ার লাগাম টানিয়া ধরে। রমণীরা একটু হাসিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পাশ কাটাইয়া যায়। অর্থাভাবেই যে রমণীরা পদব্রজে যায় তাহা নহে ইচ্ছা করিয়াই অনেক সম্পন্ন মহিলা বিশ পঁচিশ জনে দল বাঁধিয়া গল্প করিতে করিতে হাঁটিয়া যায়। এদেশের রমণীরা ক্লেশসহিষ্ণু এবং কতকটা স্বাধীন-প্রকৃতি, বাঙ্গালী রমণীদের ন্যায় মোমের পুতুল নহে। কনখল হরিদ্বার হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার তীরদেশে অবস্থিত। এমন পবিত্র শান্তিময় স্থান নিতান্ত বিরল। পুরাকালে ঋষিরা কনখলে বাস করিতেন। এখানেই দক্ষপ্রজাপতির আলয় ছিল। মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূত কাব্যের নায়ক যক্ষের মুখে কনখল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথা:—

"যেও পরে কনখল যথায় জাহ্নবী জল
শৈল হতে পড়িয়া ধরায়।
সগর তনয়বর্গে লইয়া যাইতে স্বর্গে,
বিরাজিয়া সোপানের প্রায়॥
অম্বিকা ভ্রুকুটি ভরে যেন উপহাস করে,
ফেনরাজি করিয়া বিস্তার।
ঊর্ম্মিরূপ কর দিয়া শশধরে আবরিয়া,
ধরে পুনঃ শিবজটাভার॥" *

প্রায় দশটার সময় কনখলে উপস্থিত হইলাম। একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া কনখলে যাইতে হয়, কিন্তু তাহা নহে। লুক্‌সার হইতে হরিদ্বার বা গঙ্গাদ্বারে যাইবার পথে আগে কনখল পাওয়া যায়, কিন্তু রেল ষ্টেসন না থাকায় লোকে হরিদ্বারে নামিয়া কনখলে পিছাইয়া আসে †। প্রথমেই দক্ষিণেশ্বর শিবের মন্দিরে উপনীত হইলাম। ঐ শিবমন্দির-সংলগ্ন অনেকটা

---

* কার্ত্তিকের 'ভারতমহিলায়' প্রকাশিত "নারীর উন্নতি—প্রতীচ্য দেশ" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

* তস্মাদগচ্ছেরনু কনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং।
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্‌॥
গৌরীবক্ত্র ভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা।
(মেঘদূত)

† কনখলে যাইবার জন্য ষ্টেসন হইতেছে।

খালি জমি প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে, উহাই দক্ষযজ্ঞের স্থান এবং উহার নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীর ঘাটই সতীঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে প্রসঙ্গক্রমে দক্ষযজ্ঞের ইতিবৃত্তটি সংক্ষেপে (অতি সংক্ষেপে) উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ এই ক্ষেত্রই মহাদেবের ভাগ্যপরীক্ষার স্থান। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন ;—দক্ষ যজ্ঞের পূর্ব্বে বৈদিক দেবতাদের তালিকায় মহাদেবের নাম ছিল না, মহাদেবও ঐসকল সংবাদ রাখিতেন না। শেষে দক্ষযজ্ঞ কালে মহাদেবের চৈতন্য হয়, তাহাতেই তিনি দেবতাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক যজ্ঞভাগ আদায় করিয়া লয়েন। এই কথাগুলি সত্য কিনা তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। দেখা যাউক পুরাণ হইতে উহার সমর্থক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা। স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত কেদার খণ্ডস্থ মায়াপুরী মাহাত্ম্যের মধ্যে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা আছে। ঐ বিবরণটি এইরূপ ;—

কনখলের ভাগীরথী-তীরে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। মহাধূম। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ মৃগ-চর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। সুরলোকে সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। দেবগণের বগী ফেটিং মটরকার প্রভৃতি আকাশ ছাইয়া কনখলের দিকে ছুটিতেছে। কনখলের কিঞ্চিদ্দূরে (মানস-সরোবর ও কাশ্মীর প্রদেশের উত্তরপূর্ব্ব কোণে) কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত। চিরতুষারে আবৃত বলিয়া উহার বর্ণ রৌপ্যের ন্যায়। সেইজন্য লোকে ঐ পর্ব্বতের "রজতাদ্রি" নাম রাখিয়াছে। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা সতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর হইতে মহাদেব সতীকে লইয়া মনোহর রজত গিরির অধিত্য-কায় বাস করেন। সতী আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পিতৃভবনে উৎসব হইতেছে। কারণ ঐ প্রদেশে তখন দক্ষপ্রজাপতিই একমাত্র সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। যাহা হউক তিনি মহা-দেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন এবং মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ;—"দেব! আমার পিতৃগৃহে মহোৎ-সব, একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখুন সুরগণের যান বাহনে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। সেই উৎসব দেখিবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল। আমার সমস্ত ভগিনী সেখানে গিয়াছে, বাপের বাড়ীতে উৎসবের কথা শুনিয়া কে আর স্থির থাকিতে পারে? মুনিরা আমার পিতাকে ঘিরিয়া বসিয়া কত স্তুতি করিতেছেন, ভগিনীরা নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বেড়াইতেছে, জননী দেবপত্নীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতে-ছেন। আমি কখন তাহাদিগকে দেখিব। অতএব দেব! অনুমতি কর, আমি সেখানে যাইব।" মহাদেব বলিলেন—"দেবি! তোমার পিতা অতি নিষ্ঠুর, নতুবা তিনি কি তোমার নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেন না? অতএব বিনা আহ্বানে তুমি কেমন করিয়া পিতৃগৃহে যাইবে। জানই ত আহুত না হইয়া গেলে লোকে নিতান্ত লঘু মনে করে।" সতী উত্তর করিলেন ;—"তোমার পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, মিত্র বান্ধব কেহই নাই, তুমি নির্গুণ এবং মায়া রহিত, অতএব বন্ধু বান্ধবের মমতা কি বুঝিবে বল?" শিব দেখিলেন, সতী বিরক্ত হইয়াছেন; তখন তাঁহার মন রাখিবার জন্য বলিলেন, "দেবি! যদি একান্তই তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে যাও, কিন্তু ইহাতে হয়ত একটি অনর্থ ঘটিতে পারে।" সতী আর কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তাড়াতাড়ি মহাদেবের পায়ের ধূলা মস্তকে গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পিতা যজ্ঞে প্রবৃত্ত, ঋত্বিক্‌গণ কুশহস্তে উপবিষ্ট। সকল দেবতারই যজ্ঞের ভাগ (হব্য) প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু মহাদেবের কোনই ভাগ নাই। উহাতে সতী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং পিতাকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, সকল দেবতারই যজ্ঞভাগ দেখিতেছি, আমাদের বাটীর তাঁহার কোন ভাগ নাই কেন? আপনার সকল জামাতাই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া-ছেন কিন্তু আমার ভর্ত্তা অনিমন্ত্রিত রহিলেন কেন?" দক্ষ বলিলেন—"কি তোমার ভর্ত্তার কথা বলিতেছ? সে অনার্য্য, অনার্য্যের সহিত তাহার সহবাস, (১) ভূত

(১) অনার্য্যোঽহনার্য্যসঙ্গশ্চ শঙ্করোঽহ বিদ্যায়া যুতঃ
(স্কন্দপুরাণ - মায়াপুরী মাহাত্ম্য)।

বেতাল তাহার সহচর, সে দেবতা হইতে ভিন্ন। (২) হস্তীর চর্ম্ম পরিধান করে, শূল হস্তে বৃষে চড়িয়া বেড়ায় কপাল তাহার ভক্ষ্যপাত্র, সে শ্মশানের ভস্ম গায়ে মাখে, কখন নৃত্য করে, কখন হাস্য করে, কখনো বা হাঁই তোলে। অতএব সে কেমন করিয়া যজ্ঞাংশভাগী হইবে? সেই অমঙ্গল মূর্ত্তিটাকে যজ্ঞদর্শন করানই অবিধেয়। সে যজ্ঞক্ষেত্রে কখনই সম্মান পাইতে পারে না। বৎসে! দৈবযোগে তুমি তাহার হস্তে পড়িয়াছ, সে কথা আর এখন বলিয়া কি হইবে?

পিতার মুখে পতির ঐরূপ নিন্দা শুনিতে শুনিতে কোপে সতীর নয়ন আরক্ত হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে পতির চরণদ্বয় চিন্তা করিতে করিতে সহসা যজ্ঞীয় অগ্নিমধ্যে পতিত হইলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে হাহাকার রব উঠিল। কিন্তু দক্ষ এতই নিষ্ঠুর যে কন্যার ঐরূপ কার্য্য দেখিয়া কোন কথাই বলিলেন না, স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এ দিকে তৎক্ষণাৎ কৈলাসে মহাদেবের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। মহাদেব ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া কনখল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে নানা আকার-বিশিষ্ট প্রমথগণ ধাবিত হইল। কৈলাস হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের কেহ নৃত্য করিতে করিতে কেহ কেহ বা মহাশব্দ করিতে করিতে শিবের সহিত গমন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিবের এক ভয়ঙ্কর আকার হইল। চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। মস্তকের সুবর্ণবর্ণ কেশগুলি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ও কম্পিত হইতে লাগিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে সর্প সকল বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। তখনি মহাদেবের সম্মুখে এক পুরুষ আবির্ভূত হইল। তাহার সহস্র বাহু, মস্তক আকাশে ঠেকিয়াছে। গলদেশে নরমুণ্ডের মালা, তিন চক্ষু তিন সূর্য্যের ন্যায়। সে মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া বলিল—প্রভো! কি নিমিত্ত দাসকে স্মরণ করিয়াছেন? শিব বলিলেন;—"ওহে প্রমথাগ্রণী! তুমি দক্ষকে বধ কর এবং যজ্ঞ বিনষ্ট কর।" আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র সেই পুরুষ মহাদেবকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করিয়া শূল হস্তে দক্ষালয় অভিমুখে প্রস্থান করিল। মহাদেবও কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রমথগণ হুঙ্কার করিতে করিতে সেই শিবসেনানীর অনুসরণ করিতে লাগিল। এদিকে যজ্ঞ-রত ঋত্বিক্ এবং সদস্যগণ উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে ধূলি উত্থিত হইতেছে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দ্বিজপত্নীগণ ভয়ে অস্থির। সকলে বলিতে লাগিলেন—হায় হায় একি! তবে কি দস্যুগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে! দেখিতে দেখিতে শিবসেনানী গর্জ্জন করিতে করিতে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত। দক্ষ তখন কুপিত হইয়া দেবগণ মরুৎগণ এবং সাধ্যগণকে যুদ্ধের নিমিত্ত উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সকলে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। দেবগণের সহিত প্রমথগণের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। প্রথম প্রমথগণের বেগে দেবগণ একটু হটিয়া যাইতেছিলেন; শেষে ইন্দ্রের উৎসাহবাক্যে দেবগণ মুখ ফিরাইয়া ঘোরতর বেগে প্রমথগণকে আক্রমণ করিলেন। বহুসংখ্যক প্রমথ যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইল। এমন সময়ে শিবসেনানী যেই ঘণ্টানাদ করিলেন, অমনি অসংখ্য প্রমথ শিলা, পর্ব্বতখণ্ড, বৃক্ষশাখা প্রভৃতি লইয়া বেগে গিয়া দেবগণের উপর পতিত হইল। সংগ্রামক্ষেত্রে রুধিরের সমুদ্র বহিয়া যাইতে লাগিল। তখন প্রমথগণ প্রথমে যজ্ঞশালার সম্মুখস্থ গৃহ, পরে যজ্ঞশালা, মহানস, প্রভৃতি চূর্ণবিচূর্ণ করিল। যজ্ঞপাত্র চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলিল। অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিল। অবশেষে অতি অশ্লীলভাবে যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করিল। তাহার পর, তাহারা মুনি ও মুনিপত্নীদিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পলায়মান দেবতাদিগকে ধরিতে লাগিল। মণিমান্ নামক একটা প্রমথ পুরোহিত ভৃগুমুনিকে লতাদ্বারা বন্ধন করিল। শিবসেনানী সেই বীরভদ্র দক্ষকে এবং সূর্য্যকে বাঁধিয়া ফেলিল। কেহ কেহ অন্যান্য দেবতাগণকে বাঁধিল। অবশিষ্ট দেবগণের যিনি যেখানে পারিলেন পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। শেষে তাহারা হস্তগত দেব ও ঋষিদের ঘোর নির্য্যাতন করিতে লাগিল। যতক্ষণ পারিল তাঁহাদের উপর

(২) দেবেতরো মহাকালঃ সর্ব্বেষাং নাশকশ্চ সঃ।
(স্কন্দপুরাণ—মায়াপুরী মাহাত্ম্য)।

মুষ্ট্যাঘাত করিল, তাহার পর, পাষাণখণ্ড দ্বারা তাঁহাদের গায়ে আঘাত করিতে লাগিল। একটা প্রমথ ভৃগুমুনির লম্বা দাড়ী কাটিয়া দিয়া খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল। আর একজন ভগদেবকে ভূতলশায়ী করিয়া তাঁহার নেত্র উৎপাটন করিল। অপর একজন সূর্য্যদেবের সুন্দর চকচকে দাঁতগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল। শিবসেনানী বীরভদ্র হাতের কৌশল দেখাইবার জন্য হঠাৎ দক্ষের দেহ হইতে মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। উহা দেখিয়া প্রমথগণ ঘনঘন করতালি দিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া শিবসেনানী বীরভদ্র প্রমথগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বতে প্রস্থানোদ্যত হইল।

এদিকে দেবগণ ও ঋষিগণ প্রমথগণের হস্তে বিড়ম্বিত হইয়া অত্যন্ত ভয়াকুল হইলেন। তাঁহারা বীরভদ্রের নিকট গিয়া করযোড়ে বলিলেন ঃ—"মহাশয়! ক্ষমা করুন, ভবাদৃশ ব্যক্তিদের ক্ষমাই সর্ব্বপ্রধান গুণ। আমরা অভিমানে প্রমত্ত হইয়া আপনাকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিতাম না। পূজ্য ব্যক্তির অতিক্রম করার যে ফল তাহা ভোগ করিয়া আমাদের বিলক্ষণ শিক্ষা হইয়াছে। আমরা এখন জানিলাম আপনি যথার্থই দেব। শুধু দেব কেন দেবদেব মহাদেব। অতএব এখন কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।" বীরভদ্র বলিলেন—আমি কে? আপনারাও যেমন মহাদেবের কিঙ্কর আমিও সেইরূপ মহাদেবের কিঙ্কর। আপনারা কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করুন, তিনি প্রসন্ন হইলে আপনাদের কোন দুঃখই থাকিবে না। শেষে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া কৈলাস পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানকার শোভা অবর্ণনীয়। হিমপুঞ্জ-বিমণ্ডিত বনস্থলী, স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষে মধুরকণ্ঠ কোকিলগণ কূজন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছ হ্রদ-সমূহে পদ্মকুমুদ উৎপল প্রভৃতি শোভা পাইতেছে, ভ্রমরপুঞ্জ উহার উপরিভাগে গুন্ গুন্ রবে ভ্রমণ করিতেছে। বনমধ্যে মৃগগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। দেবগণ মহাদেবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে গিয়া দেখিলেন—মহাদেব যোগাসনস্থ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, তিনি সতীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব এবং চারণগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া আছে। প্রথমে ব্রহ্মা ভক্তিগদগদ বাক্যে মহাদেবকে স্তব করিলেন। তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্রের স্তুতিবাদ শেষ হইলে সমস্ত দেবতা একসঙ্গে মহাদেবকে স্তব করিলেন। আশুতোষ তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইলেন। তিনি দেবগণকে ও ঋষিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ;—"ওহে দেবগণ! ওহে ঋষিগণ! আমি তোমাদের স্তবে প্রসন্ন হইয়াছি। তোমরা এরূপ কর্ম্ম আর কখনও করিও না। এখন বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব।" দেবতারা বলিলেন ;—"প্রভো! আর কি বলিয়া দিতে হইবে? এখন হইতে দেখিতে পাইবেন।" তাহার পর, তাহারা দক্ষের পুনর্জীবন, ভগদেবের চক্ষু, সূর্য্যদেবের দন্ত প্রার্থনা করিলেন। আর যদিও ভৃগুর দাড়ী দুদিন পরে আপনাআপনিই গজাইত কিন্তু দেবতারা আর কাল প্রতীক্ষা না করিয়া তাহাও আদায় করিয়া লইলেন।

তাহার পর, দেবগণ ও ঋষিগণ মহাদেবের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। প্রথম প্রথম দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবের দিকে তাকাইতে কষ্ট বোধ করিলেন। সতীর কথা মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় নয়ন বাষ্পাকুল হইল। শেষে স্বচ্ছ অন্তঃকরণে মহাদেবের স্তব করিলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দক্ষ বলিলেন ;—"দেবদেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, চিরকাল যেন আপনার চরণকমলে ভক্তি থাকে। আর আমার কন্যা সতী শীঘ্র দেহ লাভ করুন, এবং আপনার সহিত তাঁহার বিবাহ হউক।" শিব বলিলেন—"দক্ষ, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হউক এবং এই যজ্ঞক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ রূপে পরিণত হউক। আর এখানে মায়ার নিমিত্ত সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, অতএব অদ্য হইতে এই ক্ষেত্র "মায়া-পুরী" নামে প্রসিদ্ধ হউক (১)। এই মায়াপুরী ভারতের সাতটি মোক্ষপ্রদ তীর্থের অন্যতম (২)।

---

(১) যত্র মায়া নিমিত্তংহি জাতং সর্ব্বং প্রজাপতে। তস্মাদিদং মহাক্ষেত্রং মায়াক্ষেত্রং ভবিষ্যতি॥

(স্কন্দপুরাণ—মায়াপুরী মাহাত্ম্য)

(২) অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

এই উপাখ্যান দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম যে দক্ষযজ্ঞের পূর্ব্বে শিব দেবতার মধ্যে গণ্য হইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি দেবতার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইলে শ্বশুর দক্ষপ্রজাপতি কখনই তাঁহাকে "দেবেতরঃ" "অনার্য্যঃ" "অনার্য্যসঙ্গঃ" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতেন না। তখন যজ্ঞাদিতে বেদোক্ত তেত্রিশটি (৩) দেবতারই অর্চ্চনা করা হইত, তদিতর পৌরাণিক দেব-দেবীগণ তখনও আবির্ভূত হন নাই। দক্ষযজ্ঞের পরি সমাপ্তি কালে ঋষিগণ শিবের ক্রোধের আধিক্য দেখিয়া বেদোক্ত অগ্নি দেবের অবতারবিশেষ রুদ্রদেবের সহিত অভিন্নত্ব কল্পনা পূর্ব্বক তাঁহাকে রুদ্ররূপে অর্চ্চনা করিয়া যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। ঋক্-বেদের একটি ঋকে রুদ্র জ্ঞানী অভীষ্টদাতা এবং অতিবৃদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (৪) আবার অপর ঋকে ক্রুর অগ্নি বলিয়াও স্তুত হইয়াছেন! (৫) এই সকল কারণে অনেকে অনুমান করেন, আর্য্যগণের ভারত-বর্ষে আগমনের পূর্ব্বে অনার্য্যগণ ভারতবর্ষের উত্তর হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে একাধিপত্য করিত, তাহাদের অধিকৃত সমস্ত ভূভাগেই লিঙ্গরূপী প্রস্তরখণ্ড পরিপূজিত হইত। আর্য্যেরা এদেশে আগমন করিলে যজ্ঞকালে হয়ত অনার্য্য রাজগণের সহিত অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হয়। শেষে অনার্য্য রাজগণের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত আর্য্যসমাজে বিশেষভাবে শিবার্চ্চনা প্রচলিত হয়। বৈদিক রুদ্র ও অনার্য্য শিব একীভূত হইয়া সর্ব্বসাধারণের পূজা গ্রহণ করিতে থাকেন। নানা পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় অনার্য্যগণ কর্ত্তৃকই সর্ব্বাগ্রে শিবের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের বারাণসী ও দক্ষিণা-পথের কালহস্তীশ্বর প্রাচীনতম শৈবতীর্থ। এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাধ কর্ত্তৃক শিবমাহাত্ম্য প্রচারের কথা অবগত হওয়া যায় (১)। চৈত্রমাসে যে শৈব উৎসব (গাজন) হইয়া থাকে, উহাতেও নিম্নবর্ণ ব্যতীত উচ্চবর্ণের লোকের প্রায়ই যোগ দিতে দেখা যায় না।

দেবাদিদেব মহাদেবের কথা এই পর্য্যন্তই থাকুক। তাহার পর, আমরা মায়াপুরী সম্বন্ধে অন্য দুই চারিটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দক্ষেশ্বর শিবের মন্দিরে সুলভ মূল্যে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কুসুম পাওয়া যায়। স্থানটি বেশ বিজন ও গম্ভীর। যাহা হউক, সেখান হইতে সতীঘাট অভিমুখে চলিলাম, কিন্তু সৈকত ভূমিতে রাশি রাশি গোল গোল প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া থাকায় ঘাটটি একপ্রকার দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ফিরিতে হইল। অপর পারে নীলপর্ব্বতে নীলেশ্বর, বিল্ব-পর্ব্বতে বিল্বেশ্বর ইত্যাদি বহুসংখ্যক শিব আছেন। তাঁহা-দের প্রত্যেকের বিষয়ে একটি করিয়া উপাখ্যান মায়াপুরী মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কয়েকটি সংস্কৃত পাঠশালা ও মঠে যাইতে হয়। ঐ সকল পাঠশালা ও মঠের মধ্যে দক্ষেশ্বর সংস্কৃত পাঠশালা, ভাগীরথী সংস্কৃত পাঠশালা, সতীঘাট সংস্কৃত পাঠশালা ও মুনিমণ্ডল মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। আসার কালে আমি এক পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মায়াপুরীর "কনখল" নাম হইবার কারণ কি? তিনি বলিলেন, এই তীর্থ কোন খল ব্যক্তিকেই মুক্তি প্রদান করেন না। তজ্জন্য এই তীর্থের নাম কনখল হইয়াছে। মায়াপুরী মাহাত্ম্যেও ঠিক এইরূপ ব্যাখ্যাই আছে (২)। কনখলে অধিকাংশ পণ্ডিত ব্রহ্মচারী

---

(৩) দেবতাদের তেত্রিশ সংখ্যার কথা বেদেও উক্ত হইয়াছে। যথা;—"যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্। বিদন্নহ দ্বিতাসনন্॥" উহার বঙ্গানুবাদ এই রূপ।—যে ত্রিশের উপর তিন সংখ্যা যুক্ত (৩৩শ সংখ্যক) দেবরা বর্হিতে উপবেশন করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা আমাদিগকে জ্ঞাত হউন এবং দুই প্রকার ধন দান করুন। (ঋঃ মঃ ৮ অং ২৮ সূঃ ১)

(৪) কদ্রুদ্রায় প্রচেতসেমীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শংত মংহৃদে॥ অনুবাদ—কবে আমরা জ্ঞানী অভীষ্টদাতা অতিবৃদ্ধ হৃদয়ে চিরবিরাজমান রুদ্র দেবতার উদ্দেশে অতি সুখকর স্তোত্র পাঠ করিব। (ঋঃ মঃ ১ অঃ ৮ সূঃ ২০)

(৫) ঋঃ মঃ ১০ অঃ ৬ সূঃ ২১ পাঠ করুন।

(১) স্কন্দপুরাণান্তর্গত, "শিবরাত্রি ব্রত" ও "দক্ষিণাবর্ত্ত তীর্থ মাহাত্ম্য" পাঠ করুন।

(২) খলঃ কোনাত্র মুক্তিং বৈত্তজতে তত্র মজ্জনাৎ। অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রুর্মুনীশ্বরাঃ॥ (স্কন্দপুরাণ, মায়াপুরী মাহাত্ম্য)।

দণ্ডী ও পরমহংসের বাস। বিশেষতঃ গঙ্গাতীরে সুন্দর সুন্দর উদ্যান থাকায় স্থানটির দৃশ্য অতি মনোহর।

দুইটা বাজিয়া গেলে হরিদ্বারে (বাসায়) ফিরিয়া আসিয়া ফলমূল আহার করিলাম। তাহার পর, বহুকালের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু একচক্ষু পণ্ডিত রামকৃষ্ণ তর্কশাস্ত্রীর (১) চতুষ্পাঠী হইতে তাঁহাকে লইয়া বাচস্পতি সংস্কৃত পাঠশালা, গণেশীভক্ত সংস্কৃত পাঠশালা প্রভৃতি কয়েকটি পাঠশালায় পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বালব্রহ্মচারি-প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত পাঠশালায় উপনীত হইলাম। বালব্রহ্মচারী একাদশীর ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীর চারিটি অধ্যাপক যজ্ঞ কার্য্যে ব্রতী। ব্রহ্মচারী স্বয়ং হোতা, তিনিই সমুদয় করিতেছেন। ব্রহ্মা তন্ত্রধার সদস্য প্রভৃতি কেবল উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন। আমরা উপস্থিত হইবা মাত্র সংস্কৃত ভাষায় আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই যজ্ঞ শেষ হইল। তাহার পর, আমি যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম তাহা সংসাধিত হইলে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল পাঠশালার পণ্ডিতগণের সহিত সংস্কৃত ভাষায় নানা কথা হইল। ব্রহ্মচারী নিজে হিন্দীতে কথোপকথন করিলেন। ব্রহ্মচারীর বয়স প্রায় সত্তর বৎসর, এ বয়সেও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ এবং শরীর হইতে যেন জ্যোতি নির্গত হইতেছে। তাঁহারই অর্থে পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। ব্রহ্মচারী বিবাহিত লোকের উপর নিতান্ত চটা। তিনি চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন, পৃথিবীর লোক ঐ রূপ থাকুক, ইহাই তিনি বাঞ্ছা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই বলে আমি বিবাহ করিয়াছি। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার পাঠশালায় চারিটি অধ্যাপক। চারিজনই নব্য এবং চারিজনই বিবাহিত। তজ্জন্য ব্রহ্মচারী আরও জ্বালাতন। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া বলিলেন, —“ইহাদের সহিত শাস্ত্রের কথা কি বলিতেছেন, ইহারা কি পণ্ডিত? না, না, ইহারা পর্দার নফর! ঘরে বাইজীর পায়ে তেল লাগায় আর পাঠশালায় আসিয়া বেদান্ত পড়ায়।” অধ্যাপকেরা মস্তক নত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীর মন কিন্তু স্বচ্ছ।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে আহারাদি অন্তে একখানি একা ভাড়া করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড হইতে দেড় ক্রোশ দূরে ঋষিকুল পাঠশালা দেখিতে গেলাম। ঐ পাঠশালা ভাগীরথীর তীরে এক প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। ভারতের নানা প্রদেশের ধনী বিশেষতঃ মাড়োয়ারীদের অর্থে ঐ পাঠশালাটি নির্ম্মিত। একটি বড় একতল অট্টালিকায় পাঠশালা। ঐরূপ অপরটিতে বিদ্যার্থীদের বাসস্থান। এখানকার বিদ্যার্থীদের হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে হয় এবং আহারাদি বিষয়ে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিতে হয়। পাদুকা কিংবা ছত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। গণিত ব্যাকরণ সাহিত্য ইতিহাস সমুদয়ই সংস্কৃতে পড়া হয়। বিদ্যার্থীরা কেবল এক ঘণ্টা ইংরাজী সাহিত্য পড়িতে পায়। পাঠশালায় প্রবেশের দ্বারদেশের দুইদিকে দুইটি অট্টালিকা। একটি সভাগৃহ ও অপরটি আফিস ঘর। সাত আটটি সংস্কৃতাধ্যাপক ও ও দুইজন ইংরাজী শিক্ষক অধ্যাপনা করেন। ছাত্রসংখ্যা প্রায় এক শত। স্থানটি সহরের কোলাহল হইতে দূরে এবং নির্জ্জন শান্তিময়। প্রান্তর মধ্যে এক ঘর হইতে অপর ঘরে যাইতে সুন্দর রাজপথ ও পুষ্পবীথিকা। পাঠশালার সীমার মধ্যে অথচ দূরে ভাগীরথীর তীরে বনপ্রান্তে একখানি কুটীরে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ তীর্থস্বামী বাস করেন। ইনি একজন বর্ষীয়ান্ বৈদান্তিক। সর্ব্বদা সহাস্যবদন এবং সকলের প্রতিই সস্নেহ দৃষ্টি। আমাকে পানীয় (দধি ও লেবুর রস মিশ্রিত এক প্রকার সরবৎ) না পান করাইয়া ছাড়িলেন না।

গঙ্গার অপর পারে আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণ গুরুকুল পাঠশালা নামে আর একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়টি নাকি অতি বৃহৎ এবং উহার ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা অনেক অধিক। সেখানকার বিদ্যার্থীদিগকেও ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিতে হয়। কিন্তু তাহার

(১) পণ্ডিত রামকৃষ্ণ তর্কশাস্ত্রী পঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর নিবাসী। ইনি শৈশব অতিক্রান্ত হইলেই নবদ্বীপে যান এবং পাকা টোলে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ শেষ করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইনি বিবাহ করেন নাই, শাস্ত্র চর্চ্চায় জীবন শেষ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কলিকাতার ভগবান্ দাস বগলার পরিত্যক্ত অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী শ্রীমতী ব্রজকুমারী ইঁহাকে মাসিক ৩০, টাকা বৃত্তি দেন। তদ্দ্বারা হরিদ্বারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

নিয়মাদি নাকি অতি সুন্দর। সময়াভাবে গুরুকুল পাঠশালায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

হরিদ্বারে তীর্থের অন্ত নাই। কুমুদ্বতীতীর্থ, মায়াকুণ্ড, রেণুকাতীর্থ, নারায়ণীতীর্থ, ভানুতীর্থ প্রভৃতি অসংখ্য তীর্থ বিরাজমান। প্রত্যেক তীর্থের পৌরাণিক ইতিহাস আছে। হরিদ্বারে কয়দিন পরম আনন্দে ছিলাম। এখানে ফলমূল যথেষ্ট। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও পাওয়া যায়, তবে তণ্ডুলাদি কাশীর তণ্ডুলাদির মত নহে। হরিদ্বারে মূল্যবান্ নানা চিত্র বিচিত্র কম্বল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে নাকি এখানে জ্বরের প্রভাব যথেষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে হরিদ্বার পরম স্বাস্থ্যকর। পাণ্ডাদের ব্যবহার অতি উত্তম। উহারা লোক পাঠাইয়া সেই ভিড়ে আমায় গাড়ীতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিল। আমি দুইটার ট্রেণে অসংখ্য নরনারীর সহিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

বঙ্গবাণী জননীর চিরপ্রিয় ওহে সুসন্তান,
কোথা গেলে আজ,
হাহাকারে সারা দেশ ভরে গেছে তোমার বিহনে,
হে সাহিত্যরাজ!
আলোকিত ছিল বঙ্গ অতুলন তোমার বিভায়,
এতকাল ধরি',
শশী অস্তে নিভে গেছে ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের ভাতি,
এক এক করি'।
ছেয়ে গেছে অন্ধকারে, তারমাঝে কীর্ত্তিরাশি তব,
অক্ষয় অমর,
আলোকপুঞ্জের মত সুবিমল উজ্জ্বল আভায়,
ভাতিবে সুন্দর।

২

প্রথম উদিলে যবে পূর্ব্বাকাশ প্রভায় রাঙ্গিয়া
বালসূর্য্যমত,
বিস্ময়ে হেরিল সবে তাহামাঝে কি ভাব গরিমা,
ছিল লুক্কায়িত।
ক্ষীণ মৃদু বঙ্গভাষা নিদ্রালস শিশুর মতন
ছিল অসহায়,
তড়িৎ প্রবাহ মত তোমার পরশে বহে শক্তি
শিরায় শিরায়।
দূরে গেল অলসতা; পূর্ব্বদিন যে মূককাতর,
অবোধের ভাষা,
গাহিল নূতন তানে, প্রতিদিন উঠিল ফুটিয়া
নবভাব, আশা।
আভরণ-হীন দীন অবজ্ঞাত যেই সভয়ে সুদূরে
র'ত সভামাঝে,
নবীন উৎসাহ গর্ব্বে বসে নিজ উন্নত আসনে
দীপ্ত নব সাজে।

৩

ভিখারিণী মাতা রাজরাণী আজি কল্যাণে যাঁহার
চির অতুলন,
সেই তুমি কোথা দেব, প্রতিভা-তনয় বরেণ্য সুন্দর
শান্ত সুশোভন!
আপনার অসীম প্রভাবে দিলে যারে অনুপম
নবীন জীবন,
তার সনে চিন্তামাখা নিভৃত আলাপ ক্ষণেকেই
হ'ল অবসান,
সুনিপুণ কারু হস্তে রচিলে যে দিব্য আয়তন
শিল্পীশ্রেষ্ঠ, হায়,
সুধু তথা ক্ষণমাত্র বিরামের লভি' অবসর
লইলে বিদায়!

৪

যাও দেব, বঙ্গভাগ্যে তবসঙ্গ ক্ষণ তরে সুধু
দিব্য পুণ্যময়,
ঈর্ষাবশে চাহে তোমা প্রতিদানে কাতর অমরা
বাণীর আলয়।
যশঃ প্রভাকর তব চিরোজ্জ্বল রহিবে হেথায়
অমর বাঞ্ছিত।

"প্রভাত" "নিশীথ" চিন্তা "মহাশক্তি" আপন গৌরবে
রবে বিরাজিত।
বঙ্গহৃদি তবস্মৃতি চিরতরে রাখিবে গাঁথিয়া
শুভ্র নিরমল,
আপন প্রভায় দীপ্ত আপনার কীর্ত্তির মন্দির
রহিবে উজ্জ্বল।*

শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী।

ছায়া-পথ।

অনন্ত নীল আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ:—মরি মরি! কি অপরূপ শোভা! হাজার হাজার হীরার ঝাড় যেন ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে! উজ্জ্বলে মধুর, মধুরে মহান্! এ মহত্ত্ব মধুরতার সংমিশ্রণে কি এক অনির্ব্বচনীয়, অভাবনীয় মহাশক্তির বিকাশ অনুভূত হইতেছে।

যখন তামসী রজনীর কৃষ্ণছায়ায় মেদিনীর শ্যাম সুন্দর কলেবর আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, যখন শ্রান্ত ক্লান্ত জীবকুল বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ান হইয়া,—কর্ম্মক্ষেত্রের অনন্ত শ্রম ক্লেশ বিস্মৃত হয়, সেই সময় একবার সুন্দর নীল নভোমণ্ডলের বিশ্বমোহন কান্তি অবলোকন করিলে কি আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়! যেন স্বর্গীয় উদ্যানে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ পুষ্প স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত! অথবা যেন বৈজয়ন্তপুরীর সহস্র সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অগণিত সুর-সুন্দরী অনিমেষ নয়নে মর্ত্ত্যবাসীদিগকে দর্শন করিতেছেন। যেন কোন অজ্ঞাত রাজ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া সেই নীরব নিস্তব্ধ নিশীথে প্রকৃতি দেবী এক মহাধ্যানে নিমগ্ন! সেই সময় অনন্ত সত্য সুন্দর চিদ্‌ঘন মাধুরী প্রাণের উপর কেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

নক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতি, গতি, দূরত্ব প্রভৃতি নির্দ্ধারণের নিমিত্ত যুগে যুগে মনীষিগণ গভীর গবেষণায় রত রহিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই ভূমা মহেশ্বরের মহিমার জলন্ত নিদর্শন স্বরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের বিষয় অতি অল্পই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

যে সময়ে পাশ্চাত্য জগতের অনেক দেশই ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত যখন জ্ঞানের সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত ছিল, সেই সময়েও ভারতে জ্যোতিষ-তত্ত্বের আলোচনা অল্প ছিল না। খনা প্রভৃতি অসামান্য প্রতিভাশালিনী মহিলাগণও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অলৌকিক পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন; সে সমস্ত বিষয় এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

নীরদমুক্ত নির্ম্মল আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে, সুদূর ব্যোমপথে নক্ষত্র-বিরচিত এক কিরণময় মণ্ডল নয়ন-গোচর হয়। উহা নীল অসীম দিগন্তের উত্তর পশ্চিম ব্যাপিয়া যেন দ্যুলোককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মহা-পথের তুল্য বিস্তৃত, এবং আলোকমালায় উদ্ভাসিত রহিয়াছে। তাহার নাম ছায়াপথ।

জ্যোতিষ্ক-বিমণ্ডিত মহামহিমাময় ব্যোমের দুর্জ্ঞেয় সরণী পরিভ্রমণ করিতে মানব-মনের সাধ্য কি? মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি দূর হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই ছায়া-পথের আকৃতি সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। বিবিধ বৈচিত্র-পূর্ণ বিশ্ব-চিত্রপটের একটি অপরূপ চিত্র ছায়াপথের বৈচিত্রও সামান্য নহে। ইহা কোথাও অল্প বিস্তৃত, কোথাও অধিক বিস্তৃত, কোথাও বা সামান্য রেখাবৎ। কোথাও অতিশয় উজ্জ্বল, কোথাও অনুজ্জ্বল, অল্প আলোকবিশিষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতি ও বর্ণও একপ্রকার নহে। অপূর্ব্ব বিভিন্নতা সত্ত্বেও কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য!

এই ছায়াপথ সম্বন্ধে নানাদেশে নানাপ্রকার গল্প প্রচলিত আছে। প্রাচীন রোমবাসীগণ উহাকে সৌর-জগতের কিরণদাতা সবিতাদেবের পথ বলিয়াছেন, তাহা-দের মতে এই পথ দিয়াই গ্রহরাজ সূর্য্য পূর্ব্বাচলে এবং পশ্চিমাঞ্চলে গমনাগমন করেন। প্রাচীনযুগে যে গ্রীকগণ সভ্যতা, শিল্প, বাণিজ্য বিদ্যাবুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণ গরিমায় উন্নতির সমুচ্চ শিখরে উত্থিত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহারাও এসম্বন্ধে কুসংস্কার বর্জ্জিত ছিলেন না। তাঁহারা ছায়াপথকে দেহমুক্ত আত্মার স্বর্গগমনের পথ বলিয়া-ছেন। অথবা সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ কবির কি চমৎ-কার কল্পনা! কবিকল্পনার এমন মনোহর আশ্রয় ছায়া-

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ স্মৃতিসভায় পঠিত।

পথের ন্যায় দ্বিতীয় বস্তু আর কি আছে ? সকল দেশেই প্রাচীন কবিগণ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত করিয়া যেন এক অপূর্ব্ব আমোদ অনুভব করিতেন। চীনের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক ছায়াপথ মনোহর অমরা পুরীর পুণ্য সলিলপ্রবাহিনী তরঙ্গিনীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে ভারত কাহারও পশ্চাদ্বর্ত্তী নহে। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও এসম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পিত ব্যাখ্যা শ্রবণ করা যায়। চিরকল্পনাপ্রিয় ভারতবাসীগণ এমন মাধুর্য্য ও মহিমাপূর্ণ বিষয়ে কেননা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ?

জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ ছায়াপথ সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এপ্রবন্ধে তাহাই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

ছায়াপথ স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র অথবা সূত্রগ্রথিত মুক্তা সমূহের ন্যায় নক্ষত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নক্ষত্রগুলি স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। কোথাও বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে,—তাহাও স্তরে স্তরে। নৌকা-পথে চলিতে চলিতে খরস্রোতা তটিনীর তীরে মৃত্তিকা-স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। একটি স্তরের উপর আর একটি স্তর কেমন সাজান রহিয়াছে। এই ছায়াপথের নক্ষত্রস্তর সেই প্রকার নহে। নীচের স্তরের নক্ষত্রগুলিও সুস্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু অনুজ্জ্বল। এই নক্ষত্র-স্তরের নির্ণয় বিষয়ে ও জ্যোতিষীগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে ছায়াপথের নিম্নস্তরস্থিত নক্ষত্র-পুঞ্জ এত অস্পষ্ট যে ধূমপুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

এই নক্ষত্র গুলির জ্যোতি অসামান্য। অতিশয় দূরত্ব বশতঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও মানবচক্ষে ক্ষীণালোক বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতি জন্মে। একটি সূর্য্যের আলোক রাশিতে সমস্ত সৌরজগৎ উদ্ভাসিত এবং রক্ষিত। জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা নিঃসংশয় রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে এ অগণিত নক্ষত্রমালার এক একটির জ্যোতিঃ মহাজ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

প্রত্যেকটি নক্ষত্র আকৃতিতে সূর্য্যের তুল্য বিশাল-কায়; কোনটি বা সূর্য্যের অপেক্ষাও বৃহত্তর হইবে। অসীম মহাব্যোম ব্যাপিয়া এই মহাজ্যোতিষ্ক সকল অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে। এক মহা আকর্ষণ শক্তিতে পরস্পর অনন্ত শূন্যে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই আকর্ষণই বা কেমন ? এবং তাহার স্রষ্টাই বা কি মহান্! সেই অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বিশ্ববিধাতার অচিন্তনীয় সৃষ্টিতত্ত্বের অসীমত্ব আমরা কীটানুকীট কেমন করিয়া ধারণা করিব ? চিন্তা করিতে চিন্তা শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে। তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে এই অনন্ত রবিপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং কোন্ উদ্দেশ্যেই বা সৌরজগৎ পরিবেষ্টিত রবি-স্তবক-স্তর-শোভিত ছায়া-পথের রচনা করিয়া আপনার মহামহিমান্বিত লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা কে বুঝিবে ? সেই বিস্ময়কর তত্ত্বের এক কণাও মানববুদ্ধির গম্য নহে। মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধিপ্রসূত সামান্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সেই মহাসৃষ্টির অতি সামান্য অংশই দৃষ্টিগোচর হয়। এই মহা বিশ্বকার্য্য যাঁহার রচনা তিনি ইহাতে প্রাণ রূপে প্রতিষ্ঠিত।

এই মহত্ত্বের কূল কিনারা না পাইয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ অজ্ঞেয়তাবাদী প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ মহান্ সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে ব্রহ্মতত্ত্বকে পরিহার করিতেই চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু ভারতের পরম জ্ঞানী মহর্ষিগণ জলদগম্ভীরনাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই মহান্ পুরুষে অবস্থিত রহিয়াছে।"

নক্ষত্রপুঞ্জ দূরত্ব বশতঃই এত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। নক্ষত্রগুলি পরস্পর সুদূর-বর্ত্তী হইলেও যে ধরাতল হইতে এত ঘন সন্নিবিষ্ট প্রতীয়মান হয়, দূরত্বই তাহার একমাত্র কারণ। ধরণী হইতে নক্ষত্রমণ্ডলের দূরত্ব নির্ণয় করিতে যাইয়া জ্যোতিষগণ শ্রান্ত ক্লান্ত হইতেছেন। কিন্তু যুগান্তরব্যাপী অবিশ্রান্ত গবেষণা দ্বারাও আজ পর্য্যন্ত তাহাদের দূরত্ব নিঃসংশয়রূপে নিরূপিত হয় নাই। সৌর জগৎ হইতে ছায়াপথ কত দূরে অবস্থিতি করিতেছে তাহা স্থির করিতে কেহই সম্যক্ সমর্থ হন নাই।

আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল (১৮০০০০)। দুই জন জ্যোতিষী পণ্ডিত (ডাঃ গিল এবং ডাঃ এলকিন) লুব্ধক নামক নক্ষত্রের দূরত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ নক্ষত্র হইতে

আলোকরাশি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮০০০০ হাজার মাইল ছুটিয়া, পৃথিবীতে পঁহুছিতে ৯ বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। এরূপ অসংখ্য নক্ষত্র রহিয়াছে যাহারা লুব্ধক হইতেও বহু সহস্র গুণ দূরে অবস্থিত। কোন কোন নক্ষত্র হইতে ধরাবাসীর নিকট আলোক পঁহুছিতে নয় হাজার বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। তাহাদের দূরত্ব কত বিস্ময়কর তাহা কল্পনা করুন। যে আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল দ্রুত ধাবিত হয়, তাহা ধরণী রাজ্যে পঁহুছিতে নয় হাজার বৎসর সময় অতিক্রম করিয়া থাকে।

নক্ষত্রপুঞ্জ গমনশীল হইলেও অতিশয় দূরত্ব বশতঃ তাহারা স্থির বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

আকাশের ইতস্ততঃ অনেক স্থানেই নক্ষত্রপুঞ্জ স্তবকে স্তবকে দৃষ্ট হয়। একবৃন্তে বহু পুষ্পের ন্যায় যেন গুচ্ছে গুচ্ছে সজ্জিত রহিয়াছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বহু দূরে যে অস্পষ্ট আলোক বিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্ট হয় তাহার নাম নীহারিকা। সমুদ্র বেলাস্থিত সিকতাস্তূপের ন্যায় কত স্তরে স্তরে অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ ধূম্রবৎ দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে ইহারা সকলেই এক একটি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য ! এবং সম্ভবতঃ সকলেই এক এক সৌরজগৎ অধিকার করিয়া রহিয়াছে !

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! বিস্ময়ে বাক্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে ! হৃদয় কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে। সীমাশূন্য—অন্তশূন্য ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার অসীম শক্তির বিষয় চিন্তা করিতেও আমরা সমর্থ নহি। কেবল অবনত মস্তকে ভক্তিপরিপ্লুত প্রাণে সেই মহা শক্তিময় জ্ঞানময় পুরুষকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হই। ইহাতেই আমাদের মানবজন্মের সার্থকতা।

শ্রীকুমুদিনী মিত্র।

আমি, দাদা ও বৌদিদি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বসন্তকাল। পূর্ণিমা। বেলা অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যানের প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধ মনের মধ্যে মায়া বিস্তার করিতেছিল; বায়ু পুষ্পের সুঘ্রাণে মধুর হইতে মধুর হইয়া আমার প্রতি অঙ্গে পুলকের সঞ্চার করিতেছিল; একটি পাখী থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া প্রাণের ভিতর নবভাব জাগাইয়া দিতেছিল। এই রকম সুখের দিনে স্বভাবতঃই বেশবিন্যাসের পারিপাট্যের দিকে মন একটু ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহার উপর সাজসজ্জা বিষয়ে দাদার বিশেষ অনুরোধ। আজ মিষ্টার সিংহের বাড়ীতে সান্ধ্য-সমিতি। সেখানে বড় ঘরের মেয়েরা আসিবেন; যেমন তেমন পোষাক পড়িয়া গেলে কি মান রক্ষা হয় ?

আমি উত্তমরূপে বেশবিন্যাস করিলাম, গোলাপ রঙ্গের স্বর্ণখচিত একখানি শাড়ী পরিলাম; উজ্জ্বল স্বর্ণখণ্ডে নির্ম্মিত একটি ব্রোচ লাগাইলাম; আমার কণ্ঠে রত্নশোভিত হার, হস্তে ও অন্যান্য অঙ্গে বহুমূল্য সুবর্ণের অলঙ্কার শোভা পাইতে লাগিল।

আমি সত্যই বলিতেছি, দাদার ভিতরে ভিতরে যে মতলব ছিল, তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতাম না। জানিলে কি আর সাজসজ্জা করি, না ঘরের বাহিরেই বেড়াইতে যাই ? আমার কি একটুকু লজ্জা নাই ? কিন্তু বউদিদি কি দুষ্ট ! তিনি সব জানিতেন, অথচ আমাকে কিছুই বলেন নাই। বলা ত দূরের কথা; আমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিবার জন্য কাছে আসিয়া কহিলেন:—

"রাণীজীর কোথা হতে আগমন হল ?"

আমি। ঠাট্টা করো না, ওগো ঠাট্টা করো না; নিজে যখন পোষাক পরে বেড়াতে বের হও, তখন আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে আপনাকে আপনি একবার দেখে নিও; তা হলে বুঝতে পারবে বেশবিন্যাসটা তোমারও কিছু কম হয় না।

বউদি। না ভাই, ঠাট্টা করব কেন? আজ সত্যিই তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কেনই বা দেখাবে না? বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে, আকাশে চাঁদ উঠ্‌ছে, গাছে ফুল ফুটছে, পাখী গান গাচ্ছে; এমন দিনে তোমার অঙ্গে অঙ্গে যদি লাবণ্য বিকশিত হয়ে না উঠে, তবে আর উঠবে কবে?

আমি। থামো থামো, আর কবিত্বের বাজে খরচ করো না; কে তোমার কাব্যরসের স্বাদ গ্রহণ করবে? যদি দাদা এখানে উপস্থিত থাকৃত, তা হলে এতটা কবিত্ব শোভা পেত।

এই কথা বলিতে বলিতেই দাদা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। দাদা আর আমি গাড়ীতে উঠিলাম। বউদিদি অসুখের ভাণ করিয়া বাড়ীতে রহিলেন। দাদা কহিলেন—"বসন্তের এমন জ্যোৎস্না রেতে একবার ইডেন-গার্ডেনে যাওয়া যা'ক। তারপর সান্ধ্য-সমিতিতে যাওয়া যাবে।"

গাড়ী ইডেন-গার্ডেনে গিয়া পৌঁছিল। দাদা ও আমি গাড়ী হইতে নামিয়া উদ্যানের অনুপম শোভা দেখিতে লাগিলাম।

একটু পরেই একটি যুবক আসিয়া দাদার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দাদা তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। বুঝিলাম, যুবকটি দাদার বন্ধু। আমি একটু দূরে সরিয়া গিয়া যুবকটিকে দেখিতে লাগিলাম।

যুবকটির পরনে একখানি ফরাসডাঙ্গার কল্কাপেড়ে ধুতি, গায়ে শিল্কের জামা এবং গরদের চাদর। পায়ে ফুলকাটা মোজা ও কার্পেটের জুতো। মাথায় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ সুবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম; ললাটে প্রতিভার দীপ্তি; বঙ্কিম ভ্রূলতার নিম্নে নীলোৎপল নেত্র। মুখখানি মধুর হাস্যশ্রীতে সমুজ্জ্বল। বলিতে কি, এই গৌরবর্ণ যুবকের মত সুশ্রী পুরুষ আমি খুব কমই দেখিয়াছি।

আমার সঙ্গে সেই যুবকের আলাপ পরিচয়ের জন্য দাদা তাঁহার হাত ধরিয়া আমার কাছে আনিলেন এবং আমাকে কহিলেন:—

"ইনি মিষ্টার রায়। বিলাত হতে ফিরে এসেছেন—আমার বন্ধু।"

যুবকটি বিলাতি কায়দা অনুসারে আমার করস্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। আমি পশ্চাৎদিকে একটু সরিয়া গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তখন তিনিও আমাকে নমস্কার করিলেন। আমার দাদা কহিলেন:—

"তুমি ত সান্ধ্য-সমিতিতেই যাবে, এস না এক সঙ্গেই যাওয়া যা'ক।"

যুবকটি দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। একটি লজ্জানম্র-মধুর শ্রীতে তাঁহার মুখখানি আরও সুন্দর হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি সঙ্কোচে আর বেশি কথা কহিতে পারিলেন না। বাহিরের রাজপথের জনতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলিতে লজ্জা করে, আমি এই সুযোগে দুই নয়ন ভরিয়া যুবকের নিরুপম মুখশ্রী দর্শন করিতে লাগিলাম। হঠাৎ যুবকটি সতৃষ্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন; চারি চক্ষুর মিলন হইল; লজ্জায় আমার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলাম, আর একটি বারও মাথা উঁচু করিয়া কোন দিকে চাহিতে পারি নাই। হয় ত যুবকটি আমার এই সলজ্জভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সতৃষ্ণ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু সান্ধ্য-সমিতির গৃহে প্রবেশ করিয়াই গা-ঢাকা দিয়াছিলাম।

কথাটা গোপন রাখিয়া আর কি হইবে? সেদিন রাত্রিকালে আমার ভাল ঘুম হয় নাই। সেই যুবকের সুন্দর মুখখানি বার বার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। লজ্জায় আকুল হইয়া আপনিই আপনাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলাম:—

"ছি ছি, এমন করিয়া কি কোন পুরুষের কথা চিন্তা করা উচিত? এই মুহূর্ত্তেই জেঠা মহাশয় যদি আমার মন দেখিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে কি হইত? তিনি আমাকে কি বলিতেন? তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের পরিণাম কি এই?"

পরদিন সকালে বউদিদি হাসিতে হাসিতে আমার ঘরে আসিয়া কহিলেন—'কি গো? কালকের সেই বাবুটিকে কেমন লাগল? খুব সুন্দর, দেখলেই মুগ্ধ হতে হয়! কেমন তাই না?"

সেকি! বউদিদি কি তবে মিষ্টার রায়কে জানেন? তিনি কহিলেন—"অনেক দিন আগেই ত তোমাকে বিয়ের কথা বলেছি। ছেলেটির নাম যে শৈলেন্দ্র তাও হয় ত মনে আছে। শৈলেন্দ্রই হচ্ছে মিষ্টার রায়। কাল তার সঙ্গে তোমার দেখাশুনা হয়ে গিয়েছে। ছেলেটি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান; বাপের অনেক টাকা আছে। আমাদের এ বিয়েতে মত হয়েছে। এখন তোমার মন পাবার জন্যই যত ফিকির ফন্দী। ছেলে ত তোমার জন্য আকুল হয়ে আছে।"

বউদিদির কথা শুনিয়া মনের মধ্যে যে কি ভাব জাগিয়া উঠিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হায়, এ বিবাহে মা কিম্বা জেঠা মহাশয়ের যে মত নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই সময় জেঠা মহাশয় পঞ্জাবে এবং মা মামার বাড়ীতে গিয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আজ আমাদের বাড়ীতে শৈলেন বাবুর নিমন্ত্রণ। আহারের পর কিছুক্ষণ গল্প চলিল। তাহার পর দাদা বউদিদি দুজনেই সরিয়া পড়িলেন। আমি চেয়ারে বসিয়া সাম্‌নের টেবিলের একখানা বহির পাতা উল্টা-ইতে লাগিলাম। শৈলেন বাবু কহিলেন:—

"ওখানা কি বই?"

আমি। রাজা ও রাণী নাটক।

শৈলেন। বইখানা বুঝি আপনার খুব ভাল লাগে?

আমি। আমার ত ভালই লাগে। তবে দাদা বলেন বইখানি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট, কিন্তু নাট্যকলার হিসাবে একেবারে নিখুঁত নয়।

শৈলেন। এই নাটকের পুরুষ রমণীদিগের ভিতর সব চেয়ে আপনার কাকে ভাল লাগে?

আমি। সব চেয়ে? কুমার সেনকে—না, বোধ হয় ইলাকেই ভাল লাগে। তবে হিসাব করে সমালোচনা করতে হলে সুমিত্রারই প্রশংসা করতে হয়।

শৈলেন। আপনাকে যদি ইলার গুটি কয়েক কথা পাঠ করে শুনাতে অনুরোধ করি, তা হলে কি অপরাধ হবে?

আমি লজ্জায় কাতর হইয়া এক হাতে অন্য হাতের আঙ্গুলগুলি লইয়া টিপিতে লাগিলাম। একটু পরে কহিলাম:—

"আজ আমাকে মাফ করুন, আর একদিন পড়ে শুনাব।"

শৈলেন। আপনি আমাকে নিতান্তই পর মনে করেন, নইলে কি পুস্তকের একটি পাতার একটুখানি পড়ে শুনাতে আপনার এত লজ্জা হত?

আর কি করি? অতি কষ্টে পড়িতে আরম্ভ করি-লাম:—

"ইলা। এ কি দুঃখগান?

শোনায় গভীর সুখ দুঃখের মতন

উদার উদাস। সুখ দুঃখ ছেড়ে দিয়ে

আত্ম-বিসর্জ্জন করি রমণীর সুখ।"

এইটুকু পড়িয়া একটু থামিলেই শৈলেন বাবু কহি-লেন—"আপনার কি মধুর কণ্ঠ! এমন আবৃত্তি আমি আর কখনই শুনি নাই।"

আমার পড়া ঐখানেই শেষ হইল। চেষ্টা করিয়াও আর পড়িতে পারিলাম না। গলার স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তখন শৈলেন বাবু স্বয়ংই বইখানি হস্তে লইয়া পড়িতে লাগিলেন:—

"কুমার।

"পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।

আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া

বিশ্বমাঝে। শ্রান্তিহীন কর্ম্মসুখ তরে

ধায় হিয়া। চিরকীর্ত্তি করিয়া অর্জ্জন

তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

শৈলেন বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বউদিদি গৃহে প্রবেশ করিলেন। এইবার আমি খুব সেয়ানার মত কাজ করিলাম। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িলাম।

ইহার পর আমাদের বিবাহ এক রকম ঠিক হইবার মতই হইল। দাদা ও বউদিদির মত হইয়াছে। মায়ের অনুমতি পাইলেই পাকাপাকি কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া যাইবে।

এখন প্রায় প্রতি রবিবারে আমাদের বাড়ীতে শৈলেন বাবুর নিমন্ত্রণ হইত। তিনি প্রসন্ন মনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। আমার ইচ্ছা হইত, প্রাণ খুলিয়া কথা কহিয়া, গান শুনাইয়া এবং ভালবাসা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সুখী করি। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিতাম না। তবু আজ আহারের সময় আমি পরিবেশন করিতে গেলাম, হায়, যে নাকাল হইলাম তাহা আর কাহাকে বলি? শৈলেন বাবুর পাতে ডিমের ডালনা দিতে না দিতেই আমার শাড়ীর আঁচলশুদ্ধ চাবির গোচ্ছা তাঁহার থালায় পড়িয়া গেল। আমি লজ্জায় বাঁচি না, আর বউদিদি হাসিয়াই খুন! ইহাকেই বলে কাহারো সর্ব্বনাশ কাহারো পৌষ মাস।

আজ সন্ধ্যার পর শৈলেন বাবু আমার গান শুনিবার জন্য জেদ আরম্ভ করিলেন। লজ্জা দূর করিবার জন্য প্রথমেই বউদিদি গান ধরিলেন। তাহার পর আমি এস্রাজ বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু গানের মাঝখানেই বউদিদি আমাকে একলা ফেলিয়া পলাইয়া গেলেন। আমি চালাকি করিয়া তৎক্ষণাৎ এস্রাজের তার ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। তখন গান বন্ধ হইল। শৈলেন বাবু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন :—

"আপনি কি আমাকে একটুকু ভালবাসতে পারেন নাই? নইলে বউদিদির পালাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পালাবার ফন্দী কচ্ছেন কেন? আমি এতদিন ধরে আপনার ভালবাসার জন্য আকুল হয়ে আছি, আর আপনি একটা গান শুনাতেও পারেন না।"

আমি মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। মনে মনে সংকল্প করিলাম, আজ যেমন করিয়াই হো'ক শৈলেন বাবুকে সুখী করিতেই হইবে। একটু পরে হাতের আঙ্গুল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কহিলাম :—

"আপনি সাত দিন পরে আমাদের বাড়ী আসেন কেন? এখন থেকে প্রতিদিনই আসতে হবে।"

শৈলেন। তা'হলে আপনি সুখী হবেন?

আমি। খুব সুখী হব।

শৈলেন। তবে কি আমাকে ভালবাসেন?

আমি। ভাল না বাসলে কি রোজ আপনাকে আসতে বলি।

শৈলেন। কতটুকু ভালবাসেন তাকি জিজ্ঞেস করতে পারি?

আমি। আগে বলুন আমাকে কতটুকু ভালবাসেন?

শৈলেন। পুষ্পের ভিতর যেমন সুধা লুকানো থাকে, তেমনি আমারও কোমল মর্ম্মস্থানে অনেকখানি ভালবাসা লুকানো ছিল; কিন্তু সকলই আপনাকে সমর্পণ করেছি।

আমি। আমি কি এত ভালবাসা পাবার উপযুক্ত পাত্রী? তাহা ত নই।

শৈলেন। আমার সঙ্গেত মিশ্ছেন, এর পরে দেখবেন সৌভাগ্যবশতঃই আপনার অনুগ্রহের পাত্র হতে পেরেছি; নচেৎ আপনার প্রীতি আকর্ষণ করবার মত কোন যোগ্যতাই আমার নাই।

আমি। আপনার কি আছে, কি নেই, আমি তা জানতে চাইনে। ঈশ্বর করুন আমার জীবন দিয়ে আপনাকে যেন সুখী করতে পারি।

শৈলেন। হিন্দুনারীর প্রেম এমন নির্ম্মল, এমন গভীরই বটে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মায়ের অনুমতি লইয়া একদিন প্রকাশ্যভাবে বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করা আবশ্যক। সেজন্য দাদা মাকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। কিন্তু এই বিবাহে মায়ের অনুমতি পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তিনি দাদাকে তাঁহার অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আমি মায়ের কাছে শৈলেন্দ্রের বিলাতের কাহিনী শুনিতে পাইলাম। কিন্তু তখন আমি ভালবাসার আত্মহারা। তাই মনে ভাবিলাম :—

"শৈলেন্দ্র তরুণ যৌবনের চপলতা-বশতঃ বিলাতে কবে কোথায় কি করিয়াছে, অতকথা ভাবিয়া কি হইবে? এখন ত তিনি ভাল। মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল, তাহাও আমার অনুরোধে ত্যাগ করিয়াছেন। তবে কোন ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস নাই। তাহা কয়জন শিক্ষিত যুবকেরই বা আছে? জেঠা মহাশয় স্বয়ং আমাকে ভাগবত পড়াইলেন; কই; আমি ত ধর্ম্মলাভ করিতে পারিলাম না? তবে

ধর্ম্মের জন্য সময় সময় মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আজ যদি ঈশ্বর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হন; যে প্রেম মানুষকে অর্পণ করিতে যাইতেছি, তাহা তিনি কাড়িয়া লন, তবে যথার্থই আমার নারী-জীবন ধন্য মনে করি।"

মা ত কিছুতেই বিবাহে অনুমতি দিবেন না। কিন্তু জেঠা মহাশয়ের প্রকৃতি কি উদার; তিনি কলিকাতায় আসিলে পর, আমি ভয়ে ও লজ্জায় এক দিনও তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম না। অথচ তিনি মাকে কহিলেন—

"হেমের বয়স অল্প নয়; সে লেখা পড়া শিখেছে। সকল জেনে শুনেই শৈলেন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করবে বলে মনে করেছে। এখন আর এ বিবাহে বাধা দেওয়া উচিত নয়। ফলদাতা ঈশ্বর, আপনি তাঁর করুণার উপর নির্ভর করে মত দিন।"

মা কিন্তু জেঠা মহাশয়ের কথা শুনিয়াই বিবাহে মত দিলেন। অথচ আমরা কেহই তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মনে করিলাম জেঠা মহাশয় এই বিবাহের ঘোর বিরোধী। তাঁহার পরামর্শ শুনিয়াই মা অনুমতি দিতে রাজি হন নাই।

আমাদের বিবাহ দস্তুরমত আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাতে ঠিক হইয়া গেল। মায়ের শরীর তত ভাল ছিল না। সেজন্য তিনি আবার বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। এই সময় জেঠা মহাশয় একদিন আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার আদাব কায়দা সব ঠিক্‌ঠাক। তিনি বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে বসিয়াই আমাকে খবর পাঠাইলেন। দাদা ভাবিলেন জেঠা মহাশয় আমাকে ফুসলাইয়া বিবাহ ভাঙ্গিবেন বলিয়াই আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছেন। একজন্য তিনি আমার ঘর জুড়িয়া বসিলেন। কহিলেন:—

"কিছুতেই তুমি প্রচারকের সঙ্গে দেখা করিতে পারবে না। তোমার কি একটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? আজ বাদে কাল যিনি তোমার স্বামী হবেন, প্রচারক তাকেই ঘৃণার চোখে দেখছে, এবং চারদিকে তার নিন্দা রটনা করছে; এ সত্ত্বেও তুমি যদি তার সঙ্গে দেখা কর, তা হলে শৈলেনের অপমান করা হবে।"

এ কথার পর আমি আর জেঠা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে সাহস করিলাম না। শুধু তাহাই নহে। দাদার নিতান্ত অনুরোধে মিথ্যা লিখিতে বাধ্য হইলাম। লিখিলাম:—

"আজ আমার মন বড় খারাপ। আপনার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিব না। সেজন্য দেখা করিতে পারিলাম না। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

চিঠিতে যে একেবারে মিথ্যা কথা, জেঠা মহাশয়ের আর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি আমার দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাহার পর তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহিরে যাইবার জন্য অন্তঃপুরের নিকট দিয়া সোজা রাস্তায় চলিলেন। এমন সময় দাদা তাঁহাকে অন্তঃপুরের দিকে যাইতে দেখিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইলেন। তিনি চিঠি অগ্রাহ্য করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন বলিয়াই দাদার বিশ্বাস জন্মিল। দাদা দারোয়ানকে ধমক দিয়া কহিলেন:—

"তুই এই লোকটাকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিয়েছিস কেন? এখনি গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দে।" এই কথা শুনিয়াই জেঠা মহাশয় বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গেল। সেই অবস্থা দেখিয়া দাদার পাষাণ প্রাণও আর্দ্র হইল। তৎক্ষণাৎ জেঠা মহাশয়ের কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহা পারিলেন না। আমি এ ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলাম না।

জেঠা মহাশয় বাসায় গিয়া সকল ঘটনা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহা পারিলেন না। আজ শৈলেন্দ্রের জন্মদিন; সেজন্য আমাদের বাড়ীতে খুব আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাত্রি আটটার সময় আমরা আমোদের নেশায় মাতিয়া উঠিয়া "রাজা ও রাণী" নাটকের একটি অঙ্ক অভিনয় করিতেছিলাম; আর সেই সময় জেঠা মহাশয় অশ্রুপাত করিতে করিতে ভাবিতে ছিলেন:—

"তবে কি যথার্থই ঘোর কলি ঘনায়ে এল? আমি

যে হেমকে নিজের কন্যা মনে করে কত শিক্ষা দিয়েছি, ধর্মশীলা হবে বলে কত আশা করেছি; আজ সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করল। হে ভগবান, তুমি হেমকে অধর্ম্ম হতে রক্ষা কর।"

এখনও ঘোর কলি ঘনায়ে আসে নাই। সংসারে ধর্ম্ম আছে। তাই জেঠা মহাশয়ের প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু অভিশাপ হইয়া আমার মস্তকের উপর পতিত হইল; আবার তাঁহার প্রার্থনাই আমাকে অকল্যাণের পথ হইতে কল্যাণের পথে রক্ষা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শৈলেন্দ্রের গৃহে তাঁহার বাপ আছেন, মা নাই। মা নাই বলিয়া আমার বড় দুঃখ হয়। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আমি এক মা ছাড়িয়া আর এক নূতন মা পাইতাম। শৈলেনের বাবা আমাকে দেখিয়া বড় খুসী হইয়াছেন। বিবাহ ঠিক্ হওয়ার দিন আশীর্ব্বাদ করিয়া একটি নেকলেস উপহার দিয়াছেন। ঐ নেকলেসের চেয়ে আমার আরও খুব ভাল নেকলেস আছে। তবু কোথাও যাইবার সময় ঐ নূতন নেকলেসটি গলায় পরি। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করেন :—

"ভাই, এ নূতন নেকলেসটি কবে কিনেছ ?"

আমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠি—"কিনব কেন ? যিনি আমার শ্বশুর হবেন, তিনি যে ইটি উপহার দিয়েছেন।"

শ্বশুরের উপহার—ইহা চিন্তা করিতেও নারী-হৃদয় কেমন এক গর্ব্ব অনুভব করে। আমি মনে ভাবিতাম, আমার শাশুড়ী নাই, আহা শ্বশুরের কি কষ্ট! কে তাঁহার সেবা করে ? বিবাহের পর প্রাণপণ করিয়া তাঁহার সেবা করিব।

এতদিন রান্নাবান্না কিছুই শিখি নাই। এখন শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই সে দিন পূর্ব্ববঙ্গের এক রকম মিঠাই তৈরী করিয়া শৈলেন বাবুকে খাওয়াইয়াছিলাম। তাঁহার মুখে ত প্রশংসা আর ধরে না। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া জলখাবারগুলি স্বহস্তে প্রস্তুত করিব। নারীর আর কি সুখ ? শ্বশুর ও স্বামীর সেবাতেই নারী-প্রকৃতির পরিতৃপ্তি।

আমি যখন বসিয়া বসিয়া এই সকল বিষয় কল্পনা করি, তখনই বউদিদি আসিয়া পরিহাস আরম্ভ করেন। বলেন :—

"গম্ভীর ও মৌনী হয়ে মনে মনে কার ধ্যান হচ্ছে ?"

আমি। ধ্যান যার করতে হয়, তারই ধ্যান কচ্ছি।

বউদি। নিশ্চয়ই নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান করতে বস নাই। হয় ত খুব সুন্দর কোন সাকার মূর্ত্তির ধ্যানে মগ্ন আছ।

আমি। মনে মনে যা জান, তা আর মুখে বলে সময় নষ্ট কর কেন ?

বউদি। বলে যে সুখ পাই।

বউদিদি যথার্থই আমাকে খুব ভালবাসেন, আমার সুখে সুখী হন। তিনি বলেন—"নব বসন্তের আবির্ভাবে তরুলতা যেমন পুষ্প ও কিশলয়ে রমণীয় শ্রী ধারণ করে, তেমনি নব প্রেমের আবির্ভাবে তোমার মুখশ্রী এক নবীন সৌন্দর্য্যে মনোহর হইয়া উঠিয়াছে।" বউদিদি শুধু এই কথা বলিয়াই থামিতে পারেন না। তিনি কাব্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন—প্রেমের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই নারী সৌন্দর্য্যে ও হৃদয়-মাহাত্ম্যে মহীয়সী হন। যে সকল রমণীর মনোবৃত্তি ধর্ম্মের আলোকে বিকশিত হয়, এ কথা তাঁহাদের পক্ষেই শোভা পায়; আমার পক্ষে শোভা পায় না।

ইহার পর একটি ঘটনা ঘটিল। শৈলেন বাবুর পিতার হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা ছিল। মোকদ্দমায় যে তিনি জিতিবেন, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সময়কালে তিনি হারিয়া গেলেন। সকলেই তাঁহাকে বিলাত আপীল করিতে পরামর্শ দিলেন। অনেক দিন হইতেই তাঁহার ইংলণ্ডে যাইতে ইচ্ছা ছিল। এখন স্বয়ংই বিলাত গমন করিয়া মোকদ্দমার আপীল দায়ের করিতে প্রস্তুত হইলেন। ছেলেকে কহিলেন :—

"এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করতে না পারলে অনেক সম্পত্তি অন্তের হাতে যাবে। তোমার সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে। সেজন্য আমার সঙ্গেই তোমাকে বিলাত নিয়ে যাব। তুমি ত সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছিলে।

এখন কয়েক মাস চেষ্টা করলেই ব্যারিষ্টার হয়ে আসতে পারবে। তা হলে তোমার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব।”

শৈলেন্দ্র আমাকে কলিকাতা রাখিয়া ইন্দ্রের অমরাপুরীতে যাইতেও প্রস্তুত নহেন। অথচ পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করিবার শক্তিও তাঁহার নাই। পিতার চিত্ত অতিশয় দৃঢ় এবং তিনি তেজস্বী পুরুষ। ছেলে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে চলিলেই তিনি তাঁহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন। শৈলেন্দ্র পিতাকে কহিলেন :—
“বিলাত যাবার আগে আমাদের বিবাহ হো'ক, তার পর হেমলতাকে নিয়েই বিলাত যাব।”

পিতা বুদ্ধিমান। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বধূ সঙ্গে থাকিলে শৈলেন্দ্র পরীক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু পাশ হইবার কোন আশা থাকিবে না। তাহা ছাড়া খুব তাড়াতাড়ি বিলাত যাওয়া আবশ্যক; অথচ শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হইবার মত কোন আয়োজনই নাই। কাজেই শৈলেন্দ্র পিতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বিলাত যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তিনি যে দিন আমাকে বিলাত যাত্রার কথা বলিলেন, সেদিন চোখের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শৈলেন্দ্রনাথ প্রেমে পূর্ণ হইয়া কহিলেন :—

“প্রেমময়ি-নারী, কিশলয়ের কোমলতা, কুসুমের সুষমা ও শিশুর সরলতায় তোমার হৃদয়টুকু নির্ম্মিত; তোমার পক্ষে অশ্রুপাত স্বাভাবিক; কিন্তু আমি ত তোমার সজল নয়ন আর দেখতে পারি না। তুমি ধৈর্য্য ধর, কিছুদিন সহ্য করে থাক; বিলাত থেকে ফিরে এসে তোমার ঐ মধুর প্রেমে আমার প্রবাসের সমুদয় ক্লেশ ভুলে যাব।”

অবশেষে বিলাত যাত্রার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন কে আর আমার কান্না থামাইবে? শৈলেন্দ্রনাথ রুমালে আমার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন :—

“লক্ষ্মীটি, আর কেঁদ না; আমি তোমার মুখে হাসি দেখতে চাই; আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দাও।”

আমি। অতদিন কি করে থাকব? আমি তোমাকে যেতে দিব না।

শৈলেন। তুমি যেতে না দিলে আমি কি যেতে পারি? স্থির হও; একবার আমার পানে ফিরে চাও; আমাকে যাবার অনুমতি দাও।

হেমন্তের প্রভাতে শেফালিকা ফুলের গাছে নাড়া দিলে যেমন একটি পাতার শিশির আর একটি পাতার শিশিরের সঙ্গে মিশিয়া যায়; তেমনি আমার চোখের জলের সঙ্গে শৈলেন্দ্রনাথের অশ্রুজল মিশিয়া যাইতে লাগিল। আমার অশ্রুর সঙ্গে অশ্রু বিনিময় করিয়াই তিনি বিদায় হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শৈলেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া আমাকে খুব সুন্দর একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার পর যে দিন বিলাতের ডাক বিলি হইবে, সে দিন আমি পথের পানে চাহিয়া থাকিতাম। শৈলেন্দ্রনাথের চিঠি পাইলেই উহা লইয়া শয়ন ঘরে প্রবেশ করিতাম। পড়িতে পড়িতে প্রেমে ও পুলকে আমার হৃদয়ের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

ইহার পর ইংলণ্ডে শৈলেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইল। তাহার তিন মাস পরে শৈলেন্দ্রের চিঠির সংখ্যা অল্প ও সংবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। আমি মনে করিলাম, তিনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পাঁচ মাস পরে খবর আসিল, শৈলেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে যে ইংরাজ মহিলার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই পরিণয়ের সংবাদ পাইয়া শৈ[illegible] বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন—ইংরাজ মহিলার প্রেম শৈলেন্দ্রের বক্ষপঞ্জরের মধ্যে সুপ্ত হইয়াছিল; এখন তাহার শুভ্র নির্ম্মল মুখশ্রী দেখিয়া আবার [illegible] উঠিয়াছে; সেই জন্যই শৈলেন্দ্র বিবাহ করিয়াছেন।

আবার কেহ বলিল, ইংরাজ মহিলার বাপ বড় শক্ত লোক। শৈলেন তাঁহার তাড়া খাইয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এ সকল বিষয়ে আমার কোনরূপ [illegible] করিবার শক্তি ছিল না। আমি দুই চোখে শুধুই অন্ধকার দেখিতে

লাগিলাম। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ভয়ে ভীত হইয়া জননীর স্নেহের ভিতর আশ্রয় পাইবার জন্য ছুটিয়া চলিলাম।

হায়, এতদিন সুখের স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া জননীর স্নেহের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আজ সংসার সাগরের কোথাও আর কূল কিনারা না দেখিয়া জননীর স্নেহকেই বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। বিবাহের প্রস্তাব হওয়ার পর হইতে আমি কি মাতার নিকট সহস্র অপরাধ করি নাই? তবু জননী আমার হৃদয়ে স্নেহ-সুধা ঢালিয়া দিলেন। মাতার স্নেহের তুলনায় বন্ধুত্ব প্রণয় সকলই যে অতি তুচ্ছ সামগ্রী—তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। আমি মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা কহিলেন:—

"মা আমার, লক্ষ্মী আমার, তুই কাঁদিস নে। তোর দুঃখ দেখে বুক যে ভেঙ্গে যায়। শান্ত হয়ে চল, একবার তোর মামার বাড়ী বেড়ায়ে আসি।"

আমি। মা, কি করে শান্ত হব? মনে বড় জ্বালা প্রাণে বড় ব্যথা।

মা। ব্যথাহারী হরিকে একবার ডাক্। তা হলে সকল জ্বালা জুড়ায়ে যাবে।

আমি। ডাক্‌তে ত ইচ্ছা হয়; ডাক্‌তে যে পারি না। সুখের সময় তাঁকে ডাকি নাই, আজ দুঃখের সময় ডাকলে কি তিনি শুনবেন?

মা। তবে তোর জেঠা মহাশয়ের কাছেই একবার খবর পাঠাই।

আমি। আমার শুধু তাঁকেই মনে পড়চে। তিনিই আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন। কিন্তু আমরা তাঁকে যে অপমান করে তাড়িয়েছি, তিনি কি আর ফিরে আমাদের বাড়ী আসবেন?

মা। তুই তাঁকে চিন্‌তে পারিস নাই। দেবতার মত ক্ষমা ও করুণা দুই তাঁর হৃদয়ের পাশা পাশি হয়ে রয়েছে।

মা একখানি চিঠিতে আমার সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লিখিলেন। জেঠা মহাশয় চিঠিখানা পাইয়াই আমার কাছে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার একজন অনুগত যুবক নিকটে ছিলেন; তিনি কহিলেন, "তারা ত ইচ্ছা করেই আপনার অপমান করেছে। আবার আপনি তাঁদের বাড়ীতে যাবেন?"

জেঠা মহাশয় কহিলেন—"তুমি বল কি? আমি যাব না? এই ত্রিশ বৎসর হল ঈশ্বরের ভৃত্য হয়েছি, তাঁর চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি; আর কি আমিত্বের অভিমান শোভা পায়? আজ যে ধনের অহঙ্কারে গর্ব্বিত হয়ে মাথায় পা তুলবে,কাল তার দুঃখের আর্ত্তনাদ শুনতে পেলে, তাকেই বুকে জড়ায়ে ধরব। আমি মানুষের সুখের দিনে কেউ নই, আমার কি আছে যে সুখের দিনে লোকের আনন্দের মাত্রা একটুকু বৃদ্ধি করব? কিন্তু দুঃখের দিনে আমি মানুষের বন্ধু। আমার হৃদয়ের প্রেম ঈশ্বরকে এবং বুকের ভালবাসা মানুষকে দিব—এই ত জীবনের উদ্দেশ্য। যে কয়টি দিন বেঁচে আছি, যদি শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে পারি, দুঃখীর দুঃখ দূর করতে পারি, পাপীর মন ঈশ্বরের দিকে ফিরায়ে দিতে পারি, তা হলেই জন্ম সার্থক। নচেৎ এই বৃদ্ধ বয়সে দেহের বোঝা বহন করে আর লাভ কি?"

জেঠা মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আসিতেই, মা তাঁহাকে লইয়া আমার শোবার ঘরে আসিলেন। আমি তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। তিনি গভীর স্নেহে পূর্ণ হইয়া আমার মস্তকে হাত রাখিলেন এবং উপাসনা করিতে লাগিলেন।

আমি ত কতদিন জেঠা মহাশয়ের মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিয়াছি; কোন দিন ত আমার হৃদয় আর্দ্র হয় নাই; আজ তাঁহার উপাসনার এক একটি বাক্য শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—ঈশ্বরের নাম কি মিষ্ট! আমার মনে হইল, ধীরে ধীরে কোমল মর্ম্মস্থানে যেন একটি শান্তির অমৃত-ধারা প্রবেশ করিতেছে।

জেঠা মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া উপাসনা করিলেন। তাহার পর চোখ মেলিলেন। একটি সরল হাস্যশ্রীতে মুখখানি রঞ্জিত হইল। তিনি সস্নেহে আমার মুখে হাত বুলাইয়া কহিলেন—

"মা, তোর কিসের দুঃখ? আমাকে বিশ্বাস কর;

আমি বলছি, সুখের দিন সাম্‌নে আস্‌ছে।”

ইহার পর একখানি গানের বহি হইতে একটি সঙ্গীত বাহির করিয়া আমাকে গাহিতে আদেশ করিলেন। আমি গাহিলাম :—

“আমি সংসারে মন দিয়েছিনু
তুমি আপনি সে মন নিয়েছ,
আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু
তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে।
সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে
কতদিকে কত খোঁজালে.
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে।
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে!
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে।”

আমার স্বর-তরঙ্গ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটী ভক্তিরস অন্তরে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গানটি গাহিতে লাগিলাম। আমার মুখের প্রসন্ন ভাব দেখিয়া মা অত্যন্ত সুখী হইলেন। জেঠা মহাশয় কহিলেন, “আজ এই গানের পদগুলিকে কবির কল্পিত রাশি রাশি শব্দ বলে মনে করো না। তোমার পক্ষে ইহার প্রত্যেকটি বর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়াবে।”

আমি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

জেঠা। আমি এখন তোমাকে গুটিকয়েক কথা বলব। সংসারের অধিকাংশ লোকই ভোগের লালসায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় এবং ঈশ্বরকে লাভ করতে পারলেই তৃপ্তি লাভ করা যায়। তুমি শৈশবের কুশিক্ষার জন্য ত্যাগের চেয়ে ভোগের পথকেই উৎকৃষ্ট ও ঈশ্বরের প্রেমের চেয়ে মানুষের প্রেমই স্পৃহনীয় সামগ্রী বলে মনে করতে। সেজন্য ঈশ্বর তোমাকে একটি ঘটনার দ্বারা শিক্ষা দিলেন। এখন তোমার মনের বিকার দূর হবে মোহের ঘোর কেটে যাবে; দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য স্বার্থত্যাগ করে যে আনন্দ, ঈশ্বরের প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করে যে তৃপ্তি;—তা লাভ করবার নিমিত্ত তোমার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠবে। ঈশ্বরের নিকট যে যা পাবার জন্য যথার্থ ব্যাকুল হয়, সে তাই পায়। তুমি জীবনের নির্ম্মল আনন্দ ও দিব্য সুখ প্রাপ্ত হবে এবং নারীজন্ম সার্থক করতে পারবে।”

জেঠা মহাশয় এমন দৃঢ়তা ও পরিপূর্ণ ভাবের সহিত এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিলেন যে, ইহার প্রত্যেকটি কথায় আমার বিশ্বাস জন্মিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলাম। মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলাম। এক একটি দিন উপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আত্মচিন্তা করিয়া কাটাইতে লাগিলাম।

ইহার পর একদিন উপাসনার সময় একটি আনন্দ আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই আনন্দ সমস্ত হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আমি আর কি বলিব? জীবনে অনেক সুখ ভোগ করিয়াছি; কিন্তু এইরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। ইচ্ছা হইল, মাকে একবার ডাকি। কিন্তু বাক্যস্ফুরণ হইল না, নয়নের পাতাও নড়িল না; আমি আলোকে পুলকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। তাহার পর বলিতে লাগিলাম—

“আমার প্রিয়তম দেবতা, এ কি তোমারই আনন্দ-রূপের প্রকাশ!”

আমি প্রায় দুই ঘণ্টা উপাসনায় নিমগ্ন থাকিয়া আনন্দ উপভোগ করিলাম। তাহার পর আমার প্রার্থনার ভাব লইয়া একটি সঙ্গীত রচনা করিতে বসিলাম। বিস্তর ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাব্য পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কোন দিন এক ছত্র কবিতা লিখি নাই। আজ অতি সহজেই আমার হৃদয় হইতে সঙ্গীতের এই পদগুলি বাহির হইল :—

এত দিন পরে বুঝিনু হে নাথ,
তোমারে না পেলে আর,
জুড়াবে না প্রাণ যাবে না যাতনা
যাবে না হৃদয় ভার।

হবে না নির্ম্মল মলিন এ মন
ছিন্ন বাসনার পাশ,
মিটিবে না তৃষা তৃষিত চিত্তের
অতৃপ্ত প্রাণের আশ।

তাই নাথ আজি এসেছি নিকটে
মরম-বেদনা লয়ে,
কত দিন হায় শূন্য মরু মাঝে
ভ্রমেছি তৃষার্ত্ত হয়ে।

সুখের আশায় বাসনা অনল
জ্বালাইয়া অহর্নিশ,
শান্তি শান্তি করি করিয়াছি পান
বিষয়ের তীব্র বিষ।

তুমি প্রেমময় অতুল তোমার
প্রীতি আমি পাশরিয়া,
মোহের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছি
প্রেম লভিবারে গিয়া।

আর যেন নাথ, শান্তি শান্তি করি
সংসারে না ছুটে যাই,
তোমার মাঝারে আছে সর্ব্ব সুখ
দুঃখ ত তোমাতে নাই।

তোমাতেই যেন খুঁজি জীবনের
চিরতৃপ্তি চিরকাল।
তোমার মধুর রূপে যা'ক চলে
রূপের কুহক-জাল।

হে প্রেমনির্ঝর সর্ব্বপ্রেম-তৃষ্ণা
মিটে যাক প্রেমে তব,
মুগ্ধ করে যাক দেখায়ে চিন্ময়
নিত্যরূপ নব নব।

আমি প্রতিদিন উপাসনার পর এই সঙ্গীত করিতাম। এই সঙ্গীতটী যেন আমার দুর্ব্বল হস্ত ধরিয়া ধর্ম্মরাজ্যে লইয়া যাইতে লাগিল। আমার অন্তরে ভক্তির স্ফুরণ হইল ভক্তির রসধারায় জীবন মধুময় হইয়া গেল।

আমি নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, অনেক মানুষই ত বলিয়া থাকে, ঈশ্বরকে পাইলেই প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায়; নতুবা আর কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। অথচ সকলেই সুখ সুখ করিয়া সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়; ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য একটু পরিশ্রম করিতে চায় না।

আসল কথা মানুষ একটা সংস্কারবশতঃ মুখেই উহা বলে, কিন্তু মনের মধ্যে সংশয়; যথার্থই যে ঈশ্বর আনন্দ রূপে প্রকাশিত হন, এবং অন্তরে বাহিরে তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাইলেই মানবজন্ম সার্থক হয়, এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন না।

হে ভগবান, মানুষ যেমন উদ্যানের পুষ্প চয়ন করিয়া দেবতার চরণে অর্পণ করে, তেমনি আমার জীবন তোমার চরণে অর্পণ করিব। তুমি আমাকে আরও ভক্তি দাও, আমার নারী-হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার কর, আমি অবিশ্বাসী নরনারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলি—

ধর্ম্ম মিথ্যা নয়; ঈশ্বর আছেন; তাঁহাকে ব্যাকুল অন্তরে ডাকিলেই তিনি আনন্দরূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার আনন্দরূপ নিরীক্ষণ করিলেই মানুষ এই সংসারে প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সমাপ্ত।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

গার্হস্থ্য ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

যদ্দেশোৎপন্নং যদ্দ্রব্যং তদ্দেশে তস্মহৌষধম্।

মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ আরোগ্যার্থে আমাদের চতুর্দ্দিকে বিবিধ রোগের অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যে সমস্ত ঔষধ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, বড় দুঃখের বিষয়—সে সকলের পরিচয় ও ব্যবহার অনেকেই জানেন না। চতুষ্পার্শ্বে এই সমস্ত অমূল্য রত্ন থাকিতে, আমরা পদে পদে যে পরের শরণাপন্ন হই, ইহা কেবল অল্প কষ্টের কথা নহে।

এক সময়ে আমাদের দেশে গার্হস্থ্য ভৈষজ্য বিদ্যার বিশেষ আলোচনা ছিল। তখন আর কথায় কথায় ডাক্তার, বৈদ্য ডাকিতে হইত না। সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসা, বাটীর বর্ষিয়সী মহিলারাই সম্পন্ন করিতেন।

রোগ-প্রবণতা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এসম্বন্ধে এখন বিশেষ আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আশা করি,—এই প্রবন্ধ পাঠে আমাদের পাঠক পাঠিকারা নিজ পরিবার এবং প্রতিবেশীগণের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

অনন্তমূল।

নামান্তর :—শারিবা, অনন্তা, উপলসরী।

পরিচয় :—অ্যাস্‌ক্লেপিয়াডেসি জাতীয় হেমিডেস্‌মস্ ইণ্ডিকস্ নামক লতার মূল। দেখিতে ঈষৎ পীত মিশ্রিত পাটল বর্ণ, নলাকার বক্র, দীর্ঘভাবে সীতাযুক্ত ও ঈষৎ তিক্তাস্বাদযুক্ত। ভারতের নিম্ন প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই সাধারণতঃ জন্মে। ঔষধার্থ মূল ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া :—পরিবর্ত্তক, বলকারক, ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক।

আময়িক প্রয়োগ।

সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্যে, পুরাতন উপদংশ জনিত বাত, ক্ষত ও চর্ম্মপীড়ায় প্রয়োজ্য। যে সমস্ত রোগে জ্যামেকা সারসাপ্যারিলা ব্যবহার হয়, তৎপরিবর্ত্তে ইহা সচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাক্তার ওসানিসি ইহাকে সারসাপ্যারিলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন। পৈত্রিক উপদংশগ্রস্ত শিশুদের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকার জনক।

অনন্তমূল মুখে রাখিয়া চর্ব্বণ করিলে মুখের ঘায়ের উপকার হয়।

প্রয়োগরূপ।

অনন্তমূলের কাথ। অনন্তমূল দুই ছটাক, জল দেড় সের, আবৃত পাত্রে অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মাত্রা :—পূর্ণ বয়স্কের জন্য অর্দ্ধ ছটাক হইতে এক ছটাক অথবা এক আউন্স হইতে দুই আউন্স। বালকদের জন্য এক কাচ্চা বা চারি ড্রাম। শিশুদের জন্য সিকি কাচ্চা বা এক ড্রাম।

অপামার্গ।

নামান্তর :—আপাং, উবুৎনেঙ্গরা, চিরচিরা।

পরিচয় :—অ্যামারান্তেসি জাতীয় অ্যাচিরান্থিস্ অ্যাস্‌পেরা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ভারতের সকল প্রদেশেই সচরাচর জন্মে। ঔষধার্থ শাখা, পত্র ও মূল ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া :—সঙ্কোচক, মূত্রকারক ও পরিবর্ত্তক।

আময়িক প্রয়োগ।

উদরাময় ও আমাশয় রোগে ইহার কাথ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। সিবিল সার্জ্জন অবিনাশচন্দ্র ঘোষ আমাশয়ের রক্তস্রাবে ইহা অব্যর্থ ঔষধ মনে করেন। আপাংমূল চারি আনা, ডালিমের কুঁড়ি দুই আনা, ভালরূপ পেষণ করিয়া প্রাতে কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত সেব্য। দিবসের মধ্যে একবার মাত্র সেবন করিতে হয়।

স্ত্রীলোকদের ঋতুর সময়ে রক্তস্রাব অধিক হইতে থাকিলে ইহার মূল দুই আনা ৫। ৬টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করাইয়া বিশেষ উপকারিতা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

শ্বেত প্রদর রোগেও ইহার মূল বিশেষ ফলপ্রদ। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারের পর দুই আনা পরিমাণ কাঁচা মূল পানের সহিত চিবাইয়া খাইতে হয়। তিন মাস কাল এই প্রকার ব্যবহারে ৫। ৬টী প্রদরগ্রস্তা রোগিনী আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

মূত্রযন্ত্রের পীড়া জনিত উদরী রোগে ডাক্তার কার্ণিস ইহার কাথ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সন্তোষজনক ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার টর্ণর ও কানাইলাল দে বৃশ্চিকাদি বিষধর জন্তুর দংশনে ইহার পাতা ও সপুষ্প শাখাগ্র বাটিয়া স্থানিক প্রয়োগে উপকার লাভ করিয়াছেন।

ইহার মূলের রস আঘ্রাণে পালাজ্বর আরোগ্য হয় বলিয়া কথিত আছে।

অপামার্গ বীজ বাটিয়া ললাটের সম্মুখ ভাগে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ার আশু শান্তি হয়।

শুষ্ক কাশে অপামার্গ কাথ সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া সত্বর কাশের উপশম হয়।

ক্ষত রোগেরও ইহা একটী মহৌষধ। "বহরের ননী" নামক সুপ্রসিদ্ধ ঔষধের প্রধান উপাদানই আপাং। এই ননীতে ফোড়া, দদ্রু, কর্ণমুল, বাঘি, পৃষ্ঠাঘাত, নালী, পচা ঘা প্রভৃতি যে কত আরোগ্য হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

প্রয়োগরূপ।

অপামার্গ কাথ ঃ—সমগ্র আপাং গাছ এক ছটাক, জল এক সের, সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে ছাকিয়া লইবে।

মাত্রা ঃ—পূর্ণ বয়স্কের জন্য কাথ অর্দ্ধ ছটাক হইতে এক ছটাক বা এক আউন্স হইতে দুই আউন্স। বালকদের পক্ষে এক কাঁচ্চা বা ৪ ড্রাম। শিশুদের পক্ষে শিকি কাঁচ্চা বা এক ড্রাম।

অপামার্গ পত্রের রসের মাত্রা ঃ—পূর্ণ বয়স্কের জন্য অর্দ্ধ কাঁচ্চা বা দুই ড্রাম। বালকদের জন্য শিকি কাঁচ্চা বা এক ড্রাম। শিশুদের জন্য ১৫ বিন্দু, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেব্য।

মূলের মাত্রা ঃ—পূর্ণ বয়স্কের জন্য চারি আনা। বালকদের জন্য দুই আনা। শিশুদের জন্য এক আনা।

বহরের ননী ঃ—একটী ডাব নারিকেল ছোবড়া ছাড়াইয়া এবং ভিতরের শস্য ফেলিয়া ঐ নারিকেলের মালার বহির্দ্দেশে পুরু করিয়া মৃত্তিকা লেপনান্তর একটী ক্ষুদ্র চুল্লীর উপর বসাইবে। মালার মধ্যে অর্দ্ধ পোয়া গব্য নবনী রাখিয়া কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কোন ঝুনা নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া দ্বারা জ্বাল দেওয়া বিধি।

নবনীর ফেনা মজিয়া গেলে, কুচি কুচি করিয়া কাটা এক তোলা ছোট পিয়াজ নবনীর মধ্যে ভাজিবে। উত্তমরূপ ভাজা হইলে, পিয়াজগুলি তুলিয়া লইবে। তৎপর এক তোলা আপাং পত্রের রস নবনীর মধ্যে দিবে। ফেনা সম্পূর্ণ মজিয়া গেলে, চুল্লী হইতে নামাইয়া নবনী ছাকিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে। কেহ কেহ আপাং পত্রের রস দেওয়ার পরে, নবনীতে কিঞ্চিৎ গাঁজা প্রক্ষেপ করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাহা না দিলেও গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না।

নবনীর প্রয়োগ ঃ—কোন স্থানে প্রদাহ উৎপন্ন হইলে, নবনী দ্বারা সিক্ত ঐকখণ্ড বস্ত্র প্রদাহের উপরে সমগ্র স্থান ব্যাপিয়া রাখিবে। উক্ত বস্ত্র শুকাইয়া আসিলে পুনঃ পুনঃ নবনী প্রক্ষেপ করিয়া বস্ত্র সিক্ত রাখিতে হইবে। পূঁযোৎপত্তির পূর্ব্বে এই প্রক্রিয়াতে প্রদাহে আর পূঁযোৎপত্তি হইতে পারে না।

পূঁযোৎপত্তির পর এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলে, অধিকাংশ স্থলেই বিনা অস্ত্র প্রয়োগে আপনা হইতে প্রদাহ স্থল ফাটিয়া পূঁয বাহির হয়। কদাচিৎ অস্ত্র প্রয়োগ প্রয়োজন হইলেও অস্ত্র দ্বারা সামান্য একটুকু মুখ করিয়া দিলেই চলিতে পারে।

সাধারণ ঘায়ের উপর নবনীসিক্ত একখণ্ড বস্ত্র লাগাইয়া পুনঃ পুনঃ নবনী প্রক্ষেপে বস্ত্র সিক্ত রাখিবে। বাঘি, নালী প্রভৃতি গভীর ক্ষতে একখণ্ড পাতলা বস্ত্র ননীতে সিক্ত করিয়া ক্ষতের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই নবনীদ্বারা চিকিৎসা করিলে, ঘা ধুইবার অথবা অন্য কোন ঔষধের সাহায্যের আবশ্যক হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী, সরস্বতী।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিত, আমাদের পিসিমা তখন তাঁহার সান্ধ্য মালাজপ শেষ করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। অমনি, প্রদীপের সম্মুখে কঠোরমূর্ত্তি পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া উপবিষ্ট আমাদের মনের মধ্যে একটা চঞ্চলতা জাগিয়া উঠিত। তখন অতি অনায়াসেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম যে সে দিনের পাঠ শিখা হইয়া গিয়াছে, অথবা যাহা রহিয়াছে, তাহা আগামী কল্য প্রাতে সহজেই শিখা যাইবে। বিদ্রোহী মনকে এবম্বিধ উপায়ে শাসন করিয়া, সানন্দে পুস্তকের কবল হইতে মুক্ত হইয়া, মহা কোলাহলে পিসিমাকে ঘিরিয়া বসিতাম।

পিসিমা "পরণকথা" আরম্ভ করিতেন। সে কি কাহিনী! —কত রাজপুত্র, কত রাজকন্যা, কত সাত সমুদ্র তের নদী, কত সাতরাজার ধন এক মাণিক, কত সওদাগর, কত পাত্রের পুত্র কোটালের পুত্র;—কত সাত ভাই চম্পা, কত সুয়োরাণী কত দুয়োরাণী! আমরা অবাক হইয়া শুনিতাম,—"তারপর" পর্য্যন্ত বলিতে উৎসাহ থাকিত না! সম্মুখে দেখা যাইত, বাগানে দীর্ঘ দীর্ঘ সুপারী গাছগুলি অন্ধকারে প্রেতের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নারিকেল গাছের দুই একটি পত্র মাত্র শঙ্কিত ভাবে ধীরে ধীরে কম্পিত হইতেছে।

এই কথা সাহিত্য চির নবীন। বড় সুকুমার, বড় কোমল, বড় কল্পনাময়, —"বৃন্তহীন পুষ্পসম" আপনাতে আপনি বিকশিত; কিন্তু যুগ যুগান্ত ধরিয়া ইহারা একই ভাবে মাধুরী বিতরণ করিয়া আসিতেছে। যুগযুগান্ত ধরিয়া মানবের মন, শৈশবে ইহা হইতেই রস সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হইয়া আসিতেছে। এই কথা-সাহিত্য পৃথিবী ব্যাপী,—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে যেন ইহা এক বিশেষ রসমাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই রূপকথাগুলিকে স্থূলতঃ দুইভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলির উদ্দেশ্য কেবল শিশুদের মনোরঞ্জন, কতকগুলি সমভাবে সকলের উপভোগ্য। আমাদের দেশের দ্বিতীয় প্রকারের রূপকথাগুলি এমন কবিত্বপূর্ণ, যে যিনিই একবার ইহাদের একটিও শুনিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই ধরণের রূপকথাগুলিই আধুনিক সাহিত্যের উপন্যাস এবং ছোট গল্পের বীজ।

ঠিক কোন্ বৎসর হইতে যে বঙ্গসাহিত্যে আধুনিক ধরনের ছোট গল্পের প্রচলন আরম্ভ হয়, এই সুদূর মফঃস্বলে বসিয়া তাহার সঠিক ইতিহাস সংগ্রহ করা অসম্ভব। ১২৭৯ সালে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাহির হয় ও ১২৮৪ সালে বন্ধ হইয়া যায়। তাহার কোন সংখ্যাই দেখিবার সৌভাগ্য এপর্য্যন্ত আমাদের হয় নাই। সুতরাং তাহাতে ছোট গল্প বাহির হইত কিনা বলিতে পারি না। ১২৮৬ কি ৮৭ সালে বোধ হয়, সঞ্জীব বাবুর সম্পাদনে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারিত হয়। তাহাতেও ছোট গল্প দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ১২৮১ সালে ঢাকা হইতে বান্ধব বাহির হয়, তাহাতে ছোট গল্প ছিল না। ১২৯১ সালে বঙ্কিম বাবুর সাহায্যে প্রকাশিত প্রচার নামক মাসিক পত্রেও ছোট গল্প নাই।

১২৮৩ সালে "ভারতী" বাহির হয়। ১২৯৬ সালে সাহিত্য বাহির হয় এবং ১২৯৭ সালে বোধ হয়, "জন্মভূমি" বাহির হয়। এই কয় খানা পত্রিকায়ই আমরা প্রথমে ছোট গল্পের সাক্ষাৎকার লাভ করি। আমাদের বিচার ঠিক ঐতিহাসিক হইল কিনা, আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তবে মোটামুটি ধরিলে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোটগল্পের বয়স কিছুতেই ৩৫। ৪০ বৎসরের বেশী নহে।

বঙ্কিম বাবু উপন্যাস লিখিতে গিয়া দুইটি গল্প লিখিয়া ফেলিয়াছেন —"রাধারাণী" ও "যুগলাঙ্গুরীয়।" ছোট গল্প লেখা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি নিজেই নাকি বলিয়াছেন, যে এই উপন্যাস দুটি তিনি এমন ভাবেই আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে তাহারা আর বাড়িতে পারে নাই। ছোট গল্পাকারে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। ঐ গুলিকে ছোট গল্প না বলিয়া নক্সা বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়। "সুবর্ণগোলক" "হনুমদ্বাবু সংবাদ." "গ্রাম্য কথা," "বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর," "গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি" ইত্যাদি এই শ্রেণীর প্রবন্ধ।

বোধ হয় শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথমে ছোট গল্প লেখার পথ প্রদর্শন করেন। প্রত্যেক প্রতিভাবান লেখকেরই একটা বিশেষত্ব থাকে। এই ছোট গল্প গুলিতে লেখকের বিশেষত্ব যত ধরা যায়, আর কোন প্রকারের রচনায়ই বোধ হয় তত ধরা যায় না। স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই একটি গল্প এমন মধুর—পড়িয়া এমন তৃপ্তি লাভ করা যায়, যে তাঁহার উপন্যাসাবলীর যে কোন উপন্যাস পাঠ করিয়াও বোধ হয় অত তৃপ্তি হয় না। তাঁহার "নব কাহিনী"র প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই সুখপাঠ্য; এর মধ্যে "কেন?" ও "গহনা" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, এবং "লজ্জাবতী" নামক গল্পটী মাধুর্য্যে ও চরিত্র চিত্রণে অতুলনীয়। লেখিকা আমাদিগকে এমন একটি

স্নেহপূর্ণা কোমলহৃদয়া মঙ্গলের প্রতিমা দেখাইয়াছেন, যে তাহার জন্য নিজের অজ্ঞাতে একটী করুণাপূর্ণ সহানুভূতির ভাব জাগিয়া উঠে। সে কোনও অপরাধ করে না, প্রাণপণে সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে; সে কুসুমের মত নির্ম্মল, নীরবে গৃহকোণ উজ্জ্বল করিয়া মাধুরী ও সৌরভ বিতরণে রত;—তবু সংসারের সকলের চোখে সে চির অপরাধিনী! মেয়ে গহনা হারাইল,—দোষ হইল তাহার! বড় ঘরের বৌ ঠাকুরঝি রাঁধিতে যাইয়া পা পুড়িয়া ফেলিলেন, তাহার জন্য ভর্ৎসনা সহিতে হইল তাহারই! স্বামী যখন না বুঝিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া মর্ম্মান্তিক কথা শুনাইয়া দিয়া গেল, তখনও সে একটিবার মুখ তুলিয়া বলিল না—"ওগো, এতে আমার কিছুই দোষ নাই।" সে কেবল "বিছানায় পড়িয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল", ঠাকুরঝি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তুই ভাই এমন কেন ?"

"কেমন ?"

"যেখানে তোর দোষ নাই সেখানেও কথা কোসনে!"

"কথা কইতে গিয়ে দেখেছি, উল্টো হয়,—কে জানে আমি কিরকম করে বলি, সবাই ভুল বোঝে!"

হায়; ননীর পুতুল লজ্জাবতী লতা, এই কঠোর সংসারে সকলেই তোমাকে ভুল বুঝিবে। এখানে যে দৃঢ়হস্তে নিজের অধিকার সাব্যস্ত করিতে না পারে, তাহার স্থান নাই। এখানে,—

"কেহ বা দেখে মুখ কেহবা দেহ,
কেহ বা ভাল বলে বলে না কেহ;
* * *
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।"

এখানে তোমার মধুভরা স্নেহকম্পিত হৃদয়ের আদর নাই।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারীর পরেই পূজনীয় রবি বাবুর গল্পের অমিয় প্রবাহ মাসিক পত্রকে অপূর্ব্ব নবীন সরসতা প্রদান করিয়া খরবেগে বহিয়া চলিল। তাঁহার কবিতার উৎকর্ষ বিষয়ে মতভেদ আছে ও থাকিবে,—প্রকৃত কবিত্বরস আস্বাদনের আনন্দ সকলের জন্য নহে,—তাঁহার উপন্যাস পড়িয়া অনেকেই মাথা নাড়েন এবং ভাবেন,—এ গুলি শুধুই "মিছে কথা গাথা ছলনা"—কিন্তু তাঁহার গল্পগুলির বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। যিনিই পড়েন, তিনিই ইহাদের আকর্ষণ অনুভব করেন;—তিনিই দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলেন—"অপূর্ব্ব!"

রবি বাবু এত অধিক ভাল গল্প লিখিয়াছেন যে তাহাদের কোন্‌টিকে ছাড়িয়া কোন্‌টিকে দেখাইব ঠিক করা সহজ নহে। প্রথম যখন হিতবাদীর সংস্করণ হইতে এ গুলি পড়ি, তখন তাহাদের কয়েকটা এত ভাল লাগিয়াছিল, যে সে গুলি ঝোঁকের মাথায় প্রবল বেগে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। পরে দেখিতেছি, আমাদের মনোনীত গল্পগুলিই একটি একটি করিয়া মডার্ণ রিভিউতে অনুবাদিত হইয়া যাইতেছে!

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত রবি বাবুর গল্পগুচ্ছ আমাদের কাছে নাই। কাজেই হিতবাদীর সংস্করণ লইয়াই পড়িতে হইল। উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না জানি না।

হিতবাদীর সংস্করণে সমগ্র গল্পগুলি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা,—সংসারচিত্র, সমাজচিত্র, রঙ্গচিত্র ও বিচিত্রচিত্র।

সংসারচিত্রে সকল ভাল গল্পের মধ্যে—আপদ, দিদি, অতিথি, একরাত্রি, কাবুলীওয়ালা, খাতা, দুর্ব্বুদ্ধি এবং দৃষ্টিদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অতিথি, একরাত্রি এবং খাতা অতি সুন্দর;—পড়িয়াই মনে হয়, রবি বাবু ভিন্ন আর কাহারও লেখনী হইতে এ গুলি প্রসূত হইতে পারে না।

অতিথি গল্পটি এমন অসাধারণ, এমন পরিপূর্ণ, এমন প্রস্ফুটিত, এমন—কি বলিব ?—যে ইহার উপযুক্ত প্রশংসা অসম্ভব। কবি এমন একটি সর্ব্ব আকর্ষণে উদাসীন, অথচ সর্ব্ব বিষয়ে কৌতূহলী বিকাশোন্মুখ তরুণ প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, এমন নিপুণতার সহিত ধীরে ধীরে আমাদিগকে লইয়া তাহার মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন যে চরিত্রটি অত্যন্ত নূতন বলিয়া ঠেকিলেও, কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। নির্ম্মলা স্বচ্ছ-

স্রোতা নির্ঝরিণীর প্রতি বিভঙ্গে যেমন বৈচিত্র্য ঝিকিমিকি করিয়া নৃত্য করিয়া উঠে, অথচ এই চঞ্চলতা তাহার তলস্থিত অচল উপলখণ্ডগুলিকে কিছুমাত্র গোপন করে না, তারাপদের চরিত্রটিও ঠিক সেই রকম! প্রত্যেক কার্য্যে বৈচিত্র উথলিয়া পড়িতেছে, অথচ সকলের মধ্যে একটি উদাসীন অনমণীয় নির্লিপ্ততা অতি সহজেই ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জীবের প্রকারভেদ কথনে নিত্যমুক্ত জীবের উদাহরণ স্বরূপ বলিয়াছিলেন, যে, তাহারা পুষ্করিণীর সেয়ানা মাছের মত, তাহারা কোন জালেই বদ্ধ হয় না। যদিও তারাপদের সংসাররূপ জাল হইতে মুক্ত হইয়া পরমার্থিক তত্ত্বে মগ্ন হইয়া যাইবার জন্য কোন বিশেষ ব্যগ্রতার পরিচয় কবি দেন নাই, তবু, সংসারের কোন আকর্ষণই যে তাহাকে বদ্ধ করিতে পারিত না, তাহার পরিচয় কবির তুলিকায় প্রতিপদেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তার পর হরিণশিশুর মত "বন্ধন-ভীরু" হইলে কি হইবে, সে "আবার হরিণেরই মত সঙ্গীতমুগ্ধ।" "কেবল সঙ্গীতে কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্য শিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার মন যেন উচ্ছৃ-ঙ্খল হইয়া উঠিত! নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি,—সকলি তাহাকে উতালা করিত।" তাহার কৌতূহলেরও শেষ নাই। "যে কোন দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতিই তারাপদের সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়। যে কোন কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্ব্বদাই সচল হইয়া আছে; এই জন্য সে এই সচলা প্রকৃতির মত সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত, উদাসীন, অথচ সর্ব্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষ মাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে;—কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ, ভূত ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন বন্ধন নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য্য।"

গল্পের মধ্যে বালিকা চারুর চরিত্রটীও অদ্ভুত। কবি যখন এই বিদ্রোহী, অভিমানময়, দুর্দ্দমনীয় নারী প্রকৃতিটি দ্বারা উদাসীন, প্রবাহময় তারাপদের উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ প্রকৃতিটিকে বাঁধিবার আয়োজন করিলেন, তখন আমরা মনে করিলাম,—"হাঁ, এইবার ঠিক হইয়াছে।"

সমস্ত গ্রামের হৃদয় হরণ করিয়াও, চারুর বিরুদ্ধ ভাব তারাপদের অপরাধ কিছুতেই দূর করিতে পারিত না! "এই বালিকাটি তারাপদের সুদূরে নির্ব্বাসন তীব্র ভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই" বোধ হয় তারা-পদের চঞ্চলচিত্ত অচঞ্চল হইয়া বালিকার হৃদয় জয়ে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যখন চারুও ধরা দিল এবং এই দুইটি দুর্দ্দমনীয় হৃদয়কে এক চিরস্থায়ী সূত্রে বাঁধিবার আয়ো-জন চলিতে লাগিল, তখন তারাপদের ভিতরের বন্ধনভীরু উদাসীন প্রকৃতিটি সজাগ হইয়া উঠিল এবং স্নেহ, প্রেম, বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিবার পূর্ব্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয় খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ বালক আসক্তি বিহীন উদাসীর জননী বিশ্ব পৃথিবীর নিকট চলিয়া গেল!"

আমাদিগকে যেন এক স্বপ্নরাজ্য হইতে কেহ ধাক্কা-দিয়া ফেলিয়া দিল। শুনিয়াছি, কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চে "ভ্রমর" অভিনয়ের সময়, যখন গোবিন্দ লাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন একজন তন্ময় দর্শক উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়া-ছিলেন—"পাকড়ো. শালাকো পাকড়ো।" যখন নিষ্ঠুর উদাসীন বালকটি সমস্ত স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অকস্মাৎ এই ভাবে প্রস্থান করিল তখন আমাদেরও হৃদয়ের অন্ত-স্তল মন্থন করিয়া ঐরূপই আবেগপূর্ণ ধ্বনি বাজিয়া উঠে—"পাকড়ো, পাকড়ো।" হায়! যদি কেহ কোন উপায়ে উহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিত!

"একরাত্রি" গল্পটি ফুলের গন্ধের মত,—দিয়া যায় যাহা, হৃদয়ে জাগাইয়া যায় তাহার চেয়ে ঢের বেশী। পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হয়। অবশেষে কূল কিনারা না পাইয়া

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—
"কেন এমন হয় কেন ?—কেন ? ঃ—

বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে প্রাণ এক যবে খোঁজে
আকুল ব্যাকুল হয়ে সাথী একজন।
ভ্রমি বহু অতিদূরে পায় যবে দেখিবারে
একটি পথিক প্রাণ মনের মতন ;—
তখন, তখন তারে নিয়তি কেনরে বারে
কেন না মিশাতে দেয় দুইটি জীবন ?
অনুল্লঙ্ঘ্য বাধা রাশি সম্মুখে দাঁড়ায় আসি
কেন দুইদিকে আহা যায় দুই জন ?"

"খাতা" গল্পটি ছোট, কিন্তু আগা গোড়া অতি মধুর কারুণ্যে পরিপূর্ণ। বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে উমার বড় ভাই উমাকে একখানা খাতা দিয়াছিল। উমা "ছোট বেণীটি বাঁধিয়া ঝি সঙ্গে করিয়া যখন গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে যাইত,—খাতাটি সঙ্গে লইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারো বিস্ময় কাহারো লোভ কাহারও বা দ্বেষ হইত।" উমা তাহার ছোট হৃদয় খানির আবেগ গুলি সেই খাতায় লিখিয়া রাখিত,—"যশিকে আমি খুব ভাল বাসি," "হরির সঙ্গে জন্মের মত আড়ি" ইত্যাদি। এই আবেগময় রচনাগুলি যদিও সাহিত্যিক হিসাবে খুব বেশী মূল্যবান বলিয়া খুব বড় উদার সমালোচকও স্বীকার করিবেন না, তবু ক্ষুদ্র বালিকার কতখানি দৈনিক সুখ দুঃখ যে ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিত তাহা অন্তর্য্যামী জানিতেন, এবং আমরাও কিছু কিছু অনুমান করিতে পারি। তার পর একদিন যখন সকাল বেলা হইতে উমাদের বাড়ীতে সানাই বাজিতে লাগিল এবং প্যারীমোহন নামক একটি চিন্তাশীল গম্ভীর প্রকৃতির লোক অনাহুত আসিয়া উমাকে বৃন্তচ্যুত কুসুমটির মত লইয়া প্রস্থান করিল তখন উপরোল্লিখিত যশি দাসী সঙ্গে গিয়াছিল এবং স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। স্বামীগৃহে যাইয়া উমা গোপনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া তাহার খাতায় লিখিতে বসিত, কিন্তু লিখিতে গিয়া তাহার নয়নেতেও রচনায় সমানে অশ্রু উথলিয়া উঠিত এবং সে কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিত "যশি বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, আমিও মার কাছে যাব।" প্যারীমোহনদের অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে "কখনই সরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই," কাজেই উমার কৌতূহলী ননদিনীত্রয় অচিরাৎ উমার লিখন ব্যাপার রূপ বিস্ময়কর সংবাদ প্যারীমোহনকে জানাইয়াছিল, এবং কর্ত্তব্যজ্ঞ প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীর ভাবে সহধর্ম্মিনীকে ভর্ৎসনা করিয়া গেলেন। তারপরে বহুদিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু একদিন শরৎ কালের প্রভাতে একটি ভিখারিনীর মুখে আগমনী গান শুনিয়া "অভিমানে উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া চোকে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে ডাকিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি লিখিতে আরম্ভ করিল,—

পুরবাসী বলে উমার মা
তোর হারা তারা এল ওই
শুনি পাগলিনী প্রায় অমনি রাণী ধায়
বলি কই উমা কই !
কেঁদে রাণী বলে আমার উমা এলে
একবার আয়মা একবার আয়মা
একবার আয়মা করি কোলে !—"

এদিকে প্যারীমোহনের কাছে খবর গিয়াছে। প্যারীমোহন আসিয়া মেঘমন্দ্রে বলিল—"খাতা দাও"।

"বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অনুনয়ের দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল প্যারী মোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।"

"প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখা গুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল ; শুনিয়া উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল," এবং প্যারী মোহনের খবরদাত্রী উমার ননদ তিনটী "খিলখিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।"

কবি গল্পের শেষে লিখিয়াছেন—"প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্ব কণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল। কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।"—পড়িয়া প্রলয়োৎসাহে গর্জ্জন করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—"আছি, আমি আছি !"

সমাজ চিত্রের গল্পগুলির মধ্যে "মেঘও রৌদ্র", "অধ্যা-

পক", "পোষ্টমাষ্টার", "দুরাশা," এই কয়টি গল্প বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পটিকে ঠিক "ছোট" বলা যায় না, কিন্তু এরূপ হৃদয়োদ্বেলনকারী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গল্প বাঙ্গালা ভাষায় চারি পাঁচটির বেশী নাই। উপর উপর পড়িয়াও অনেকে গল্পটির সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন কিন্তু গভীর অনুভূতির সহিত গল্পটি পড়িতে পড়িতে, ইহাতে একেবারে ডুবিয়া যাইতে হয়, বিশ্বসংসার জ্ঞান থাকেনা, এবং পড়িয়া শেষ করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা কেবল দর বিগলিত অশ্রু জলেই প্রকাশ্য;—মানবভাষা দ্বারা তাহার সম্যক প্রকাশ ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। আমরা গল্পটি পড়িয়া যে পরিপূর্ণ পরম পুলক প্রাপ্ত হইয়াছি, আলোচনা দ্বারা তাহার গভীরতা নষ্ট করিতে চাহি না। যাঁহার হৃদয় আছে তিনি পড়িয়া দেখিবেন, এবং দরকার বোধ করিলে আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিবেন,—আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা বরণ করিয়া লইব।

অন্য তিনটি গল্পের মধ্যে "পোষ্টমাষ্টার" গল্পটি সকলের ছোট, কিন্তু অন্য দুইটি ছাড়িয়া আমরা সেইটিরই আলোচনা করিব।

কলিকাতার ছেলে গ্রামে পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসিয়াছে; কাজেই "জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে যেরকম হয় এই গণ্ড গ্রামের মধ্যে আসিয়া পোষ্টমাষ্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে।" পোষ্ট মাষ্টারের বেতন অতি সামান্য, নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বালিকা তাহার কাজকর্ম্ম করিয়া দেয়,—চারিটি চারিটি খাইতে পায় মেয়েটির নাম রতন, বয়স বারো তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায়না।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন অনন্ত আকাশতলে প্রকৃতির মৌনবাণী ফুটিয়া উঠিত এবং পার্থিব মানবের মনে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিতে থাকিত, "তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোষ্টমাষ্টার ডাকিতেন —'রতন'।" রতন এক ডাকেই ঘরে আসিত না, বাবু কর্ত্তৃক আহুত হইবার আনন্দটি বিশেষরূপে বারবার উপভোগ করিয়া অবশেষে সে ঘরে প্রবেশ করিত। তখন এই বিচিত্র সঙ্গী দুটির মধ্যে কোন ক্ষুদ্রতম সুখ দুঃখের কথাও অনালোচিত থাকিত না। ইংরেজী শিক্ষিত কলিকাতার ছেলে পোষ্টমাষ্টার এই অশিক্ষিতা ক্ষুদ্রা বালিকার নিকট স্বীয় হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিয়া অসীম আরাম অনুভব করিতেন, এবং ক্ষুদ্রা বালিকার অভ্যন্তরে একটি কোমল রমণী হৃদয় স্নেহ ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

একদিন পোষ্টমাষ্টার বাবুর জ্বর হইয়াছিল। তখন "বালিকা রতন আর বালিকা রহিলনা। সেই মুহূর্ত্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল; বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথা সময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভাল বোধ হচ্ছে কি?"

জ্বর হইতে সারিয়া উঠিয়া ম্যালেরিয়া ভয়ভীত পোষ্টমাষ্টারের বদলীর জন্য দরখাস্ত না-মঞ্জুর হইল। পোষ্টমাষ্টার কাজে জবাব দিয়া বাড়ী চলিলেন। রতনকে ডাকিয়া বলিলেন—"রতন আমার যায়গায় যে লোকটি আসিবেন, তাকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারি মত যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবেনা।"

"রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিলনা। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল 'না—না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবেনা, আমি থাকতে চাইনে।"

রতনের এই ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস কেন? পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে লাভে পড়িয়াছিল? ভুল! এই উচ্ছ্বাস হৃদয়ের অনেকগুলি কোমলতম করুণতম সজীবতম ভাবের অদ্ভুত সংমিশ্রন প্রসূত। এই উচ্ছ্বাসের কারণ কেবল হৃদয় দিয়াই অনুভবনীয়, ভাষা ইহার বর্ণনা করিতে গিয়া নির্ব্বাক হইয়া যায়!

"পোষ্টমাষ্টার যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়াদিল,—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছল ছল করিতে লাগিল,—

তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন।" অবশেষে "নদী প্রবাহে ভাসমান পথিকের হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল,—জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ কত মৃত্যু আছে * * * পৃথিবীতে কে কাহার?"

"কিন্তু রতনের মনে কোন তত্ত্বের উদয় হইল না, সে সেই পোষ্টাফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।"—হৃতমধুচক্রে মধুমক্ষিকা যেমন করিয়া গাছের ডালে চক্রের চিহ্নের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়!"

রঙ্গচিত্র বিভাগে "চিরকুমার সভা" স্থান পাইয়াছে। যিনি এই বিভাগ করিয়াছেন তিনি বোধ হয় এই কিম্ভুত-কিমাকার জিনিষটাকে উপন্যাস বলিতে সাহসী না হইয়া এবং নাটক বলিলেও ঠিক হয় না দেখিয়া, অবশেষে নিরুপায় হইয়া ইহাকে ছোট গল্পের দলে নিক্ষেপ করিয়াছেন! কিন্তু ইহাকে ছোট গল্প বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে! এই অবস্থায় আলোচনা অসম্ভব। কাজেই হতভম্ব হইয়া সেই চেষ্টায় ক্ষান্ত হইতে হইল। এই সরস উৎকৃষ্ট পুস্তক খানিতে নাটকের লক্ষণই বেশী বিদ্যমান।

"মান ভঞ্জন" গল্পটি কেন যে রঙ্গচিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, আমরা বুঝিতে অক্ষম। কবি গিরিবালাকে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাইয়া দিয়া হতভাগ্য, ভ্রান্ত, বিপথচালিত গোপীনাথের উপর প্রতিশোধ তুলিয়া যে রঙ্গ দেখিয়াছেন, তাহা রঙ্গচিত্র হইলেন, ইহাকে বড়ই নিষ্ঠুর, হৃদয়বিদারক রঙ্গচিত্র বলিতে হইবে। এই পৈশাচিক জ্বালাময় রঙ্গ দেখিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে হাহাকারের মত একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হয়, এবং তাহার সঙ্গে যে অশ্রু মিশ্রিত থাকে তাহা আনন্দাশ্রু নহে। যাহা হউক, এই গল্পটি রবীন্দ্র বাবুর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। ইহাতে কবির যে নিপুণতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। গিরিবালার উপর রঙ্গমঞ্চের প্রথম মোহ বর্ণনার মত পরিস্ফুট বর্ণনা খুব বেশী পড়ি নাই।

"রাজটীকা" ও "মুক্তির উপায়" উৎকৃষ্ট রঙ্গচিত্র বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত। বিশেষতঃ "রাজটীকার" রঙ্গ অতুলনীয়, অনপুকরণীয়।

"বিচিত্রচিত্র" বিভাগে চারিটি গল্প অত্যুৎকৃষ্ট, "ক্ষুধিত পাষাণ" "জয় পরাজয়," "কঙ্কাল," "সমাপ্তি"।

"ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটি বাস্তবিকই বিচিত্র। আমরা ইহার অত্যধিক প্রশংসা করিব না, কারণ অনেকের ইহা একটি প্রকাণ্ড প্রলাপময় গল্প বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে; কিন্তু এই ছোট গল্পটিতে কবির যে ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা একান্ত বিস্ময়কর। কবি অসামান্য প্রতিভা বলে বহির্জগৎ ভুলাইয়া এক অচেনা অজ্ঞাত অন্তর্জগতের যে বিচিত্র রহস্যময় চিত্র আমাদের সম্মুখে অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার দিকে বিস্মিত বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা আমাদিগকে দুঃস্বপ্নের মত আবিষ্ট করিয়া ফেলে!

"জয় পরাজয়" গল্পটি একটি করুণ সঙ্গীতের মত। বঙ্কিম বাবু তাহার "গদ্যপদ্য" নামক পুস্তকে গদ্যে লিখিত কবিতার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, সেই আদর্শের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিল না হইলেও, এই গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতা বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত। গল্পটিতে গল্পত্ব খুব অল্প, যাহা আছে তাহাও অপূর্ব্ব কবিত্ব ঝঙ্কারের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত কবিত্ব কি, তাহা অলঙ্কার শাস্ত্রের মাথাভাঙ্গা কবিত্বের পার্শ্বে স্থাপিত হইয়া অতিশয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে ইহার একটি "নাগসৈ" উদাহরণ দেওয়া যাইত, কিন্তু সে প্রলোভন সম্বরণ করিলাম।

"কঙ্কাল" গল্পটি "ক্ষুধিত পাষাণ" শ্রেণীর। ইহার বেশী আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর গল্প। গল্পটির বিশেষত্ব এই যে ইহার পাঠে মনে এক অপূর্ব্ব উদাস ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। "সমাপ্তি" গল্পটি দ্বারা পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে, এবং সমাপনটা বস্তুতঃই মধুরেন হইয়াছে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এরূপ মিশ্রিপানার মত মিষ্ট এবং তৃপ্তিদায়ক গল্প রবি বাবুর বড় নাই।

আমরা মোটামোটি রবিবাবুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গল্প গুলির আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইলাম। রবিবাবুর গল্প

গুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে এ গুলিতে সামান্য দুই এক কথায় মনের বিচিত্র সূক্ষ্মতম সুখদুঃখগুলিকেও জীবন্ত করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহাদের রস মধুর অথচ প্রগাঢ়। এগুলি যেন এক একটা ভাবের ঝড়,—পাঠকের মনে এমনি একটা বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া যায় যে পাঠের অনেক পরেও রহিয়া রহিয়া তাহার আবেগ কম্পন উঠিতে থাকে। একটা বেদনা, একটা হাহাকার, একটা কিজানি-কেমন-ভাব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কণ্টকের মত মনের মধ্যে বাজিতে থাকে।

আধুনিক গল্প লেখকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবি বাবুর পরেই দুই জন শ্রেষ্ঠ লেককের নাম মনে হইতেছে.—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র বাবুর মত একনিষ্ঠ লেখক বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই এই প্রশংসনীয় অদ্ভুত একনিষ্ঠতার দরুণ তিনি বঙ্গসাহিত্যে ভাল করিয়া পরিচিতও হইতে পারেন নাই! অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে সুরেন্দ্র বাবুর গল্প ও প্রবন্ধাবলি সমস্তই "সাহিত্য" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কখনও অন্য কোন কাগজে কোন লেখা দেন নাই। অনিয়মিত প্রকাশে "সাহিত্য" অদ্বিতীয়; কিন্তু বৈশাখের "সাহিত্য" বৈশাখেই প্রকাশিত হউক, অথবা আশ্বিনেই প্রকাশিত হউক, সুরেন্দ্র বাবুর গল্প "সাহিত্য" ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশিত হইবে না। বিষম বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও "সাহিত্য" যে এতদিন টিকিয়া আছে তাহা কতক সম্পাদক মহাশয়ের দৃঢ়নিষ্ঠার ফল, কতক তাঁহার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন নৈপুণ্যে এবং অনেকটা সুরেন্দ্র বাবুর লেখার আকর্ষণের গুণে। প্রভাত বাবু অপেক্ষা গল্প লেখকরূপে সুরেন্দ্র বাবুকে নানা বিষয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ মনে করি; কিন্তু তবু সুরেন্দ্র বাবুকে আমরা প্রভাত বাবুর উপরে স্থান দিতে দিতে পারি না। সুরেন্দ্র বাবুর প্রতিভা কতকটা রবি বাবুর 'চিরকুমার-সভা'র অক্ষয়ের মত,—বড়ই উচ্ছৃঙ্খল, কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমরা প্রভাত বাবুর গল্প প্রথম আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

সমালোচনা। *

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। শ্রীযুক্ত বঙ্ক বিহারী কর প্রণীত। ৪১৯ পৃষ্ঠা মূল্য ১৷৷০ ও ১৸০। এই পুস্তকের আমরা যে কি সমালোচনা করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। আমরা কেবল পড়িয়াছি, আর গ্রন্থকারকে তাঁহার এই অমূল্য দানের জন্য শত শত ধন্যবাদ দিয়াছি। নদী যেমন নানা দেশ দেখিয়া নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অবশেষে অনন্ত সাগরে যাইয়া উপনীত হয়, ভক্ত বিজয়-কৃষ্ণ সেই রূপ সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়া ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম বিশালত্বে মিলিত হইয়াছিলেন। সেই ঐকান্তিক সাধকের প্রাণপূর্ণ সাধনার বিবরণ বঙ্ক বাবুর যত্নে আজ বঙ্গবাসীর হস্তগত হইল। বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট জীবনবৃত্তান্ত চারি পাঁচ খানার বেশী নাই। বর্ত্তমান পুস্তকখানা তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল, এই পুস্তকখানার রচনা যে খুব উৎকৃষ্ট এমন কথা বলিতে পারি না। পুস্তকের স্থানে স্থানে অনেক শৃঙ্খলার অভাব লক্ষিত হইল। অনেক স্থানে ঘটনা সমাবেশ নিতান্ত এলোমেলো হওয়ায় পুস্তকের সূত্র যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত সত্বেও যিনিই এই পুস্তক পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন, পবিত্র হইবেন, বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন; চিন্তা করিবার শত শত বিষয় পাইবেন। বঙ্গবাসী ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের চরিতামৃত পান করুন আর দুই হাত তুলিয়া বঙ্কবাবুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধান ও আয়তনের তুলনায় মূল্য বেশ সুলভ হইয়াছে।

ময়মনসিংহের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। পুস্তক খানি কেদার বাবুর অসাধারণ অধ্যবসায় এবং প্রায় জীবনব্যাপী সাধনার ফল। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারের প্রতি সম্ভ্রমে মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনেক

* সমালোচনার্থ অনেকগুলি পুস্তক আমরা বহুদিন হইল পাইয়াছি। যথাসময়ে সমালোচনা করিতে পারা যায় নাই বলিয়া আমরা গ্রন্থকার মহোদয়গণের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। ভাঃ মঃ সঃ।

ত্রুটি থাকা অনিবার্য্য। এই পুস্তকেও বহু ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইল। শুনিয়াছি এই পুস্তকের আরো সংস্করণ হইয়াছে। আমাদের পুস্তক খানা প্রথম সংস্করণের, কাজেই ইহা অবলম্বনে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে মুসলমান শাসনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত অংশে গ্রন্থকারের আরও মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই অংশ পড়িয়া কেবলি নিরাশ হইতে হয়। আশা করি গ্রন্থকার আমাদের সেই গৌরবময় যুগের লুপ্ত কাহিনী সকল উদ্ধার করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইবেন। মনে রাখিবেন, সেই সময়কার একটু প্রবাদও হীরকের টুকরার মত মূল্যবান। গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়া যদি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলির বর্ণনা ও আলোকচিত্র পুস্তকে দিতে পারিতেন তবে পুস্তক খানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর পড়া ত উচিতই, ইতিহাসপ্রিয় প্রত্যেক বঙ্গবাসীরও ইহা অবশ্যপাঠ্য। প্রাচীন ময়মনসিংহ এবং ঢাকার মানচিত্র বেশ হইয়াছে। মানচিত্রের নীচে "পাটের গাত্র" ও "ইন্দ্রকপুর" বলিয়া যে দুটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদের নাম যথাক্রমে "পাথরঘাটা" ও "ইদ্রাকপুর" হইবে। রেনেলের ম্যাপের ইংরেজী নাম বাঙ্গালা করিবার সময় বোধ হয় এই ভুল হইয়াছে।

টুনটুনির বই। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, প্রণীত। ১৬৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা। এই পর্য্যন্ত উপকথার অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে, কিন্তু উপেন্দ্র বাবু টুনটুনির বইএ যে শ্রেণীর উপকথাগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, সে গুলির দিকে এ পর্য্যন্ত কাহারও মনোযোগ বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। উপকথার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে বলিতে হয় যে টুনটুনির বই এ সংগৃহীত কথাগুলি উপকথার আরম্ভ, দক্ষিণা বাবুর "ঠাকুরমার ঝুলিতে" সংগৃহীত শ্রেণীর আখ্যানগুলি বিকাশ এবং তাঁহার ঠাকুরদাদার ঝুলি ও জ্ঞানেন্দ্র বাবুর "উপকথা"ত সংগৃহীত উপখ্যানগুলি উপকথার পরিণতি। আরম্ভে কল্পনা ছায়াময়ী, বিকাশে কল্পনা চঞ্চলা, উচ্ছৃঙ্খলা, এবং [illegible] কল্পনার মধ্যে মানব হৃদয়ের বিচিত্র সুখদুঃখগুলি শত তানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে কল্পনা বেশীদূর হাটিতে শিখে নাই, তবু দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ। আধ আধ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, হামাগুড়ি দিয়া সারা বাড়ীময় বেড়ায় আর হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরমার করে,—ধরিতে গেলে বড় বাহাদুরী করিয়াছে ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে হামাগুড়ি দিয়া পালায়। দ্বিতীয় অবস্থায় কল্পনা বালিকা; যেখানে সেখানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, লাজ নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, ভয় নাই; কেবলি মাধুর্য্যে ভরা। তৃতীয় অবস্থায় কল্পনা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। চাঞ্চল্য নাই, হিল্লোল আছে; মাধুর্য্য আছে এবং মাধুর্য্যের চেয়ে বেশী,—মোহ আছে। এখন সৌন্দর্য্য কেবল—"চলিতে ফিরিতে চলকি ঝলকি উঠে।" এই পর্য্যন্তই উপকথার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে, তাহার পরেই মানব জীবনের সহিত বিবাহিতা হইয়া একেবারে মানবের গোপন অন্তঃপুরে মাধুর্য্যের উৎসরূপে আশ্রয় গ্রহণ করে।

টুনটুনির বই পড়িতে পড়িতে সেই দিনের কথা মনে পড়িতেছিল যখন লবনকে "নবন" বলিয়া, হাঁড়িকে "হালি" বলিয়া উপহসিত হইতাম; সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গেসঙ্গেই যখন পিসিমার কোলে আশ্রয় লইতাম, শীত-প্রভাতে "দোলাই" গায়ে দিয়া রান্না ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া যখন "থানা-থানা" মাছের ঝোল দিয়া পিসিমার হাতে "পান্ত" খাইতাম। কি মধুর স্মৃতি!

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংগ্রহের জন্য উপেন্দ্র বাবুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। গল্প অনেকেই জানেন কিন্তু বলিতে কয়জনে পারেন? উপেন্দ্র বাবু সেই দুরূহ কার্য্যে আশ্চর্য্য সফল হইয়াছেন। ভাষাটি ঠিক জিরেন কাটা খেজুরের রসের মত মিষ্টি, আর বলিবার ভঙ্গীও অতি মনোরম। একটু দুঃখের বিষয় এই যে উপেন্দ্র বাবু অনেকগুলি গল্প ও ছড়া পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন। এই রকম পরিবর্ত্তন ভারী মারাত্মক। ইহা কতকটা কলিকাতার ভাষার অনুরোধে, এবং অনেকটা বোধ হয়, শৈশব-স্মৃতির উপর নির্ভর করার ফল। আমাদের স্থানের অভাব নতুবা পরিবর্ত্তিত সমস্ত স্থান আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিতাম। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, ছবি ও আয়তনের তুলনায় মূল্য নিতান্ত সুলভ হইয়াছে। সমালোচক।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত
"মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" হইতে গৃহীত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ,
ফাল্গুন ১৩০১ বঙ্গাব্দ,

ফিনিস্ পার্লিয়ামেণ্টের নারীসভ্যগণ।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson

৬ষ্ঠ ভাগ। | পৌষ, ১৩১৭। | ৯ম সংখ্যা।

মহারাণী ক্ষেমা।

মকুল পর্ব্বত হতে শাক্যমুনি যবে
নির্জ্জন সমাধি-সুখে পুনঃ তৃপ্ত ক'রে
আত্মার অনন্ত ক্ষুধা, আসিলেন ফিরে
রাজগৃহে, বিতরিতে কুটীরে কুটীরে
অপূর্ব্ব অমৃত-বার্ত্তা—অক্ষয় সম্পদ
মুক্তিকামী জীবনের, পদ-কোকনদ
অর্চ্চিবারে ঘটিল উৎসব!
অকস্মাৎ
সুবিপুল জনসঙ্ঘে অশনি সম্পাত!
করিল শ্রবণ সবে কালি উষা-ক্ষণে
রাজেন্দ্রানী দেবী ক্ষেমা হর্ষোৎফুল্ল মনে
ত্যজি সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যে ভিক্ষুণীর ব্রতে
উৎসর্গিবা আপনায়!—মোহান্ধ মরতে
অচিন্ত্য-বিস্ময়! কোটি হৃদি ব্যাকুলিত
পলে, কোটি নেত্রে যুগপৎ উচ্ছ্বসিত
অশ্রুরাশি, কোটি প্রাণ উৎকণ্ঠা-চঞ্চল
হেরিতে সে পুণ্য-দৃশ্য!
শান্ত কোলাহল;—
রাজেন্দ্র পূজিয়া বুদ্ধ চরণ কমল
পশিলেন অন্তঃপুরে নিঃশব্দে একাকী
ম্লান-মুখে ধীর পায়! স্তব্ধ শুকপাখী;—
গাহিল না বন্দীগণ, ভেদিয়া অম্বর
জাগিল না জয়-ধ্বনি, মৌন চরাচর
নরেশ ইঙ্গিতে যেন!
রজনী তখন
বিস্তারিয়া কৃষ্ণ-পক্ষ মায়ার মতন
গাঢ় হয়ে আসে ক্রমে! ত্রিদিব অঙ্গন
উদ্ভাসিয়া জ্বলিতেছে তারা অগণন
অপলক জ্ঞান-আঁখি মত! দেবালয়ে
সন্ধ্যারতি শেষ হয় ভক্তের হৃদয়ে
পুলক-লহর তুলি!

মহিষী হেথায়
একা বসি ধ্যান-মগ্না প্রতিমার প্রায়
নির্জ্জন শয়ন কক্ষে মহার্ঘ আসনে
যুগল প্রসূন-মাল্য আপনার মনে
গাঁথিছেন যত্নে অতি সমগ্র পরাণ
ঢালি যেন তাহে ! লক্ষ দীপ-শিখা ম্লান
চরণ-সরোজ চুম্বি ! রত্ন-সজ্জা হায়,
দেব-পদে নিবেদিত পুষ্প-কীট প্রায়
হতেছে পবিত্র আজো সে পূত শরীর
স্পর্শ করি ! পুণ্য-প্রভা প্রভাত-মিহির ;—
রূপ-জ্যোতিঃ চন্দ্রমার স্নিগ্ধ রশ্মিধারা,
দোঁহাকার বিচিত্র মিলন !
আত্মহারা
মহারাজ, পদ-শব্দে মহিষী চকিতা ;—
উঠিলা আসন ত্যজি প্রকৃতি-বন্দিতা
বন্দিতে প্রকৃতি-নাথে ! ভূপ ভুজপাশে
বাঁধি তাঁরে একান্তই হৃদয় সকাশে
শুধাইলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে—অশ্রুবারি
সিক্ত বুঝি তাহে— "প্রিয়ে, জীবন আমারি,
একি শুনি অকস্মাৎ ?"—মর্ম্মের ক্রন্দন
ফুটিল না ভাষে আর !
ধীরে নিবেদন
করিলেন দেবী ক্ষেমা—"সত্য প্রিয়তম,
তব আশীর্ব্বাদ শিরে লয়ে অনুপম
রাজেন্দ্রানী সন্ন্যাসিনী সাজিবে উষায়
শাশ্বত নির্ব্বাণ আশে ! প্রসন্ন হিয়ায়
আমারে বিদায় দাও ! আজি একবার
স্মিত মুখে বস প্রভু ; সম্মুখে আমার
জন্ম শোধ হেরি তোমা, প্রসূন সম্ভারে
ও রাঙ্গা চরণ পূজি ! এ মর-সংসারে
শেষ সাধ—শেষ ভিক্ষা এই !"
—"প্রাণেশ্বরী,
স্বপ্নাতীত বজ্রাঘাত এযে ! রক্ষ ভরি
জাগে তীব্র হাহাকার ! আজিকে কেবলি
তুমি মোর ! প্রেমময়ী, মায়ার পুত্তলি,
বাঞ্ছিতা, সর্ব্বস্ব, নিধি, কল্যাণী আমার,
সে কি শুধু এক নিশি তরে ! কালি আর
না রবে সম্পর্ক কিছু ! তুমি বসুধার
হবে ! দেবী, দূর হতে সম্ভ্রমে অপার
আমি শুধু করিব দর্শন ! এ কি হায়,
প্রাণের বন্ধন ? একি ভালবাসা ?'—
—ক্ষিপ্তপ্রায়
কহিলেন বিম্বসার ব্যাকুল-আবেগে
মহিষীর পানে চাহি, ভারাক্রান্ত মেঘে
নিবিড় বর্ষণ হেন !-
—"তারপর রাণী,
ভেবে দেখ, রাজা আমি, তব সখা স্বামী
তুমি অনাথিনী সমা আমারি প্রজার
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কার জীবন তোমার
করিবে রক্ষণ প্রিয়ে ! চেয়ে রব আমি
কোন্ প্রাণে প্রাণময়ী, চির-দিন-যামী
নির্জীব কঠিনতর প্রস্তর-গঠিত
প্রতিমার মত ? শত্রু হবে হরষিত ;—
দগ্ধ হবে স্বজননিকর ! অভিপ্রায়ে
তব রাখিনি অপূর্ণ কভু, অন্তরায়ে
করিনি খণ্ডন ! দেবী, তোমারি ইচ্ছায়
দিতেছি না আজো বাধা ! একবার হায়,
অনুরোধ শুধু প্রাণেশের, প্রণেশ্বরী,
ভেবে দেখ, এখনো যে রয়েছে শর্ব্বরী ;—
তব সমা মহীয়সী গৌরবমণ্ডিতা
প্রীতিময়ী রমণীর অয়ি শুচিস্মিতা,
একি হবে যোগ্য-ব্যবহার ?"
মহারাণী
উত্তরিলা ধীর কণ্ঠে (দেবী বীণাপাণি
দিলা কিবা বীণায় ঝঙ্কার !) "মহারাজ !
প্রিয়তম, হৃদয়-বল্লভ ! বিশ্ব মাঝ
যেদিন প্রথম শুনিয়াছি সিদ্ধার্থের
অত্যাশ্চর্য্য আত্ম-ত্যাগ, হায়, ত্রিলোকের
কল্পনা-অতীত কথা, সত্য সেই দিন
লভিয়াছি জীবনের আদর্শ নবীন

প্রচ্ছন্ন হৃদয়-কোণে! তারপর যবে
দুঃখদৈন্য-জরামৃত্যু-ব্যথাপূর্ণ ভবে
শুনিয়াছি শ্রীমুখের জ্ঞান গর্ভ-বাণী
মধুমাখা উপদেশ, শত ধন্য মানি'
লইয়াছি আপনারে, হয়ে গেছে স্থির
ধ্রুব লক্ষ্য এ দাসীর! পেয়েছি গভীর
তমঃ মাঝে দিব্যালোক।
ঘটেছে যখন
বিন্দু অবসর নাথ, সঁপি প্রাণ-মন
ভাবিয়াছি নিশিদিন একান্তে বসিয়া
কত শতবার, ভ্রান্ত-সুখে নিমজ্জিয়া
রহিব না আর! তুচ্ছ ধনজন মান
ক্ষণ-লীলা চপলার! মহান্ নির্ব্বাণ
ধ্যেয় জ্ঞেয় প্রার্থনীয় শুধু হে রাজন্,
কল্যাণার্থী মানবের! সে দুর্লভ-ধন
আহরিব তপস্যায়! দ্বারে দ্বারে আর
ভিক্ষাচ্ছলে অবরুদ্ধে দিব উপহার
মুক্তির সন্দেশ নব! জননী সন্তানে
স্তন্য-ক্ষীরধারা যথা সস্নেহে প্রদানে
বিতরিব তেমতি এ সুধা! প্রেমাধার,
মান-অপমান হেথা করিতে বিচার
কিবা আছে? কে না জানে রাজ-মহিষীর
প্রজাবৃন্দ সুত হেন! মিত্র-অরাতির
বেদনা-হর্ষের হেতু কি রহে হেথায়
নরমণি! নন্দনের অন্তর-তৃষায়
নিবারিতে মাতা তারে নিবে বক্ষে টানি'
এযে আরো চারু দৃশ্য—আনন্দের বাণী
সবাকার! স্বাভাবিক এযেগো সর্ব্বথা
চিরন্তন! এতকাল হৃদয়ে দেবতা,
এ সাধ করিত খেলা নিঃশব্দে গোপনে
শুক্তি-গর্ভে মুক্তা-দ্যুতি সম! শুভক্ষণে
কালি তার হবে মাত্র বাহ্য-অভিনয়
বিশ্ব-নাট্য-রঙ্গভূমে!
হে প্রেমনিলয়!
কি কহিব? প্রেম কিংবা প্রাণের বন্ধন
দেহের মিলন নহে! নৈকট্য মোহন
করে না ঘনিষ্ঠ তারে! কাছে কাছে রহি'
জ্বলে শুধু দু'জনার মনঃপ্রাণ দহি'
অতৃপ্তির মহা দাবানল! পঙ্কিলতা
আসে প্রেমে! অতি ঘৃণ্য স্বার্থের অন্ধতা
প্রাণের বন্ধনে ঘেরে! মিটেনা তিয়াস;—
"আরো চাহি" "আরো চাহি" শান্তি করি নাশ
অন্তরে ক্রন্দন শুধু উঠে উথলিয়া
প্রবল বন্যার সম! মরু-ভ্রান্ত হিয়া
ধায় বৃথা মৃত্যু-পথে!
প্রেম হোম-শিখা;—
আত্মারে নির্ম্মল করি শুভ্র জয়-টীকা
পরাইয়ে দেয় ভালে! প্রাণের বন্ধন
ঘনাইয়ে আনে শুধু প্রাণের মিলন
নিবিড় প্রগাঢ় করি! নাথ, প্রিয়তম,
তোমারে বাসিয়ে ভাল নিত্য নিরুপম
লভিয়াছি সে সুধা-সন্ধান! বুঝিয়াছি
প্রেম কত পবিত্র উদার! জানিয়াছি
কোটি প্রাণে এক মহা প্রাণ! হে দেবতা,
সহকারে আলিঙ্গিয়া ক্ষুদ্র বন-লতা
হেরিয়াছে ঊর্দ্ধাকাশে অনন্ত আলোক
দিগন্ত বসুধা ব্যাপি! অসহ্য পুলক
উন্নত করিছে তারে!
আমি যে তোমারি—
তোমারি—তোমারি চিরকাল! সিন্ধু-বারি
বাষ্পরূপে যে নীরদে বিশ্বে দান করে
রহে না সিন্ধুর সে কি? অন্তিমে সাগরে
মিশে না সে পুনর্ব্বার? হে প্রেম-জলধি,
উপাস্য আরাধ্য মোর! চিন্তি নিরবধি
অসীম প্রেমের তব তুচ্ছ এক কণা
আমি নাথ, রূপা তব করিতে ঘোষণা
জগতে বিলায়ে দাও মোরে! বৃথা শোক;—
মহা জ্ঞানবান তুমি! হেরিবে ত্রিলোক
অক্ষয় অমর প্রেম! প্রাণের বন্ধন
জন্ম-জন্মান্তর লাগি! বিচ্ছেদ মরণ
সে যে শুধু বাহিরের মিথ্যা-স্বপ্ন-ভ্রম
মায়ার বুদ্‌বুদ্!
সব সাধ আশা মম

জানি তুমি পূর্ণ কর, তাই হৃদয়েশ,
বারেক সম্মুখে বস! নিশি অবশেষ
হল বুঝি!"—
এত কহি রাজেন্দ্রানী সুখে
রাজেন্দ্রের করে ধরি উদ্বেল-কৌতুকে
বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে! তারপর
ফুল্ল ফুল-মালা এক লইয়া সুন্দর
নৃপ-কণ্ঠে পরাইয়া দিলা—প্রণমিয়া
গল-লগ্ন-বাসে! সারা বিশ্ব পাশরিয়া
স্তম্ভিত বিমুগ্ধ ভূপ! রাণী কন হেসে
"প্রাণনাথ! প্রাণে আজো যায় সদা ভেসে
মধু-স্মৃতি বসন্তের মলয়ের মত
ব্যাকুলিয়া স্নিগ্ধতায়, সেই এক দিন
ঘটেছিল বসুধায় উৎসব নবীন
বেজেছিল হৃদে বাঁশী—এই মত তোমা
পুষ্পমাল্যে বরেছিনু আনন্দে হে ভূমা,
অন্তর-দেবতারূপে! মাহেন্দ্র লগনে
হয়েছিল উদ্বাহ দোঁহার! ত্রিভুবনে
জেগেছিল জয়-ধ্বনি! আজ কিছু নাই;—
নীরব নিঝুম স্তব্ধ শুধু চারি ঠাঁই
সুপ্তি-মগ্ন বসুন্ধরা! একান্তে কেবল
বিকশিয়া উঠিয়াছে চিত্ত-শতদল
হৃদয়ে লভিতে তোমা, তাই সারাৎসার,
আত্মমাঝে করিতেছি ও দেব-আত্মার
বরণ এ মালিকায়! আত্মার মিলন
দেবাশীসে হউক সার্থক। প্রেমঘন
চাহ তুমি চাহ হাসি মুখে!"
ক্ষান্ত রাণী;—
নৃপতি শুনিলা যেন মহাশঙ্খ বাণী
পুণ্য-লগ্নে অকস্মাৎ। মর্ম্ম-হুতাশন
ধীরে যেন নিভে আসে! না সরে বচন;—
ফুল-সাজি হতে শুধু অপর মালায়
গ্রহণ করিয়া ধীরে রাণীর গলায়
নিঃশব্দে পরায়ে দিলা! তার পর ধীরে
কহিলেন মৃদুভাবে ঈষন্নত শিরে
বুঝিনা সম্ভ্রম ভরে—"হে দেবী কল্যাণী,
পূর্ণ হোক্ বাঞ্ছা তব! আজ মোরে দানি
তোমা সনে জগতের প্রাণদ-সেবায়
হইনু কৃতার্থ ধন্য!"—তরঙ্গ হিয়ায়—
ফুটিল না বাক্যে আর!
হায়রে সজল
রাণীর কোমল আঁখি, সারা অন্তঃস্থল
নিপীড়িত দীর্ঘশ্বাসে! দৃঢ় বলে তবু
সম্বরিয়া আপনায় কহিলেন "প্রভু,
তব যোগ্য এই আত্মত্যাগ! কি মহান্
হৃদয় তোমার! তব এই প্রেম-দান
শাক্যসিংহ করুন গ্রহণ! প্রিয়তম!
গেঁথেছিনু এই মালা যত্নে নিরুপম
অর্চ্চিবারে বুদ্ধদেবে! তুমি দেব দিলে
কণ্ঠে মোর! তব প্রেম মোর প্রেম মিলে
অতুলন করেছে ইহায়! নহে আর
তুচ্ছ মালা! প্রেম-পূত হৃদয় দোঁহার
পশিয়াছে প্রতি পুষ্পদলে! শাক্য-পায়
মাল্যচ্ছলে উপহার দিব দুজনায়
কালি শুভ উষাক্ষণে! এ জন্মের মত
যুগল হৃদয় সেথা হর্ষে অবিরত
ডুবে রবে পরস্পরে!
কে কহিছে প্রাণে
কি অমৃত-মন্ত্র-বলে আশ্বাসি কে জানে
শান্ত হও প্রিয়তম! আবার—আবার
নির্ব্বাণের পীঠভূমে এমতি দোঁহার
ঘটিবে মিলন চির!"
সহসা মধুরে
বিহঙ্গ উঠিল গাহি হায়, মর্ত্ত্যপুরে
উষা-আগমনী গাথা! বৈতালিক দল
চারুকণ্ঠ মিলাইল তায়! রক্তোজ্জ্বল
পূর্ব্বাকাশ! রাজারাণী দোঁহে সচকিত!
না ফুরাতে কথা কবে হল অন্তর্হিত
মহা রাত্রি, সাথে লয়ে রাজ-দম্পতির
প্রীতিময় সংসার-জীবন!
অগ্রনীর

অঞ্চলে গোপনে মুছি প্রণমি রাজায়
বাহিরিলা মহারাণী আগে, মুগ্ধপ্রায়
ভূপাল পশ্চাতে রহে, জাগে চিত্তে তাঁর
প্রেয়সীর শেষবাণী আশা-সান্ত্বনার
অফুরন্ত প্রস্রবণ—"আবার--আবার
নির্ব্বাণের পীঠভূমে এমতি দোঁহার
ঘটিবে মিলন চির !"

অন্তঃপুর ত্যজি
অগ্রসিলা ধীরে দোঁহে পদব্রজে আজি
মহাবন বিহারের পানে, যেথায় সুগত
জ্ঞান-দীপ্ত মূর্ত্তিমান কল্যাণের মত
নিবসেন সপার্ষদ ! নীরব দু'জন ,—
নীরব পশ্চাৎগামী পুরবাসীগণ
বক্ষে কারো জাগে না স্পন্দন ! সুনীরব
বীথির উভয় পার্শ্বে জাগরিত নব
প্রজা-সিন্ধু, স্থির ধীর সবে, ঝটিকার
পূর্ব্বাভাস করিছে সূচনা ! একবার
দিল বুঝি জয়ধ্বনি বন্দিয়া রাজায়
প্রণমিয়া মহিষী ক্ষেমায়, ইসারায়
নিবারিলা নৃপমণি ! করুণ-গম্ভীর
করুণার শান্ত-ছায়া শুধু ধরিত্রীর
বক্ষ পরে পাতিল আসন !

কতক্ষণে
উত্তরিলা সবে সেই বুদ্ধ-তপোবনে
সিন্ধু-যাত্রী নদীস্রোত মত ! নতশিরে
প্রণমিয়া শাক্যসিংহে বসিলেন ধীরে
যথাযোগ্য স্থানে সর্ব্বজন ! আশীষিয়া
সবার অন্তর-গ্লানি ক্ষণে বিদূরিয়া
কহিলা গৌতম—"হে কল্যাণী, চিত্ত স্থির
করেছ কি শুনিবারে শাশ্বত মুক্তির
মঙ্গল-বারতা নব ?" মস্তক নোয়ায়ে
নিবেদিলা দেবী ক্ষেমা নিজ অভিপ্রায়ে
তথাগত পদাম্বুজে, সঙ্কল্প অটল ;—
শিহরিল নরনারী !

সিক্তি তীর্থ-জল
দীক্ষা তাঁর হল যথারীতি ! মূল্যবান
বসন ভূষণে করি দীনজনে দান
কাটিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তল
পবিত্র গৈরিক-বাসে অঙ্গ-শতদল
আবরিয়া রাজেন্দ্রাণী হর্ষে সন্ন্যাসিনী
সাজিলেন মুহূর্ত্তেকে ! অপূর্ব্ব কাহিনী
বিমোহিল চরাচরে ! কি অস্ফুট ব্যথা
কোটি চিত্তে জাগাইয়ে তীব্র ব্যাকুলতা
মিলাইল জনসঙ্ঘে ! ভিক্ষুণী ক্ষেমার
অন্তরে বাহিরে কিবা লাবণ্য অপার
উদ্ভাসিয়া উঠিল চকিতে ! অগ্রসরি
সিদ্ধার্থ সকাশে দেবী উন্মোচন করি
কণ্ঠ হতে নিলা সেই মালা, তারপর
মৃদু ভাষে "অন্তর্য্যামী করুণানিকর,
অর্ঘ্য এই ; ধ্যানময় ! কি কহিব আর ;—
আশীষিয়া লহগো বারেক !" উপহার
হইল অর্পিত পদে ! বুদ্ধ স্মিত মুখে
পুষ্পাঞ্জলি নিলা হাতে তুলি ! এ কৌতুকে
এ রহস্যে কে বুঝিল আর !

মহারাজ
বিম্বসার এতকাল বৌদ্ধ সভা মাঝ
একান্তে আছিলা বসি মহা স্বপ্নাবেশে
মন্ত্রমুগ্ধ মত ! কোন্ দুর্জ্জেয়-আদেশে
ঘটিল কি বিপর্য্যয় বুঝিবা তখন
সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে রাজন্
না ছিল শকতি কিছু ! হায়, বজ্রাহত
কি জানিবে বিশ্বের সংবাদ ! তথাগত
কহিলা সচিবে, "হে অমাত্য, বিম্বসারে
প্রাসাদে লইয়া যাও !" তিতি নেত্র-সারে
পালিলা আদেশ মন্ত্রী ! মহারাজ ধীরে
প্রণমিয়া বোধিসত্ত্বে ভক্তিনম্র শিরে
মহিষীর কেশগুচ্ছ কুড়াইয়ে লয়ে
ফিরিলেন নিকেতনে, বিশুষ্ক হৃদয়ে
খেলিল না জ্যোৎস্না আর !

নবীন প্রভাত
করি নব বালার্কের কিরণ সম্পাত

দেখা দিল রাজগৃহে, বিশাল নগর
নব কর্ম্ম কোলাহলে সজীব মুখর
জনস্রোতে পূর্ণ বীথি ! ভিক্ষা-পাত্র করে
বাহিরিলা দেবী ক্ষেমা আহরণ তরে
নব জীবনের অর্ঘ্য, লক্ষ্মী কি আপনি
ভিক্ষাচ্ছলে বিশ্ব-জনে করিবারে ধনী
উজলিলা রাজ-পথে ! দিশে দিশে দিশে
বিকীরিল পুণ্যজ্যোতিঃ ! বিষাদে হরিষে
বাষ্পাকুল লক্ষ আঁখি স্থির অচঞ্চল
তাঁরি পানে, ভেদি পলে কোটি মর্ম্মস্থল
জেগে উঠে কোটি কণ্ঠে "জয় রাণী মার"
সাগর কল্লোল হেন ! প্রতিধ্বনি তার
জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে চলিল ছুটিয়া
অপূর্ব্ব সন্দেশ লয়ে !
স্নেহে সম্ভাষিয়া
সবারে কহেন রাণী, "শুন বৎসগণ,
নগণ্যা ভিক্ষুণী আমি, এ জয় নিক্কণ
আমারে বিদ্রূপ করে ! ক্ষান্ত হও সবে ;
জননীর আশীর্ব্বাদ নির্ব্বাণ-গৌরবে
ধন্য হও প্রতি জনা ! ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
কর সবে জয় ধ্বনি প্রাণ মন খুলি
জয় জয় সিদ্ধার্থের ! জয় জয় জয়
ধর্ম্মের সঙ্ঘের !"
একি পলকে প্রলয় !
ত্রিরত্নের জয়ধ্বনি জাগে ঘোর স্বনে
সুবিশাল জন-সিন্ধু মথি ক্ষণে ক্ষণে
চুম্বিয়া সে অনন্ত আকাশ !
একি সুধা !
সমুত্থিত নিবারিতে মুমুক্ষুর ক্ষুধা
চিরতরে ! দ্বিসহস্র বর্ষ গেল চলি
কত ঝঞ্ঝা শিরে বহি' ! সর্ব্ব বাধা দলি
জাগে আজো বিশ্ব মাঝে সেই জয় ধ্বনি
উদ্বেলি অগণ্য হৃদি ! দিবস রজনী
দিব্য প্রতিধ্বনি তার বাঙ্গালার কবি
করে অনুভব প্রাণে, সেই পুণ্য ছবি
নিরখিয়া ধ্যান-নেত্রে ! বুঝি আত্মাখানি
ভুলি মরতের তুচ্ছ দুঃখ-দৈন্য-গ্লানি
স্নাত হয় নিরুপম নিত্য কুতূহলে
জগতের এ নবীন ত্রিবেণীর জলে !!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

লজ্জাশীলতা।

স্থূলতঃ মানব দ্বিপ্রকৃতি বিশিষ্ট। একটিকে পশু-প্রকৃতি ও অপরটিকে দেব-প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।

লজ্জাশীলতার স্বরূপ নির্ণয় করা বড় কঠিন। মানব-প্রকৃতির যে বিভাগ পশু-প্রকৃতির সহিত সমান, তাহাকে কতকটা নিয়মের ও সংযমের মধ্যে রাখার অভ্যাসই লজ্জাশীলতা। আহার, বিহার, চলন, উপবেশন, শয়ন, কথোপকথন, হাস্যকরন প্রভৃতি অনেক বাহ্যিক ক্রিয়া ও অঙ্গভঙ্গিকে নিয়মের ও বন্ধনের দ্বারা শাসিত করাই লজ্জাশীলতার প্রকৃত পরিচয়। যদি কেহ ধুপধাপ করিয়া চলে, সপ সপ করিয়া আহার করে, হো হো করিয়া হাস্য করে, কথা বলিবার সময় নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গি করে, তবে আমরা তাহাকে লজ্জাহীন বলিয়া থাকি।

লজ্জাশীলতা চরিত্রকে কোমল এবং মনোহারী করে, কুভাবকে হৃদয়ে ও মনে স্থান দিবার সুযোগ দান করে না। এই শাসন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে প্রয়োজন কিন্তু স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমলপ্রকৃতি এবং সৌন্দর্য্যের আধার; তাহার প্রকৃতিগত কোমলতার ও স্বাভাবিক মাধুর্য্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য পুরুষাপেক্ষা তাহার লজ্জাপালন ব্যবস্থা অধিকতর এবং কোন কোন স্থলে কঠোরতর। দেশ, জাতি ও সভ্যতা ভেদে লজ্জাশীলতার আদর্শের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় রমণী পদপল্লব দেখান বিশেষ লজ্জাজনক কার্য্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তিনি দেহের উপরাংশ যথেষ্ট নগ্ন রাখা রুচিসঙ্গত মনে করেন ; ভারতবাসীর চক্ষুতে তাহা লজ্জাহীনতার

পরিচারক। অশিক্ষিত, অসভ্য, দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের পরিচ্ছদ পরিধান, আহার ও কথোপকথন-প্রণালী অপেক্ষাকৃত ভদ্র শ্রেণীর অযোগ্য।

ভারত রমণীর লজ্জারক্ষার ব্যবস্থা একটা বিশেষ ব্যাপার; ইহার একটা স্বতন্ত্র মূর্ত্তি আছে। বহু শতাব্দীর ঘটনাচক্রে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এবং পুরুষের যথেচ্ছ ও কঠোর শাসনের অধীন থাকিয়া স্ত্রীজাতি আপনাদের মহত্ব ও শক্তি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে, এবং সেইজন্যই তাহাদের মধ্যে এই অদ্ভুত লজ্জার মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার অনুরূপ মূর্ত্তি জগতের অন্যত্র বিরল। সাময়িক প্রয়োজন ইহার উৎপত্তির কারণ হইলেও ইহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের কারণ নহে।

সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি এবং সুরুচির সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, এই দুইটি লজ্জাশীলতার সুফল। ভারতরমণী যে লজ্জা পালন করেন তাহার দ্বারা এতদুভয়ের স্ফূর্ত্তি না হইয়া বরং ক্ষয় হইতেছে।

আমাদের দেশে বৃহদবগুণ্ঠন লজ্জারক্ষার একটি প্রধান উপকরণ বলিয়া আচরিত ও স্বীকৃত হইয়া থাকে। অথচ প্রকাণ্ড অবগুণ্ঠন সত্বেও খাঁটি লজ্জার মাথা যে কত সময় ও কত প্রকারে চর্ব্বণ করা হয় তাহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যাঁহার ঘোমটার দৈর্ঘ্য দেড় হস্ত পরিমিত তিনি হয়ত একজন নামজাদা কোন্দল প্রিয়া মুখরা রমণী, তাঁহার পরিচ্ছদ-পরিধান প্রণালী নিতান্ত কদর্য্য। চক্ষুর ব্যবহার জীব মাত্রেরই একটি বহু প্রয়োজনীয় সম্পত্তি ও অধিকার। দর্শনশক্তি জ্ঞান ও তৃপ্তিলাভের একমাত্র উপায় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অবগুণ্ঠন দ্বারা তাহার সঙ্কোচ করা বিশেষ অনিষ্ট জনক। অবগুণ্ঠন বিহীন দেশে স্ত্রীলোক দর্শনের একটা উৎকট-লালসা নাই। যে বক্র দৃষ্টিতে এমন কি উচ্চশিক্ষাভিমানী ভদ্র-জনেরা অবগুণ্ঠিতা পরস্ত্রী দর্শনের ঔৎসুক্য দেখান তাহা সম্পূর্ণ নীতি ও সুরুচি বিরুদ্ধ। অবগুণ্ঠন চলাচলের পক্ষে বিষম অন্তরায়। স্বাধীন ও উন্মুক্ত চলাচলের অভাবে কিরূপ স্বাস্থ্যহানি হয় তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। এদেশে আচরিত অবগুণ্ঠন প্রথার একটি বিশেষ কৌতুককর ব্যাপার এই যে, পিত্রালয়ে ঘোমটার একরূপ প্রয়োজন নাই অথচ শ্বশুরালয়ে তাহা পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ কি।

অসঙ্গত লজ্জার ভাব পরিবারের ও সমাজের যত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, কথোপকথনের সঙ্কীর্ণ সীমা-নির্দ্দেশ তাহার মধ্যে প্রধান। বাকশক্তি মানবের একটি প্রকৃতিদত্ত বিশেষ অধিকার। যাহা প্রকৃতিদত্ত অধিকার সামাজিক হিসাবে তাহাকে নিয়মবদ্ধ না করিলে, তাহার একটা নূতন আকার না দিলে, তাহার অপব্যবহার করা হয়; তাহা হইতে অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। সেই বিচারে বাকশক্তিকে অবস্থা বিশেষে সংযত করা একটা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এ শাসন ও সংযম যখন সীমা ও যুক্তি অতিক্রম করে তখন তাহা ব্যাধিতে পরিণত হয়। মানবের মনের ভাব বাক্যে প্রকাশ পায়। বাক্য অসম্ভব মত সংযত হইলে ভাব পরিবর্ত্তনের বিশেষ বাধা ঘটে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাব বিনিময় না হইলে পরস্পরের সহিত সম্যক পরিচয় লাভ ঘটিয়া উঠে না। এক পরিবারভুক্ত পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সদ্ভাব, বিশ্বাস ও আকর্ষণের উৎপত্তি ও পরিণতি এইরূপে কঠোর বাধা প্রাপ্ত হয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই কথোপকথন সঙ্কোচ বিশেষ পরিতাপের বিষয়। এই জন্য পরস্পরকে জানিতে ও অনুসরণ করিতে উপযুক্ত সময়ের দশগুণ সময় কাটিয়া যায়। হিন্দু পরিবারে নবোঢ়া পত্নী বালিকামাত্র; স্বামীই তাহার অধিকাংশ বিষয়ে শিক্ষক ও নিয়ন্তা। উৎকট এবং অসঙ্গত লজ্জার খাতিরে স্ত্রীর শিক্ষার ও জ্ঞান লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সংসারের অসংখ্য অভাব, অশান্তি, অতৃপ্তি ও ক্লেশের মধ্যে মানবমন স্বভাবতঃ কিছু আরাম ও আমোদ চায়। মধুর ও মিষ্টা-লাপে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। সঙ্গীতে হৃদয় শান্তিলাভ করে এবং পবিত্রভাবাপন্ন হয়; কত ব্যক্তি ইহার অভাবে কুপথগামী হইয়াছে তাহা প্রমাণের অপেক্ষা করে না। লজ্জা রক্ষার অজুহাতে এ সমুদয়ের অবাধ অনুশীলন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

এই লজ্জাপালনের একটা হাস্যোদ্দীপক দিক আছে; নারীর পিত্রালয়ে কথোপকথনের সীমা একরূপ অনি-

র্দিষ্ট; শ্বশুরালয়ে তাহার সীমা খুব সংকীর্ণ। বিবাহের পর কিন্তু শ্বশুর অথবা স্বামীর ঘর স্ত্রীলোকের আপনার ঘর রূপে পরিণত হয়। অমার্জ্জিতরুচি, সম্মানজ্ঞানহীন অপরিচিত ভৃত্যাদির সহিত অনেক সময় লজ্জাহীন ভাবে কথোপকথনে বাধা নাই অথচ খুব নিকটসম্পর্কীয় আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন, দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ মার্জ্জিতরুচি শ্বশুর, ভাসুর প্রভৃতি আত্মীয়ের সহিত কথোপকথনে কড়া নিষেধ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে. ইহা বস্তুতঃ শোচনীয়।

পরিচ্ছদেই লজ্জাশীলতার প্রকাশ যথার্থভাবে হয়। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সহিত মানবজাতির রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং পরিচ্ছদাদির আদর্শ রুচি ও বিলাস বাসনার অনুযায়ী হইতেছে। সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদের শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হইতেছে। অবশ্য দেশের জল বায়ুর উষ্ণতা ও শৈত্যের আধিক্য ও অল্পতার উপর—পোষাকের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে একটা নূতন রকমের প্রথা প্রচলিত আছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের নরনারীর পোষাক অপেক্ষা বাঙ্গালার নরনারীর পোষাক অপর্য্যাপ্ত এবং পরিধান প্রণালীও বড় শিথিল এবং লজ্জাহানিকর। অবশ্য এ দেশের নারীরা পর্দানশীন। যাহারা স্বাধীনা তাহাদের অপেক্ষা পর্দানশীনদের পোষাকের পরিমাণ অল্প প্রয়োজনীয় হইলেও, তাহার পরিধান প্রণালী লজ্জারক্ষার উপযোগী হওয়া উচিত। আজ কাল সেমিজ প্রভৃতির ক্রম বিস্তার লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহা ব্যয় সাপেক্ষ। সাধারণ লোকের পক্ষে পশ্চিম দেশীয় রমণীদের পরিচ্ছদের অনুকরণ সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাবে এদেশে অন্যান্য আচার পদ্ধতির ন্যায়, লজ্জাশীলতার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অন্য সমুদয় জাতির দেশ ও জাতি বিশেষে নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে; কিন্তু বাঙ্গালী পুরুষ ও রমণীর কোন নির্দ্দিষ্ট পোষাক না থাকায় তাঁহারা কাহাকে অনুসরণ করিবেন এবং কোন্ জাতির পরিচ্ছদ অনুকরণ করিয়া অবলম্বন করিবেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ব্রাহ্ম রমণীরা পারসী রমণীদের পরিচ্ছদ প্রণালী অনুকরণ করিয়া তাহাই আচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের পরিধান প্রণালী প্রকৃত লজ্জারক্ষার যথেষ্ট অনুকূল, অথচ তাহা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর মহিলারা এইরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে খুব সুষ্ঠু দেখাইবে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

বাল্মীকির রাম ও ভবভূতির রাম।

"সাহিত্য" পত্রে কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় "কালিদাস ও ভবভূতি" শীর্ষক প্রবন্ধে "উত্তর চরিতের" রামচরিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে একস্থলে লিখিয়াছেন, "ভবভূতির রাম মূল রামায়ণের গল্প প্রায় কিছুই গ্রহণ করেন নাই। প্রথমতঃ রামায়ণের রাম বংশমর্য্যাদারক্ষার্থে ছলে সীতাকে বনবাসে দেন; ভবভূতির রাম প্রজানুরঞ্জনব্রতে বিনাছলে জানকীকে নির্ব্বাসিত করেন।" অপর একস্থলে লিখিয়াছেন, "বাল্মীকির রাম নিজের বংশমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য পতিপ্রাণা সীতাকে ছলে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ভবভূতি দেখিলেন যে, তাহাতে রামের চরিত্র মলিন হইয়া যায়। সর্ব্বত্র ন্যায় বিচারই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহার একদিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আর একদিকে ন্যায় বিচার। বংশ যাউক, রাজ্য যাউক, নিরপরাধিনীকে শাস্তি দিব না—এই রূপই তাঁহার মনের অবস্থা হওয়া উচিত। রাম জানেন যে, সীতা নিরপরাধিনী। যে রাজা বংশমর্য্যাদা রক্ষার্থ—নিরপরাধিনীকে নির্ব্বাসিত করেন, সে রাজার বংশমর্য্যদা রক্ষা হয় না, সে রাজা সবংশে নির্ব্বংশ হন। ভবভূতি দেখিলেন যে. এ রামে চলিবে না। তাই অষ্টাবক্রের সমক্ষে রামকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে,—

"স্নেহং দয়া তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতোনাস্তিমে ব্যথা॥

"ভবভূতি দেখাইলেন যে রাজার প্রধান ধর্ম্ম প্রজারঞ্জন। সেই প্রজারঞ্জনরূপ কর্ত্তব্য পালনের জন্য রাম নিরপরাধিনী সীতাকে বনবাস দিলেন। এইরূপে ভবভূতি

রামের চরিত্রকে দোষশূন্য করিয়া লইলেন। "ভবভূতি আর একস্থলে রামকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজা শূদ্রক যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি, তাঁহার শিরচ্ছেদের পরে যে তিনি দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জনস্থান দেখাইতে লাগিলেন, এরূপ ব্যাপার রামায়ণে নাই। রামায়ণের রাম, শূদ্রক শূদ্র হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছিল, এই অপরাধে তাহাকে বধ করেন। ভবভূতি দেখিলেন, এ অত্যন্ত অবিচার। পুণ্যকার্য্যের জন্য প্রাণদণ্ড? এ রামে চলিবে না। তাই তাঁহার রাম কৃপা করিয়া তরবারি দ্বারা শূদ্রককে শাপমুক্ত করিলেন।" বাল্মিকীর রামের বিরুদ্ধে উপরিলিখিত দুইটী অভিযোগ উত্থাপন করিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু রামের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন মনে হইতেছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রথম অভিযোগ—'বাল্মিকীর রাম বংশমর্য্যাদা রক্ষার্থ ছলে সীতাকে বনবাসে দেন। বিনা বিচারে সীতাকে বনবাসে দেওয়া রামের অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।'

বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া এরূপ মনে হইবার কারণ নাই। বাল্মীকির রামায়ণে এ সম্বন্ধে বৃত্তান্তটী সংক্ষেপে এইরূপ:—

"সীতাঽপি দেব কার্য্যাণি কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকানিবৈ।
শ্বশ্রূণামকরোৎ পূজাং সর্ব্বাসামবিশেষতঃ॥
অভ্যগচ্ছত্ততো রামং বিচিত্রা ভরণাম্বরা।
ত্রিপিষ্টপে সহস্রাক্ষমুপবিষ্টং যথা শচী॥
দৃষ্টাতু রাঘবঃ পত্নীং কল্যাণেন সমন্বিতাম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ॥
অব্রবীচ্চ বরারোহাং সীতাং সুরসুতোপমাম্।
অপত্যলাভো বৈদেহি ত্বয্যয়ং সমুপস্থিতঃ॥
কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কিং ক্রিয়তাং তব।
স্মিতাং কৃত্বাতু বৈদেহী রামং বাক্যমথাব্রবীৎ॥
তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব।
গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামৃষিণমুগ্রতেজসাম্॥
ফলমূলাশিনাং দেব পাদমূলেষু বর্ত্তিতুম্।
এব মে পরমঃ কামো যন্মূল ফলভোজিনাম্॥
অপ্যেব রাত্রিং কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে।
তথেতিচ প্রতিজ্ঞাতং রামেণাক্লিষ্ট কর্ম্মণা॥
বিশ্রব্ধাভব বৈদিহি শোগমিষ্যস্যসংশয়ম্।
এবমুক্ত্বাতু কাকুৎস্থো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
মধ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম সুহৃদ্বৃতঃ॥"

বাল্মীকির রাম সীতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "তুমি আশ্বস্তা হও; আগামী কল্য (তপোবনে) যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।" এস্থলে সীতা ও রামকে বলিতেছেন না যে তোমাকে আমার সহিত তপোবনে যাইতে হইবে, অথবা রাম ও সীতার নিকট কহিতেছেন না যে তিনিও তপোবনে যাইবেন। উত্তর-চরিতে সীতা রামকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "নাথ! তুমিও আমার সঙ্গে যাবেতো?" রাম উত্তর করিতেছেন, "কঠিন-হৃদয়ে! এও কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়?" অর্থাৎ রাম নিশ্চয়ই সীতার সহিত যাইবেন। অতঃপর উত্তর-চরিতে বর্ণিত ঘটনা এই। রাম, লক্ষ্মণকে রথ প্রস্তুত করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ চলিয়া গেলেন। সেই অবকাশে রাম সীতাকে লইয়া গবাক্ষের পার্শ্বে নির্জ্জনে শয়ন করিতে গেলেন। সীতা রামের বাহু উপাধান করিয়া নিদ্রিতা হইলেন। রাম ভাবিতেছেন, "কিমস্যাঃ ন প্রেয়োযদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ" এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া বলিল, "মহারাজ সে এসেছে।" রাম চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আসিয়াছে?" প্রতিহারী দুর্ম্মুখের আগমন বার্ত্তা জানাইল। রামের আদেশ ক্রমে প্রতিহারী দুর্ম্মুখকে রামের সমীপে আনিল। দুর্ম্মুখ রামের কাণে কাণে সীতা সম্বন্ধে লোকাপবাদের কথা বলিল। শুনিয়া রাম প্রথমে মূর্চ্ছিত হইলেন। তার পর অনেক কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রাম বলিতেছেন যে,—

'সূর্য্যবংশ-নৃপতিরা যেই কুল করেন উজ্জ্বল।
তাঁদের চরিত্র কিবা সাধু শুদ্ধ পবিত্র নির্ম্মল!
জনমিয়া সেই কুলে যদি তাহে কলঙ্ক পরশে।
ধিক্ এ জীবনে মোর ধিক মোর কুলমান যশে॥ *

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তর-চরিতের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

তার পর দুর্ম্মুখকে বলিতেছেন যে, "লক্ষ্মণকে বলোগে যে, তোমাদের নূতন রাজা রাম এই আদেশ ক'রচেন (কাণে কাণে) এই...এই।" দুর্ম্মুখ রামের আদেশের বরং প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে. "দেবীর অগ্নিশুদ্ধি হ'য়ে গেছে, তাতে আবার তিনি এখন অন্তঃসত্বা—এরূপ অবস্থায় কি প্রকারে তাঁর প্রতি এমন ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন মহারাজ?" তাহাতে রাম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "না, তুমি ওরূপ কথা কহিওনা। পৌরজনকে বৃথা দোষ দিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের নিকট ঈক্ষ্বাকুর কুল শ্রদ্ধেয়; তাহাদের বলিবার অবশ্য কোনো মূল আছে। অগ্নিশুদ্ধি দূরদেশে সংঘটিত হয়; এখন কে তাহা প্রত্যয় করিবে বল?" তার পর দুর্ম্মুখ চলিয়া গেলে রাম পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সীতাকে নিদ্রিতাবস্থায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে সীতা জাগিলে পর দুর্ম্মুখ আসিয়া বলিল যে, "দেবি! কুমার লক্ষ্মণ বললেন রথ সজ্জিত, আপনি এখন আরোহণ করিতে পারেন।" সীতা রথে আরোহণ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

ভবভূতির রামও বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক দেখা যাইতেছে। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজারা প্রজারঞ্জক বলিয়া জগতে বিখ্যাত। সেই বংশে জন্মিয়া যে রাজা প্রজারঞ্জন না করেন, তাঁহা দ্বারা সেই কুল কলঙ্কিত হয়। রামের পক্ষে বংশমর্য্যাদা রক্ষা করা এবং প্রজারঞ্জন করা একই কথা। সেই জন্য অষ্টাবক্র মুনি আসিয়া যখন রামকে বলিলেন যে বশিষ্ঠ আপনাকে বলিয়াছেন যে, "তুমি প্রজানুরঞ্জনে সর্ব্বদা তৎপর হইবে। তাহা হইলে তুমি যশোলাভ করিবে।" তখন রাম বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন, "স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং" ইত্যাদি। এই কথাকে কি প্রজারঞ্জন বিষয়ে অষ্টাবক্রের নিকট রামের প্রতিজ্ঞা বলিয়া বুঝিতে হইবে? অথবা বুঝিতে হইবে যে রাম প্রজারঞ্জন বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিতে পূর্ব্বহইতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কেবল সেই কথা অষ্টাবক্রের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন? তর্কস্থলে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে রাম প্রজারঞ্জনের জন্য আবশ্যক হইলে জানকীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, অষ্টাবক্রের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সীতাকে নির্ব্বাসিত করেন। তাহা হইলে, কেবল মাত্র দুর্ম্মুখের নিকট লোকাপবাদের কথা শুনিয়া আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, সীতার মুনিদিগের তপোবন দেখিবার অভিলাষকে উপলক্ষ্য করিয়া সীতাকে বনে রাখিয়া আসিবার আদেশ দিয়া যদ্যপি ভবভূতির রাম দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট নির্দ্দোষ বিবেচিত হন, বাল্মীকির রামের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্র বাবু একটী কথাও বলিতে পারেন না।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে বাল্মীকির রাম সীতাকে তপোবনে পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া সুহৃদ্‌পরিবৃত হইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। এবং 'সভ্যগণ আনন্দিত মনে পরিহাস করিতে করিতে মহাত্মা রামের নিকট নানা কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন।' কথা প্রসঙ্গে রাম জানিতে চাহিলেন:—

"কাঃ কথা নগরে ভদ্র বর্ত্তন্তে বিষয়েষুচ॥ মামাশ্রিতানি কান্যাহুঃ পৌরাজানপদা জনাঃ। কিঞ্চ সীতাং সমাশ্রিত্য" ....ইত্যাদি। রাম এই কথা কহিলে ভদ্র করযোড়ে বলিলেন, "রাজন্ পুরবাসীরা অনেক শুভ কথারই উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু সৌম্য পুরুষ, প্রবর, রাবণ বধ ব্যাপার লইয়া পুরবাসীরা আপন আপন গৃহে বসিয়া নানা কথার আন্দোলন করে।' সে কথা শুনিয়া রাম কহিলেন, "পুরবাসীরা যে সকল ভাল বা মন্দ কথা বলিয়া থাকে তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ যথার্থ আমার নিকট বল। আমি তাহা শুনিয়া এখন হইতে মন্দ কাজ না করিয়া ভাল কাজই করিব। পুরবাসীরা নগরে যেরূপ পাপ কথার আলোচনা করিয়া থাকে তুমি মনে কোনরূপ দ্বিধা বা কষ্ট না করিয়া বিশ্বস্ত ও নির্ভয়-চিত্তে আমাকে বল।" তখন ভদ্র রামকে সীতার অপবাদ সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন:—

"হত্বা চ রাবণং সঙ্খ্যে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনরানয়ৎ॥
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্॥

লঙ্কামপি পুরীং নীতামশোকবনিকাংগতাম্।
রক্ষসাংবশমাপন্নাং কথং রামেন কুৎস্যতি॥
অস্মাকমপিদারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথাহি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে॥
এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুর-বাসিনঃ।
নগরেষু চ সর্ব্বেষু রাজন্ জনপদেষু চ॥

রাম এই কথা শুনিয়া নিতান্ত পীড়িত চিত্তে অন্যান্য সুহৃদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র যাহা বলিতেছে তাহা কি সকলেই আমাকে বলে?" তাঁহারা দুঃখিতান্তঃকরণে রামকে কহিলেন, "ভদ্র যাহা কহিল, তাহা সত্য ইহাতে সংশয় নাই।" তখন রাম সুহৃদবর্গকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণ, ভরত, ও শত্রুঘ্নকে ডাকাইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতা নির্ব্বাসনের আদেশ দিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধে বাল্মীকির রামায়ণের এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ভবভূতির রাম অপেক্ষা বাল্মীকির রামের প্রশংসা করিয়াছেন; অথচ বলিতে ছাড়েন নাই যে "রামায়ণের রাম ছল করিয়া সীতাকে বনবাসে দিয়াছিলেন, সীতার অপেক্ষা স্বীয় বংশমর্য্যাদা তাঁর প্রিয়তর ছিল।"

বাল্মীকির রাম ভদ্রের মুখে সীতার অপবাদের কথা শুনিয়াই কর্ত্তব্য নির্ণয় করিলেন না। অন্যান্য সভ্যগণের নিকট হইতে এই লোকাপবাদের সত্যতা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলেন। রামের সভার সভ্যেরা চাটুকার ছিলেন না। অতিশয় অপ্রিয় হইলেও তাঁহারা রামকে জানাইলেন যে 'ভদ্র যাহা কহিতেছে তাহা সত্য। সকল প্রজাই আপনার অপবাদ করিতেছে।' দশরথ রাজার অমাত্যগণের বর্ণনা করিতে গিয়া বাল্মীকি লিখিয়াছেন যে তাঁহারা এমন ন্যায় বিচারক ছিলেন যে তাঁহাদের পুত্রেরা ও যদি দোষী হইত তাহাদিগকে যথোচিত দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। "প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি।" দেখা যাইতেছে যে রামের অমাত্যগণও দশরথের অমাত্যদিগের তুল্য। তাঁহারা প্রয়োজন হইলে রাজাকেও অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে পশ্চাৎপদ নন। প্রজাগণের অপবাদ সঙ্গত হউক কি অসঙ্গত হউক তাহারা যে রাজার অপবাদ করিতেছে একথার রাম যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেন। প্রজাগণ কি বলিয়া রামের নিন্দা করিতেছে? না, রাবণ পূর্ব্বে সীতাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া সত্বেও

'কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্'

এখন প্রজাগণকেও তাহাদের স্ত্রীদিগের এই দোষ সহিতে হইবে; কারণ,

'যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে।'

সকল দিক বিবেচনা করিলে প্রজাগণের এ অপবাদ নিতান্ত অসঙ্গত বলা চলে না। এমত অবস্থায় রাম প্রজাদিগের মঙ্গল কামনায় এবং লোকাপবাদ দূর করিবার জন্য সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া রাজধর্ম্মই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রাম, লক্ষ্মণাদির নিকট সীতা নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিবার সময় বংশমর্য্যাদার কথা বলেন নাই—লোকাপবাদ ও অকীর্ত্তির কথাই বলিয়াছেন; কেবল মাত্র একবার বলিয়াছেন,—

অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্।

ইহা হইতে এমন বুঝায় না যে সীতার অপেক্ষা স্বীয় বংশমর্য্যাদাই রামের প্রিয়তর ছিল। বরং ইহা দ্বারা এই বুঝায় যে সীতাসম্ভোগ-জনিত-সুখ অপেক্ষা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন রামচন্দ্র উচ্চতর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতীত পতিপত্নীর মধ্যে পবিত্রতর সম্বন্ধ আছে। রাম সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাঁহার সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সীতা যতটুকু 'ইন্দ্রিয়ার্থ' ততটুকুই ত্যাগ করিয়াছিলেন; সীতার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন নাই; সীতার ধর্ম্মপত্নীত্ব কখনই অস্বীকার করেন নাই। তাহার প্রমাণ রাম যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তখন সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমার সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সস্ত্রীক যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া শাস্ত্রের বিধান। রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ না করিয়া সীতার কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তির সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়াতেই বুঝা যাইবে যে তিনি সীতার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন নাই; এবং লক্ষ্মণকে সীতার নির্ব্বাসনের সময় যে বলিয়াছিলেন "অন্তরাত্মাচমে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্" তাহা নিতান্ত কথার কথা নয়, তাহা রামের

অন্তরের কথা। লক্ষ্মণ যখন সীতার নিকট নির্ব্বাসনের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন তখন তাহা শুনিয়া সীতা রামের নিন্দা করিলেন না কিম্বা তাঁহাকে রাম অবিচারে অন্যায় করিয়া নির্ব্বাসিত করিতেছেন এমন কথাও বলিলেন না।

যথাজ্ঞাং কুরু সৌমিত্রে ত্যজ মাং দুঃখভাগিনীম্।
নিদেশে স্থীয়তাং রাজ্ঞঃ শৃণুবেদং বচোমম॥
শ্বশ্রূণামবিশেষেণ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহেণচ।
শিরসাভিনতো ব্রূয়া সর্ব্বাসামেব লক্ষ্মণ॥
শিরসা বন্দ্য চরণৌ কুশলং ব্রূহি পার্থিবম্।
বক্তব্যশ্চাপি নৃপতি ধর্ম্মেষু সুসমাহিতাঃ॥
জানামি চ তথা শুদ্ধা সীতাতত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা যা হিতা তব নিত্যশঃ॥
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে
যচ্চতে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ॥
ময়াহি পরিহর্ত্তব্যং ত্বং হি মে পরিমাগতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতি ধর্ম্মেণ সুসমাহিতাঃ॥
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথাস্তথা পৌরেষু নিত্যদা।
পরমোহ্যেষ ধর্ম্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তিরনুত্তমা॥
যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ।
অহন্তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ॥
যথাপবাদং পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।
পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধু পতিগুরুঃ॥
প্রাণৈরপি প্রিয়ংতস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।
ইতি মদ্বচনাদ্রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ॥

অর্থাৎ লক্ষ্মণ, রাজা তোমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন তাহা তুমি পালন কর; আমি নিতান্ত দুঃখভাগিনী, অতএব আমাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া রাজাদেশ পালন কর। আমার একটি কথা শুন। লক্ষ্মণ, তুমি আমার প্রতিনিধি স্বরূপ করযোড়ে নত মস্তকে মহারাজের চরণ যুগলে প্রণাম করিয়া শ্বশ্রূদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে আমার প্রতিনিধি হইয়া তুমি বলিবে, রঘুনন্দন, সীতা কিরূপ শুদ্ধস্বভাবা, আপনার প্রতি ভক্তিমতী এবং আপনার কিরূপ হিতাভিলাষিণী, তাহা আপনি বিশেষরূপে জানেন। বীর, আপনি যে নিন্দা ভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বিশেষতঃ আপনি আমার পরমাগতি, সুতরাং যাহাতে আপনার নিন্দা বা অপবাদ হয় এরূপ কার্য্য করা আমার উচিত নয়। নিতান্ত ধর্ম্মশীল সেই রাজাকে বলিবে যে, তিনি ভ্রাতৃবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন পুরবাসীদের প্রতিও যেন সতত সেইরূপ ব্যবহার করেন। রাজন্! পৌরজনের ধর্ম্মরক্ষণ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় হইবে আপনার তাহাই ধর্ম্ম, এবং তাহাতেই আপনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন। আমি পৌরজনের নিন্দাবাদ এবং রামচন্দ্রের জন্য যেরূপ অনুশোচনা করি নিজের দেহের জন্য সেরূপ শোক করি না। পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, পতিই গুরু, পতিই গতি, পতিই বন্ধু, সুতরাং প্রাণ দিয়াও পতির প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। ইহা রামের ধর্ম্মপত্নী সীতার উপযুক্ত কথা। ইহাকে রামের প্রতি সীতার তীব্র ব্যঙ্গোক্তি বলিলে চলিবে না। কারণ লঙ্কায় অগ্নি পরীক্ষার পূর্ব্বে রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন সীতার সতীত্বগর্ব্বে আঘাত লাগায় তিনি দলিতাফণিনীর ন্যায় জ্বালাময়ী ভাষায় রামের বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন।

লোকাপবাদ নিবারণ করিয়া রাজধর্ম্ম পালনের জন্য সীতার নির্ব্বাসন শ্রেয়, আর অন্তরাত্মা যখন সীতাকে বিশুদ্ধা বলিয়া জানে তখন অন্যায় লোকাপবাদে কর্ণপাত না করিয়া সীতার সহিত একত্র বাস প্রেয়। এই শ্রেয় এবং প্রেয়র মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে রাম প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "রাজার কর্ত্তব্য নহে, প্রজারা যাহা বলে তাহা শোনা—রাজার কর্ত্তব্য ন্যায় বিচার।" কিন্তু সকল প্রজাই যদি কোন বিষয়ে রাজার নিন্দা করে রাজা সে কথা না শুনিয়া কি করেন? রাজার দুইটী পন্থা আছে। হয় রাজা বলিবেন যে,—

নিন্দা আর নহি ডরি।
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্দ্ধিত রসনা তার দৃঢ়-বলে চাপি'
মোর পাদপীঠ তলে।

না হয় যাহাতে প্রজারা আর নিন্দা করিতে না পারে তাহাই করিবেন। বর্ত্তমান কালের সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে একটা কথা চলিত আছে যে ‘সাধারণের কথা আর ঈশ্বরের কথা একই’ (Vox populi Vox Die) প্রকৃত পক্ষে দেশের সকললোকে মিলিয়া কোনো কথা বলিলে তাহা বড় একটি ফেলিবার জিনিষ হয় না। সাধারণের অভিমতের শক্তি অসীম। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞগণ কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এবং অধিকাংশ প্রজারা যে দিকে মত দিবেন তদনুসারে দেশের শাসন কার্য্য চলিবে। রাম বহু বহু পূর্ব্বে জনসাধারণের মতের মূল্য কি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি এখন পর্য্যন্ত আদর্শ রাজা।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, ‘ভবভূতি রাম-সীতার মিলন করিয়া কাব্য কলা ও poetic justice এর শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। বাল্মীকি সীতাকে পাতালে প্রবেশ করাইয়া ঠিক করিয়াছেন। যেহেতু রাম সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া পাপী। পাপী রাম সীতাকে পাইবার যোগ্য নহেন।’ অথচ দ্বিজেন্দ্র বাবুই বলিয়াছেন যে পৃথিবীর সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কার ধর্ম্মের পরিমাপক নহে! রাজধর্ম্মপালন করা সত্বেও যে রাম মৃত্যু পর্য্যন্ত সীতার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন তার কারণ,

> “ধর্ম্ম নহে সম্পদের হেতু,
> নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,
> ধর্ম্মেই ধর্ম্মের শেষ।”

রাজধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য সীতাকে নির্ব্বাসিত না করিলে রামের রামত্ব থাকিত না। অজ রামের অবস্থায় পতিত হইলে বোধ হয় রাজধর্ম্ম প্রতিপালন অপেক্ষা পত্নীর কর্ত্তব্য পালনটা শ্রেয়স্কর মনে করিতেন এবং আবশ্যক হইলে ইন্দুমতীকে লইয়া বনে চলিয়া যাইতেন। বাল্মীকির রাম আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ বীর, আদর্শ পিতা, আদর্শ রাজা। এক কথায় তিনি সকল গুণের আধার। বাল্মীকির উপর কলম চালাইতে গিয়া এপর্য্যন্ত কেহই সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ. ‘বাল্মীকির রাম শূদ্রমুনি শম্বুককে বধ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলেন। পুণ্য কার্য্যের জন্য দণ্ড কেন?

রামায়ণের প্রথমেই রামের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি বলিতেছেন যে রাম

> “রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য পরিরক্ষিতা॥
> রক্ষিতা স্বস্য ধর্ম্মস্য।”

ত্রেতা যুগে শূদ্রের তপস্যা নিষিদ্ধ ছিল। শম্বুক শূদ্র হইয়া ত্রেতাযুগে তপস্যা করায় রামের হস্তে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের রক্ষিতা রামকে যদি শাস্ত্রের বিধান মতে চলিতে হয়, তবে শূদ্রকের মুণ্ডচ্ছেদন তাঁহাকে করিতেই হইবে। এমতাবস্থায় রাম শম্বুকের বধসাধন করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন একথা বলা যাইতে পারে না। তপস্যা পুণ্য কার্য্য হউক; কিন্তু যদি কেহ অনধিকারী হইয়া সেই পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

কোনও কার্য্য করিবার উদ্দেশ্য হাজারই মহৎ হউক না কেন, কিন্তু সে কর্ম্ম যদি নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে যিনি সে কর্ম্ম করিবেন তাঁহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে। এইরূপ স্থলে দণ্ডদাতার দোষ দিলে চলিবে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

বিদায়।

আমাদের নূতন ভৃত্য কেনারাম নাকি এপর্য্যন্ত কোথায়ও বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। অথচ তাহার মত পরিশ্রমী ও সভ্য চাকর কলিকাতার এই টেরি-কাটা ভৃত্য-সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এমন কাজ ছিল না যে কেনারাম না জানিত।

খানসামার কাজ, ঝির মেয়েলী কাজ, তা ছাড়া লেখাপড়ার কাজও কিছু কিছু সে জানিত। অথচ তাহার মাহিনার ‘কামড়’ এতটুকু ছিল না। এই জন্যই বোধ হয় সে আমার, বিশেষতঃ আমার গৃহিণীর বড়ই

'পেয়ারের' চাকর হইয়া উঠিয়াছিল!—মানুষ চিরকালই স্বার্থপর।

কেনারাম মাহিনার প্রয়াসী ছিল না বটে কিন্তু মাহিনার চেয়ে একটু উঁচুদরের জিনিষের দিকে তার নজর ছিল—সে চার টাকা মাহিনার স্থলে আড়াই টাকা লইতে রাজী যদি তার সঙ্গে সে একটু আদর যত্ন পায়।

সে যেদিন প্রথম আসে তাহাকে মাহিনা কত জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল—যা হয় দেবেন, আমার টাকার বেশী দরকার নেই—আমার তো কেউ নেই যে খাওয়াতে হবে!" আমি সংসারী লোক—একটা 'পাকা' কথা শুনিতে চাই—বলিলাম "যা হয় বললে তো হয় না—একটা ঠিকঠাক্ করা চাই তো।"

কেনারাম আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"আমার যদি বাবু এখানে মন টেঁকে যায় তা হলে দু-টাকা হলেও থাক্‌বো।"

চার টাকার জায়গায় দু-টাকা!—গৃহিণী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন. তাঁহার চোখের ভাব—"খুব সস্তা!"

কিন্তু আমি পুরুষ মানুষ, তার উপর 'আইন' ঘাঁটিয়া খাই, মনে কেমন একটা সন্দেহ বিঁধিতে লাগিল—"চোর টোর নয় তো?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর কোথায় ছিলে?" কেনারাম অসঙ্কোচে বলিল—"অনেক জায়গায়।"

"সে সব জায়গা ছাড়লে কেন?"

"মন টেক্‌লনা—"

"মন টেক্‌লনা!"

"আজ্ঞে—হাঁ,—সে সব মনিবেরা চাকরকে শুধু গরুর মত খাটাতেই—"

আমি তাহার অসমাপ্ত কথায় বাধা দিয়া বলিলাম "খাট্‌বার জন্যেইত রাখা!"

"আজ্ঞে খাট্‌বনা কেন? কিন্তু চাকর থাকরে একটু 'দরদ যত্ন'ও পেতে চায়!"

'অসভ্য' লোক যে এমন 'সেন্টিমেণ্ট্যাল্' হয়, আমার ধারণা ছিল না, কিম্বা লোকটা পাকা বদমায়েস! যাই হউক গৃহিণীর নয়ন-টেলিগ্রাফের নীরব হুকুমে শেষে বাধ্য হইয়া নূতন চাকর বহাল করিলাম! আপাততঃ মাহিনা কিছুই ধার্য্য হইল না।

কিছু দিন তাহার উপর একটু দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল কিন্তু শেষে আমারি উকিলী বুদ্ধিরই ব্যর্থতা প্রকাশ পাইল—কেনারাম সে ধরণেরই লোক নয়!

কেনারাম টাকাকড়ি তেমন চাহেনা—একটু আদর যত্ন চায় এ কথাটা গৃহিণীর আমার বেশ ভাল রকম মনে ছিল, সুতরাং তিনিও কেনারাম যা' চায় তাহাই দিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম গৃহিণী স্বার্থের খাতিরে কেনারামকে দরদ যত্ন করিতেন কিন্তু কিছু দিন না যাইতে তিনি বাস্তবিকই তাহাকে 'টান' করিতে লাগিলেন; তবে, সেটা নারীহৃদয়ের মাহাত্ম্য কি কেনারামের নিজের গুণ তাহা বলা সুকঠিন।

যাইহক, গৃহিণী কেনারামকে আপন সন্তানের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। কোন ভাল খাদ্যদ্রব্য আসিলে তিনি তাঁর সতু'র জন্য যেমন তুলিয়া রাখিতেন তেমনি কেনারামের জন্যও না রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না!

(২)

চিরাগত প্রথায়, গৃহিণী ভৃত্যকর্ত্তৃক মাতৃসম্বোধনে ভূষিতা হইতেন বটে কিন্তু গৃহিণীর স্বামীটিকে এপর্য্যন্ত কোন ভৃত্য পিতৃত্বের আসনে বসাইয়া গৃহিণীর উপর কর্ত্তার স্বামীত্বের 'রাইট' টুকু সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু কেনারাম আমায় পিতৃ-সম্বোধন করিয়া গৃহিণীর উপর আমার পতিত্বের 'পাট্টা' খানি আরো একটু বেশীরকম 'কায়েমী' করিয়া তুলিয়াছিল! বলাবাহুল্য ইহাতে সে আমারও একটু প্রিয় হইয়াছিল। দেখিতেছি স্নেহ-সম্বন্ধের নকল ডাকেও কি একটা মাদকতা আছে!

কেনারাম বেশ মনের স্ফূর্ত্তিতে চাকরী করিতে লাগিল; আমরাও তাকে সাধ্যমত যত্ন মমতার অদৃশ্য বন্ধনে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম!

কেনারাম নিয়োগের পর হইতে কিন্তু বাড়ীতে একটি জিনিষের বড় উপদ্রব আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে কখন কখন দূরে শৃগালের ডাক শুনা যাইত কিন্তু ইদানীং আন্দরে অবধি শৃগাল ডাকিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্য্যের

বিষয় ছিল এই, শৃগাল এক দিনও কাহারো চোখে পড়িত না। দ্বার বন্ধ থাকা সত্বেও শৃগালের ডাকের ব্যতিক্রম হইত না!

এই সময় বাড়ীতে একজন নূতন 'ঠাকুর' বাহাল হইল। সেই নূতন পাচক কেনারামকে দেখিয়া বলিল, "কিরে তুই এখানে?"

তাহাকে দেখিয়া কেনারাম মুহূর্ত্তের জন্য যেন কেমন হইয়া গেল কিন্তু ঠাকুরের চোখের ভাবে কি বুঝিয়া হঠাৎ তাহার সেই ভাব কাটিয়া গেল!

আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ও তোমায় দেখে অমন করলে কেন? ওকে তুমি চেনো?

ঠাকুর বলিল—"আজ্ঞে মাঝে মাঝে ওর অমন হয়, কেমন একটা রোগ!"

কেনারামও যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া ঈষৎ হসিয়া বলিল—"আজ্ঞে হাঁ—মাঝে মাঝে আমার ঐরকম হয়! ক'মাস মোটেই হয়নি—আবার দেখছি"—

আমি বলিলাম, "নবীন ডাক্তার আসে, বলতে পারিস না?"

এইরূপে কিছু দিন গেল। ক্রমে বাড়িতে শুধু শৃগালের ডাক নহে, আরো অনেক রকম জীবজন্তুর ডাক, এমন কি মাঝে মাঝে সদ্যঃজাত শিশুর ক্রন্দন শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যাইতে লাগিল।

ইহাতে গৃহিণী,—গৃহিণী কেন—সকলেই একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। পাড়ায় এক 'ভট্টাচার্য্য' ছিলেন তিনি 'কামরূপ' হইতে অনেক 'মন্ত্রতন্ত্র' শিখিয়া আসিয়াছিলেন—জ্যোতিষও নাকি জানিতেন। তিনিই পাড়ার গণক এবং ভৌতিক চিকিৎসক! তাঁহার নিকট গিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলাম এবং কেনারাম বাড়ীতে আসা অবধি যে এই উপদ্রবের সূত্রপাত হইয়াছিল একথাটুকুও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, "করেছ কি?—তোমার ও চাকর যে একটি অ-মুক্ত প্রেত-যোনি—মানুষের দেহ ধারণ করে তোমার সংসারে ঢুকে তোমাদের অকল্যাণ করছে! এখনি বিদায় করে দাও—এখনি বিদায় করে দাও!

আমার কনিষ্ঠ ভাই জিতেন এই কথা শুনিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল ও 'ভট্টাচার্জ্জির' কথা অবিশ্বাস করিয়া বলিল ও ভট্টচার্জ্জির সব বুজরুকী—বোধ হয় চারকটার ওপর নিজের লোভ পড়েছে!"

আমি জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলাম—"রাধেকৃষ্ণ!"

জিতেন তখন সেই অনিষ্টের মূলাধার শৃগালটিকে বধ করিয়া ভট্টাচার্য্যের গণনা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল!

'জবাব' হইল শুনিয়া কেনারাম কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল "কি দোষে আমায় ছাড়িয়ে দিচ্চেন?'

যথার্থ কারণ বলিতে ভট্টাচার্য্যের নিষেধ ছিল সুতরাং বলিলাম—"না আমি তোমায় রাখব না।"—মনে মনে বলিলাম—"কি আপদ!—ঐ জন্যে সংসারের 'শ্রী' আর কিছুতেই হয় না!"

কেনারামের চাকরী গেল! রাত্রিটুকু থাকিয়া সকালেই সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে স্থির হইল! গৃহিণী বলিলেন—"পোড়া ভূতটা আজ রাত্রে গেলেই বাচতুম!" আমি বলিলাম "থাক্ গাল টাল আর দিয়ে কাজনেই!"

* * *

সেই রাত্রে আবার উঠানের মাঝে নিয়মিত সময়ে শৃগালের ডাক শুনা গেল! পর মুহূর্ত্তেই বন্দুকের 'গুড়ুম' শব্দে অমাবস্যার অন্ধকার যেন কাঁপিয়া উঠিল! আর সেই সঙ্গে একটা গুরুদ্রব্য পতনের শব্দ হইল এবং বস্তুটা গোঁ গোঁ করিতে লাগিল! নীচে নামিয়া আসিয়া দেখি তাহা শৃগালও নহে প্রেতও নহে; ভৃত্য কেনারাম প্রভুর নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতেছে!

নূতন ঠাকুর আসিয়া বলিল—হায় হায়! "কেনারাম শিয়ালের ডাক ডাক্‌তে গিয়ে শেষে প্রাণটা দিলে!"

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি রকম? কেনারাম শিয়ালের মত—"

"আজ্ঞে ও একজন চমৎকার 'হরবোলা' আর 'হরবোলা'র ব্যবসা যদি করত তাহলে এমন করে প্রাণ দিতে হত না।"

"একথা তুমি আমাদের বলনি কেন?"

"ওরই বারণে বলিনি বাবু। ঐরকম ডাকার জন্যে অনেক জায়গায় ওর চাকরী যাওয়ায় ও বলতে মানা

করেছিল! শেয়ালের ডাক ডাকা ওর একটা কেমন নেশা ছিল, না ডেকে থাক্‌তে পারেনা! মাঝে মাঝে ডেকে উঠে!

জিতেন এতক্ষণ নিকটে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হাতে বন্দুক! তাহার দিকে চাহিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম কে যেন তার দুই চোখে কেনারামের টকটকে কাঁচারক্ত মাখাইয়া দিয়াছে! হঠাৎ সে একটা বিকট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। চিকিৎসার ত্রুটি করিলাম না, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল! সে আজো শৃগালের ডাক শুনিলেই কেমন একটা বিকট শব্দ করিয়া উঠে!

অনেক কষ্টে সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিলাম বটে কিন্তু বন্দুকের 'পাস' সরকারে কাড়িয়া লইল!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রভাত বাবুর গল্পগুলি শরবৎ-এর মত তৃপ্তিদায়ক, অতি মিষ্ট, সময় সময় অম্ল-মধুর। ইহাদের প্রবাহ স্বচ্ছ স্রোতোয়া নির্ঝরিণীর মত,—সর্ব্বদা অবাধ দ্রুতগতিতে অবাধভাবে বহিয়া চলিয়াছে। তাহার প্রায় প্রত্যেক গল্পই মনোরম, উজ্জ্বল, অতিশয় স্পষ্ট,—কোথাও কিছুমাত্র জড়তা নাই,—ঠিক যেন একটি প্রফুল্ল শারদ প্রভাতের মত। বিয়োগান্ত গল্প তাহার বড় নাই, যে দুই একটি আছে, তাহার বিয়োগ-ব্যথাও পাঠকের হৃদয়কে অভিভূত করিয়া দেয় না। গল্পগুলিতে অস্বাভাবিকতা কোথাও কিছুমাত্র নাই,—যেন এক একটি নিখুঁত ফটো তিনি সমস্ত পরিষ্কার করিয়া পাঠকের চোকের সম্মুখে ধরেন, পাঠকের কল্পনাকে কিছুমাত্র কাজ করিতে দেননা। ফলে, পাঠকগণ এগুলি পড়িয়া উঠিয়া চিন্তা করিবার কিছুই পান না, তাহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে না, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে না; অথচ পাঠকের মন এক সম্পূর্ণ উপভোগের বিমল আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে। শরৎ প্রভাতের বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতির মত এগুলি পাঠকের মনের মধ্য দিয়া হাসিয়া, খেলিয়া, নাচিয়া চলিয়া যায়,—পাঠক যতক্ষণ এগুলিতে লিপ্ত থাকেন ততক্ষণ বিমল আনন্দ উপভোগ করেন, শেষ হইয়া গেলে,—দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে ইহাদের স্মৃতি আর মনে রাখিবার প্রয়োজন হয় না। সোজা কথায়, আনন্দ দিবার ক্ষমতা প্রভাত বাবুর যথেষ্ট আছে, মনে দাগ বসাইবার ক্ষমতা তাঁহার বড় বেশী নাই। তাঁহার লেখায় গম্ভীর অন্তর্দৃষ্টির অভাব। প্রভাত বাবুর সমস্ত গল্পগুলিই যে এরকম তাহা নহে; তবে তাঁহার অধিকাংশ গল্পের প্রকৃতিই এইরূপ। মোটামোটি তাঁহার উৎকৃষ্ট গল্পগুলির স্বরূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাইলাম।

প্রভাত বাবুর "নবকথা" কোথাও পাইলাম না, কাজেই "ষোড়শী" ও "দেশী ও বিলাতী" তে প্রকাশিত গল্পগুলিরই আলোচনা করিব। "ষোড়শীর" প্রত্যেক গল্পই অতীব সুখপাঠ্য। ইহার প্রত্যেক গল্পেই প্রভাত বাবুর অসামান্য সূক্ষ্মদর্শনের পরিচয় বর্ত্তমান। প্রত্যেক গল্পই পড়িয়া এত তৃপ্তি পাওয়া যায় যে রবীন্দ্র বাবুর অনেক শ্রেষ্ঠ গল্প পড়িয়াও তত পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রভাত বাবু বাস্তবদর্শী, রবীন্দ্র নাথ অন্তরদর্শী। একখানা সুন্দর নিখুঁত ফটো ও একখানা উৎকৃষ্ট চিত্রের মধ্যে যে প্রভেদ বর্ত্তমান, প্রভাত বাবু ও রবীন্দ্র নাথের গল্পেতে সেই প্রভেদ বর্ত্তমান। উভয়ই প্রশংসনীয়, তবে রুচি ও উপভোগ ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে পাঠকের নিকট এই উভয়বিধ গল্পের আদরের তারতম্য হয়। প্রভাত বাবুর উৎকৃষ্ট গল্পগুলির আর এক প্রধান বিশেষত্ব তাহাদের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। বিদ্রূপাত্মক ছোট ছোট বাক্য গুলি যেন প্রত্যেক গল্পের মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র উজ্জ্বল হিরককণ্টকের মত ঝিকমিক করিতেছে।

ষোড়শীতে ষোলটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, 'বউচুরি' তাহাদের প্রথম। প্রভাত বাবুর গল্পের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সহজ নহে; যদি পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের অক্ষমতা প্রযুক্ত গল্পটির সৌন্দর্য্যের আভাস না পান, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আসল গল্পটি পড়িয়া লইবেন।

"বউচুরি" গল্পটি প্রথম ভারতীতে বাহির হয়,—যতদূর মনে হইতেছে, বোধ হয় ১৩০৯ সনের ভারতীতে।

মনে আছে, তখন ইংরেজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। খুড়া মহাশয় 'ভারতী' রাখিতেন। আমরা ছেলেপিলেরা 'ভারতী' পড়িতে পাইতাম বটে, কিন্তু গল্প পড়িতে খুড়া মহাশয় বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই আমার সঙ্গীগণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া "জ্যোতিষিকে সমস্যা" "অঙ্কের ঘর পূরণ" "কানহৌজি আঙ্গ্রে" ইত্যাদি দংষ্ট্রাভঙ্গকারী প্রবন্ধ ভারী মনোযোগের সহিত পড়িবার ভান করিতেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক হতভাগ্য কিন্তু, বাছিয়া বাছিয়া, যে সকল সংখ্যায় প্রভাত বাবুর গল্প অথবা রবিবাবুর চিরকুমার সভা থাকিত সেই সকল সংখ্যা লইয়া গোপনে রবিবারের নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে এক আম্র বৃক্ষে আরোহণ করিত এবং নির্জ্জন আমশাখায় বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে পাঠ করিত। সেই সময়েই বউচুরি পড়িয়া এত আনন্দ পাইয়াছিলাম যে তাহা সুপক্ক আম্র আস্বাদনের আনন্দের চেয়েও বেশী মনে হইত।

"যে সময়ে নব্যবঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার একটা ভারী ধূম পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা" লইয়া লেখক গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। দীক্ষিত ব্রাহ্মবন্ধু হেমন্ত কুমারের উপদেশে গল্পের নায়ক অনাথশরণের হঠাৎ খেয়াল হইল যে পূর্ব্বরাগ বর্জ্জিত বিবাহে মন্ত্র পড়িয়া বিবাহিতা তাহার স্ত্রী মন্দাকিনীকে সে কখনই ভাল বাসিতে পারে না, অতএব সে তাহার ভর্য্যাস্বরূপা, কিছুতেই স্ত্রী নহে! সে মনে করিত যে হেমন্তকুমারের ভগিনী নগেন্দ্রবালাকে সে ভালবাসিয়াছে; কিন্তু সে পথে ভারী গোলমাল, তাহার সহিত "যথার্থ আদর্শ বিবাহ" ঘটাইতে হইলে মন্দাকিনীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছেদন করা দরকার! এজন্য অনাথশরণ ঠিক করিল যে উভয়ে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, এবং পরে বিবাহ বন্ধন আইন অনুসারে সহজেই ছিন্ন করা যাইবে। অনাথ নগেন্দ্রবালাকে বিবাহ করিবে, এবং মন্দাকিনীও যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে। অনাথ বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছিল, বাহির বাড়ীতেই শয়ন করিত। গভীর গবেষণায় উক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে এক দিন ভাবিল, মন্দাকে এই সুখসংবাদ জানান দরকার। সে "একটুকরা কাগজ লইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল :—আজ রাত্রি বারটার পরে সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।" কাগজ খানা পাকাইয়া ছোট করিয়া নিস্তব্ধ দুপুরে অন্তঃপুরে মন্দাকিনীকে খুঁজিতে গেল। অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল বৌদিদি সখীগণ লইয়া তাস খেলিতেছেন, মা আমাদের ঘুমাইতেন, ভ্রাতুষ্পুত্র চুরি করিয়া কুল-আচার ভক্ষণ করিতেছে এবং এক নির্জ্জন ঘরে মন্দাকিনী বটি পাতিয়া তেঁতুল কাটিতেছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া "অনাথ প্রায় একমিনিট কাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল,"—সদ্য দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত জন্মান্ধ যে রকম করিয়া বহির্জ্জগতের পানে চাহে বোধ হয় অনেকটা সেই রকমে! কিয়ৎক্ষণ পরে "অনাথ মন্দাকিনীর পা লক্ষ্য করি কাগজখান ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।" ইহার পরের বর্ণনাটি অতি সুন্দর। "সে চলিয়া গেলে পর মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমতঃ দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আনিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার পর বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাঁচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার ভিতরে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। অনেক দূরে ঘুঘু ডাকিতেছে। আবার কাগজখানি পড়িল, আবার আম গাছের পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজ খানিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। গলবস্ত্র হইয়া, নারায়ণ শিলার সম্মুখে উপুর হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ করিল। আজ তাহার জীবনের কি দিন? বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন।"

অনাথের বিধবা ভগিনী "হরিমতি মন্দার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়; তবু দুজনে খুব ভাব।" হরিমতির সাহায্যে মন্দা "নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রিতে" স্বামী সম্ভাষণে চলিল। স্বামীর ঘরের বারাণ্ডায় গিয়া "প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। পা আর উঠে না; শেষে সাহসে ভর করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল, দেখিল শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী

নিদ্রা যাইতেছেন।" সে পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। কিছু পরে অনাথ জাগিয়া "দেখিল মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সরিয়া গিয়াছে, মন্দাকিনীর মুখ খানির উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে অনাথ সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল। বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। ঠোঁট দুখানি এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে; মন্দা বুঝি তখন কোন স্বপ্ন দেখিতেছিল।"

"স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া অনাথ ভাবিতে লাগিল—, "এ বড় সুন্দর ত! এযেন নগেন্দ্রবালার চেয়েও সুন্দর। দুই তিন মিনিট এই ভাবে কাটিলে অনাথ সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল। চক্ষু বুজিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—হে ঈশ্বর আমার হৃদয়ে বল দাও।"

"চন্দ্রালোকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা আনয়ন করে ভাবিয়া ঝটিতি অনাথ বাতিটা জ্বালাইয়া ফেলিল, কেরোসিনের তীব্র আলোকে মনে হইল বুঝি স্বপ্ন জড়িমা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর পায়ে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইল।" এর পর হইতে অনাথের হৃদয়ে কি ভাবে ধীরে ধীরে মন্দাকিনীর প্রভাব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল তাহা প্রভাত বাবু অতি নিপুণ ভাবে দেখাইয়াছেন।

অনাথ মন্দাকিনীর কাছে তাহার উদ্ভাবিত উপায় বলিলে পর মন্দাকিনী কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ইচ্ছা করিল মন্দার মুখের আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষুদুটি মুছাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই রাত্রে নির্জ্জন গৃহে যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল—'মন্দা কাঁদ কেন? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই ত বলিতেছি।" পাঠকগণ প্রভাত বাবুর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ক্ষমতা ও নিপুণতা লক্ষ্য করিবেন। "কিন্তু মন্দাকিনী কিছু বলিল না, তাহার ক্রন্দনও থামিল না।"

"অনাথ ডাকিল—'মন্দা।'—এবার স্বর অন্যরূপ, এবেন আদরের স্বর। এস্বর শুনিয়া মন্দাকিনী বেশী করিয়া কাঁদিতে লাগিল।"

কতক্ষণ পরে মন্দা চলিয়া গেল, প্রস্তাবিত বিষয় অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল,—কোন মীমাংসাই হইল না। অনাথ তাহাকে আবার কাল আসিবার জন্য অনুরোধ করিল এবং সে অনুরোধে "একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল।"

পরদিন প্রাতে অনাথের মন নিতান্ত অশান্ত ছিল, সে নদীতীরে পদচারণা করিতে গেল। "কিয়ৎপরে দেখিতে পাইল, বাটির একজন ভৃত্য মাখন সর্দ্দার ছুটিতে ছুটিতে তাহার অভিমুখে আসিতেছে। হঠাৎ তাহার মন অমঙ্গলাশঙ্কায় চমকিয়া উঠিল। কি হইয়াছে, ওকি আমাকে ডাকিতে আসিতেছে? মন্দাকিনীর কিছু হয় নাই ত? অথবা সে কিছু করিয়া বসে নাই ত? মাখন সর্দ্দার নিকটস্থ হইলে অনাথ দেখিল সে কাঁদিতেছে! দ্রুতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'কি মাখন, কি হয়েছে?"

"মাখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আর দাদাঠাকুর সর্ব্বনাশ হয়েছে। রোজা ডাক্‌তে যাচ্ছি। কাটি ঘা।"

"কাটি ঘা অর্থে সর্পাঘাত। অনাথ ভাবিল, মন্দাকিনীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। মাখন ততক্ষণ অনেক দূর, কাহার এরূপ হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করা হইল না।"

"তখনি অনাথ বাড়ী ফিরিল। প্রথমে সহজ পাদবিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে গতির বৃদ্ধি করিল; পরে দৌড়িতে লাগিল।"

এই ব্যাপার বর্ণনায় প্রভাত বাবু আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ণিত ঘটনাটির কার্য্যকারণ পাঠকের কাছে এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে প্রভাত বাবুর প্রকাশ-ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়।

"অনাথ বৈঠকখানায় যাইয়া শুনিল যে মাখন সর্দ্দারের স্ত্রীকে সর্পে দংশন করিয়াছে।" মাখনের স্ত্রী কিছুতেই বাঁচিল না। "তাই দেখিয়া মাখনের যে কান্না, পাঁচ বৎসরের বালকের মত ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। * * অনাথ চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিল। * * * ইচ্ছা করিল হেমন্তকুমারকে আনিয়া এদৃশ্য দেখায়।" এই ব্যাপার দেখিয়া "বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয় সঞ্চার না হইলে পরে যে তাহা হইবেই না তাহার স্থিরতা সম্বন্ধে অনাথের মনে সংশয় উপস্থিত

হইয়াছে।" তবু একদিন "রাত্রি একটার সময় স্ত্রীকে চুরি করিয়া অনাথ পলায়ন করিল।"

গল্পের শেষ অংশের উপর বেশী কিছু লিখিবার নাই। পথে মন্দার ভীষণ জ্বর হইল। অনাথ তিন দিবারাত্রি মন্দার পাশে বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিল। ফলে অনাথের হৃদয় জয় করিতে মন্দাকিনীর যে টুকু বাকী ছিল তাহাও জিত হইল। হেমন্তকুমারের এক পত্রে এই সময় জানা গেল যে নগেন্দ্রবালা অনাথকে কখনই ভালবাসে নাই এবং অন্যের সহিত তাহার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। এই ভীষণ দুঃসংবাদ এবং দুঃখ অনাথ কিরূপে বহন করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া হেমন্তকুমার অনাথকে হিমালয়ের কোন গভীরতম প্রদেশে শান্তির এবং সান্ত্বনার অন্বেষণে যাইতে উপদেশ দিয়াছে! ইতি।

এই গল্পটি প্রভাত বাবুর লিখিত একটি শ্রেষ্ঠ গল্প, এই জন্য আমরা ইহার এত বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। 'ষোড়শী'তে অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে 'প্রিয়তম' ও কাশী-বাসিনী' গল্প দুইটি করুণরসাপ্লুত। 'প্রিয়তম' পড়িয়া উঠিয়া একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয়, এবং "কাশীবাসিনী" শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন অশ্রুজলসিক্ত হইয়া উঠে। 'প্রণয়পরিণাম' গল্পটিতে প্রচ্ছন্ন হাস্যরসের স্রোত ফল্গুপ্রবাহের মত বহিয়া চলিয়াছে; এই গল্পটি আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত সমান ভাবে উপভোগ্য। স্থান বিশেষ পড়িবার সময়, কুসুমের "স্বামীসুখে ভরপুর" ভগিনী নলিনীর হাস্যলুণ্ঠিত মূর্ত্তিখানি যেন প্রত্যক্ষবৎ চোকের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

"দেশী ও বিলাতীর" প্রথমেই "আমার উপন্যাস" নামক গল্পটি প্রভাত বাবুর আর একটি সুলিখিত শ্রেষ্ঠ গল্প। 'প্রবাসীতে' ইহা প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহা এতবার পড়িয়াছি যে গল্পটি প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। কাজেই সমালোচনা থা'ক্। "প্রতিজ্ঞাপূরণ" "উকীলের বুদ্ধি" "হাতে হাতে ফল" "খালাস" প্রভাত বাবুর পূর্ণ প্রস্ফুটিত গল্প,—প্রভাত বাবুর স্বাভাবিক প্রতিভার পরিচয় এগুলিতে পদে পদে বর্ত্তমান। 'দেশী' সর্ব্বশেষ গল্প "প্রত্যাবর্ত্তন।" যে "প্রত্যাবর্ত্তনকে" রবীন্দ্র বাবু দ্বিজেন্দ্র বাবু, যাদব বাবু, ইত্যাদি দেশের গৌরবস্থলগণ এক বাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার বিষয় আমাদের বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। গল্পটি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন বায়স্কোপের স্ক্রিনের উপর দিয়া ঘটনার পর ঘটনা স্বাভাবিক স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, আর দর্শক আমরা নিস্তব্ধ অবাক হইয়া দেখিতেছি। আইন-অধ্যয়নকারী ছাত্রটির "হুএভার" "হুএভার" আমাদের বি, এল, ক্লাশে হাস্যের তুফান সৃষ্টি করিয়াছিল।

"বিলাতী" অংশের সমস্ত গল্পগুলিই সুলিখিত, তবে "মুক্তি" ও "প্রবাসিনী" বিশেষভাবে উপভোগ্য,—বিশেষতঃ "প্রবাসিনী"। "ফুলের মূল্য" গল্পটিতে যেন একটু জড়িমা লাগিয়া রহিয়াছে, যেন ভাল ফোটে নাই। তাই এমন সুকরুণ শেষাংশটিও যেন আমাদের হৃদয়কে তেমন করিয়া আলোড়িত করে না।

গত বৎসর প্রবাসীতে প্রকাশিত "রসময়ীর রসিকতা" গল্পটিতে প্রভাত বাবুর স্বাভাবিক রস অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভাবী সতীনের মায়ের সহিত রসময়ীর ঝগড়ার এমন ফটো প্রভাত বাবু তুলিয়াছেন যে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শন ক্ষমতায় বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মনোরম গল্পগুলি ১৩০৯ সনের সাহিত্যে প্রথম বাহির হইতে আরম্ভ করে। তিনি এ যাবৎ অনেক গল্প লিখিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যে সে গুলি কেন পুস্তকাকারে বাহির হইল না, বুঝিতে পারিতেছি না। কত নগণ্য গল্প লেখকের দুই পাঁচটা নিকৃষ্ট গল্প পুস্তকাকারে বাহির হইয়া শুধু বিজ্ঞাপনের জোরে বিকাইয়া যাইতেছে, আর বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবস্বরূপ সুরেন্দ্র বাবুর অননুকরণীয় গল্পগুলি এখনও পুরাতন সাহিত্যের পৃষ্ঠায় থাকিয়া পঁচিতেছে! আমরা সুরেন্দ্র বাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তিনি অবিলম্বে গল্পগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করুন। গল্পগুলি যে প্রভাত বাবুর প্রাঞ্জল গল্পাবলির মত জনপ্রিয় হইবে, সে কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা প্রভাত বাবুর প্রাঞ্জলতার সহিত রবি বাবুর গভীর অন্তর্দৃষ্টি একত্র দেখিতে চাহেন, এবং সর্ব্বোপরি এই উভয় গুণকে অপূর্ব্ব তীব্র আকস্মিক হাস্যরসমণ্ডিত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা

সুরেন্দ্র বাবুর গল্পগুলি অত্যন্ত আদর করিয়া পড়িবেন। সুরেন্দ্র বাবুর ভাষা আবার এক অপূর্ব্ব জিনিস,—সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার নিজস্ব, এবং একেবারে অননুকরণীয়!

সুরেন্দ্র বাবুর সমস্ত গল্পগুলিই যে ভাল তাহা নহে। এমন গল্পও অনেক আছে, যাহা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। প্রভাত বাবুর গল্পে যেমন একটানা স্রোত, সুরেন্দ্র বাবুর গল্পে তাহা নহে,—জোয়ার ভাটা আছে। তাঁহার গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়, এগুলি যেন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। কতকগুলি তাঁহার হৃদয়রসের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস আর কতকগুলি যেন সম্পাদকীয় তাড়ায় লিখিত। প্রথমোক্ত শ্রেণীর গল্পগুলি নানা রসের সংমিশ্রনে বাঙ্গালা ভাষায় অতুলনীয়। শেষোক্ত শ্রেণীর গল্পগুলি পড়িয়া, যদিও সুরেন্দ্র বাবু ভিন্ন অন্যের লিখিত বলিয়া ভুল হইবার আশঙ্কা নাই, তবু এগুলি যেন সম্পূর্ণ ফোটে নাই,—কতকটা যেন আড়ষ্ট।

সুরেন্দ্র বাবুর অনেক গল্পের প্রধান বিশেষত্ব, দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ। বঙ্কিম বাবু যেমন গীতার কয়েকটি শ্লোকের উদাহরণ স্বরূপে কোন কোন উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, সুরেন্দ্র বাবুর কয়েকটি গল্পের ভিত্তিও সেই রকম, পড়িয়া গল্পের আস্বাদ বেশ পাওয়া যায়, আবার একটু মনোযোগ দিয়া মিলাইয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, গল্পটি প্রারম্ভে লিখিত কয়েকটি বাক্যের উদাহরণ মাত্র।

সুরেন্দ্র বাবুর ভাষা এমন বিশেষত্বযুক্ত ও জীবন্ত, এত নূতন, হাস্যরস সৃষ্টিতে এত উপভোগ্য, যে তাহার যে কোন গল্পের চারি পাঁচ লাইন পড়িয়াই অনায়াসে ঠিক করিয়া ফেলা যায় যে ইহা সুরেন্দ্র বাবুর রচনা। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দুই একটি গল্পের প্রথম হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"বাজে খরচ" নামক গল্পের প্রারম্ভে;—

"পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের অজীর্ণ রোগ হয়। এক বৎসরের পর অন্য বৎসর ভেড়ার পালের মত একে একে চলিয়া গেল, কিন্তু চাটুর্য্যের অজীর্ণ রোগ সারিল না। চল্লিশের কোঠায় পদার্পণ করিয়া চাটুর্য্যের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইল। উভয়ের অনুকম্পায় চাটুর্য্যে বুঝিতে পারিলেন যে বাজে খরচই অজীর্ণ রোগের কারণ।

কিন্তু একথা কাহাকেও বলিলেন না।

কোন গূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম হইলে জীব-শরীরে একটা না একটা লক্ষণ প্রকাশ পায়। হরিহরেরও তাহাই হইল। অর্থাৎ হরিহর সামান্য কারণেই চটিতে আরম্ভ করিলেন।

চাটুর্য্যের চুল পাকিতে আরম্ভ করিল। শরীরের মসৃণ চর্ম্ম শুষ্ক ও বিলোল ভাব ধারণ করিল। সকলে বলিল "মধ্যম নারায়ণ তৈল মাখ এবং মকরধ্বজ খাও।"

চাটুর্য্যে বলিলেন "চুল পাকিলে এবং চর্ম্ম শুষ্ক হইলে কিছু আসে যায় না। অতএব বাজে খরচের আবশ্যকতা নাই।" ইহা বলিয়াই পুনরায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পাকা চুলের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল।"

"স্বদেশী ও বিলাতী" নামক গল্পের প্রারম্ভে,—

"বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিষ্টার সেন সুমধুর শারদীয়া রজনীর দ্বিতীয় মাসে স্বদেশের পুরাণো পুষ্করিণীটার পারে সটান লম্বা হইয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

স্বদেশের পুকুরটা পানায় পরিপূর্ণ। * * * দেশীয় শৃগাল বিলাতীয় ব্যারিষ্টারের সহৃদয়তা লক্ষ্য করিয়া ক্ষণ কালের জন্য দার্শনিক বিচারপরায়ণতার পরিচয় দিয়া নীরব হইল। গোটাকতক অন্ধকার ও গোটাকতক আলোক স্বদেশী ও বিলাতী ভাব ধারণ করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। গোটাকতক বিলাতী স্বপ্ন ও গোটা কতক দেশী স্বপ্ন দুই দিকে সারি সারি দাঁড়াইয়া চন্দ্র-করে নৃত্য করিতে লাগিল"

"ছেঁড়াপাতা" নামক গল্পের আরম্ভে;—

"অনেক আত্মসংবরণ করিয়া, খানিকটা দেশের জন্য খানিকটা নিজের গৌরবের জন্য, খানিকটা সুপাত্রীর অভাবের জন্য পরেশনাথ বিবাহ করিয়া উঠিতে পারে নাই। করিলেও চলিত, কিন্তু না করিয়াও চলিতেছিল। অর্থাৎ কখনও কখনও দীর্ঘনিশ্বাসটা উঠিলে চাপিতে হইত; কখনও কখনও হৃদয়টা ব্যাকুল হইলে ঘুমাইতে হইত। মোটের মাথায় চেয়ার, টেবিল, আলমারী, দর্পণ, কার্পেট,

কৌচ সেটের মশারি প্রভৃতিতে গৃহ পরিপূর্ণ থাকিলেও মনটা কেমন শূন্য শূন্য বোধ হইত। আলমারির পার্শ্বে উঁকি মারিবার লোক নাই, দর্পণে মুখ দেখিবার লোক নাই; মশারি ছিঁড়িয়া গেলে সেলাই করিবার লোক নাই; ইত্যাদি।”

“তাই সেদিন সেই শীতকালে, যখন লোকে চা খায় অর্থাৎ বেলা আটটার সময় সমগ্র গরম চার পেয়ালা ও প্রিন্সেপের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন, উভয়ে এক সঙ্গে পরেশের পায়ের উপর পড়িয়া গেল! পা খানিকটা ফুলিয়া গেল, খানিকটা ভিজিয়া গেল। ইহাতে চটিবার কোন কারণ ছিল না, কারণ ভূমণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণবশতঃ গুরু পদার্থ নীচে পড়িয়া যায়। পরেশ তাহা বুঝিল না। আরদালিকে ধরিয়া মারিল। আফিসে গেল না। মোকদ্দমাগুলি মুলতুবি করিয়া রাখিল!”

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কোন কবিতা সমালোচনায় এক সমালোচক বলিয়াছিলেন—“আমি যদি আরবের মরুভূমিতেও এই কয় লাইন দেখিতে পাইতাম, আমি নিশ্চয়ই চীৎকার করিয়া উঠিতাম “ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ!” (“If I had met these lines running wild in the deserts of Arabia, I would have cried out Wordsworth.”) সুরেন্দ্র বাবুর রচনাও ঐরূপ তীক্ষ্ণ বিশেষত্বযুক্ত, বহুবিধ রচনার মধ্য হইতেও অনায়াসে বাছিয়া বাহির করা যায়।

১৩০৯ সনের সাহিত্যে সুরেন্দ্র বাবুর আটটি গল্প বাহির হইয়াছিল। তন্মধ্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত গল্প তিনটি,—“সন্ধ্যা”, “দুই বন্ধু” এবং “সবিরাম জ্বর”। ‘সন্ধ্যা’ গল্পটি সূচীপত্রে ‘গল্প’ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া ব্রেকেটে ‘গান’ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা কি সূচীপত্র লেখকের অথবা মুদ্রাকরের ভ্রান্তি, অথবা লেখকেরই ইচ্ছাকৃত অভিধান, জানি না। কিন্তু সন্ধ্যা গল্পটি প্রকৃতই গানের মত,—মৃদু মৃদু অস্ফুট অর্দ্ধোচ্চারিত ঝঙ্কারে অব্যক্ত আনন্দ জাগাইয়া তুলে। এরূপ নিখুঁত সুন্দর গল্প সুরেন্দ্র বাবুর খুব বেশী নাই। ‘দুই বন্ধু’ এবং ‘সবিরাম জ্বর’ গল্প দুইটি হাস্যরসের ফোয়ারা। মনে আছে, ‘সবিরাম জ্বর’ পড়িয়া তাহার “এ কি রকম? বাঃ!” আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে এক প্রচলিত বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ‘দুই বন্ধু’ গল্পটিতে সুরেন্দ্র বাবু অসামান্য মানব চরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। দুই বন্ধুর অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ কি ভাবে ক্রমে ক্রমে মোহধারা আচ্ছন্ন হইল, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব কিরূপে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল, ইত্যাদি, ঘটনাতরঙ্গে অবিশ্রান্ত হাস্যরসের মধ্য দিয়া লেখক অতি নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

১৩১০ সনে প্রকাশিত নয়টি গল্পের মধ্যে “বাজেখরচ” এবং “ভুল” একান্ত উপভোগ্য। অন্য গল্পগুলিতে সুরেন্দ্র বাবুর নিপুণ হস্তের পরিচয় থাকিলেও কোনটাই প্রথম শ্রেণীর গল্প নহে। সদাশিবের জ্ঞান ত স্পষ্টই যেন সম্পাদকীয় তাড়ায় লিখিত। প্রথম হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—“সদাশিব অতি শান্ত প্রকৃতি শীর্ণকায় যুবা। * * * সদাশিবের অন্য কোন আত্মীয় কুটুম্ব ছিল না। এরূপ ছোট খাট মানুষটি ও ছোট খাট সংসার লইয়া একটা ছোট খাট গল্প অনায়াসে লেখা যাইতে পারে। অথচ মাসিক পত্রিকার অন্ততঃ আট পৃষ্ঠা পরিপূরণ না করিলে গল্প লেখা হয় না; সুতরাং সংসারটা একটু বাড়াইয়া লইতে হইবে। কিন্তু উপন্যাস লেখকেরও অন্যান্য সাংসারিক কর্ম্ম আছে এবং সমালোচনার তীব্র ভয় আছে। চতুর্দ্দিক ভাবিয়া আপাততঃ তিনটি মাত্র নূতন ব্যক্তির উল্লেখ করা গেল। তাহারা ১। সদাশিবের বিমাতা; ২। সদাশিবের বন্ধু পরেশ ৩। সদাশিবের পুরাতন ভৃত্য নন্দী।” ইত্যাদি। লেখক যতই অগ্রসর হইয়াছেন, ততই আরও পাত্র পাত্রী সুবিধা মত বাড়াইয়াছেন। গল্প লিখিবার নূতনতর পদ্ধতি বটে!

“বাজে খরচ” গল্পের প্রারম্ভ হইতে পূর্ব্বেই কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি। বাজে খরচই জীবনের নিদান এই ঠিক করিয়া হরিহর চাটুর্য্যের গৃহিণী বাপের বাড়ী গিয়াছিল। এক মাসের মধ্যে স্বামীর জীবনে এ হেন ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু দিশাহারা হইয়া পড়িল এবং রাগ করিয়া চাকরবাকর সমস্ত ছাড়াইয়া দিয়া বাজে খরচ আরও কমাইয়া দিল। ফলে সাংসারিক কার্য্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। চাটুর্য্যের ঘাড়ে গৃহ-

কার্য্যের অনেক ভার বাঁধিয়া পড়িল। চাটুর্য্যে বাজারে গেলে, জ্যেষ্ঠপুত্র রাম পিতার বাক্স হইতে পাঁচ টাকা চুরি করিল। বাজার হইতে আসিয়া দৈনিক হিসাব মিলাইতে যাইয়া চাটুর্য্যে "দেখিলেন পাঁচ টাকা ছয় আনা কমতি পড়িতেছে। ক্রমেই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে খোকা চেষ্টাপূর্ব্বক দোয়াতের কালি শুভ্র বিছানায় ঢালিয়া ফেলিল।" ফলে খোকার ভীষণ চপেটাঘাত প্রাপ্তি, তাহাতে গৃহিনীর অভিমান এবং পুত্র রামের দেরীতে স্কুলে গমন। "বিড়াল আসিয়া মৎস্য খাইয়া গেল। একজন সমদুঃখিনী প্রতিবাসিনী আসিয়া এক বাটি তৈল চুরি করিয়া লইয়া গেল। রাম স্কুলে 'লেটে' গিয়াছে বলিয়া হেডমাষ্টার চারি আনা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।"

"সে রাত্রিকালে কে কোথায় শুইয়া থাকিল তাহা বলা যায় না; কিন্তু ফলে শ্মশানভীতির মত একটা ভাব প্রাঙ্গণে খেলা করিতে লাগিল। প্রদীপও জ্বলে নাই।"

পরদিন প্রাতে গৃহিনীর সঙ্গে চাটুর্য্যে একটা সন্ধি করিয়া ফেলিলেন এবং ঘরকন্না আবার আরম্ভ হইল। কিন্তু এই সময় গৃহিনীর জ্বর হইয়া পড়িল তাহাতে ঝি পাচক ও চাকর সমস্তই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং ডাক্তারের ফিতেও অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল।

এদিকে চাটুর্য্যে কোন সূত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রামই পাঁচ টাকা চুরি করিয়াছিল। "কাজেই চাটুর্য্যে ক্রমশঃ একটা রবিবার পাইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।" এবং রামের মাতার নিকট কথাটা উত্থাপন করিলেন। রাম কিন্তু স্বীয় চরিত্র মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমি ত বাবার মত আফিসে ঘুস লই না।" ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চাটুর্য্যে পুত্রের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ধরিতে না পারিয়া "কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন" এবং দ্বাপরের পিতৃসত্য পালনে রত রামচন্দ্রের সহিত কলির রামের শোচনীয় পার্থক্য ও বঙ্গদেশের অধঃপতন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।"

এই সময় চাটুর্য্যের পিতৃব্য-তনয় খিনোদের আগমনে বাজে খরচ আরও বাড়িয়া গেল এবং "বাটিতে একটা কংগ্রেসের মত বিদ্রোহীদল বাড়িয়া গেল।" চাটুর্য্যে এই সকল ব্যাপারে ভারী চটিয়া গেলেন, চাকরকে দিয়া কিছু গাঁজা আনিয়া খুব কসিয়া দম দিলেন এবং "কোটরস্থ চক্ষু পাকাইয়া সংসারটাকে একবার সামলাইয়া লইলেন।" "প্রত্যুষে পাড়ার লোকে সকলে জানিতে পারিল যে হরিহর চট্টোপাধ্যায় ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেছেন।"

চাটুর্য্যের প্রলাপ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; বাঙ্গালা ভাষায় এর চেয়ে নিপুণ হাস্যরস সৃষ্টি খুব কম পড়িয়াছি।

"ওঃ! আমি ভগ্নহৃদয়। Broken heart—B. H. শ্রীযুক্ত হরিহর চাটুর্য্যে B. H.; ওহে ডাক্তার! ভাষা তত্ত্ব বোঝ?

চাটুর্য্যে প্রলাপ বকিতেছেন—

ডাক্তার। আপনি চুপ করুন।

চাটুর্য্যে। ভাষাতত্ত্ব বুঝিয়া দেখুন—ব্রোকন্—ব্রকন্—বলেভগ্ন।—হার্ট—হারীত—হৃৎ—হৃদয়—ইংরেজী কিংবা বাঙ্গালা উভয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন B. H. যেমন তুমি M. B. আমি তেমনই B. H."

অতঃপর চাটুর্য্যের ভগ্নহৃদয় জোরা লাগিল এবং "চাটুর্য্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে বাজে খরচ অন্যান্য খরচ হইতেও জীবনধারণার্থ আবশ্যক।"

"শেষ কয়টা দিন"ও কতকটা এই শ্রেণীর গল্প—হাস্যরসের উৎস স্বরূপ। "ভুল" গল্পটি নিখুঁত এবং ইহাতে যথেষ্ট নূতনত্ব ও মানব-চরিত্র জ্ঞানের পরিচয় বিদ্যমান।

১৩১১ সনে সুরেন্দ্র বাবুর চারিটি গল্প বাহির হয়। তাহা মধ্যে "যে হেতু ও সে হেতু" নামক গল্পটি কতকটা পানতোয়ার মত। গল্পটি মিষ্টি, অতি মিষ্টি, এবং তদুপরি অতি মধুর হাস্যরসের সিরকায় নিমগ্ন, এবং হাস্যরস ইহার অণুতে অণুতে প্রবিষ্ট।—এই জন্যই অনেক একটা অসাধারণ উপমা দিয়া ফেলিলাম। আমাদের এক রাসায়নিক বন্ধু আছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন

সিংহের ভাষায় বলিতে গেলে তিনি "বৎসরে পাঁচ ছয়টি কথা বলেন এবং দুই তিনবার হাসেন"। সে হেন বন্ধু আমাদের এই গল্প শ্রবণে যে ভাবে হাসিয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন তাহা আমাদের অনেক দিন স্মরণ থাকিবে।

১৩১২ সনে সুরেন্দ্র বাবু কতকটা "স্তম্ভিত" হইয়া গিয়াছিলেন। দুইটি গল্পমাত্র বাহির হইয়াছিল, তাহার কোনটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কাব্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে স্রষ্টাগণ 'নিরঙ্কুশ' হইবেন ইহাই বাঞ্ছনীয় এবং বরণীয়। কিন্তু "রুদ্রাক্ষ গল্পে সুরেন্দ্র বাবু এতদূর গিয়াছেন যে তাহা মোটেই নিরাপদ নহে। কোন প্রিয়জন তুঙ্গ পাহাড়ের প্রান্তে যাইয়া দাঁড়াইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের বুক যেমন আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে, এই গল্পে সুরেন্দ্র বাবুর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া আমাদেরও মনে ঠিক সেই রকম ভাব হইয়াছিল।

১৩১৩ সনের 'সাহিত্যে' সুরেন্দ্র বাবুর গল্পের এবং গল্পে সরসতার স্রোত আরও কমিয়া গিয়াছিল। প্রকাশিত তিনটি মাত্র গল্পের মধ্যে "সিন্ধু ঘোটক" গল্পটির প্লটটি অস্বাভাবিকরূপে রোমাণ্টিক হইলেও সুরেন্দ্র বাবুর রচনার বিশেষ রস ইহাতেই কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৩১৪ সনেও তিনটি গল্পমাত্র প্রকাশিত হয়; তাহার মধ্যে "দীক্ষা" গল্পটি সুরেন্দ্র বাবুর শ্রেষ্ঠতম গল্পগুলির মধ্যে প্রধান একটি। আমরা অনেক কষ্টে ইহার আলোচনার প্রলোভন সম্বরণ করিলাম।

১৩১৫ সনের চারিটি গল্পের মধ্যে "কপালের দুঃখ" গল্পটি মোটেই সুরেন্দ্র বাবুর উপযুক্ত হয় নাই। "ছেঁড়া পাতা" অতি উৎকৃষ্ট।—জায়গায় জায়গায় দুই এক কথায় এমন সুন্দর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে পড়িয়া বিস্মিত হইতে হয়। "ছেলেবেলার গল্প" ও "তাহার পর"ও মন্দ নহে।

১৩১৬ সনে ও বর্ত্তমান সনে সুরেন্দ্র বাবুর গল্পগুলিতে যেন তাহার পূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইতেছি না। অনেক গল্প কেবল তাঁহার বিশেষ ভাষার গুণে চেনা যায়। "সাহিত্য" আসিলেই সুরেন্দ্র বাবুর নাম দেখিয়া অনেক গল্প আমরা গর্ব্ব করিয়া বন্ধুবর্গকে শুনাইতে যাইয়া কেবলি নিরাশ হইয়াছি। যাহা হউক কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত "আত্মহত্যা" ও পূজার আসর" পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, এবং এখন হইতে আবার পূর্ণ মূর্ত্তিতে সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিতে পাইব বলিয়া আশা হইতেছে। সুরেন্দ্র বাবুর গল্পের অনেক দোষ আছে, তাহার আলোচনা করিলাম না কারণ যে পাঠকের নিকট এই গল্পগুলি ভাল লাগে না, তাঁহর কাছে কোন দিনই ভাল লাগিবে না। আর যিনি সুরেন্দ্র বাবুর গল্প পড়িয়া আনন্দ পাইবেন, তিনি গল্পগুলির দোষ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিবেন না। সুরেন্দ্র বাবুর গল্প সর্ব্ব সাধারণের উপভোগ্য নহে।

যে সকল শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক এখন গল্প লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত জলধর সেন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণ প্রধান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

পণ্ডিত।

অঙ্ক শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য কি,—না জানে কে তারে?
খ্যাতি, শুধু ভারতে নয়, সমুদ্রেরো পারে!
ষ্টাটিক্স এবং ডিনামিক্সে আশ্চর্য্য সে মাথা,
প্রমাণ, ঘরে বস্তাবন্দী দীর্ঘপ্রস্থ খাতা!
অঙ্কশাস্ত্রে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লেখেন তিনি,
গ্রহ-উপগ্রহের বাসা, বলে দেনও গণি'!
সম্মানটা তাঁর বলব কি? উঃ, বেজায় ভারী যে সে,
এত বড় পণ্ডিত কভু জন্মাননিক দেশে!
এত বিদ্যা, বিধাতারি লিখন, তবু, কি যে,
রৌপ্যমুদ্রা, আধুলিটি, ভাঙ্গান যদি নিজে,
হিসাব বুঝে নিতে তারি, লাগে একটি ঘণ্টা,—
আবার সেথা রেখে আসেন, পয়সা দু'চার গণ্ডা!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গুজরাতের উৎসব চিত্র।

"গুজরাতে দিওয়ালী উৎসব ও গরবা গান" প্রবন্ধে গুজরাতের উৎসব চিত্রের সামান্য একটু রেখাপাত করিয়াছি, এবার গুজরাতের সম্বৎসরের একটা ক্ষীণ চিত্ররেখা আঁকিতে প্রয়াস পাইব।

গুজরাতে ছয় ঋতুর প্রাবল্য অনুভব করিতে হয় না; শিয়ালু উনালু ও চোমাসু—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই প্রকৃষ্ট তিন ঋতুতে সম্বৎসরকে ভাগ করা হইয়াছে;—তাহাতে শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত কোন স্থান লাভ করিতে পারে নাই। গণনার মধ্যে শরতের স্থান লাভ না ঘটিলেও প্রকৃতি কিছু মাত্র আত্মবিস্মৃত হয় নাই, বরং গুজরাতে শরতের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান। কেবল গুজরাত কেন, রাজপুতনার কঠোর ভীষণকায় দৈত্যের মত আরাবলী পর্ব্বতশ্রেণী এবং মালবের তরঙ্গায়িত বিরলপাদপ প্রান্তরও বর্ষা অবসানে শরতের আবির্ভাবে নূতন সজীব শ্রী ধারণ করে। সে যেন প্রকৃতির রোমে রোমে পুলক হর্ষ। শীত গ্রীষ্মের চক্ষু-জ্বালাকর তৃণহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর—তখন নবকিশলয় বুকে ধারণ করিয়া উল্লাসে যেন বিগলিত হইয়া পড়ে।

গুজরাতের তরঙ্গায়িত মাঠে এ পুলক-শ্রী বড়ই মনোহর। বর্ষা সমাগমে ময়ুর ময়ূরীর পুলক চঞ্চল নৃত্য ও কেকারব গুজরাতের পল্লি-প্রান্তরে নূতন চেতনা আনয়ন করে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের অবিরাম শ্রম আরম্ভ হয়। বর্ষার পর শরতের দৃশ্য আরো মধুময়। স্বচ্ছ সুনীল আকাশ, চন্দ্রমাবিধৌত যামিনী, লতাপল্লব বৃক্ষ ও কুসুমগুচ্ছ শরতকে মোহনবেশে সাজাইয়া দেয়। এসময়ই নয়দিন ব্যাপী নওরাত্রি ও তৎপর দিওয়ালী উৎসব-উচ্ছ্বাসে নরনারীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

শরতের পরে শীত ঋতুর আগমন হয়। তাহা তিন মাস কাল স্থায়ী হয়। অগ্রহায়ণ হেমন্তের দৃশ্য লইয়াই কাটে; পৌষ মাঘ এই দুই মাসে একটু শীত পড়ে। শিশিরের প্রাদুর্ভাব গুজরাতের কোন ঋতুতেই নাই, শীত কালেও তাহা দুর্লভ। শিশির নাই বলিয়াই রাত্রিকালে গুজরাতের বহিপ্রকৃতি মনোরম ও রোগের আশঙ্কাহীন। সেই জন্যই গুজরাতিরা রাত্রিকালে সুউন্মুক্তনীল আকাশ তলে আরামবর্ষী নৈশ সমীরণের মধ্যে নিদ্রা যাইতে ভালবাসে।

শীতের পর ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাসে বৃক্ষ লতা সকল নব পল্লবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে—শীতের নীরস শ্রী তখন অনেক পরিমাণে বিদূরিত হয়। বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের কিছুদিন পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের ভয়ঙ্কর প্রকোপ লক্ষিত হয়। প্রভাত কাল বেশ শান্ত ও শীতলই থাকে, বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের প্রখর উষ্ণতা ভোগ করিতে হয়। বিকালে তাহার অনেক হ্রাস হয়। সন্ধ্যা আরম্ভেই পশ্চিমদিক হইতে শান্ত শীতল সমুদ্র-বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। গুজরাতে প্রায় সকল সময়ই পশ্চিমদিক হইতে এই আরামবর্ষী সমুদ্র-বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্ম-কালে দুপ্রহর যেমন উষ্ণ হয় রাত্রি তেমনি আরামপূর্ণ ও শীতল হয়। গ্রীষ্মকালে সারা দিন তীব্র তাপ ভোগের পর সন্ধ্যার বাতাস শরীরে একটু লাগিলেই প্রাণ মন শীতল হইয়া যায়।

গুজরাতে চান্দ্রমাস গণনা করা হয়, কাজেই ত্র্যহস্পর্শ দিনে তিন তিথির সহিত তিন দিনও যুক্ত হয়। প্রতি-পদে ১লা, দ্বিতীয়ায় ২রা এই প্রকারে দিন গণনা করা হয়।

বিক্রম সম্বত অনুসারে এদেশে বর্ষ গণনা করা হয়। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ হইতে বৎসরের প্রথম ধরা হয়।

দিওয়ালী উৎসব আনন্দ তিন দিনে অমাবস্যার দিন শেষ হইলে, প্রতিপদ দিনে গুজরাতে নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়। এই দিনে বাণিজ্য ব্যবসাপ্রবল গুজরাতে বর্ষলক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। বৎসরের সুখ সমৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রদেবের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজা হইয়া থাকে। এবং দেবতার সম্মুখে ভোগ দ্রব্য রাখিবার জন্য "অনকুৎ" বা ভাণ্ডার নির্ম্মিত হয়। বর্ষের প্রথম দিনে হাল খাতার দিন। ব্যবসাদারগণ নূতন খাতার প্রথম পৃষ্ঠা হরিদ্রা রসে সিক্ত করিয়া সিদ্ধিদাতা দেব দেবীগণের নাম লিখিয়া মঙ্গলাচরণের শুভ চিহ্ন স্বরূপ হরিদ্রা চিনি পান সুপারী লিখিয়া একটা জমা খরচ লেখেন।

২রা বৈশাখ সন্ধ্যার সময় পল্লীবাসীগণ মাঠে যাইয়া বিভিন্ন শস্য রাখিয়া তন্মধ্যে একটী পাই, একটী সুপারী কিঞ্চিৎ তুলা ও চিনি গুঁজিয়া দেয়। পর দিবস প্রভাতে মাঠে যাইয়া ঐ সকল শস্যস্তূপ পরীক্ষা করে। যদি কোন শস্যে পিপীলিকার আবির্ভাব হইয়াছে দেখে তবে স্থির করে—সে বৎসর শস্যের বিশেষ অভাব হইবে। তুলা উড়াইয়া বায়ুযোগে যে দিকে তুলা চালিত হয় সেই দিকে তুলার কাটতি হইবে বলিয়া আশা করিয়া থাকে। পয়সা ও সুপারী যদি যথা স্থানে থাকে তবে সে বৎসর রাজা ও মন্ত্রীর দুর্বৎসর কল্পনা করিয়া থাকে।

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে গৌরী পূজা হইয়া থাকে। এ উৎসব কুমারী বালিকাগণের। অল্পবয়স্কা বালিকাগণ গৌরীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করে এবং প্রতিমার উভয় পার্শ্বে মৃৎপূর্ণ কলসে গম ও জোয়ারী বপন করে। শুক্লা দ্বাদশীর প্রত্যুষে বালিকাগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া নদীজলে স্নান করতঃ গ্রামের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হইয়া সমস্বরে গান করিতে করিতে গৌরী প্রতিমার নিকট উপস্থিত হয়। গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। বিহিত উপচারে পূজা শেষ হইলে মাতা ও ভগ্নিগণ স্বস্ব কন্যা ভগিনীর জন্য গৌরী দেবীর আশীর্ব্বাদ কামনা করেন।

বালিকাগণ প্রতিমার পদতলে যুক্ত-করে প্রণাম করিয়া—"আমারে একটী ভাল বর দেও" এই প্রার্থনা করে। এইরূপে দেবী পূজা শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের পথে বিল্ববৃক্ষ, গাভী ও কূপ পূজা করিয়া স্বীয় গৃহের চৌকাঠ পূজা করে।

গৌরী পূজার দিন বালিকাগণ একবেলা ডালরুটী আহার করে, রাত্রিতে ফলমূল খাইয়া থাকে। অপরাহ্নে তাহারা যথোচিত সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দল বাঁধিয়া দেব-মন্দির দর্শন করে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন স্থানে বসিয়া হাস্যামোদ, ক্রীড়া কৌতুক করে। তৎপর দাঁড়াইয়া সমতালে বুক চাপড়াইয়া অতীতের জন্য শোক প্রকাশ করে। "হায়রে দেদা হায় হায়" করিয়া ক্রন্দন স্বরে উচ্চারণ করিতে থাকে। তৎপর সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসে। গৌরী পূজা গুজরাতে বালিকাগণের প্রভাত-জীবনের আশা-সমুজ্জ্বল মধুর সুখস্বপ্ন। গৌরী পূজার দিন বাক্‌দত্তা বালিকাগণ ভাবী শ্বশুর শাশুরীদিগের নিকট হইতে বস্ত্র, মিষ্টান্ন এবং কোন কোন স্থানে অলঙ্কারও উপহার পাইয়া থাকে। গুজরাতে বাক্‌দানের প্রথা খুব প্রচলিত। শৈশবেই বালক বালিকাগণ বাক্‌দত্ত হইয়া থাকে। জন্মের পূর্ব্বেও বাক্‌ দত্ত হইতে দেখা যায়। কাজেই স্বামী স্ত্রী অনেক সময় এক বয়সী হয়। আষাঢ় মাসের শেষ বা শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে গুজরাতে বারি বর্ষণ আরম্ভ হয়। কোন বৎসর বারি বর্ষণের বিলম্ব হইলে কৃষক রমণীগণ দলে দলে পথে গান গাহিয়া ফিরে, উদ্দেশ্য—বৃষ্টিদেবতা মেহলাকে সন্তুষ্ট করা। এই দলের আগে আগে কেহ মৃত্তিকা পূর্ণ ঝুড়িতে নিমের ডাল পুতিয়া মাথায় লইয়া ফিরে। হিন্দু গৃহস্থের বাড়ী গেলেই তাহারা তাহাতে জল ঢালিয়া দেয়, জল ঝুড়ি-বাহককে পূর্ণ মাত্রায় ভিজাইয়া বাহিয়া মাটিতে পড়ে, তবে বিনিময়ে কিছু সন্দেশ ভক্ষণ ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

শ্রাবণ মাসের ২০শে তারিখে নাগ পঞ্চমী ব্রত হইয়া থাকে। দেওয়ালে শেষ নাগের মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া যথাবিহিত পূজা করা হয়।

নাগ পঞ্চমীর পর দিবস "রন্ধন ষষ্ঠী"। সেদিন গুজরাতি রমণীগণের রান্নার বড় ধুম পড়িয়া যায়. পরের দিন অরন্ধন বলিয়া সে দিনের সমস্ত রান্না পূর্ব্ব দিন করিয়া রাখে। রন্ধন ষষ্ঠীর পর দিন শীতলা সপ্তমী। শীতলা সপ্তমীর পর জন্মাষ্টমী; সেইদিন গুজরাতের অধিকাংশ লোকই উপবাস করে। রাত্রিতে ভক্তগণ দেব মন্দিরে সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে আনন্দ ও সংকীর্ত্তনে লিপ্ত থাকে। সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণের বালক-মূর্ত্তি আন্দোলিত হয়।

গুজরাতে নববর্ষার নদীজলে তিথি অনুযায়ী স্নান করিবার এক পদ্ধতি আছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই তিথিতে নববর্ষার নূতন জলে স্নান করিয়া থাকে।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা দিন বলি উৎসব। গুজরাতি ভাষায় ইহাকে "বুলেব" বলে। বামন মূর্ত্তিতে ভগবান বলির নিকট হইতে ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তাহারই স্মরণার্থ এই উৎসব। সেদিন ব্রাহ্মণগণ গৃহ দেবতাকে নদীতীরে লইয়া গিয়া পূজা করেন। এবং দেহশুদ্ধি বিধান করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল ও অরুন্ধতীর কুশ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি পূজা করেন। সেই দিন তাঁহারা পুরাতন যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া নূতন যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। সেইদিন সকলে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দেয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

কাউণ্ট টলষ্টয়

জগদীশ্বর যে সকল শক্তির বীজ মানব জীবনে প্রোথিত করিয়া রাখেন, কেহ সমস্ত জীবনের সাধনাদ্বারা যদি তাহার দুই একটীকে পরিপাটীরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তবে তাহার অপ্রতিহত শক্তি দেখিয়া জগত স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং তাহারই অপ্রতিহত শক্তি যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতে থাকে। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের কথা স্মরণ হইবা মাত্র আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ তাঁহাদের চরণে বিলুণ্ঠিত হইতে চায়, তাঁহারাও ভগবান প্রদত্ত দুই একটী শক্তির বিশেষ প্রকাশ দেখাইয়াছেন মাত্র। আজ আমরা যাঁহার বিষয় বলিতে যাইতেছি তাঁহার প্রতিভা বহুমুখীন। একাধারে তিনি রুশিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক, ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক ও রাজনৈতিক সংস্কারক। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি রুশিয়ার জনসাধারণের গুরু। শুধু রুশিয়ায় কেন জগতের সর্ব্বত্র কাউণ্ট লিও টলষ্টয়ের আসন অতি উচ্চে। এই মহাত্মা ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট রুশিয়াদেশে জন্মগ্রহণ করেন। টলষ্টয় সম্বন্ধে এত কথা লিখিবার আছে যে গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করিলেও তাঁহার বিষয়ে বলা শেষ হয় না। আজ আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিব। ক্রমে ভারত-মহিলার পাঠক পাঠিকাদের নিকট বিশেষ বিবরণ উপস্থিত করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

টলষ্টয়কে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমকালীন রুশিয়া সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। টলষ্টয়ের জীবনের প্রথমাবাস্থায় রুশিয়া ঘোর অন্ধকারে মগ্ন ছিল। রাজশক্তি ও সমাজশক্তি অপ্রতিহতভাবে যদৃচ্ছা পরিচালিত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রুশিয়া মগের মুল্লুক ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজা হইতে সামান্য রাজ-কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত যাহাকে ইচ্ছা ধরিয়া আনিয়া বিনা বিচারে আজীবন ভীষণ কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিতেন অথবা সুদূর সাইবেরিয়ার দুরন্ত হিমময় প্রদেশে নির্ব্বাসিত করিতেন। কত শত সহস্র হতভাগ্য যে বিনা বিচারে, বিনা অপরাধে শুধু কোন রাজকর্ম্মচারীর রোষ-নয়নে পতিত হইয়া রুশিয়ার নরকতুল্য ভীষণ কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জীবন ত্যাগ করিতেছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তখন মস্কো বা সেণ্টপিটার্স-বার্গের নাম শুনিয়া লোকের বুক কাঁপিয়া উঠিত। তখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হতভাগ্যদের আকুলক্রন্দনে বাস্তবিকই রুশিয়ার আকাশে যেন কালিমার চিহ্ন দেখা দিয়াছিল। কত আশ্রয়শূন্যা নারী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নিজের ও শিশু সন্তানের মৃত্যু কামনা করিত! জমিদারগণ তাহা-দের অধীনস্থ প্রজাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। সে কালে রুশিয়ার প্রজাদের অবস্থা ক্রীত-দাসদের অবস্থা হইতে কিছুমাত্র পৃথক ছিল না বরং কোন কোন স্থলে তদপেক্ষাও হীন ছিল। প্রজারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জমিদারের জমি কর্ষণ করিত, সকল প্রকার হীন কাজ করিত, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সকল সময় নিজের গ্রাসাচ্ছাদনও পাইত না। জমিদারের নিকট জমি ক্রয় করিলে সেই সঙ্গে সেখানকার প্রজা-দেরও পাওয়া যাইত। তাহাতে নূতন জমিদার তাহাদের উপর নির্ম্মমভাবে যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। কাউণ্ট টলষ্টয়ও নিজে একজন বিখ্যাত ধনী জমিদারের পুত্র ছিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায়ই মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতাও মানবলীলা সম্বরণ করেন। টলষ্টয়ের পিতা সমসাময়িক অন্যান্য জমিদারদের ন্যায় সাহসী, গর্ব্বিত ও অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু মাতার সাধুতা ও হৃদয়ের কোমলতা শিশু টলষ্টয়ের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর

পর কোন এক গর্ব্বিতা ও নীচমনা আত্মীয়ার হস্তে তাঁহার প্রতিপালনের ও শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। এইরূপ অভিভাবিকার হাতে পড়িয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রবল হইয়া উঠে। টলষ্টয় নিজে লিখিয়াছেন, তাঁহার মলিন বসন হলগুদেশ হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিত। চিরন্তন নিয়মানুসারে টলষ্টয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। সে কালে রুশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনী যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতার কেন্দ্রস্থল ছিল। যুবক টলষ্টয় কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানানন্তর বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ না করিয়াই সামরিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সামরিক বিভাগে কার্য্য গ্রহণের কিছুদিন পরেই আর্ম্মেনিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং তিনি তথায় গমন করেন। এই যুদ্ধে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া তিনি সামরিক বিভাগ পরিত্যাগ করতঃ আপনার বিস্তীর্ণ জমিদারীতে চলিয়া যান। তখনও তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু এই বিলাসিতা, ক্রীড়াকৌতুক এবং অপ্রতিহত প্রভুত্বও তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিতে পারিল না। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী তাঁহার নিকট দুঃখ ও শোক পরিপূর্ণ একটা কারাগার বলিয়া মনে হইল। একদিন তাঁহার জমিদারীতে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি ত প্রকৃত ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিতেছেন না। তাঁহার মনে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সেইদিন হইতে তাঁহার বোধ হইল, ভগবানের রাজ্যে সকল বিষয়ে মানব মাত্রেরই তুল্য অধিকার। অতএব প্রজাবৃন্দ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে ধন উপার্জ্জন করিতেছে বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অবলীলাক্রমে তাহা ভোগ করিবার তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তিনি স্থির করিলেন, এই প্রকার জমিদারী করা তাঁহার পক্ষে অন্যায়। সেইদিন হইতে প্রকৃত খৃষ্টীয়ান্ জীবন যাপন করিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন; সমস্ত প্রজাবৃন্দকে বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং তাহাদের সঙ্গে মাঠে গিয়া শীত ও গ্রীষ্মে মজুরের মত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজাদের শিক্ষার জন্যও অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। পুস্তক লিখিয়া তিনি যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পাইতেন তাহা অকাতরে পরের মঙ্গলের জন্য বিতরণ করিতে লাগিলেন।

তিনি যে কেবল সাধারণের উন্নতিবিধানার্থেই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি নবযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্য জগতে টলষ্টয় মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন। সমগ্র জীবন তিনি সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনার তীব্র-লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক সকল রুশীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার নানাগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হইয়া মানব-হৃদয়ে ভালবাসা ও ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিতেছে। সাহিত্যের কোন বিশেষ শাখা যে তাঁহার প্রিয় ছিল তাহা নহে, তিনি বহু উপন্যাস ও সমাজ, বিজ্ঞান, দর্শন এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। টলষ্টয় যদি রাজসেবায় জীবন অর্পণ করিতেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই মহামান্য রাজমন্ত্রী হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি অপমান, নির্য্যাতন ও দরিদ্রতাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন।

যখন তিনি দেশ-প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন তিনি আর তাঁহার হৃদয়ের দুঃখাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আমার ধর্ম্মমত এই যে, ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা ও জগতের প্রত্যেক নরনারী আমাদের ভাইবোন। প্রকাশ্য ভাবে এই বাণী প্রচার করাতে তিনি রাজপুরুষগণের বিরাগভাজন হইলেন এবং ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রুশিয়ার রাজপরিবার ও জনসাধারণ খৃষ্টীয় সমাজের গ্রীকচার্চ্চভুক্ত। এই গ্রীকচার্চ্চ মণ্ডলী তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া দিলেন। জগতের ইতিহাসে সর্ব্বদাই এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। জগতের কল্যাণের জন্য যখন কোন মহাপুরুষ ভগবৎ প্রদত্ত বিশেষ বাণী প্রচার করিতে উদ্যত হন তখন কত মোহান্ধ জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মের বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সকল বাধা কিছুতেই ঐশী শক্তির প্রতিবন্ধকতা

জন্মাইতে পারে না। তাহা আপনার দুর্দ্দমনীয় বেগে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। আজ ইঁহার করুণা বহুদিনের তমসাচ্ছন্ন রুশদেশে প্রেমের অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে; এখন ক্রোরপতি হইতে পর্ণকুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।

রুশিয়ার মহাবৃদ্ধ (Grand Old Man) জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া ৮২ বৎসর বয়সে জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। এমন মহাপুরুষকে হারাইয়া বসুন্ধরা বাস্তবিকই অমূল্য পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইলেন।

শ্রীপ্যারিমোহন দত্ত।

জ্যোৎস্নাতঙ্কিতা।

মধ্য রজনীতে যোগেন্দ্রনাথ জাগিয়া দেখিলেন, ষোড়শী পত্নী রমা শয্যা-পার্শ্বে নাই। সে দিন বাসন্তী পূর্ণিমা, বড় মধুময়ী। সেই নীরব শান্ত রজনীতে তরল-জ্যোৎস্না-ধারা স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ব্যবধানটুকু যেন ঘুচাইয়া দিয়াছিল! মৃদু সমীরণ চারিদিকে ফুলের সৌরভ-মধু ছড়াইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় তন্ময়তার সঞ্চার করিতেছিল! রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ-সুখে ধরণী যেন নাচিয়া উঠিয়াছিল! প্রকৃতি-সুন্দরী যখন চারিদিকে এইরূপে রূপের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেছিল, সেই মোহাবরণে জড়িত হইয়া যোগেন্দ্রনাথ আপনাকে কোথায় যেন হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন এ মধু-মুহূর্ত্তে রমা কোথায় গেল! এক মিনিট দুই মিনিট করিয়া প্রায় একঘণ্টা অতিবাহিত হইল, তবু রমা ফিরিয়া আসে না। যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার সতৃষ্ণ আঁখি দু'টি দ্বারদেশে বিন্যস্ত করিয়া দেখিলেন, অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে, তবে রমা কোথায় গেল? অস্থির-চিত্তে যোগেন্দ্রনাথ শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

(২)

ছাদে আসিয়া দেখিলেন রমা সেখানে রহিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে রমার সম্মুখে আসিলেন, দেখিলেন রমার চক্ষু পলকহীন, আঁখি-তারা বিস্ফারিত, শূন্য-নিবদ্ধ, কর-দ্বয় যুক্তবদ্ধ, অনুচ্চ অস্ফুটস্বরে কি যেন বকিতেছে।

অস্থিরভাবে যোগেন্দ্রনাথ ডাকিলেন, "রমা!" রমা নীরব।

ভয় বিহ্বল-চিত্তে তিনি আবার ডাকিলেন,—"রমা"। তথাপি রমা অবিচলিতা।

যোগেন্দ্রনাথ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এরূপ অমানুষিকী ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন দূরে থাকুক এমন ঘটনার কথা তিনি কানেও কখন শুনেন নাই। উৎকণ্ঠিত চিত্তে রমাকে তিনি লইয়া নীচে শয়ন-প্রকোষ্ঠে আসিলেন। নানারূপ আশঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায় রজনীর অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গে রমা প্রকৃতিস্থ হইল।

যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা! এখন সুস্থ বোধ করিতেছ!"

রমা বলিল, "আমার কি হইয়াছে?"

যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, রাত্রির ঘটনার কিছুই রমার মনে নাই। এই দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই সদ্য-প্রস্ফু-টিত প্রভাত-কমলটীকে ক্লিষ্ট করিতে তিনি সাহসী হই-লেন না। অন্য কথা পাড়িলেন।

পুনরায় এরূপ ঘটনা ঘটে কি না যোগেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। আবার পূর্ণিমা আসিল, সে দিনও মধ্য রজনীতে নিদ্রোত্থিতা রমা দ্বারের অর্গল খুলিয়া উন্মাদিনীবৎ ঘরের বাহির হইয়া পড়িল. সতর্ক যোগেন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে রমার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। রমা তাহাদের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। সেই শূন্য-দৃষ্টি, সেই উন্মাদবৎ হিজিবিজি প্রলাপ। যোগেন্দ্র পুনরায় রমাকে ঘরে ফিরাইয়া আনি-লেন। সারারাত্রি সতর্কতার সহিত তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। চন্দ্র অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এবারও রমা সুস্থ হইল। প্রতি পূর্ণিমায় এইরূপ ঘটিতে লাগিল। যোগেন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট দিনে সতর্কভাবে রমাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।

(৩)

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল. যোগেন্দ্রনাথ এই দৈবী ঘটনার রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ হইলেন না। প্রতীকার মানসে অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করি-

লেন সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হইল না। প্রথম হইতেই এ ঘটনাটী তিনি তাহার পরিবার ও প্রতিবেশীদের নিকটে গোপন রাখিয়াছিলেন। যখন রোগ-মুক্তির আশা সুদুর-পরাহত হইল, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন। তাহার বিশেষ ভাবান্তর লক্ষিত হইল, সে সদা-প্রফুল্ল-ভাব আর নাই; কাহারও সহিত মন খুলিয়া আলাপ করেন না। কোন আমোদ-প্রমোদে যোগ দেন না; রমার সহিতও তেমন প্রফুল্লমনে কথাবার্ত্তা বলেন না। রমা ভাবে, এ ভাবান্তর কেন হইল? তাহার সেবা শুশ্রূষায় বুঝি যোগেন্দ্রনাথ সুখী হইতেছেন না। সে ত কোন ক্রটী করে না, তবে কেন এমন হয়? রমা যোগেন্দ্রনাথকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি করি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। যোগেন্দ্রনাথের মাও এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন বধূর অনাদরই পুত্রের এই বিমর্ষতার কারণ. সুতরাং আকারে ইঙ্গিতে বধূকে এই কথাটার আভাস দিতে তিনি ছাড়িলেন না। রমা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই ভীত হইয়া পড়িল।

যোগেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করিলেন, অবিলম্বে "পশ্চিমে" বেড়াইতে যাইবেন। মাকে বলিলেন রমাও তাহার সঙ্গে যাইবে। যোগেন্দ্রনাথের পিতা জীবিত ছিলেন না। মাতাই সংসারের অভিভাবিকা। তিনি পুত্রের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। ভাবিলেন, দূরদেশে নানারূপ বৈচিত্র্যের ভিতর পুত্রের মানসিক প্রফুল্লতা হয়ত আবার ফিরিয়া আসিবে। শুভ-মুহূর্ত্তে যোগেন্দ্রনাথ রমাকে সঙ্গে করিয়া "পশ্চিম" যাত্রা করিলেন।

(৪)

আজ আবার পূর্ণিমা, একটী বৎসর পূর্ব্বে এমনই দিনে রমা সর্ব্ব প্রথম পীড়িতা হইয়াছিল. বৈদ্যনাথে সে দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ ও রমা পশ্চিমের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বৈদ্যনাথে আসিয়াছেন। এই একটী বৎসর রমার এই অদ্ভুত রোগ দূর করিবার জন্ত যোগেন্দ্রনাথ কত চেষ্টাই না করিয়াছেন, কত যাতনাই না সহিয়াছেন।

পার্শ্বে রমা শায়িতা. যোগেন্দ্রনাথ একখানা পুস্তক পড়িতেছিলেন; এখন প্রায় প্রতি পূর্ণিমা রজনীই তিনি কোন না কোন পুস্তক পড়িয়া কাটাইতেন। সে দিন পুস্তক পড়িতে পড়িতে তিনি কখন জানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন; একটা আকস্মিক চীৎকারে জাগ্রত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন. দাসী লখিয়া রমাকে ধরিয়া "বাবু, বাবু" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। যোগেন্দ্রনাথ সেখানে যাইতেই লখিয়া বলিল, "বাবু, আপনি মাকে ধরুন, আমাদের বাড়ীর পাশে এক সন্ন্যাসী ঠাকুর আছেন, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনি তিনি খুব ভাল ঔষধ জানেন।"

লখিয়া যোগেন্দ্রনাথের কোন প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া গেল। অত্যল্পকাল মধ্যে সন্ন্যাসী আসিয়া রমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এ রোগের নাম জ্যোৎস্নাতঙ্ক. কোন চিন্তার কারণ নাই. আমি একটা ঔষধ দিতেছি, আর এ রোগে আক্রমণ করিবে না। এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বন হইতে কি একটী লতারপাতা লইয়া আসিলেন; এবং ইহার রস নিংড়াইয়া রমার চোখে ও হাতে মাখাইয়া হাত দুখানি জোড় করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন, আর অনুচ্চস্বরে কি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। রমার অবশ শরীর কাঁপিতেছিল, তারপর ঘামিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, 'উহাকে শোয়াইয়া রাখুন, স্বেচ্ছায় না জাগিলে ডাকিবেন না, কাল আবার আমাকে সংবাদ দিবেন।' সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

প্রাতে রমা সুস্থ হইল, যোগেন্দ্রনাথ লখিয়ার দ্বারা এ সংবাদ সন্ন্যাসীর নিকট পাঠাইলেন। সন্ন্যাসী বলিয়া পাঠাইলেন, 'আর কোন ভয় নাই, রোগিনী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।'

বলাবাহুল্য যোগেন্দ্রনাথ এ সকল কথা রমার নিকট গোপন রাখিতে লখিয়াকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীর উপদেশে তাহারা আরও একমাস বৈদ্যনাথে রহিলেন। ইতঃমধ্যে একবার পূর্ণিমা গিয়াছে কিন্তু রমা পীড়িতা হয় নাই।

বিদায়-কালে সন্ন্যাসী ঠাকুর যোগেন্দ্রনাথকে বলিলেন,

"এই জ্যোৎস্নাতঙ্ক সাধারণতঃ ক্রূরকর্ম্মা লোকদের অভিশাপে ঘটিয়া থাকে, আমার বিশ্বাস, আপনার স্ত্রীকে কেহ অভিশপ্ত করিয়াছিল। আপনি দেশে ফিরিয়া এ রহস্যোদ্ভেদের চেষ্টা করিবেন।"

যোগেন্দ্রনাথ রমাকে সঙ্গে করিয়া অবিলম্বে দেশে ফিরিলেন, মা ও আত্মীয় পরিজন তাহাকে আবার প্রফুল্ল দেখিয়া সুখী হইলেন। ইতঃমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তনই ঘটিয়াছে, রমার পিতা পরলোকে গমন করিয়াছেন, উত্তরাধিকার সূত্রে রমা তাহার পিতার সম্পত্তি লাভ করিয়াছে, যোগেন্দ্রনাথ রমার অভিভাবক রূপে সে সম্পত্তির পরিরক্ষক।

একদিন যোগেন্দ্রনাথ তাহার শ্বশুরের একটী পুরাতন বাক্সে একখানি প্রয়োজনীয় দলিলের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, দেখিলেন, একখানা হস্তলিখিত খাতায় অন্যান্য অনেক স্মরণীয় ঘটনার সহিত নিম্নলিখিত ঘটনাটী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে:—

আমাদের বাড়ীতে মিসিয়া নাম্নী একটী দাসী ছিল। আমার পিতা মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে যাইতেন, একবার এই পার্ব্বত্য রমণীটিকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। সে নানাবিধ যাদু-বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিল। আমার স্ত্রী মিসিয়াকে বড় ভয় করিতেন। তিনি বলিতেন, মিশিয়া সর্ব্বদা তাঁহার অহিত চিন্তা করিতেছে। রমা এক বৎসরের হইলে আমার স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না, রমার প্রতিপালন-ভার-অনেকটা মিশিয়ার উপর অর্পিত হয়। কিছুদিন পরে দেখা গেল, মেয়েটি ক্রমেই শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমার স্ত্রীর সতর্ক-বাণী আমার মনে পড়িল, আমরা সতর্ক হইলাম, আমাদের একটী চাকর একদিন যথার্থই দেখিল, মিসিয়া রমার উপর কি মন্ত্র পড়িতেছে।

বিশ্বাসী চাকর সেই পিশাচীর কার্য্য-কলাপে ভীত হইয়া আমাকে সমুদয় জানাইল, আমি কন্যাটির অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইলাম। সে পিশাচীও ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং মেয়েটিকে অভিশপ্ত করিয়া বলিল, "যৌবনোদ্গমে রমা জ্যোৎস্নাতঙ্কে পীড়িতা হইবে, চন্দ্র-কিরণ দেখিলেই উন্মাদিনীবৎ ছুটিয়া যাইবে।" জানিতাম মিসিয়ার অভিশাপ অব্যর্থ, তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা করিলাম, পিশাচী অপেক্ষাকৃত কোমল হইয়া বলিল, "আমার অভিশাপ ব্যর্থ হইবে না, তবে যৌবনে প্রতি পূর্ণিমায় এইরূপ উন্মাদিনী হইবে।" এই বলিয়া মিসিয়া কোথায় চলিয়া গেল, তারপর আর তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই।

(৫)

সে দিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, যোগেন্দ্রনাথ অর্দ্ধশায়িত ভাবে কি একখানা পুস্তক পড়িতেছিলেন, রমা তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া তাহাই একাগ্রমনে শুনিতেছিল। পুস্তক পাঠ বুঝি যোগেন্দ্রনাথের ভাল লাগিতেছিল না, তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, দেখি রমা, এই কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে এত বিষণ্ণ দেখিতে কেন?"

রমা বলিল, "আমি ত কিছুই বুঝি নাই, কত দিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ভাবিয়াছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই। বল না তুমি কেন এত বিষণ্ণ থাকিতে? কেন এতদিন তোমার মুখে এক দিনও হাসি দেখি নাই?"

যোগেন্দ্রনাথ এত দিন পরে রমার নিকট আমূল ঘটনাটী বর্ণনা করিলেন।

রমা বলিল, "এত ঘটিয়াছিল, তবু আমাকে জানাও নাই কেন?" রমার স্বর অভিমান-পূর্ণ, যোগেন্দ্রনাথ এ কথার কি উত্তর দিবেন, অভিমানিনী রমাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

তখন বুঝি আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার মৌলিক।

গার্হস্থ্য ভৈষজ্য তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অমৃত।

নামান্তর—মিঠা বিষ, বিষ, শৃঙ্গীনাভ, মিঠা জহর, কাঠবিষ।

পরিচয়—র‍্যানান্‌কিউলেসী জাতীয় একোনাইটম্‌-ফিরক্স নামক বৃক্ষের মূল। ভারতের হিমালয় প্রদেশে জন্মে। বঙ্গদেশের বণিক দোকানে সচরাচর পাওয়া যায়। মূলগুলি দেখিতে প্রায় ২।৩ ইঞ্চি দীর্ঘ, নিম্নদিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র। আস্বাদ প্রথমতঃ সামান্য, পরে মুখ মধ্যে ঝিন্‌ ঝিন্‌ ও অবশতা অনুভব হয়।

এলোপ্যাথিক্‌ ও হোমিওপ্যাথিক্‌ ভৈষজ্যতত্ত্বে উল্লিখিত একোনাইটম্‌নেপেলাস্‌ ও ভারতীয় অমৃত অনেকে যে অভিন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। অমৃত- একোনাইটম্‌ফিরক্স। তবে উভয়ের ক্রিয়াই প্রায় এক প্রকার। যে যে রোগে একোনাইট্‌ নেপেলাস্‌ ব্যবহৃত হয়, তৎপরিবর্ত্তে অমৃত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্রিয়া—স্নায়বিক ও ধামনিক অবসাদক, প্রদাহ নাশক, ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক।

সূক্ষ্মমাত্রায়,—ধামনিক-উত্তেজক।

সাবধানতা—অমৃত একটী উগ্রবীর্য্য ঔষধ। অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দীর্ঘকাল ব্যবহারে কিংবা মাত্রার কিঞ্চিৎ আধিক্য হইলে, রোগীর বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। অত্যন্ত শারীরিক দৌর্ব্বল্যে, নিরক্ততা, হৃদ-পিণ্ড ও ফুসফুসের রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত থাকিলে ইহার প্রয়োগ অবিধেয়।

আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর চিকিৎসাতে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সাধারণ অবিরাম জ্বর ইহা দ্বারা সচরাচর ২৪ ঘণ্টা মধ্যেই আরোগ্য হয়। সহজসাধ্য স্বল্পবিরাম জ্বরও ৫।৬ দিনের মধ্যে বিরাম প্রাপ্ত হয়।

প্রদাহ ও প্রাদাহিক জ্বর নিবারণার্থ অমৃত প্রকৃতই অমৃত তুল্য। সময় মত প্রয়োগ করিতে পারিলে, প্রায় নিষ্ফল হয় না। কর্ণমূল প্রদাহ, গলপ্রদাহ, ব্রঙ্কাইটিস্‌, নিমোনিয়া, প্লুরিসি * প্রভৃতির প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে সচরাচর ৪৮ ঘণ্টা মধ্যেই রোগের প্রতিকার করা যাইতে পারে।

বসন্ত, হাম, জলবসন্ত প্রভৃতি উদ্ভেদমূলক জ্বরে, জ্বরের তীব্রতা প্রশমন করিয়া উদ্ভেদ সত্বর বাহির হইবার ইহা সহায়তা করে।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থায়, হিমাঙ্গে ও পরবর্ত্তী জ্বরে অমৃত বিশেষ ফলপ্রদ। প্রথমাবস্থায় কর্পূরাসব নিষ্ফল হইলে, অথবা প্রথম হইতেই ইহা প্রয়োগ করিবে। পরবর্ত্তী জ্বরে, ইহা একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তরুণবাত রোগে ইহা বাহিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয়। পুরাতন বাত রোগেও ইহা মহোপকারক। বেদনা ও যন্ত্রণা আশু নিবারণ করে। তবে ক্ষুদ্র সন্ধি অপেক্ষা বৃহৎ সন্ধির বেদনা দুর করিতেই ইহার কার্য্যকারিতা অধিক।

আমাশয়ের প্রারম্ভে রোগীর শরীরে ঈষৎ জ্বরভাব বর্ত্তমান থাকিলে,অমৃত দ্বারা সময় সময় আশাতীত ফললাভ করা যায়।

প্রমেহের প্রথমাবস্থায় ও তরুণমূত্রাশয় প্রদাহে—মূত্রনালীতে উত্তাপবোধ, চুলকান, শুড়্‌শুড়্‌ করা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা প্রযোজ্য।

ঠাণ্ডা লাগিয়া স্ত্রীলোকদের রজঃস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইলে পুনঃ রজ নিঃসরণার্থ অমৃত মহৌষধ।

সর্দ্দির প্রারম্ভে ইহার প্রয়োগে রোগ আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

প্রয়োগরূপ।

অমৃতের অরিষ্ট। মিঠাবিষ স্থূলচূর্ণ পাঁচ আনা বা একড্রাম, রেক্‌টিফাইড্‌ স্পিরিট দুই কাঁচ্চা বা এক আউন্স, শিশির মধ্যে আট দিবস ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ব্লটিং কাগজদ্বারা ছাকিয়া অরিষ্ট গ্রহণ করিবে।

মাত্রা—পূর্ণ বয়স্কের জন্য অরিষ্ট এক বিন্দুর আট ভাগের এক ভাগ। ভারত ভৈষজ্যানুরাগী পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা অরিষ্ট পাঁচবিন্দু মাত্রা করিয়া যে নির্দ্দেশ-করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশবাসীর পক্ষে উপযোগী বলিয়া বোধ হয়না। বরং তাহাতে সময় সময় অনিষ্ট

* বায়ুনলীভুজপ্রদাহ, ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ প্রভৃতি শব্দ হইতে ব্রঙ্কাইটিস্‌, প্লুরিসি প্রভৃতি শব্দই অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য বিধায়, এখানে সেই সমুদয় শব্দের প্রয়োগ করা হইল।

প্রবন্ধ লেখক।

হইতে দেখা যায়। স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার করিয়া আমি সর্ব্বদাই আশানুরূপ ফল লাভ করি। সিবিল সার্জ্জন অবিনাশচন্দ্র ঘোষও এই প্রকার স্বল্প মাত্রার পক্ষপাতী। আট আউন্স বা এক পোয়া একটী জলপূর্ণ শিশিতে এক বিন্দু অরিষ্ট দিয়া, আটটী দাগ কাটিয়া দিবে। পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে এক দাগ, বালকের পক্ষে অর্দ্ধ দাগ, শিশু পক্ষে সিকি দাগ। রোগের প্রারম্ভে প্রথমতঃ ঘণ্টায় ঘণ্টায়, পরে ক্রমশঃ দীর্ঘ সময়ান্তর সেবন ব্যবস্থেয়।

অমৃতের মর্দ্দন। অমৃতারিষ্ট সিকি কাঁচ্চা বা এক ড্রাম, দেশী দোবরা সুরা এক কাঁচ্চা বা চারি ড্রাম, কর্পূর সিকি কাঁচ্চা বা এক ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিবে। বাত ও স্নায়ুশূলাদি রোগে বাহ্য প্রয়োগার্থ ইহা বিশেষ উপকারী।

অর্জ্জুন।

নামান্তর—অর্জ্জুনগাব, ককুভ, কৌহ, বীরতরু।

পরিচয়—কম্ব্রিটেসি জাতীয় টেরমিনেলিয়া অর্জ্জুনা নামক বৃক্ষ। ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে। বঙ্গদেশের বীরভূম অঞ্চলে অর্জ্জুনগাছ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষগুলি প্রায় ৩০৷৩২ হাত উচ্চ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল ফোটে। ফুলগুলি খুব ছোট ও হরিতাভ শ্বেতবর্ণ। ফলগুলি দেখিতে প্রায় কামরাঙ্গার মত। ঔষধার্থ বৃক্ষের বল্কল ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া—বলকারক, সঙ্কোচক ও কফ নাশক।

আময়িক প্রয়োগ।

হৃদ্স্পন্দন ও হৃদ্দৌর্ব্বল্যে অর্জ্জুনের ক্ষীরপাককাথ উপকারী। হৃদরোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া অর্জ্জুনের যে একটা প্রসিদ্ধি আছে, সিবিলসার্জ্জন অবিনাশচন্দ্র ঘোষ তৎসম্বন্ধে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন না। বহুতর হৃদ-রোগীকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত অর্জ্জুনঘৃত ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া প্রায় স্থলেই তিনি আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন নাই।

অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেত চন্দনের কাথ শুক্রমেহের পক্ষে উপকারী।

অর্জ্জুন ছালের কাথ রক্তপিত্তের উপশমকারক বলিয়া চরকসংহিতাতে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাব প্রকাশে বর্ণিত আছে,—অর্জ্জুন ছালের চূর্ণ বাসকপাতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া, মধু, মিশ্রি ও গব্য ঘৃতের সহিত লেহন করিলে সরক্ত ক্ষয়কাশ নিবারণ হয়।

রক্তাতিসারে রক্তস্রাব নিবারণার্থ অর্জ্জুন ছাল ছাগদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক পুনঃ কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধ যোগ করিয়া সেবন করাইতে চক্রপানি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মেচেথা রোগে অর্জ্জুন ছাল মধু সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

প্রয়োগ রূপ।

অর্জ্জুন ক্ষীরপাক। কুট্টিত অর্জ্জুন ছাল দুইতোলা, গব্য দুগ্ধ আধপোয়া, জল দেড়পোয়া, সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইবে।

মাত্রা—অর্জ্জুন ক্ষীরপাক পূর্ণবয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধপোয়া বা ৪ আউন্স, বালকের পক্ষে একছটাক বা ২ আউন্স, শিশুর পক্ষে অর্দ্ধছটাক বা এক আউন্স।

অর্জ্জুন বল্কল চূর্ণের মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের জন্য চারি আনা, বালকের জন্য দুই আনা, শিশুর জন্য এক আনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী।
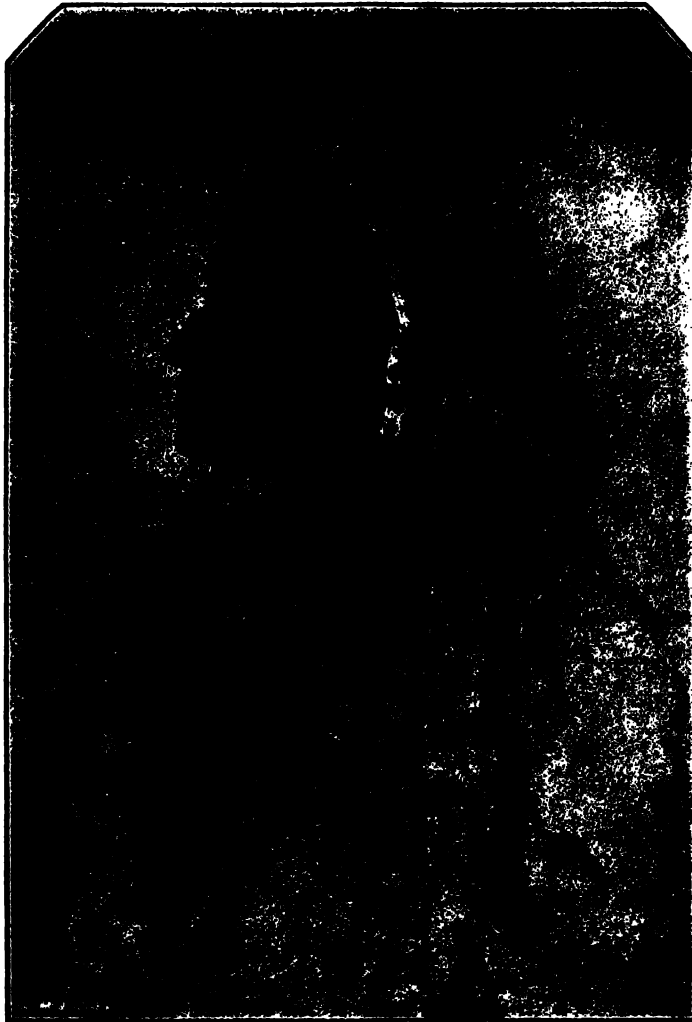
৺ লীলাবতী সিংহ এম, এ ।

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson

৬ষ্ঠ ভাগ। | মাঘ, ১৩১৭। | ১০ম সংখ্যা।

চাপা (চাঁপা) থেরীর গাথা।

গয়া জেলার দক্ষিণে যে বনভূমি, উহার অংশ বিশেষ অতিপূর্ব্বকালে বঙ্কহার দেশ নামে আখ্যাত ছিল। সেই দেশে নাল নামক এক ব্যাধ-পল্লীতে, এক ব্যাধের গৃহে চাঁপার জন্ম হয়। চাঁপা যখন যৌবনে পা দিয়াছে, তখন উপক নামক একজন সংসারত্যাগী ভিক্ষু (বৌদ্ধ কিম্বা জৈন নহে) চাঁপার পিতৃগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ভিক্ষুদের নাম ছিল আজীবক। আজীবক উপক, চাঁপার প্রতি প্রেমে আসক্ত হইয়া, তাহার পিতার অনুমতি লইয়া চাঁপাকে বিবাহ করেন; এবং বহুদিন পর্য্যন্ত আপনার সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া মৃগলুব্ধকের (ব্যাধের) কার্য্যে নিরত থাকেন। উপক, পরে আবার বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থের (স্থবির বা জ্ঞানবৃদ্ধ হয়েন; চাঁপাও স্বামীর পথ অনুসরণ করিয়া থেরী হইয়াছিল, চাঁপার রচিত গাথায়, তাহার স্বামীর কথাই বিশেষভাবে বিবৃত।

গাথাটি কথায় কথায় অনুবাদ করিয়াছি বলিয়া, হয়ত মূলের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অনুভূত হইতে না পারে। কিন্তু অনুবাদ ঠিক থাকিলে মূলটি যে কেহ পড়িয়া রস গ্রহণ করিতে পারিবেন মনে করিয়া, অনুবাদটি যথাযথ করিতেই বেশী প্রয়াস পাইয়াছি।

গাথা।

উপক—দণ্ডযষ্টি ছিল হাতে ব্যাধ আমি হয়েছি ইদানী;
ঘোর আশা-পঙ্কে মগ্ন; কেমনে না উতরিব জানি।

টীকাকার লিখিয়াছেন, যে একদিন চাঁপা তাহার নবজাত পুত্রটিকে এই বলিয়া আদর করিতেছিল:—

বাছা আমার, আজীবকের পুত্র, মৃগলুব্ধকের পুত্র।

উপক উহা শুনিয়া ভাবিলেন, চাঁপা তাঁহাকে পরিহাস করিতেছে। তাই গাথার পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে:—

রূপমোহে বাঁধা তার; তাই চাঁপা পুত্রকে তুষিতে
পরিহাস করি মোরে কথা কয় হাসিতে হাসিতে।
কাটিয়ে বন্ধন পুনঃ, হব ভিক্ষু বাসনা শাসিতে।

চাঁপা—হয়োনাকো ক্রুদ্ধ, ওগো মহাবীর, ওগো মহামুনি।
তপস্যা থাকুক দূরে, ক্রুদ্ধচিত্তে শুদ্ধি কোথা শুনি?

উপক—নাল গ্রাম হতে যাব ; কে করিবে হেন স্থানে বাস?
রমণীর রূপে ধর্ম্মজ্ঞানী শ্রমণের পাশ !

পরবর্ত্তী অনেক শ্লোকে চাঁপা, স্বামী উপককে "কালা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। টীকাকার বলেন,—"কাল-বন্নতায় কাল ইতি।

চাঁপা—ফিরে এসো কেলে সোণা, ভালবাস আগেকার মত ;
আমি আছি বশীভূতা ; পরিজন সেবিবে সতত।

উপক—তুমি যা চাহিছ দিতে, তৃপ্ত সে যে চতুর্থাংশে তার,—
যে তোমার প্রেমে বদ্ধ ; দীপ্ত তুমি প্রেমেতে তোমার।

চাঁপা—কালাঙ্গিনী লতা যথা সুপুষ্পিতা রাজে গিরিচূড়ে,
প্রফুল্ল দাড়িম্ব কিম্বা পাটলীটী দূর দ্বীপ-পুরে,
তেমনি তোমার পাশে শোভা মোর ; কোথা যাবে ছাড়ি ?
চন্দনে চর্চ্চিয়া অঙ্গ পরিব গো বারাণসী শাড়ী।

উপক—ব্যাধ যেন পক্ষীটিকে পাশে বাঁধি ধরিবারে চায়।
রূপ-পাশে আর মোরে বাঁধিতে না পারিবে হেথায়।

চাঁপা—ওগো কালা, পুত্র ফল মোরে তুমি করিয়াছ দান ;
তেজি পুত্রবতী ভার্য্যা কোথা তুমি করিবে প্রয়াণ ?

উপক—প্রব্রজ্যা করে যে প্রাজ্ঞ, তেজি তার পুত্র, জ্ঞাতি, ধন ;
হস্তী যথা কেটে যায় শৃঙ্খলের কঠোর বন্ধন।

চাঁপা—দণ্ডাঘাতে, ছুরি মেরে, কিম্বা তবে পুঁতিয়া ভূমিতে
মারি পুত্রে ? গেলে হবে সে শোক ভুঞ্জিতে।

উপক—শৃগাল কুক্কুর-মুখে সত্য যদি দাও পুত্র তবু—
হে পুত্র-জননী, মোরে ফিরাইতে পারিবে না কভু।

চাঁপা—যাবে সত্য তবে প্রিয় ! সুখে থাকো যথা তুমি যাও।
কোন্ গ্রামে, কি নগরে, কোথা যাবে, শুধু বলে দাও।

উপক—হইয়া শ্রমণ-মগ্ন, পূর্ব্বে আমি ভিক্ষুগণ সহ
শতেক নগরে গ্রামে ভ্রমিতাম, জ্ঞান অহরহ।
এবে নিরঞ্জনা-তীরে যাব, যথা বুদ্ধ ভগবান
সর্ব্ব দুঃখ বিমোচিয়া করিছেন জীবে ধর্ম্মদান।
তাঁহাকে করিব প্রভু, তাঁহারি চরণে নিব স্থান।

চাঁপা—অনুপম লোক-নাথে জানাইও বন্দনা আমার ;
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে দিও পদে নিবেদন ভার।

উপক—অনুপম লোকনাথে যবে আমি করিব দর্শন,
জানাব বন্দনা, আর দোঁহার বিনীত নিবেদন।

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক তিনটিতে চাঁপা কেবল ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন :—

নিরঞ্জনা-তীরে পরে গিয়ে কালা হেরিল তখন,—
কহিছেন বুদ্ধদেব অমৃত পদের বিবরণ।
আর্য্য অষ্টাঙ্গিক পন্থা বুঝায়ে কহেন ভগবান,
কেমনে দুঃখের জন্ম, কিরূপে দুঃখের অবসান।

[ধর্ম্ম সাধনায় অষ্ট অঙ্গের বিবরণ দিতে গেলে বিনয় পিটকের একটি সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদের বিবরণ দিতে হয়, শেষ শ্লোকের ত্রিবিদ্যার কথাও এখানে ব্যাখ্যা করিলাম না।]

প্রদক্ষিণ করি তাঁরে, বন্দিয়া শ্রীবুদ্ধের চরণ
কহিয়া চাঁপার কথা, নিল স্বামী প্রব্রজ্যা শরণ ;
ত্রিবিদ্যা ভাতিল চিত্তে, পালিল সে বুদ্ধের শাসন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

"আমি"।

"আমির" কোটা ছাড়তে গেলে লাগবে প্রাণে ডর,
ভাব্‌বে বুঝি গেল আমার এমন বাঁধা ঘর।
ভাব্‌বে আমার জনম গেল মরণ হোলো সার—
"আমি" যাওয়া মরণ হওয়া তফাৎ কোথা আর ?
এই "আমিকে" সঙ্গে রেখে করছি যত খেলা,
এইটি গেলে কি নিয়ে আর কাটবে বল বেলা ?
কি নিয়ে আর চল্‌বে এখন বেচা কেনার হাট
ভাঙ্গবে বুঝি ভবের লীলা উঠ্‌বে দোকান পাট।
ভেবোনা ভাই ভেবোনা ভাই সকল যাবে মুছে,
"আমি" গেলেই জগত যাবে একেবারে ঘুচে।

এই আশাই থাক্‌বে তখন এই বাতাসই রবে
যেম্‌নিটি এই দেখ্‌ছো এখন তেম্‌নিটি ঠিক্‌ র'বে।
কানাকড়ির একটি কোথাও যাবে নাকো খোয়া
চল্‌ছে যেমন চল্‌বে তেমন নিত্যি খাওয়া শোয়া
এই যে দেশে দেখ্‌ছো এখন, তখনো সেই দেশ,
"আমি" বলে ভাবনাটুকু, সেইটুকুরই শেষ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

আমাদের শিশু।

(১)

বিধাতার রাজ্যে শিশুর মত এমন মনোহর জিনিস বুঝি আর কিছুই নাই। ছোট ছোট শিশুগুলি তাহাদের কমল-দল সদৃশ মুখমণ্ডলে সুধা মাখা হাসি ফুটাইয়া যে গৃহ আলোকিত না করে তাহা অরণ্যের মত শ্রীশূন্য বলিয়া বোধ হয়। কবি বলিয়াছেন :—

ধন ধন ধন বাড়ীতে ফুলের বন
এ ধন যার ঘরে নাই তার কিসের জীবন?
তারা কিসের গরব করে
তারা আগুনে পুড়ে কেন না মরে?

আগুনে পুড়িয়া মরাটা যদিও কবির অত্যুক্তি তথাপি শিশুশূন্য গৃহস্থ ভগবানের একটা বিশেষ আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ যে গৃহ প্রভাত হইতে না হইতেই শিশুগণের চীৎকার, হাস্য এবং সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া না উঠে, তাহা জনশূন্য প্রান্তরের ন্যায় ভারবহ এবং নীরস। রন্ধন করিতে করিতে জননী শিশু পুত্রকন্যার আবদার, অভিযোগ জল ঢালা, দুধ ফেলা প্রভৃতি অসহ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেও তাঁহার প্রাণ সে সকল দৌরাত্ম্যের অভাবে রন্ধনশালায় থাকিতে চাহে না। পিতা আফিসের কঠোর পরিশ্রমের পর গৃহে আসিয়া যখন দেখিতে পান ক্ষুদ্র সন্তানটী মুখের লাল ফেলিতে ফেলিতে এবং আধ আধ ভাষায় কথা বলিতে বলিতে কোলে উঠিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে, ছোটখোকা "দেখ বাবা, দিদি আমাকে পুতুল দেয় না" বলিয়া নালিশ করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে, তখন সারাদিনের পরিশ্রম ভুলিয়া যান। পিতামহ, পিতামহী জীবনের সন্ধ্যাকালে শিশু পৌত্র পৌত্রীর সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া আবার প্রভাতের আলো দেখিতে পান। শিশুরূপ অমূল্য ধনের সহিত আর কোন ধনেরই তুলনা হইতে পারে না। কোন্ মায়া প্রভাবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণগুলি কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আসিয়া মানব প্রাণ এমন ভাবে অধিকার করিয়া বসে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ধন্য সেই অনাদিঅনন্ত পুরুষ যিনি আপনার অনন্ত প্রেমের বীজ জনকজননীর হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সংসারকে এমন মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন। সন্তান ভূমিষ্ট হইবা মাত্রই মাতৃ হৃদয় এরূপ ভাবে অধিকার করিয়া বসে যে সন্তানকে ভাল রাখিবার জন্য মাতাকে উপদেশ দিতে হয় না। এ প্রেম ভগবানের অযাচিত দান, কাহাকেও চাহিয়া লইতে হয় না।

সন্তানের মঙ্গলকামনা কোন্ পিতামাতা না করেন? এই জগতে সকলেই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিরন্তর ব্যাকুল, কেবল পিতামাতাই সকল স্বার্থের মূলে আপন সন্তানের মুখচ্ছবি দেখিতে পান। আবার সন্তানের জন্য দুঃখও বিস্তর। যে শিশুর সুমধুর হাসিতে গৃহ সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিত রোগযাতনায় ক্লিষ্ট সেই শিশুর বিষাদ কালিমাবৃত মুখ দেখিয়া পিতামাতার যাতনার সীমা থাকে না। আবার কোন কোন শিশু হয়ত বৃন্তচ্যুত কুসুমকোরকের ন্যায় অকালে জননীর ক্রোড় শূন্য করত পরলোক গমন পূর্ব্বক পিতামাতার প্রাণে এমন শেলবিদ্ধ করিয়া যায় যে তাঁহারা এ জীবনে সে বেদনা বিস্মৃত হইতে পারেন না। দয়াময় বিধাতার এ সুখের রাজ্যে এ হাহাকার কেন। অরণ্যচর পশুপক্ষীর কথা দূরে থাকুক একটা সামান্য বৃক্ষলতাকেও আমরা আপনাআপনি অসময়ে ঝরিয়া পড়িতে দেখি না। আর ভগবানের প্রিয় সন্তান মানবের গৃহে অকাল মৃত্যুজনিত এত হাহাকার কি তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ জনিত অপরাধের ফল নহে?

সন্তানপালনরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ বিধাতা রমণীর উপর অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতরমণী এরূপ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন যে পশুর অপেক্ষা তাহাদের

অধিকাংশেরই হিতাহিত জ্ঞান অধিক নহে। সন্তানের মঙ্গলকামনা সকলেই করেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কিসে তাহাদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে তাহা কয়জনে বুঝিতে পারেন? সামান্য একটা বৃক্ষকে পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিত করিতে হইলে কত যত্নের আবশ্যক। আর মানব-শিশু কি বিনা আয়াসে কেবল স্নেহের বলে প্রকৃত মানুষ হইতে পারে? বর্ত্তমান প্রবন্ধে শিশুর প্রতি জননীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শিশুকে মানুষ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয়, কারণ, শরীর সুস্থ না থাকিলে মানসিক বৃত্তিগুলিও সম্যক প্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। পীড়িত শিশু নিজেই কেবল কষ্টভোগ করে না, তাহাতে পিতামাতা এবং পরিবারের যাবতীয় লোককেই অবর্ণনীয় মানসিক কষ্টে নিপাতিত করে। শিশু তাহার নিজের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে অক্ষম সুতরাং তাহার অশুভের জন্য প্রধানতঃ জনকজননীই দায়ী। সংসারের আর কোন প্রকার কষ্টভারই জননীকে এই গুরুতর দায়িত্ব হইতে মুক্ত রাখিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ন্যায় অদৃষ্টবাদী জাতি অতি অল্পই আছে। সন্তানের পীড়া হইলে, বা সে মানুষ না হইলে আমরা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সেই দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে এবং সান্ত্বনালাভ করিতে চেষ্টা করি। অবশ্য শারীরিক যন্ত্র সকল এরূপ জটিল যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিলেও সর্ব্বতোভাবে ব্যাধিশূন্য থাকা সম্ভব নহে। তথাপি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি যথাযথ ভাবে পালন করিলে অনেকটা ব্যাধিমুক্ত থাকা যায় এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। যে সকল স্থানের জলবায়ু খারাপ বলিয়া প্রসিদ্ধ সেখানেও বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত এবং বায়ু দূষিত হইবার কারণগুলি বন্ধ করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করা গিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্রামক ব্যাধি-পীড়িত স্থানের মৃত্যুসংখ্যার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভ্রান্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন তাঁহাদের মধ্যে খুব কম লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হন। "কপালে রোগভোগ অথবা মৃত্যু থাকিলে তাহা এড়াইবার উপায় নাই" অশিক্ষিতাদের কথা দূরে থাকুক অনেক শিক্ষিত নরনারীর হৃদয়েও এই বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে অনেকেই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া নিজের অথবা সন্তানসন্ততির অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার আবশ্যকতা হিন্দুরা যেমন বুঝিতেন, জগতের কোন জাতিই সেরূপ বুঝিতেন না কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুসমাজের এই পবিত্র নিয়মগুলি কেবল বাহ্যিক আচার এবং শুচিবাইয়ে পরিণত হইয়াছে। জল হিন্দুর নিকট এমনই পবিত্র যে শাস্ত্রানুসারে জল নারায়ণের ন্যায় পূজনীয়। সন্ধ্যাবন্দনাদির সময়ও হিন্দুগণ জলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন * হে জল! তোমরা অতি সুখদায়ী, অতএব আমাদিগকে ইহকালে অন্নদান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহারমনীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিও। হে জল! তোমরা হিতাভিলাষিনী মাতার ন্যায় ইহলোকে আমাদিগকে অতি কল্যাণদায়ী রসের ভাগী করিও। হে জল! তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা তাহাতে তৃপ্তিলাভ করি। জলের পবিত্রতা রক্ষার মানসেই যে এই সকল স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার আবশ্যকতা কয়জনে বোঝেন বা তদ্বিষয়ে মনোযোগী হন? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পানীয় জলের পুকুরে ফুল, পাতা প্রভৃতি ফেলিয়া শাস্ত্রের উপদেশ পালনেই জলকে আমরা আরও অপবিত্র করিয়া থাকি। পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্যই আচারের সৃষ্টি কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে তাহা এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছে যে সর্ব্বাঙ্গে গোময় মাখিয়া এবং বাড়ী ঘরকে অতিরিক্তরূপে গোময় মিশ্রিত জল দ্বারা স্যাঁতসেঁতে না করিলে আচার রক্ষা হইল না বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, আমাদের আচার নিষ্ঠার কথা বলিতে হইলে অনেক কথাই বলিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িব। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি কি উপায়

* ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জেধাতন মহেরণায় চক্ষসে ইত্যাদি। ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা বিধি। ১।

অবলম্বন করা যাইতে পারে আপাততঃ তাহারই আলোচনা করা যাউক।

উপযুক্ত খাদ্য এবং পানীয় জল দ্বারা শরীর বর্দ্ধিত হয়, বিশেষতঃ আমাদের শরীরের অধিকাংশই জল, সুতরাং জল যে পরিমাণে বিশুদ্ধ হইবে এবং খাদ্য যে পরিমাণে পুষ্টিকর এবং সহজপাচ্য হইবে শরীরও সেই পরিমাণে সুস্থ থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। খাদ্যের দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয় ইহা সকলেই বোঝেন, সাধারণ লোকদের আবার এই জ্ঞানটা এত বেশী যে অধিকাংশ স্থলেই অপরিমিত আহারের দোষেই অনেক শিশু মৃত্যু মুখে পতিত হয়। খাদ্য শরীরের রক্ত মাংস বৃদ্ধি করে সত্য কিন্তু যে সকল শারীরিক যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্য রক্তমাংসে পরিণত হয় তাহাদের শক্তিও যে সীমাবদ্ধ অনেকে এ কথা না বুঝিয়া মনে করে, কোনও রূপে শিশুর পেটে খাদ্য প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলেই হইল। বাল্যকালে আহার করিতে বসিলে প্রায়ই বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে বলিতে শুনিতাম "খাও না, পেটতো আর পলে নয় যে ফেটে যাবে।" শিশু আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করিয়াছে, পেটে আর সরিষা প্রমাণ স্থান নাই, সে নিতান্ত কাতর ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "মা আল খাবোনা" কিন্তু জননী নানা প্রলোভন দেখাইয়া সেই ভরা পেটে আরও দুই তিন গ্রাস ঢুকাইয়া দিতেছেন। অনেক সময় দেখিয়াছি, শিশু উত্তমরূপে ভোজন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে, এমন সময়ে ঘরে হয়ত একটা ভাল খাবার আসিল, তখন মায়ের প্রাণে ভালবাসা এমন উথলিয়া উঠিল, যে নিদ্রিত সন্তানকে জাগাইয়া না খাওয়াইলেই চলে না। শিশু খাইতে চাহে না, কিন্তু তাহাকে মারিয়া ধরিয়া কাঁদাইয়া কিছু গলাধঃকরণ করাইতে না পারিলে মায়ের প্রাণে আর শান্তি হয় না। শিশুদের পাকযন্ত্র অধিকতর সবল এবং কার্য্যক্ষম হইলেও, উহার শক্তি অসীম নহে, সুতরাং এইরূপ অত্যাচারে পাকযন্ত্র সকল শীঘ্র বিকল হইয়া পড়ে। তখন দুশ্চিকিৎস্য পেটের পীড়ায় কতকগুলি জীবন্মৃত হইয়া থাকে, আবার কতকগুলি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। জননী তখন "বিধাতার বিচার নাই" বলিয়া কতক দোষ বিধাতার ঘাড়ে এবং কতক নিজের অদৃষ্টের উপর দিয়া বিলাপ করিতে থাকেন। অপ্রচুর আহারও অবশ্যই দোষাবহ, কিন্তু সন্তানকে আহার দিবার আকাঙ্ক্ষা মাতৃহৃদয়ে এত প্রবল যে সম্পন্ন পরিবারের শিশুদিগকে অল্পাহারে থাকিতে হয়, এরূপ অভিযোগ করিবার কোনই কারণ নাই। কুখাদ্য এবং আহারের অনিয়ম বশতঃই আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশু অকালে মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া যায়, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের ইহাই মত। বিশেষতঃ জ্বর, পরিপাক শক্তির হীনতা, বমন (Simple ও Chronic Vomitting) শিশুদের ভয়াবহ পেটের পীড়া (Infantile Diarrœa) এবং আমাশয়ের পীড়া প্রভৃতি প্রধানতঃ আহারের দোষ বশতঃই হয়। শিশুদের আহারের বিশুদ্ধতা এবং নিয়ম রক্ষা সম্বন্ধে আমরা যেরূপ উদাসীন, উহাদের অকালমৃত্যুজনিত শোক তাহারই ফল, সন্দেহ নাই।

অধুনা খাদ্যদ্রব্যে এরূপ ভেজাল চলিতেছে যে বাজারের মিষ্টান্ন ত দূরের কথা, বাজার হইতে ক্রীত ঘি দ্বারা গৃহে খাবার প্রস্তুত করিয়া দেওয়াও নিরাপদ নহে। এরূপস্থলে ছোট ছোট বালক বালিকাদের খাদ্যের জন্য অন্ন, গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ, রুটী এবং ফল মূলের উপর নির্ভর করিতে পারিলে ভাল হয়। শিশুদিগকে প্রত্যহ দুইবেলা অন্ন এবং উল্লিখিত প্রকারের দুগ্ধ ও রুটী এবং ফলমূল দ্বারা আরও ২।৩ বার জল খাবার দেওয়া যাইতে পারে। ভাল পানীয় জল ফুটাইয়া পরে ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে দিলে অনেক রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

বায়ুর অপর নাম প্রাণ বলিয়া কথিত আছে। খাদ্য এবং জলীয়ের অভাবে আমরা কিছুকাল বাঁচিতে পারি, কিন্তু বায়ুর সহিত এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারি না। এমন হিতের জিনিষকে যে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি, শিশুদের সান্নিপাতিক জ্বর, কণ্ঠনালীর পীড়া (Diptheria) হুপিং কাশি, ব্রোঙ্কাইটিস্ এবং ফুসফুসের পীড়া প্রভৃতি প্রধানতঃ দূষিত বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। দুর্গন্ধ নিবারণের উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হইলেও বায়ুকে ধূলিকণা হইতে

নির্ম্মুক্ত রাখা অনেক সময় আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে বিশুদ্ধ অম্লজান পরিপূর্ণ বায়ুবেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর বা নদীতটের অভাব নাই। শিশুদিগকে নিয়মিতরূপে সেই সকল স্থানে বেড়াইতে দিলে অনেক উপকার হয়।

বাসগৃহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে মনে কেমন স্ফূর্ত্তি অনুভূত হইয়া থাকে; শরীর আত্মার বাসগৃহ সুতরাং ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট মন্দির আর কি হইতে পারে? শরীর পরিষ্কৃত না রাখা গুরুতর পাপ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। অপরিষ্কার থাকার জন্য যে কেবল পাঁচড়া, দদ্রু প্রভৃতি সামান্য সামান্য চর্ম্মরোগই জন্মে তাহা নহে, চোখউঠা প্রভৃতি কষ্টকর ব্যাধিও জন্মিতে পারে। সন্তানকে ভাল ভাল পোষাক পরিচ্ছদ দিতে সকলেই ভালবাসেন। দরিদ্র পরিবারের লোকেরাও অনেক কষ্ট করিয়া রেশমী জামা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দেন, কিন্তু সে গুলি যে পরিষ্কার রাখা দরকার তাহা অনেকেই বোঝেন না। পূজার সময় মূল্যবান জামা কিনিয়া বৎসরের মধ্যে তাহা একবারও ধৌত না করাইয়া শিশুদিগকে ব্যবহার করিতে দিয়া থাকেন, অথচ সেই ব্যয়ে সমস্ত বৎসর অল্প মূল্যের পরিষ্কৃত পরিচ্ছদে যোগাইতে পারা যায়। অনেককেই এরূপ বলিতে শুনিয়াছি "রঙ্গকরা পোষাকই ভাল, ময়লা হইলেও দেখা যায় না", যেন কেবল দেখাইবার উদ্দেশ্যেই পোষাক পরান হয়।

বহুকাল ব্যবহার না করিলে কোন জিনিষই ভাল থাকে না। পুস্তক বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলে পোকায় ধরে, বাসনপত্রে দাগ পড়ে ও ময়লা হয় এবং কাঠের জিনিষে উই ধরে। মানব শরীরে ভগবান যে সকল ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন তাহারও উপযুক্ত ব্যবহার আবশ্যক। এই জন্য নিয়মিতরূপে ব্যায়াম না করিলে শরীর কখনও সুস্থ থাকিতে পারে না। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শীঘ্র শীঘ্র সবল হইবার প্রয়োজন বলিয়াই ভগবান তাহাদিগকে দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি অঙ্গ চালনার প্রবল ইচ্ছাও দান করিয়াছেন। শিশুর ক্রীড়া অনেকের পক্ষে অসহ্য। বুড়োদের ন্যায় গম্ভীর হইয়া পুস্তক লইয়া দিন রাত বসিয়া থাকাই তাঁহারা সচ্চরিত্রতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই এ দেশের স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সুগঠিত দেহ স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক মুখশ্রী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখের বিষয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আজকাল এ দিকে পতিত হইয়াছে। অতএব আমাদের শিশুদিগকে সুস্থ সবল এবং নীরোগ রাখিতে হইলে (১) উপযুক্ত এবং নিয়মিত খাদ্য (২) বিশুদ্ধ পানীয় জল (৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (৪) বিশুদ্ধ বায়ু (৫) শীত গ্রীষ্মভেদে উপযুক্ত পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

বাঙ্গলা সাহিত্যে ক্ষুদ্র গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি এত কবিত্বপূর্ণ, এত করুণরস-মণ্ডিত, যে পড়িয়া উঠিয়া বিচার ভুলিয়া আলোড়িত হৃদয়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। এ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের সহিত তুল্য। তাঁহার নিখুঁত শ্রেষ্ঠ গল্প খুব বেশী নাই তবে যাহা আছে তাহা গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে, সহানুভূতি উদ্রেক করিবার ক্ষমতায় এবং সর্ব্ব প্রকারেই রবীন্দ্র বাবুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গল্পগুলির তুল্য আসন পাইবার উপযুক্ত। দুই একটি এমন হৃদয় আলোড়নকারী যে অল্পের মধ্যে রবীন্দ্র বাবুরও এ রকম গল্প আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের ভয় হইতেছে অনেকে আমাদের প্রশংসা অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিবেন। তাঁহাদিগকে কেবল একবার মাত্র জলধর বাবুর গল্পগুলি পড়িতে অনুরোধ করি। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্গদেশে যাঁহারা পুস্তক কিনিয়া পাঠ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকের একান্ত অভাব, এবং ভগবান যাঁহাদিগকে প্রকৃত সাহিত্য চিনিবার এবং উপভোগ করিবার দুর্লভ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই—"ধনবানে কিনে বই জ্ঞানবানে পড়ে"—এই নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। যে সকল গল্প জাল জুয়াচুরি, খুন আত্মহত্যা,

ব্যভিচার চুরি, ডাকাতি, ইত্যাদির বিবরণে পূর্ণ, যে সকল গল্পের ঘটনায় স্বাভাবিকতার লেশমাত্র নাই; যথায় অদ্ভুতকর্ম্মা দৈব সহায় সম্পন্ন ডিটেক্‌টিভ অসম্ভব রকমের স্থূলবুদ্ধি চোরের পশ্চাতে দৌড়াইয়া হয়রান হইতেছে,—সেই সকল গল্পের পুস্তক বাজারে পড়িতেও পাইতেছে না। আর যে সকল গল্পে মানবজাতির বিচিত্র হৃদয়-তন্ত্রী সহস্র সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে, যে সকল গল্প যাইতে যাইতে ভাবতরঙ্গিনীর মূল প্রস্রবনে যাইয়া পৌঁছে, যে সকল গল্পে নিজ হৃদয়ের সাড়া পাইয়া হৃদয় ভরিয়া উঠে, যাহা মানবকে স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যায় সেই সকল প্রাণপূর্ণ গল্প প্রকাশকের আল-মারীতে থাকিয়াই তাহাদের গল্পলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়! বাঙ্গালা পাঠক সমাজের অবস্থা এই রকম শোচনীয় না হইলে জলধর বাবুর অমূল্য গল্পগুলির সংস্করণের পর সংস্করণ উঠিয়া যাইত।

এ পর্য্যন্ত জলধর বাবুর চারি খানা গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—নৈবেদ্য, ছোটকাকী, নূতন গিন্নী ও পুরাতন পঞ্জিকা। নৈবেদ্যে তিনি একান্ত বিনয়ের সহিত যে "পুষ্পচন্দনের আয়োজন" করিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাসীর পায়ে উপহার দিয়া তিনি নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদের তাহা গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে। নৈবেদ্যের প্রত্যেকটি গল্পই সুলিখিত, তার মধ্যে "পাগল" "প্রতীক্ষা" এবং "মা কোথায়" এই গল্প তিনটি অতুলনীয়। "পাগল" গল্পটি বঙ্গসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। ইহা না পড়িলে গল্পপ্রিয় পাঠক মাত্রেরই গল্পপাঠ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। "প্রতীক্ষা" গল্পটি পড়িয়া মনে হয় ইহার প্রত্যেক অক্ষর যেন লেখকের হৃদয়-রক্ত দিয়া লেখা হইয়াছে। ইহার সহানুভূতি উদ্রেক করিবার ক্ষমতা এরূপ অসাধারণ যে পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কোন প্রিয়তম আত্মীয় গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া তাঁহার চরম দুর্ভাগ্যের হৃদয়-বিদারক কাহিনী বলিতেছেন, আর আমরা নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে নির্ব্বাক হইয়া তাহা শুনিতেছি! "মা কোথায়" গল্পেও এই গুণ প্রচুর পরিমাণে আছে। গল্প পাঠকালে ভৈরবের ভৈরব গর্জ্জন, এবং সেই হৃৎকম্পকারী "মা কোথায়" প্রশ্ন, যেন কর্ণে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। আমরা এই গল্পত্রয়ের আর বেশী কোন আলোচনা করিব না। এই প্রাণময় গল্প তিনটিতে হস্তস্পর্শ করাইতেও সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।

নৈবেদ্যের বাকী গল্প চারিটি,—"অন্ধের কাহিনী" "সন্ন্যাসী" এবং "ব্রহ্মচারিণী"—প্রথম শ্রেণীর গল্প না হইলেও জলধর বাবুর লেখনীর অনুপযুক্ত হয় নাই। প্রত্যেকটিতেই জলধর বাবুর গল্পের বিশেষ গুণাবলি অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

"ছোটকাকী"তে জলধর বাবুর সাতটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে "সমাজ চিত্র"কে ঠিক গল্প বলা যায় না এবং এটি না ছাপিলেই ভাল হইত। এই গল্পটিতে জলধর বাবুর একান্ত অনুপযুক্ত একটু ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত শ্লেষ ব্যতীত আর কিছুই নাই। অপর আটটির মধ্যে "ছোটকাকী", "ডিপুটী বাবু" এবং "প্রায়শ্চিত্ত" উৎকৃষ্ট গল্প। "ডিপুটী বাবু" এবং প্রায়শ্চিত্তে জলধর বাবুর ভাষার ধার অতিশয় উপভোগ্য। সমাজ-সংস্কারকগণ বড় বড় গুরুভার বিশিষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া সমাজের যে উপকার করিতে না পারেন, এই রকম ক্ষুদ্র গল্পের সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাতে সমাজের তাহার চেয়ে ঢের বেশী উপকার হয়। "ডিপুটী বাবু" পড়িতে পড়িতে পত্নী-তর্জ্জনী পরিচালিত অকৃতজ্ঞ ডিপুটী বাবুর উপর ক্রোধে আত্ম সম্বরণ অসাধ্য হইয়া পড়ে। আধুনিক সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে এরূপ আত্মকেন্দ্রীভূত হৃদয়হীন "শিক্ষিত" নরপশু বিরল নহে। তাহাদের যে এই কশাঘাতে কিছুমাত্র চৈতন্য হইবে এইরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র! কিন্তু ভবিষ্যৎ যুগে যদি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই সর্ব্ববিধ্বংসী স্রোত ফিরে, তবে এই রকম সাহিত্যের প্রভাবেই ফিরিবে।

"প্রায়শ্চিত্ত" গল্পটির মত তৃপ্তিপ্রদায়ক গল্প জলধর বাবুর আর নাই। গল্পটি প্রথম ১৩১১ সনের "সাহিত্য" মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছিল। গল্পে তাহারও "পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বের" অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তখন একদিকে ব্রাহ্মসমাজের যেমন উৎসাহ অন্যদিকে গীতাও তেমনই দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ

তখনও ইংরেজী অনুকরণের মোহ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।" সেই জন্যই "ইংরাজী শিক্ষিত ডেপুটী হরিশ্চন্দ্র সান্যাল যে Mr. Horace C. Sandell নাম গ্রহণ পূর্ব্বক হ্যাট কোট ও টাই কলারের সম্মান রক্ষা করিতেন" ইহাতে লেখক মহাশয় কোন বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই! সাহেবিয়ানাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে সাণ্ডেল সাহেবের প্রাণপণ যত্নের ক্রটী ছিল না, এমন-কি তিনি আদালতে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের সময় বিস্ময়জনক রূপে বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাইতেন,—তাঁহাকে সাক্ষীর কথা ইংরেজীতে বুঝাইয়া দিতে হইত!

এহেন ডিপুটী বাবু যে অন্তঃপুরেও সমাজ সংস্কারের শিখা প্রজ্বলিত করিবেন এবং তাহারই প্রখরালোকে ডিপুটী-গৃহিণী যে শাড়ী ও মল ফেলিয়া গাউন ও জুতা বরণ করিবেন, এবং আদরের কন্যা সুমতি ওরফে সোফী যে বিবিয়ানায় পিতা মাতাকেও ছাড়াইয়া উঠিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। পিতা মাতার উচ্চ আদর্শে সোফীর ধারণা হইয়াছিল যে তাহার "বিবিয়ানার বাধা,—কেবল রংটা হয় না সাদা;"—কিন্তু তাহার চেষ্টার ক্রটী ছিল না একথা বলাই বাহুল্য। সুযোগ পাইলেই সে যে "প্রেমের অভিনয়ে কত নীলকুঠীর সাহেবদের টুপি সমেত মাথাগুলি ঘুরাইয়া দিতে পারিবে" এ বিষয়ে সে এক রকম নিঃসন্দেহ হইয়াছিল! কিন্তু মিস্ সোফী যখন নিরাপদে সপ্তদশের কোঠায় পা দিলেন তখন সান্যাল গৃহিনীর হৃদয়ে "বাঙ্গালিনী সুলভ চাঞ্চল্যের" উদয় হইল। সাণ্ডেল সাহেব একটি গরু চুরির মোকদ্দমার রায় লিখিতেছিলেন। গৃহিণী গিয়া তাঁহাকে এমনি তাড়া দিলেন যে "তাঁহাকে গরুচোর অপেক্ষাও অধিক নিগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হইল।" নানা কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক সোফীর জন্য পাত্রের খোঁজ চলিতে লাগিল; মিলিলও অনেক, কিন্তু টিকিলনা একটিও। কতককে সোফী না-মঞ্জুর করিল, কতক সোফীকে না-মঞ্জুর করিল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ডিপুটী সাহেব বিলাত পাঠাইবার প্রলোভন দেখাইয়া সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। এইবার ফল ফলিল। "বেকার গ্রাজুয়েটগণ দলে দলে দরখাস্ত পাঠাইতে লাগিল" এবং "ডেপুটী সাহেবের গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিল।" পূর্ব্বকালের রাজকন্যাদের অনুসৃত লুপ্ত স্বয়ম্বর প্রথাকে পুনর্জীবিত করিবার সাধু উদ্দেশ্য সোফীর মনে ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু স্বামীত্বের উমেদারদের মধ্য হইতে স্বামীরত্ন বাছিয়া বাহির করিবার ভার সোফী নিজেই গ্রহণ করিল এবং অনেক দেখিবার শুনিবার পর "শ্রীমান্ অখিলভূষণ বাগ্চী এম, এ-র ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল।" বিবাহ হইল এবং বিবাহের রাত্রেই তেজস্বিনী সোফী তাহার একান্ত অযোগ্য হতভাগ্য বাঙ্গালী স্বামীকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার পূর্ব্বে সে স্বামীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এমন "গোরার মত মেজাজের" স্ত্রী পাইয়া শ্রীমান্ অখিলভূষণ—যে কতকটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। জলধর বাবু লিখিয়াছেন যে অখিলভূষণের বাড়ী ছিল পূর্ব্ববঙ্গে একং ঢাকা জেলায়। সেই জন্যই নাকি সে এ অপমান সহজে ভুলিতে পারিল না। পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ বিশেষরূপে অপমান সহজে না ভুলিবার জন্য বিখ্যাত কিনা ঠিক অবগত নহি, কিন্তু এই অবস্থায় এমন অপমান যে সহজে ভুলিতে পারে সে মনুষ্য নামের অযোগ্য। "অখিলভূষণ জাহাজে পা দিয়াই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি এ অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। কিরূপে যে প্রতিশোধ দিবেন তাহা পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। তখন মন একটু প্রসন্ন হইল।

কিন্তু মানবমন স্বভাবতঃই বড় স্থিতিস্থাপক, কোনও আঘাতই বড় বেশী দিন তাহাকে অভিভূত রাখিতে পারে না। সেই জন্যই বোধ হয় অখিলভূষণ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াও স্ত্রীকে দুই একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার উত্তরে কর্ত্তব্যপরায়ণা সোফী তাহাকে জানাইয়াছিল যে ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার পূর্ব্বে সে তাহার নিকট হইতে প্রেম পত্র পাইবার জন্য উৎসুক নহে!" অখিলভূষণ স্তব্ধ হইয়া গেলেন এবং দুই বৎসর মধ্যে সম্মানের সহিত ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ফেলিলেন। এবার রুদ্ধ প্রেম দরিয়ায় বাণ ডাকিল। উক্ত খবর পাওয়া মাত্রই দীর্ঘ প্রেমপত্র ব্যারিষ্টার অখিলভূষণের নামে প্রেরিত হইল। স্রোত ফিরিয়াছে।

এবার অখিলভূষণের পালা। উক্ত পত্র পাইয়া অখিলভূষণ না খুলিয়াই উপরে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া ফেরত দিলেন। (Refused-A. Bnckchie) ফিরিয়া যখন এই পত্র আসিয়া সোফীর হাতে পৌঁছিল তখন নিজের সুদীর্ঘ প্রেমপত্রের এই "শোচনীয় পরিণাম" দেখিয়া সোফীর যে অবস্থা হইল তাহা জলধর বাবু নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন,—আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিলাম।

এদিকে "দুই তিন মাসের মধ্যে ব্যারিষ্টার অখিল ভূষণের কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না"। যখন খবর পাওয়া গেল যে অখিলভূষণ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন ডেপুটী সাহেব জামাতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি স্ত্রীকন্যাকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। কলিকাতা গিয়া খবর পাইলেন যে পূর্ব্ব রাত্রেই অখিলভূষণ ঢাকায় তাহার দাদার নিকট চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া ডেপুটী সাহেবের মুখ "পাংশুবর্ণ ধারণ করিল" এবং "তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন কে সবলে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল"। পাঠকপাঠিকা-গণ লক্ষ্য করিবেন, কি তীব্রভাবে 'প্রায়শ্চিত্ত' আরম্ভ হইয়াছে, এবং কিরূপ পাকা দাবা খেলোয়াড়ের মত অখিলভূষণ প্রত্যেক চাল দিতেছেন। অনেকে হয়ত অখিলভূষণকে হৃদয়হীন বলিবেন; কিন্তু অখিলভূষণ হৃদয়হীন নহেন, তাহার পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে। রোগী আরোগ্য করিতে সময় সময় চিকিৎসকের একটু নিষ্ঠুরতার আবশ্যক হয়, অখিলভূষণের এই নিষ্ঠুরতা তাহার চেয়ে বেশী নহে।

নিরুপায় হইয়া ডেপুটী সাহেব ঢাকায় কোন বন্ধুর নিকট পত্র লিখিলেন। পত্রের উত্তরে অখিলভূষণের বিষয়ে তিনি যে সংবাদ পাইলেন "তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কে পিনালকোডের সমস্ত ধারা একত্র জমাট বাঁধিয়া গেল।" "তিনি জানিতে পারিলেন, অখিলভূষণ বাগ্‌চী তাঁহার দাদার গৃহে ফিরিয়া হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তিনি চটি জুতা পরেন এবং সর্ব্বাঙ্গে হ্যাটকোট চড়াইয়া বসিয়া থাকেন না। বিলাত ফেরতের এমন শোচনীয় অধঃপতন বার্ত্তা পূর্ব্বে কখনও তাহার কর্ণগোচর হয় নাই, সুতরাং অখিলভূষণের প্রকৃতিস্থতায় তিনি অত্যন্ত সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি যখন শুনিলেন, অখিলভূষণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে সম্মত আছেন এবং তাহার দাদা সুন্দরী কন্যার সন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন তিনি প্রায়শ্চিত্ত প্রথা ও চটিজুতার উপর হাড়ে চটিলেন; কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ দেখিতে পাইলেন না।"

"সেই দিন ডেপুটী সাহেব অখিলভূষণের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন।" সম্রাট ঔরঙ্গজেব অনেক সময় কৌশলময় রাজনৈতিক পত্রের সাহায্যে যুদ্ধজয় করিতেন। স্যাণ্ডেল সাহেবের সাহেবিয়ানার ভূত ছাড়াইতে অখিলভূষণের এই পত্রখানি তাহা অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকর হইয়াছিল! পত্রখানি পড়িয়া, অখিলভূষণ ভবিষ্যতে যে বড় ব্যারিষ্টার হইতে পারিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। পত্রে অখিলভূষণ ডেপুটী সাহেবকে তাহার সুশিক্ষিতা কন্যার আত্মস্ত ব্যবহার বিস্তৃতভাবে জানাইয়াছেন এবং আশ্বাস দিয়াছেন যে তাহার বিলাত প্রবাসের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ডেপুটী সাহেব যে কয়েক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, তাহা সুদ সমেত তিনি শীঘ্রই পরিশোধ করিবেন। অখিল ভূষণের পত্রের শেষ অংশ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :—

আমি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, বিলাতী পোষাক ত্যাগ করিয়া দেশী ধুতি চাদর পরিতেছি; বিজাতির ও বিধর্ম্মীর নামের নকল করা নাম পরিত্যাগ করিয়া পিতামাতার প্রদত্ত শ্রীঅখিলভূষণ বাগ্‌চী নাম গ্রহণ করিয়াছি। আপনার গাউন পরিহিতা কন্যা সম্ভবতঃ এ সকল সহ্য করিতে পারিবেন না। গরীব গৃহস্থের বধূর মত লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পড়িয়া পরিজনবর্গের সেবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত থাকিলে, আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি নাই,—একথা আপনি তাহাকে বলিতে পারেন।"

এবম্বিধ কলিযুগ-বিরোধী ব্যাপারে ডেপুটী সাহেবের মস্তিষ্ক যে গরম হইয়া উঠিবে তাহা বিচিত্র নহে। আরদালীর হাতে অখিলভূষণের পত্র সোফীর নিকট

পাঠাইয়া দিয়া নদীর তীরে যাইয়া তিনি দুই তিন ঘণ্টা ভ্রমণ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, সোফী কাঁদিতেছে এবং তাহার মাতা বিষণ্ণভাবে শয্যার পার্শ্বে তাহার নিকট বসিয়া রহিয়াছে। ডেপুটী সাহেবের স্নেহকরস্পর্শে সোফী আরও কাঁদিতে লাগিল। "ডিপুটী সাহেব করুণার্দ্র স্বরে বলিলেন। কাঁদিস্ কেন মা? তোর ত কোনও দোষ নাই। যদি কেহ অপরাধী হইয়া থাকে ত সে আমি। তুই এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিস্?' সোফী প্রথমে কোনও উত্তর করিল না। ডেপুটী সাহেব পুনর্ব্বার অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সোফী মৃদুস্বরে বলিল—"আমাকে ঢাকাই যাইতে হইবে।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন—"* * * অখিল যেমন চায় সেভাবে চলিতে পারিবে?"

"সোফী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।"

এই স্থানে বিসর্জ্জিত-সর্ব্ব-কৃত্রিমতা সোফীর চিত্র এমন মনোহর বোধ হয়, নারীত্বের এবং দেবীত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া মনে এত আনন্দ হয় যে ভাষায় তাহার সম্যক্ প্রকাশ অসাধ্য। মনে হয় ধন্য পুরুষ অখিলভূষণ এবং সর্ব্বোপরি মনে হয় ধন্য লেখক জলধর বাবু।

অতঃপর "শ্রীমতী সুমতি দেবী শাখা ও শাড়ী পরিধান করিয়া সিথিতে সিঁদুর পরিয়া অবগুণ্ঠনবতী হিন্দু বধূর ন্যায় পাকস্পর্শের ভোজে কুটুম্বগণের পাতে অন্ন-ব্যঞ্জন দিতে লাগিল;"—স্যাণ্ডেল সাহেব হ্যাটকোট ছাড়িয়া চোগা চাপকান ধরিলেন, অখাদ্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলেন, এমন কি মাথায় একটি খাটো টিকিও রাখিলেন।

"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মিঃ হোরাস স্যাণ্ডেল পঞ্চদশ বৎসরের সার্ভিসের পর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে সার্ভিস লিষ্টে তাহার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম বসান হউক "বাবু হরিশ্চন্দ্র সান্যাল।" অখিল ভূষণের চিকিৎসা এমনি ফলদায়ক হইয়াছিল!

জলধর বাবুর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গল্পটিকে, আলোচনা করিতে গিয়া হয়ত আমরা মাটিই করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু আমাদের কোনরূপ হিংস্র অভিপ্রায় নাই, অন্ততঃ এই ভাবিয়াও পাঠক পাঠিকা আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

জলধর বাবুর গল্পের প্রধান উৎকর্ষ তাহাদের নিপুণ করুণরস সৃষ্টিতে। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক গল্পই করুণ রসাত্মক। প্রায় প্রত্যেক গল্পেই জলধর বাবুর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া গল্পটিকে লেখকের প্রাণের গল্প করিয়া তুলিয়াছে। অনেকে বলেন, এরূপ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ লেখকের পক্ষে দোষের কথা, গুণের নহে। ব্যক্তিত্ব প্রকাশ যে গুণের কথা, এরূপ আমরাও বলিতেছি না। ব্যক্তিত্ব প্রকাশে রচনা এক ঘেয়ে হইয়া পড়ে এবং জলধর বাবুরও স্থানে স্থানে সেই দোষ যে বর্ত্তে নাই এমন নহে। কিন্তু বিচিত্র, কোমল, স্বাভাবিক করুণরসের প্রবাহে সমস্ত দোষ ধুইয়া গিয়াছে। আমরা প্রায়শ্চিত্ত গল্পে জলধর বাবুর ভাষার তীক্ষ্ণতার প্রশংসা করিয়াছি; কিন্তু জলধর বাবুর ভাষা সমস্ত গল্পে সমান নহে। কয়েকটি গল্পে জলধর বাবুর ভাষা নিতান্ত মন্থর-গতি, শৈবালদলসমাচ্ছন্না শীর্ণকায়া তটিনীর মত। কিন্তু এই ভাষাতেই যেন করুণরস আরও প্রগাঢ়ত্ব লাভ করিয়াছে। মন্থর, অকোমল, অনিচ্ছুক ভাষার নীচ দিয়া যে ভাব-ফল্গু প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহার স্পর্শে সমস্ত হৃদয় শীতল হইয়া যায়। * (ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

রমণীর দয়া ও পরসেবা।

জগতে দুঃখও আছে, আবার মানব-হৃদয়ে করুণাও আছে। এই করুণা না থাকিলেই সুখের সংসার দুঃখে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহা হইলে পৃথিবীর অসহায় নরনারী কোথাও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইত না, কাহারও নিকট

---

* অগ্রহায়ণ মাসের ভারত-মহিলায় এই প্রবন্ধের লেখক "সাহিত্য" পত্রের অনিয়মিত প্রকাশের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে ১৩১৫ সনের দুই এক মাস ব্যতীত সাহিত্য কখনো অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে সাহিত্য আমরা নিয়মিতরূপেই পাইতেছি। ভাঃ মঃ সঃ।

একটুকু সহানুভূতি লাভ করিত না; নিরন্তর দুঃখীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে জগতের বায়ু উষ্ণ হইয়া উঠিত এবং সেই উষ্ণ ও বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে মানুষের সুখে বাস করা অসম্ভব হইত। সুতরাং এই ধরাতলে করুণা এক স্বর্গীয় সামগ্রী।

মানুষ এই করুণার বশবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে নানা রকম মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে এবং মানব-জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছে। মানুষের সেই সকল পুণ্যকার্য্যের মধ্যে পরসেবা অর্থাৎ নরনারীর দুঃখ নিবারণের জন্য আত্মোৎসর্গই শ্রেষ্ঠ কার্য্য। এই কার্য্যের সঙ্গে মানুষের আর কোন কার্য্যেরই তুলনা হইতে পারে না। এই জন্য যে সকল নরনারী জগতের হিতের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইতিহাসের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদেরই অমর আত্মা পরলোকে থাকিয়া এই মর্ত্ত্যের মানবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। এ জগতে এই বড় এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! একদিকে শত শত মানুষ হিংস্র প্রকৃতির অধীন হইয়া নরনারীর রক্ত পান করিবার জন্য লোলজিহ্বা বিস্তার করিতেছে, দুষ্প্রবৃত্তির অধীন হইয়া নিজে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে, অপরকেও ডুবাইতে চাহিতেছে, স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখীর অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইতেছে! আবার অপর দিকে ইহার কি বিপরীত দৃশ্য! যেমন সূর্য্যের উত্তাপে বিগলিত তুষার রাশি ঝরণা হইয়া বহিয়া যায়, তেমনি জগতের দুঃখের উত্তাপে শত শত নরনারীর হৃদয়ের প্রীতি বিগলিত হইয়া করুণার ঝরণা বহিয়া যাইতেছে! কত নরনারী লোকের দুঃখ নিবারণের জন্য স্বহস্তে হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া দেবাদিদেবের চরণে অর্পণ করিতেছে, কত নরনারী সমস্ত জীবনের কঠোর তপস্যার ফল পাপীকে পাপ হইতে উদ্ধারের জন্য অর্পণ করিতেছে; কত নরনারী নিজের শ্রমের অন্ন অন্নহীনের মুখে তুলিয়া দিতেছে! এ সকলই দয়ার কার্য্য; শুধু দয়ার কার্য্য নহে; দয়ার চরমোৎকর্ষের পরিচয়। তাই বলি পরসেবাই দয়াবান পুরুষ ও দয়াবতী নারীদিগের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য।

পুরুষ ও নারীদিগের মধ্যে রমণীর হৃদয় অত্যন্ত কোমল; এজন্য তাঁহাদের দয়াও অনেক বেশী। কিন্তু স্বামীর সেবা, সংসারের কার্য্য ও সন্তানদিগের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহাদের দয়া অনেক পরিমাণে গৃহপরিবারের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাবে পরসেবার সুযোগ ও সুবিধাও অল্প। বোধ হয় এই জন্যই লোক-হিতার্থে নারীর মহৎকার্য্যের দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে।

এ বিষয়ে হিন্দুনারীর অবস্থাই কেন একবার ভাবিয়া দেখুন না। সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুনারীর অন্তরই বোধ হয় অত্যন্ত কোমল; তাঁহাদের দয়াও অনেক বেশী। কোন্ হিন্দুনারী লোকের মর্ম্মান্তিক দুঃখ দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? পাড়ার মাতৃহীন শিশু দেখিলে কোন্ নারীর চিত্ত করুণায় আর্দ্র না হয়? প্রতিবেশীর ঘরে অন্ন নাই, এ কথা শুনিলে হিন্দু-মহিলা তৃপ্তির সহিত নিজের অন্ন ভোজন করিতে পারেন না। প্রতিবেশী শত্রুর গৃহেও শোক উপস্থিত হইলে, রমণী তৎক্ষণাৎ শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে যান। অথচ হিন্দুনারী জগতের দুঃখ নিবারণের জন্য কোন মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন নাই অর্থাৎ পরসেবায় প্রবৃত্ত হন নাই। কেমন করিয়া প্রবৃত্ত হইবেন! হিন্দুসমাজে তাহার সুযোগ কোথায়? তাঁহাদের শিক্ষা নাই, স্বাধীনতা নাই, অন্তঃপুরের বাহিরে কোন মহৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া মহীয়সী নারীর মধ্যে গণ্য হইবার উপায় নাই; সমাজ অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র একটু স্থানের মধ্যে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন, পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা সেই ছোট জায়গাটুকুর মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রতিদিনের নিরূপিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া যান। কিন্তু এই বৃহৎ বিশ্বে লোকের কত দুঃখ আছে, জ্বালা আছে, রোগ আছে, শোক আছে, সে সংবাদ তাঁহাদের কাছে আসিয়া পৌঁছায় না; পৌঁছিলেও তাঁহারা করুণায় আর্দ্র হইয়া শুধু অশ্রুবিসর্জ্জনই করিতে পারেন, না হয় বড় জোর দুঃখীর সাহায্যের জন্য গুটিকয়েক টাকা দান করিতে পারেন; তাহা ছাড়া তাঁহাদের আর কি কার্য্য করিবার শক্তি আছে?

আমার বোধ হয় হিন্দুনারীর এই সকল কথা স্মরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ বয়সে নিশা ও জয়ন্তী প্রভৃতির স্থায় নারীচরিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। এ দেশে রমণী-জীবনের একটা নূতন আদর্শ প্রদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থের সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় মহাশয় সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের অপেক্ষা নিশা, জয়ন্তী প্রভৃতি নারীচরিত্রের অধিক প্রশংসা করিয়াছেন।

এরূপ প্রশংসার কারণ আছে। নারীর পক্ষে সাধ্বী ও স্নেহময়ী হইয়া স্বামীর সেবা, সন্তানের পরিচর্য্যা ও গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করা সামান্য কথা নয় বটে এবং উহাতেই নারীধর্ম্ম রক্ষা হয়;—ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি। তবুও বলিতে বাধ্য হইব, এই সকল কার্য্যের দ্বারা নারী নারীর অধিক আর কিছুই নহেন; কিন্তু যে নারী তপস্যা দ্বারা ঈশ্বর ভক্তি লাভ করেন এবং জগতের দুঃখ নিবারণের জন্য পরসেবায় প্রবৃত্ত হন, তিনি মানবী হইয়াও দেবী। অতএব হিন্দুনারীদিগকে গৃহকার্য্য ও সন্তান পালনের সঙ্গে সঙ্গে পরসেবারও সুযোগ করিয়া দিতে হইবে; উক্ত কার্য্যের জন্য সমুচিত শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে।

যাহা হো'ক যে সকল ইউরোপীয় রমণী শি া ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের দয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহারা পরসেবার দ্বারা জগতের দুঃখ নিবারণে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করিব।

আমরা দূর দেশে থাকিয়া ইংলণ্ড, এমেরিকা ও ফরাসীদেশের অনেক রমণীর সুখস্পৃহা, বিলাসিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবের অনেক গল্প শুনিয়া থাকি। এই সকল শুনিয়া শুনিয়া মনের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া যায়। আমরা ভাবি পশ্চিম দেশীয় রমণীদিগের মধ্যে যথেষ্ট ধর্ম্মভাব নাই; তাঁহাদের অন্তরে করুণা ও কোমল ভাবেরও অত্যন্ত অভাব। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। পশ্চিম দেশে বিষয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ধনৈশ্বর্য্য বাড়িয়া যাইতেছে; এজন্য লোকের মন ভোগবিলাসিতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং লোকের অন্তরের ধর্ম্মভাব হ্রাস হইতেছে;—ইহা স্বীকার করি। কিন্তু এমনই দিনকাল পড়িয়াছে যে, ভারতবর্ষের শত প্রকার অভাব সত্ত্বেও এখানে লোকের সুখস্পৃহা বৃদ্ধি হইতেছে, ত্যাগের অপেক্ষা ভোগের আকাঙ্ক্ষাই বাড়িয়া চলিয়াছে; তৎসঙ্গে হিন্দুজাতির ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া যাইতেছে।

অথচ এ সকল সত্ত্বেও হিন্দুনারীর হৃদয়ের মহত্ত্ব ও করুণা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। পশ্চিমদেশীয় রমণীদিগেরও হৃদয়ের মহত্ত্ব ও করুণার বিলোপ ঘটে নাই। এ দেশেও এক শ্রেণীর ধনীর ঘরের মেয়েরা বেশবিন্যাস ও আমোদ প্রমোদ করিয়া, উপন্যাস পড়িয়া, থিয়েটার দেখিয়া সময় কাটান; সে দেশেও প্রায় তাই; তবে তাঁহারা লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

এই সকল স্ত্রীলোক ব্যতীত পশ্চিমদেশে এক শ্রেণীর ধর্ম্মশীলা রমণী আছেন। তাঁহারা হৃদয়মাহাত্ম্যে যথার্থই দেবী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহাদের অন্তর পুষ্পের রমণীয় দল অপেক্ষাও কোমল ও পবিত্র। জগতের দুঃখ তাপে তাঁহাদের চিত্ত বিগলিত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের করুণার অমৃতস্রোত জগতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই সকল দয়াময়ী রমণীর কথা স্মরণ করিলেও প্রাণ পবিত্র হয়। সংসারে ইঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সুখের পথ মুক্ত ছিল; ইঁহাদের অনেকেরই রূপ ছিল, গুণ ছিল, সমাজে সম্মান ছিল; ইঁহারা ইচ্ছা করিলেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন; কিন্তু বিধাতার আহ্বানে ইঁহারা সুখের পথ ত্যাগ করিয়াছেন; নারী-হৃদয়ের প্রেম সঙ্কীর্ণ গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ না রাখিয়া বিশ্বে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন; ইঁহারা আপনার আত্মীয় স্বজনকে দূরে রাখিয়া জগতের দুঃখী নরনারীদিগকেই আপনার করিয়া লইয়াছেন; এই বিংশ শতাব্দীতে ইঁহারা যদি দেবী না হন, তবে আর দেবী কাহাকে বলিব?

এই সকল দয়াময়ী রমণী দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রায় সর্ব্বপ্রকার দুঃখ মোচনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলে দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রধানতঃ চারি প্রকারের দুঃখ দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ অজ্ঞানতার দুঃখ। ভাবিয়া দেখিলে মানুষের

জ্ঞানের তুল্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আর কি আছে? জ্ঞানেই মানুষের মনুষ্যত্ব; নতুবা জ্ঞানবিহীন অসভ্য মানুষও প্রায় পশুরই সমান। কিন্তু জগতের লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারী এই জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন। পশ্চিম দেশীয় শত শত পুরুষ ও নারী পশুর ন্যায় অসভ্য মানুষদিগের দেশে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞানালোক বিতরণ করিতেছেন। এই ত আমাদের বাঙ্গালা দেশের নিকটেই ছোটনাগপুর অঞ্চলে কত অশিক্ষিত কোল ও সাঁওতাল রহিয়াছে। তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া আমাদের প্রাণ কি কাঁদে? আমরা কি তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করি? কিন্তু সকলে একবার রাঁচি সহরে গিয়া খবর লইতে চেষ্টা করুন, জানিতে পারিবেন, ইউরোপের নানা স্থানের পুরুষ ও নারীগণ কোলদের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থাকে উন্নত করিয়া তুলিতেছেন

পুরুষদিগের দয়ার কথা আলোচনা করিয়া আমাদের কোন লাভ নাই। আমরা পশ্চিমদেশীয় রমণীদিগের দয়ার বিষয়ই চিন্তা করিব। শুধু যে তাঁহারা অসভ্যদের মধ্যেই জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন, তাহা নয়। ঐ সকল রমণীগণ ভারতবর্ষের সহরে সহরে বাস করিয়া হিন্দু-নারীর জ্ঞানোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য ইঁহার মধ্যে তাঁহাদের কিছু উদ্দেশ্য আছে, তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্যও কি তাঁহাদের পক্ষে মহৎ নয়?

দ্বিতীয়তঃ মানুষের দারিদ্র্যের দুঃখ, অর্থাৎ অন্ন বস্ত্রের কষ্ট। মানুষ এই দুঃখকেই অতিশয় ভয়ানক বলিয়া মনে করে। অথচ সর্ব্বত্রই লোকের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক স্থানে এই অন্ন বস্ত্রের অভাবে লোকের যে কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা স্মরণ করিতেও অশ্রুতে নয়নপল্লব সিক্ত হয়। এ সংসারে কত অনাথা বালিকা ও অনাথিনী রমণী অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা কে বলিবে? তাঁহাদের দুঃখের কথা ভাবিয়া আমাদের কি প্রাণ কাঁদে? আমরা কি তাহাদের খবর লইয়া থাকি? আমরা আপন আপন সুখ দুঃখ লইয়া ব্যস্ত; পরের কথা ভাবিবার সময় কোথায়?

এই ভারতবর্ষেই বিস্তর অসহায়া বালিকা আছে। আমরা তাহাদের আশ্রয় দিবার জন্য তেমন কিছুই করিতে পারি নাই। দেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমে কয়েক শত বালিকা বাস করে। তদ্ভিন্ন শত শত অসহায়া বালিকা খ্রীষ্টান রমণীদিগের আশ্রমেই আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এই সকল রমণীগণ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারতে আসিয়াছেন এবং চিরজীবন কুমারী থাকিয়া অসহায়া বালিকাদিগকে কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন।

উঁহার একটি আশ্রমে প্রবেশ করিলে এবং ইউরোপীয় রমণীদিগের কার্য্য দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। কিছুদিন হইল চট্টগ্রাম সহর গমন করিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী প্রতিদিনই ইউরোপীয় মহিলাদিগের কন্‌ভেন্টে গমন করিতেন। তিনি একদিন ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে একটি প্রকাশ্য সভায় কন্‌ভেন্টের সেবাপরায়ণা নারীদিগের কার্য্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল মহিলা বিস্তর অসহায়া বালিকার সেবা করিয়া থাকেন। চট্টগ্রামে ধোপার বড় অভাব কাপড় পরিষ্কার রাখিতে হইলে বিস্তর খরচ হয়; এজন্য মেয়েরাই আশ্রমের ধোপার কাজ করেন, তাঁহারা স্বহস্তে রাশি রাশি বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন আমরা যে সকল নিম্নশ্রেণীর বালিকাদিগকে স্পর্শ করিতেও চাহি না, তাঁহারা সেই সকল বালিকাদিগকেই কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়া থাকেন। উঁহাদিগের প্রতি তাঁহাদের করুণা ও মমতা দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে হয়।

তৃতীয়তঃ মানুষের রোগের যন্ত্রণা ও শোকের দুঃখ বড় ভয়ানক। রোগ যখন শরীরের অস্থি চূর্ণ করিতে থাকে এবং শোক হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলে, তখন এই বিশ্বসংসারে কিছুই আর ভাল বলিয়া মনে হয় না। তন্মধ্যে যে সকল হতভাগ্য পুরুষ ও হতভাগিনী রমণী নিরন্তর রোগের যন্ত্রণা ভোগ করেন, অথচ কোথাও একটি আপনার লোক দেখিতে পান না, কাহারও নিকট

সেবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না, দারুণ কষ্টের সময় নীরবে কেবল অশ্রুই বিসর্জ্জন করেন ;—বুঝিবা তাঁহাদের দুঃখের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। কিন্তু ইউরোপের একদল রমণী ঘরের সুখ পায়ে ঠেলিয়া এই সকল পর-কেই আপনার করিয়া লইয়াছেন এবং শুশ্রূষা ও স্নেহ দ্বারা তাঁহাদিগের রোগযন্ত্রণা নিবারণ করিতেছেন। কলিকাতায় এই শ্রেণীর করুণহৃদয়া নারীদিগের একটি আশ্রম আছে। তাঁহারা রুগ্ন ও অসহায় ভারতবাসীর সেবা করিতেছেন। সৌভাগ্য বশতঃ আমি নিজে এই আশ্রমটি দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এদেশের অনেক মহিলাই এই আশ্রমের কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

চতুর্থতঃ মানুষের পাপের দুঃখ। এই দুঃখ সচরাচর মানুষের চোখে পড়ে না বটে ; কিন্তু ইঁহার জ্বালা বড় তীব্র ; অথচ এই জ্বালা জুড়াইবার উপায়ও মানুষ খুঁজিয়া পায় না। এ সংসারে কত দুর্ভাগিনী নারী পাপিষ্ঠ পুরুষের ছলনায় পড়িয়া পাপের পথকেই সুখের পথ মনে করিয়া, সেই পথেই চলিতেছিল ; এবং পাপের বিষকে স্পৃহনীয় সামগ্রী মনে করিয়া, উহা পান করিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহাদের চোখ ফুটিয়াছে, পাপ যে কি ভয়ানক তাহা বুঝিতে পারিয়াছে ; অথচ যে পথে এক-বার পা বাড়াইয়াছে, সে পথ হইতে আর ফিরিবার উপায় নাই ; যে বিষ পান করিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ বিষাক্ত করিবে, অথচ সে বিষের হাত এড়াইবার আর যো নাই। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের উপর কেবল ঘৃণাবর্ষণ করি, কিন্তু তাহাদের অন্তরের জ্বালা অনুভব করিতেও পারি না। কোন কোন ব্যক্তি সময় সময় ইহাদের দুঃখের কথা অবগত হইয়া থাকেন ; কিন্তু সে দুঃখ নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দয়া ও সাধুতার কথা অনেক দুর্ভাগিনী পতিতা রমণীও শুনিয়া থাকে। তাঁহার বাটীতে পতিতা রমণীদিগের গৃহের কোন কোন বালিকা আশ্রয় পাইয়াছে। এজন্য সময় সময় কোন কোন পতিতা নারী পাপের জ্বালায় অধীর হইয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া থাকে। এ বিষয়ে একটি ঘটনা এই :—একবার একটি থিয়েটারের অভিনেত্রী পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিল। শাস্ত্রী মহাশয় সেই অভিনেত্রীকে তাঁহার কাছে আসিতে পত্র লিখিলেন। অভিনেত্রী যথা সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার নিকট দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাহাকে কহিলেন :—

"তুমি ত নিজেই বলিতেছ, তোমার অর্থের অভাব নাই। তাহা হইলে তোমাকে কিছুদিন কোন প্রলোভন-শূন্য স্থানে বাস করিয়া কঠোরভাবে আত্মশাসন ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। কিছুদিন পরে যদি দেখা যায়, তোমার পক্ষে ভয়ের আর কোন কারণ নাই, তাহা হইলেই তুমি সমাজে সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিবে।"

মেয়েটি কহিল—"আমি কয়েক দিন চিন্তা করিয়া এ বিষয়ে যাহা হয় ঠিক করিব এবং আপনাকে লিখিয়া জানাইব।"

শাস্ত্রী মহাশয় মেয়েটিকে দুখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করিলেন। মেয়েটি কয়েকদিন পরে শাস্ত্রী মহাশয়কে লিখিল—

"আপনার প্রদত্ত বই দুখানি পড়িয়া উপকার পাইয়াছি, আমি প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু কি করিব, এখনও কিছু ঠিক করিতে পারি নাই।" ইহার পর আর মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সে কথা যা'ক। ইউরোপের ধর্ম্মশীলা রমণীগণ সকল যন্ত্রণার অপেক্ষা পাপের যন্ত্রণাকেই বড় ভয়ানক বলিয়া মনে করেন। এজন্য ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত তাঁহারা সকল ক্লেশই অম্লান বদনে সহ্য করিতেছেন। তাঁহারা নারী হইয়া কিরূপে নারীর পাপযন্ত্রণা সহ্য করিবেন? সহ্য করিতে পারেন না ; করুণায় তাঁহাদের মন আর্দ্র হইয়া যায় ; তাই ইউরোপে এবং ভারতে নারীর পাপ-যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই জানেন পশ্চিম দেশীয় ধর্ম্মশীলা রমণীগণ সমবেত হইয়া মদ্যপান নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা ছাড়া একদল স্ত্রীলোক পতিতা রমণীদিগের

পাপযন্ত্রণা নিবারণ ও তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য আশ্রম স্থাপন করিতেছেন। কলিকাতা সহরেই পশ্চিম দেশীয় মহিলাদিগের চেষ্টায় দুইটি পতিতাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে আর অধিক বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না, কেহ মনে করিবেন না যে শুধু পশ্চিম দেশীয় রমণীদিগের প্রশংসা করাই আমার রচনার উদ্দেশ্য। তাহা কখনই নহে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু নারীর কোমল হৃদয়ে করুণার কিছুমাত্র অভাব নাই, তাঁহাদের ধর্ম্মভাবও সামান্য নহে ; তবে শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাবেই তাহারা পরসেবায় আত্মসমর্পণ করিতে পারেন না।

কিন্তু পশ্চিম দেশীয় মহিলাদিগের ধর্ম্মভাব ও করুণার উল্লেখ করিয়া এ দেশের খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী সমাজের শিক্ষিতা মহিলাদিগের নিকটে বিনীত ভাবে কিছু বলিতে চাহি। ঈশ্বর কৃপায় তাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং কিছু স্বাধীনতাও প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নিকট অনেক কার্য্যের আশা করিতে পারি। বলিতে আনন্দ হয় যে, অনেক মহিলা দেশের সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহা দ্বারা কোন কোন শ্রদ্ধেয়া মহিলা আরও অনেক মহৎকার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা দেশের যে অনেক উন্নতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অল্প সংখ্যক মহিলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এ দেশের বিদুষী রমণীদিগের মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। এ দেশে দুঃখ কষ্টের ত কিছুমাত্র অভাব নাই। লক্ষ লক্ষ রমণী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া হীনভাবে দিন যাপন করিতেছেন, হিন্দুসমাজের অধিকাংশ পুরুষই তাঁহাদের শিক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, এই সকল রমণীর শিক্ষাসম্বন্ধে শিক্ষিতা রমণীদিগের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? এ দেশে কত অসহায়া রমণী দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। কত অসহায় বালক বালিকা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শিক্ষিতা রমণীগণ কি তাঁহাদের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিবেন? তৎপরে প্রত্যেক সহরে শত শত রমণী স্বামীর সঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছেন। গৃহে আর দ্বিতীয় কোনই স্ত্রীলোক নাই। তাঁহারা সময় সময় কঠিন রোগে রুগ্না হইয়া পড়েন ; তখন এক স্বামী ভিন্ন শুশ্রূষা করিবার লোক কেহই থাকে না। ছোট বালক বালিকাদিগের মুখে দুটি অন্ন তুলিয়া দিবার লোকও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সহরের শিক্ষিত রমণীগণ এই সকল অসহায়া নারীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে যে কি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, তাহা আর বলিবার নয়।

তদ্ভিন্ন শিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা রমণীদিগের ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। এ দেশের অনেক স্ত্রীলোক এমন কি ভদ্র ঘরেরও অনেক রমণী সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পাপের ব্যবসা করিতেছেন ; পশ্চিম দেশীয় রমণীগণ তাহাদিগকে পাপের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য আশ্রম খুলিয়াছেন বটে, কিন্তু এ দেশের শিক্ষিতা রমণীগণ ঐ সকল পতিতা রমণীগণের জন্য কিছুই করিতে পারেন না, করিবার সময় আসে নাই। তথাপি শিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা রমণীদিগের ধর্ম্ম প্রচারের প্রশস্ত স্থান আছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের রমণীগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিতেছেন ; তাঁহাদের অন্তরের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ঈশ্বর ভক্তি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা বাল্যকালে ঘরে ঘরে হিন্দু নারীদিগকে পূজা অর্চ্চনা ও ব্রতানুষ্ঠান করিতে ও কুলগুরুর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে হিন্দু নারীদিগকে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সহরের বাড়ী অনুসন্ধান করুন, দেখিবেন অধিকাংশ হিন্দু নারী ধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়াছেন। একদিন ধর্ম্মের জন্য যে হিন্দুনারী গৌরবান্বিতা হইয়াছিলেন, আজ যদি সেই হিন্দু নারীর অন্তর হইতে ধর্ম্মভাব লুপ্ত হয়, তবে আর আমাদের উন্নতির আশা কোথায়? তদ্ভিন্ন আমাদের ধর্ম্মহীন গৃহে বালক বালিকাগণ বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহারাও ধর্ম্মটিকে একটা কল্পনা জল্পনার ব্যাপার বলিয়া মনে

করিতেছে। বাল্যকাল হইতে বালক বালিকাগণ গৃহে যদি কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিতে না পায়, তবে তাহারা কিরূপে ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করিবে? এজন্য দেশের শিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা রমণীদিগকে প্রচার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা শিক্ষার আলোকে যে সকল উন্নত ধর্ম্মভাব লাভ করিয়াছেন, উহা অল্পশিক্ষিতা রমণীদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা দিতে পারিলেই গৃহে গৃহে আবার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইবে, বালক বালিকাদিগের অন্তরে ধীরে ধীরে ধর্ম্মভাব বিকশিত হইবে।

এ বিষয়ে আমরা ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিতা রমণীদিগের নিকট অনেক আশা করিতে পারি। কারণ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি ও দেশের লোকের বড় একটা আস্থা নাই। সেজন্য পশ্চিম দেশীয় রমণীদিগের ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মশীলা রমণীগণ যদি হিন্দু পরিবারে গমন করিয়া রমণীদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেন এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের অত্যন্ত উপকার হইবে।

এ সম্বন্ধে আমরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্নী স্বর্গীয়া অঘোর কামিনী দেবী নারী জাতির কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মশীলা নারীর জীবন-চরিত পূর্ব্বেই আমরা ভারত-মহিলায় প্রকাশ করিয়াছি। ইনি স্বামীর সঙ্গে বাঁকিপুর বাস করিতেন। বেহার অঞ্চলের নারীদিগের দুঃখ দেখিয়া এই দয়াবতী ও ভক্তিমতী নারীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। এজন্য ইনি ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন এবং স্বামী ও পুত্রকন্যা হইতে দূরে গিয়া লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করেন, সে স্থানে সেই পূর্ণ বয়সে বিদ্যাভ্যাস করিয়া বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিয়া মেয়েদের জন্য ইংরাজী স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপন করেন।

শুধু এই কার্য্য করিয়াই তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। স্বামীর সঙ্গে ধর্ম্ম সাধন করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধুর ধর্ম্মোপদেশে অনেক রমণী উপকার লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম, কি বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী কোথাও কোন বিপন্না রমণীর সংবাদ পাইলেই তিনি তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইতেন। তিনি কত অসহায়া রমণীর রোগের সময় শুশ্রূষা করিতেন শোকের সময় সান্ত্বনা দিতেন, এজন্য কোন কোন হিন্দুনারী তাঁহাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

আমাদের শিক্ষিতা নারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই ধর্ম্মশীলা নারীর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া পরসেবায় ও দেশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, যথার্থই তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষা সার্থক হইবে; তৎসঙ্গে তাঁহাদের দয়া চরিতার্থ হইবে; তাঁহারা পশ্চিম দেশীয় সেবাপরায়ণা নারীদিগের ন্যায় দেবী বলিয়া গণ্য হইবেন, দেশের লোকও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন; এবং রমণীর দয়া যে কি স্বর্গীয় বস্তু ও তদ্দ্বারা জগতের যে কি কল্যাণ সাধন হয়, তাহাও সকলে অনুভব করিতে পারিবেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

সন্ধ্যা।

জ্যোতি-স্নিগ্ধ দুটীতারা,—তারি পদতলে
শরতের অস্ত-সূর্য্য 'রচি' কুতূহলে
রক্ত-হ্রদ, স্বর্ণ বেলা, মরীচিকা-রাশি
রঞ্জিত মেঘের কোলে মূরছিল হাসি'।
মিশিছে শ্যামল তীরে বনান্ত নীলিমে,
যেন দু'টী প্রিয়-সখী মুগ্ধ আলিঙ্গনে।
শেফালি সুরভি চারু জোছনা অঞ্চল
শিহরে সাঁঝের বায়ে—মধুর-চঞ্চল।
মুদিছে কমল বন;—মুগ্ধ মধুকরে
শৃঙ্খলিয়া কমলিনী হৃদি-কারাগারে।
বিহঙ্গের গীতাঞ্জলি ভাসিছে বাতাসে,
বাজিছে মঙ্গল-শঙ্খ আরতি উচ্ছ্বাসে।
সুলক্ষণা স্মরি হরি ভূমে লুটাইছে
ভক্তি-শির, বিগলিত কেশ-রাশি মাঝে।

কিবা প্রেম-স্পর্শ দিয়া কোন প্রেম কবি,
ছন্দে গন্ধে রূপে রসে রচি সন্ধ্যা ছবি,
ফুটায়েছে চিত্রকলা প্রেম-স্বপ্ন সাজে
অমৃতের অনুভূতি মাখা বিশ্ব-মাঝে!
সে স্পর্শ রচেছে স্বপ্ন গোলাপ-তলায়
ঝরা রাঙ্গা পাঁপড়ির করুণ শোভায়!
সে স্পর্শ বিকাশি' শ্যাম-স্নিগ্ধ বৃন্ত-ভাতি
দোলায় শাখায় ফোটা কানন মালতী!
সে স্পর্শে ভরেছে ফল পক্ক-রক্তিমায়
সে পরশ ছন্দোবন্দে বিরহ সাজায়!
প্রীতি-মুগ্ধা প্রিয়া মোর সে প্রেম-পরশে
সে পরশে সুপ্ত শিশু স্বপ্নে উঠে হেসে'!
উথলে সে প্রেম-স্পর্শ নির্ঝরের গানে,
দীনের সজল-চক্ষে,—কবির মরণে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

শ্রীমতী বিমলা দাস গুপ্তা ও
তাঁহার অনূদিত
মালবিকাগ্নিমিত্র। (১)

(জনৈক অধ্যাপক-লিখিত)

সংপ্রতি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের একটি নূতন অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুবাদের রচয়িত্রী শ্রীমতী বিমলা দাস গুপ্তা। আমরা উল্লিখিত অনুবাদ পুস্তকের সমালোচনার পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্রীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ঢাকা জেলার পূর্ব্বাংশে ভাটপাড়া নামক একটি পল্লীগ্রাম অবস্থিত। সেখানে কালীনারায়ণ গুপ্ত নামক একটি রাজর্ষিকল্প জমিদার বাস করিতেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই কালীনারায়ণের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে, শেষে তিনি নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। আধ্যাত্মিক বিষয় ব্যতীত কালীনারায়ণ সাংসারিক বিষয়েও কম সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ নানাগুণে বিভূষিত এবং কেহ কেহ জগদ্বিখ্যাত। কালীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনারেবল্ মিঃ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ইংলণ্ডে এখন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর। তদ্ভিন্ন এক পুত্র সিবিলসার্জ্জন ও এক পুত্র ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহারা এখন পরলোকগত হইয়াছেন। অনারেবল্ মিঃ গুপ্তের পুত্র নবীন ব্যারিষ্টার মিঃ যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত এখন কলিকাতা স্মলকজ্‌ কোর্টের রেজিষ্ট্রারের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

উল্লিখিত ভাগ্যবান্ কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের পঞ্চম কন্যা শ্রীমতী বিমলা দাস গুপ্তা। বিমলা ১৭৯০ শকাব্দে ১২ চৈত্র তারিখে তাঁহার পিতার পল্লীভবনের শান্তিময় ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হন। শেষে তিনি অন্যান্য ভ্রাতা ভগিনীদের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন রাজধানী ঢাকা নগরীতে পিতার অভিনব নিকেতনে আনীত হন। বিমলা শৈশব হইতেই অত্যন্ত মেধাবিনী ও প্রখর বুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন। তিনি ঢাকা ফিমেল স্কুল হইতে একাদশ বর্ষ বয়সে মধ্যইংরাজী মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য তিনি যখন মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন পূর্ব্ববঙ্গের অতি অল্প বালিকাই ইংরাজী বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। বিমলা যখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন তাঁহার বয়স সপ্তদশবর্ষ মাত্র। তাহারপর তিনি কলিকাতা ডবটন্ কলেজে রীতিমত দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এফ, এ কোর্স শেষ করেন। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। ঐ সময় কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় দুর্গা-মোহন দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যারিষ্টার মিঃ সত্যরঞ্জন দাস (মিঃ এস্ আর্ দাস) বিমলার পাণিপ্রার্থী হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে বিমলার একটি কন্যা জন্মে। কন্যাটীর নাম কুমারী মায়া দাস। মায়া ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং লাটিন্ ভাষা ও সংগীত এবং চিত্রবিদ্যায় নিপুণা।

বিমলা বিগত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর সহিত য়ুরোপ

(১) প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি। মূল্য ৸৹ ক্লথবাইণ্ডিং স্বর্ণাক্ষরে মণ্ডিত।

ভ্রমণে গমন করেন। তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বিবিধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বিমলা বিবাহের পূর্ব্বে কলেজ পরিত্যাগ করেন বটে কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চা একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। নানাবিধ সুন্দর সুন্দর গ্রন্থপাঠ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিমলার স্বামি-বিয়োগ হইয়াছে। এই দারুণ বিয়োগ-ব্যথা বিস্মৃত হইবার জন্য তিনি জ্ঞান চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কি চমৎকার প্রতিভা! অদ্ভুত স্মরণশক্তি! অল্পদিনের মধ্যে বিমলা সংস্কৃতভাষা মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। সংস্কৃত শিক্ষারম্ভের দশমাস পরে তিনি ভ্রাতা ভগিনীদের সহিত তাঁহার পিতার ময়মনসিংহ জেলাস্থ কাছারি বাড়ীর সন্নিহিত সমাধি স্থান সন্দর্শন করিতে গমন করেন। ঐ সময় ঢাকানগরীতে তাঁহার পিতৃভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক, এক কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিমলার সন্নিহিত আত্মীয়। পরিদর্শক মহাশয় কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংস্কৃত প্রশ্নপত্রের উত্তরের জন্য বিমলার হস্তে প্রদান করেন। বিমলা অল্প সময়ের মধ্যে উহার সম্পূর্ণ উত্তর করেন। এই বিদুষী মহিলার জন্মভূমির প্রতি অসাধারণ অনুরাগ। ঐ বারেই তিনি পল্লীজননীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত জন্মভূমি ভাটপাড়ায় গমন করেন এবং তত্রত্য মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে পাঁচশত মুদ্রা দান করেন। অন্যান্য সৎকার্য্যেও তাঁহার সহানুভূতির অভাব লক্ষিত হয় না।

এখনও তিনি নিয়মিতরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন। যে মুগ্ধবোধের নাম শুনিলে চতুষ্পাঠীর কাকপক্ষধরদেরও প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয় মেধাবিনী বিমলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা আয়ত্ত করিতেছেন। ব্যাকরণের কৌশলপূর্ণ সূত্র এবং কোথায় ইম্ হইবে, কোথায় হইবে না, কোথায় বিকল্পে হইবে ইত্যাদি খুটি নাটি গুলিতে পাঠের সময় তিনি আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কুমারসম্ভব অভিজ্ঞান শকুন্তল' মালবিকাগ্নিমিত্র, দণ্ডীর দশকুমার চরিত এবং গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি শেষ হইয়াছে। এখন অলঙ্কার গ্রন্থ ও অবশিষ্ট মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং কতিপয় নাটক অধ্যয়ন করিয়া উপনিষদ্ ও বেদান্ত শাস্ত্রের বিশেষ ভাবে চর্চ্চা করিবেন। সামান্য সময় দুই বৎসর আড়াই বৎসরের মধ্যে বিমলা সংস্কৃত ভাষায় বেশ অধিকার লাভ করিয়াছেন। অপঠিত গ্রন্থের অনেকাংশ স্বয়ং পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন। অনুবাদেও তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা জন্মিয়াছে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ এবং সংস্কৃত গ্রন্থের সুন্দর বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে পারেন। স্বাধীন ভাবে সংস্কৃত রচনায়ও বিমলার নৈপুণ্য জন্মিয়াছে। তিনি ফরাসী দেশের একটি গল্পের মর্ম্ম এমন রীতিশুদ্ধ (idiomatic) সংস্কৃত গদ্যে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, উহা পাঠ করিলে প্রাচীন সংস্কৃত বলিয়া ভ্রম জন্মে। এই প্রতিভাশালিনী মহিলা যেরূপ বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায় কালে ইনি ভারতীয় সংস্কৃত বিদুষীগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

শুনা যায় ইঁহার অন্যান্য ভগিনীরাও বিলক্ষণ প্রতিভাশালিনী। সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুবালা দেবীর সহিত লেখকের পরিচয় আছে। ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম্. এ, এম্, বি, মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। তাঁহার ধর্ম্মভাব দেখিলে সেই বৌদ্ধযুগের রত্নমালার ধর্ম্মভাবের স্মৃতি মনোমধ্যে সমুদিত হয়। সুবালা যখন গল্প করেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তন্ময়চিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। সে গল্পে কত সমাজসংস্কারের কথা, কত উচ্চ উপদেশ নিহিত থাকে। তাঁহার সুমধুর গীতি সত্য সত্যই সুধাবর্ষিণী। এক দিবস কতিপয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতের বৃদ্ধা জননী তাঁহার মুখে ঈশ্বর বিষয়ক সুমধুর সংগীত শ্রবণ করিয়া নয়নাম্বুতে আপ্লুত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি সে স্মৃতি তাঁহার মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

এতক্ষণ আমরা শ্রীমতী বিমলা দাস গুপ্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। এইবার তাঁহার অনুদিত গ্রন্থ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সকলেই জানেন কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক একখানি ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য। ইহার আখ্যান বস্তুটি অতি সুন্দর। ঘটনাটি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে সংঘটিত হয়। কাব্যের নায়ক বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্র এবং নায়িকা বিদর্ভের রাজকুমারী ভুবনমোহিনী সুন্দরী মালবিকা। অনুবাদটি অতি সুন্দর ও যথাযথ হইয়াছে। কালিদাসের লেখা সাধারণতঃ অন্যান্য কবির তুলনায় সরল হইলেও মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি কবিতা ভাবপূর্ণ ও জটিল। অনুবাদিকা ঐ সকল কবিতার অনুবাদে বেশ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পদ্যের পদ্যানুবাদে ঠিক ভাবরক্ষা করা যায় না, তজ্জন্য এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্তই গদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। মালবিকা মহিষীর আদেশে স্বর্ণালোকের সাধ দিতে প্রমোদ-উদ্যানে গিয়াছেন। রাজা দূর হইতে চুপে চুপে দেখিয়া বিদূষককে বলিতেছেন।

(মূল) রাজা। বয়স্য !

আদায় কর্ণকিসলয় মস্মাদিয়মএ চরণমর্পয়তি।

উভয়োঃ সদৃশ বিনিময়াদাত্মানং বঞ্চিতং মন্যে॥

(অনুবাদ) রাজা। বয়স্য! ইনি এই অশোক বৃক্ষ হইতে কর্ণে ধারণ করিবার জন্য নবকিসলয় গ্রহণ করিয়া তাহারি প্রতিদানে আবার উহার পাদমূলে চরণ অর্পণ করিলেন। আমি হতভাগ্য কিন্তু এই উভয়ের প্রেম বিনিময়ে আপনাকে নিতান্তই বঞ্চিত মনে করিতেছি।

আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। ফলকথা অনুবাদে গ্রন্থের সরসতা সম্পূর্ণ বিদ্যমান। এই কাব্য হইতে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতার একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। তখন স্ত্রীজাতির কিরূপ উচ্চ শিক্ষা ছিল? রাজকুমারীরা পর্য্যন্ত পুরুষ শিক্ষক ও স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীদের নিকট কেমন সাহিত্য সংগীত নৃত্য এবং অন্যান্য কলাবিদ্যা শিক্ষা করিতেন এবং স্ত্রীজাতির স্বামীর উপর ও স্বামীর রাজ্যের উপর কিরূপ অক্ষুণ্ণ আধিপত্য ছিল ইত্যাদি বিষয় কালিদাসের লেখনীতে সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। এই অনুবাদ গ্রন্থে চারিটি আলোক চিত্র বা হাফটোন ফটো সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিত্র কয়টি বড়ই চিত্তাকর্ষক। 'বিশেষ বকুলাবলিকা যখন প্রমোদোদ্যানে তরুমূলে বসিয়া মালবিকার পায় আলতা পরাইয়া দিতেছে এবং রাজার অনুরাগের কথা বলিতেছে, সেই চিত্রটি বড়ই মনোহর হইয়াছে। পুস্তকের কাগজ উৎকৃষ্ট। কুন্তলীন প্রেসে সুন্দররূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা পুস্তকে যেরূপ সৌষ্ঠব সম্ভব, ইহাতে তাহার কোন অংশেই ত্রুটী হয় নাই।

গাইকোয়ার ও পতিত জাতি।

বরোদার গাইকোয়ার অসার উপাধিজড়িত জড় রাজা নহেন। তিনি বর্ত্তমান ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কারক। জগতের বিচিত্র সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াও তিনি জাতীয় ভাবকে পরিত্যাগ করেন নাই। আবার তথাকথিত জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া বাহিরের বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-ধারাকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষা-সংস্কার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

ভারতের নিপীড়িত জনসমাজের বেদনা এই মহাপ্রাণ নরপতির হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াছে। তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান্ রিভিউ পত্রিকায় "পতিত জাতি" সম্বন্ধে একটী প্রাণস্পর্শী প্রবন্ধ লিখিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে এই নিপীড়িত জনসমাজের মুক্তিদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

প্রবন্ধটীর সার মর্ম্ম আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্য জাতির সংখ্যা ছয় কোটী। জনসমষ্টির এক পঞ্চমাংশ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর স্বায়ত্ত শাসন ও বর্ণগত সাম্যের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। যে কারণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা রাজনৈতিক অধিকারের দাবী করি, সেই কারণেই কি আমাদের পরস্পরের সামাজিক অধিকারের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত নহে? আমাদের পদতলে যাহারা পড়িয়া আছে তাহাদের উদ্ধারের জন্য কি করতেছি, তাহা দেখিয়াই আমাদের জাতীয় অধিকার লাভ করিবার যোগ্যতা বুঝা যাইবে।

যে বিধান আমাদিগকে পারিয়া হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত অসংখ্য বর্ণে বিভক্ত করিয়াছে—যদ্দারা অতি সামান্য ভেদ অনুসারে স্তরে স্তরে এই বর্ণগুলিকে স্থাপন করা হইয়াছে তাহা একটি অবিচারের স্নায়ুতন্ত্র স্বরূপ। এই বিধান মানবকে স্বাভাবিক ব্যক্তিগত গুণ অনুসারে শ্রেণী-বদ্ধ না করিয়া জন্মগত গণ্ডীর অসংখ্য বন্ধনে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

সামাজিক প্রাধান্য লাভের জন্য বহুকাল হইতে বিভিন্ন বর্ণে যে বিবাদ ও বিদ্বেষ চলিয়া আসিয়াছে এখনও তাহার অবসান হয় নাই। তাহার ফলে আমাদের মধ্যে এই বর্ণ-বিরোধ ঐক্যেরই বাধা দিতেছে। অথচ জগতে একটি জাতিরূপে পরিগণিত হইতে হইলে এই একতাই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

এ সকল পতিত জাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই শিক্ষার একান্ত অভাব। কিন্তু তাহাও ইহাদের পতনের কারণ নহে, কেন না ভারতের কোন কোন স্থানে তথা-কথিত উচ্চ বর্ণের মধ্যেও প্রচুর অজ্ঞতা দেখা যায়।

তাহাদের সঙ্গে নিম্নজাতির তফাৎ এই যে, ইহারা সাধারণ স্কুলে অধ্যয়ন করিতে পারে না, আর উচ্চ বর্ণেরা পারেন। নিম্নজাতির সংস্পর্শে উচ্চবর্ণ অপবিত্র হইয়া পড়েন,—উক্ত বিচ্ছেদের ইহাই কারণ। এই অন্যায় ব্যবহার ধর্ম্ম ও মানবনীতি উভয়ের চক্ষেই পাপ। উচ্চ-বর্ণের সম্মুখে জীবিকা অর্জ্জনের বহু পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে। নিম্নজাতি অস্পৃশ্য বলিয়া উপার্জ্জনের অধিকাংশ দ্বারই তাহার নিকট অবরুদ্ধ। অতএব এসকল পতিত জাতির উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই অস্পৃশ্যতার ধারণাটি আমাদের মন হইতে দূর করিতে হইবে।

সাধারণ লোকে দেশাচারের নামেই মস্তক নত করে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করে না। আচারকেই তাহারা ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করা গুরু-তর পাপ, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। স্নান করিয়া, মুখ কামাইয়া অথবা ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মুদ্রা জরিমানা দিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইহার কোন যুক্তি নাই। তাহার ধর্ম্মের মধ্যে যুক্তির স্থান নাই। সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস অলৌকিক ঘটনার উপরই স্থাপিত।

শিক্ষিত লোকেরা সূক্ষ্ম দেহের অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া এই কুসংস্কারগুলিকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। তাহারা বলেন যে মানুষের রক্ত মাংসের শরীরটাই সব নয়। তার সঙ্গে আর একটা তেজোময় সূক্ষ্ম দেহ আছে। সেই সূক্ষ্ম দেহ তাহার চরিত্র, বাসনা ও নীতি দ্বারা গঠিত। দুইটী সূক্ষ্মদেহ একত্রিত হইলেই উভয়ের চরিত্র পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। একজন অন্যকে স্পর্শ করিলে সেই তেজ অপরের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার চরিত্রের উপর নিজের শক্তি প্রয়োগ করে। নিম্নশ্রেণীর কোনও লোক উচ্চবর্ণের লোকের দেহ স্পর্শ করিলে তাহার কলুষিত তেজ উচ্চবর্ণের নির্ম্মল চরিত্রের বিকার সংঘটন করিতে পারে। অতএব নিম্ন জাতিকে স্পর্শ করিতে নাই। এই যুক্তি মানিয়া লইলেও আমরা বলিতে পারি যে যাহাদের চিত্ত কলুষিত তাহা-দিগকেই স্পর্শ করা উচিত নহে। তাহা হইলে দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকেও স্পর্শ করা সেই কারণেই অন্যায়। উচ্চ ও নীচ সকল বর্ণের মধ্যেই দুশ্চরিত্র লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে উচ্চদেহের বেলা সেই যুক্তি আমরা কখনও প্রয়োগ করি না।

আর এই যুক্তির বলেই যদি আমরা নিম্ন শ্রেণীর কাহাকেও স্পর্শ না করি তাহা হইলে ইহাই বুঝা যায় যে নীচ বর্ণের ব্যক্তি মাত্রই পাপী। তাহাদের তেজোময় সূক্ষ্ম দেহ পাপের দ্বারা কলুষিত। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু তাহা সমর্থন করিতেছে না। কারণ ভারতের নিম্নতম বর্ণের মধ্যেও এমন পবিত্রাত্মা সাধু পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া-ছেন যাঁহাদের পুণ্যালোকে সমগ্র ভারত উজ্জ্বল হইয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোকেরা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। রোহিদাস মুচী ছিলেন, কবীর জোলা ছিলেন, সাধু সেন একজন সামান্য নাপিত ছিলেন *। শিক্ষিত লোকেরা নীচ জাতির বিরুদ্ধে আর একটি

* সেন রেওয়ার অধিপতি রাজা রামের রাজসভার ক্ষৌরকার ছিলেন। তাঁহার গভীর ধর্ম্মপিপাসা ছিল। তিনি রামানন্দের শিষ্য হন, এবং পরে একজন পরম সাধকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। পরে রাজা স্বয়ং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভিযোগ এই যে তাঁহারা অপরিচ্ছন্ন, কদভ্যাসে রত এবং নিষিদ্ধাহারী। ইহার অর্থ এই যে অপরিচ্ছন্ন ও অসৎ লোক মাত্রই পরিত্যাজ্য। কিন্তু আমরা যথার্থ সৎ ও অসৎ কে তাহা পরীক্ষা করি না। কারণ তাহা হইলে অনেক গর্ব্বদীপ্ত আর্য্যবংশধরকেও মুস্কিলে পড়িতে হয়, আর তা ছাড়া ভারতের এক অংশে যাহা সদাচার অন্য অংশে তাহাই অসদাচার। এক সময়ে যাহা নিষিদ্ধাহার ছিল আর এক সময়ে তাহাই সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। স্থান ও কালের বিভিন্নতা অনুসারে কদাচারও যখন সদাচার হয় এবং নিষিদ্ধ আহার পবিত্র আহার হয় তখন আচার সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী টানিয়া তাহার বলে কোনও মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করা কি যুক্তিসঙ্গত ?

বস্তুতঃ ইহার প্রধান কারণ জাতিগত বিদ্বেষ। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, যখনই একটী বিজেতা ও একটী বিজিত জাতি একত্রিত হইয়াছে তখনই তাহাদের মিলন সম্বন্ধে একটী কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

এই উভয় জাতি যদি সমান উন্নত হয় এবং তাহাদের মধ্যে যদি ধর্ম্ম অথবা অন্য কোনও প্রকারের বাধা না থাকে তবে সহজেই তাহারা একত্র মিলিয়া যায়। যখন উহাদের মধ্যে একটী শিক্ষা ও সভ্যতায় অত্যন্ত উন্নত, অন্যটী অসভ্য ও বর্ব্বর থাকে তখনই উন্নত জাতি তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর রচনা করিয়া অপরকে দূরে ঠেকাইয়া রাখে। স্পেনের অধিবাসীগণ যখন ব্রেজীল ও মেক্সিকোর সংস্পর্শে আসিল তখন তাহারা তদ্দেশবাসী শিক্ষিত ও সভ্য ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। তাহার কিছু উত্তরেই সভ্যতর ইংরেজ ও ফরাসীগণ তেমন করিয়া মিশিতে পারে নাই। আমেরিকানগণ ইচ্ছা করিয়াই নিগ্রোদের সঙ্গে মিশিতেছে না। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম এ মিলনে কোনও বাধা দিতেছে না। কখনও কখনও আমরা দেখিতে পাই যে কোন কোন জাতি অর্থনীতির হিসাবে এই মিলনকে দূরে রাখে। অষ্ট্রেলিয়া সেই নীতি অবলম্বন করিতেছে। এইরূপে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে কেবল জাতিগত বিদ্বেষ ও অর্থনৈতিক ঈর্ষাই উন্নত ও অবনত জাতির মিলনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। সভ্য জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে এমন কোন দেশ নাই যেখানে ধর্ম্মের শক্তি মানুষকে মানুষের বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার উপায় স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আচার হিন্দুর একটি বিশেষ অবলম্বন। আচারবান হইলেই যেন ঈশ্বর সন্নিধানে যাওয়া যায়—ইহাই তাহার বিশ্বাস। আচারহীনের স্পর্শে পবিত্রতা কলুষিত হয়। স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আচারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। বুদ্ধদেবের প্রখর সংস্কার-প্রতিভাও যাহার মূল উচ্ছেদ করিতে পারে নাই এগুলি সেই অর্থহীন অনুষ্ঠান বাহুল্যের অবশেষ মাত্র। একটি বিড়ালের অপবিত্র করিবার শক্তি অল্প, কুকুরের শক্তি আরও বেশী। কিন্তু আচার তদপেক্ষাও কলুষিত হয় "পারিয়ার" স্পর্শে। মানুষকেও পশু অপেক্ষা হীন করিয়া দেখা এই আচারের ধর্ম্ম।

তাহার পর জনসাধারণের উন্নতিকল্পে চারিদিকের কর্ম্মক্ষেত্রে কি উপায়ে অগ্রসর হইতে হইবে তাহার আলোচনা করিয়া গাইকোয়ার বলেন সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের উন্নত ও শিক্ষিত করিতে হইবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাহাদের সম্মুখে নূতন নূতন ব্যবসায়ের পথ খুলিয়া দিতে হইবে।

প্রাচীনকালে জন্মগত জাতিভেদ ছিল না। কর্ম্ম ও গুণগত জাতিভেদ অনেকটা বর্ত্তমান যুগের Trades Union এর মত ছিল। বর্ত্তমানে সেই চতুর্ব্বর্ণের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদে এই সকল বর্ণের কোন নামই নাই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রামদাস, তুকারাম, তুলসীদাস, কবীর, নানক, চৈতন্য এবং অন্যান্য যে সকল কবি ও ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বত্রই সেই পরমাত্মার সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া সাম্যের সঙ্গীত গান করিয়াছেন। আমাদের দৈনিক জীবনে তাঁহাদের সেই সকল উপদেশকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা উচিত। মানব মাত্রেরই নিকটে আত্মোন্নতির বাণী শুনাইতে হইবে। "ব্যক্তিত্ব কিছুই নহে কুলই সব", বর্ত্তমান জাতিভেদের এই অদ্ভুত নীতির সমর্থন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ভারতের এক ষষ্ঠাংশ লোক সমাজের শিক্ষা ও সান্ত্বনা এবং সভ্যতার উপকারিতা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের মত দেশে গবর্ণমেণ্টের হাতে যে অপরিমিত নৈতিক ও পার্থিব সম্পদ রহিয়াছে তাহাতে আইনের চক্ষে সাম্য রক্ষা করিয়া চলিলেই যথেষ্ট হইবে না। সহানুভূতির সহিত বরাবর দেখিতে হইবে যাহাতে প্রজা সাধারণের উন্নতির প্রশস্ত উপায় বিধান করা হয়।

তাহার পর মহারাজা ভারতের জনসাধারণকে নিম্নলিখিতরূপে আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন:—এই সকল দুরবস্থার অপনোদনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যতই চেষ্টা করুন না কেন সমাজের মঙ্গল অভিপ্রায়ের উপরেই ইহার প্রকৃত সংস্কার নির্ভর করে। আমাদের ধর্ম্মের আদর্শকে এইরূপ করিতে হইবে যে ব্যক্তিগত ভাবেই হউক অথবা সমষ্টিগত ভাবেই হউক ধর্ম্ম যেন কোনরূপেই আমাদের উন্নতির গতিকে প্রতিহত করিতে না পারে। ধর্ম্মের এই কঠোর ব্যবহারে পীড়িত হইয়া পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ লোক খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানেও সহস্র লোক সেই পথ অবলম্বন করিতেছে। প্রতি বৎসর জন সংখ্যা যে এইরূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে ইহা কি হিন্দুজাতির পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ নহে?

নিম্নজাতির উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভর করে তাহাদের আত্মশক্তির উপরে। তাহারা সকল বিষয়েই আত্মোন্নতি করিতে চেষ্টা করিবে। সমাজের প্রতি তাহাদের যে সকল কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা ক্ষুদ্র হইলেও সামাজিক শান্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সেই সকল কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া সমাজের নিকট ন্যায্য অধিকারের দাবী করিতে হইবে।

জাতিরূপে গণ্য হইতে হইলে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পুরোহিত-শ্রেণীর দাসত্বে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের কোনও জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

পৌরোহিত্যের প্রভাবে স্পেন বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্ব গৌরব-শিখর হইতে অবনত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি-রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহার সেই জগৎব্যাপী শক্তি এখন ইংলণ্ডের করতল গত হইয়াছে। পৌরোহিত্যের বন্ধন ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে।

লোকে রাজাদের এবং গবর্ণমেণ্টের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থার প্রার্থনা করিতেছে। ব্যক্তিত্ব আত্মসম্মান ও সর্ব্ববিধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া, যে সকল নিষ্ঠুর ধর্ম্মবিধান জনসাধারণের মনুষ্যত্বকে নিপীড়িত করিতেছে, তাহার সংশোধনে তাহাদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। এক সময় যখন জ্ঞান সমাজের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তখন সাধারণে পুরোহিত শ্রেণীর কর্ত্তৃত্বে সন্তুষ্ট থাকিত। সে সময় অতীত হইয়াছে।

জ্ঞানবিমুখ, অজ্ঞতায় পরিতুষ্ট, যে পুরোহিত সম্প্রদায় অত্যুক্তি দ্বারা নিজের অভ্রান্ততা ঘোষণা করিয়া দেবতা-রূপে পূজনীয় হইতে চাহে—বর্ত্তমান জগতে তাহাদের স্থান নাই। এই পুরোহিত সম্প্রদায় উন্নতির গতিকে প্রতিহত করিতেছে। তাহারা জনসাধারণের উপকার না করিয়া অপদেবতাস্বরূপ অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিশেষরূপে আমাদের চক্ষু উন্মীলন করা উচিত। জগতের অন্য অন্য জাতি যখন তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে শক্তির উৎস বলিয়া মনে করিতেছে তখন আমরা ইচ্ছা করিয়া এক ষষ্ঠাংশ লোককে জাতীয় সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিতেছি। আমরা পীতভীতির কথা শুনিয়াছি। চীন তাহার অপরিমেয় জনসংখ্যার বলে ইয়ুরোপের সম্ভ্রম আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জারমেনী স্বয়ং তাহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য শক্তি ও সম্পদের শিখরে আরোহণ করিতেছে। অপরদিকে জনসংখ্যার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের শক্তি হ্রাস পাইতে চলিয়াছে। ফরাসী নেতাগণ পারিবারিক ধর্ম্মের ঔদাসীন্য জনিত জাতীয় আত্মহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন। এখানে এই ভারতবর্ষে আমরা আরও গুরুতর জাতীয় আত্মহত্যা সাধন

করিতেছি। জগতের সভ্যজাতি সমূহের সম্মুখে আমাদের স্বদেশকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা কিরূপ চেষ্টা করিতেছি—আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট জগত ভবিষ্যতে এই হিসাব তাগিদ করিবে।

সময় আসিয়াছে যখন আমাদিগকে ঐ সকল লক্ষ লক্ষ অস্পৃশ্য জাতির হাত ধরিয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা সমবেত জাতিরূপে ন্যায্য অধিকার শ্রদ্ধা ও শক্তি দাবী করিবার উপযুক্ত হইতে পারিব।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

বয়।

১

জমীর আফিসে 'বয়ের' কর্ম্ম করিত। বাবু ও সাহেবের দেখা দেখি সে ঘোড় দৌড়ে বাজী ধরিত। জুয়ার নেশা ভূতের মত তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। প্রতি শনিবার বাজী না ধরিলে তাহার অন্ন পরিপাক হইত না। জুয়া খেলায় অর্থ নষ্ট করিয়া বাড়ীতে গালি গালাজ ও প্রহার লাভ তাহার পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে সমস্ত শাসন নীরবে সহ্য করিত। বাড়ীতে চিররুগ্না বিধবা মাতা জমীরকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

সে দিন সোমবার। সকালে পথে ফকিরের সহিত জমীরের সাক্ষাৎ হইল। ফকির জমীরকে জুয়া খেলায় মাতাইয়া তুলিল।

সাহেব আসিবার পূর্ব্বে জমীরকে আফিসে পৌঁছাইতে হইবে কাজেই খেলাটা তেমন জমিতে পারিল না। কিন্তু ফকিরও ছাড়িবার পাত্র নহে। সে জমীরকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইল যে টিফিনের সময় মনুমেণ্টের ধারে দেখা করিয়া আরো কয় বাজী খেলিয়া যাইবে।

জমীর তাড়াতাড়ি চারটী খাইয়া ছুটিতে ছুটিতে আফিসে আসিয়া দেখে সাহেব আসিয়াছে! বাবুদের নিকট শুনিল সাহেব তাহাকে অনেকবার ডাকিয়া পায় নাই।

জমীর আসিয়াছে শুনিয়া সাহেব ডাকিল "বয়!" সে স্বরে রোষের তীব্রতা মাখানো ছিল! ভয়ে জমীরের মুখ শুকাইয়া গেল। "হুজুর" বলিয়া ধীরে ধীরে সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিয়া এক দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া নতমস্তকে এক পাশে সে দাঁড়াইল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল "এত দেরী কেন? ক'টা বাজিয়াছে জান? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

জমীর কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। তাহার ঠোঁট কাঁপিতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল; "অসুখ করিয়াছে।" জমীরের মুখ লাল হইয়া উঠিল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। বহু চেষ্টাতেও সে চোখের জল চাপিতে পারিল না। একটা বড় ফোঁটা তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া পড়িল।

সাহেব খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, "আচ্ছা! তোমার জায়গায় গিয়ে বস, খানিক বসিলেই সুস্থ হইবে।"

সংবাদ পত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদাদি পাঠ শেষ করিয়া সাহেব 'সেয়ারের' বাজার দর দেখিতে আরম্ভ করিল। দেখিল নলদানী কোল (coal) সেয়ারের দর অন্যদিন অপেক্ষা বাড়িয়াছে। শোলপুর টোবাকো কোম্পানী এই অল্পদিনের ভিতর সেয়ার পিছু ছয় টাকা ডিভিডেণ্ড দিয়াছে; সেয়ারের দর এখনও একশত পাঁচ টাকা আছে।

শোলপুর টোবাকো কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট তাহাকে গোপনে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার প্রতি প্রত্যয় জন্মিল। সাহেব হিসাব করিয়া দেখিল যে শোলপুর টোবাকোর একশত সেয়ার বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা নলদানী কোলে লাগাইলে মাসখানেকের মধ্যে অনেক টাকা লাভ হয়। কিন্তু আবার যদি উল্টা ফল হয়—? কাগজ ফেলিয়া দিয়া পাওয়েল সাহেব তখন ভাবিতে বসিল।

২

পাওয়েলের আত্মীয় লড্ আসিয়া আসর জমাইয়া তুলিল। লড্ সাহেব একজন দালাল; সেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ই তাহার কাজ। লড্‌কে দেখিয়া পাওয়েল যেন

একটা অবলম্বন পাইল। সস্মিতমুখে কহিল "ভালো লণ্ড, আজকাল বাজার কেমন ?" লণ্ড কহিল "দেখ, আমার ধ্রুব বিশ্বাস অদৃষ্ট ফিরাইবার এই সুযোগ। গোলপুর টোবাকো কোম্পানী একটা নূতন কোল কোম্পানী খুলিয়াছে। এখনও সেয়ারের দর কম আছে, পরে দেখিবে আরও বাড়িবে।"

পাওয়েল চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া কহিল "কি রকম !" লণ্ড পাওয়েলের কানের কাছে মুখ লইয়া ধীরস্বরে কহিল "কে, পি, আমাকে কথা দিয়াছে আগামী সপ্তাহে সেয়ারের দর দেড়শত টাকা অবধি উঠিবে।"

পাওয়েল মাথা নাড়িয়া কহিল "কোন প্রয়োজন নাই, লণ্ড, এখন আমার হাতে তেমন টাকাও নাই। আর যদিও বা থাকিত, একেবারে অনিশ্চিতের মধ্যে যাওয়া আমার পছন্দ নয়। সাহসে কুলায় না।"

লণ্ড কহিল "অদৃষ্ট ফেরাবার এ সুযোগ ছাড়িও না। তুমি ত জান আমি উড়ো কথায় কাজ করি না। আরও দেখ সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করে খোঁজ না নিয়েই কি আমি একশ খানা সেয়ার কিনেছি। কিন্তু এটা মনে রেখো এ সুযোগ হারালে শেষে পস্তাবে।"

"আচ্ছা যা হয় তোমাকে জানাব। এস আপাততঃ এখানেই ঘণ্টা খানেক বস, আমি একটু ভেবে দেখি।" "না, এখন আর বসতে পাচ্ছি না, একটু কাজ আছে বরং বারটার সময় আমি আবার আসব" বলিয়া বিদায় লইল।

কিয়ৎকাল বাহিরের দিকে চাহিয়া পাওয়েল ডাকিল "বয়!" জমীর আসিলে পাওয়েল কহিল "এখন কেমন আছ?" জমীর সসঙ্কোচে বলিল "ভাল আছি।"

"তবে যাও, শীঘ্র ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে খবরের কাগজ কিনে আন। আর দেখ আজকের Opening price তাতে থাকে। বুঝেছ Opening price—মনে থাকবে? বাবুদের কাছে লিখে নাও।"

আদেশ পাইয়া জমীর তখনি ছুটিল। পনর মিনিটের মধ্যে সে কাগজ লইয়া ফিরিল।

পাওয়েল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বাজার দর কোথায়ও দেখিতে পাইল না। গর্জিয়া উঠিল "বয়, তোমাকে কি বলি নাই Opening price—খোলা দর—যাহাতে আছে এমন কাগজ আনিবে, লিখিয়া লইয়াছিলে ?"

জমীর সভয়ে কহিল "হাঁ হুজুর।"

"কোথায়? কোথায়? চাহিয়া দেখ।"

প্রথম পৃষ্ঠার ভাঁজ খুলিয়া "এই যে হুজুর" বলিয়া To day's entries and probable odds লিখিত স্থানটী দেখাইয়া দিয়া জমীর কহিল "বাবুরা বলিয়া দিয়াছে।"

রাগে পাওয়েলের অস্থিমজ্জা জলিয়া উঠিল। আমি কি রেস্ race এর জন্ম চাহিয়াছি যে এ কাগজ আনিয়াছ? যাও এখনি ফিরাইয়া আজকার market opening price —বাজার খোলা দর যাহাতে আছে এমন কাগজ লইয়া এস। বাবুদের কাছে ভাল করে জেনে যাও।"

জমীর চলিয়া যাইবার পর পাওয়েল সংবাদ পাইল যে এক ঘণ্টার মধ্যে দশ দফা নব্বই টাকা হারে সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। সাহেব অধীরভাবে কক্ষমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। শেষে বিরক্ত হইয়া নিজেই ম্যাথুস কোম্পানীর আফিসে চলিল।

কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া সে দেখিল দর পচানব্বইয়ে উঠিয়াছে। পাওয়েল স্থির করিল যতগুলি পাওয়া যায় ততগুলি সেয়ার কিনিয়া ফেলিবে।

আফিসে আসিয়া পাওয়েল পাঁচশত সেয়ার কিনিবে বলিয়া মনস্থ করিল। এখন চটপট কিনিয়া ফেলতে হইবে কারণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বেলা আড়াইটার সময় বিক্রয় বন্ধ হইবে। ঘড়িতে বারটা বাজিল। লণ্ড আসিলে পাওয়েল কহিল "দেখ তোমার জন্য কিনিতে পারিলাম না।"

দু একটী পরামর্শ করিয়া দুজনেই বাহির হইয়া গেল। ফিরিতে একটা বাজিল। টিফিন সারিয়া পাওয়েল দেখিল একটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট। বিলম্ব না করিয়া তখনি একখানি চেক কাটিয়া দিল। লণ্ড ম্যাথুস কোম্পানীকে পাঁচশত সেয়ার পাওয়েলের নামে কিনিতে লিখিল।

জমীর আশা করিয়াছিল শীঘ্র ছুটী মিলিবে। দেড়টা বাজিতে চলিল তবুও সাহেব কিছু বলিতেছে না। যদি

শিবি রাজার পরীক্ষা।

ভারত-মহিলা প্রেস. ঢাকা।

একেবারে ছুটী হয় ত ভাল হয়। টিফিনের ত একঘণ্টা ছুটী—এক ঘণ্টায় কি পোষাইবে? ফকির নিশ্চয়ই মনু-মেণ্টের ধারে অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময় জমীরের ডাক পড়িল। সাহ্লাদে জমীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

সাহেব কহিল, "চট্‌ করিয়া এই চিঠিখানি ম্যাথুস কোম্পানীর বাড়ী লইয়া যাও। মনে থাকে যেন একটুও দেরি না হয় –জরুরি কাজ। সাবধান যেন না হারায়।"

জমীর বাঁচিল!

পত্র লইয়া সে বিদ্যুৎবেগে ছুটিল।

লণ্ড চলিয়া গেলে পাওয়েল ভাবিতেছিল, অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় অর্থ ও মনের শান্তি দুইই যায়। আবার কখনো অদৃষ্টগুণে লাভও হয়।

টেবিলের উপর হুইস্কির বোতল ছিল। এক পেগ, দুই পেগ করিয়া কয়েক পেগ নিঃশেষ হইলে পাওয়েলের চিত্তে কেমন একটা আবেগ আসিল। নানা সুরে আশার বিচিত্র রাগিনী ধ্বনিত হইয়া উঠিল। চারিধার কেমন রঙীন্ হইয়া আসিতেছিল। পাওয়েল পার্শ্বস্থ সোফায় শয়ন করিল। ধীরে ধীরে নিদ্রা আসিয়া, তাহার চক্ষু দুটিতে বিস্মৃতির আবরণ টানিয়া দিল।

জমীর দ্রুত চলিল। দেড়টার সময় সে মনুমেণ্টের নিকট পৌঁছিল। ফকির অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছে।

খেলা চলিল। খেলায় জমীর কেবলি হারিতেছিল। শেষে তাহার চারি আনা মাত্র সম্বল রহিল। তাহা হইতে ক্রমে দুই টাকা জিতিল, তবু সে খেলার বিরাম নাই! কখনো আশা কখনো নিরাশা! শেষে বেচারা তাহার শেষ পয়সাটি অবধি হারিয়া বসিল! রিক্তপকেট —অবসন্ন মন—ক্ষুধায় কাতর—তাহার শুধু মনে হইতে-ছিল, কি লইয়া সে আজ গৃহে ফিরিবে। রুগ্না মাতার পথ্য কিনিবে সে কি দিয়া! ঐ টাকাটি ভাঙাইয়া মাতার পথ্য, নিজের আহার লইয়া সে ফিরিবে, মাতা যে তাহাই আশা করিয়া বসিয়া আছে! রিক্তহস্তে সে আজ সন্ধ্যায় যখন গৃহে ফিরিবে তখন তিরস্কার ও প্রহারে তাহাকে কি ভাবে জর্জ্জরিত হইতে হইবে' তাহারি ভীষণ চিন্তা বালককে উন্মাদ করিয়া তুলিল।

হঠাৎ অদূরে ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ট্রাম ভরিয়া তখন যতলোক গৃহাভিমুখে চলিয়াছে—সাহেব মেমেরা মাঠে বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছে। জমীরের প্রাণ চমকিয়া উঠিল! আফিসে যাইয়া কত লাঞ্ছনা সহিতে হইবে! চিঠি চেক সমস্ত সে ভুলিয়া বসিয়াছিল, মনেও পড়িল না। তাড়াতাড়ি সে আফিসের দিকে ছুটিতেছিল।

লণ্ড আসিয়া দেখিল, পাওয়েল পাশ কামরায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পাওয়েলকে ঠেলিয়া ডাকিল, "পাওয়েল ঘুমুচ্ছ যে ওঠ"—পাওয়েলের নিদ্রা ভাঙিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'খবর কি?"

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তোমার সেয়ারগুলি দাও, আমার খরিদ্দার আছে"—

"কেন?"

"এইমাত্র কে, পির টেলিগ্রাম পাইয়াছি; একটা খনি একেবারে ধসিয়া গিয়াছে, আর এক খনিতে কেবল মাটি আর কাঁকর উঠিয়াছে। ম্যাথুসের আফিস বন্ধ, কাল দর একেবারে নামিয়া যাইবে। আমার সেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়াছি, তোমার গুলি এইবার দাও, খরিদ্দার ঠিক করিয়াছি। এখনও বোধ হয় বিক্রয় করিতে পারিব।"

পাওয়েলের মুখ সাদা হইয়া গেল! সে কহিল, "সে কি?" তাহার মনে হইল এ যেন স্বপ্ন! ভালো করিয়া চোখ মেলিতে বোধ হইল পৃথিবীটার যেন আর কোন অস্তিত্বই নাই! কেবল চোখের সম্মুখে কতকগুলা নীল গোলা ঘুরিতেছে। প্রকৃতিস্থ হইয়া সে কহিল, "সে কি? কখন? কখন?—কাগজ কলম—এই য়ো বয়, বয়—" কোনও উত্তর নাই!

পাওয়েল লাফাইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল বাবুরা সব চলিয়া গিয়াছে—রোষে জ্বলিয়া উঠিয়া ডাকিল, "দর-ওয়ান, দরওয়ান", জমীর তখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়িতে উঠিতেছিল, পাওয়েল তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

জমীর কহিল, 'হুজুর খাইতে গিয়াছিলাম।"

"পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে জান?"

জমীরের মুখে কথা ফুটিল না।

"চিঠি দিয়াছ?"

জমীরের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তাহার হৃৎপিণ্ডের গতি থামিয়া গেল! ঠিক যেন কে তাহাকে গুলি করিয়াছে! ঢোঁক গিলিয়া সে কহিল "আ---আ---মার কিছুই মনে ছিল না।" ভিতরের পকেটে হাত দিয়া সে চিঠি বাহির করিল।

'দাও আমাকে, দাও আমাকে" বলিয়া পাওয়েল উন্মাদের মত জমীরের হাত হইতে কাড়িয়া লইল। চিঠিখানা না খুলিয়া পাওয়েল একবারে খাম, চেক ও চিঠি এক সঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

লণ্ড্ বাহিরে আসিয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল। পাওয়েল ফিরিয়া লণ্ডের করমর্দ্দন করিয়া কহিল,"এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি, আর পস্তাইতে হইবে না।" পরে ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে আবার ডাক পড়িল "বয়!"

জমীর নিকটে আসিলে পাওয়েল রোষতীব্র স্বরে কহিল, "দেরী হইল কেন?"

জমীর মাথা তুলিতে পারিল না, ধীরে ধীরে কহিল "কড়ি খেলিতে ছিলাম।"

"এঁ্যা! জুয়াখেলা, জুয়া? হারিয়াছ? নিশ্চয়ই, হারিয়াছ তুমি, তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি"! জমীর কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, "হুজুর, ওবেলা হেরেছিলাম, এ বেলা যদি তা ফিরে পাই ভেবে খেল্‌তে গেছলাম, কিন্তু সব হারিয়াছি, মার ওষুধ পথ্যের জন্য কড়িটি পর্য্যন্ত নাই।" তার স্বর কাঁপিতেছিল! সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আচ্ছা" বলিয়া পকেট হইতে একখানি [illegible] টাকার নোট বাহির করিয়া পাওয়েল কহিল, "এই নাও, এই দশ টাকা তোমায় দিতেছি। মাহিয়ানা নয়, তোমার মার ওষুধের জন্য। আর কখনও জুয়া খেলিও না, চাকুরি হারাইবে মনে থাকে যেন। যাও, এখন তোমার ছুটী।"

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

পৌরাণিকী কথা।

অতি পুরাকালে শিবি নামধারী যদুবংশীয় এক নরপতি ছিলেন। শিবি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং সর্ব্বদা নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার অসাধারণ দৃঢ়তা ও একাগ্রতা ছিল। তিনি নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা যাহা একবার ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া লইতেন প্রাণান্তেও তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না; তিনি ধন মান সুখ ঐশ্বর্য্য, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইতেন, তথাপি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে কিছুতেই ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার দৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রাণতা সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে।

একদা মহারাজ শিবি যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন এমন সময়ে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও হৃদয়বল পরীক্ষার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেনরূপ ও হুতাশন কপোতরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। কপোতরূপধারী ছদ্মবেশী অগ্নি শ্যেনরূপধারী ছদ্মবেশী ইন্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া রাজা শিবির উরুতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন শ্যেন রাজার নিকট গিয়া কহিলেন, 'রাজন, সমুদয় ভূপতিবৃন্দ আপনাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া জানেন। অতএব আপনি কিরূপে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। কপোত চিরদিনই শ্যেন পক্ষীর খাদ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন না। এরূপ করিলে আপনাকে ক্ষুধার্ত্তের অন্ননাশরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হইবে।"

রাজা বলিলেন, পক্ষীরাজ, এই কপোত তোমা হইতে ভয় পাইয়া প্রাণরক্ষার আশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। আমি ইহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? শরণাগতকে পরিত্যাগ করা যে কি পাপ তাহা কি তুমি জান না? আমি প্রাণভয়ে ভীত শরণাপন্ন এই কপোতকে তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ছাড়িয়া দিতে পারি না।" তদুত্তরে শ্যেন মহারাজকে বলিল, "জীব মাত্রেরই আহার হইতে উৎপত্তি, আবার আহার দ্বারাই তাহার পরিপুষ্টি ও

জীবন রক্ষা হয়। জীবসমূহ আর সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আহার পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগকে জীবনও ত্যাগ করিতে হয়। অতএব আহার অভাবে আমারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং আমার মৃত্যু হইলে আমার আত্মীয় স্বজনেরও বিনাশ নিশ্চিত; সুতরাং এক জনের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া বহুলোকের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হওয়া আপনার কিছুতেই ধর্ম্মসঙ্গত হইবে না। যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোন বাধা নাই আপনার সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হওয়া উচিত।"

শ্যেনের কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, "হে বিহগবর, তুমি কি প্রকারে শরণাগতকে পরিত্যাগ করা ধর্ম্মানুগত কর্ম্ম বলিয়া কহিতেছ? তোমার আহারের প্রয়োজন, ক্ষুধানিবৃত্ত করিতে পারিলেই তোমার হয়। এই কপোত ছাড়া আর যে বস্তু তোমার খাইতে অভিলাষ হয় তুমি বল, আমি তোমার জন্য তাহারই সংস্থান করিতেছি। হরিণ, মহিষ প্রভৃতি যে কোন পশু তুমি খাইতে চাও বল আমি অনতিবিলম্বে তাহা তোমার নিকট উপস্থিত করিতেছি।" শ্যেন বলিল "হে নরশ্রেষ্ঠ, হরিণ মহিষ প্রভৃতি পশু আমি ভক্ষণ করি না, সুতরাং অন্য কোন প্রাণীতে আমার প্রয়োজন নাই। বিধাতা আমার জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, আমি উহাই চাহি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাই আমাকে প্রদান করুন। কপোতেরা শ্যেনপক্ষীর ভক্ষ্য ইহা কে না জানে?" রাজা কহিলেন, "হে বিহঙ্গ, তোমাকে প্রার্থনানুযায়ী সকলই দিতে পারি কিন্তু শরণাগত ভীত কপোতকে আমি কোন মতেই ছাড়িতে পারি না। যেরূপ কর্ম্ম করিলে তোমার সন্তোষ বিধান হইতে পারে এবং পক্ষীর আশা পরিত্যাগ করিতে পার তাহা আমাকে বল, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই পক্ষীটি পাইবার প্রার্থনা করিও না।"

শ্যেন কহিল, "নরাধিপ, যদি এই কপোতকে আপনি একান্তই না ছাড়িতে চাহেন তবে আমার সন্তোষার্থ নিজ শরীর হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া তুলাধারা কপোতের সহিত সম পরিমাণে ওজন করুন। ঐ মাংস যখন ওজনে কপোতের মাংসের তুল্য হইবে তখন উহা আমাকে দিবেন, তাহা হইলে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিব।"

রাজা তিলমাত্র ব্যথিত না হইয়া অম্লানবদনে পক্ষীরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "হে শ্যেন, তুমি যে আমার নিকট এরূপ প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা বিশেষ অনুগ্রহ বিবেচনা করিতেছি। আমি এখনই সন্তুষ্টচিত্তে তুলাতে পরিমাণ করিয়া কপোতের পরিমাণানুযায়ী মাংস আমার দেহ হইতে কাটিয়া তোমাকে দিব।" ধার্ম্মিক রাজা শিবি অতঃপর নিজ শরীর হইতে মাংস কাটিয়া তুলাদণ্ডের এক দিকে স্থাপন করতঃ অন্য দিকে কপোতকে রাখিয়া মাপিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মাংস কাটিয়া তুলাতে দেন কিন্তু কপোতের ভারই অধিক থাকে। মাংস কাটিতে কাটিতে রাজার শরীরের মাংস প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, কিন্তু উহা ওজনে কপোতের সমতুল্য হইল না। তখন রাজা স্বয়ং তুলাতে আরোহণ করিলেন। ছদ্মবেশী দেবরাজ ইন্দ্র রাজার এইরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও হৃদয়বল দেখিয়া আর নিজকে গোপন রাখিতে পারিলেন না। তিনি রাজাকে বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রাণ, আমি ইন্দ্র, আর এই কপোত হুতাশন। আমরা আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আজ শরণাগতের রক্ষা হেতু নিজ শরীর হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া যে উজ্জ্বল কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন তাহা পৃথিবীতে চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।" এই বলিয়া দেবরাজ ও হুতাশন দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত।

স্বর্গীয়া লীলাবতী সিংহ।

ইংরাজ কবি টেনিসন্ বলিয়াছেন "পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর সমানও নহে, অসমানও নহে—ইহারা পরস্পরের জীবনের অসম্পূর্ণতার পরিপূরণ করিয়া থাকে"।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন—স্ত্রীর সহিত ধর্ম্ম অর্থাৎ মানবজীবনের কর্ত্তব্য আচরণ করিবে। সুতরাং সমাজ, দেশ ও ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য—মানবজীবনের

এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে হইলে, পুরুষের স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয়ের বিকাশ যেমন অত্যন্ত আবশ্যক তেমনই স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের বিকাশ ও পরিস্ফুরণও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নারী যাহাতে যথার্থ সঙ্গিনীরূপে জীবন-পথে পুরুষের হাত ধরিয়া চলিতে পারে, তজ্জন্য স্ত্রীজাতির উপযুক্ত শিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে ভারতনারীর সাধারণ অবস্থা অতি শোচনীয়। অবশ্য, কতিপয় মহাত্মার উদ্যোগে ভারতের স্থানে স্থানে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং অল্পসংখ্যক মহিলা কৃতবিদ্যও হইয়াছেন; কিন্তু তাহা সমুদ্রের তুলনায় শিশির বিন্দুবৎ। এইরূপ অবস্থায়, কৃতকার্য্যতার উচ্চতম-শিখরারূঢ়া, বর্ত্তমান কালের বিদুষীকুলাগ্রগণ্য পরলোকগতা লীলাবতী সিংহের জীবন-চরিত, স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকগণ এবং বিদ্যোৎসাহিনী ভারতমহিলাকুলের আশা ও উৎসাহ বিশেষরূপে বর্দ্ধন করিবে। সেইজন্য উক্ত মহীয়সী রমণীর চরিত্র কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমতী লীলাবতী, ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গোরক্ষপুর জেলায় এক দেশীয় (নেটিভ)খৃষ্টীয়ান্ দম্পতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতিশয় বলবান, স্বাধীনচেতা ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। পিতার নিকট হইতে লীলাবতী দৈহিক স্বাভাবিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাধীনতা ও সত্যপ্রিয়তা এই দুইটী গুণ লাভ করিয়াছিলেন। এই তিনটী পৈত্রিক উত্তরাধিকার, খৃষ্টধর্ম্মনীতির সহায়তায়, তাঁহার জীবনকে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় সুন্দর করিয়াছিল। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে জানা যায় যে তাঁহার চরিত্রে গোরক্ষ ও রাজপুত জাতির শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সহিত খৃষ্টান জীবনের সদ্‌গুণরাশির চমৎকার সমাবেশ হইয়াছিল। গোরক্ষজাতি-সুলভ কষ্টসহিষ্ণুতা, রাজপুতজাতির ন্যায় নির্ভীকতা, স্বাবলম্বন, অধ্যবসায় ও দেশপ্রেম এবং আদর্শ খৃষ্টানের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মোৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছা তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় এবং পরবর্ত্তী জীবনে আলোকস্তম্ভের ন্যায় সর্ব্বদাই তাহার দৃষ্টির সম্মুখে বিদ্যমান ছিল। এই মহৎগুণ সমূহের প্রভাবেই লীলাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্র নির্ম্মল যশোরাশি লাভ করিয়া গিয়াছেন। অবলা নারী জীবনে কতদূর উন্নতি সাধন এবং কর্ম্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারে শ্রীমতী লীলাবতীর জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল।

সাতবৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। তিনি মাতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই অল্প বয়সে মাতৃহীনা হইলেও মাতার স্মৃতি আজীবন তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ ও কাব্যানুরাগ তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন। মাতৃহীনা বালিকাকে পিতা মিস্ থোবর্ণের বোর্ডিংস্কুলে পাঠাইলেন।

লীলার মাতা রুগ্ন হইবার পর হইতে লীলাকে অতিশয় প্রশ্রয় দিতেন; তখন লীলার ইচ্ছা কোন বাধা পাইত না, এজন্য লীলাবতী বড় আহ্লাদে মেয়ে হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং লক্ষ্ণৌ আসিয়া তিনি প্রথমে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং যা খুসী তাই করার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সময় সময় নিষিদ্ধ কার্য্যাদি করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার উপর মিস্ থোবর্ণের প্রভাব বিস্তৃত হইল; লীলা এই পরম হিতৈষিণী মহীয়সী মহিলাকে দ্বিতীয় মাতারূপে প্রাপ্ত হইলেন। মিস্ থোবর্ণের চরিত্রের মঙ্গলময় প্রভাবে লীলার এক নূতন জীবনের দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহার নিকট বোর্ডিংজীবন অতি মধুর বোধ হইতে লাগিল; বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। থোবর্ণের মুখে আমেরিকার বালিকাগণের বিদ্যার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে অধ্যয়নকে জীবনের সাথী করিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইল। লীলার মনে সময় সময় চাঞ্চল্য ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইত কিন্তু থোবর্ণের উদাহরণ ও তৎপ্রতি ঐকান্তিক ভক্তি তাঁহার মন হইতে সমস্ত সংশয় ও চাঞ্চল্য দুর করিয়া দিত। এমন কি, কুমারী থোবর্ণের শিক্ষায় লীলার মনে প্রকৃত স্বদেশানুরাগ জন্মিয়াছিল; লীলার বৈদেশিক পরিচ্ছদ ত্যাগ এবং পরবর্ত্তী জীবনে ভারতের স্ত্রীজাতির শিক্ষার জন্য আন্তরিক প্রয়াস তাঁহার দেশ-

প্রেমের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। লীলাবতী উৎসাহ ও যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন কিন্তু হাইস্কুলে থাকিতেই তাঁহার পিতার অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁহার পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। এরূপ অবস্থায় লীলাকে একটি মিশন স্কলারসিপ্ দিবার কথা হয়, কিন্তু স্বাবলম্বনপ্রিয়া লীলাবতী সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন এবং শিক্ষকতা করিয়া কষ্টের সহিত অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শেষে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া গবর্ণমেণ্ট স্কলারসিপ্ পাইলেন। এই সময়ে তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং জ্ঞানার্জ্জনকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া কলেজ ডিপার্টমেণ্টে অধ্যয়নের নিমিত্ত ভর্ত্তি হইলেন।

এইরূপ আত্মনির্ভর সহকারে পরিশ্রম করিয়া ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া লীলাবতী কলিকাতায় বেথুন কলেজে আসিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং তথা হইতে বি, এ, ডিগ্রি প্রাপ্ত হইলেন। এই বৎসর তিনি ঢাকায় একটী গবর্ণমেণ্ট্ স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। লীলাবতী তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়াছেন যে বেথুনকলেজে ও ঢাকায় থাকা কালে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং বৈষয়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঢাকায় বহুতর শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় তাঁহার সেই সময়কার জীবন নানারূপ প্রলোভনপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তখনও কুমারী থোবর্ণের স্মৃতি তাঁহার মনে জাগরূক ছিল এবং একদিন প্রলোভনের সময় থোবর্ণের স্মৃতি তাঁহাকে প্রলোভন হইতে নিবৃত্ত করিলে তিনি তাঁহার প্রভু খৃষ্টের কাজ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া মিশন সংক্রান্ত কোন কার্য্য পাইবার জন্য কুমারী থোবর্ণকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

এই সময় লক্ষ্ণৌ মিশনারী কলেজে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হওয়ায় কুমারী থোবর্ণ তাঁহার পুরাতন ছাত্রীকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং লীলাবতী অধ্যাপকের পদে যোগদান করিলেন। আমেরিকান মিশনারীরা লীলাকে তাঁহাদের সমানশ্রেণীতে গ্রহণ করিলেন; এইরূপ সম্মান লীলাবতীর পূর্ব্বে ভারতীয় আর কোন খৃষ্টান নারীর ভাগ্যে ঘটে নাই। লীলাবতী অতি সুপ্রণালীতে ও পারদর্শিতার সহিত অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহার ছাত্রীদিগের সহিত অতি অমায়িক ব্যবহার করিতেন। পাশ্চাত্য অধ্যাপকের সমকক্ষ এই প্রাচ্য অধ্যাপিকার শিক্ষানৈপুণ্যে ও ব্যবহারে ইউরোপীয়ান্ ও ইউরেসীয়ান ছাত্রীগণ বিস্ময়াপন্ন হইত। অধ্যাপনার কার্য্যে থাকিয়াই লীলা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৯ সনে লক্ষ্ণৌ কলেজের জন্য অর্থসংগ্রহেচ্ছায় কুমারী থোবর্ণ যখন আমেরিকায় যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে লীলাবতী তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। আমেরিকার প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাতে লীলাবতী তাঁহার প্রতিভা ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞতা দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে আমেরিকাবাসীগণ অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। ভারতীয় নারীর এতাদৃশ উন্নতিতে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের এক বৎসর পরে মিস্ থোবর্ণের মৃত্যু হইলে, নবনিয়োজিত অধ্যক্ষ কলেজের কার্য্যাদি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলিয়া লীলাবতী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্তা হইলেন এবং কলেজের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইল। অতি যোগ্যতার সহিত তিনি এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতেন; তদুপরি আবার বোর্ডিংএ থাকিয়া ছাত্রীদিগকে গার্হস্থ্য কর্ম্মাদি সুচারুরূপে শিক্ষা দিতেন। কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি অতিশয় উদ্যোগিনী ছিলেন। এই পদে অবস্থান কালে ১৯০৭ সনে জাপানের খৃষ্টান ছাত্রসমিতির অধিবেশনে লীলাবতী ভারতের প্রতিনিধিরূপে জাপানে প্রেরিত হন; তথায় তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে এত মোহিত করিয়াছিলেন যে, জাপানী, ইংরাজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি জা ীয় আর কোন প্রতিনিধিই সেরূপ শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। এই দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ লীলাবতী তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের কোঅপারেটীভ কমিটীর সভানেত্রী (President) নির্ব্বাচিত হন। জাপানে বহু ইংরাজ এবং

ওলন্দাজ স্ত্রী-প্রতিনিধিগণের সহিত লীলার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। জাপান হইতে প্রত্যাগত হইবার কিছুকাল পরে লীলাবতী ইউরোপ যাত্রা করেন এবং তথায় ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ ছাত্রসম্মিতিতে বক্তৃতা দ্বারা পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের বিস্ময় উৎপাদন করেন; সর্ব্বশেষে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন করেন এবং যুক্তরাজ্যের নানাস্থানে ভ্রমণের পর কঠোর শ্রমে অসুস্থ হইয়া চিকাগোতে ১৯০৯ সনের মে মাসে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—"জীবনে আমার এত কাজ বাকী যে আরও কিছুদিন বাঁচিবার ইচ্ছা ছিল।"

স্বীয় অধ্যবসায়ে কৃতবিদ্য, স্বদেশ, ইউরোপ ও আমেরিকা সর্ব্বত্র প্রশংসিত এই মহীয়সী রমণীর জীবন ভারতের প্রত্যেক নরনারীর গৌরব ও শিক্ষার বিষয়।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার।

চীনদেশীয় রমণীগণের বিবরণ।

ভারতমহিলার পাঠিকাগণকে চীনদেশের রমণীকুলের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিবার আশায় আজ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। যাহা লিখিত হইল লেখকের সামান্য অভিজ্ঞতা ভিন্ন তাহার মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছুই নাই।

চীনের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ স্থূলকায়া। মুখাকৃতি কিছু দীর্ঘ, ওষ্ঠ পাতলা ও রক্তিমাভ, কপোল প্রদেশ তুষারধবল, নাক চেপ্টা, চক্ষু ক্ষুদ্র ও দীপ্তিহীন, ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, রং কাঞ্চনবর্ণ এবং পদদ্বয় অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র। সকল অঙ্গ অপেক্ষা উদরের আয়তন কিছু বড়। চীনদেশে অবরোধ প্রথা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া বড় ঘরের মেয়েরা বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ ব্যতীত কখনও ঘরের বাহির হয় না। পরপুরুষ সমক্ষে তাহারা বিলক্ষণ সলজ্জ, ধীর এবং গম্ভীর। তাহাদিগকে কখনও প্রগল্‌ভতা কিম্বা উচ্চহাস্য করিতে দেখা যায় না। তথাকার রমণীকুল [illegible] আধারে কেশের পারিপাট্য বড় বেশি। [illegible] প্রথা বৃদ্ধি হয়। শীতকালে ব্যতীত মস্তকে কোন আবরণ দিবার প্রথা নাই। কোন কাজ করিবার সময় মাথায় একখানি রুমাল বাঁধিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের গৌরব রক্ষা এবং সমুচিত সম্মান প্রদর্শন চীনেরা তাহাদের একটী প্রধান এবং গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করে। আমরা কিন্তু তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ উদাসীন, অথবা কর্ত্তব্য কার্য্যে আমাদের মত উদাসীন জাতি জগতীতলে বিরল। অন্তঃপুর মধ্যে অপর পুরুষের ত কথাই নাই। বাটীর কর্ত্তাও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সদাসর্ব্বদা তথায় যাওয়া সঙ্গত মনে করেন না। চীন দেশের বড় ঘরের মেয়েরা অনেকেই বিদ্যানুরাগিনী এবং ললিত কলায় পারদর্শিনী। সঙ্গীত বিদ্যা চীন স্ত্রীলোকের একটী গুণের মধ্যে গণ্য। ললনাকুল মধ্যে বিদ্যানুশীলনের বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অনেক বড় ঘরের মেয়ের বেশ বিদুষী এবং উৎকৃষ্ট কবিতা রচনায় সুনিপুণা। অনেকে আবার অন্তঃপুর মধ্যে অহর্নিশি আলস্যে কাল কাটাইয়া থাকে। তথায় স্ত্রীলোকের বিশেষ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও আমাদের দেশের ন্যায় অন্তঃপুরের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে বেশ ক্ষমতা আছে। চীন ললনাকুলের সৌন্দর্য্যের নিরূপণ তাহাদের পদযুগের ক্ষুদ্রত্বের তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে। নাক, মুখ, চোখের প্রতি চীনেদের ততটা লক্ষ্য নাই, কেবল যার পা যত ছোট, সে তত সুন্দরী। এরূপ কিম্বদন্তী আছে, নবম শতাব্দীতে টাং রাজবংশের কোন রাজ্ঞীর এত ক্ষুদ্র পদযুগ ছিল যে তিনি পদ্মের উপর অনায়াসে নৃত্য করিতে পারিতেন। তদনুসারে সকল স্ত্রীলোকেই ক্ষুদ্র পদ সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইল, এবং এমন কি অস্বাভাবিক উপায়েও পদদ্বয় খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত হইল, তদবধি এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বড় ঘরের চালচলন অনুকরণ সাধারণ লোক মধ্যে একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ, এবং পৃথিবীস্থ সকল জাতি মধ্যে একপ্রকার প্রচলিত।

চীনেরা যেরূপ নিষ্ঠুর উপায়ে কন্যা সন্তানের পদদ্বয় ক্ষুদ্র করে তাহা শুনিলে অনেক পাঠিকাই শিহরিয়া উঠিবেন। তাহা এইরূপঃ—কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার পদযুগলে লৌহ নির্ম্মিত পাদুকা পরাইয়া দেওয়া হয়।

ইহার ফলে শিশু এমন চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে যে সে গ্রামের মধ্যে সকলেই জানিতে পারে অমুকের কন্যার পা ছোট করা হইতেছে। এরূপ অবস্থায় কতিপয় বৎসর রাখিয়া যখন পা বেচারীর আর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকে তখন উক্ত লৌহ পাদুকার পরিবর্ত্তে বস্ত্র নির্ম্মিত পাদুকা পরিতে দেওয়া হয়। বড় ঘরের মেয়েদের মধ্যে পদযুগল এত ছোট দেখা গিয়াছে যে দুইজন সহচরী দুই পার্শ্বে সাহায্য না করিলে তাহাদের এক পদও চলিবার সামর্থ্য নাই। যাহারা কথঞ্চিৎ চলিতে পারে—তাহারাও পাখীর ন্যায় হস্তরূপ ডানা বিস্তার করিয়া গোড়ালীর উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া থাকে. কি শোচনীয় দৃশ্য! ইহা চীনদের চোখে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইলেও আমাদের চোখে কিন্তু খুঁড়ী বই আর কিছু বলিয়া বোধ হয় না। এই কুপ্রথার ফল চীনজাতি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, এখন স্বাভাবিক পা রাখার দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে। চীন রমণীগণের পদযুগল ক্ষুদ্র না হইলে তাহারা সুন্দরী নারীকুলের মধ্যে স্থান লাভের যোগ্য। মধ্যবিৎ গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সংসারের অনেক উপকার করে। দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত কষ্টসাধ্য কাজ করিয়াও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। চীন জাতির নিকট কন্যা সন্তানাপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিক বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে আমাদের অবস্থাও তথৈবচ। শিশুহত্যা চীনজাতি মধ্যে প্রচলিত আছে। এই কুপ্রথাকে তাহারা দোষাবহ বলিয়া মনে করে না, এবং এই পাপের শাস্তি বিষয়েও তাহাদের দণ্ডবিধি আইনের মধ্যে উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চীন স্ত্রীলোকের সন্তানবাৎসল্য কিন্তু আমাদের দেশ অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না।

বিবাহ প্রথা।—বাল্যবিবাহ চীনজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে বেণীবন্ধনের নিয়ম নাই। কেশদাম পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান থাকে। বর এবং কন্যাকর্ত্তার মনোনীত ঘটক দ্বারা বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বর ভাবী ক'নেকে কোনক্রমেই দেখিতে পায় না। বিবাহ স্থির হইয়া গেলে কন্যাকে হাস্য পরিহাস ত্যাগ করিতে হয়। এই সময়ে পুরুষের সম্মুখে বাহির হওয়াও নিষিদ্ধ। গণকদ্বারা বিবাহের দিন স্থির হয়। বহু বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই।

কপোল এবং ওষ্ঠ গোলাপী রং দ্বারা রঞ্জিত করা এবং পাউডার মাখা চীন স্ত্রীলোকের এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ। স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত কৃত্রিম নখ ধারণ বহুল প্রচলিত, ইহা স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গাভরণের মধ্যে গণ্য। বিবাহ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে প্রবন্ধান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীআশুতোষ রায়।

নিরঞ্জন।

কেবলি তোমার রূপের ছটায় যদি
থাকিতে আমার সম্মুখে নিরবধি,
ভেবে মরিতাম কোথায় তোমারে রাখি।
তৃষিত পরাণ চাহিত না কিছু আর
মরিত সে সদা লজ্জায় আপনার
গোপন আঁধারে রহিত সে মুখ ঢাকি।
কেবলি যদি সে তোমার অসীম শক্তি
জাগাত পরাণে আমার সভয় ভক্তি,
তা হ'লে মোদের মিলন ঘটিত না যে!
রুদ্রদীপ্তি-সাগরে হ'তেম হারা
স্তম্ভিত হিয়া পেত না কূল কিনারা
আপন দৈন্যে ডুবিত অকূল মাঝে।
তোমার যন্ত্রে কাঁপায়ে তন্ত্রীরাজি
গরবে গভীর বাণী যদি উঠে বাজি
কে তবে তাহার মর্ম্ম লইবে বুঝি?
তোমার বীণার গভীর বিশ্বপ্লাবী
সে নীরব বাণী খুলিয়া গোপন চাবি
অন্তর মাঝে লভিবারে মরে খুঁজি।
হে নিরঞ্জন, আপনা গোপন করি
দিতেছ সকলি লভি তাই প্রাণ ভরি;
কেমনে দিতেছ কি যে দাও নাহি জানি।
হে শক্তিমান, আপন শক্তি হরি'
প্রেমময়, কি আনন্দ মূরতি ধরি
সরস হরষে ভরেছ ভুবন খানি।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গার্হস্থ্য ভেষজ্যতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর *)

অশোক।

নামান্তর :—হেমপুষ্প, পীলাফুলনো, অশোগি।

পরিচয় :—লিগিওমিনেসি জাতীয় সারাকা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই জন্মে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই সচরাচর অশোক বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তকালে যখন ফুল ফোটে, তখন এই গাছ দেখিতে বড় নয়নানন্দকর। ঔষধার্থে বৃক্ষের বল্কল ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া :—পরিবর্ত্তক, বলকারক ও সঙ্কোচক। রক্তসঞ্চালক প্রণালী সমূহের স্নায়ুমূলের উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া অশোক হৃদপিণ্ডের বলাধান করে।

আময়িক প্রয়োগ।

জরায়ুর রক্তস্রাব নিবারণার্থ ইহা অমোঘ মহৌষধ। আশু কার্য্যকারী না হইলেও ইহার রক্তস্রাব নিবারণ ক্রিয়া প্রায় নিষ্ফল হয় না।

এসিষ্ট্যাণ্টসার্জ্জন জহরুদ্দিন আহম্মদ বলেন যে জরায়ুর উপর অশোক বলকারক ও পরিবর্ত্তক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এজন্য জরায়ুর অন্যান্য রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদরে অশোককাথ বিশেষ সফলতার সহিত প্রয়োগ হইতেছে।

মূত্রাঘাত (প্রস্রাবরোধ) ও অশ্মরী (পাথরী) রোগে একটী অশোক বীজ শীতল জলের সহিত পেষণান্তর পান করাইতে চক্রপাণি ব্যবস্থা করেন।

প্রয়োগরূপ।

অশোক ক্ষীরপাক। কুট্টিত অশোক ছাল দুই তোলা, গব্য দুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া, সিদ্ধ করিয়া শেষ আধ পোয়া থাকিতে নামাইবে।

মাত্রা :—পূর্ণ বয়স্কের জন্য এক ছটাক বা দুই আউন্স, বালকদের জন্য অর্দ্ধ ছটাক বা এক আউন্স। শিশুদের জন্য এক কাঁচ্চা বা চারি ড্রাম।

* ভ্রম সংশোধন :—গতমাসে অর্জ্জুন ক্ষীরপাকের মাত্রা যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নিম্ন প্রকার হইবে—

অর্জ্জুন ক্ষীরপাকের মাত্রা—পূর্ণ বয়স্কের জন্য এক ছটাক বা দুই আউন্স। বালকদের জন্য অর্দ্ধ ছটাক বা এক আউন্স, শিশুদের জন্য এক কাঁচ্চা বা চারি ড্রাম।

অশ্বগন্ধা।

নামান্তর :—পুষ্টিদা অশ্বগন্ধ, বারাহীগেটী, আখসন্ধ।

পরিচয় :—সোলেনেসী জাতীয় পাইসালিস্ ফ্লাক্সোসা নামক বৃক্ষ। ভারতের সকল স্থানেই জন্মে। ঔষধার্থে মূল ব্যবহৃত হয়। মূলগুলি দেখিতে সরু মূলার মত। উপরের রং কটা, ভাঙ্গিলে ভিতরে সদা দেখায়। কাঁচা মূলে অশ্বগাত্রের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়। শুষ্কাবস্থায় এই গন্ধ প্রায় থাকে না।

ক্রিয়া :—বলকারক, পরিবর্ত্তক, মস্তিষ্কপোষক ও শুক্রবর্দ্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।

অতিরিক্ত চিন্তা, অধ্যয়ন ও অন্যান্য কারণজনিত মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অশ্বগন্ধা চূর্ণ কিঞ্চিৎ শর্করা ও বকা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। মস্তিষ্ক পোষণ ও শুক্র বর্দ্ধন ক্রিয়াতে ইহা প্রায় ডাক্তারী ঔষধ ডামিয়ানার তুল্য।

জরাকৃত দৌর্ব্বল্য বাত ও ক্ষয় রোগাদিতে পরিবর্ত্তক ক্রিয়ার জন্য খণ্ড ও মোদকাদিরূপে অশ্বগন্ধা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষীণকায় শিশুদিগকে ইহার ক্ষীরপাক কাথ সেবন করাইলে পুষ্টি লাভ হয়।

নিদ্রাহীনতায় চিনি ও গব্যঘৃত সহ অশ্বগন্ধাচূর্ণ লেহন করিতে বঙ্গসেন ব্যবস্থা করেন।

অশ্বগন্ধা ক্ষীরপাক কাথ ঘৃত সহযোগে ঋতুস্নানের পর পান করিলে, বন্ধ্যা দোষ নিবারণ হয় বলিয়া ভাবপ্রকাশে উক্ত আছে।

অশ্বগন্ধার পাতা চায়ের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। সিবিল সার্জ্জন অবিনাশ ঘোষ চা অপেক্ষাও ইহা উপকারী বলিয়া মনে করেন।

প্রয়োগরূপ।

অশ্বগন্ধা ক্ষীরপাক। কুট্টিত অশ্বগন্ধা মূল দুই তোলা, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া, সিদ্ধ করিয়া শেষ আধ পোয়া থাকিতে নামাইবে।

মাত্রা :—ক্ষীরপাক কাথের মাত্রা পূর্ণবয়স্কের জন্য এক ছটাক বা দুই আউন্স। বালকদের জন্য অর্দ্ধ ছটাক বা এক আউন্স। শিশুদের জন্য এক কাঁচ্চা বা চারি ড্রাম।

চূর্ণের মাত্রা। পূর্ণ বয়স্কের জন্য চারি আনা, বালকদের জন্য দুই আনা, শিশুদের জন্য এক আনা। (ক্রমশঃ)

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী।

রাণী লুইসা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson

৬ষ্ঠ ভাগ। | ফাল্গুন, ১৩১৭। | ১১শ সংখ্যা।

আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন।

একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, যে জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শিক্ষণীয় বিষয়—জীবন যাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান। কারণ জীবন রক্ষার চেষ্টাই প্রাণী সমূহের মুখ্যতম চেষ্টা এবং জীবজগৎ তাহার এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন শ্রমকে শ্রম বলিয়া গণ্য করে না।

কিন্তু জীবন রক্ষা ব্যাপারটা নেহাৎ সোজা নয়। হিপোক্রেটিস বলিয়াছিলেন, "আমাদের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত, আর্ট অতি দীর্ঘ, সুযোগ বহমান স্রোতের মত দ্রুত ধাবমান, আমাদের পরীক্ষিত সত্য অনিশ্চিত এবং আমাদের বিচার কঠোর।" অবষ্ট্যাকল্ (obstacle) রেসের ছেলেদের যেমন বিঘ্ন পার হইয়া বহু সঙ্কটসঙ্কুল স্থান উত্তীর্ণ হইয়া তবে নির্দ্দিষ্ট সীমায় পঁহুছিতে হয়, ইহাও যেন খানিকটা তেমনি, তাহার বিফলতা কেবলমাত্র বিফলতা নয়, তাহা বিনাশের বিভীষিকায় অত্যন্ত ভয়াবহ।

জীবনে সুখী হওয়া অথবা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারাটা শুধু আমাদের চারিদিককার অবস্থার উপরেই নির্ভর করে না, বরঞ্চ আমাদের নিজেদের উপরেই তাহা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। মানুষ অপরের হাতে বিনষ্ট হওয়া অপেক্ষা আপনার হাতেই বেশী বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভূমিকম্প অথবা ঝড়ের মুখে লোকাবাস যত বিনষ্ট হয় মানুষের রক্তমুখী গ্রাসের চেষ্টা তাহার দ্বিগুণ ধ্বংসের অবতারণা করে। অন্ধ অচেতন প্রবৃত্তি যাহা করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থামিয়া দাঁড়ায়, সচেতন জ্ঞান বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ তাহা করিতে অল্পই দ্বিধা বোধ করে।

পৃথিবীতে যত সব ভগ্নাবশেষ পতিত আছে, তাহার মধ্যে মানুষের জীবনের ভগ্নাবশেষ সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কারণ, মানুষের যাহা শত্রু, তাহা অন্যান্য প্রাণী সমূহের শত্রুর মত বাহিরে অবস্থান করে না, মানুষের নিজের হৃদয়েই তাহার দৃঢ়তম আবাস। লাব্রুয়ারি বলেন, এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা পরকে অসুখী করার চেষ্টায় আপনাদের সময়ের অধিকাংশ ভাগ ব্যয়

করেন। অনেক স্থানে দেখা যায়, যৌবনের উত্তপ্ত রক্ত লোককে এমন সমস্ত কাজে প্ররোচনা দান করে যে, নির্ব্বাপিত-তেজ বার্দ্ধক্য তাহার অনুশোচনার অশ্রুসেকে তাহার পরিত্যক্ত ভস্ম ধৌত করিতে পারে না। কারণ ইহা সুনিশ্চিত যে, অতীতকে কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারে না, বর্ত্তমানের তন্তুকোষ হইতে যে উর্ণা একবার টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে স্বয়ং দেবতারাও তাহা পুনঃ চয়ন করিতে পারেন না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে মানুষ আপনাকে ভালবাসে আত্যন্তিকতার অভিশাপ বহন করিয়া, নির্ব্বোধের মত—বুদ্ধিমানের মত নয়।

মানুষ আপনার ভাগ্যের প্রভু, একথা বলিতে গিয়া অনেক সময় আমরা "optimistic" (আশাশীল) বলিয়া অভিযুক্ত হইতে হইয়াছি। কিন্তু মানুষের দুঃখদুর্দ্দশাকে আমরা কখনও অস্বীকার করি নাই বা মানুষের জীবন সুখী জীবন একথাও আমরা কখনও বলি নাই। আমরা শুধু বলিয়াছি যে মানুষের সুখী হওয়া কতকটা তাহার আপনার উপরেই নির্ভর করে,মানুষ চেষ্টা করিলে জীবনের বহু যন্ত্রণা বিদূরিত করিতে পারে। সহানুভূতির অভাব, স্নেহের অভাব, সহৃদয়তার অভাব, করুণার অভাব, লোক-সমাজ এসকল হইতে যত প্রপীড়িত হইয়াছে ও হইতেছে, জাগতিক নিয়মের ফলে তাহার অর্দ্ধেক মাত্রায়ও প্রপীড়িত হয় নাই এবং হইবে না। আমাদের নিজেদের মূঢ়তা ও অন্ধতা বশতঃই আমরা পরস্পরের সুখ ও স্বস্তিকে দলিত করিয়া চলিয়া যাইতেছি, আমরা মনে করিতেছি ভাগ্যদেবীর বণ্টনের আসরে সব চেয়ে যে বড় ভাগটি আমরা তাহা দখল করিব। কিন্তু সকলের চেয়ে জিতিতে গিয়া আমরা সকলের চেয়ে হারিয়াই যাইতেছি, আমাদের আত্মকেন্দ্রীভূত পরবিমুখ চেষ্টা জগতের হিসাবের খাতায় কিছুই জমা রাখিতে পারিতেছে না।

অনেক জায়গায়, আমরা যাহা অনর্থ বলিয়া মনে করি, তাহা বিধিবহির্ভূত ভুক্ত ইচ্ছা অথবা তাহারই একটা আত্যন্তিক প্রকাশ। সমস্ত গাড়ীখানার মধ্যে চাকার ভিতর একটি অর অথবা নাভির যদি একটু ব্যতিক্রম ঘটে তবে তাহাতে যেমন সমস্ত গাড়ীখানিরই পঙ্গুত্ব ঘটে, তেমনি জগৎ জুড়িয়া শৃঙ্খলার এই যে বিরাট চক্রটি ঘূর্ণিত হইতেছে তাহার কোথাও সামান্য একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহার সমগ্রতার হানি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই বিশ্ব জগতের সামঞ্জস্যের যে সুর তাহার সহিত আমরা যদি আমাদের জীবনতন্ত্রীগুলির সুর মিলাইয়া লইতে না পারি—তবে সেই অসামঞ্জস্যের যে পীড়া তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে, তাহা এড়াইবার আমাদের কোন পথ নাই। আত্যন্তিকতায় একটি বিশেষ বৃত্তি মনের অন্যান্য বৃত্তি সমূহকে লঙ্ঘন করে বলিয়াই তাহা গর্হিত বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাহস অত্যধিক হইলে নির্ব্বুদ্ধিতায় পঁহুছায়; অত্যধিক স্নেহ দুর্ব্বলতায় পর্য্যবসিত হয়; অত্যধিক সহিষ্ণুতা জড়তা আনয়ন করে; অত্যধিক মিতব্যয়িতা কার্পণ্যে দাঁড়ায়, অত্যধিক যাহা কিছু তাহাই সামঞ্জস্যের সুর নষ্ট করে। একটি নিয়ম সকলের প্রতি সমভাবে প্রযুজ্য হইতে পারে না। প্রবাদ আছে যে একের ভক্ষ্য অন্যের বিষ হয়! এ পর্য্যন্ত এমন কেহ আবির্ভূত হন নাই যিনি প্রাকৃতিক কোন নিয়মের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মানুষ পড়িয়া গেলে তাহার হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শোচনীয় অবস্থা ঘটে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের পরিবর্ত্তন কেহ বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারে না।

পার্সিরা শুভাশুভ দুইটি পৃথক্ দেবতার শক্তি বিশেষ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দুঃখ ক্লেশ আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের ভ্রম ও ক্লেশ হইতে যে সকল ক্লেশ উত্থিত হয় তাহা ছাড়াও আমরা জানিয়া শুনিয়া যে সকল অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণ করিয়া থাকি, তাহাও নেহাৎ অল্প নয়। আমরা যে পথ দিয়াই চলি, আমাদের নিজেদের দৃষ্টিশক্তিই পথপ্রদর্শক হয়, যেখানে আমরা ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ পাই সেখানে আমরা নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে সে অন্ধতা আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। আমাদের ভ্রম প্রমাদ হইতে যে সকল ক্লেশ উত্থিত হয় তাহার সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যায় যে সেই সকল স্থলে

আমাদের বাধ্য হইয়াই আমাদের যুক্তির উপরে, আমাদের পিতামাতার উপরে, আমাদের শ্রেষ্ঠগণের উপরে, আমাদের বন্ধুবর্গের উপরে—আমাদের নিজেদের শিক্ষার উপরে, এবং নিজেদের উপরে নির্ভর করিতে হয়। শিক্ষা আমাদের জীবনের একটি বিশেষ অংশ স্বরূপ, আমাদের উপর তাহার একটা সুমহান ভার বিন্যস্ত আছে; যেরূপেই হোক্ আমাদের তাহা সাধন করিতে হইবে, এই যে অন্ধ অহং—(blind ego) যেমন করিয়াই হোক্ তাহার চক্ষুরুন্মীলন করিতে হইবে, নহিলে সে ভয়াবহ অন্ধতা আমাদের চিরতিমিরের ভিতর টানিয়া লইবে।

আমরা নিজেরা নিজেদের যে শিক্ষা দান করিয়া থাকি, তাহা অপরের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত আমাদের জীবন ও সত্তার অংশীভূত হইয়া থাকে। শিক্ষা বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে কখনও সমাপ্ত হয় না, বরঞ্চ তাহাই তাহার প্রারম্ভকাল; তখন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের চরম দিবস পর্য্যন্ত তাহার প্রবাহ বহিতে থাকে।

কোন কোন জাতি অদৃষ্টবাদ মানিয়া থাকে। সে স্থলে আমাদের বিচার্য্য এই যে, জীবন-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব তাহা হইলে বাস্তব কিনা। কালের এই মহা সমুদ্রের উপর দিয়া আমরা যে তরণীগুলি ভাসাইয়াছি—তাহা বাহিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা কি আমাদের নাই? বায়ুর বেগ ও স্রোতের প্রবাহ সে তরণীগুলিকে যেখানে লইয়া যাইবে সেই কি তাহার চরম গতি? আমরা ইহার উত্তরে এই বলিতে পারি যে মানুষ কেবল এই জীবজগতেরই প্রভু নয়, তাহার ভাগ্যেরও সে খানিকটা নিয়ামক। যদি তাহার জীবনে সে তাহার প্রমাণ না দিতে পারে তবে সেই দোষ তাহার আপনার। মানুষ যাহা করিতে ইচ্ছা করে, অপরিহার্য্যরূপে সে তাহাই হয়, তাহার ইচ্ছা-শক্তি এই বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত শক্তির সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে সেই পরিণামের দিকেই লইয়া যায়। প্রথম কথা হইতেছে এই যে, বাস্তবিকই যদি আমাদের ভাগ্য-শাসনের ক্ষমতা থাকিয়া থাকে তবে আমরা কি হইতে চাই, সর্ব্বাগ্রে আমাদের তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য এবং জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে শস্য বপন করিতে হইবে তাহার সুপ্রচুর ফসল কিরূপে সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে তাহার পন্থা নিরূপণ করা। কতক লোকের জীবনের একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, কতক লোকের তাহা নাই। আমাদের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, আমাদের জীবনকে পূর্ণভাবে গঠন করা। হ্যামবোল্ট (Hamboldt) বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যেরই লক্ষ্য হওয়া চাই একটি পরিপূর্ণ অখণ্ড সামঞ্জস্যের দিকে তাহার শক্তির উচ্চতম বিকাশকে লইয়া যাওয়া। আমাদের জীবনকে আমাদের এতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া উচিত যতক্ষণ আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি নিঃশেষের মাত্রায় না আসে। কিন্তু যদি কোনও স্বার্থপর অভিসন্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া এরূপ উদ্যমে প্রবৃত্ত হই তবে আমরা কিছুতেই তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিব না। বেকন বলিয়াছেন, শুধু আপনাকে লইয়া সুখ সম্ভোগ কোন ব্যক্তিরই যোগ্য পরিণাম নয়।

উপরে যাহা বলা গেল তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের জীবনের উৎকর্ষসাধন—অপরের জন্যই প্রধানতঃ প্রয়োজনীয়। একটুখানি সূক্ষ্মরূপে ভাবিলেই দেখা যায় যে জগতের সমস্ত মহাজনেরা—প্লেটো এবং এরিষ্টটল, বুদ্ধ এবং সেণ্টপল—চৈতন্য এবং মহম্মদ ইঁহারা দেবত্বের যে উর্দ্ধতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, আত্মচিন্তার কোনও প্রণোদনা তাহার মূলে ছিল না, বিশ্বমানবের সুবৃহৎ কল্যাণের চিন্তা তাঁহাদের মহান্ সাধনার ইন্ধন যোগাইয়াছিল। বৃহৎ কার্য্য ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না; যে বীজ বটবৃক্ষকে জন্মদান করিবে তাহা কোনও গুল্মের গর্ভ হইতে প্রসূত হইতে পারে না।

উপদেশের কথা যদি তোলা যায় তবে দেখা যায় যে, উক্ত বিষয়টি দীর্ঘকাল যাবৎ লোকসমাজে অতি নীরসতম পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এক সময়ে নিউ-জিল্যাণ্ডের এক দেশীয় প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের মিশনরীর কাছে বলিয়াছিলেন যে এক ব্যক্তির উপদেশের আধিক্যে তাঁহারা এরূপ প্রপীড়িত হইয়াছিলেন যে, তাহাকে তাঁহারা

মারিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোকের মানসিক ভাব যদিও এই নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানের মতই, তবুও সাহস করিয়া আমরা একথা বলিতে পারি যে, প্রথমে সুলভ উপদেশ যাঁহারা গ্রহণ করেন না, শেষে দুর্ম্মূল্য দিয়া তাহাই তাঁহাদিগকে ক্রয় কবিতে হয়।

মানুষ আহার করে এবং সেটা তাহার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিকই, কিন্তু ভোজনপ্রিয় ব্যক্তি যখন অত্যধিক আহার করিতে থাকে, তখন তাহার সমস্ত শরীর-যন্ত্র সেই আতিশয্যের দ্বারা পীড়িত হইয়া ক্রমে বিনষ্ট হইতে থাকে। তেমনি, বিধাতা মানুষকে যে টুকু সীমার ভিতর বিচরণ করিতে দিয়াছেন, মানুষ যখন অত্যধিক গ্রাসের লিপ্সা দ্বারা চালিত হইয়া তাহা উল্লঙ্ঘন করে, তখন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির যে সুসম্বদ্ধ নিয়মের ধারা—তাহার ভিতর সে বিশৃঙ্খলতা যতই আপাতমধুর হউক না কেন, পরিণামে তাহা তাহার ধ্বংস সাধন করে। আমরা পরস্পরকে সুখী করিতে পারি অত্যন্ত সহজে, কিন্তু নিজের অংশে সুখের মাত্রা বেশী করিবার ঝোঁকে সেটুকু করিতে কিছুতেই রাজি নই! শুধু একটু খানি পশ্চাদ্দৃষ্টি—শুধু একটুখানি সহানুভূতি—তাহা হইলেই আজ আমরা পৃথিবীর যে চিত্র দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক চিত্র দেখিতে পাইতাম!

মানুষ স্বভাবতঃই আনন্দ-প্রয়াসী। তরুর শাখা যেমন অদৃশ্য আকর্ষণে সূর্য্যের দিকে বাহু বাড়ায়, লোক-চিত্ত তেমনি স্বতঃসিদ্ধ আকর্ষণে আনন্দের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, যে আনন্দ আমরা উপভোগ করিতেছি তাহার বাস্তবিক একটা সত্তা আছে কিনা, অথবা তাহা শুধু আমাদের চঞ্চল আকাঙ্ক্ষা কিংবা কল্পনা-প্রসূত। অনেকে আছেন, যাঁহারা কিছু করিতেছেন না, ইহা ভাবিয়াও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আনন্দকে শুধু বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আনন্দ—যাহা বিশ্বমানবের চিত্তকোষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—তাহার সহিত বহিরেন্দ্রির অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধই অধিক।

মানুষ তাহার বুদ্ধিমত্তার গর্ব্ব করিয়া থাকে, কিন্তু প্রতিপদে সে তাহার বিরুদ্ধ-প্রমাণই দিয়া থাকে। শারীরিক নিয়ম সমূহ পালন না করিলে যে রোগ ভোগ করিতে হয়, তাহা পঞ্চমবর্ষীয় বালকও জানে, কিন্তু তবুও নিয়ম পালন অপেক্ষা নিয়ম ভঙ্গের দিকে শতকরা নিরনব্বই জন লোকের প্রবণতা দেখা যায়। আমাদের সম্মুখে আনন্দলাভের যে প্রচুর উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে নিজের অন্ধতা ও মূঢ়তা বশতঃই আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি না! আমাদের মধ্যে কয়জন বিজ্ঞান ও ললিতকলার আস্বাদন করিতে সমর্থ? সৌন্দর্য্যময়ী বসুন্ধরার অনন্ত শোভাভাণ্ডার হইতে কয়জন আপনাকে সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম? আমরা বাক্যচর্চ্চা করিয়া থাকি বটে কিন্তু তাহাও আমাদের ক্ষমতা অপেক্ষা বহু ন্যূন পরিমাণে। মানুষ প্রজ্ঞাবান্ জীব বলিয়া সমগ্র জীব-জগতের ভিতর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব পরিকল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু তথাচ তাহার সেই গর্ব্বস্ফীত মনীষা বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনে কোন বিশেষ সফলতা লাভ করে নাই! মায়াবাদীরা মানুষের এই "মনঃ" জিনিসটির অধিকারকে অনেক জায়গায় অভিসম্পাৎ স্বরূপ মনে করিয়া থাকেন। কারণ, পশুরা চিন্তার দ্বারা, বিবেচনার দ্বারা, স্মৃতির দ্বারা, কখনই আপনাদিগকে প্রপীড়িত করে না; মানুষ ধাবিত হয় মিথ্যা ছায়ার পশ্চাতে, এবং তাহার জীবন-ব্যবসায়ের মূলধন সঞ্চয় করে—মিথ্যা অস্বস্তি। বাহিরে ঐ যে বৃহৎকায় তরুগুলি ঝড় বৃষ্টি তুফানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ভাঙ্গিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে, আমাদের জীবনও তেমনই 'মন' হইতে উদ্ভূত সহস্র উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়াছে—সে সন্তাপের শেষ নাই, নির্ব্বাণ নাই, উপশম নাই, বিরাম নাই। আমরা দেখিতে পাইতেছি, একটা দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা আমাদের চারিদিক্ দিয়া তাহার অন্ধকার জাল ধীর হস্তে টানিয়া নিতেছে, কিন্তু আমাদের তাহা মোচন করিবার সাধ্য নাই!

মানুষ বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব, তাহাতে চিৎ-শক্তি সুপরিস্ফুট, ভাগ্যশাসনের ক্ষমতায় সে বলীয়ান—এই ঝড়, এই বজ্রবিদ্যুৎ অশনির ভিতর তাহাকে উন্নতশিরে দাঁড়াইতে হইবে, সেখান হইতে তাহার হটিয়া আসা চলিবে না! তরবারি খেলায় খেলোয়াড় যেমন একই সঙ্গে প্রতিপক্ষের আক্রমণ নিরোধ ও খেলায় আপনার

নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, একতিল অভিনিবেশের ব্যত্যয় ঘটিলে যেমন তাহার দক্ষতার যশ বিনষ্ট হয়, ও তৎসঙ্গে তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়, মানুষের জীবনের অবস্থান ঠিক্ তেমনি, শুধু আত্মরক্ষা করিলে তাহার চলে না, তাহার নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেও সে বাধ্য। ভুল করিব না বলিয়াই যখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি তখনই আমরা ভুল ঘটিবার সুযোগ দান করি; ভুল ঘটিবে, একথা মানিয়া লইয়া যদি আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি, তাহা হইলেই প্রকৃত পন্থা গ্রহণ করা হয়। লর্ড চেষ্টারফিল্ড বলেন যে, "অধর্ম্ম কি তাহা নিরূপণের অপেক্ষা আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি তাহা ধর্ম্ম কিনা তাহা আমাদের আগে দেখা উচিত!" একথার প্রধান অর্থ হইতেছে এই যে, ধর্ম্মের রূপ নির্ণয় যত সহজ অধর্ম্মের রূপ নির্ণয় তত সহজ নহে। অধর্ম্ম যখন তাহার স্বমূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন অতি বড় নীচ-প্রবৃত্তি যে লোক, সেও তাহার কদর্য্য মূর্ত্তি দেখিয়া ঘৃণা বোধ না করিয়া পারে না; কিন্তু এই কুৎসিৎবপু চতুর খলটি যখন ধর্ম্মের ছদ্মবেশে আপনাকে আবৃত করিয়া আমাদের চিত্তভবনের দ্বারপথে আসিয়া অবতীর্ণ হয়, তখন এই শোভনবেশী অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারেন, এমন লোক কয়জন আছেন! এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের চরিত্রে মহৎগুণের সমাবেশ সত্ত্বেও তাঁহারা কঠোরতা ও হৃদয়হীনতার অভিযোগ হইতে মুক্ত নন। লর্ড পামারষ্টোন যখন লিখিয়াছিলেন যে, শিশুমাত্রেই নির্দ্দোষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন অবশ্য সমালোচকদের তরফ হইতে বহু শ্লেষাত্মক বাক্য তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহা সত্য যে, পৃথিবীর প্রচলিত পাপ ও অন্যায়ে অভ্যস্ত হইতে মানব-শিশুকে প্রথমে রীতিমত শিক্ষানবিশী করিতে হয়! ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে উর্দ্ধগগন-বিহারী বাজপক্ষীর মত আমরা ধর্ম্ম হইতে এককালে স্খলিত হইয়া পড়ি না, আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে অমর বীজ নিহিত আছে বহু আয়াস ও ক্লেশ স্বীকারে আমাদের তাহা ধ্বংস করিতে হয়।

ব্যক্তির দিক্ ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা জাতির দিকে চাহিতে যাই, তাহা হইলে শিক্ষা ও উন্নতির দিকে আমাদের বৃহৎ ঔদাসীন্য বৃহত্তররূপে চোখে পড়ে! মানব নিউটনের সঙ্গে সমস্বরে বলিতে পারে যে, "শিশুর মত আমরা বেলাভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, অনন্ত জ্ঞান-মহার্ণব আমাদের সম্মুখে অজ্ঞাত পড়িয়া রহিয়াছে।" এমন কোন বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞানকে আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি। দিবসের প্রারম্ভ হইতে রাত্রিশেষ পর্য্যন্ত আমরা পরিশ্রম করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাও কোন বিশেষ সফলতা প্রকাশ করিতেছে না। বাষ্পের ব্যবহার আমরা করিতে শিখিয়াছি বটে কিন্তু তাহাকে কিছুতেই "সমগ্রভাবে" বলা যাইতে পারে না। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও বিদ্যুতের ব্যবহার আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল, এখন কেবল মাত্র তাহার কার্য্যকারিতার শক্তি আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাকে বিশেষ কোন কাজে লাগাইতে পারি নাই। অজ্ঞান করিবার প্রণালী যদি আর কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইত তবে, তখনকার সময়ে যাহারা অস্ত্রের মুখ আপনার জীবিত অঙ্গের ভিতর অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ভয়াবহ যন্ত্রণার কত লাঘব ঘটিত! এইরূপ শত সহস্র আবিষ্ক্রিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে যে পড়িয়া আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। জাতিসমূহ পরস্পরের মাঝখানে বিভাগের রেখা টানিয়া পরস্পরের রক্তে তাহা সিক্ত করিবার চেষ্টায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের সম্মুখে অনন্ত জ্ঞান-মহার্ণব নিত্যকাল ধরিয়া অনাবিষ্কৃতই পড়িয়া রহিয়াছে!

শিক্ষা সম্বন্ধীয় আইন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী যে যুগ—তাহাতে দেখা যায় যে জনসাধারণকে তখন লিখন ও পঠনপদ্ধতির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত করিতে আমাদের কোন উদ্যম ছিল না। এমন কি এখনও অনেক লোককে বলিতে শোনা যায় যে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাদান অতিরিক্ততার দিকে গড়াইতেছে! শিক্ষার সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সামঞ্জস্যের অভাবের জন্যই যে তাঁহারা ঐরূপ মনে করিয়া থাকেন,

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! অনেকে আছেন যাঁহারা শিক্ষার ব্যয়ভারকে প্রবল অত্যাচারের মত মনে করিয়া থাকেন ; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে শিক্ষা কেবলমাত্র অর্থব্যয়েই ক্ষান্ত হয় বটে, কিন্তু মূর্খতা জীবন-ব্যবসায়ের সমস্ত মূলধন ব্যয় করিতে উদ্যত হয়! কিন্তু এখন আমরা বলিতে পারি যে আমাদের জনসাধারণ বিধিনির্দ্দিষ্টরূপে শিক্ষা লাভ করিতেছে। শিক্ষার উপর আমরা যখন দোষারোপ করিতে যাই, তখন আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, শিক্ষার যে পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সমীচীন কিনা। এখানে আমরা কেবলমাত্র এই বলিব যে, শিক্ষার উন্নতির সম্বন্ধে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠিত এই সকল বিদ্যামন্দিরগুলির নৈতিক অবস্থার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করি না, আমাদের এই ঔদাসীন্য এবং চেষ্টার অভাবই সকল ত্রুটীর মূলীভূত হেতু। ইহার যুক্তিসঙ্গত কারণ যাহা দেখা যায় তাহা এই ঃ—ধর্ম্মবিধি আমরা যখন উল্লঙ্ঘন করিয়া চলি, তখন আমরা নিঃসন্দেহেই খুব একটা অন্যায় করিতে থাকি এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভারে সমাজকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকি। কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে ধরিতে গেলে আমাদের আপনার সুখ ও সুবিধাকে আমরা তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করি না! উদ্যমহীনতা ও নিশ্চেষ্টতা অন্যের পক্ষে যতটা অশুভদায়ক, আমাদের নিজের পক্ষে ততটা নয়। মানুষ যদি তাহার নিজের লাভ ক্ষতিকেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বিষয় বলিয়া মনে করিত, এবং তাহার মনুষ্যত্বের গৌরব যদি কোন প্রকারে তাহার পরিপন্থী না হইত, তাহা হইলে সে কখনও পরের কল্যাণ অকল্যাণের দিকে ফিরিয়া চাহিত না! ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সদাচরণ যতই মহৎ হউক না কেন, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রবল অন্তরায়। কিন্তু ব্যক্তি ছাড়িয়া যিনি সমাজের দিকে চাহিবেন, তাঁহাকে প্রতিপদে প্রতিবন্ধকতার দ্বারা আপনাকে খর্ব্ব করিতে হইবে, আপনার মধ্যে নিবদ্ধ আনন্দ রুদ্ধ করিতে হইবে, সম্ভোগাকাঙ্ক্ষাকে আপনার সবল বাহুর তাড়নায় চূর্ণ করিতে হইবে, পরের মঙ্গলমন্দিরে তাঁহার আপনাকে বলিদান দিতে হইবে! দুর্নীতি ও পাপের, অন্যায় ও অধর্ম্মের এই আপাতমধুর দিক্, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া যদি আমরা দেখিতে যাই—তাহা হইলে এই সংযমহীন, প্রতিবন্ধকহীন, কুণ্ঠাহীন ভোগবাসনার পদানত যে ব্যক্তি, তাহাকে প্রবৃত্তির ক্রীতদাস বলিতে আমরা দ্বিধা বোধ করিব না, এবং সে দাসত্ব এমন কুৎসিৎ, এমন জঘন্য, মন ভয়াবহ—যে তাহার কবল হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন কাঠিন্য হইতে বিরত হইতে আমরা ইচ্ছা করিব না।

অনেক তরুণবয়স্ক তরলমতি যুবক পাপানুষ্ঠানের ভিতর পৌরুষের আস্বাদ অনুভব করিয়া থাকে। এই যে বিধি—বিশ্বলোক যাহার অনুশাসনের ভয়ে ভীত—তাহাকে সদর্পে পদতলে মথিত করা—সে বেশ একটা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহা শুধু বর্ব্বরতা ও মূঢ়তারই পরিচয় প্রদান করে! মনুষ্যত্বের বীর্য্য রক্ষার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, হত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি দুঃসাহসিকতার শক্তি তাহার সহিত উপমেয় হইতে পারে না। মানুষ যখনই পাপে প্রবৃত্ত হয় তখন সে আপনাকে শাসন করিবার ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়াই হয়, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্যের পক্ষে সে হীনতা কি ভয়ানক! কতকগুলি বিশেষ কাজ বা বিশেষ ব্যবহার অবৈধ বলিয়া অধঃপতন ঘটায় না, তাহা অধঃপতন ঘটায় বলিয়াই আমরা সে গুলিকে অবৈধ বলিয়া থাকি। হঠাৎ যদি কোন এক অচিন্তিত-পূর্ব্ব হেতুতে আমাদের সামাজিক বিধানের নিয়মগুলি বদলাইয়া গিয়া বৈধ বিষয় অবৈধ হইয়া দাঁড়ায় এবং অবৈধ বিষয় বৈধ হইয়া দাঁড়ায়, তবুও বিগর্হিত কাজ হইতে যে ফল প্রসূত হয় তাহা থাকিয়া যাইবেই, তাহা কিছুতেই বদলাইবে না।

ছায়ার মত দুঃখ যে পাপের অনুগামী, অবশ্য এ কথা প্রতিপন্ন করিতে আমাদিগকে দর্শন শাস্ত্রের কিংবা কোন দার্শনিকের নজীর দেখাইতে হইবে না ; আমাদের মতই যাঁহারা সংসারবাসে জীবনযাপন করিয়াছেন এবং আমাদের মতই দুঃখ বর্জ্জন করিয়া সুখ লাভের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই একজনের বাক্য আমি এখানে উদ্ধৃত করিব। লর্ড চেষ্টারফিল্ড তাঁহার শিক্ষার্থী পুত্রকে নানা

উপদেশ প্রদানের পর উপসংহারে কোন একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "এই হইতেছে ধর্ম্মের পুরস্কার। এবং এই যে চরিত্রের উদাহরণগুলি আমি তোমায় দেখাইলাম, কায়মনোবাক্যে তদ্রূপ হইতে তুমি চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই তুমি পৃথিবীর ভিতর একজন মহৎ ও বৃহৎ লোক হইতে পারিবে। শুধু তাহাই নয়, তুমি নিশ্চয় জানিও যে, মহত্ত্ব বিনা মানুষের জীবন তৃপ্ত হইতে পারে না, আনন্দ লাভ করিতে পারে না, তাহাই তাহাকে প্রকৃত সুখের অধিকারী করে।"

ডেকার্টে তাঁহার জীবনে চারিটি নীতি পালন করিতেন। যে আইন ও ধর্ম্মের ভিতর তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তাহার সর্ব্বথা অনুসরণ, আপনার বিবেক ও বিচার বুদ্ধির আদেশ প্রতিপালন এবং কার্য্যের ফল সম্বন্ধে ক্ষোভ ত্যাগ, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি দমন করিয়া তাহার সঙ্কোচে তৃপ্তিলাভ, সত্যানুসন্ধানকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা। স্থূলতঃ দেখিতে গেলে এই কয়টি নিয়ম পালন করিলে জীবনে প্রকৃত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। লিলি বলিয়াছিলেন, "মেষশাবকের মত নম্রচিত্ত লইয়া শয্যায় যাইও এবং ভরত পক্ষীর মত আনন্দবিস্ফারিত গতি-বেগে অধীর হৃদয় লইয়া প্রভাতে প্রাত্রোত্থান করিও। প্রফুল্লচিত্ত হও, কিন্তু লজ্জাকে অতিক্রম করিও না, শান্ত হও, কিন্তু নিরানন্দ হইও না, নির্ভীক হও—কিন্তু দুঃসাহসী হইও না। তোমাদের বেশ ভূষা সুরুচিসম্পন্ন হোক, আহার্য্য আতিশয্যবর্জ্জিত এবং স্বাস্থ্যকর হোক, তোমাদের কৌতুক শ্রম-অপনোদনের লক্ষ্য দ্বারা শ্রীমণ্ডিত হোক। অকারণে কাহাকেও অবিশ্বাস করিও না, বা প্রমাণ ব্যতিরেকে কাহাকেও অতিরিক্ত বিশ্বাস করিও না। প্রত্যেকের মতের অনুসরণ করিও না অথবা নিজের মতকে অভ্রান্ত বলিয়া তাহা আঁকড়িয়া থাকিও না। ঈশ্বরকে ভালবাস, ভয় কর, সেবা কর, ঈশ্বর তোমাকে এমন জীবন দান করিবেন যে তুমি নিজেও তাহা কল্পনা কর নাই।

কেবল যে অবিবেচক স্বার্থপর লোকেরাই স্বার্থ-সাধনের ক্ষুদ্রতার দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের জীবন এবং তৎসঙ্গে অপরের জীবন ভারাক্রান্ত করে তাহা নয়, বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরও এরূপ নিম্নাভিমুখ প্রবৃত্তি দেখা যায়। আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে এমন বিভিন্ন করিয়া দেখেন যে মানুষের জীবনের আমোদ মাত্র-কেই তাঁহারা পাপ বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মকে তাঁহারা এমন রুদ্র, এমন ভয়ঙ্কর, এমন অন্ধকার বলিয়া মনে করেন যে প্রতিকুলতার পীড়নে ক্লিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ তাহা অন্তর ছাড়িয়া বাহিরের জিনিষ হইয়া উঠে!

কাউপার বলিয়াছিলেন যে, "একমাত্র দুঃখই আমাদের দুঃখ নিবারণের হেতু।" মানুষের জীবনে দুঃখ অপরি-হার্য্য, কিন্তু ছায়ার অস্তিত্ব না থাকিলে সূর্য্যালোকের অস্তিত্ব যেরূপ অসম্ভব হইত, তেমনি দুঃখের অনস্তিত্বে সৃষ্টি লুপ্ত-বর্ণ চিত্রের মত তাহার সমস্ত বৈচিত্র হইতে বঞ্চিত হইত, সন্দেহ নাই। আমাদের জীবনযাত্রা ব্যাপারটা যে অত্যন্ত দুরূহ এবং দুর্ব্বোধ্য তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনটা আমরা ভাল করিয়া কেহ জানি না এবং এই যে প্রকৃতি —বৃহৎ, বিশাল, অন্ধ, অচেতন শক্তিপূর্ণ প্রকৃতি—তাহার সহিত আমাদের পরিচয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং প্রবাসী এবং অচেনা অজানা লোকের যে ক্লেশ ভোগ তাহা আমাদের করিতে হইবেই।

অনেকে আছেন, পৃথিবীতে তাঁহাদের অস্তিত্ব লইয়া উৎকট চিন্তাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তবু আমরা ইহা বেশ অকুণ্ঠিত ভাবে বলিতে পারি যে বিদ্বান ও সৎব্যক্তিও অনেক সময়ে জাগতিক ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন, সময়ে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশও করিতে পারেন, কিন্তু যিনি একান্ত মনে আপন কর্ত্তব্য পালন করেন, তিনিই জীবনে তৃপ্ত হন। হুইটার বলিয়াছিলেন, "এই পৃথিবীর রহস্য শুধু তিনিই বুঝিতে পারেন, যিনি ঈশ্বরের মঙ্গলময় সত্তার উপরে দৃঢ় আস্থাবান।" মিলটন বলিয়াছিলেন, "প্রকৃতিকে অভিশাপ দিও না, কারণ, সে তাহার কাজ করিয়াছে, এখন তুমি তোমার কাজ কর।" বাইবেলে একটা কথা আছে যে ধ্বংসের দিকে যে পথ তাহা প্রশস্ত এবং তাহার সিংহদ্বার অবারিত, বহুসংখ্যক যাত্রী সেখানে সমাগত হয়। আর জীবনের যে পথ তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, এবং তাহার

প্রবেশ দ্বার একান্ত অপ্রশস্ত, সে খানে লোকসংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু আমি মনে করি, কথাটা ঠিক সুসঙ্গত রূপে প্রযুক্ত হয় নাই। মানিলাম, জীবনের পথ অপ্রশস্ত এবং তাহার প্রবেশদ্বার অতি সঙ্কীর্ণ, কিন্তু তাহা হইতে আমরা এই মাত্র জানিতে পারিতেছি যে তাহা প্রশস্ত নয় এবং সহজে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে সে পথ বিদ্যমান আছে, এবং তাহার বহুধাবিভক্ত শাখা বহু দিক্ দিয়া আসিয়া সেই একটি স্থানে মিলিত হইয়াছে। জাহাজ যখন সমুদ্র দিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার একটি মাত্র পথ থাকে, তাহার চারিদিক দিয়া অন্য যে সব পথ—তাহা তাহাকে বিপথে বিনাশের মুখেই লইয়া যাইবে, কখনও গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবে না, কিন্তু ইহা হইতেই এমন কিছু প্রতিপন্ন হয় না যে তাহার গন্তব্য পথ বিপথ অপেক্ষা ঝটিকাসঙ্কুল অথবা বিঘ্নপূর্ণ।

সুখ ঐশ্বর্য্যের অনুগামী নয়। বরঞ্চ বৈভবের প্রাচুর্য্য যেখানে, ধর্ম্মাচরণ ও জীবনের প্রকৃত সুখ সেখানে শোচনীয়রূপে বিরল। উচ্চপদ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান প্রত্যেকেই লাভ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকেই সৎ, উদার ও জ্ঞানী হইতে পারেন। ক্রাইসষ্টম্ বলেন, "আধুনিক সমাজের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহাকে রঙ্গমঞ্চ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মানুষের কাজ কর্ম্ম যেন অভিনয়, ঐশ্বর্য্য এবং দারিদ্র্য নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিত। এইরূপ প্রত্যেকটি বিষয়ই রঙ্গমঞ্চের এক একটি বিষয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু এই অভিনয়ের দিন যখন অতীত হইবে এবং সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যক্ত হইবে তখন প্রত্যেকের, এবং প্রত্যেকের কাজের, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। কাহারও বিষয় কর্ম্মের তখন পরীক্ষা হইবে না, কাহারও ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে না, প্রত্যেক ব্যক্তির এবং প্রত্যেকের কার্য্যের তখন পরীক্ষা হইবে।" এই পরীক্ষা, কর্ম্মের পরিমাণ অথবা চেষ্টার পরিমাণের দ্বারা হইবে না. জীবনে আমরা যাহাকে সফলতা বলিয়াছি তাহা দ্বারাও হইবে না, কেবল মাত্র আমাদের যোগ্যতার দ্বারাই তাহা হইবে, এবং আমাদের আপন বেশেই তখন আমাদের পরিচয় দিতে হইবে।

উপরে যাহা বলা গেল তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পঁহুছিতেছি যে, ধর্ম্মই লোকজীবনের সুখের ভিত্তি, অধর্ম্মই প্রকৃত আত্মবলিদান। *

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

আলোক।

আলোক! তুমি নিখিলের আনন্দ, অনন্তলীলাপূর্ণ, বৈচিত্রপূর্ণ, জীবলোকের পরমসম্পদ,—বিশ্বজগতের প্রাণ, এই মর্ত্ত্যলোকে কে তোমায় আনিল বল দেখি? নিয়তি সূত্রে ভ্রাম্যমান, বিচিত্র কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ বিরাট বিশ্বযন্ত্রে আনন্দরূপে কে তোমায় ঢালিয়া দিল বল দেখি? যখন তুমি ভুবনমোহিনী ঊষার রত্নকিরীট বিভূষিত করিয়া অনন্ত সীমাশূন্য অতলস্পর্শ অন্ধকার পারাবার ভেদ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হও, তোমার স্বর্ণ-কিরণছটায় বসুন্ধরা রঞ্জিত হইয়া উঠে। শুভ্র অঞ্চলে কাঞ্চন ঢালিয়া দিয়া ঊষাদেবী যখন জীবের দ্বারে সমাগত হন, তাহার মধুর হাস্যরাশি চরাচর-বক্ষে উছলিয়া পড়ে সেই শুভমুহূর্ত্তে তোমার অমৃতস্পর্শে নিতান্ত নিরাশ প্রাণেও কি আশার সঞ্চার হয় না? নিতান্ত দুঃখতপ্তহৃদয়েও কি আনন্দের একটি রেখা অঙ্কিত হয় না? তোমার নিকট ধনী দীন পাপী সাধুর ভেদ নাই। যে ব্যক্তি জগৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত——ঘৃণিত, পদদলিত, তোমার স্নেহবাহু তাহার জন্যও প্রসারিত। এমন সাম্যনীতি মানবের কোথায়?

মহান্ মহিমাময় দ্যুলোক ও ভূলোকের বরণীয়, আলোক-শিশুর প্রথম জন্ম, স্থিতি এবং অনন্তরূপে বিকাশ সম্বন্ধে নানাদেশে নানাপ্রকার অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ গল্প রচিত হইয়াছে। ভারতের পুরাণ ইতিহাসেও এই প্রকার অদ্ভুত চলিত গল্পের অভাব নাই। গল্প ও রূপকের মনোহর আবরণে সত্যের উজ্জ্বলদেহ আচ্ছাদন করা সকলদেশেরই অতীত ইতিহাস-লেখক—বর্ত্তমান জনসমাজের পূর্ব্বপুরুষগণের—আমোদের বিষয় ছিল। সেই রূপকের আবরণ

---

* Sir John Lubbock এর The great question শীর্ষক প্রবন্ধের মর্ম্মাশ্রিত অনুবাদ।

ভেদ করিয়া শুদ্ধ সত্যকে জনসমাজে প্রকাশিত করা মণীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষেও নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগের জ্যোতিষীগণ কল্পনার আশ্রয় ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে আলোক সম্বন্ধে যতটুকু সত্য লাভ করিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সূর্য্যের আলোক-রশ্মি সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া ধরারাণীর নয়নগোচর হয়। ঐ রশ্মিসমূহ কিরণ বা অংশুনামে অভিহিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্তই সূর্য্যের নাম সহস্র-রশ্মি বা সহস্রাংশু। মানবের দেহ রক্ষার উপযোগী যতপ্রকার বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে সূর্য্যালোকের উপকারিতা অসামান্য। সূর্য্যালোক ভিন্ন ভূমণ্ডলে আরও বহুবিধ আলোক দৃষ্ট হয়; যথা নক্ষত্রালোক, চন্দ্রালোক, তড়িতালোক, অগ্নি দ্বারা সমুৎপন্ন আলোক ইত্যাদি। উজ্জ্বল মণিসমূহ হইতে একপ্রকার আলোক নির্গত হইতে দেখা যায়। জোনাকীপোকা এবং সমুদ্রজাত কোন কোন প্রাণী হইতে একপ্রকার আলোক নিঃসৃত হয়। বিস্তৃত জলাভূমিতে, প্রান্তর মধ্যে গলিতপ্রায় কোন কোন উদ্ভিদের দেহ হইতেও একপ্রকার আলোক নিশাকালে দর্শন করা যায়; তাহা প্রকৃত আলোক না হইলেও আলোক নামেই খ্যাত।

নিবিড় বনানী সম্ভূত দাবাগ্নির বহুদূর ব্যাপী দীপ্ত আলোকরশ্মিতে এবং আগ্নেয়গিরি উদ্ভূত আলোকের কিরণ ছটায় অনেক দেশ দীপ্তিময় হইয়া থাকে। নীলাম্বুনিধির বিশালবক্ষেও স্থানে স্থানে বাড়বাগ্নি নামক একপ্রকার আলোকের উদ্ভব দর্শন করিয়া সাগরতীরবাসী এবং পোতারোহী মানবগণ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হন। কিন্তু সে সমস্ত বিষয় এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। আমরা সূর্য্যালোক সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

মানবের দৃষ্টিশক্তির অগোচর সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর যে ইথর-তরঙ্গ মহান্ ব্যোম ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, আমাদের অধিষ্ঠানভূতা বিশাল পৃথিবী অনাদিকালে একদিন যে ইথররূপী পরমাণুপুঞ্জে পরিণত ছিল, আলোক সেই ইথর-তরঙ্গের শক্তিরই অংশ মাত্র। ইথর-তরঙ্গের এই মঙ্গলময় খেলা আলোকরূপে লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া থাকে। পরমাণুপুঞ্জের স্পন্দন হেতুই যে আলোকের সৃষ্টি তাহা বিজ্ঞান অনেক দিন হইল প্রমাণ করিয়াছেন। পরমাণুপুঞ্জের এই স্পন্দন, ঘর্ষণ, ঘাত প্রতিঘাত, বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষণ ব্যাপারে কি প্রকার কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিতেছে, যুগের পর যুগ, দিনের পর দিন ভৌতিকজগতে কি প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত করিতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে জ্যোতিবিগণ সর্ব্বদাই আপনাদের অসামান্য ধীশক্তি এবং সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি সত্য জনসমাজে প্রচার করিয়া বাস্তবিকই জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের সৃষ্টি। যাহা চক্ষুর অগোচর, দুরবীক্ষণ যন্ত্রেরও অগোচর সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের গবেষণা বিশেষ দুরূহ ও আয়াসসাধ্য সন্দেহ নাই। ইথর-তরঙ্গের শক্তি, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি মনীষিগণ অন্ধ শক্তির কার্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? নানা ভাবপূর্ণ, লীলাপূর্ণ, সৌন্দর্য্যপূর্ণ, সুনিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিরাট বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্য সুধু কি অন্ধশক্তির ক্রিয়া? ইহাতে কি কোন চৈতন্যময়, মঙ্গলময় শক্তি কার্য্য করিতেছে না? সত্য সত্যই সাধকগণ প্রতি পরমাণুতে এক মহান্ চৈতন্যময় জ্ঞানময় শক্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন

মহাকায় সূর্য্যমণ্ডলের ভীষণ অগ্নিময়দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া আলোক গ্রহ, উপগ্রহ সকলের জীবনীশক্তি বিধান করিতেছে এবং নানাপ্রকারে তাহাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে। মার্ত্তণ্ডমণ্ডল হইতে আলোকমালা প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল ধাবিত হইয়া ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড সময়ে ধরণী রাজ্যে পঁহুছিয়া থাকে।

আপনার ভীষণ-দর্শন দেহস্থিত প্রচণ্ড প্রলয়রূপী অগ্নিরাশিতে অহর্নিশি দগ্ধীভূত হইয়া অংশুমালী সূর্য্য অবিরত সৌরজগতে আলোক বিকীরণ করিতেছেন। জ্যোতিবিগণ সেই প্রলয়রূপী সূর্য্যকিরণের উত্তাপ সম্বন্ধে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে সূর্য্যের তাপের পরিমাণ ছয় হাজার (৬০০০) ডিগ্রিরও অধিক। কেহ কেহ বা

ঠিক ছয় হাজার ডিগ্রি বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভূমণ্ডল হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহত্তর, প্রকাণ্ডকায়, মার্ত্তণ্ড-দেব অনেকগুলি গ্রহ উপগ্রহে পরিবৃত হইয়া অবিশ্রান্ত ছুটিতেছেন। আপনার কক্ষপথে আবর্ত্তন করিতে করিতে ভীমবেগে (সেই ভ্রমণবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় ত্রয়োদশ মাইল) অভিজিৎ নামক মহালোক লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতেছেন। সে সমস্ত বিষয় এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। আমরা অন্ত প্রবন্ধে সূর্য্যমণ্ডল সম্বন্ধে দু এক কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

রবিমণ্ডলের ভ্রমণবেগের সহিত আলোকরাশি গ্রহ উপগ্রহে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। প্রতিদিন যে পরিমাণ আলোকরশ্মি অবিশ্রান্ত সৌরজগতে বিতরিত হইতেছে তাহার অতি সামান্য অংশই বসুধাবাসী জীবগণ লাভ করিয়া থাকেন। সূর্য্য কতকাল এই আলোক বিতরণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, আর কত কালই বা থাকিবেন তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত।

নীল, পীত, লোহিত, হরিত, অতি পাটল, বেগুণে, গাঢ় ধূমল এই সপ্তবিধ পরম রমণীয় মূল বর্ণ আলোক রশ্মিতে দৃষ্ট হয়। বর্ণ সমূহের রাসায়নিক সংমিশ্রণ জন্ত সূর্য্যালোককে বর্ণহীন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। রাসায়নিক সংমিশ্রণরূপ মহাবিধানে শুধু আলোক-নিহিত বর্ণ সমূহ কেন, অনেক বস্তুই সম্পূর্ণ রূপান্তর হইয়া থাকে। বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল উদ্দেশ্যে, বিশ্ববিধাতার আদেশে প্রকৃতি এই কার্য্যভার (আলোক বিশ্লেষণ, সংমিশ্রণ কখন বা সম্পূর্ণ রূপান্তর করণ) গ্রহণ করিয়াছেন।

পৃথিবীর নানাস্থানের বৈজ্ঞানিক মনীষিগণ সূর্য্য-কিরণ বিশ্লেষণ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। রশ্মি বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা অতি সহজেই বর্ণ সকলের পৃথক পৃথক কার্য্যকারিতা দর্শন করিতে পারেন। এই আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র মানব-প্রতিভার এক অভাবনীয় কীর্ত্তি। কি অতি দূরস্থিত নভোবিহারী নক্ষত্রপুঞ্জ, কি ছায়াপথবর্ত্তী নক্ষত্র, কি ততোধিক দূরবর্ত্তী ধূমপুঞ্জবৎ নীহারিকা, কি সূর্য্যমণ্ডল এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সকল, জ্যোতিবিগণ রশ্মি-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়াও সমস্তই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্টভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা বর্ণ-পরীক্ষার যন্ত্রবলে জ্যোতিষ্ক-রাজ্যের নিত্য নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন।

ত্রিকোণ বিশিষ্ট কাচখণ্ডের সহায়তায় আমরাও মার্ত্তণ্ড-কিরণের বর্ণসমূহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবলোকন করিতে পারি।

সুদূর নীলাম্বরপ্রান্তে দিগন্ত প্রসারিত রামধনুর উদয় কি মনোরম! তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে সপ্তবিধ বর্ণের সমাবেশ কেমন নয়নের তৃপ্তিকর! প্রকৃতি দেবী যেন দিগঙ্গনাকে বিচিত্র বর্ণের রত্নভূষণে বিভূষিতা করিয়া দেন। বৃষ্টিবিন্দু সমূহে বিপরীতবর্ত্তী সূর্য্য-রশ্মি প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই রামধনুর উৎপত্তি, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কাচখণ্ডের ন্যায় জলবিন্দুরও আলোক বিভাগ করিবার শক্তি আছে; তাহাতেই ঐ সকল বর্ণ স্বতন্ত্ররূপে লোক-নয়নের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ধরণী-রাজ্যে রবিকিরণ-সম্ভূত এই সপ্তবিধ মূল বর্ণের কি সুন্দর বিশ্লেষণ! বর্ণ সমূহের নানারূপ রাসায়নিক সংযোগে প্রকৃতি বক্ষে অশেষ প্রকার নয়ন-বিনোদন মানস লোভনীয় বর্ণের সমুদ্ভব হইয়া থাকে। এই অতি সুন্দর বর্ণ-সন্নিবেশ নিবন্ধন প্রাকৃতিক চিত্র পটের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় হৃদয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। নানা বর্ণের জলদ-বিমণ্ডিত গগনমণ্ডল, কি শ্যামল শাখা-পত্র-পল্লবে পরিশোভিত বৃক্ষলতা গুল্ম বল্লরী,—কি স্তবকে স্তবকে শ্বেত পীত, নীল, লোহিত এবং আরও নানা বর্ণের পুষ্পরাশি, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কি অনুভব করি? যেন শিল্পীর মঙ্গল হস্ত প্রত্যক্ষ ভাবে এই বর্ণ সন্নিবেশ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ধন্য সেই অচিন্ত্যশক্তি দেব দেবের রচনা-কৌশল ও শিল্প-নৈপুণ্য! সর্ব্বত্র তিনি নানা বর্ণ কেমন আশ্চর্য্যরূপে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন—প্রকৃতির ভাণ্ডার কি অপরূপ শোভা ও মাধুর্য্যের আধার করিয়া দিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতেও হৃদয় স্তব্ধ হইয়া যায়। আলোকের বর্ণ সকল নৈসর্গিক নিয়মে কেমন বিবিধ প্রকারে নানা রঙ্গে প্রকৃতিরাজ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে তাহা ধারণা করা ক্ষুদ্র জীবের সাধ্য নয়।

নীল পীত হরিত প্রভৃতি যতপ্রকার বর্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশ অবলোকন করা যায় তন্মধ্যে পরম মনোরম হরিৎই সর্ব্বপ্রধান; ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র হরিৎ বর্ণেরই প্রাধান্য দর্শন করা যায়। পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে হরিৎবর্ণ স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা উপকারী এবং হরিৎ ও নীলবর্ণ দৃষ্টিশক্তি রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জীবের কল্যাণের জন্যই পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর সৃষ্ট পদার্থে হরিৎ ও নীল বর্ণের আধিক্য প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ডাক্তার ফিন্সেন্ প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ আলোক চিকিৎসায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অসাধারণ মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ রশ্মি-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্য-কিরণের বর্ণ সমূহ স্বতন্ত্রীভূত করিয়া প্রতীচ্য জগতে চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। অনেক দুশ্চিকিৎস্য কঠিন ব্যাধি তাঁহারা আলোক চিকিৎসা দ্বারা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, মৃত্যুর করাল গ্রাসে সমুদ্যত কত অমূল্য জীবন আলোক-চিকিৎসা দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রখর মার্ত্তণ্ড-রশ্মি-নিহিত নীল, বেগুনে ও হরিত বর্ণ বিবিধ বিষাক্ত বীজ নষ্ট করিবার পক্ষে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ আলোক-রশ্মি হইতে আবশ্যক মত বিভিন্ন বর্ণ সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকেন। মানব বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজ আয়ত্তাধীনে নিযুক্ত করিতেছেন। আমেরিকার জল চিকিৎসার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। আলোক চিকিৎসা তদপেক্ষাও বিস্ময়কর।

ডাক্তার এরিকসন্, অধ্যাপক ক্রাঙ্ক ওমনি প্রভৃতি মণীষিগণ বিজ্ঞানের অদ্ভুত গবেষণা বলে আলোকের কি প্রকার কার্য্যকারিতা মানব সমাজে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা উৎপন্ন তাপে যে প্রকার যন্ত্রাদি পরিচালিত হইয়া থাকে, প্রখর মার্ত্তণ্ড-কর সংগৃহীত হইলেও সেই প্রকার কার্য্য হইতে পারে; যন্ত্র সাহায্যে সূর্য্যকিরণ সংগ্রহ করিয়া অনায়াসেই পোত প্রভৃতি পরিচালিত করিতে পারা যায়; তাঁহারা অলৌকিক প্রতিভাবলে কয়েকটি সূর্য্যকর-চালিত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া নিঃসংশয়ে জনসমাজে এই তথ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কয়েক গজ পরিমিত স্থানের রবিকর একত্র করিলে সেই শক্তি নিয়োগে একখানা অর্ণবযান অনায়াসেই পরিচালিত হইতে পারে। সমগ্র পৃথিবীতে তরণী, বাষ্পীয়যান ও অন্যান্য কল কারখানায় প্রায় আশী কোটি টন (প্রত্যেক টন প্রায় ২৭ মন) কয়লা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সাহারা মরুতে যে পরিমাণ সূর্য্যরশ্মি এক বৎসরে ব্যয়িত হয় তাহা সংগৃহীত হইলে সেই শক্তি, পূর্ব্বোক্ত কয়লা রাশির সমতুল্য কার্য্যকর হইবে।

অনেকে আশঙ্কা করেন, পৃথিবীর কয়লা রাশি যে প্রকার দ্রুত ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে যুগ যুগান্তর পরে এককালে নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা। কতকালে সমস্ত কয়লা রাশি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইবে পণ্ডিতগণ তাহার গণনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তখন পৃথিবীর সভ্যজগতের দশা কি হইবে? বাণিজ্য প্রভৃতি কি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে? এই চিন্তায় অনেকে এখনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু গ্রহরাজ সূর্য্য আলোক দানে কখনই কৃপন নহেন। বিজ্ঞান যে প্রকার অপ্রতিহত প্রভাবে পৃথিবীতে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহাতে কয়লার অভাব সূর্য্যালোকেই পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

বৃক্ষলতা, গুল্ম ও শস্য প্রভৃতির জীবনী শক্তি বিধান সম্বন্ধে সূর্য্যালোকের কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। যে শস্য দ্বারা বিশ্বব্যাপী জীবগণের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে, যে শস্যপুঞ্জ সংসারে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধির মূলীভূত, সূর্য্যালোকই তাহার প্রাণ স্বরূপ।

পানীয় জলের উপর সূর্য্যালোকের ক্রিয়া আশ্চর্য্যজনক। সূর্য্যালোক নানারূপ জীবাণু ধ্বংশ করিয়া জল বিশুদ্ধ করে। বিবিধ প্রকার বর্ণের কাচ পাত্রে পানীয় জল

রাখিয়া সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত করিলে বিভিন্ন শ্রেণীর রোগ আরাম হইয়া থাকে ; ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। আর্দ্র স্থান শুষ্ক করিয়া ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট করিতে সূর্য্যালোকের শক্তি অসাধারণ।

সূর্য্যকিরণ দ্বারা চন্দ্র আলোকিত হয় তাহাতেই আমরা হৃদয় মনের আনন্দকর এমন শোভাময় চন্দ্রিকা সম্পদের অধিকারী এ কথা কাহার অবিদিত? সর্ব্বপ্রকার আলোকের মূল সবিতা। যিনি সবিতার সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাকে শত সহস্র নমস্কার।

শ্রীকুমুদিনী বসু। *

সোনাবিবি।

মোগল সম্রাট আকবর শাহ সমগ্র বাঙ্গলার শাসন-সৌকার্য্যার্থে "বার ভূঞা" নামক সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ জন ভূম্যধিকারীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই সকল ভূম্যধিকারী বাঙ্গলা দেশ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন-পাশ হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অপরিমিত শৌর্য্য-বীর্য্যে ও অনুপমেয় স্বদেশ-প্রীতিতে যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য একদিকে যেরূপ পশ্চিম বাঙ্গলা প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেরূপ শ্রীপুররাজ মহামতি কেদার রায় স্বাধীনতার অমৃত-বাণী শুনাইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গলা অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যদি এই সময়ে বাঙ্গলার ভূম্যধিকারীগণ ঈর্ষায় ও যশোলিপ্সায় পরস্পর আত্ম-কলহে বলক্ষয় না করিতেন, তবে হয়ত বাঙ্গলার ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হইত।

এই প্রবন্ধের শিরোনামায় যে রমণীর নাম লিখিত হইল, তিনি চিরস্মরণীয় চাঁদরায় ও কেদার রায়ের ভগিনী, তাহার নাম স্বর্ণময়ী, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে সোনামণি বলিয়া ডাকিত। তিনি অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। বাল-বিধবা ছিলেন বলিয়া পিতৃ-গৃহেই বাস করিতেন। এই মনোরমা রমণীর রূপ-বহ্নিতেই বাঙ্গলার আশা ভস্মীভূত হইল।

একদা সুবর্ণগ্রামাধিপতি ঈশা খাঁ মসনদ আলি শ্রীপুরে বন্ধুপ্রবর কেদার রায়ের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। মহামতি কেদার রায়ও এই মুসলমান বন্ধুর প্রতি রাজোচিত সম্মান ও আতিথ্য সৎকারে কৃপণতা প্রকাশ করিলেন না। ঘটনাচক্রে এই সময়ে স্বর্ণময়ী ঈশা খাঁর নয়নে পতিত হইলেন। কিয়দ্দিবস শ্রীপুরে অবস্থান করিয়া ঈশা খাঁ আপনার রাজধানী খিজিরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। খিজিরপুরে আসিয়াও রূপ-ললামভূতা স্বর্ণময়ীকে ভুলিতে পারেন নাই। স্বর্ণময়ীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তিনি একজন দূত শ্রীপুরে প্রেরণ করিলেন। মুসলমান-বীর ঈশা খাঁ বুঝিতে পারেন নাই, যে তাঁহার এই আচরণে ধর্ম্মপ্রাণ চাঁদ ও কেদার রায় কিরূপ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইলেন। ঈশা খাঁর প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যাত হইল। শ্রীপুরেশ্বর আপনাকে ইহাতে অবজ্ঞাত ও অবমানিত মনে করিয়া ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেই দিন হইতেই হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গালায় স্বাধীনতা স্থাপনের ইচ্ছা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল। কেদার রায় প্রথম আক্রমণেই কলাগেছের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ বিধ্বস্ত করিলেন। অতঃপর ঈশা খাঁ ত্রিবেণীর সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কেদার রায় ঈশা খাঁর রাজধানী খিজিরপুর লুণ্ঠন করিলেন এবং ত্রিবেণীর দুর্গ অবরোধ করিলেন। সকলেই মনে মনে ভাবিলেন, এইবার সুবর্ণগ্রাম বিক্রমপুরাধিপতির করতলগত হইবে।

এই সময়ে বাঙ্গলার রাজনৈতিক-গগনে দুইটী ধূমকেতুর উদয় হইল। একজন ভবানন্দ মজুমদার, তিনি যশোরের প্রতাপাদিত্যের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াও তাঁহার সর্ব্বনাশের উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। অন্যজন শ্রীমন্ত খাঁ, তিনি কেদার রায়ের একজন অমাত্য ছিলেন। কোন সময়ে একটী সামাজিক বিষয় লইয়া কেদার রায়ের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটে এবং ইহাতে আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত জ্ঞান করিয়া শ্রীমন্ত খাঁ

---

* অগ্রহায়ণের ভারত মহিলাতে প্রকাশিত "ছায়াপথ" নামক [illegible] ইহার ই লিখিত, ভুলক্রমে কুমুদিনী বসু স্থলে কুমুদিনী মিত্র হইয়াছিল—ভাঃ মাঃ বঃ।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে সুযোগ খুঁজিতে-ছিলেন।

শ্রীমন্ত খাঁ কেদার রায় ও ঈশা খাঁর কলহ সুযোগে আপনার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে কৃতসংকল্প হইল। ঈশা খাঁর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া সোনামণিকে তাঁহার হস্তে সমর্পন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ঈশা খাঁ আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কার্য্য সফল হইলে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। এতদিন শ্রীমন্ত খাঁ চাঁদ ও কেদার রায়ের সহিত খিজিরপুরেই ছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের পর তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে শ্রীপুরে আসিয়া প্রচার করিলেন যে চাঁদরায় ও কেদার রায় শত্রুহস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছেন। ঈশা খাঁ শীঘ্রই শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া সোনামণিকে হস্তগত করিবে। পুর-স্ত্রীগণ ইহাতে বড়ই আশঙ্কা-যুক্ত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী রঘুনন্দনের আপত্তি সত্ত্বেও, শ্রীমন্তের প্ররোচনায় সোনামণিকে তাঁহার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। ক্রূর, বিশ্বাস-ঘাতক শ্রীমন্তই সোনামণির পরিরক্ষক হইয়া চলিলেন, এবং অচিরেই সোনামণি সুবর্ণগ্রামে ঈশা খাঁর নিকট নীত হইলেন। ঈশা খাঁ মুসলমান রীত্যনুসারে সোনামণিকে বিবাহ করিলেন। সোনামণি এখন হইতে বিবি "আলিনেয়ামত" এই মুসলমানী নামে অভিহিত হইলেন। কিন্তু সাধারণ্যে, তিনি সোনাবিবি নামেই প্রসিদ্ধা হইয়া রহিলেন। এইরূপ মিলন আপাততঃ হিন্দুচক্ষে বিসদৃশ ও ধর্ম্মহানিকর হইলেও, উত্তরকালে বড়ই মঙ্গলপ্রদ হইয়াছিল। ঈশা খাঁর পিতা কালীদাস গজদানী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, এক মুসলমান যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করেন এবং এই বিবাহের সন্তান ঈশা খাঁ। ঈশা খাঁ ও সোনাবিবি মুসা খাঁ ও মহম্মদ খাঁ নামে দুইটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই জমিদার বংশ এখন ময়মনসিংহের অন্তর্গত হয়বতনগরে বাস করেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে যে পরিমাণ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তত্তুল্য কোন হিন্দু জমিদার দান করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

সোনামণির হরণের পর চাঁদরায় অনশনে থাকিয়া দশবিস্তার মন্দিরে "হত্যা দিলেন।" দৈববাণী হইল, "সোনামণির জন্য আর শোণিতপাত করিও না।" ধর্ম্ম-প্রাণ রাজাগণ দেবীর আদেশ মান্য করিয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন।

এদিকে সোনাবিবিকে পাইয়া ঈশা খাঁ বিপুল উৎসাহ সহকারে আপনার অধিকৃত ভূভাগ শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে কেদার রায়, পর্ত্তুগীজ দস্যু ও মগগণ ঈশা খাঁর রাজ্য লুঠ করিয়া দখল করিতে লাগিল। সোনাবিবি হাজিগঞ্জের দুর্গে থাকিয়া কিছুদিন মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়া বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার মৌলিক।

সাহিত্যের শক্তি।

সমাজের প্রতিবিম্ব যে সাহিত্যে পড়ে, সে বিষয়ে আর আজকাল কেহ সন্দেহ করেন না। সাহিত্য সমকালীন রীতি, নীতি, সামাজিক উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্ম্মের এমন জীবন্ত চিত্র যে ইহা হইতে প্রাচীন কালের সমাজ-চিত্র আমরা অনেক পরিমাণে উদ্ধার করিতে পারি। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে ভারতের সাহিত্যই ভারতের প্রধান ইতিহাস। ইহাতে রাজা ও রাজবংশের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু সামাজিক উন্নতি ও অবনতির জীবন্ত চিত্র প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কিন্তু সমাজের ছায়া যতটা সাহিত্যে পড়ে, তাহা অপেক্ষা সাহিত্য সমাজ গঠন ও উন্নতির অধিক সাহায্য করে। মানবশিশুর শিক্ষার যত উপাদান আছে, জাতীয় সাহিত্য তাহার মধ্যে একটি প্রধান উপায়। প্রত্যক্ষ-ভাবে সে ইহা হইতে শিক্ষা করে এবং সমাজের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে ইহা তাহার উপর কাজ করে। সাহিত্যের এই শক্তির বিষয় এ প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

মানবজীবনে সমাজ যে কি উপকারী তাহার আর বিশেষ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস না করিলে সকল শক্তি থাকা সত্ত্বেও মানব চতুর পশু

অপেক্ষা উন্নত হইত না। প্রেম, নীতি, ভাষা, এমন কি কোন জ্ঞানই তাহার মধ্যে পরিস্ফুট হইত না। কিন্তু এই প্রেমকে প্রসারিত করিতে হইলে, নীতি ও জ্ঞান উন্নত করিতে হইলে,—এক কথায় মানবকে উন্নত ও সভ্য করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের একান্ত আবশ্যক।

বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমরা কোন সাহিত্যবিহীন অসভ্য জাতির কল্পনা করি। এই অসভ্য-জাতির ভাষা আছে,তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিতে জানে, নীতিজ্ঞানও কিয়ৎপরিমাণে দেখা যায়, কিন্তু ইহারা দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে অসভ্য অবস্থায় ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে। উন্নতি ও সভ্যতা, নীতি ও ধর্ম্মের উত্থান পতন ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। কেন ইহারা এরূপ উন্নতিবিমুখ, তাহার তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, প্রাচীন কালের সহিত এই জাতির কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য সভ্যতা —যাহা বহু যুগের ভূয়োদর্শনের ফল, তাহা ইহাদিগের মধ্যে দুর্ল্লভ। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের যেমন অতীতের সহিত সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ ভবিষ্যতের সহিতও ইহাদের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। অতীতের দৃষ্টাণ্ডই প্রধানতঃ ভবিষ্যৎবিষয়ে চিন্তা আনয়ন করে এবং যে জাতি কেবল বর্ত্তমান অভাব ও তৃপ্তি লইয়া ব্যস্ত, তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ ইহাদিগের মধ্যে একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যে তাহারা শারীরিক বৃত্তিগুলির অনুশীলনেই দিবারাত্রি ব্যস্ত রহিয়াছে। যুদ্ধ, প্রতিহিংসা, নৃত্য, গীত, আহার ও মদ্যপান এইগুলিই তাহাদের জীবনের কার্য্য। এইগুলি মানুষের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রবল। যদি আমরা এগুলিকে সংযত ও মার্জ্জিত না করি, তবে এইগুলি আমাদের উন্নত বৃত্তিসমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলে, কিছুতেই বৃদ্ধি হইতে দেয় না। যেমন ভাল গাছের চারাটিকে আগাছায় চাপিয়া রাখে, কিছুতেই বাড়িতে দেয় না, এই হীন বৃত্তিগুলিও সৎবৃত্তি-গুলিকে তেমনি করিয়া চাপিয়া রাখে। এদিকে যে অনুশীলনের আবশ্যক তাহাও তাহারা করে না। এইজন্য সভ্যতার যে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য মানবের সম্ভাবগুলির বিকাশ করা, তাহা ইহাদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না।

এ দিকে যে জাতির প্রাচীন সাহিত্য রহিয়াছে তাহার বহু শতাব্দীর জ্ঞান তাহার সেই সাহিত্যের মধ্যে লিখিত আছে। সে সমাজের বালকেরা প্রাচীন কাহিনী শুনিয়া প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিতে চাহে। যে সকল ব্যবহার বা বিশ্বাস অপরের নিকট অতি কঠিন বলিয়া মনে হয়, তাহার নিকট তাহা সহজজ্ঞানলব্ধ সাহিত্যের ন্যায় স্বাভাবিক। বয়োবৃদ্ধির সহিত একদিকে যেমন তাহার ভূয়োদর্শন বাড়িতে থাকে, অপর দিকে সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া বহু যুগের চিন্তা ও জ্ঞান সে লাভ করে। ইহা হইতে সৎবিষয়ের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিয়া সে যেমন মোহিত হয়, সেইরূপ প্রবৃত্তি প্রাবল্যের কি যে বিষময় ফল তাহা দেখিয়া প্রবৃত্তি দমন করিতে শিক্ষা করে। জাতির অতীত আশা, আকাজ্ক্ষা এবং গৌরব তাহার রক্তমাংসের সহিত একীভূত হইয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা যে সকল গুণের প্রশংসা করিয়াছেন সে তাহা পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। এবং অতীত ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ফুটিয়াছিল তাহার পক্ষে তাহার তুলনা করা অতি সহজ হয়। এই রূপে তাহার জীবন উন্নত হইতে থাকে। অতএব সাহিত্য জাতির মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা আনয়ন করিবার একটি প্রধান উপায়। এই জন্যই দেখি যে সভ্যতা ও জাতীয় সাহিত্য এক সুদৃঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ। জগতে যে জাতি আজ সভ্য তাহারই একটি উন্নত জাতীয় সাহিত্য রহিয়াছে।

ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্রীস দেশে হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসির মত পুস্তক আর নাই। এই দুই পুস্তকের বীরত্ব বর্ণনা গ্রীকদিগকে চিরদিন উৎসাহ দিয়াছে এবং জগতের মধ্যে তাহাদিগকে এক সময়ে শ্রেষ্ঠ বীর করিয়া তুলিয়াছিল। ফরাসী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ফ্রান্সে সাহিত্য যে কি কাজ করিয়াছে তাহা শিক্ষিত সমাজেরঅবিদিত নাই। ফ্রান্সে পূর্ব্বে জমীদার ও পুরোহিতেরা অতিশয় শক্তিশালী ও রাজার বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। তাহাদের কোন কর দিতে হইত না, এবং তাহারা অতি সুখে ও আমোদে কালহরণ করিতেন। রাজা অকর্ম্মণ্য ও অত্যাচারী এবং অতিশয় অপব্যয়ী ছিলেন। ইহাদের সমস্ত ব্যয় নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের যোগাইতে হইত। এমন সময়ে কতকগুলি পণ্ডিত লোক জনসাধারণের

শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলেন, এবং একদিকে যেমন নানাবিষয়ের শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন, অপর দিকে সমাজের মূলভিত্তি আলোচনা করিয়া তৎকালীন সমাজ-বন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন। মানবের সাম্য এবং রাজ্যে প্রত্যেকের সমান অধিকার প্রচার করিয়া সমস্ত ফরাসি-রাজ্যে তাঁহারা এক বিপ্লব তুলিয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ ভলটেয়ার, রুসো ও বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ যাহা করিয়াছেন তাহা না করিলে ফরাসী বিপ্লব হইতে পারিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ফরাসী জাতিকে স্বাধীনতালাভের জন্য হয়ত আরও কতকাল বসিয়া থাকিতে হইত। আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে শ্রীমতী ষ্টো প্রণীত "টমকাকার কুটীর" কি করিয়াছে তাহা অনেকেই জানেন। বোধ হয় দাসত্ব প্রথার উপর শেষ আঘাত এই উপন্যাস খানিই দিয়াছে। তিনি দাস ব্যবসায়িদিগের ভীষণ চিত্র, দাসদিগের প্রতি অত্যাচার কাহিনী উজ্জ্বল ও জীবন্তভাবে বর্ণনা করিয়া এই প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বিদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া এই ভারতবর্ষে সাহিত্যের শক্তির বিষয় আলোচনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঋগ্বেদের সময় সামাজিক শক্তি কতদূর বিকশিত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মহাভারত ও রামায়ণের শিক্ষা হিন্দু চরিত্রে অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে! হিন্দুসমাজের পারিবারিক সম্বন্ধ ও রীতিগুলির বিশেষত্ব আছে। এখানে সন্তানেরা পিতামাতাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় করে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য; স্ত্রী স্বামীর একান্ত বশীভূতা এবং সতীত্বের আদর এদেশের মত আর কোন্ দেশে আছে? ইহার মূল কারণ রামায়ণ ও মহাভারতে দেখিতে পাই। রামের পিতৃভক্তি, ভীমার্জ্জুন ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, এবং সীতার অবিচলিত পতিভক্তিই ইহার মূল কারণ। গৃহে গৃহে মহাভারত ও রামায়ণের কথা অধীত হয়, কথকেরা রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যায়িকা নানা বর্ণে প্রতিফলিত করিয়া বর্ণনা করেন—এই জন্য ইহার শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি হিন্দুর রক্তমাংসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আবার ইহার দোষগুলিও হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পিতামাতার সন্তানের উপর অসীম অধিকার রহিয়াছে; এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি যথেচ্ছব্যবহার করিতে পারেন। তাহার আর প্রতীকার নাই। দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ার পণ রাখিয়াছিলেন এবং রাম সীতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলে নাই। আরও দেখা যায় যে, প্রাচীন হিন্দু ও রাজপুত রাজা শক্তিশালী হইলেই ভারতের অপরাপর রাজ্য জয় করা, রাম ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন রাজাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সে রাজ্যের রাজবংশ লোপ করা তাহাদিগের লক্ষ্য ছিল না। কেবল করগ্রহণ পর্য্যন্তই জয়ের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই ভারত এখন পর্য্যন্তও একজাতি, একভাষী হইতে পারিতেছে না।

মহাভারত ও রামায়ণে দেখিতে পাই যে, প্রজারঞ্জন করাই রাজা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। রাম এই জন্য নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সীতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন আর্ত্ত প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় দ্বাদশবর্ষের জন্য বন গমন করিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দুরাজাদিগের ইতিহাসে কোন রাজা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন এরূপ পাঠ করা যায় না। অপরাপর দেশে এইরূপ অত্যাচারের শত শত দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতে তাহা ছিল না। বরং দেশে যখন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইত, রাজার মনে করিতেন যে ইহার জন্য তাঁহারাই দায়ী। রাজাদিগের আদর্শ ছিল, প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় পালন করা। এদিকে প্রজাগণও রাজাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। হিন্দুরাজত্বে কোনদিন প্রজাবিদ্রোহ দেখিতে পাই না। ইহার মূলও কি মহাভারত ও রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না? রাজা ও প্রজার এরূপ সম্বন্ধ আর কোন দেশে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী।

পুরাতন প্রাণ ।

১

কোথা সেই পুরাতন প্রাণ—
খুঁজিলাম কত ঠাঁই,
আর তারে নাহি পাই.
অলক্ষিতে হয়ে গেল হোমাগ্নি নির্ব্বাণ
কোনখানে হারাইনু পুরাতন প্রাণ ?

২

কোথা সেই পুরাতন প্রাণ—
সরল বিশ্বাস পূর্ণ,
কুটিলতা পরিশূন্য,
স্বার্থের পঙ্কিল বায়ু করে নাই ম্লান,
কোথা হারাইনু সেই পুরাতন প্রাণ ?

৩

কোথা সেই পুরাতন প্রাণ—
সে সৌহার্দ্দ আত্মত্যাগী,
অকপট অনুরাগী,
পরের মঙ্গল আশে সাধি আত্মদান,
কোথা হারাইনু সেই পুরাতন প্রাণ ?

৪

কোথা সেই পুরাতন প্রাণ—
উদার সমস্ত ধরা,
আনন্দ আরাম ভরা,
বিশ্বাস করুণা প্রীতি সমুদ্র সমান,
কোথা হারাইনু সেই পুরাতন প্রাণ ?

৫

কোথা সেই পুরাতন প্রাণ—
চাহিতে চাঁদের পানে,
কত কি জাগিল প্রাণে,
কি দেখিছ সুধানিধি—ভেঙেছে সে গান,
আজ আর নাহি সেই পুরাতন প্রাণ !

৬

কোথা সেই পুরাতন প্রাণ—
তুমি তো দেখেছ শশী,
মুক্ত বাতায়নে বসি,
জাগ্রত স্বপনে সেই নিশা অবসান,
কল্প লতা কল্পনার,
"অদেয়" ছিলনা আর,
আমরি, আনন্দ নদে উচ্ছসিত "বান"
আজি হারায়েছি সেই পুরাতন প্রাণ !

৭

কোথা সেই পুরাতন প্রাণ—
যখন বিহঙ্গ গীতি,
জাগায় সেকেলে স্মৃতি,
সরমে মরমে ভাঙি হয়ে শতখান ;
অম্বরে অম্বুদ যবে,
সম্ভাষে ভৈরব রবে,
মনে ভাবি এ অধমে কেন এ সম্মান,
আজি আর নাহি সেই পুরাতন প্রাণ!

৮

কোথা সেই পুরাতন প্রাণ !—
তপন ! তরুণ আলো,
ফুলে ফুলে যবে ঢাল,
তাহারা সৌরভ হাসি দিতে আসে দান ।
তখন নয়নে জল,
উছলয়ে ছল ছল,
মনে পড়ে—জনমের মহা অপমান,
সবি আছে, নাহি মোর পুরাতন প্রাণ !

৯

কত খুঁজিয়াছি তোমা পুরাতন প্রাণ,
যেখানে করুণা প্রীতি,
যেখানে মঙ্গল স্মৃতি,
যেখানে আনন্দ শুভ আরাম কল্যাণ,
তোমায় পাইব আশে,
ছুটে গেছি ঊর্দ্ধশ্বাসে,
ফিরিয়াছি প্রবঞ্চিত দীন হীন ম্লান !
কোন খানে গেলে তুমি পুরাতন প্রাণ ?

১০

কোন খানে গেলে তুমি পুরাতন প্রাণ,
কোথা তুমি হে আরাধ্য,
শত জনমের সাধ্য,
বিশুদ্ধ বিশুভ্র সুখী, বিধাতার দান,

পাইয়া দেখিনি হায়,
তাই বুঝি দ'লি পায়,
অলক্ষিতে হয়ে গেল হোমাগ্নি-নির্ব্বাণ।
যাহা কিছু রত্ন ধন
চলি গেছে সেইক্ষণ—
সেই শক্তি ভক্তি সেই পরে আত্মদান,
উদারতা সরলতা,
আজি তো কথার কথা,
হয়েছে তোমার সাথে সবি অন্তর্দ্ধান।
এবে আর কিবা ক'ব,
কেমনে এমন র'ব,
কোথা অনাথের নাথ দেব ভগবান,
তুমি দাও নব প্রাণে আরাম কল্যাণ।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী

আমাদের শিশু

আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যদিও বর্ত্তমান প্রবন্ধের নাম 'আমাদের শিশু' রাখা হইল তথাপি ইহার প্রকৃত নামকরণ করা উচিত ছিল "তাঁহাদের (ইংরেজদের) শিশু।" কারণ শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ নির্ণয় এবং তাহা নিবারণের জন্য কি করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাঙ্গালী জনক জননীর হৃদয় অপত্য স্নেহে পরিপূর্ণ হইলেও তাঁহারা এ বিষয়ে তেমন চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গবাসী, "আমরা নেহাৎ গরীব নেহাৎ ছোট, তবু আছি সাত কোটী ভাই জেগে উঠ" বলিয়া গৌরব করিলেও জাতীয় ধ্বংসের কারণ স্বরূপ এই গুরুতর প্রশ্ন তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে যাঁহারা জাতীয় উন্নতির জন্য ভাবেন, জাতীয় অবনতির ক্ষুদ্রতম কারণটা পর্য্যন্ত যাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, সেই ইংরেজ জাতির সাহায্য লইতে হইবে। কোন বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক বলেন, শিশুদের অকাল মৃত্যুরূপ জাতিধ্বংসকারী গুরুতর বিপদের প্রতিকারের নিমিত্ত প্রত্যেক ইংরেজ নরনারীর সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। গ্রীস এবং রোম উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াও এখন জগতের একটী পতিত জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে; জন সংখ্যার হ্রাসই তাহার কারণ। ইংলণ্ড যতই সমৃদ্ধিশালিনী হউক না কেন শিশুদিগকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে তাহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে।" ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং প্রভুত্বে পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ জাতিই যদি একথা বলিতে পারেন, তবে শুধু লোকবলের গৌরবকারী আমাদের তো কথাই নাই। একটী শিশুর মৃত্যু যে তাহার পিতা মাতারই ক্ষতি তাহা নহে, উহা সমগ্র জাতির পক্ষে একটী অমঙ্গলজনক ঘটনা বলিয়া মনে করা উচিত। সমস্ত ভারতবাসীর একটী বৃহৎ পরিবাররূপে শিশুদিগকে সম্ভবমত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। শুধু তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়া ডাল পাতার সিপাহীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে চলিবে না। স্বাস্থ্য, জ্ঞান এবং চরিত্রে যাহাতে তাহারা মানুষের মত মানুষ হইতে পারে সে সম্বন্ধে সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। অভিজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিতগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর গড়ে যত লোকের মৃত্যু হয় তন্মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশই এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশু, এবং ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ শুধু পিতা মাতার দোষেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়; উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহাদের প্রতি সাত জনের মধ্যে একজন এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যদি ইতর প্রাণীদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যার এরূপ আধিক্য হইত, তবে পশুর অভাবে কৃষকের কৃষিকার্য্য চালান একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িত। মানব, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনরূপ অপরাধে কিরূপ অপরাধী এবং এবিষয়ে ইতরপ্রাণী মানুষ অপেক্ষা কত উন্নত তাহা ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে বন্য পশু পক্ষীদের মধ্যে অকালমৃত্যু নাই বলিলেই হয়, গৃহপালিত পশ্বাদীর

মধ্যে ও পাখীদের মধ্যে শতকরা দুইটী, মেষশাবকদের মধ্যে তিনটী, গাভীদের মধ্যে চারিটী এবং অশ্বদের মধ্যে আটটী মাত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাও মানবের প্রতিপালন দোষে। কিন্তু মানবশিশু সকলকেই ছাড়াইয়াছে। উহাদের মৃত্যুসংখ্যা শতকরা পনের জনের কম নহে। ইহা অবশ্যই ইংলণ্ডের হিসাব, আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আরও বেশী। জীবন রক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম পালন করা আবশ্যক তাহার লঙ্ঘনই এই জাতিধ্বংসকারী মৃত্যুসংখ্যার প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জননী এবং ভাবী জননীগণের অজ্ঞতাই ইহার মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিক্ষায় এবং জ্ঞানে বর্ত্তমানযুগে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সেই ইংরেজ রমণীর পক্ষেই যদি একথা খাটে তবে আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ নারীর শিক্ষা মানবের প্রত্যেক কল্যাণের সহিত এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যেক সমাজহিতকর প্রবন্ধের সঙ্গে আপনা হইতে এই আলোচনা আসিয়া পড়ে। বিখ্যাত চিকিৎসক ডড্ সাহেব বলেন, শিশুর জন্মের সময় এবং অব্যবহিত পরে মাতার অযত্নের জন্যই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু ঘটে। শিশুদের অকালমৃত্যু যে কেবল পিতামাতাকেই শোকসন্তপ্ত করে তাহা নহে, জননীর শরীর এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়া যায়, যে তদ্দ্বারা জননীর নিজের এবং তাহার ভাবী সন্তান সন্ততিগণের জীবনও বিপন্ন হইয়া পড়ে।

গর্ভাবস্থায় এবং গর্ভের পরে মাতাদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যের বন্দোবস্ত না করা এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখা হয় না বলিয়াই প্রসূতিদের মধ্যে পীড়ার এত আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও প্রসূতিদের পালনের জন্য আমাদের দেশে অনেক বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে কিন্তু এখন তাহা অর্থশূন্য কতকগুলি দেশাচার মাত্রে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে সূতিকা গৃহের অবস্থা দর্শন করিলে বিদেশীয়েরা নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠেন, কারণ সূতিকা ঘর সম্বন্ধে এরূপ ছুঁৎকুড়িবাই বোধ হয় সভ্য জগতের আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। মানব শিশুর জন্ম একটী মঙ্গলময় পবিত্র ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের দেশের সূতিকা গৃহের অবস্থা দর্শন করিলে মনে হয়, শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া যেন নিতান্ত অপকর্ম্ম করিয়াছে, তাই তাহার জন্য নরক কুণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া শিশু যে একমাস পরে জীবিতাবস্থায় বাহির হয় ইহাই আশ্চর্য্য। বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে ঘরটী নিকৃষ্ট তাহাই সূতিকাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং এইরূপ ঘরের অভাব হইলে কিছুকালের জন্য এক খানি কুঁড়ে ঘর নির্ম্মিত হয়। এইরূপ ঘরে থাকিয়া দুর্ব্বল প্রসূতি এবং অল্প প্রাণ শিশু শীতকালে শৈত্য এবং বর্ষাকালে বাদলা বৃষ্টির ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে সুতরাং সূতিকা গৃহেই ধনুষ্টঙ্কার, ডাবা প্রভৃতি রোগে বহুসংখ্যক শিশুর প্রাণ দুর্ব্বল দেহপিঞ্জর হইতে পলায়ন করে। তখন কল্পিত পেঁচো এবং অপদেবতার উপর দোষারোপ করিয়া বঙ্গীয় জনক জননী সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকেন। ছেলে বেলায় গল্প শুনিয়াছি, "এক রাজপুত্র অনেক দিন পরে বিয়ে ক'রে দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু তার বিপদ আর কাটে না—তাঁর বন্ধু কোটালের পুত্র বেঙ্গমা বেঙ্গমীর কাছে শুন্‌তে পেলে হাতীতে মেরে ফেল্‌বে, সিংহদরজা ভেঙ্গে পড়্‌বে এইরূপ সাত আটটী বিপদ রাজপুত্রের জন্য বসে আছে। কোটালের পুত্র অনেক ফিকির ফন্দী করে তাঁকে বাঁচালেন।" আমাদের শিশুদেরও সেইরূপ বিপদ আর কাটিতে চাহে না। সূতিকা ঘরের ডাইনীদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাহির হইলেই খাদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হয়। অধুনা শিশুখাদ্যের জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম খাদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্পন্ন পরিবারের লোকেরা কতকটা খাঁটি গাভীদুগ্ধের অভাবে এবং কতকটা সভ্যতার চিহ্ন মনে করিয়া এই সকল কৃত্রিম খাদ্য শিশুদের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকেই ভুলিয়া যায় যে ভগবানের দ্বারা ব্যবস্থিত মাতৃস্তন্য অপেক্ষা শিশুদের পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য আর কিছুই হইতে পারে না। বিলাতের সুবিখ্যাত ডাক্তার ই, জি, এ্যালিস সাহেব কৃত্রিম

খাদ্যের অপকারিতা বর্ণন করিয়া বলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, ধনী পরিবারের রমণীগণ মাতৃত্বের বন্ধন হইতে এখন অনেকটা মুক্ত থাকিতে চাহেন। শিশুসন্তানদিগকে স্তন্যপান করান নারীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, অনেকেই একথা ভুলিয়া যান। সুতরাং খাদ্যের জন্য কৃত্রিম খাদ্য এবং পালনের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া মাতৃত্বের দায় হইতে মুক্ত হইলেন বলিয়া মনে করেন।" "শিশুরাজ্যে কালের অধিকার প্রসারণের ইহাই প্রধানতম কারণ সন্দেহ নাই।" সুখের বিষয় আমাদের দেশে এখনও এ ভাব প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু বিদেশীয় কৃত্রিম খাদ্য যেরূপ দ্রুতবেগে এদেশে প্রবেশ লাভ করিতেছে, তাহাতে সেদিন বেশী দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ শিশু খাদ্যের জন্য মাতৃস্তন্যের একান্ত অভাব হইলে গাভী-দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই উপযোগী নহে।

গাভীদুগ্ধ সম্বন্ধেও গৌহাটীর ভূতপূর্ব্ব সিভিলসার্জ্জন কাপ্তেন নেস্‌ফিল্ড বলেন, "যে সকল জননী শিশুসন্তানকে গাভীদুগ্ধ পান করাইতে চাহেন তাঁহারা কেন একথা ভুলিয়া যান যে মানব, স্বীয়শক্তি প্রভাবে গাভীদুগ্ধ আপন সন্তানের জন্য কাড়িয়া লইলেও ভগবান উহা তাহার বৎসের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। সন্তানের জন্য অন্য পশুদুগ্ধের ব্যবস্থা তাঁহার বিধান হইলে মাতৃস্তনের কোন প্রয়োজন থাকিত না।" হারবার্ট স্পেনসার বলেন, "বিধাতানির্ম্মিত মাতৃস্তন্য দ্বারা শিশু যেরূপ পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিষ্ট হইতে পারে অন্য কোনওরূপ খাদ্যে সেরূপ হইতে পারে এরূপ ধারণা ভুল। প্রতি বৎসর ফ্রান্সে এক বৎসরের ন্যূন বয়স্ক যত শিশুর মৃত্যু হয়, অনুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়াছে, তাহার তিন চতুর্থাংশ কৃত্রিম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে। স্যার জে, সি, ব্রাউন সাহেব বলেন, ফ্রান্সদেশে মৃত শিশুর মধ্যে শতকরা ৬১ জন কৃত্রিম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত, এবং মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত মৃত শিশুর সংখ্যা শতকরা ৮ জন মাত্র। বিখ্যাত ডাক্তার সাইক্‌স্ সাহেব বলেন, পেটের পীড়ায় যে সকল শিশুর মৃত্যু হয় খাদ্যের ত্রুটীই তাহার প্রধান কারণ। জননী যদি সুস্থ হন তবে স্তন্যদুগ্ধের দ্বারা প্রতিপালিত শিশুর পেটের পীড়ায় মৃত্যু এক প্রকার অসম্ভব।" মাতৃস্তন্যের অভাবে গাভীদুগ্ধের ব্যবস্থা করা অনিবার্য্য কিন্তু বিশুদ্ধ গাভীদুগ্ধ পাওয়া সাধারণের পক্ষে যেরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে উহার উপর নির্ভর করা সবিশেষ বিপজ্জনক। ইংলণ্ডে মিউনিসি-পালিটী হইতে অতিঅল্প মূল্যে দরিদ্র পিতামাতাকে বিশুদ্ধ গাভীদুগ্ধ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা হই-য়াছে। সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাভী দোহন করা হইয়া থাকে, আমাদের দেশে খাঁটী দুগ্ধ পাওয়া দূরে থাকুক উহাতে ভেজালরূপে যে সকল পদার্থ মিশ্রিত করা হয় তাহাও বিষের ন্যায় অপকারী। আমরা নির্জ্জলা খাঁটী দুধ পাইলেই বাঁচিয়া যাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মিউনি-সিপাল দুগ্ধ সরবরাহের কারখানায় দুগ্ধ দোহনের জন্যই যেরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হয় তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সুস্থকায়া গাভীগুলিকে পরিষ্কৃত খোলা জায়গায় রাখিয়া দোহন করা হয়, এবং দোহনকালে বায়ু হইতে অনিষ্টকর বীজাণু সকল দুগ্ধ বিষাক্ত করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহা আবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশোধিত করিয়া লওয়া হয়। ছয় বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুদের উপযোগী করিবার জন্য উহাতে আবার জল, চিনি এবং অল্প লবণ মিশ্রিত করত ফুটাইয়া শীল মোহর-যুক্ত বোতলে পূরিয়া অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এইরূপে সেখানে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইতে কোনই বাধা হয় না। অথচ সেখানকার স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণ বলিতেছেন, শিশুদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থাও পর্য্যাপ্ত নহে। বিচক্ষণ সম্পাদকগণ শিশুদের অকাল মৃত্যু সমগ্র জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে বলিয়া ইহার প্রতিকারে জন্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণের অভিপ্রায়ে উদ্দীপনাময়ী ভাষাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। ইংলণ্ডে যে প্রণালীতে গাভী দোহন করা হয় তাহা আমাদের দেশে কল্পনার বিষয় হইলেও ইংরেজগণ তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে আরও উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। দুগ্ধের বিশুদ্ধতা সাধারণতঃ এই কয়েকটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা গাভীর স্বাস্থ্য, দোহনকারী ব্যক্তির স্বাস্থ্য, দোহন-পাত্র এবং যে জলে

তাহা ধৌত করা হয়, ও গোশালা। এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গাভী দোহন করিতে পারিলে তবে তাহা শিশুখাদ্যের উপযোগী হইতে পারে। আমাদের দেশে সূতিকাগৃহে শিশুদের ভূত, প্রেতের ভয় আছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, এবং শিশুদিগকে এই সকল অপদেবতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। সূতিকাগৃহের চারিপার্শে নানাপ্রকার গাছ গাছড়া এবং শিশুর শয্যার চারিদিকে লৌহ, কাঁটা, এবং ছিন্ন চর্ম্মপাদুকা রাখিয়া ভূত তাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে সকল আসল ভূত সত্য সত্যই আমাদের শিশুদিগকে বিনাশ করে, তাহাদিগকে তাড়াইবার কোনই উপায় অবলম্বন করা হয় না। ডাঃ উইলিয়ম হল নামক একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, সত্যসত্যই কতকগুলি ডাইনী আছে, যাহারা আমাদের শিশুদিগকে হত্যা করে, এই সকল ডাইনীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রসূতিদিগকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে। এই সকল ডাইনীদের একটীর নাম ক্ষুধা, এবং অপরটীর নাম অস্থির অপূর্ণতা (রিকেট)। একই আকারের দুইটী নবজাত শিশুর একটীকে মাতৃস্তন্য এবং অপরটীকে হাতে খাওয়াইয়া বর্দ্ধিত করিলে বার মাস পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রথমটী বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং দ্বিতীয়টী নিতান্ত রুগ্নভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত মাতার স্বাস্থ্যও জড়িত রহিয়াছে। শিশুদের পীড়া প্রধানতঃ অনুচিত খাদ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ভেজাল দুধের কথা দূরে থাকুক, বিশুদ্ধ গাভীদুগ্ধও অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে উহা বিষাক্ত জীবাণুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

বিলাতে মাতাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লঙউড (Longwood) নামক স্থানে একটী সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। নরসেবায় বিলাতের লোকদিগের চিন্তা ও শক্তি নিয়োগ করিবার শক্তি কিরূপ অসাধারণ তাহা দেখাইবার জন্য আমরা উহার সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ দিলাম। মাতাদিগকে, বিশুদ্ধ খাদ্যের উপকারিতা এবং শিশুদিগকে খাওয়াইবার উপযুক্ত প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতি হইতে নিয়ম করা হইয়াছে যে জন্ম হইতে একবৎসর কাল শিশুকে সুস্থাবস্থায় দেখাইতে পারিলে জননীকে পনের টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। সমিতির পরিচালনাধীনে কয়েকজন স্ত্রী-পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ পূর্ব্বক মাতাদিগকে সন্তানপালন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। একখানি সুরঞ্জিত কার্ডে কতকগুলি নিয়ম মুদ্রিত করিয়া, গৃহে টানাইয়া রাখিবার জন্য বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্ডের প্রথমেই নিম্নলিখিত উপদেশটী বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত থাকে—

"শিশুকে মাতৃস্তন্যে প্রতিপালন করিবে, কারণ উহাই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট শিশুখাদ্য, সুতরাং উৎকৃষ্ট।"

যদি একান্তই মাতৃস্তন্যের অভাব হয় টাটকা দুগ্ধে বয়সের পরিমাণ অনুসারে জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। প্রথমতঃ একভাগ দুগ্ধে দুই ভাগ জল এবং পরে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে ক্রমশঃ দুগ্ধের ভাগ বাড়াইয়া দিতে হইবে। শিশুকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কদাচ অধিক খাদ্য দিবে না, এবং একবার খাওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ফেলিয়া দিবে। তারপর শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য কি কি করা উচিত, কি কি করা অনুচিত তাহা লিখিত থাকে।

কি কি করা উচিত—

১। প্রথমতঃ প্রতি দুইঘণ্টা অন্তর শিশুকে খাইতে দিবে, এবং ক্রমশঃ এই ব্যবধান বৃদ্ধি করিয়া তিন ঘণ্টা করিবে।

২। শিশুর মুখ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার ধোয়াইবে।

৩। শিশুকে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে।

৪। দিনে একবার করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে শিশুর গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিবে।

৫। মাতা যেন শিশুর সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন না করেন।

৬। শিশু কাঁদিলে তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। তিনটি কারণে শিশু কাঁদে।

(ক) ক্ষুধা পাইলে (খ) আঘাত পাইলে কোনও রূপ অস্বস্তি বোধ করিলে অথবা (গ) পীড়িত হইলে।

কি কি করা অনুচিত।

১। কোনপ্রকার উগ্র ঔষধ সেবন করাইবে না।

২। সাতমাস বয়সের পূর্ব্বে কঠিন খাদ্য দিবে না।

৩। শিশুকে মাখন তোলা দুধ অথবা যে দুধ টাট্‌কা বা বিশুদ্ধ নহে তাহা দিবে না।

৪। দীর্ঘ নল বিশিষ্ট ফিডিং বোতল ব্যবহার করিবে না।

৫। শিশুকে চুষিকাঠি ব্যবহার করিতে দিবে না।

৬। পাঁচমাস বয়সের পূর্ব্বে তাহাকে বসাইতে চেষ্টা করিবে না।

৭। শিশুর সামান্য অসুখ হইবা মাত্রই বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। কারণ সহজেই শিশুদের পীড়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া দেখা গিয়াছে. উক্ত সমিতির অধিষ্ঠান ভূমি লংউড্ জেলাতে পূর্ব্বে শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা হাজার করা ১৪৪ জন ছিল, কিন্তু উহা কমিয়া ৫৪ জন মাত্র হইয়াছে। কিন্তু তথাকার লোকেরা শুধু ইহা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা বলেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে অসহায়া এবং দরিদ্রা জননীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষিতা মহিলাদিগকে নিযুক্ত করা আবশ্যক, তাঁহাদের করুণাময় এবং স্নেহপরায়ণ হস্ত শিশুদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা প্রসারিত থাকিবে। ইঁহারা মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায় প্রতি দরিদ্র পরিবারে উপস্থিত থাকিয়া জননীদিগকে উপদেশ প্রদান করিবেন, তাঁহারা স্বর্গীয় দূতের ন্যায় পীড়িত শিশুর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিয়া দুঃখিনী জননীকে অভয়বাণী শুনাইয়া তাঁহার অশ্রুজল মুছাইতে চেষ্টা করিবেন। আমাদের দেশের বিধবা মহিলাগণ কি এই মহৎ কার্য্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন? এখন শিশুদের অকাল মৃত্যু এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমরা ভগিনীদের অবগতির জন্য তাহার উল্লেখ করিয়া আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করিব।

শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ।

১। অনুচিত খাদ্য।

২। জননীদের অজ্ঞানতা।

৩। মাতাদের আহারের অল্পতা বা অনিয়ম।

৪। অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান।

৫। অযত্ন।

অকাল মৃত্যু নিবারণের উপায়।

১। বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ।

২। মাতাকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করা এবং সুখাদ্য প্রদান।

৩। মাতা এবং ভবিষ্যতে যাহারা মাতা হইবেন, তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা করা।

৪। উপদেশ দিবার জন্য শিক্ষিতা মহিলার নিয়োগ।

৫। বিনা ব্যয়ে দরিদ্র শিশুদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত।

৬। বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত।

৭। পীড়িত শিশুদের শুশ্রূষার জন্য দয়াবতী শিক্ষিতা মহিলার নিয়োগ।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের "সাজি" হাতে লইয়া আজ অনেক কথা মনে উঠিতেছে, সেই সমস্ত কথা বলিলে সমাজপতি মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় এবং সর্ব্বাগ্রে যে কথাটা, তাহা না বলিয়া পারিলাম না। বঙ্গ সাহিত্যকে তিনি যাহা দিতে পারিতেন, তাহার তুলনায় যাহা দিয়াছেন তাহা হাতে লইতে যাইয়া আজ আমাদিগকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইতেছে। এমন জীবনের এমনতর অপব্যয় বড় দেখা যায় না।

'সাজি'তে সমাজপতি মহাশয়ের সর্ব্বশুদ্ধ আটটি গল্প বাহির হইয়াছে—'প্রাইভেট্ টিউটার' "প্রভা" "বাঘের মুখ" "কমলা" "প্রতিশোধ," "তীর্থের পথে," "শোক-

বিজয়," এবং "লালসা ও সংযম।" ইহাদের শেষ সমাজপতি মহাশয়ের বাল্য রচনা,—বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। প্রথম গল্প তিনটি উৎকৃষ্ট ও সুখপাঠ্য, কিন্তু ভাল গল্পে যে বিশেষত্ব ও বৈচিত্র আশা করা যায় এ গুলিতে তাহা বিদ্যমান নাই। ডাল পালা ছাড়িয়া দিলে গল্প তিনটি প্রায় একই হইয়া দাঁড়ায়। তিনটি গল্পের নায়িকাই ত্রয়োদশ বর্ষীয়া, তিনটি নায়কই নায়িকাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন –প্রতিদানও পাইয়া ছিলেন, —এমন আভাসও লেখক দিয়াছেন—এবং সকল পক্ষকেই অবশেষে হতাশ প্রেমিক সাজিতে হইয়াছিল। তবে "প্রভা" গল্পটির নায়ক "হৃদয়ের প্রবলবেগ সম্বরণ" করিতে না পারিয়া, যে কাজটি করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাতে গল্পটির মধ্যে একটু বৈচিত্রের সঞ্চার হইয়াছে বটে! লেখক সাফাই দিয়াছেন—"তোমরা কিছু মনে করিওনা, —আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না."—; এই শ্রেণীর সমস্ত সত্যই যদি বক্তব্য হয়, তবে আমরা নাচার। এইরূপ একটি লোভনীয় দৃশ্য অবতারণা করার প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন হইলেও লেখকের পক্ষে, একটু বিচার করিয়া দেখিলে তাহা একেবারে অসাধ্য হইত না, এবং এই সুখ-পাঠ্য গল্পটিও অপাঠ্য হইয়া উঠিত না। "প্রাইভেট টিউটার" ও "বাঘের নখ" এই গল্প দুইটিতে লেখক অতি নিপুণতার সহিত সমস্ত দিক বাঁচাইয়া গিয়াছেন বলিয়াই গল্প দুইটি এমন হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। যাহা দেখিয়া "বাঘের নখ" গল্পের উপেন্দ্রলালের "এক ফোটা চোকের জল কাগজের উপর" পড়িয়াছিল, তাহা কোন সমাজহিতৈষী ব্যক্তিই অনুমোদন করিবেন না; তথাপি লেখকের লিপিকৌশলে ঘটনাটিতে হৃদয়ে বিরাগের চেয়ে সহানুভূতিরই বেশী উদ্রেক হয়। সকল দিক দেখিতে গেলে প্রাইভেট টিউটার গল্পটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। লেখক এমন নিপুণতার সহিত সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে তাঁহার লিপি-কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গল্পটি যেন একখানা বর্ণ চাপা নিখুঁত সুন্দর চিত্র, কোন রেখাই অতিরিক্ত ফুটিয়া উঠিয়া সমস্ত গোপন রহস্য ফাঁস করিয়া দেয় নাই, অথচ দেখিবামাত্র একটি অনুপম কোমল সৌন্দর্য্যের প্রবল আভাস পাওয়া যায়। গল্পটি এমন ভাবে লিখিত যে আলোচনার সুবিধা হইবে না, নতুবা আমরা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ময় করুণ গল্পটি আমূল আলোচনা করিতাম। বাকী গল্প তিনটির মধ্যে "কমলা" ও "তীর্থের পথে" নিতান্ত ব্যর্থ ও অপাঠ্য; —স্থানে স্থানে লিপি কুশলতার পরিচয় থাকিলেও, ভাল গল্পের লক্ষণ ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই। "প্রতিশোধ" গল্পটি বরং নানা রকমেই ইহাদের চেয়ে অনেক ভাল। বেশ সুলিখিত না হইলেও করুণ শেষাংশটি সহজেই হৃদয় স্পর্শ করে।

সমাজপতি মহাশয়ের "ডালি" বাহির হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম, বাহির হইল কিনা জানি না। সমাজপতি মহাশয়ের গল্পগুলি অবধান সহকারে পাঠ করিলে, মনে হয় যে এই গল্পগুলি কুঁড়ি মাত্র, পূর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুম পরে আসিতেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য-ক্রমে পূর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুম আর আসিল না,—আমাদের অপেক্ষা করাই সার হইল। গল্প গুলির ভাবা বিশুদ্ধ, কিন্তু কোথাও বলবান নহে,—সর্ব্বত্রই একটা আশ্চর্য্য সঙ্কোচ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই সঙ্কোচই ক্রমে বলবান হইয়া বোধ হয় স্রোতের মুখে একেবারে পাষাণ চাপাইয়া দিয়াছিল। নিজের অবস্থা তিনি এমনই করিয়া তুলিয়া ছিলেন যে সারগর্ভ সাহিত্য-চর্চ্চা তাঁহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্বে অপমান করিয়া, সেই অপমানিত রুদ্ধরোষ পরীক্ষক মণ্ডলীর নিকট পরীক্ষা দিতে ছাত্র যেমন ভয় পায়, সাহিত্য-চর্চ্চা তাঁহার পক্ষে তেমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় এই সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে যতখানি বলের দরকার হয়, তাঁহার অভাবের সঙ্গে আলস্য ও সাধনার অভাব যোগ দিয়া রুদ্ধ স্রোতকে আর পুনরায় বহিতে দেয় নাই।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় এক সময় মাসিক পত্র পাঠকের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। রামানন্দ বাবুর সম্পাদনে যখন "প্রদীপ" বাহির হইত তখন তিনি এবং হরিসাধন বাবুই বলিতে গেলে এক রকম প্রদীপের তৈল সলিতা ছিলেন। তাঁহার গল্পগুলি সেই সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রায় সমস্ত গল্প গুলিই অদ্ভুত ঘটনার বিবরণে পূর্ণ এবং আরব্য উপন্যাসের

গল্পের ন্যায় এগুলি তরুণ পাঠকের মনকে দেখিতে দেখিতে অভিভূত করিয়া ফেলে। এই জন্যই প্রথম প্রথম তাঁহাদের এত আদর হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের প্রথম চটক কাটিয়া গেলে দেখা যায় যে দুই তিনটি গল্প ভিন্ন ঐগুলি প্রায়ই অসার আপাতসুখপাঠ্য অস্বাভাবিক কাহিনী মাত্র। কিছুকাল ইহাদিগকে লইয়া বেশ আমোদে থাকা যায়, কিন্তু একবার পড়িয়া উঠিলে দ্বিতীয় বার পড়িবার জন্য কোনই আগ্রহ হয় না। তাঁহার অধিকাংশ গল্প পড়িয়া কেবলি মনে হয় যে অচিরস্থায়ী আমোদ দেওয়াই ইহাদের একমাত্র কার্য্য, মানব হৃদয়ের বিচিত্র সুখ দুঃখের সহিত ইহাদের কোনও সংশ্রব নাই।

এরূপ মনে হইবার ত যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার অনেক গল্পের মধ্যে দুই একটি এমন চরিত্র থাকে যাহাদের কার্য্যাবলী সাধারণ মানবের মত নহে। তাহারা কেহ অদ্ভুত কৌশলী যাদুকর, কেহবা অপূর্ব্ব যোগবল সম্পন্ন সন্ন্যাসী। তাহাদের কার্য্য কলাপের বিবরণ পড়িতে পড়িতে কৌতূহলের উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু সহানুভূতি হয় না মোটেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা "রোশিনারা," "ছায়া," "মুক্তি" "মায়াবিনী" ইত্যাদি গল্পের উল্লেখ করিতে পারি। নগেন্দ্র বাবুর "লীলা" নামক উপন্যাসেও তিনি এইরূপ একটি রহস্যময় অদ্ভুত-কর্ম্মা চরিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এরূপ চরিত্রের সন্নিবেশে পুস্তক যতই রোমান্টিক হইয়া উঠুক না কেন, প্রকৃত স্থায়ী সাহিত্যের পর্য্যায়ে তাহা কখনই উল্লিখিত হইতে পারিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নগেন্দ্র বাবুর গল্পাবলি অত্যন্ত সুখপাঠ্য—'হীরার মূল্য' 'বোম্বেটে' ইত্যাদি গল্পেও এই গুণ বিদ্যমান। কিন্তু "বন্ধু" ও "কাহার ভ্রম" পড়িয়াই প্রথম মনে হয় যে এইবার বাস্তব ধরার রাজ্যে আসিয়াছি—কেবলি মেঘলোকে বিচরণ করিতেছি না। এই গুণ তাঁহার গল্পাবলিতে বড় বেশী নাই। তিনি যে রহস্যময়তার সাধনা করিয়াছেন, তাহা যে একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে, এমন বলিতে পারি না। তাঁহার সাধনার চরমোৎকর্ষ আমরা "মুক্তি" ও "মায়াবিনী" গল্প দুইটিতে দেখিতে পাই। অসাধারণতা ও অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও এই গল্প দুইটিতে এমন সুর সুরে স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য আছে যে গল্প দুটি পড়া শেষ হইয়া গেলে মনে হয় যেন কোন সুখ স্বপ্ন হইতে সহসা জাগরিত হইলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় এরূপ কবিত্ব-কুহকময় গল্প নগেন্দ্র বাবুর বড় বেশী নাই।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন বাবুও এক সময় গল্প লিখিয়া নগেন্দ্র বাবুর মত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। কিন্তু "পঞ্চ পুষ্প" ও "রঙ্গমহাল" এই পুস্তকদ্বয়ে প্রকাশিত গল্প গুলিকে ঠিক "ছোট গল্প" বলা যায় না। এ গুলি উপন্যাসেরই ছোট সংস্করণ মাত্র,—সংক্ষেপে সারিতে গিয়া স্থানে স্থানে নিতান্ত উদ্ভট, আজগুবি, ও বেখাপ্পা হইয়া পড়িয়াছে। ছোট গল্প ষ্টীম-লঞ্চের মত—মনের মধ্যে বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া অবলীলা সহজ গতিতে সবেগে চলিয়া যায়। কিন্তু এ গুলিতে না আছে উপন্যাসের অনায়াস বিস্তৃতি ও সহজ পরিণতি,—না আছে ছোট গল্পের অনির্ব্বচনীয়তা। এ গুলির গতি গাধা বোটের মত—চলিতেছে কি থামিয়া আছে সব সময় ঠিক পাওয়া যায় না। যাহা হউক, হরিসাধন বাবুর লেখার আকর্ষণ আছে। রঙ্গ মহালের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ সংযুক্ত গল্প গুলির মধ্যে আমি ইচ্ছা করিয়া চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করি নাই। তবে যদি কোন চরিত্র বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তাহা পাঠকেরই লভ্যাংশ। * * * লোকের চিত্তরঞ্জনই আমার উদ্দেশ্য - চরিত্র চিত্রন নহে।" চরিত্র চিত্রনে তাঁহার চেষ্টার অভাব সত্ত্বেও রঙ্গমহালের প্রথম গল্প "সেলিমা বেগম" বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"দুখুয়া মে কৈসে কহুঁ মেরে সজনী"—

হৃদয়ে একটি আকুল অশ্রুকরুণ ঝঙ্কার তুলিয়া যায়। গল্পটির ঘটনায় অতিরিক্ত উপন্যাসী গন্ধ থাকিলেও কবিত্বময় উপসংহারে গল্পটি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। গল্পের প্রথম অংশে পাঠকের মনে যে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠে, উপসংহারে তাহা একেবারে শান্ত হইয়া যায়। রঙ্গ মহালের শেষ গল্প "মতি সিপারে" এই ধরণের গল্পে যত রকম দোষ বর্ত্তিতে পারে, সমস্তই বর্ত্তিয়াছে। এই গল্পটি ছাপিবার প্রলোভন সম্বরণ করিলেই ভাল হইত।

তবে বাকী গল্প চারিটিতে হরি সাধন বাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কোন চরিত্র বিশেষ ভাবে ফুটিয়া না উঠিয়া থাকিলেও, এই গুলি তরল-গল্পপ্রিয় পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

"পল্লীচিত্রের" নিপুণ চিত্রকর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় * মহাশয় গল্পলেখক রূপে সাহিত্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত নহেন। একটি নিখুঁত ছোট গল্প একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলের মত, তাহার বাহিরের এবং ভিতরের সমস্ত পাঁপড়ি গুলি সমানভাবে ফুটিয়া উঠা চাই। কিন্তু সমস্ত পাঁপড়ি সমানে ফুটাইয়া তুলিতে যে প্রতিভার প্রয়োজন হয়, দীনেন্দ্র বাবুর প্রতিভা সেই শ্রেণীর নহে। একটি একক চিত্র তাঁহার হাতে এমন সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে যে বঙ্গসাহিত্যে এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নাই বলিলেও চলে,—এক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়কে মনে পড়ে। কিন্তু অল্পের মধ্যে যেখানে চরিত্র বৈচিত্র্যের দরকার হয় সেখানে যেন তিনি ততটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহার হাতের গ্রামের পিসিমা, কুণ্ডু মশাই, দাদা ঠাকুর ইত্যাদি চিত্র অতুলনীয়,—নিখুঁত, স্বাভাবিক ও জীবন্ত। পল্লীচিত্রে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু আমরা সর্ব্বথা একথা বলিতে বাধ্য যে প্রকৃতির গূঢ় বাণী তাঁহার রচনায় যেমন সুস্পষ্ট ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, অনন্ত বৈচিত্র্যময় মানব হৃদয়ের গোপন রহস্যগুলি তাঁহার নিকট তেমন করিয়া ধরা দেয় নাই। আমরা যদি বলি যে তাঁহার রচনাবলি চিত্র,—সঙ্গীত নহে, তবে কথাটা কিছু প্রহেলিকার মত শুনাইলেও তাহাই ইহাদের সঠিক বর্ণনা হইবে। আমরা সঙ্গীতের অভাবের জন্য কিছুমাত্র শোক করিতে চাহি না,—তাঁহার চিত্রাবলিই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

"বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরে "জন্মভূমিতে" শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণই বোধ হয় প্রথম এইরূপ ছোট ছোট রসাল চিত্র আঁকিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। দীনেন্দ্র বাবু সেই স্রোত অব্যাহত রাখিয়াছেন। এক্ষেত্রের আর একজন শিল্পী শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়। "চিত্র-বিচিত্রে" তিনি তাঁহার পনরটি চিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—'আমার আশঙ্কা আমি শিব গড়িতে গিয়া অক্ষমতা বশতঃ হয়ত অন্যকিছু গড়িয়া ফেলিয়াছি।" তাঁহার আশঙ্কা অমূলক নহে, তিনি গড়িয়াছেন বানরই কিন্তু মোটেই অক্ষমতা বশতঃ নয়। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক গড়নেই পাকা হাতের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে তিনি শিব গড়িতে কিছুমাত্র চেষ্টাই করেন নাই। আদর্শ নির্ব্বাচনে তাঁহার এমন বিষম ভুল কেন হইল তাহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। "চিত্রবিচিত্র" প্রায় আগা গোড়া চিত্রে পরিপূর্ণ—বানরকেই তিনি আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গড়িয়াও তুলিয়াছেন অবলীলাক্রমে তাহাই। এর উপর কয়েকটি চিত্রে তিনি এত অধিক পরিমাণে অনবরত কোটেশনের জল ঢালিয়াছেন, যে চিত্রের প্রগাঢ়ত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য চিত্রগুলির কতক ব্যর্থ হইয়াছে বিষয়-দোষে, কতক ব্যর্থ হইয়াছে সর্ব্ব রকমেই। কেবল "উমেদার" "কেরাণী জীবন" এবং "হেমের অনধিকার" সহানুভূতি উদ্রেক করিবার ক্ষমতায় কথঞ্চিৎ সার্থক হইয়া উঠিয়া। তাঁহার সর্ব্বরকমে সার্থক গল্প "দাদার কাণ্ড। এই একটি মাত্র গল্পে সমস্ত "চিত্রবিচিত্র" উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পাবলির সঙ্গে ইহা চিরদিন সমান আসন পাইবে। গল্পটির শেষে সহসা অতর্কিতভাবে একটি আনন্দের কশাঘাত খাইয়া দিশাহারা হইয়া পাঠক যদি ইহার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া ফেলেন তবে আমরা বিশেষ বিস্মিত

* গত পৌষের সংখ্যা ভারতমহিলায় ২৭৯ পৃষ্ঠায় দক্ষিণার্দ্ধের ১৪শ পংক্তিতে শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মুদ্রাকর প্রমাদে "শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার" রায় হইয়া পড়িয়াছেন। ২৭৭ পৃষ্ঠায় দক্ষিণার্দ্ধের ২৪শ, ২৯শ ও ৩০শ লাইনেও অনেক গোলমাল হইয়া গিয়াছে। মাঘের সংখ্যায়ও দুইটি মারাত্মক ভুল হইয়াছে। ২৯৫ পৃষ্ঠায় বামার্দ্ধের ২০ লাইনে "বঙ্গবাসী" স্থলে "বঙ্গবাণী" হইবে। ঐ পৃষ্ঠায়ই দক্ষিণার্দ্ধের ১২শ পংক্তিতে 'এবং টি' স্থলে 'এবং "কবি" হইবে। পাঠক-পাঠিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।—লেখক।
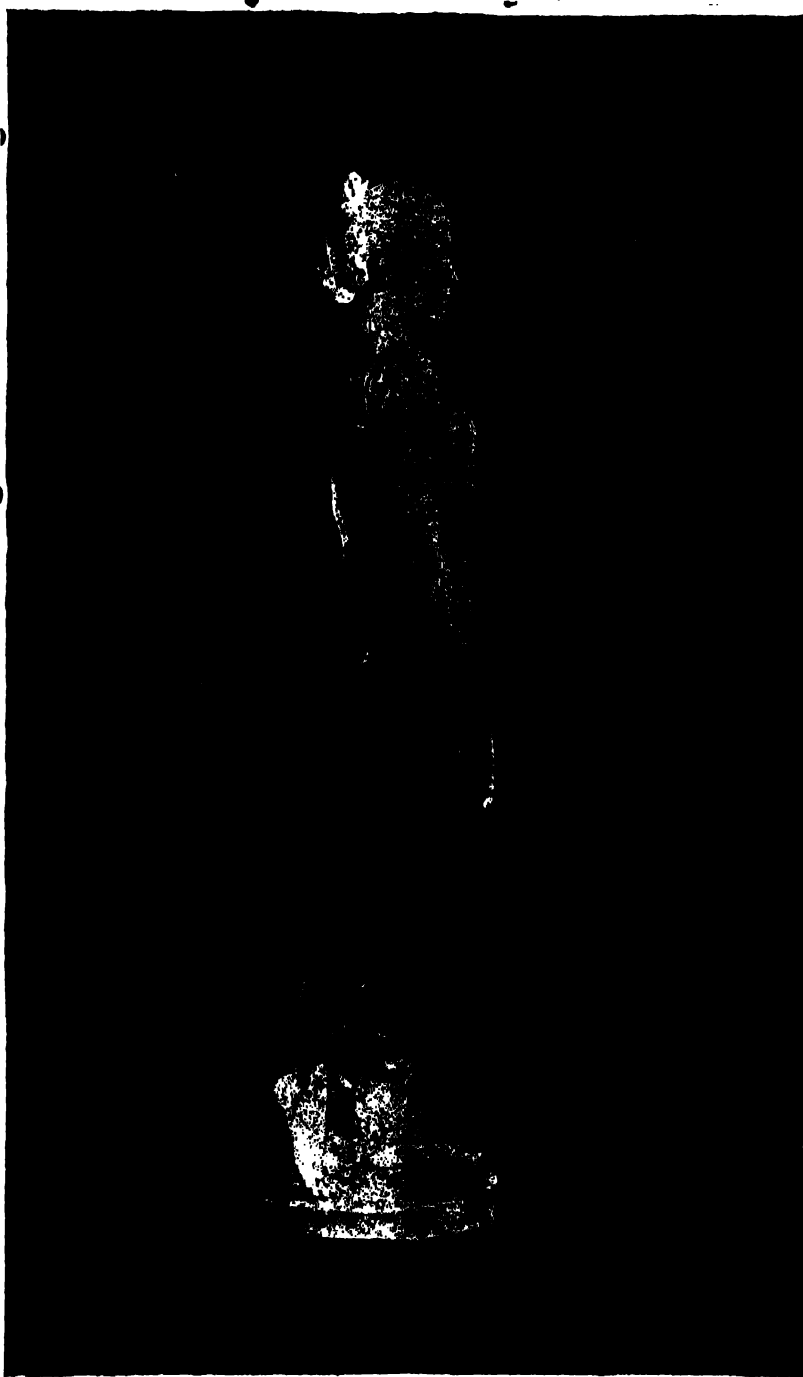
মন্দির-পথবর্ত্তিনী (পার্শ্ব-দৃশ্য)।

মহারাষ্ট্র ভাস্কর ম্হাত্রে নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রতিলিপি।

হইব না। "আমার সম্পাদকি"র বিষয়ে একটি কথা বলিবার আছে। বর্ত্তমান বৎসরের বঙ্গদর্শনেও ঐরূপ একটি চিত্র দেখিলাম, বোধ হয় শৈলেশ বাবুরই রচনা। আমরা শৈলেশ বাবুর নিকট হইতে সার্থকতর স্থায়ী সাহিত্যের প্রত্যাশা করি। আশা করি, অন্ততঃ বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়াও তিনি আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

রাণী লুইসা।

যে নারী মস্তকে স্বর্ণ-মুকুট ও কণ্ঠে রত্নহার ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিবার অধিকার পান, যিনি রম্য-হর্ম্যতলে ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করেন ;—ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহারই ধর্ম্মশীলা ও দয়াবতী রমণী হইবার কথা। কিন্তু এ সংসারে যেখানে যাহা হওয়া উচিত, অনেক সময় সেখানেই তাহা হয় না। এজন্য অধিকাংশ রাজপরিবারেই ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না এবং দুঃখীর দীর্ঘনিঃশ্বাস রাজান্তঃপুরের পাষাণপ্রাচীর ভেদ করিয়া রাজ্যেশ্বরীর হৃদয়ে গিয়া করুণা উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতে পারে না।

কাজেই কোন রাজমহিষীকে দয়াধর্ম্মে মহীয়সী দেখিতে পাইলে আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। আমরা স্বভাবতঃই তাঁহাকে দেবী মনে করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি প্রকাশ করি।

আজ আমরা ইউরোপের উক্তরূপ এক রাজমহিষীর দয়ার কাহিনী বর্ণনা করিব। তিনি হৃদয়মাহাত্ম্যে অসংখ্য নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার পুণ্য-কাহিনী শ্রবণ করিলে যথার্থই বিস্ময়ের উদ্রেক হয় ; তিনি যেন স্বর্গ হইতে দেবভাব লইয়া মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন।

এই রমণীর নাম লুইসা। ইনি ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মানীর কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। ছেলে মেয়েকে কি রকম করিয়া সুশিক্ষা দিতে হয়, তিনি তাহা উত্তম-রূপেই জানিতেন। লুইসা যখন ক্ষুদ্র বালিকা, তিনি তখনই তাঁহার সুনির্ম্মল মুখশ্রীর মধ্যে একটী স্বর্গীয় ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। লুইসার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব বিকশিত হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। এই জন্য তিনি কন্যাকে নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। জননীর সুশিক্ষায় বালিকা লুইসার জীবনপুষ্প দলে দলে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।

কিন্তু হায়, লুইসার এই স্নেহময়ী জননী অল্পদিনই সন্তানের শিক্ষার সাহায্য করিতে পারিলেন ; মৃত্যুর আহ্বানে অকালেই তাঁহাকে এই সংসার ত্যাগ করিতে হইল। তখন লুইসার পিতামহী তাঁহাকে নানাগুণে গুণবতী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লুইসার বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাঁহার শুভ্র হাসির ভিতর অপূর্ব্ব সরলতা ও প্রীতি প্রফুল্ল নয়নের মধ্যে একটি সুমধুর ভাব পরি-লক্ষিত হইত। তাঁহার মুখের সৌন্দর্য্যের মধ্যে অন্তরের মাধুর্য্যও অনুভব করা যাইত। লুইসার পবিত্র হৃদয়টুকু যেন শিশিরের কোমলতায় গঠিত হইয়াছিল। এজন্য ব্যথিতের ক্রন্দনে তাঁহার মনে বড় ব্যথা লাগিত ; দুঃখীর দুঃখ দেখিলে চিত্ত করুণায় আর্দ্র হইয়া যাইত। এক-বৃন্তের দুইটি ফুলের মত ভক্তি ও করুণা তাঁহার অন্তরে শোভা পাইত। তরুণ বয়স হইতেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। তিনি প্রতিদিন সরল প্রাণে ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি-তেন। বুঝিবা প্রার্থনার ভিতরদিয়াই তাঁহার প্রাণে স্বর্গের প্রীতি নামিয়া আসিয়াছিল। তাই তিনি কাহা-কেও রুগ্নশয্যায় শায়িত দেখিলে তক্ষণাৎ তাঁহার ক্লেশ দূর করিবার জন্য সেবায় প্রবৃত্ত হইতেন। এ বিষয়ে লুইসার বাল্যকালের একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার লুইসার পিতামহী ও শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে গৃহে না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হন। তাহার পর শুনা গেল লুইসা একটি পিতৃমাতৃহীনা অসহায়া ও পীড়িতা বালিকার

পাশে বসিয়া বাইবেল পাঠ করিতেছেন এবং সুমিষ্ট স্নেহবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন।

লুইসার তের বৎসর বয়সের আর একটি ঘটনা বলি। তিনি তাঁহার মনের মত একটি সুন্দর জিনিস কিনিবার জন্য অনেক দিন হইতে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলেন। কিন্তু একদিন এক দুঃখিনী বিধবা তাঁহার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিল; তিনি ভিখারিণীর দুঃখের কথা শুনিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন; তাহার পর সঞ্চিত সমস্ত অর্থই বিধবাকে দান করিলেন। ইহার পর লুইসার রূপের ও গুণের কথা সকলেই শুনিতে পাইলেন; তাঁহার সরলতা, পবিত্রতা, দয়া ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। প্রুসিয়ার রাজকুমার এই ধর্ম্মশীলা ও করুণাময়ী নারীর গুণে আকৃষ্ট এবং সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। ১৭৯৩ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর রাজকুমারের সঙ্গে লুইসার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

লুইসা রাণী হইলেন; এখন একদিকে তাঁহার স্বামীর অতুলনীয় প্রেম, অন্যদিকে রাজপরিবারের অসংখ্য ধনরত্ন; ইহার মধ্যে বাস করিয়া তিনি ধনগর্ব্বিতা বিলাসিনী নারীদিগের ন্যায় সুখের নেশায় মাতিয়া উঠিতে পারিতেন; ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়া দুঃখীর দুঃখের কথাও বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু শৈশবকালের সুশিক্ষায় তাঁহার অন্তরে অনুপম ধর্ম্মভাব বিকশিত হইয়াছিল। রাজার সুবৃহৎ অট্টালিকার বিপুল ধনরাশি সে ধর্ম্মভাব ম্লান করিতে পারিল না। তাই রাণী লুইসা রত্নমণিখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বর্ণ সিংহাসনে বসিতেন; আবার দুঃখীর দ্বারে গমন করিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতেন। এই চোখের জল মুছাইতে রাণী লুইসার কি আনন্দ! তিনি বিবাহের পর তাঁহার মাতামহীকে লিখিয়াছিলেন—

"আমি রাণী হইয়া দরিদ্রদিগকে যে আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারিতেছি, ইহাই আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ।"

লুইসার বিবাহের পর তাঁহার প্রিয়তম স্বামী কহিলেন—"তোমাকে সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহের সহিত একদিন রাজপথে বাহির হইব।"

রাণী লুইসা স্বামীর প্রীতিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলিয়া উঠিলেন—"কেন বৃথা অর্থ ব্যয় করিবে? এরূপ আমোদে প্রমোদে লাভ কি? এইরূপ কার্য্যে যে অর্থ ব্যয় হইবে, সেই অর্থ বিধবা এবং পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালক বালিকাদিগের জন্য ব্যয় করিলেই কি ভাল হয় না? আমি তাহাতেই অতিশয় সুখী হইব।"

রাণী লুইসা বিবাহ উপলক্ষে বিস্তর দ্রব্যসামগ্রী উপহার পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অনেকগুলি জিনিস গরীব দুঃখী ও অসহায় লোকদিগকে দান করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর রাণী লুইসার জন্মদিন উপস্থিত হইল। তাঁহার স্বামী সেই জন্মোৎসব উপলক্ষে লুইসার গ্রীষ্মকালে বাস করিবার জন্য একটি রমণীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং হাস্যমুখে কহিলেন—

"তুমি কি আমার কাছে আরও কিছু চাহিবে না?"

লুইসা। চাহিব বই কি?

রাজা। কি চাহিবে বল?

লুইসা। আমাকে আরও অধিক পরিমাণে অর্থ দাও, আমি গরীব দুঃখীকে দান করিব।

রাজা। কত অর্থ দিব বল?

লুইসা। একজন দয়ালু রাজার হৃদয় যত বড়, আমি তত অর্থ চাই।

রাণীর কথা শুনিয়া রাজার মন পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তখনই হাসিতে হাসিতে রাণীর হস্তে প্রচুর অর্থ অর্পণ করিলেন। রাণী সেই অর্থ দ্বারা দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিতে লাগিলেন। গরীব প্রজাগণ লুইসাকে দয়াময়ী জননী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল।

রাণী লুইসা ও তাঁহার স্বামী একবার একটি পল্লিগ্রামে গমন করেন। গ্রামটী খুব সুন্দর বলিয়া সেখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। লুইসা যে রাণী, তৎকালে সে কথা যেন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার করুণামাখা আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি লইয়া দরিদ্রদিগের গৃহে গমন করিতেন, এবং নানা প্রকার কথা বলিয়া তাহাদিগকে সুখী করিতেন। কোন কোন দিন মিষ্টান্ন ক্রয়

করিয়া বালক বালিকাদিগকে খাওয়াইতেন; এক এক দিন পথের অসহায় বালক বালিকাদিগকে কোলে তুলিয়া লইতেন। প্রুসিয়ার রাণীর এই-কার্য্য দেখিয়া লোকেরা বিস্মিত হইয়া যাইত!

লুইসা বেশ লেখাপড়া জানিতেন। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে খুব ভালবাসিতেন। তিনি অনেকগুলি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সরলতা, কোমলতা ও বিনয়ে তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। লোকের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, এই জন্যই বোধ হয় তিনি বিষাদ সঙ্গীত গাইতেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠের বিষাদ সঙ্গীত শুনিলে করুণায় মন আর্দ্র হইয়া যাইত এবং অশ্রুসংবরণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

১৭৯৭ সালে লুইসার প্রথম পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই প্রথম উইলিয়ম। ইঁহার দ্বারাই জর্ম্মন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাণী লুইসা যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন, ততদিন দুঃখীর সেবা করিয়াই আপনাকে সুখী মনে করিতেন। যখনই তিনি রাজপথে বাহির হইতেন, তখনই দলে দলে লোক তাঁহার গাড়ীর কাছে ছুটিয়া আসিত, শান্তিরক্ষক সৈন্যগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সরাইয়া দিতে পারিত না। রাণী লুইসা ইহাতে আনন্দ অনুভব করিতেন এবং দরিদ্রকে অর্থ, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্যসামগ্রী ও বালকবালিকাদিগকে খেলনা প্রদান করিতেন। রাস্তার লোক এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিত এবং বলিত, "পরমেশ্বর আমাদের মহারাণীকে দীর্ঘজীবী করুন।"

রাণী লুইসার মৃত্যুর পূর্ব্বে ফুসফুসের মধ্যে একটি ফোড়া হইয়াছিল। ফোড়ার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেন "হে ঈশ্বর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না।"

অবশেষে যখন বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যুর আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই, তখন স্বামীর হাতের মধ্যে নিজের হাত দুখানি রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমার স্বামি, বিদায়, এখন বিদায়; ঐ শুন আমার পিতা আমাকে ডাকিতেছেন।"

এই কথা বলিয়াই সেই কর্ম্মশীলা দয়াবতী নারী ইহ সংসার ত্যাগ করিলেন। ১৮১০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইল।

রাণী লুইসা ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুণ্যকাহিনী হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল। অদ্যাপি সেই করুণাময়ী রাণীর দয়ার কথা চিন্তা করিয়া প্রুসিয়ার রমণীগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং তিনি যে নারীজীবনের একটি আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তদনুসারে জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

ভুল।

(১)

কেবল ছেলে ভাল দেখিয়াই সুরেশের হাতে আশুবাবু তাঁহার ফুটফুটে মেয়েটীকে দান করিয়াছিলেন। সুরেশ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া মামার বাড়ীতে মামার যত্নে লেখাপড়া শিখিতেছিল। যখন তাহার বিবাহ হয়, তখন তাহার বয়স উনিশ বৎসর। সে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি সমেত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সিতে পড়িতেছিল। ইহা দেখিয়াই আশুবাবু মুগ্ধচিত্তে সুরেশকে কন্যা দান করিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য তাঁহাকে এক্ষেত্রে খরচপত্র বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই।

সহসা একদিন সুরেশের মাতুলের মৃত্যু হইল। সুরেশের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে পিতৃমাতৃহীন হইয়াও সে অভাব মামার স্নেহে কোন দিন জানিতে পারে নাই। আজ হঠাৎ এতখানি স্নেহ মমতার ভিতর হইতে বাহিরে পড়িয়া আপনাকে সে একান্ত অসহায় দেখিল। সে বুঝিল এখন তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই—দুঃখে কষ্টে আহা বলিবারও কেহ নাই।

(২)

আশুবাবু জামাতাকে আপন বাটী আনিয়া রাখিলেন। সুরেশ এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু বৃত্তি পাইল না; কাজেই প্রেসিডেন্সিতে পড়া আর ঘটিয়া উঠিল না।

এই সময় আবার আশুবাবুর আফিসে কি একটা কাজের গলতি হওয়ায় বড় সাহেব তাঁহাকে ইন্‌ভ্যালিড্ (রুগ্নের) পেন্‌সন লইতে বাধ্য করিলেন। আয় কমিয়া যাওয়াতে আশুবাবুর মেজাজ বড়ই খিট্‌খিটে হইয়া উঠিল। এই দুর্মূল্যতার দিনে সামান্য ৫০টী টাকা পেন্‌সনে সংসার চালানো ভার হইয়া উঠিল। চাকরটীকে বিদায় দেওয়া হইল। হাটবাজার করিবার ভার সুরেশের স্কন্ধে পড়িল। তবু সে শ্বশুরের মন পায় না—তিনি সর্ব্বদাই বিরক্ত, সামান্য ত্রুটিতেই খিট্‌খিট্ করেন। সুরেশের পড়াশুনারও বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল, এবং যথাসময়ে খবর আসিল যে বি, এ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছে। আশুবাবু সুরেশকে ডাকিয়া আভাস ইঙ্গিতে যে কথাগুলি বলিলেন তাহার সরল অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, সুরেশের আর পড়াশুনায় তেমন মন নাই, এবং এখন সে নিতান্ত ছেলে মানুষটী নহে, সন্তানের পিতা হইয়াছে, নিজেরই একটী সংসার হইতে চলিয়াছে, এখন আর বুড়ো শ্বশুরের মাথায় সমস্ত ভার চাপাইয়া বেড়ানটা ভাল দেখায় না। এখন দশ টাকা আনিবার চেষ্টা দেখা উচিত। আর তাহার স্ত্রীপুত্রকে যে তাহার শ্বশুর চিরদিন খাওয়াইবেন পড়াইবেন এমন কথা কোন শাস্ত্রাদিতেও লেখা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার এখন যেমন অবস্থা ইত্যাদি।

সুরেশ প্রস্তর-প্রতিমাবৎ নির্ব্বাক ও নিষ্ফলভাবে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিল! ভাবিয়া দেখিল কথাটা মিথ্যা বা অযৌক্তিক নহে! কিন্তু উপায় কি? সে শুধু একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল, দুই ফোঁটা অশ্রুও তার চোখের কোণে ফুটিয়া উঠিল—তাহা কেহ দেখিল না।

(৩)

"শুনেচ সরো, তোমার বাবা কি বলেছেন?"

"সব শুনেছি ...." কথাটা সরোজিনীর কণ্ঠে বাধিয়া গেল।

সুরেশ বলিল "কথাগুলো মিথ্যা নয় ত সরো"—

"কিন্তু তোমার অপমান আমি আর সহ্য করতে পারি না, তুমি ত জামাই, আমি মেয়ে, তবুও মন পাই না, যদি ছেলেটা না থাকৃত তা'হলে আমি বিষ খেয়ে মরতাম। তোমার পায় পড়ি, তুমি এখান থেকে আমাদের নিয়ে চল, গাছতলায় থাকৃতে হয় সেও ভাল, তবু এখানে আর না।" এই বলিয়া সরোজিনী কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ সরোজিনীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া সাদরে কহিল, "সরো, আর একটা বৎসর কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে কাটাতে হবে, তারপর বি, এ টা পাশ হ'লে যা হয় একটা কিছু সুবিধা হবেই।"

"কিন্তু তোমার অপমানে আমার প্রাণে যেন শেল বিঁধে। তুমি কি একটা কুড়ি টাকারও চাকরি জোটাতে পারবে না? তাতেই আমাদের বেশ চল্‌বে—কেন এ গলগ্রহ আর?"

"দেখ সরো, তুমি বড় ছেলে মানুষ—আমার কিসের অপমান—আমার বাপ নাই, মা নাই ওঁরাই এখন সব। ওঁরা যদি দুটা কথা না বল্‌বেন, তবে কি রাস্তার লোক এসে বল্‌বে? আচ্ছা আমি ছেলে পড়িয়ে যাতে কিছু কিছু দিতে পারি সে চেষ্টা করব।"

সুরেশের কথা শুনিয়া সরোজিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—বলিল, "যা ভাল বুঝ তাই কর, আমার কিন্তু আর ভাল লাগে না।"

(৪)

সুরেশ দুইটী টুইশনি যোগাড় করিল। সকাল সন্ধ্যা দুই বেলা দুইটী ছাত্রকে পড়াইতে হয়। ইহাতে সে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া আনিতে লাগিল। আপন খরচের জন্য দশ টাকা রাখিয়া বাকি দশ টাকা সরোজিনীর দ্বারা সে সংসারে দিতে লাগিল। সুরেশ যে গোপনে বি, এ পড়িতে লাগিল, একথা কেহই জানিল না। সুরেশ প্রাণপণ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। নানা বাধাবিঘ্ন অশ্রুপাতের ভিতর দিয়া দীর্ঘ এক বৎসর কাল যেন জলের মত বহিয়া গেল। সুরেশ বি, এ পরীক্ষা দিয়া ফলাফলের জন্য ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিল। একদিন সুরেশ যথারীতি ছাত্র পড়াইয়া রাত্রি ৯টার সময় বাটীতে আসিয়া হঠাৎ শুনিল আশুবাবু তাহার সম্বন্ধে স্ত্রীকে কি বলিতেছেন। কথাটা সুরেশের কাণে গেল। "দশটা

ক'রে টাকা দিয়ে যেন মাথা কিনে রেখেচে, সমস্ত দিন বাড়ীতে বসে থাকে, দুটাকা আন্‌বার চেষ্টাও করে না। এত বলি, তা গায়ে মাখেওনা ত! "মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি!"

সুরেশের প্রাণের ভিতর যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিল। সে শয়নকক্ষে আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। আপনাকে সে একান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। ভাবিল সত্যই আমি অপদার্থ! উপার্জ্জনের জন্য নিজে এখন ত কিছু চেষ্টা করিতেছি না! দুপুর বেলাটা সত্যই ত কিছু উপার্জ্জনের জোগাড় দেখিতে পারি। মনে একটা অভিমানও আসিল, এ জগতে পয়সাটাই কি সব! স্নেহ, মায়া, করুণা, এগুলিও কি পয়সার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে! যে হতভাগ্য এক পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে না তাহার জন্য কি এক বিন্দু স্নেহও নাই? হা ভগবান!

সুরেশ একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া মনের আবেগে কি কতকগুলা লিখিয়া ফেলিল। শয্যার প্রতি চাহিল। সরোজিনী তখন আপনার দেড় বৎসরের শিশুটীকে বুকে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সে মুখে কি এক আশ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল! কি বিশ্বাস! কি নির্ভর!

সুরেশ কাগজ খানি সরোজিনীর মস্তকের নিকট রাখিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বহিরে আসিয়া নৈশ অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গেল। পরীক্ষার ফল বাহির হইতে আর দেরী নাই, কিন্তু ভাবিতব্যের গর্ভে কি আছে কে জানে? সুরেশের আর সহিল না, সে বাহির হইয়া পড়িল।

সরোজিনী প্রভাতে উঠিয়া দেখিল, সুরেশ ঘরে নাই তাহার বালিসের উপর এক খানা কাগজ! তাহার প্রাণটা কি এক অজানিত আশঙ্কায় ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কাগজখানি উঠাইয়া লইয়া সে পড়িতে লাগিল, তাহার বুকের ভিতর ধ্বক ধ্বক করিতেছিল।

কাগজে লেখাছিল :—

প্রাণের সরো!

আমি এখন তোমার পিতার চক্ষুশূল। আমি বিদায় না হইলে তাঁহাদের সোয়াস্তি নাই। তোমার পিতা মাতাকে বলিও সরো, যে আজ হইতে এ অপদার্থ বিদায় হইল। যদি কখনও মানুষ হইতে পারি তবেই আবার তোমাদের বাড়ী আসিব। আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। নচেৎ এমুখ আর তোমাদের দেখাইব না। সরো, তুমি যেমন আছ তেম্‌নি থেক, কেঁদে কেটে উতলা হয়োনা। ভগবান তোমার সহায় হবেন—আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ছেলেটীর উপর যেন যত্নের ত্রুটী না হয়। ইতি—

তোমারই,
সুরেশ।

সরোজিনীর চক্ষে সমস্ত আলো নিভিয়া গেল! সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। এমন সময় শিশুটী কাঁদিয়া উঠিল। সেইদিন অপরাহ্নে খবর আসিল—সুরেশ বি, এ, পাশ হইয়াছে।

(৫)

কিছু দিন পরে সহসা একদিন রাত্রি এগারটার সময়ে আশুবাবুর নামে এক টেলিগ্রাম আসিল। টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া আশুবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। লেখা ছিল "গত রাত্রে কলেরায় সুরেশের মৃত্যু হইয়াছে। পত্রে সবিশেষ জানিবেন।" টেলিগ্রাম খানি এলাহাবাদ হইতে পাঠান হইয়াছিল। প্রেরকের নাম, এন্, সি, সেন। এই দারুণ সংবাদে আশুবাবুর অন্তঃপুর হইতে একটা কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইয়া সুপ্ত পল্লিটীকে চকিত করিয়া তুলিল।

সরোজিনী শিশুটীকে বুকে লইয়া শোকের বেগ কতকটা থামাইল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর বিশ্বদাহকারী অগ্নি যেন বিজন গহনে জ্বলিয়া উঠিল। কি অসহ্য দারুণ সে জ্বালা! স্বহস্তে সরোজিনী আপনার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম কাটিয়া ফেলিল। চুড়ি কয়গাছা খুলিয়া ফেলিল, সে বিধবা! তাহার সোণার বর্ণ কালী হইয়া গেল। সংসারে এখন আর সে কিছুই চাহে না, শুধু চাহে মৃত্যু! কিন্তু এই শিশু—! হারে বাছা, জন্ম দুঃখী বাছা আমার!

ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে একখানি গাড়ী আসিয়া আশু বাবুর বাটীর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন

রাত্রি ৮টা। সোণার চস্মাধারী একজন বাবু গাড়ি হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে বৈঠকখানার আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে কয়েকটী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন।

সকলেই আগন্তুকের দিকে চাহিলেন। আশু বাবু বলিলেন, "আপনি কি চান? আপনি কি ডাক্তার? আপনার কি এখানে আস্‌বার কথা ছিল?

"আজ্ঞে না—আমি আপনার জামাতা সুরেশ, চিন্তে পার্‌ছেন না।"

সকলেই তাহার দিকে তীব্র কটাক্ষের সহিত চাহিলেন। আশু বাবু সন্দেহ-সূচক স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"সুরেশ—আমার জামাতা—সেত আজ চার বৎসরের কথা—এলাহাবাদে তার মৃত্যু হয়েচে—আমার বিধবা কন্যা রোগশয্যায়—ঘোর বিকার। এক মাস হ'ল ছেলেটীও মারা গেছে।"

সুরেশের প্রাণটা যেন ফাটিয়া গেল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে সমস্ত অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল।

ইঁহাদের মধ্যে একজন থিয়জফিষ্ট ছিলেন, তিনি আশু বাবুকে বাহিরে আনিয়া কানে কানে বলিলেন, "আমার ত ভাল বোধ হচ্চে না, আমি জানি, যে সমস্ত জীব সংসারে থাকিয়া বাসনা পরিতৃপ্ত কর্‌তে পারে নাই, একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে রেখে ইহধাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়; তাহাদের আত্মা সেই অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য কখন কখন তাদের পূর্ব্বদেহ ধারণ করে সংসারে এসে তাদের বঞ্চিত, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে নিয়ে যায়। আপনি একটু বিবেচনা করে ক'াজ করবেন।" আশু বাবু ফিরিয়া আসিলে, সুরেশ আপনাকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "আপনি কিসে জান্‌লেন সুরেশের এলাহাবাদে মৃত্যু হয়েচে।"

"কেন সেখানথেকে টেলিগ্রাম এসেছিল।"

"সে টেলিগ্রামখানি আছে—আন্‌তে পারেন কি?

"আমার যেন স্মরণ হয় আছে, একটু অপেক্ষা করুন, পুরান ফাইলটা একবার খুঁজে দেখি।"

আশু বাবু বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ পরে টেলিগ্রাম আনিয়া সুরেশের হাতে দিলেন। সুরেশ একবার টেলিগ্রাম খানি দেখিয়াই বলিল, "আপনার বাড়ীর নম্বর কত? ১৯ না! হেঁ ১৯ই বটে।"

"টেলিগ্রামে আছে ২৯, দুইটা লেখবার দোষে দুয়ো প হয়ে একের মত দেখাচ্চে। ২৯ নং বাড়ীতে কি কোন আশু বাবু থাকেন?"

একটী ভদ্রলোক বলিলেন, আমি জানি সে বাড়ীতে আশুতোষ ঘোষ বলে একজন উকিল অনেক দিন থেকে ভাড়াটে আছে।"

"সেখানে একবার খোঁজ করা দরকার ত—তা'হলে আপনারা কেউ আমার সঙ্গে আসুন।"

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আশু বাবু তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত ২৯ নং ভবনে আসিয়া দেখা দিলেন। সুরেশের প্রশ্নের উত্তরে উকিল আশুতোষ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস নামে তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধু এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রাকটিস্ করিতেন, চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁর মৃত্যু সংবাদ তাঁহারই অপর বন্ধু নিবারণচন্দ্র সেন তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানায়, তাহাতে টেলিগ্রামের উল্লেখ ছিল, কিন্তু যতদূর স্মরণ হয় কোন টেলিগ্রাম তিনি পান নাই।

সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল। কি বিষম ভুল! কি মর্ম্মান্তিক!

আশুবাবু বাড়ী ফিরিলে থিয়সফিষ্ট মহাশয় মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমার কিন্তু এখনও সন্দেহ হয়! আশুবাবু ঘৃণার সহিত তাঁহার দিকে তাকাইলেন। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা!

সুরেশ, প্রাণের আবেগে একেবারে ঝড়ের মত বাটির মধ্যে দৌড়িয়া গেল। গিয়া কক্ষ মধ্যে দেখিল, কেশ হীনা বিধবা বেশিনী সরোজিনী মৃত্যু শয্যায় শায়িতা। সুরেশ ধীরে ধীরে সরোজিনীর মস্তকটী কোলের উপর তুলিয়া লইল। দেখিল ক্ষীণ চর্ম্মাবরণে কয়খানা কঙ্কাল মাত্র সাজান রহিয়াছে।

সুরেশ অধীর ভাবে বলিল, "সরো, একবার চেয়ে দেখ আমি এসেছি!

সরোজিনী সুরেশের মুখের দিকে চাহিল—একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীর স্বরে বলিল, "এসেছ তুমি, আমাকে নিতে এসেছ, এতদিন পরে বুঝি মনে পড়্‌ল! চল নিয়ে চল! এতদিন শুধু কেবল তোমাকে ডেকেছি—খোকাকে নিয়ে গেছ আমাকেও নিয়ে চল!"

সুরেশ ব্যথিত প্রাণে বলিল, "সরো, চুপ কর, তুমি কি বল্‌ছ, এই যে আমি, তুমি আমার কোলে শুয়ে আছ!"

শেষ রাত্রে সরোজিনী সুরেশের কোলে মাথা রাখিয়া ইহ জগৎ হইতে বিদায় লইল। বাড়ীতে একটা হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনের রোল উঠিল।

সুরেশ ধীরে ধীরে উঠিল—তারপর মাতালের মত টলিতে টলিতে অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেল—কেহ তাহাকে দেখিল না!

থিয়সফিষ্ট্‌ মহাশয় আশুবাবুকে নানারূপে সান্ত্বনা দিলেন এটুকুও বুঝাইয়া দিলেন "ওটা সুরেশের প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়, দেখ তোমার মেয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেল। ওটা তোমার মেয়েকে শুধু ডেকে নিতে এসেছিল। এমন হয়ে থাকে। অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

"কে এসেছ?"

আজি এ পূজোর মন্দিরে মোর
কে এসেছ তুমি দেবতা?
স্নিগ্ধ পরশে ঊষার আলোক
এনেছে আশার বারতা।
সুরভিত আজ প্রভাতের বায়,
জীবন পরশে চেতনা বিলায়,
উজ্জ্বল আজি প্রভাতের আলো
দীপ্তি মাখিয়া কে দিল?
সুন্দরতম অতুল শোভায়
মন্দিরে মোর কে এল?
সকল তর্ক গরিমা ও জ্ঞান,
দেখিনু নিমেষে একি মহাধ্যান!
সকল দ্বন্দ্ব চরণে তোমার
দাঁড়ায়েছে কর জোড়ে;
শুধু একখানি আকুল হৃদয়
জাগিয়া উঠেছে ধীরে।
মীমাংসা ভেদ যাহা কিছু সব
চুপ হয়ে গেছে স্তবধ নীরব,
শুধু সে একক সত্য মহান্‌
চিত্ত ভরিয়া রয়েছে;
শুধু সেই এক মহা পূর্ণতা
বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে।
গিয়াছে দৈন্য, গেছে মলিনতা,
ঘুচে গেছে আজ সকল দীনতা,
লাজে নত প্রাণ আনন্দে একি
জাগিয়া উঠিছে আজ।
কে এসেছ তুমি মন্দিরে মোর
ওগো মহারাজ রাজ!
জাগিয়া উঠিয়া চিত্ত আমার,
বন্দনা গায় হে দেব তোমার,
পাগল পরাণ মাতিয়া উঠিছে
পেয়েছে তোমারে স্বামী!
আরাধ্যতম ওগো, ও দেবতা!
আজি কি এসেছ তুমি!

শ্রীসুধাসিন্ধু সেনগুপ্ত।

সমালোচনা।

১। ওলাউঠা-চিকিৎসা। বিক্রমপুর, স্বর্ণগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০। প্রকাশক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই পুস্তকের রচয়িতা মহাশয় ধনী এবং কৃতবিদ্য, তদুপরি তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞ। লোকের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্যই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। ধনী কি দীন, কাহারও গৃহে কেহ পীড়ায় আক্রান্ত হইলে ইনি নিজের সকল সুখ-স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া বিনা পারিশ্রমিকে, এমন কি ঔষধের মূল্য পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিয়া তাহাকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর মহামারীর সময় ইহার পরিশ্রম দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।" এরূপ মহানুভব ব্যক্তি নিজ অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ যাহা লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের উপকারে আসিবারই কথা। পুস্তকখানা ক্ষুদ্র হইলেও বেশ শৃঙ্খলার সহিত

লিখিত। প্রকাশক মহাশয় পুস্তকখানার জন্ত যে "স্বাতন্ত্র্য" দাবী করিয়াছেন, তাহার অনুকূলে যদিও পুস্তকে আমরা বিশেষ কিছু দেখিলাম না, তবু এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা যাঁহাদের ব্যবসায় নহে অথচ যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক বাক্স বাড়ীতে রাখিয়া থাকেন, তাহারা ঔষধের বাক্সের সঙ্গে সঙ্গে এই পুস্তকের একখণ্ড রাখিলে উপকৃত হইবেন।

ময়মনসিংহের বিবরণ। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। এই পুস্তকখানিকে ময়মনসিংহের ইতিহাসের ভূমিকা বলা যাইতে পারে। ময়মনসিংহকে যাহারা সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে জানিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসীর এই পুস্তক এক একখানা থাকা উচিত। পুস্তকখানা নানা কারণে কিছু 'শুষ্ক' হইয়া পড়িয়াছে। একটু চেষ্টা করিলেই এইরূপ বিবরণী উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য করা যাইতে পারে। গ্রন্থে বর্ণিত স্থান গুলি বেড়াইয়া বেড়াইয়া স্বচক্ষে দেখা এবং তাহার পরে তাহাদের জীবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা অবশ্য অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার; তবু ময়মনসিংহের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান গুলির পূর্ণ বিবরণ পাইবার আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে কেদার বাবু আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন। শুধু কতগুলি নামের তালিকা পড়িয়া কোন দিনই তৃপ্তি হয় না। পুস্তকের কোথাও কিশোরগঞ্জের পরামাণিকদের বিস্তৃত বিবরণ দেখিলাম না। তাহাদের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও স্তূপীকৃত হইয়া পাহাড়ের মত পড়িয়া রহিয়াছে।

রুক্মিণী। (কাব্য) শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত। রঙিন্ কালীতে কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। ১০১ পৃষ্ঠা, মূল্য দশআনা। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির ভাষা অনেক স্থানেই কর্কশ, ছন্দোবন্ধ একান্ত শিথিল, প্রবাহ মন্থর এবং চরিত্রাবলি এক রুক্মিণীর ভিন্ন কোনটীই ভাল ফোটে নাই। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও এই নবীন মহিলা কবির প্রথম কাব্যখানি পড়িয়া আমাদের মনে বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হইতেছে। কাব্যের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে না পারিলেও তিনি স্থানে স্থানে যে কবিত্বের আভাস দিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাষ বলিয়া মনে হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ২য়, ৬ষ্ঠ, ১৩শ সর্গের উল্লেখ করিতে পারি। এই সর্গ গুলির প্রারম্ভে রুক্মিণীর কার্য্যকলাপ বর্ণনায় লেখিকার লেখনী ও কল্পনা যেন জড়তা পরিত্যাগ করিয়া সৌন্দর্য্যে ভরপুর হইয়া সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি,—যেখানে রুক্মিণী একাকিনী, সেইখানেই যেন রুক্মিণীর চিত্র জীবন্ত,—উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় লেখিকার প্রতিভা কাব্য রচনার উপযোগী নহে, খণ্ড কবিতায় বোধ হয় তাহা অধিকতর সার্থকতা লাভ করিবে। সমগ্র দর্শন হইতে খণ্ডদর্শনে তিনি নিপুণতরা।

প্রীতিপুষ্পাঞ্জলী। শ্রীযুক্তা সরেজবাসিনী গুপ্তা প্রণীত। বরিশাল আদর্শ লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। ১০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য আটআনা। নামেই প্রকাশ,—আলোচ্য গ্রন্থখানি কবিতা পুস্তক; ইহা কতগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। বরিশাল কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় পরিচয় স্বরূপ পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে লেখিকা বালিকা মাত্র এবং ইহাই নাকি তাঁহার প্রথম উদ্যম। কবিতাগুলিও এইজন্যই বোধ হয়, অধিকাংশই কবিত্বরস-হীন গদ্য ভাবাপন্ন, শিথিল ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। তবে, উঁচুদরের কবিত্বের পরিচয় পুস্তকে না থাকিলেও অনেক গুলি কবিতায় সহজ সরল করুণরসটুকু মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা,—"স্বপ্নভোর" "অশ্রু" "মানবজীবন" এবং "জেঠামণির প্রতি"—এই কয়টি কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। আমরা ভবিষ্যতে লেখিকার নিকট হইতে উচ্চতর কবিত্বের প্রত্যাশায় রহিলাম।

কর্ণের আত্মসংযম।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson

৬ষ্ঠ ভাগ। | চৈত্র, ১৩১৭। | ১২শ সংখ্যা।

সাহিত্যের শক্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতীয় চরিত্রের আরও চারিটি বিষয় প্রাচীন সাহিত্যের নিকট ঋণী। ইহার প্রথম বিষয় জাতিভেদ। এই প্রথা হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবাহিত হইয়া রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই প্রথার মূল কারণ ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার। কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে। মনু ও অপরাপর স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণ শূদ্রের প্রতি অনেক কঠোর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে ব্যবস্থা এ প্রথার একমাত্র কারণ নহে। ইহার কারণ উচ্চজাতির অহঙ্কার নহে, বরং নীচজাতির আত্মবিলোপ। যদি ইহা অত্যাচার-মূলক হইত, এতদিন এ প্রথা স্থায়ী হইতে পারিত না। হীনতর জাতি এ অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদিগের উন্নতির উপায় করিয়া লইত। আজকাল এইরূপ উন্নতির চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু এ প্রথার মূলকারণ পুরাণগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেখানে পাইবেন, ব্রাহ্মণেরা দেবতা, তাঁহাদের সেবা করা মহাপুণ্য। তাঁহাদের চরণের ধূলি পাপ হরণ করে, তাঁহারা ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাতে ব্রাহ্মণ ও অন্য শ্রেষ্ঠতর জাতিসমূহ হীনজাতির নিকট অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিয়াছে। এবং উচ্চজাতি সমান অধিকার দিলেও হীন-জাতি তাহা গ্রহণ করিতেছে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাতিভেদ প্রথা ভঙ্গ করিবার জন্য যত আন্দোলন হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই উচ্চজাতির দ্বারা প্রবর্ত্তিত। বুদ্ধ ক্ষত্রিয়, নানক বৈশ্য, চৈতন্য ব্রাহ্মণ, রাজা রামমোহন ব্রাহ্মণ, কেশবচন্দ্র বৈদ্য, কেবল এক কবির তন্তুবায়।

আর তিনটি বিষয় বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী সাহিত্যের ফল। প্রথমটি পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় পরলোকে বিশ্বাস, তৃতীয়টি অদ্বৈতবাদ।

হিন্দুগৃহে গমন কর, দেখিতে পাইবে তাহা দেবদেবী বিশ্বাসের একটী জীবন্ত স্থান। কালী নাই, দুর্গা শিব বা বিষ্ণু নাই—ইহা তাহারা কল্পনাই করিতে পারে না। মানব যদি জীবাত্মার দৃষ্টান্তে পরমাত্মার চিন্তা করে এবং সৃষ্টিকর্ত্তাকে যদি অনন্ত বলিয়া মনে করে তাহা হইলে স্রষ্টাকে কখনও সাকার কল্পনা করিতে পারে না। এই জন্য মানবের পক্ষে জগতের স্রষ্টাকে সাকার কল্পনা অপেক্ষা নিরাকার কল্পনা করা সহজ। হিন্দুসমাজের বাহিরে এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজের শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই ঈশ্বরকে নিরাকার মনে করে। কিন্তু হিন্দুসমাজে পৌত্তলিকতা যেন প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ পুরাণগুলি। গৃহে গৃহে চণ্ডীপাঠ হইতেছে। পুরাণে দেবদেবীর কাহিনী ও মাহাত্ম্য নানা ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। লোকে প্রতিনিয়ত এই সকল শুনিতেছে এবং বাল্যকালাবধি শুনিতেছে বলিয়া এ বিষয়ে আপনা হইতেই বিশ্বাস জন্মিতেছে—কোন সন্দেহ হয় না। এই দেবদেবী পূজা বৈদিক হিন্দুদিগের মধ্যে ছিল না। বৌদ্ধদিগের পরে আর্য্য ও অনার্য্য সংমিশ্রণে এই সকল দেবদেবী অনার্য্য ধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মে আসিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা লোকের যাগযজ্ঞের প্রতি অনিচ্ছা দেখিয়া ইহাদিগের সম্বন্ধে নানাবিধ পুরাণ, নানা প্রসঙ্গ, কথা, ফল ইত্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। প্রতি গৃহে, প্রতি অনুষ্ঠানে ইহা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া লোকের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়াছে।

এই পুরাণ হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসের আর একদিক গঠন করিয়াছে। হিন্দু যেমন পরলোকে বিশ্বাসী এমন আর প্রায় দেখা যায় না। ইহার কারণও গ্রন্থকারের কল্পনা ও সাহিত্য। পুরাণে স্বর্গ ও নরক, দেবদেবী ও তাহাদের আবাস-স্থান স্বর্গ—ইত্যাদি বিষয়ের এমন বর্ণনা আছে, যাহা অন্য কোন প্রাচীন বা আধুনিক ধর্ম্মে নাই। ইহাতে পরলোকের প্রতি বিশ্বাস হিন্দুর স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহার অনেক কাজ পরলোকে সুখভোগের জন্য। ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, এবং কঠোর উপবাস ইত্যাদি আচার পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয় উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহলোকে সৎকাজ করা, পরোপকার করা—এ সমস্তই পরলোকে সুখভোগের জন্য। হিন্দু জলাশয় খনন করে, দান করে, অতিথি সেবা করে, পূজা করে, এমন কি সতী স্বামীর চিতায় নিজকে আহুতি দেন—পরলোকে সুখে থাকিবার জন্য। ইহলোক তাহার নিকট নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

তৃতীয়তঃ পরলোকে বিশ্বাসের পার্শ্বে আর একটি বিশ্বাস হিন্দুর চিন্তা ও ভাবের সহিত জড়িত হইয়াছে—ইহা অদ্বৈত মত, অর্থাৎ "কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র!"—কে তোমার স্ত্রী কেইবা পুত্র!—এই ভাব। উপনিষদে এই অদ্বৈতমতের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা প্রবল হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে ষড়দর্শনের সৃষ্টি। অতএব যখন সকল দর্শনেরই চর্চ্চা ছিল তখন অদ্বৈতবাদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য এই অদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এই দার্শনিক মত অপরাপর সকল দর্শন অপেক্ষা প্রবল হইতেছিল। তিনি উপনিষদগুলির এই মতানুযায়ী ভাষ্য করিলেন। বেদান্তদর্শনের সূত্র এই অদ্বৈত মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলেন * এবং এমন কি গীতাতেও এই মতানুযায়ী ভাষ্য যুক্ত হইল। সেই সময়ে ও তাহার পরে যত কিছু পুরাণ রচিত হইল, সকলের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে এই মত প্রচারিত হইয়াছে। এই সকলের ফলে হিন্দুসমাজ আজ এই মায়াবাদে জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে। হিন্দু এ সংসারকে অনিত্য বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করে। যাহা ভবিষ্যতে আসিতেছে তাহা লইয়াই হিন্দু ব্যস্ত। একদিকে যেমন ভয়ানক পাপ এ সমাজে অল্প, অপরদিকে ঈশ্বর আমাদিগকে যে জীবন, পৃথিবী ও পরিবার দিয়াছেন,

* শঙ্কর যে বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত ভাষ্য করিতে পারেন নাই সে সম্বন্ধে ডাক্তার থিব কৃত শঙ্কর ভাষ্যের ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

তাহা সম্ভোগ করা ও তাহার উন্নতি করা এ জাতির মধ্যে তেমন প্রবল ভাবে দেখা যায় না। এ জীবন দুইদিনের হইলেও ইহা যে আরও সম্ভোগ করা যায়, পারিবারিক সম্বন্ধ আরও গভীর ও মিষ্ট করা যাইতে পারে, এবং নানা প্রকারে পৃথিবীর নানা উন্নতি করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবের ক্ষুদ্র জীবনকে আরও সুখী করা যাইতে পারে—সে ধারণা নাই বলিলেই হয়। ইহার মূলে প্রধানতঃ সাহিত্য।

বর্ত্তমান সাহিত্যের ফল বিচার করিবার সময় এখনও আইসে নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা ইহার কিছু পরিচয় পাইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এখন সাধারণে বহুল পরিমাণে পড়িয়া থাকে—স্কুলের অজাত-শ্মশ্রু বালক হইতে পল্লীগ্রামের নবোঢ়া কুলবধূরা সকলেই তাহা পড়িয়া থাকে। অতএব ইহার ফলের আভাস কিছু এখনই পাওয়া যাইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দ মঠে" ইতিহাসের আবরণে কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দুইশ্রেণীর লোক দেখা গিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃত সংসারবিরাগী, তাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ, ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুতেই বিচলিত হইতে চাহেন না। পর্ব্বতে অথবা নির্জ্জন তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহারা আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ স্থাপনে প্রয়াসী। সৎ ও অসৎ সকল কামনা হইতে বিমুক্ত হওয়াই তাঁহাদের সাধনা। যদি তাহারা লোকালয়ে আগমন করেন, সে কেবল স্থানের আসক্তি ছেদন করিবার জন্য অথবা মানবকে উপদেশ দিবার জন্য। আর একশ্রেণীর সন্ন্যাসী আছে, তাহারা পেটের দায়ে সন্ন্যাসী, অর্থাৎ তাহারা লোকেরা নিকট ধর্ম্মের ভান করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করে। ইহারা নানারূপ নেশা করে, অসার জীবন যাপন করে, এবং অনেকের গৃহে পরিবার প্রতি-পালনের ইহাই উপায়। বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দ মঠের" শেষে যে সন্ন্যাসীদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্ন্যাসীদিগের। অনেকগুলি সন্ন্যাসী একত্র হইয়া শেষে বঙ্গদেশে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের হাতে দেশ উদ্ধারের ভার দিয়া ইতিহাসের সপিণ্ডীকরণ করা হইয়াছে। সে যাহা হউক, তাঁহার বর্ণনা ও লিপিচাতুর্য্য অনেক যুবকের মন আকর্ষণ করিয়াছে এবং অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা হইযাছে যে, প্রকৃতই সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা দেশ উদ্ধার হইতে পারে এবং সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহারা এইরূপে স্বদেশের উদ্ধারাকাঙ্ক্ষী! কতকগুলি যুবক সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এইরূপ স্বদেশ প্রেমিক অনু-সন্ধান করিতে গিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, কতকগুলি যুবকের ধারণাই হইয়াছিল যে এইরূপ সন্ন্যাসী আচার অবলম্বন করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে হইবে। এদিকে এই কৃত্রিম সন্ন্যাসীদিগের জন্য নিরীহ সন্ন্যাসীদিগের নিরাপদ থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কোন স্থানে সন্ন্যাসী আগমন করিলে পুলিস তাহার পশ্চাতে যায় এবং ইহাতে তাহাদিগকে সময়ে সময়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবীচৌধুরাণী" আর এক অদ্ভুত কল্পনার সৃষ্টি। সকল বিষয় আলোচনা করিবার স্থান নাই, ইহার মধ্যে কেবল ভবানী পাঠকের ডাকাতির কথা আলোচনা করিব। এদেশে বিশ্বনাথ বাবু, তান্তিয়াভিল ইত্যাদি ডাকাত ছিল, যাহারা ধনীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, আবার দরিদ্রকেও দান করিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্কট লিখিত "রবরয়ের" দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই ডাকাতির সহিত রাজনীতি যোগ করিয়াছেন। ভবানী পাঠক ডাকাতি করে কেবল দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য ও রাজনৈতিক অত্যাচার দমনের জন্য। ইহাতে অনেকের নিকট ডাকাতি করা একটা মহৎ বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। অনেকের ধারণা হইয়াছে যে দেশের কল্যাণের জন্য ডাকাতি করা কখনও দোষের নহে। কে বলিতে পারে যে আজ কাল যে ডাকাতির মধ্যে ভদ্রলোকের সন্তানদিগের নাম শুনিতে পাইতেছি, তাহাদের আদর্শ এই দেবীচৌধুরাণী হইতে গ্রহণ করা হয় নাই।

যখন সাহিত্য সমাজগঠনের পক্ষে এত শক্তিশালী, এবং সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি এবং সৎ ও অসৎ ভাবের সহিত যখন জাতীয় উন্নতি ও অবনতি জড়িত রহিয়াছে, তখন জাতীয় সাহিত্য কি প্রকার হইবে সে

সম্বন্ধে দুই একটি বিষয় আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথমতঃ, সাহিত্য নিরন্তর উন্নতিশীল হইবে। অপরাপর দেশের সাহিত্য অতিক্রম করিতে না পারুক, অন্ততঃ ইহা তাহার সমকক্ষ হইবে। আজকাল পৃথিবীতে জীবনসংগ্রাম অতি কঠিন হইয়াছে। ব্যক্তিগত মানুষে মানুষে যত তাহা অপেক্ষা জাতিতে জাতিতে জীবনসংগ্রাম আরও কঠোরতর হইয়া উঠিয়াছে। যে জাতি জ্ঞানে, সভ্যতায় ও চরিত্রে হীনতর, তাহারা এ সংগ্রামে পরাজিত হইতেছে। এক জাতিকে অপর জাতির সমকক্ষ করিবার যত উপায় আছে জাতীয় সাহিত্য তাহার মধ্যে একটি। সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দেশের নিকট ধরিবে। কিন্তু যদি ইহা কেবল প্রাচীন লইয়াই থাকে এবং জগতের উন্নতির সহিত চলিতে না পারে, তাহা হইলে সে জাতির দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য দেখি, যে জাতির সাহিত্য উন্নতিবিমুখ হইয়াছে, যাহারা কেবল প্রাচীন লইয়াই ব্যস্ত সে জাতি জীবনসংগ্রামে পদে পদে পরাজিত হইতেছে। অতএব জাতীয় সাহিত্য জনসমাজকে জগতের উন্নত আদর্শ, উন্নত জ্ঞান, উন্নত সভ্যতা, ধর্ম্ম ও নীতির সহিত পরিচয় করাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যের উপর যখন জনশিক্ষার ভার রহিয়াছে তখন ইহার আরও তিনটি প্রকৃতি থাকা উচিত। প্রথমতঃ যাহা সার ও সত্য, যাহা আদর্শ, যাহা জাতির উত্থান ও পতনের দ্বারা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না,—তাহাই সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিতে হইবে। তাবার মোহনসৌন্দর্য্যে মানব তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবে—যেমন কোন ভাব সঙ্গীতের তানলয়যুক্ত হইলে আমাদের মনে সহজে অঙ্কিত হয়। সাহিত্যের যদি কিছু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য থাকে, তাহার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যবহার আর কি হইতে পারে? ইহা হইতেই আমরা দ্বিতীয় প্রকৃতির আভাস পাই। সাহিত্য কখনও শুধু বর্ত্তমানে আবদ্ধ থাকিবে না। ইহা বর্ত্তমান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে না, বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের উন্নত অবস্থাই বেশী করিয়া দেখাইবে। বর্ত্তমান ঘটনা যাহা কিছু বর্ণনা করিবে তাহার মধ্যে যাহা দোষ আছে তাহা দেখাইয়া উন্নততর আদর্শ সমাজের সম্মুখে ধরিবে। উপন্যাস সম্বন্ধে এ কথা বেশী খাটে। উপন্যাস কেবল বর্ত্তমান সমাজচিত্র লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে না। কিন্তু সমাজের ভাল ও মন্দ দেখাইয়া সংশোধনের উপায় নির্দ্দেশ করিবে।

তৃতীয় বিষয়টি আরও গুরুতর। মানবের শারীরিক হীনবৃত্তিগুলি অতিশয় প্রবল। সুতরাং যে সকল পুস্তক এই সকল বৃত্তি উত্তেজিত করে, তাহা সমাজের মহা অপকার করে। প্রকৃতপক্ষে জয়দেবের "গীতগোবিন্দ", ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" এবং উপেন্দ্র ভঞ্জের উৎকল কাব্য উপকার অপেক্ষা দেশের অপকারই বেশী করিয়াছে। উপন্যাস লেখক যে এ দিক স্পর্শ করিবেন না তাহা নহে, কিন্তু এই সকল বৃত্তির শারীরিক প্রকৃতি বর্জ্জন করিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন, সাহিত্যজগতে তাঁহারাই ধন্য। কিন্তু যাঁহারা এই বৃত্তিগুলির কেবল শারীরিক প্রকৃতিই শিক্ষাদান করেন মানবকুলের তাহারা মহাশত্রু। যে উপন্যাস পড়িলে মন উন্নত না হইয়া কর্দ্দমে লিপ্ত হয়, যাহা মানবের মহৎ দিক না দেখাইয়া কেবল অসৎদিক দেখায়,—তাহা কি আবার উপন্যাস,—তাহা অস্পৃশ্য আবর্জ্জনা মাত্র। আজকাল অনেকে গোয়েন্দা কাহিনী লিখিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। এই সকল পুস্তক মানবের কেবল পাপের দিকই দেখায়। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এসকলের অল্পই মূল্য দেন।

এখন কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। যেরূপ কবিতা সচরাচর দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই কবিতা পদবাচ্য নহে। ইহার অধিকাংশই নিজের প্রাণের কথা, দুঃখের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া লেখা। কবির আসন অতি উচ্চ। এ বিশ্বের একটি ভাষা আছে যাহা সকল সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। সূর্য্যের আলোক যেমন সকলের উপর সাধারণ ভাবে পতিত হয়, এ ভাষা সেরূপ সাধারণ নহে,—ইহা প্রতি প্রাণকে স্বতন্ত্র ভাবে আহ্বান করে। ইহা কাণদিয়া শুনা যায় না, প্রকৃতির হৃদয় সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া মানবহৃদয় স্পর্শ করিলে এ ভাষার

সৃষ্টি হয়। যে একটু শুনিতে পায়, সে আরও শুনিতে চাহে,—এবং সে এই বিশ্বের অন্তরালে যে বিশ্বপ্রাণ রহিয়াছেন সেই অনন্তের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাহে। বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য ক্রমে সেই অনন্ত বিশ্বপ্রাণের সম্ভাষণে মুখরিত হইয়া উঠে। মানব ইহা বুঝিতে পারে, কিন্তু অপরকে ইহা বুঝাইবার শক্তি সকলের থাকে না। কবিরাই তাহা পারেন। প্রকৃত কবি আমাদের সৌন্দর্য্যের চক্ষু খুলিয়া এই বিশ্বপ্রাণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

কবির আরও দুইটি প্রকৃতি আছে। আমরা যেখানে কোন সম্বন্ধ দেখি না কবি তাহাকে সমস্ত বিশ্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখেন, এই জন্য আমরা যেখানে কেবল শুষ্কতা দেখি,—কবি তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দিত হন। তাঁহার নিকট কিছুই অসুন্দর নাই, মানবের সমস্ত সম্বন্ধ, সকল ভাব (যাহা স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া অসৎ হইয়াছে, তাহা ব্যতীত), জগতের সকল স্বাভাবিক বিষয়ই সুন্দর, এবং বিশ্বসৌন্দর্য্যের প্রকাশ। আর এই বিশ্বসৌন্দর্য্য কি?—বিশ্বের অন্তরালে যে নিত্য-সুন্দর বিশ্বপ্রাণ তাঁহারই প্রকাশ।

এই সৌন্দর্য্যের উপর এত বিশ্বাসী বলিয়া ভবিষ্যতেও তিনি সৌন্দর্য্য ও মিলন কল্পনা করেন। এ জগতের যাহা কিছু পরিণাম তাহা সৌন্দর্য্যের বিধি দ্বারাই নিয়মিত। তিনি মনে করেন, নদীর কল্লোল যেমন পরিণামে স্থির শান্ত সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, মানব-সমাজের বাদ বিসম্বাদ সেইরূপ পরিণামে এক মহামিলনে মিলিত হইবে। এখানকার তর্কযুক্তি তাঁহার নিকট নিতান্তই তুচ্ছ, কেবল ঋষির ন্যায় সৌন্দর্য্যের চোখে ভবিষ্যতে দৃষ্টি করিয়া তিনি যাহা দেখেন, তাহাই শিক্ষা দেন। এ অর্থে আমাদের কবি কয়জন? এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য রূপে আর কেহ আমাদের দেশে ইহা শিক্ষা দিতে পারেন নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী।

মণ্ডন-পরাজয়।

নর্ম্মদার উত্তর দিকে শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ ভূভাগ মধ্যে পুণ্যতীর্থ মাহিষ্মতী নগরী অবস্থিত। নগরীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া পূত-সলিলা প্রশস্তদেহা নর্ম্মদাদেবী সরল রেখায় তরতর বেগে প্রবাহিতা। এই মাহিষ্মতী নগরী দ্বিধা বিভক্ত করতঃ ক্ষুদ্র মাহিষ্মতী নদী নর্ম্মদার সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে। সঙ্গমস্থলে ইহার উভয় তীরে দুইটী অতি সুন্দর দেবমন্দির। অনতিদূরে শিলাময় দ্বীপমধ্যে অভ্রভেদী মন্দির-চূড়া, নর্ম্মদাবক্ষে শোভমান্। নগরীর সীমা অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদা দর্শকের মনোমুগ্ধকর সুন্দর জলপ্রপাতরূপে পরিণত হইয়াছে এবং নীলাকাশে মেঘমালার ন্যায় সুদূরস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া অনন্তের অভিমুখে যেন ছুটিয়াছে।

মাহিষ্মতী নগরী মধ্যে নানাস্থানে নানা দেবমন্দির, মন্দির-গাত্র নানা কারুকার্য্যখচিত; এবং চূড়া সমূহ বিচিত্র পতাকা-শোভিত। চারিদিকে সুদৃশ্য মনোহর অট্টালিকা, সুরভিত পুষ্প-কানন, সুরসাল ফলের বৃক্ষপূর্ণ রমণীয় উদ্যান; সুসজ্জিত অসংখ্য বিপণিশ্রেণী, প্রশস্ত রাজপথ, নগরীর উপকণ্ঠে হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, কৃষকসমূহের সুপরিচ্ছন্ন মৃৎকুটীর নগরীকে যেন একখানি চিত্রপট করিয়া রাখিয়াছে।

একদিন প্রাতঃকালে নর্ম্মদাতীরে তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক সন্ন্যাসী গমন করিতেছেন। সন্ন্যাসীর অপরূপ রূপ, প্রসন্ন বদন, সৌম্যগঠন, তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণ, আয়ত নেত্র, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ দেহ, মুখচন্দ্র অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়, বদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞের চিহ্ন, ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপ দেখিয়া তাঁহাকে সামান্য মানব জ্ঞান হয় না। সন্ন্যাসীর মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে গৈরিক কৌপীন, অঙ্গে গৈরিক বহির্ব্বাস, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র চিহ্ন, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, সুকুমার দেহ বিভূতি ভূষিত, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড। বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ মাত্র। সন্ন্যাসীকে দেখিলেই হৃদয়ে মহান্ ভাবের উদয় হয়, মস্তক যেন আপনা হইতেই সন্ন্যাসী-চরণে অবনত হয়।

সন্ন্যাসীর পশ্চাতে কতিপয় সাধু। ইঁহাদেরও গৈরিক

বাস, প্রশান্ত বদন, হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, দেখিলেই মনে হয় ইঁহারা উক্ত সন্ন্যাসীর শিষ্য সেবক।

প্রাতঃকালীন স্নানার্থ নর্ম্মদায় এক্ষণে অসংখ্য জনসমাগম হইয়াছে। নগরবাসীগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন। কেহ ভাবিতেছেন—সাক্ষাৎ কৈলাসনাথ কি আজি কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া নরবেশে নর্ম্মদা তীরে আবির্ভূত? কেহ কেহ বা ভক্তি ভাবে উদ্দেশে সন্ন্যাসী চরণে প্রণত, কেহ বা তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন।

বয়স্থা রমণীগণমধ্যে এই নবীন সন্ন্যাসী দেখিয়া যেন বাৎসল্য স্নেহ উথলিত হইল, তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন—"আহা কার এই সুকুমার কুমার? বাছা কি দুঃখে এই নবীন বয়সে সন্ন্যাসী সাজিয়াছে! কোন্ পাষাণী পাষাণপ্রাণে এমন সোনার বাছাকে বিদায় দিয়াছে!" কোন বালিকা নদীতীরে মৃণ্ময় শিবমূর্ত্তি গড়িয়া শিবপূজায় রত ছিল, সে এক্ষণে এই শিবতুল্য সন্ন্যাসী সম্মুখে দেখিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে তাঁহার উদ্দেশে প্রণিপাত করিল। কাহারও বা বহুদিন গত নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে সহসা মনে পড়িল, তিনি যেন ছল ছল নেত্রে চক্ষু ফিরাইলেন। কোন পুত্রবিয়োগবিধুরা জননী আজি এই বালক সন্ন্যাসী দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে দুই ফোঁটা অশ্রুজল বসনাঞ্চলে মুছিলেন। কেহ কেহ বা বিস্মিত নেত্রে সন্ন্যাসী পানে চাহিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসীর কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কোন চাঞ্চল্য নাই, তিনি ধীর গম্ভীর ভাবে চলিয়াছেন; তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন প্রশান্ত বদন প্রতি চাহিলে মনে হয় তাঁহার হৃদয় যেন এ জগৎ ছাড়িয়া কোন্ অনন্ত রাজ্যে বিচরণ করিতেছে।

ক্রমে তিনি নগর মধ্যস্থ দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে এক ব্রাহ্মণ মণ্ডন-মিশ্রের গৃহে এই সন্ন্যাসীর সংবাদ প্রদান করিতে চলিলেন। সন্ন্যাসীগণ পূজা অর্চ্চনা করুন। আমরা ততক্ষণ এই মণ্ডন মিশ্রের সহিত পরিচিত হইয়া আসি।

নর্ম্মদা ও মাহিষ্মতীর সঙ্গমস্থলে মাহিষ্মতী তীরে কতিপয় কদম্বৃক্ষ মূলে মণ্ডনমিশ্রের বাস ভবন। তিনি মাহিষ্মতী নগরীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক ও নগর বাসীর গৌরব। তাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট গঠন, সুস্থ সবল সুকোমল দেহ; সরল নাসিকা, মধ্যম ললাট, তাহাতে চন্দনরেখা, চক্ষু দুইটি একটু গোলাকার কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, মস্তকটী সুগোল, মধ্যস্থলে দীর্ঘ শিখা, তাহাতে একটী সচন্দন পুষ্প, গলদেশে যজ্ঞোপবীত। তাঁহাকে দেখিলেই মনে ভয় ভক্তি দুই ভাবেরই যুগপৎ উদয় হয়। তিনি অত্যন্ত বিচারচতুর ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিংশবর্ষ হইবে। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। বেদবিহিত যজ্ঞকর্ম্মে সদা নিরত। তর্ক শাস্ত্রে নিপুণ। তাঁহার গৃহে নিত্য যাগ যজ্ঞ, পূজা পাঠ, বার ব্রত, ব্রাহ্মণ ভোজন, সদাব্রত অতিথিসেবা, দীনদুঃখী অতিথির তাঁহার গৃহে অবারিত দ্বার। এ কারণ তিনি সমগ্র নগরবাসীর পূজ্য ছিলেন। সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত। সর্ব্বোপরি মিশ্র-পত্নী উভয়-ভারতীর ধনী নির্ধনে সমভাবে অযাচিত করুণারাশি নগরের তাবৎ লোককে মুগ্ধ করিয়াছিল।

মিশ্র মহাশয়ের মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের উপযোগী ধনেরও তাঁহার অভাব ছিল না। তাঁহার কতকগুলি ছাত্র ছিল, তিনি তাহাদের অধ্যাপনা করিতেন।

তাঁহার বাটীখানিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্মুখে কিছু ফুলের বাগান, তৎপশ্চাৎ আটচালা, তথায় ছাত্রগণ পাঠ অভ্যাস করিত ও মিশ্রমহাশয় উপবেশন করিতেন। তাহার পর বৃহৎ প্রাঙ্গন ও দরদালান, এইখানেই যাগযজ্ঞাদি হইয়া থাকে। পশ্চাতে অন্দরমহল, তথায়ও একটু বাগান আছে, তাহাতে নানারকম ফলের গাছ ও মিশ্রঠাকুরাণীর স্বহস্তে রোপিত লাউ কুমড়া শিম বেগুণ ইত্যাদি কতকগুলি গাছ। একপার্শ্বে কয়েকটী ধানের গোলা ও মরাই বাঁধা। তাঁহার বাটীখানি দেখিলেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গৃহ বলিয়া বোধ হয়।

এক কথায় মিশ্র মহাশয়ের গৃহখানি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, স্বয়ং লক্ষ্মী যেন বিরাজিতা। তাঁহার স্ত্রী অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না ছিলেন। তিনি গৃহখানি আলো করিয়া থাকিতেন। তাঁহার চিত্রকলা ও অঙ্কশাস্ত্রে

পারদর্শিতার কথা মাহিষ্মতীবাসী কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলে বলিত মিশ্র-গৃহিণী যেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। এহেন মিশ্রদম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহারা কেহই দুঃখিত ছিলেন না। মিশ্র ঠাকুর কর্ম্মকাণ্ড ও তর্ক শাস্ত্র লইয়াই মহা সুখী, ঠাকুরাণীও চিত্রকলা লইয়াই সন্তুষ্টা ছিলেন।

মিশ্রগৃহিণীর আর একটী বড় সখের জিনিস ছিল। উহা কতকগুলি সুকণ্ঠ পক্ষী। তাঁহার দরদালানে অনেকগুলি পক্ষীর খাঁচা ও দাঁড় ঝুলিত। অনেক রকম সুন্দর সুন্দর পক্ষী তাহাতে থাকিত। পক্ষীগুলিকে তিনি স্বহস্তে পালন করিতেন ও তাহাদিগকে নিত্য বেদগান শিক্ষা দিতেন। ঠাকুরাণীর অসীম গুণপনায় প্রভাত হইলেই পক্ষীগণ সমস্বরে সুমিষ্ট বেদগান করিত।

পক্ষী জাতির এই অদ্ভুত কলাবিদ্যা নগরের সকলেই জানিত, এজন্য মিশ্রমহাশয়ের বাটীপরিচয়ের আর অন্য কোন নিদর্শন প্রয়োজন হইত না।

অদ্য মিশ্র মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ। বিস্তৃত দর দালানে শ্রাদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত। মিশ্র মহাশয় গরদের জোড় পরিয়া খড়ম পায়ে দিয়া তথায় পাইচারি করিতেছেন। পুরোহিত আসিলেই শ্রাদ্ধ কর্ম্ম আরম্ভ হইবে।

এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ শশব্যস্তে মিশ্র মহাশয়ের নিকট আসিলেন। ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, তাঁহার পরণে ভিজা কাপড়, কাঁধে ভিজা গামছা, গলায় পৈতা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় একটী লম্বা টিকী, তাহাতে একটী চন্দন মাখান ফুল গোঁজা, তাঁহার হাতে কোশাকুশী। মিশ্র মহাশয় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রা। মিশ্র মহাশয় একটা কথা শুনিয়াছেন?

ম। কি কথা মহাশয়?

ব্রা। সে কি? আপনি এখনও কিছু শুনেন নাই নাকি?

ম। না মহাশয়! আমি ত নূতন কথা কিছু শুনি নাই।

ব্রা। কি আশ্চর্য্য! তবে শুনুন, শঙ্করাচার্য্য নামে এক সন্ন্যাসী আপনার সহিত বিচার করিতে নগরে আসিয়াছেন।

ম। সত্য নাকি? কোথায় শুনিলেন?

ব্রা। মহাশয়! নগর শুদ্ধ সকলেই এই কথা বল্‌ছে, সন্ন্যাসী এখন নগরের প্রধান শিবমন্দিরে গিয়াছেন। আমি সেখান থেকেই বিশেষ খবর আনিলাম।

ম। তার পর?

ব্রা। তিনি নাকি প্রথমে প্রয়াগে কুমারিল ভট্টকে পরাজয় করিতে গিয়াছিলেন, কুমারিল কিন্তু তাঁকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।

ম। বটে! বাঁচা গেল! অনেকদিন আর বড় বিচার হয় নাই। সেই যে কুমারিল ভট্টের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করি, তারপর হতে আর তেমন লোক পাই নাই যে বিচার করি। এখন তবে কিছুদিন বিচার চলবে। তবে কি জানেন, এরা সব ভ্রষ্ট, এদের বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ বিদায় হইলে মণ্ডন ভাবিলেন, শঙ্করাচার্য্য আমার নিকটে বিচারে আসিয়াছে। হয়ত অদ্যই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। কিন্তু অদ্য আমার পিতৃশ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধে মুণ্ডীদর্শন নিষিদ্ধ। অতএব অদ্য কোন মতেই সাক্ষাৎ করা হইবে না।

এই ভাবিয়া মণ্ডন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, অদ্য বহির্দ্বার রুদ্ধ রাখ, কোনও সন্ন্যাসীকে প্রবেশ করিতে দিও না।"

ভৃত্য প্রভুর আদেশে যারপরনাই বিস্মিত হইল, কারণ তাহার প্রভুর গৃহে অতিথি সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার, অদ্য এরূপ আদেশ কেন তাহা ভাবিয়া পাইল না।

যাহা হউক সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল।

অনন্তর মিশ্র মহাশয় অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীকে এই সংবাদ দিলেন। মিশ্রগৃহিণী শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। মিশ্রঠাকুর বলিলেন "তুমি হাসিলে যে?" প্রত্যুত্তরে ঠাকুরাণী অবার হাসিলেন। মিশ্র মহাশয় কিছু অপ্রস্তুত হইলেন, কারণ তাঁহার এ সরস্বতী ঠাকুরাণীকে তিনি সব সময় বুঝিতে পারিতেন না। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া পুরোহিতের আগমন সংবাদ জানাইল। মিশ্র মহাশয়ও ব্যস্তভাবে বহির্বাটীতে গমন করিলেন।

এদিকে সন্ন্যাসিগণ মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিপ্রহর কালে একে একে মণ্ডনের গৃহসন্নিকটে আসিলেন। আচার্য্য কিছুদূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। শিষ্যগণ গৃহদ্বারে আসিয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ। দ্বারের উপর একজন ভৃত্য চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে।

মণ্ডনের ভৃত্য প্রভুর আদেশে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তথায় বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া তাহর একটুকু তন্দ্রাবোধ হইয়াছিল। এক্ষণে নিকটে পদ-শব্দ শুনিয়া সহসা সে চক্ষু মেলিল, তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া জনৈক শিষ্য কহিলেন "বৎস, বলিতে পার ইহাই কি মণ্ডন মিশ্রের গৃহ ?"

ভৃত্য তখন উঠিয়া সন্ন্যাসী চরণে প্রণাম করিল এবং কহিল "আজ্ঞে হাঁ্যা, ইহাই আমার প্রভুর গৃহ"।

শি। তোমার প্রভুকে সংবাদ দাও, আমাদের আচার্য্য জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য আসিয়াছেন।

ভৃ। মহাশয়! অদ্য তাঁহার সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে না।

শি। কি কারণে অদ্য সাক্ষাৎ হইবে না তুমি বলিতে পার ?

ভৃ। মহাশয়! অদ্য তিনি সন্ন্যাসী দর্শন করিবেন না, কারণ অদ্য তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ। তাঁহার আদেশ, অদ্য যেন কোন সন্ন্যাসীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।

শিষ্যগণ আচার্য্যকে সবিশেষ জানাইলেন। একজন কহিলেন "ভগবন্, অদ্য ফিরিয়া চলুন, মণ্ডন কোনমতেই অদ্য সাক্ষাৎ করিবেন না।"

আচার্য্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন "বৎস, অধীর হইও না। তোমরা মন্দিরে গমন কর, আমি অদ্যই মণ্ডনের সহিত সাক্ষাৎ করিব"।

অতঃপর আচার্য্য যোগবলে আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া একেবারে প্রাঙ্গণ মধ্যে আসিলেন।

দরদালানে মণ্ডন ও তাঁহার পুরোহিতদ্বয় শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিবিষ্ট ছিলেন। সহসা প্রাঙ্গণ মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময় মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনজনেই যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

সে ভাব কতটা অন্তর্হিত হইলে মণ্ডন ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—কোথা হইতে মুণ্ডী (মুণ্ডিত মস্তক) ?

আ। গলদেশ হইতে।

ম। কে তোকে এখানে আসিতে দিল ?

আ। আমি নিজেই এখানে আসিয়াছি।

ম। তুই নিশ্চয়ই চোর, নচেৎ চোরের ন্যায় পরগৃহে প্রবেশ করিয়াছিস্ কেন ?

আ। মহাশয়! চোর আমি না আপনি ? কারণ গৃহস্থের অন্নে সন্ন্যাসীর অংশ আছে। আপনি সন্ন্যাসীকে বঞ্চিত করিয়া তাহা গোপনে ভোগ করিতেছেন। অতএব বলুন দেখি, চোর কাহাকে বলা যাইতে পারে ?

ম। দেখিতেছি তোর যজ্ঞোপবীত ও শিখাধারণ ভার বোধ হইয়াছে, কিন্তু কন্থাভার বহন করিস ত ?

আ। আপনারও বেদবিহিত নিবৃত্তিমার্গ ভারবোধ হইয়াছে, তাই নারীসেবার জন্য গৃহস্থ সাজিয়াছেন।

এইরূপে মণ্ডনের কটূক্তি আচার্য্য পরিহাসোক্তিতে পরিশোধ করিলেন।

অনন্তর মণ্ডনের পুরোহিতদ্বয় কহিলেন "বৎস মণ্ডন, অদ্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ। অদ্য তোমার ক্রোধ করা উচিত নহে, তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। একে তুমি অতিথি প্রিয়, তাহাতে গৃহাগত সন্ন্যাসী অতিথি, তুমি অতিথির অবমাননা করিও না। আর ইঁহাকে ত বেদ-বহির্ভূত বৌদ্ধসন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হয় না। তুমি শীঘ্র পাদ্যঅর্ঘ দানে অতিথি সৎকার কর।"

পুরোহিতগণের বাক্য শুনিয়া মণ্ডন কৃতাঞ্জলিসহ কহিলেন; "ভগবন্, আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য।" এই বলিয়া তিনি পাদ্যঅর্ঘ্য লইয়া আচার্য্যকে কহিলেন, "আপনি যাহাই হউন এবং যেরূপেই এখানে আগমন করুন না কেন আমার পূজনীয়, কারণ অতিথি নারায়ণ তুল্য। আপনি পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ও ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে আপনাকে ভিক্ষা প্রদান করিব।

আ। মহাশয়! আমি আপনার সহিত বাদ বিচার দ্বারা সত্য সংস্থাপন করিব, ইহাই আমার ভিক্ষা। অন্য ভিক্ষা আমি গ্রহণ করিব না।

ম। মহাত্মন্! বাদে আমার পরম আনন্দ। যে যাহা খণ্ডন করে আমি তাঁহার সে যুক্তিও আবার খণ্ডন করিয়া থাকি, এ জন্যই আমার নাম মণ্ডন।

আ। মহাশয়! এই সর্ত্তে কিন্তু আপনার সহিত আমি বিচারে প্রবৃত্ত হইব যে, আমাদের মধ্যে যিনি বাদে পরাজিত হইবেন তাঁহাকে নিজ মত ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বিজয়ীর মত ও আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে। আপনি ইহাতে সম্মত?

ম। ভগবন্, আমি ইহাতে সম্মত। কেন না আপনার ন্যায় যুবককে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করাইতে পারিলে আমি অতুল আনন্দ লাভ করিব।

আ। মহাশয়! আমিও ঐরূপ উদ্দেশ্যেই আপনাকে বাদযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। কারণ আপনার ন্যায় যাজ্ঞিক কর্ম্মী চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করিলে জগতের মহা উপকার সাধিত হইবে।

ম। এক্ষণে আমাদের বাদে মধ্যস্থ হইবার জন্য কাহাকেও স্থির করুন।

আ। আপনার সহধর্ম্মিনী উভয়ভারতীই আমাদের মধ্যস্থা হইবেন।

ম। (সবিস্ময়ে) আপনি আমার সহধর্ম্মিনীর পরিচয় কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন?

আ। আপনার বিদুষী পত্নীর প্রতিভা দেশ বিখ্যাত।

অনন্তর পরদিন প্রভাতে বাদের দিন স্থির হইল। আচার্য্যও ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

পুরোহিতদ্বয় পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "ইনিই শঙ্করাচার্য্য! এতদিন যাঁহার কথাই শুনিতাম আজ স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিলাম! কি সুন্দর তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল, কি নির্ভীক ভাব, কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বদন! অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক, কিন্তু অদ্ভুত শক্তিমান্ বলিয়া মনে হয়। বাদে কে জয়ী হইবে তাহা বলা সুকঠিন।"

দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ নগর মধ্যে প্রচারিত হইল। মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচার বড় সহজ কথা নয়। এক যুবক সন্ন্যাসীর এত সাহস, সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। কেহ কেহ আবার সন্ন্যাসীর এতটা স্পর্দ্ধা অসহ্য বোধ করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে মণ্ডনের গৃহদ্বারে লোকসমাগম হইতে লাগিল।

মণ্ডনের গৃহদ্বার পত্র পুষ্পে সজ্জিত। প্রাঙ্গণতল সুবিস্তৃত শতরঞ্চ দ্বারা মণ্ডিত, উপরে চন্দ্রাতপ, এক পার্শ্বে একটী বেদী, তদুপরি তিনখানি বহুমূল্য কম্বলাসন বিস্তীর্ণ, চতুর্দ্দিকে পণ্ডিতগণের আসন শ্রেণীবদ্ধভাবে রক্ষিত। নিম্নে সাধারণ ব্যক্তিগণের উপবেশন স্থান। দরদালানে রমণীগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যথাসময়ে একে একে পণ্ডিতগণ আসিয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলে, ক্রমে অপরাপর সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

অতঃপর মণ্ডন ও আচার্য্য বেদীর উপর আসনে বসিলেন, তখন উভয়ভারতী ঠাকুরাণী দুই গাছি ফুলের মালা হস্তে দেখা দিলেন।

তিনি সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মহাশয়গণ, এই দুই জন তার্কিকের বাদবিচারে আমি মধ্যস্থা হইয়াছি, কিন্তু আমি রমণী, আমাকে সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, সুতরাং এই সভামধ্যে বসিয়া, ইঁহাদের তর্ক শুনিবার অবসর আমার অল্পই হইবে, এজন্য আমি এই দুই গাছি ফুলের মালা ইঁহাদের দুইজনের গলদেশে পরাইয়া দিতেছি। আপনারা দেখিবেন যাঁহার গলার মালা শুষ্ক হইবে তাঁহারই নিশ্চিত পরাজয় বুঝিবেন। এক্ষণে আপনারা অনুমতি করুন আমি অন্তঃপুরে গমন করি।

সাক্ষাৎ সরস্বতীতুল্য উভয়ভারতীর বাক্য শুনিয়া সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অন্তঃপুর গমনে অনুমতি দিলে তিনি ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। উদ্বোধন হইতে উদ্ধৃত। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী—

অসাবধানে শিশু-সংহার।

শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে আজ কালকার বিজ্ঞানের যুগে মানুষের অসাবধানতার ও অজ্ঞতার নিমিত্ত অকালে কত শত শত শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পিতামাতার মহাশোকের কারণ হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কেবল উক্ত কারণে গত বৎসর ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ দ্বীপের একলক্ষ কুড়ি হাজার শিশু অকালে মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়াছে। এই এক বৎসরের জীবহানির সংখ্যা দেখিয়া অনেকে ভ্রূকুঞ্চিত করিবেন, কিন্তু যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে এতগুলি শিশুর মৃত্যু একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। 'এই প্রাণনাশের জন্য দায়ী কে?'—বলিয়া আজকাল এক প্রশ্ন উঠিয়াছে।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের অধিকাংশ পণ্ডিতই বলিতেছেন যে শিশুদের মৃত্যু অনেকটা লোকের অজ্ঞতা, অযত্ন এবং অবহেলার জন্য ঘটিয়া থাকে। মহিলাসম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করিতেও তাঁহারা ছাড়েন নাই।

দেশের জন্ম এবং মৃত্যু-তালিকা হইতে এই সত্যটি পাওয়া গিয়াছে যে সাত বৎসর হইতে দশ বৎসরের শিশুর মৃত্যুসংখ্যাই অধিক। মৃত্যুর এই করাল হস্ত কেবল যে পাশ্চাত্যজাতির শিশুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে তাহা নহে, জগতের প্রত্যেক বড় বড় জাতির ভিতর এই অকাল বিনাশের সূচনা ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার নিউম্যান্ এই বিনাশের কারণ আবিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া কয়েক বৎসর গভীর গবেষণায় কালপাত করিয়া যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ দ্বীপের শিশুর অকাল মৃত্যুর সংখ্যা কোন্ কোন্ স্থানে অধিক তাহা অন্বেষণ করিতে গিয়া নিউম্যান দেখিয়াছেন, বহুজনাকীর্ণ কয়লাখনি ও ফ্যাক্টরীওয়ালা সহরের শিশুর মৃত্যু অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক। অপর দিকে কৃষিবহুল এবং স্বল্পলোকযুক্ত প্রদেশের শিশুর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এই বিবিধ প্রদেশের শিশুর মৃত্যু তালিকা তিনি স্বরচিত পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

সেই তালিকা হইতে দেখা যায়, যে কয়লাখনি ও বাণিজ্যবহুল সহরের শিশুর মৃত্যুসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ডাক্তার নিউম্যান্ বলেন যে সহরে শ্বাসরোগ, উদরাময়, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার ও মূর্চ্ছা ইত্যাদি ব্যাধিপীড়িত হইয়া শিশুগণ অকালে প্রাণত্যাগ করে। গ্রামে যে এ সকল রোগের প্রাদুর্ভাব নাই তাহা নহে কিন্তু বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি ভয়াবহ ব্যাধির প্রভাব যে সহরের উপর পড়িয়াছে সেখানকার মৃত্যু সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই।

"উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এবং তৎসম্বন্ধীয় বিষয় সমূহের এত উন্নতি হইলেও এই মহাক্ষতি নিবারণের কি কোন উপায় নাই" বলিয়া অনেক চিকিৎসক এবং পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। নিউম্যানের নির্দ্দেশিত কারণ সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা যদি শিশুরাজ্যে সুব্যবস্থা রক্ষা না করি তবে তাহা যে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিউম্যান্ বলেন, যথাযথ বায়ু চলাচল, রৌদ্রালোকের অবাধ পথ এবং দূরে দূরে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য। জনাকীর্ণ সহরের গৃহগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত কাছাকাছি প্রস্তুত করিয়া মানুষ মানুষকে যে কত জিনিষ হইতে বঞ্চিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নিউম্যান্ গৃহ নির্ম্মাণের এই অস্বাস্থ্যকর পন্থার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তিনি নানাদেশের শিশুর মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, সংক্রামক ব্যাধি দ্বারাই সাধারণতঃ শিশুর মৃত্যু হয়। তদ্ব্যতীত জননীর ব্যাধি সন্তানে সংক্রামিত হইয়া শিশুর অনিষ্ট করে। গর্ভাবস্থায় জননী-জঠরেও অনেক শিশুর মৃত্যু হইয়া মৃত সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিংবা জন্মের কিয়ৎকাল পরেই নবজাত শিশুর ইহলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়। এই সমস্তই জননী হইতে সংক্রান্ত ব্যাধির ফল।

অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে পাশ্চাত্য দেশে,

জননীর পানদোষের নিমিত্ত তাহার গর্ভজাত শিশু অকালে বিবিধ ব্যাধিপীড়িত হইয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পানপ্রিয় ৬০০ (ছয় শত) মাতার গর্ভজাত শিশুর মধ্যে ৩৩৫টির জননী-জঠরে এবং ১২৫টির দুই বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যু ঘটিয়াছে। অন্য দিকে, সুস্থ জননীর ১৩৪টি সন্তানের মধ্যে প্রায় ৩০টি মাত্র অভিভাবকগণের অনবধানতা এবং ব্যাধি আক্রমণহেতু মারা পড়িয়াছে। ডাক্তারগণ বলিতেছেন যে পাশ্চাত্য রমণীগণের মধ্য হইতে যতদিন এই পানদোষ দুরীভূত না হইতেছে ততদিন কেহই এই শিশুগণের অকালমৃত্যু রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, দেখা যায় যে, মাতার শরীরের সবলতা এবং দুর্ব্বলতা অনুসারে তাহার গর্ভজাত শিশু সবল এবং দুর্ব্বল হইয়া থাকে। সুতরাং জননীগণকে বলশালী এবং কর্ম্মঠ করিয়া না তোলা পর্য্যন্ত মানব সমাজকে এই শিশুনাশ দেখিতেই হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে ডাক্তার নিউম্যান্ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে সহরের শিশুর মৃত্যুসংখ্যা সাধারণ গ্রাম ও ক্ষুদ্র আবাস স্থান হইতে অনেক বেশী। তিনি বলেন—সহরের বায়ু অনবরতই নানাপ্রকার ব্যাধি-জীবাণু দ্বারা পরিপূর্ণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, এবং খাদ্য, বিশেষ ভাবে দুগ্ধের সহিত এই জীবাণু আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। বিশেষ বলবান শরীর না হইলে শিশু ব্যাধিপীড়িত হইয়া অকালে ধরাধাম ত্যাগ করিয়া যায়। প্রকৃত ব্যাপার ঘটিতেছেও তাই। সহরের শিশুর মৃত্যুসংখ্যা যে গ্রাম হইতে এত অধিক তাহার প্রধান কারণই হইতেছে ওই। তিনি (নিউম্যান্) গৃহের মক্ষিকাগণকে এই শিশুহত্যা ব্যাপারে প্রধান একদল উদ্যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারা নানাপ্রকার পচা দ্রব্যাদি এবং শরীর হইতে ব্যাধি-জীবাণু সংগ্রহ করিয়া যখন শিশুর দুগ্ধ বা খাদ্যদ্রব্যাদির উপর বসে তখন উহা উক্ত ব্যাধি-জীবাণুযুক্ত হইয়া পড়ে। তাহার পর শিশু সেগুলি উদরসাৎ করিলে যে বিষময় ফল পাওয়া যায় তাহা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সেই জন্যই কিছুদিন পূর্ব্বে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, শিশুগণের খাদ্য দ্রব্যাদিকে ঢাকিয়া রাখিলে এবং শিশুকেও কোন প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে মাছির হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাই কিছুদিন শিশুর মশারি এবং খাদ্য দ্রব্যাদির ঢাকনি বাজারে বিক্রয় হইয়াছিল।

অভিভাবকগণের অসাবধানতা, অজ্ঞতা এবং সাধারণের অপরিচ্ছন্নতাকে নিউম্যান্ এই শিশুনাশের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে যে কি বিষময় ফল পাওয়া যায় অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরা তাহা দেখিয়াও তৎপ্রতি মনোযোগ করে না। এবং সেইজন্য কৃষক সন্তানগণ সাধারণতঃ অমন স্থূলোদর এবং কৃশকায় হইয়া থাকে। অধিক কি, বি. এ. এম্, এ পাশ করা শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ও আপনাদের গৃহের শিশু সন্তানগণের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ করেন না। কিন্তু সামান্য শৈথিল্যে যে মহা অনর্থ ঘটিতে পারে—তাহা বিজ্ঞান ক্লাসের অধ্যাপকের লেক্‌চার এবং পার্শ্বস্থিত উদাহরণ দ্বারাও ছাত্রগণের মনে তাহা বদ্ধমূল হয় না।

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যত্ন না করিয়া শিশুকে যত প্রকার স্বদেশ-বিদেশীয় ঔষধ সেবন ও লেপন করা যাউক না কেন তাহাতে কোন ফলই দর্শিবে না ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মার্কিন সিভিল ওয়ারের (American Civil war) সময় আমেরিকা হইতে এত অধিক পরিমাণে কার্পাস (Cotton) রপ্তানি হইতে লাগিল যে শ্রমজীবী স্ত্রীসম্প্রদায়কে তুলার কারবারে অনবরত ব্যস্ত থাকিতে হইত। সুতরাং তাহারা আপনাদের সন্তানসন্ততিদের বিশেষ যত্ন লইতে পারিল না; ফলে শত শত সন্তানের অকালমৃত্যু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল। নিউম্যান্ এই প্রমাণটি তাঁহার পুস্তকের একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্যারিস্ সহরের ভীষণ কষ্টকর অবরোধের সময় (Siege of

* "নিউম্যান সাহেবের Infant feeding and management" এবং "Preventive measures" নামক পুস্তক পাঠ করিলে পাঠক পাঠিকাগণ এ সব বিষয়ে বিশদরূপে জানিতে পারিবেন।

Paris) সেই নগরের মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব মৃত্যুসংখ্যা হইতে দ্বিগুণ হইয়া পড়িল। কিন্তু দেখা গেল, শিশুগণের মৃত্যু খুবই কম। শতকরা ৪০ এর নীচে নামিয়া গিয়াছে। ডাক্তার নিউম্যান্ বলেন, প্রবল কর্ম্ম চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হওয়ায় অহর্নিশি আর কারবারে ও ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে না পারায় জননীগণ শিশুগণের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই শিশুগণের মৃত্যু এত কম হইয়াছিল। কর্ম্ম এবং বিশ্রাম, যত্ন এবং উদাসীনতার মাত্রা যতদিন না যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ততদিন শিশুরাজ্য হইতে মৃত্যুর আক্রমণ রোধ করা সুকঠিন। ধনী ও নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহিলাগণের প্রতি একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা যেন সন্তানসন্ততিগণকে যত্ন এবং সুব্যবস্থার সহিত পালন করেন। আজকাল মাতৃমহলে শিশু-পালন-নীতি শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা দিন দিন সফল হইলেই মঙ্গল।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

পরিবর্ত্তন।

পুলিশের সঙ্গে যখন তাহার প্রথম পরিচয় তখন ভোলা একটি তের বৎসরের বালক মাত্র। পিতৃমাতৃ-হীন নিরাশ্রয় বালক, কলিকাতার রাজবর্ত্মে নিক্ষিপ্ত হইয়া সারাদিনটা ঘুরিয়া বেড়াইত। বাবু দেখিলেই এক আধটা পয়সা চাহিত, কেহ দিত, কেহ দিত না, কিন্তু যাহা পাইত তাহাতেই ভোলার বেশ দিন গুজরান্ হইত। সন্ধ্যা হইলে রাস্তার ধারে কোথাও একটু মাথা রাখিবার স্থান পাইলেই সেইখানে পড়িয়া থাকিয়া রাত্রি কাটাইত। এমনি করিয়াই ভোলার চারিটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। ভবিষ্যতের ভাবনা তাহার আদৌ ছিল না; বোধ হয় সে মনে করিত, এমনি করিয়াই তার দিনগুলি কাটিয়া যাইবে; কখনও ভাবিত না, যে তাহার এ স্বাধীনতা বেশি দিন টিকিবার নয়। পুলিশের যত্নে একদিন ভোলা বিচারকের সম্মুখে নীত হইল। সে জীবনে তেমন জাঁকজমকের স্থান আর দেখে নাই, অবাক হইয়া বিচারকের দিকে তাকাইয়া রহিল। জন কতক লোকের সাক্ষ্য লওয়া হইলে বিচারক ভোলাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোলা তাঁহার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। শেষে ধমক খাইয়া আবল তাবল যা মুখে আসিল বলিল। অতি দুর্দ্দান্ত বালক প্রতিপন্ন হইয়া ভোলাকে তিন বৎসরের জন্য দুষ্ট বালকদিগের শিক্ষালয়-কারাগার বিশেষে যাইতে হইল।

নিরাশ্রয় আশ্রয় পাইল বটে, কিন্তু এ আশ্রয় না পাই-লেই বোধ হয় ভোলার ভাল হইত। সে কোনো কালেই বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাস করে নাই, নূতন স্থানটা তাহার নিকট অতি উৎকট রকম নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তার জ্ঞান হইয়া অবধিই সে যা খুসি তাই করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখানে সে কোন দিকেই এতটুকু নিজের ইচ্ছা চালাইতে পায় না, এটা তার পক্ষে অতি অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। এর উপর তাহাকে নিয়মিত পড়িতে হয়, রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখিতে হয়। তাহার শিক্ষকেরাও আবার কয়েদী। তাহারা ভোলাকে আদর করিয়া প্রায়ই কিলটা চড়চাপড়টা এবং অনবরত কানমলা আসটা উপহার দিত, ভোলাকে সেগুলি অম্লান-বদনে হজম করিতে হইত। সে বেশ জানিত, উচ্চবাচ্য করিলেই রুলের গুঁতা আছে, তাহা আদৌ মোলায়েম্ নহে।

তিন বৎসর নানা কষ্টে কাটাইয়া যখন ভোলা মুক্তি পাইল তখন সে একজন আধপাকা রাজমিস্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জেলখানা হইতে বাহির হইয়াই সে কাজ পাইল এবং যাহা উপার্জ্জন করিতে লাগিল তাহাতে তাহার সামান্য অভাবগুলি মোচন হইয়াও অনেক বাঁচিতে পারিত; কিন্তু হতভাগ্য তো শুধু কাজ শিখিয়াই আসে নাই! সে তাহার সঙ্গীদের নিকট হইতে আরো অনেক জিনিষ শিখিয়া তবে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে। যাহাদের সহিত সে গত তিন বৎসর কাটাইয়াছে তাহারা কেমন করিয়া মদ খাইয়া, হাল্লা করিয়া আমোদ লাভ করিত, পয়সার অভাব হইলে চুরি করিত, সে সমস্ত গল্প

শুনিয়া শুনিয়া তাহার একরূপ মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। এই কুসংসর্গে থাকিয়া তাহার সাদা মন খানিতে অনেক কালীর আঁচড় লইয়া তবে সে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে। স্বাধীনতা পাইয়া যখন সে আবার জীবনের পথে দাঁড়াইল, তাহার কারাগারে পরিচিত দুই একটি বন্ধুও তাহার সহিত আসিয়া জুটিল। আর তাহাকে কে রক্ষা করে? প্রথম প্রথম আমোদের মাত্রা তাহার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিত, কিন্তু সে আর বেশি দিন চলিল না, সে যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে তাহার অভাবের শতাংশের একাংশও এখন পূরণ হয় না। সে এখন তাহার বন্ধুদের সহিত মনে প্রাণে মিলিয়াছে, ফিরিবার উপায় একরূপ রাখে নাই। অভাবে পড়িয়া ভোলা চুরি আরম্ভ করিল। অর্থোপার্জ্জনের এমন সুবিধা আর কোথায়? এক মাস মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা রোজকার করা যায় না, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ঘণ্টাখানেক খাটিলেই সংগ্রহ করা যায়,—এত বড় লোভ জয় করিতে সক্ষম হইবার শিক্ষা ভোলা কোনো দিনই পায় নাই।

জেলখানা আর কিছু করুক আর নাই করুক, তাহা ভোলার সম্মুখে এই প্রলোভনটি বড়ই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু কিসে ইহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, কিম্বা ইহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার যে কোন প্রয়োজন আছে, এরূপ শিক্ষা তো সে কোনো দিনই পায় নাই।

শুধু অভাবে পড়িয়াই ভোলা চুরি আরম্ভ করিয়াছে। এ কাজটায় সে আদৌ অভ্যস্ত ছিল না, কাজেই ভোলার হাতে পুলিশের সুদৃঢ় হাতকড়া শোভা পাইতে দেরী হইল না।

এবার বিচারক তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিন বৎসর শিক্ষা পাইয়াও যাহার স্বভাব শুধরায় না, তাহাকে কি দয়া দেখানো যায়? এবার ভোলা তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসে প্রেরিত হইল।

ভোলা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিল কি কুপথটাই সে লইয়াছে। জীবনের প্রভাতেই নানা দুর্দ্দৈব আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়াছে, বেচারা একটুখানি ভাবিবারও অবসর পায় নাই। ঘানি টানিতে টানিতে এইবার তাহার ভাবিবার, অবসর জুটিল। কুসঙ্গই যে তাহার সর্ব্বনাশের মূল সে তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিল। এবার সে সাবধান হইবে, আর কুসঙ্গে মিশিবে না, খুব সৎ হইয়া চলিবে, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া লইল। কেমন করিয়া সে তাহার সঙ্কল্প রক্ষা করিবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া সে পথও বাহির করিল। ধর্ম্মের কোনো শিক্ষাই সে পায় নাই; কেবল মাঝে মাঝে বৈষ্ণবদিগকে পথে পথে গান করিয়া বেড়াইতে শুনিয়াছে; হরির নামটা সে জানিত; ঘানি টানিতে টানিতে, কেন জানে না, মাঝে মাঝে আকুল প্রাণে বলিত—হরি, আমাকে আর কুসঙ্গে ফেলো না।

মহাক্লেশে তিনটি বৎসর কাটাইয়া এবার যখন ভোলা নিষ্কৃতি পাইল, তখন আর সে যাহার তাহার সহিত মিশিত না। কলকাতার সহরে হয় তো সে তাহার সাধু সঙ্কল্প রক্ষা করিতে বাধা পাইবে এই মনে করিয়া সে সহর ছাড়িল, পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিল। একটা গ্রামে একজন ধনীব্যক্তি একটি নূতন বাড়ী প্রস্তুত করাইতেছিলেন, ভোলা সেখানে গিয়া আপন গরজে অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে লাগিল।

বাড়ী প্রস্তুত হইতে আর কতদিন লাগে? শীঘ্রই বাড়ীটি তৈরি হইয়া গেল; আবার ভোলাকে নূতন কাজের সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। এই কয় মাস কাজ করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাই সম্বল করিয়া ভোলা আবার বাহির হইল। একখানা গ্রামের পর আর একখানা গ্রাম পার হইয়া চলিয়াছে, কোথাও সে কাজের সন্ধান পাইল না। শেষে একখানা গ্রামে আসিয়া সন্ধ্যা হইল। একটা দোকানে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া খাইয়া একজন ধনী গৃহস্থের দেউড়িতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এমন সময় রে রে শব্দে ভোলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখে, তাহার সম্মুখে বিকটাকার জন কয়েক লোক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি ঘাড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের

মধ্যে একজন ভোলাকে বলিল—"কোন পথে এই বাড়িতে ঢুক্‌তে হয় শীঘ্রি বল্।" ভোলাই বা তাহা কেমন করিয়া জানিবে, সে তাহার অজ্ঞতা স্বীকার করিল। সেই বিকটাকার লোকগুলা তাহার কথা বিশ্বাসই করিল না, তাহাদের মধ্যে একজন "তবে রে বেটা" বলিয়া তাহার মাথার উপর এক লাঠি বসাইয়া দিল, ভোলা হতজ্ঞান হইয়া সেইস্থানে পড়িয়া রহিল।

* * * *

যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন ভোলা দেখে সে এক হাঁস্‌পাতালে পড়িয়া আছে, পাশে একজন মেম্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মেম্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সেটা "ক্যাম্বেল্ হাঁস্‌পাতাল্" এবং আরো জানিল যে সে একজন ডাকাত, ডাকাতি করিতে গিয়া জখম হইয়া ধরা পড়িয়াছে, মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, মাথার ঘা শুকাইয়া গেলেই তাহার বিচার হইবে, শুনিয়াই ভোলা আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

যথা সময়ে ভোলার বিচার হইল। পুলিশ ভোলাকে তাহার দলের লোকদের নাম বলিয়া দিবার জন্য অনেক জেদ করিয়াছে, অনেক মারিয়াছে; কিন্তু সে কি জানে? সকল প্রশ্নেরই সে এক মাত্র উত্তর দিয়াছে যে সে কিছুই জানে না। পুলিশ বুঝিল, ভোলা একজন পাকা ডাকাত; বিচারকও বুঝিলেন, ভোলা একজন দাগী চোর, কাজেই কাহারো কোনো সন্দেহ রহিল না। ভোলা ডাকাত বলিয়া সাব্যস্ত হইল এবং সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসে চলিল।

ভোলা আবার কয়েদে চলিল। সে জানে, সে নিরপরাধ। ভাল হইবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। যাহার জন্য সে ভাল হইতে চাহিয়াছিল এবং ভালও হইয়াছিল ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সে তাহাতেই ফিরিয়া আসিল। পূর্ব্বের তিন বৎসর সশ্রম কারাবাস, বাহির হইয়া ভাল হইব, আর কয়েদে আসিতে হইবে না, এই সঙ্কল্পের জোরে ও আশায় সহ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার জন্য যে আর এক শিক্ষা অপেক্ষা করিতেছিল তাহা সে কেমন করিয়া জানিবে? ভাল হইয়াও তাহার নিস্তার নাই!

কারাগারের কষ্ট ভোলার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। একদিন নয়, দু দিন নয়, সাতটা বছর সে এই কষ্ট কেমন করিয়া সহ্য করিবে? তাহার মন ইহাতে কোনো প্রকারেই স্বীকার হইল না। বিনা অপরাধে কেন সে দণ্ড স্বীকার করিবে? সে পলায়নের সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। দৈবক্রমে একটা সুবিধাও জুটিয়া গেল।

একদিন রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, ঝড়ও তদনুরূপ, প্রহরীর অসাবধানতায় দুয়ার খোলা পাইয়া ভোলা ঘরের বাহির হইল, তারপর প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া পথে আসিয়া পড়িল। কলিকাতায় থাকা নিরাপদ নহে, সে দ্রুত পদক্ষেপে পূর্ব্বমুখে চলিয়া গেল। পথে শ্মশান হইতে কাপড় লইয়া পোষাক বদ্‌লাইল, তার পর আবার চলিল। আহারের জন্য ভিক্ষা করিল। এইরূপে পাঁচ সাত দিন চলিয়া একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে মজুরি খাটিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আবার সে স্থান হইতে পলায়ন করিল পুলিশে আর তাহার সন্ধান পাইল না।

এখন ভোলা ময়মনসিংহ সহরে এক মুসলমান বুড়ীর বাড়ীতে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিতেছে। একেবারে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কোনো সমাজের কোনো সংস্কারের মধ্যে সে কোন দিনই বাস করে নাই; অধিকাংশ রাজমিস্ত্রীই মুসলমান, তাই সেও মুসলমান হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহাকে কেহই ভোলা বলিয়া ডাকে না; তাহার নূতন নাম আকবর। এখনো সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে; যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহাতে খায় দায় থাকে, কাহারো সহিত বড় মেশামেশি করে না।

কিছুদিন হইল দিলসাদ্ নামক এক মুসলমান যুবকের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছে। এ সংসারে তাহারও ভোলারই মত আপনার লোক কেহই নাই। সেও রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। বেশ নিরীহ ভাল মানুষটি। কাজ করিতে গিয়াই তাহার সহিত ভোলার আলাপ হইয়াছে। সম অবস্থার লোকের মধ্যে সহজেই বন্ধুত্ব জমিয়া উঠে; দিলসাদের সহিত ভোলার বন্ধুত্বও অল্প দিনের মধ্যেই

বেশ ঘন হইয়া উঠিল। দিলসাদ আর একজনের বাড়ীতে একপ্রকার তাহার গলগ্রহ হইয়া থাকিত; সেখানে তাহাকে অনেক অপমান সহ্য করিতে হইত। ভোলা বন্ধুর দুঃখে দুঃখী হইয়া দিলসাদকে সেই বুড়ীর বাড়িতে আপনার কাছে আনিতে চাহিল। ঘরখানিতে বেশ দুজনায় মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে, বুড়ীর কাছে খাইবে; মন্দ কি?

হইলও তাহাই; দিলসাদ আসিয়া ভোলার সহিত বাস করিতে লাগিল।

দুজনে দিন কতক বেশ ছিল, কিন্তু ভোলা যে ধাতুতে গড়া দিলসাদ্ তাহা ছিল না। কাজেই ভোলার সংসর্গে দিলসাদের শীঘ্রই অবসাদ আসিল। সে অন্যস্থানেও যাতায়াত করিতে লাগিল; তাহার অনেক বন্ধু জুটিয়া পড়িল। ভোলা অনেক বার ঠকিয়াছে, বন্ধুসঙ্কটের মধ্যে পড়িবার পাত্র সে নহে; দিল্‌সাদ অত আর জানিবে কোথা হইতে? তাহার বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এখন আর দিলসাদ্‌কে সব দিন বাড়িতে দেখিতে পাওয়া যায় না, আর সে ভোলার সহিত ভাল করিয়া মেশেও না। ভোলা ব্যাপার সমস্তই বুঝিল, দিল্‌সাদকে কত বুঝাইল, কিন্তু হতভাগা যে স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে তাহা হইতে ফিরাইয়া আনিতে কি ভোলার শক্তিতে কুলায়?

দিলসাদ্ ভোলাকে লুকাইয়া কুসংসর্গে মিশিতে লাগিল। ক্রমে ভোলার কাছে দিলসাদ্ কত পিসী, মাসী, মামাত ভাই ইত্যাদির পরিচয় হাজির করিল ও তাহাদিগকে সাহায্য করার ছলে তাহার নিকট হইতে টাকা ধার করিতে লাগিল। কিন্তু সে ধার শোধ দিবার নামও করিত না। ভোলার অর্থের প্রয়োজন অতি অল্পই ছিল। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যা কিছু অভাব ছিল সেগুলি, সে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত তাহার অর্দ্ধেকেই পূরণ হইত, কাজেই সে দিলসাদ্‌কে টাকার জন্য বিশেষ কিছু তাগিদ দিত না।

দিলসাদের এখন চারিদিকেই অভাব; কত আর ধার করিয়া চালাইবে? নানা স্থানে সে ধার করিয়াছে। ভোলার যাহা কিছু বাঁচিত সমস্তই লইয়াও তাহার কুলায় না। তাহার উত্তমর্ণের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

একদিন কাজ শেষে ভোলা বাড়ী ফিরিতেছে; দূর হইতে দেখিতে পাইল, তাহাদের ঘরে কতকগুলি লোক উঁচু গলায় কি সমস্ত বলাবলি করিতেছে। দূর হইতে যাহা শুনিল তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বুড়ীর পাঁচটি টাকা চুরি গিয়াছে। সে প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া ভোলা ও দিলসাদের জিনিষ পত্র খুঁজিয়া দেখিয়া দিলসাদের কাঠের বাক্সে বুড়ীর সেই নেকড়া টুকুতে বাঁধা টাকা কয়টি পাইয়াছে। ভোলা শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। দিলসাদের এতদূর পতন হইয়াছে! কোনো দিনই সে এ ভয় করে নাই। তবে তো দিলসাদ্‌কেও তাহারই মত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। দিলসাদকে সে যে বড় ভালবাসে! সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, পিছনে চহিয়া দেখিল দিলসাদ আসিতেছে; আর কিছু মাত্র দেরী না করিয়া সে দৌড়িয়া ঘরে ঢুকিল ও এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—"ওগো, আমিই তোমার টাকা নিয়েছিলাম, ধরা পড়লে দিলসাদই জেলে যাবে এই মনে করে টাকা ক'টা দিলসাদের বাক্সে রেখে দিয়েছিলাম। সে কিছুই জানে না, আমার জন্য সে কেন মরে? তোমরা আমাকে পুলিশে দাও, তা'কে কিছুই বলো না।" এমন সময় দিলসাদ্ সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘটনা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে পলাইবার চেষ্টা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভোলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ভাই আমিই টাকা চুরি করে তোর বাক্সে রেখেছিলাম। আমি আমার দোষ স্বীকার কর্‌ছি, তোর কোনো দোষ নাই, তুই ভাবিস না।" তার পর প্রতিবেশীদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিল—"আমি দিলসাদ্‌কে গোপনে গোটা কয়েক কথা বলতে চাই। আমরা এই ঘরে থাকি, তোমরা ঘরে শিকল দিয়ে পুলিশ ডেকে নিয়ে এস, তা'হলেই আমার পালাবার উপায় থাক্‌বে না।

প্রতিবেশীরা তাহাই করিল। এদিকে ঘরের ভিতর ভোলা দিলসাদ্‌কে আত্মজীবনী সংক্ষেপে সমস্তই বলিল।

সে যে একজন পলাতক আসামী তাহাও বলিল; আরো বলিল—"এমন করে আর আমি কত দিন কাটাবো? পুলিশ আমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোন্ দিন ধরবেই। একবার কয়েদে গেলে তোর আর রক্ষা থাকবে না, দিন দিন নীচের দিকে হাঁটতেই হবে। আমাকে যখন যেতেই হবে এখনি যাই, তা হলে তুই নরক থেকে রক্ষা পাবি। কিন্তু এবার থেকে তুই ভাল হস্। মন্দ লোকের সঙ্গে মিশিস্ না, মন্দ কাজ করিস না; আল্লা তোর মঙ্গল করিবেন। আর সময় নাই, আমার হাত ছুঁয়ে বল ভাল হবি।" ভোলার কথা শেষ হইলে দিলসাদ্ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঘরের দুয়ার খুলিয়া গেল, পুলিশ ঘরে ঢুকিয়া ভোলাকে চতুর্থ বার গ্রেপ্তার করিল। ভোলা একটি কথাও না বলিয়া শান্তভাবে পুলিশকে আত্মসমর্পণ করিল।

ভোলা পুলিশকে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সে ডাকাত, কয়েদ হইতে পলাইয়াছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ অনেক বাহাদুরি পাইল। হতভাগা ডাকাত শেষে পাঁচ টাকা চুরিতে ধরা পড়িল।

এবার বিচারে ভোলা যাবজ্জীবনের জন্য কারাবাসে গেল।

লোকে বলে, ভোলার ধরা পড়ার দিনই দিলসাদ ফকিরী লইয়াছে। পুলিশ নাকি, অনেক দিন ধরিয়া তাহার উপর খাড়া নজর রাখিয়াছিল।

শ্রী—

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস। *

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পরমহংস দেবের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি তখন কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ভবানীপুরের South Suburban School এর প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলাম। ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় আমি লণ্ডন মিশনারি সোসাইটী ইনষ্টিটিউসনের একজন শিক্ষকের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হই। এই শিক্ষকটী রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান আশ্রম দক্ষিণেশ্বর নামক কলিকাতার উত্তরস্থ এক গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বর দর্শনের পর আমার বন্ধু আমার নিকট তথাকার কালী-মন্দিরবাসী এক হিন্দু সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য উক্তি ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে প্রায়ই অনেক কথা বলিতেন। এই সকল উক্তির মধ্যে কতকগুলি আমার নিকট এত হৃদয়গ্রাহী বোধ হইয়াছিল যে একদিন আমি সেই ব্রহ্মচারীর দর্শন উদ্দেশ্যে আমার বন্ধুর অনুগমন করিলাম। ইনিই রামকৃষ্ণ পরমহংস। তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতনামা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার বিবরণ নিজের কাগজে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন তখন এই মহাপুরুষের নাম দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

পরমহংস দেবের সহিত আমার সাক্ষাতের বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। কাজেই শৃঙ্খলার সহিত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ লিখিতে পারিতেছি না। স্মৃতি হইতে যতটা উদ্ধার করিতে পারিলাম তাহাই লিখিতেছি।

আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই। কিন্তু তিনি যে আমাকে অত্যন্ত সমাদরপূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন তাহা আমার বেশ মনে আছে। এই সাদর অভ্যর্থনার কারণ বোধ হয় আমার বন্ধুকর্তৃক পূর্ব্বাহ্নেই আমার পরিচয় প্রদান। তিনি তাঁহার স্বভাবাসদ্ধ শিশুর ন্যায় সরল অন্তরে আমাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি মাঝে মাঝে আমাকে দেখিতে আসিবে না?" তাঁহার জীবনের কথা যেটুকু সেখানকার লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিলাম তাহাতে বুঝিলাম, যে তিনি একজন নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণ; পূর্ব্বে কালীর মন্দিরে পূজারির কাজ করিতেন, পরে তাঁহার অনন্যসাধারণ তপস্যা ও কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা অধ্যাত্মজীবনে অসাধারণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

বারবার দেখাশুনার পর আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়া উঠিল এবং তিনি আমার নিকট তাঁহার আধ্যাত্মিক

* মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের মর্মানুবাদ।

অভিজ্ঞতাসকল বলিতে লাগিলেন! সংক্ষেপে সেগুলি এরূপে বলা যাইতে পারে ঃ—যখন তিনি কালী মন্দিরে পূজারির কাজ করিতেন তখন অনেক হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার দেখা হইত। এই সাধুসন্ন্যাসীগণ পুরী যাওয়ার পথে বা তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উক্ত মন্দির দর্শন করিতেন, কখনও কখনও কিছু কাল তথায় আসিয়া বাস করিতেন। এই সাধুসন্ন্যাসীদের সংসর্গই রামকৃষ্ণের জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। আধ্যাত্মিক সত্যদর্শনের জন্য তাঁহার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা এই সৎসঙ্গলাভে বলবত্তর হইয়া উঠিল। এই তৃষ্ণাবশতঃ সাধুরা যে সকল প্রক্রিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা তিনি অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত কষ্টসাধ্য তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন।

পরমহংস দেব আমাকে যে সকল প্রক্রিয়ার কথা বলিতেন তাহার কয়েকটা আমার মনে আছে। কামিনী-কাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, হিন্দুশাস্ত্রের এই উপদেশটী তাঁহার মনে বড় বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং তিনি ইহা অত্যন্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আধ্যাত্মিক মুক্তির ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ বিষয়ে তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বড়ই বিস্ময়কর। তিনি এক হস্তে কিছু মাটী ও অপর হস্তে কয়েক খণ্ড মুদ্রা লইয়া নিকটবর্ত্তী নদীর ধারে বসিতেন এবং ধ্যানে মগ্ন হইয়া মুদ্রা ও মাটী উভয়েরই সমান অনর্থতা উপলব্ধি করিতেন। তারপর তিনি বারবার বলিতেন, "মাটীই টাকা" "টাকাই মাটী" "মাটীই টাকা" ইত্যাদি। এবং যতক্ষণ না এই ধারণা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইত ততক্ষণ তিনি এইরূপ বলিতে থাকিতেন এবং অবশেষে মাটী ও টাকা উভয়ই নদী-স্রোতে নিক্ষেপ করিতেন।

তাঁহার স্ত্রীলোকের আকর্ষণ হইতে উচ্চে উঠিবার প্রয়াসও অতি বিচিত্র। তিনি আমাকে যে সকল চেষ্টার কথা বলিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বর্ণনা করিবার দরকার নাই। এই কথা বলিলেই এখানে যথেষ্ট হইবে যে পরিশেষে তাঁহার নিকট নারীজাতির নৈকট্য এত ঘৃণনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে জীবনের শেষকালে তিনি নারী-জাতিকে তাঁহার কয়েক হাতের মধ্যে আসিতে দিতেন না। তাঁহার অত্যন্ত নিকটে যে স্ত্রীলোক আসিতেন তাঁহাকে তিনি নমস্কারপূর্ব্বক বলিতেন, "মা, মা! ওখানেই থাক, নিকটে আসিও না।" আমি যখন তাঁহার এরূপ ব্যবহার সম্বন্ধে আপত্তি করিতাম তখন তিনি বলিতেন, এ বিষয়ে আলোচনা বৃথা, স্ত্রীলোক ছুঁইলেই সে আঘাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত বেশী হইবে এবং তিনি তদ্দ্বারা অভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। আমি কোন স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে যাইতে দেখি নাই। কিন্তু আমি এমন অনেক সময় উপস্থিত ছিলাম যখন অনুসন্ধিৎসু দর্শক পরীক্ষা-চ্ছলে তাঁহার হস্তে মুদ্রাখণ্ড রাখিতেন এবং তিনি তাহাতে স্বাভাবিকরূপে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। যতক্ষণ না মুদ্রাগুলি স্থানান্তরিত করা হইত ততক্ষণ সংজ্ঞা লাভ করিতেন না।

এই নারীত্যাগ সাধনার সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। আমি যখন তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন রামকৃষ্ণ স্বীয় পত্নী হইতে বস্তুতঃ পৃথক ভাবেই বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী নিজ গ্রামস্থ বাটীতে থাকিতেন। একদা সমবেত কয়েকটী বন্ধুর নিকট তাঁহার পত্নীর স্বামী-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে আমাকে অভিযোগ করিতে শুনিয়া রামকৃষ্ণ আমার নিকটে আসিয়া কাণে কাণে বলিলেন, "তুমি কেন অভিযোগ করিতেছ? ইহা এখন অসম্ভব, এ সকল আকাঙ্ক্ষা এখন সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" আর একদিন আমি যখন তাঁহার এই বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতেছিলাম এবং ব্রাহ্মসমাজে আমরা নারীর কিরূপ সম্মান করি তাহার উল্লেখ করিয়া যখন বলিতেছিলাম যে আমাদের ধর্ম্ম সামাজিক ও গার্হস্থ্য বিধির উপর সংস্থাপিত এবং আমরা নারীজাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিতে চাহি, তখন পরমহংস অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। যখন তাঁহার অবধারিত মত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতেন তখন এরূপে উত্তেজিত হওয়াই তাঁহার অভ্যাস ছিল এবং তাঁহার এই ব্যবহার আমরা অত্যন্ত ভালবাসিতাম। তিনি আমার প্রতিবাদ শুনিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "যাও

মূর্খ, যাও তোমাদের স্ত্রীলোকগণ তোমাদের জন্য যে গর্ত্ত করিয়াছে তাহাতে পড়িয়া মরগে।” তারপর তিনি আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “মনে কর, একজন বাগানের মালী একটী চারা গাছ রোপন করিয়াছে। সে কি করে? সে কি চারা গাছটীর চার-দিকে একটা বেড়া তৈয়ার করিয়া দেয় না, যেন উহাকে গরুতে ও ছাগলে নষ্ট করিতে না পারে? এবং যখন ঐ চারাগাছটী বৃক্ষে পরিণত হয়, পশুতে যখন তার আর অনিষ্ট করিতে পারে না তখন কি মালী ঐ বেড়া উঠাইয়া দিয়া বৃক্ষটীর অবাধ-বৃদ্ধির সাহায্য করে না?” আমি উত্তর করিলাম—“হাঁ, উহাই মালীদের নিয়ম।” তারপর তিনি বলিলেন—“তোমরা আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধেও সেইরূপ ভাবে চল; ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে স্ত্রীলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ কর, জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ কর, তারপর তুমি স্ত্রীলোকের নিকট যাইতে পার।” ইহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম, “গরু ছাগলের ন্যায় স্ত্রীলোকের কার্য্যও যে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট করে একথায় আমি আপনার সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। তাহারা আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও সামাজিক উন্নতির সঙ্গিনী ও সাহায্যকারিণী।” এই কথার সঙ্গে তিনি একমত হইতে পারিলেন না এবং তাঁহার মস্তক নাড়িয়া অমত জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলিলেন,—“তোমার ফিরিবার সময় হইয়াছে; সাবধান, গৌণ করিও না, নতুবা তোমার ঘরের স্ত্রীলোক তোমাকে তাহার ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না।” এই কথায় আমাদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটিল।

স্ত্রীলোক-পরিত্যাগের অভ্যাস ব্যতীত তাঁহার আরও কতকগুলি বিচিত্র অভ্যাস ছিল। এগুলিও আমাদের নিকট অযথা সময় ও শক্তি হানিকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রকৃষ্টতর উপায় নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমরা মানুষ মাত্রকেই তাহার সরলতা ও ধর্ম্মলাভের পিপাসা দ্বারা বিচার করিব। তিনি অকপট অন্তরে সাধুসন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রদর্শিত সমস্ত ক্রিয়াকলাপই সম্পন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে ভগবানের সম্পূর্ণ দাস্ হইতে হইলে রামায়ণ বর্ণিত রামদাস হনুমানের দাস্যভাবকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই দাস্যভাব আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ হনুমানের গুণাবলী চিন্তা করিবার জন্য একটী ঘরে কয়েকদিনের মত আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। তিনি একটী কৃত্রিম পুচ্ছ তৈয়ার করিয়া পেছনে পরিতেন এবং বানরের ন্যায় ঘরের ভিতর লাফাইয়া বলিতেন, “প্রভো, প্রভো, আমি তোমার অনুগত দাসানুদাস।”

আর একজন সাধু বিনয় লাভ করিবার জন্য নিজকে সামান্য মুচি মেথরের ন্যায় মনে করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। পরমহংস তদনুসারে মেথরের কাজ করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি চুপি চুপি কোন প্রতিবেশীর পায়খানায় প্রবেশ করিয়া পুরীষপূর্ণ পাত্র সকল নদীতে আনিয়া ধুইতেন এবং পুনর্ব্বার সেইগুলি যথাস্থানে রাখিয়া আসিতেন। কিছুকাল তাঁহার এই অভ্যাস চলিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে সকলেই তাঁহার এই অভ্যাসের প্রতিবাদ করাতে তাঁহাকে উহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত আহার-নিদ্রা সম্বন্ধে তাঁহার কঠোর সংযম ছিল। তিনি কয়েক দিন অনাহারেই থাকিতেন আবার কয়েক রাত্রি ধরিয়া একেবারেই নিদ্রা যাইতেন না। এই সকল কঠোর সংযমসাধনায় তাঁহার স্বভাব দুর্ব্বল শরীর যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। প্রধানতঃ ইহারই ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি চিররোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গলদেশে একটী ক্ষত হয় এবং তাহাই শেষকালে তাঁহার মৃত্যুর নিদান হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে তাঁহার শরীরে এরূপ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আনিয়া দিয়াছিল যে কোন প্রবল উত্তেজনার ভাবে তিনি একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন এবং অন্তরস্থ ভাবের ক্রিয়াতে তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলে এক উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশ পাইত। এই প্রকার রোগ ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের স্বভাবসিদ্ধ। বঙ্গে প্রেমধর্ম্মের

প্রবর্ত্তক চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে প্রবল ভাবের সমাগমে তিনিও মূর্চ্ছিত হইতেন এবং তাঁহার দেহে অলৌকিক দীপ্তি প্রকাশ পাইত; লোকে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত এবং অনেকেই তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রীতিভরে স্পর্শ করিত। মহম্মদ সম্বন্ধেও একথা উক্ত আছে যে গভীর ধর্মভাবের উত্তেজনায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। বঙ্গদেশের হিন্দুদের মধ্যে—ব্রাহ্মসমাজ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যেই—এ সম্বন্ধে সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে যে আবেগভরে সঙ্কীর্ত্তনের সময় নরনারী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই নরনারীগণের যাহা মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মাগণের তাহা স্বভাবতঃই হইত। পরমহংসের মূর্চ্ছা যে পূর্ব্বোক্ত কারণেই হইত তাহা তিনি আমার নিকট নিজেই বলিয়াছিলেন। একদিন আমি যখন তাঁহার এই স্বাস্থ্যভঙ্গকারী মূর্চ্ছার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলাম তখন রামকৃষ্ণ বলিলেন—"হাঁ হে! ইহা আমার কালস্বরূপ হইবে। এই মন্দিরদর্শক সাধুদের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে যাইয়া আমি এই মূর্চ্ছার অধীন হইয়া পড়িয়াছি।"

তার পর, তাঁহার কঠিন সাধনার আর একটী ফল ফলিয়াছিল। কিছুকালের জন্য ইহাতে তাঁহার মানসিক বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছিল। এই কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। কিন্তু ইহা সত্য; অন্ততঃ তিনি একদিন আমাদিগকে এরূপ বলিয়াছিলেন। আমি এখানে সেই ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন আমি তাঁহার নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় কলিকাতা হইতে কয়েক জন ধনী লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কথোপকথনের মধ্যে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কয়েক মিনিটের জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ইত্যবসরে তাঁহার তত্ত্বাবধানকারী ভাগিনেয় এই সকল ধনী লোকের নিকট তাঁহার মাতুলের কতকগুলি মহৎ কার্য্যের কথা বলিয়া তাঁহার অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত মানসিক বিকৃতির সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া সে বলিল "তাঁহার ঈশ্বরপ্রীতি এত অধিক যে তিনি কিছুকালের জন্য বাহ্য জীবনের সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বহির্জ্জগতের সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন।" ঠিক এই মুহূর্ত্তে রামকৃষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিয়া ভাগিনেয়ের শেষ কয়টি কথা শুনিয়া ফেলিলেন। মাতুলকে অন্যের নিকট বড় করিয়া দেখাইবার ঐরূপ মিথ্যা প্রয়াসের জন্য তাঁহাকে তিনি তিরস্কার করিলেন। তাঁহার সেই কথাগুলি আমার এখনও বেশ মনে আছে। তিনি বলিলেন, "এই ধনী লোকদের নিকটে আমার প্রশংসা করিতেছিলে কেন? তোর মন কি ছোট! তাহাদের জমকাল পোষাক, সোনার চেন ঘড়ি দেখিয়া তাহাদের নিকট হইতে আমার জন্য খুব কতকগুলি টাকা আদায় করার অভিপ্রায়েই আমার এত প্রশংসা করিয়াছিস্—নয়? এরা আমাকে বড় বলুক আর ছোট বলুক তাতে আমার কি আসে যায়?" তারপর ধনীদের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "না গো না, এ আমার বিষয়ে তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য নয়। ঈশ্বরপ্রীতিতে আমি নিমগ্ন ও সে জন্য যে বাহ্যজগতে উদাসীন হইয়াছিলাম তাহা নয়। আমি কিছুকালের জন্য বাস্তবিকই উন্মত্ত হইয়াছিলাম। কালী মন্দিরদর্শক সাধুগণ আমাকে অনেক বিষয় অভ্যাস করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তাহাদিগের পন্থা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।" এই প্রতিবাদে তাঁহার প্রতি আমার ভক্তিশ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার সাহচর্য্যে আমার এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার ন্যায় আমি আর একটী এমন লোক দেখি নাই যাঁহার মধ্যে ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য এমন প্রবল ক্ষুধা আছে এবং যিনি ধর্ম্ম সাধনের জন্য এত অভাব, এত ক্লেশ সহ্য করিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক জীবনের অত্যুচ্চ সোপানে উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ আমার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি তখন 'সাধক' মাত্র ছিলেন না, কিন্তু বস্তুতঃ একজন 'সিদ্ধপুরুষ' হইয়াছিলেন। যে আধ্যাত্মিক সত্য তিনি দর্শন করিয়াছিলেন এবং যে সত্য তাঁহার অন্তরে মহদ্ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল তাহা ভগবানের বিশ্বমাতৃত্বের ভাব। তিনি ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে ভালবাসিতেন এবং এই

মাতৃত্ব তাঁহার অন্তরে নানা ভাবের সঞ্চার করিত এবং তিনি উত্তেজনার আধিক্যে 'মার' নাম গান করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এই মাতৃত্বের ভাব সকল মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতির সীমা ছাড়াইয়া অনন্তের দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 'মার' সম্বন্ধে তিনি যখন কিছু বলিতেন বা গান করিতেন তখন তাঁহার ধ্যাননেত্র কালীমূর্ত্তির সীমা ছাড়াইয়া যাইত। তাঁহার একটী প্রিয় গান ছিল, "একবার হাসি ও বাঁশি লয়ে নাচ দেখি মা" অর্থাৎ কালী ও কৃষ্ণকে একত্র করে নাচ। তিনি অনেক সময়ই বলিতেন যে কেবল মূর্খেরাই কালী ও কৃষ্ণকে পৃথক্ জ্ঞান করে, তাঁহারা একই শক্তির বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ মাত্র।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

"কনে বৌ" প্রণেতা প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম আমরা অনেক ভাবিয়া এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই—একেবারে না করিলেই ভাল হইত। কবিতা লিখিতে জানিলেই যেমন গীতি-কবিতা লেখা যায় না,গদ্য রচনা শক্তি থাকিলেই সেইরূপ ছোট গল্প লেখা যায় না। যোগেন্দ্র বাবু রাশি রাশি উপন্যাস লিখিয়াও দুই এক খানির বেশী ভাল উপন্যাস রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গল্প লেখকরূপে তাঁহার ব্যর্থতা আরও পরিস্ফুটতর। প্রকাণ্ড আকার বিশিষ্ট তাঁহার পাঁচ ছয়খণ্ড ছোট গল্পের পুস্তকের মধ্যে পাঁচ ছয়টি পাঠযোগ্য উৎকৃষ্ট ছোট গল্প পাওয়া যায় কি না সন্দেহ! এত বেশী লিখিয়া এমন অসাধারণ ব্যর্থতার উদাহরণ, বঙ্গসাহিত্যে এক রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন আর বড় দেখিতেছি না। যোগেন্দ্র বাবু এখন আমাদের প্রশংসা অপ্রশংসার অনেক উপরে; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, তাঁহার প্রতিভা মোটেই ছোট গল্প রচনার উপযোগী ছিল না।

যে সকল গল্প-লেখকলেখিকা গল্প লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন তাঁহাদের নামের মধ্যে আমরা শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুক্তা সরোজকুমারী দেবীর নাম উল্লেখ করি নাই। তাঁহারা যদিও এখন ছোট গল্প রচনা বড় করেন না, তথাপি আমরা এখনো আশা ছাড়ি নাই। বিজয় বাবু প্রৌঢ় হইয়াছেন বলিলে হয়ত তিনি সজ্জিত তামাকের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আবার কবিতা লিখিতে বসিয়া যাইবেন এবং আমরা মহা বিপদে পড়িব, কিন্তু তৎসত্বেও বলিতে হইতেছে যে কেবল ছোট গল্প কেন, লঘু সাহিত্য মাত্রেরই আসর হইতে তাঁহার ছুটির সময় আসিয়াছে,—ন্যায় মত তিনি এখন ছুটির দাবী করিতে পারেন। এখন আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে গল্প-নিপুণ ঠাকুর দাদাকে যেমন ভক্ত নাতিবর্গ সহজে ছাড়িতে চায় না আমরাও সেরূপ বিজয় বাবুকে সহজে ছাড়িব না,—ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না। আমরা যদি অনুরোধ উপরোধের কোলাহলে তাঁহার সান্ধ্য মালা জপের বিঘ্ন জন্মাই তবে তিনি ক্ষুব্ধ হইবেন না। ছোট গল্প হিসাবে তাঁহার "কথা নিবন্ধের" প্রায় কোন গল্পই বহুমূল্য নহে, তবু গল্পপ্রিয় পাঠকবর্গ ইহাতেই তৃপ্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আমরা এখনো অনেক আশা করি। তিনি আমাদিগকে অনেকগুলি খাঁটি ছোট গল্প শুনাইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর নিখুঁত গল্প তাঁহার বেশী নাই, তাহাতে আমরা বিশেষ দুঃখিত নহি। কারণ তাঁহার সমস্ত গল্পই প্রাণপূর্ণ না হইলেও কোনটিই একেবারে প্রাণহীন নহে। তাঁহার প্রত্যেক গল্পেই একটু না একটু স্নিগ্ধ সজলতা ফুলের পাঁপড়ীর মধ্যে অমিয় বিন্দুর মত টলমল করিতে থাকেই, এবং তাহাতেই গল্প পাঠ করিয়া উঠিয়া মনে হয় না যে পাঠ একেবারে ব্যর্থ হইল। আশা করা যায়, তাঁহার চিত্ররেখা ও মঞ্জুষা বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী আদর লাভ করিবে।

১৩১১ সনের ভারতীতে আমরা প্রথম শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেনের 'নেহাল ওস্তাদ' পড়িয়া অবাক হইয়া

গিয়াছিলাম। অবশেষে একটি প্রকৃত শক্তিশালিনী লেখিকা বঙ্গ সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতে সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন ভাবিয়া আমরা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলাম। লেখিকার 'যুগলাঙ্গুলিতে' প্রকাশিত সমস্ত গল্পাবলি পড়িয়া আমাদের সেই উদ্দাম আশা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। আমাদের ধারণা যে, যে জন্যই হউক লেখিকার যে পরিমাণ শক্তি ছিল সেই পরিমাণে সার্থকতা হয় নাই। "নেহাল ওস্তাদের" মত গল্প যিনি লিখিতে পারেন তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা যদি কোন দুর্ব্বিপাক অথবা অননুকূলতা বশতঃ ফুটিয়া উঠিতে না পারিয়া থাকে, তবে তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। এমন অসাধারণ আবিষ্ট করিবার শক্তি বঙ্গ সাহিত্যে এক রবি বাবুর "ক্ষুধিত পাষাণ" ভিন্ন আর কোন গল্পের নাই। "নেহাল ওস্তাদ" ছাড়া যুগলাঙ্গুলিতে আরও দুই তিনটী ভাল গল্প আছে, যেমন—ঝুটাগিনি, টেলিফোনে রোমান্স, রঘুনাথের মনুষ্য সৃষ্টি। কিন্তু এগুলি পড়িয়া একটী কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়; লেখিকা মার্জ্জনা করিবেন, আমরা তাহা না বলিয়া পারিলাম না। গল্পগুলির প্লট্ লেখিকার নিজস্ব ত? গল্পগুলির পরিকল্পনায় এমন বিদেশী গন্ধ আছে যে এইরূপ সন্দেহ হওয়া অনিবার্য্য। "রঘুনাথের মনুষ্য সৃষ্টি" গল্পের প্লট্ যে কোন বঙ্গ মহিলার মস্তিষ্ক-প্রসূত আমরা এমন কল্পনাই করিতে পারি না। যদি গল্পগুলি লেখিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব হয় তবে এর চেয়ে আর বেশী সুখের বিষয় কিছুই হইতে পারে না। এমন প্রশংসনীয় কল্পনা-বৈচিত্র একান্ত বিস্ময়কর। "যুগলাঙ্গুলি"তে কতকগুলি ছেলেমি রচনা আছে—তাহাদের মধ্যে "মাণিকলালের উপন্যাস লেখা ও সম্পাদকের অভিমত" লেখিকা যে কি বিবেচনায় ছাপাইলেন আমরা তাহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। আমরা বেশী কিছু বলিতে চাহি না,—দ্বিতীয় সংস্করণে অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখিকা এগুলি বাদ দিয়া দিবেন।

শ্রীযুক্তা সরোজকুমারী দেবীর "কাহিনী"র বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। কাহিনীর কতকগুলি গল্প অনুবাদ, কতকগুলি গল্প কষ্টকল্পিত, কষ্টরচিত, অস্বাভাবিক এবং প্রাণহীন। "অশোকা"র কবি "কাহিনী" না ছাপিলেও পারিতেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের "প্রেম মরীচিকা" রূপ মরুভূমিতে ভাল গল্পের মরীচিকা দেখিয়া দেখিয়াই হয়রান হইয়া ফিরিতে হয়। সর্ব্বত্রই একটা ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায় অথচ কোন গল্পই পূর্ণ প্রস্ফুটিত নিখুঁত গল্প নহে। গল্পগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা কঠোর শুষ্কতা বর্ত্তমান,—যাহাতে গল্পগুলি সুখপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই, অথচ অপাঠ্যও নহে। সরসতা পিপাসী পাঠকপাঠিকা "প্রেমমরীচিকা" পড়িয়া তৃপ্তি পাইবেন না। তাঁহার "নর্ত্তকী" "কুলটা" "কাঠের পুতুল" "সংযম" ইত্যাদি গল্প যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গল্প এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না, অথচ উৎকৃষ্ট গল্প উপভোগ করিয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করা যায় এ গুলিতে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, হেমেন্দ্র বাবুর প্রতিভাও যেন ঠিক ছোট গল্প রচনার উপযোগী নহে। বিস্তৃততর রচনায় যেন তাহা অধিকতর সার্থকতা লাভ করিবে।

বর্ত্তমান সময়ে গল্প লিখিয়া যাঁহারা মাসিক পত্র সমূহকে সরস রাখিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নাম ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদের পরে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবোদিত শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষ মহাশয়গণের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের অধিকাংশেরই প্রতিভা বিকাশোন্মুখ মাত্র; চারু বাবু এবং সরোজ বাবু ভিন্ন কাহারও রচনাই এখনও পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই অপরিণত অবস্থায়ই ইহাদিগকে মাসিক পত্রিকার টানাটানিতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে। বঙ্কিম বাবু রচনা লিখিয়া এক বৎসর ফেলিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এক বৎসর ফেলিয়া রাখিবে দূরে থাকুক, রচনা লিখিয়া লেখকগণের এখন এক ঘণ্টা

ফেলিয়া রাখিবারও সুবিধা হইয়া উঠে না। পাঠক সাধারণের এই সর্ব্বনাশী লঘু-সাহিত্য-প্রিয়তায় সম্পাদকগণ অস্থির হইয়া উঠেন এবং উদীয়মান লেখকগণ দ্রুতগতিতে অবনতির নিম্নতম সোপানের দিকে ধাবিত হইতে থাকেন। আমাদের দেশের অনেক হতভাগিনী বালিকা যেমন দ্বাদশ বৎসর যাইতে না যাইতেই অনবরত সন্তান প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়া কুড়িতেই বুড়ী হইয়া ক্রমে বন্ধ্যা হইয়া পড়েন, উদীয়মান লেখকগণকেও ঠিক সেই রকম দুর্দ্দশায় পড়িতে হইতেছে! বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা লইয়া খুব কম লোকেই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন অনেকেই। সেই স্ফুলিঙ্গটুকুর সদ্ব্যবহার করিলে,—সযত্নে ও সুস্থির চিত্তে তাহাকে বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলে, কালক্রমে তাহা বৃহৎ অগ্নিতে পরিণত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বিকৃতরুচি পাঠক ও নিরুপায় সম্পাদক, এই উভয়ে মিলিয়া যদি গোড়াতেই তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া তাহাকে নিভাইয়া দেন, তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বড় ভাল নহে। শুধু বিষ পানেই মৃত্যু হয় না, আকণ্ঠ অমৃত পানেও মৃত্যুর আশঙ্কা আছে! অনেক লেখক আবার উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণপণে বিদেশী ভাষা হইতে অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। নিজের যাঁহার লিখিবার ক্ষমতা আছে তাঁহার পক্ষে অনুবাদ করিতে যাওয়ার মত বিষম ভুল আর নাই। যখন দেখিবেন, হৃদয়ের সমস্ত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, নূতন নূতন ফুল ফুটিবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই তখন অনুবাদ আরম্ভ করা যাইতে পারে। যখন ভাষা আছে, ভাব নাই, তখন অনুবাদের দিকে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, ইহার পূর্ব্বে অনুবাদের কোন সার্থকতা নাই। পূর্ব্বে শাস্ত্রের ব্যবস্থা ছিল যে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।—বর্ত্তমানে বন গমনের প্রয়োজন না থাকাতে তখন অনুবাদের গহনে প্রবেশ করিলেই ভাল হয়। বস্তুতঃ আজকাল মাসিক পত্রিকায় অনুবাদের প্রাচুর্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনুবাদ-বাদীরা বলেন, ইহাতে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অনুবাদে ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হয় ইহা আমরা অস্বীকার করিতে চাহি না, কিন্তু ভাষার সমস্ত অবস্থাতেই কি অনুবাদ দ্বারা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর? অনুবাদ যখন লুণ্ঠনেরই নামান্তরমাত্র, অনুবাদ যখন প্রদানশূন্য আদানমাত্র নহে, তখনই ইহা দ্বারা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু অনুবাদ যখন চুরি অথবা ঋণের নামান্তর মাত্র, তখন এই বিষম জিনিষের বিষময় ভারে ভাষার সর্ব্বস্বান্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ঋণ করিয়া কেহ কোন দিন বড় মানুষ হইয়াছে ইহা যেমন ইতিহাসে দেখা যায় না, অবিশ্রান্ত অনুবাদ করিয়া কোন অনুন্নত ভাষা উন্নত হইবে ইহাও তেমনি অশ্রদ্ধেয় কথা। শিল্প বিজ্ঞানে অবশ্য সময় সময় অনুবাদের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কিন্তু শক্তিশালী লেখকগণ ইচ্ছা করিলে তখনও অনুবাদের হাত এড়াইয়া চলিতে পারেন।

আমাদের প্রতিভারশ্মি বিশিষ্ট উদীয়মান লেখকদের অনুবাদপ্রিয়তা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। এই সর্ব্বনাশী অনুবাদ-প্রয়াস আলস্য এবং সাধনার অভাবের নামান্তর মাত্র। এই সকল ভ্রান্ত বিপথ-চালিত শক্তিশালী লেখকগণ বুঝেন না,— এইরূপ ঋণ গ্রহণে হৃদয় কত সঙ্কুচিত হয়, মৌলিক ক্ষমতা কত ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। এইরূপে সাহিত্য সেবা করা আত্ম-প্রতারণা এবং আত্ম-সর্ব্বনাশের নামান্তর মাত্র। হৃদয়ে যে কুসুমটি মাধুর্য্যে ভরিয়া লাবণ্যে ঢল ঢল হইয়া আপনি ফুটিয়া উঠে সেই একটি মাত্র কুসুমই মায়ের পদতলে আনিয়া অশ্রু সজল নয়নে উপহার দাও,—মা তৃপ্ত হইবেন। ধার করা ফুলে মায়ের পূজা করিবার ভাণ করিয়া মাকে অপমান করিও না।

শ্রীযুক্ত চারু বাবু এবং শ্রীযুক্ত সরোজ বাবুকে ঠিক উদীয়মান লেখক বলা যায় না। তাঁহাদের প্রতিভা প্রায় পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। সরোজ বাবুর ভাল গল্প অনেক আছে কিন্তু খুব ভাল গল্প দুই একটির বেশী নাই। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের মত সরোজ বাবুর গল্পেও এমন একটা কঠিন আড়ষ্ট ভাব লাগিয়া থাকে যাহাতে গল্পগুলি মোটের উপর ভাল হইলেও পড়িয়া যেন তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সমস্ত দোষ বর্জ্জিত গল্প তাঁহার একটিমাত্র আছে—তাঁহার নাম "রুদ্ধ কণ্ঠ"। ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর গল্প, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে। এমন সুনিপুণ রচনা তাঁহার আর নাই।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকগণর মধ্যে একজন। তাঁহার রচনায় প্রতি পদে অনুশীলন-কুশলতার পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইতে হয়। তাঁহার রচনায় এমন একটি নিটোল রসমাধুর্য্যের ধারা বহিয়া চলে যে তাহা হৃদয়কে অনায়াসেই স্পর্শ করিয়া প্রভুত আনন্দ দান করে। এই ধারার প্রধানগুণ এই যে, ইহা যেমন অন্তঃসলিলা, তেমনি বহিঃসলিলা। তাঁহার অনেকগুলি গল্প অতি মধুর কোমল-কান্ত কবিত্ব-মণ্ডিত; সে গুলি সর্ব্বসাধারণের নিকট আদর পাইবে না বটে, কিন্তু রসজ্ঞ পাঠক সে গুলি চিরদিন পুলকোদ্বেল চিত্তে পাঠ করিবেন। "দেয়ালের আড়াল" "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" এই শ্রেণীর গল্প। "দেয়ালের আড়াল", এত অনির্ব্বচনীয়তা গুণ-মণ্ডিত, ইহার আনন্দ দিবার শক্তি এমন অসাধারণ যে, বঙ্গ-সাহিত্যে এত ছোট অথচ এত সুন্দর গল্প নাই বলিলেও চলে। চারু বাবুর নব প্রকাশিত "পুষ্প পাত্রে" কয়েকটি অপদার্থ গল্পও সন্নিবিষ্ট আছে,—তাহাদের অপদার্থতা তাহাদের রচনায় ততটা নহে, যতটা তাহাদের আদর্শে এবং কল্পনায়। আর এক কথা;—চারু বাবুর ভাষার বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার আছে। চারু বাবু আমাদের কথা বিদ্বেষী সমালোচকের কথা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া বিনীত ভক্তের মিনতি বলিয়া গ্রহণ করিলে বাধিত হইব। চারু বাবুর সমস্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাহাদের ভাষার বহুরূপ দেখিয়া বিস্মিত, বিরক্ত এবং বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে হয়। "পুষ্প পাত্রের" ভূমিকায় তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাতে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। শক্তি থাকিলেই কি বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাষা লইয়া এমনি ছিনিমিনি খেলিতে হয়? চারু বাবু কি বলেন জানি না, কিন্তু ইহা আমরা মানি যে বিষয় অনুসারে ভাষার গতি বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু সে জন্য কি একেবারে কামাস্কাট্‌কা হইতে মলয়াচলে? এইরূপ চেষ্টাকৃত বিকৃতির সার্থকতা কি, আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের মতামতে অবশ্য চারু বাবুর মত শক্তিশালী লেখকের কিছুই আসিবে যাইবে না,—তিনি যে ভাষায়ই লিখুন, আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবেনই। আমরা কেবল তাঁহাকে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। জেদ বজায় রাখা, সমালোচকের কথায় কর্ণপাত না করা, এবং স্বেচ্ছামতে চলা দৃঢ়তার পরিচায়ক হইলেও সর্ব্বদাই প্রসংশনীয় নহে। পশ্চিম বঙ্গের লেখকগণ আর একটি কথা সহজেই ভুলিয়া যান। পূর্ব্ব বঙ্গে, এমন কি আসামেও যে বাঙ্গালা ভাষাই লিখিত পঠিত এবং কথিত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা তাঁহারা মাঝে মাঝে স্মরণ করিবেন। আমাদের মতে চারু বাবুর "বন্ধু" এবং "লেখকের বিপদ" নামক উৎকৃষ্ট মনোরম গল্পদ্বয়ের ভাষাই চারু বাবুর গল্পের ভাষার আদর্শ হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র বাবু ছোট গল্প রচনায় ইতিমধ্যেই বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার শেফালি উৎকৃষ্ট গল্পের সমষ্টি। তাঁহার নিকট আমরা অনেক আশা করি। কিন্তু তাঁহার "পরদেশী"র বিষয় বক্তব্য এই যে—

"চণ্ডালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তকে,
ভস্মরাশি করে ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

শ্রীযুক্ত ফকীরবাবুও ইতিমধ্যেই "ঘরের কথায়" বেশ শক্তির আভাস দিয়াছেন। তাঁহার প্রতি একান্ত বিনীত অনুরোধ,—টানাটানিতে পড়িয়া দিশাহারা হইবেন না। নবোদিত শ্রীযুক্ত পাঁচু বাবুকেও আমরা ঐ একই কথা বলিতেছি। শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবুর "সপ্তপর্ণী" এবং শ্রীযুক্ত মনিলাল বাবুর "আলপনা"র আলোচনা করিলাম না,—প্রীতিকর হইবে না। এই সকল বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ আশাস্থল লেখকগণের সাধনার অভাব এবং অবহেলা দেখিলে মনে বড়ই কষ্ট হয়। প্রবাসীতে সুরেশ বাবু এই শ্রেণীর লেখকদিগকে সাহিত্যামোদী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের ত সাহিত্যামোদী হইলে চলিবে না, ইহাদিগকে যে প্রকৃত সাহিত্যসেবী হইতে হইবে। সাহিত্যসেবা ছেলে খেলা নহে, কঠোর সাধনা ভিন্ন এই ক্ষেত্রে সিদ্ধি অসম্ভব।

১৩১৪ সনের ভারতীতে একটি অজ্ঞাতনামা লেখক "বড়দিদি" নামে একটি গল্প লিখিয়াছিলেন। ঐ বৎসর ভারতী মাত্র ছয় খণ্ড বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ঐ ছয় খণ্ড ভারতী এই একটি মাত্র গল্পে আলোকিত হইয়া

রহিয়াছে। আমরা নিঃসঙ্কোচে এই গল্পটিকে বঙ্গ ভাষার শ্রেষ্ঠতম গল্পের মধ্যে একটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। গল্পটি যদিও সারঙ্গের মত শীর্ণোদর হইয়া গিয়াছে তবু ইহার সর্ব্বত্র অসাধারণ নিপুণতার পরিচয় বর্ত্তমান। এই গল্পের লেখক আমাদের মনে অসীম আশা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন; ইহার পরে তিনি যদি চুপ করিয়া থাকেন তবে তিনি ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইবার উপযুক্ত হইবেন।

কেশ-তৈল, সাবান ইত্যাদির বিজ্ঞাপন প্রচারোদ্দেশ্যে আমাদের দেশে অনেকগুলি গল্পরচনা প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুন্তলীন পুরস্কার রচনা ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান,—আর কোনটিই বিশেষ ফল প্রসব করে নাই।

১৩০৩ সনে শ্রীযুক্ত এইচ্ বসু মহাশয় নূতন লেখক লেখিকাদিগকে সাহিত্য চর্চ্চায় কতক পরিমাণে উৎসাহিত করিতে, "গৌণভাবে কুন্তলীন ও দেলখোসের প্রচার" করিবার জন্য কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রভুত পরিমাণে সফল হইলেও প্রধান উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে ঠিক বলিতে পারিতেছি না। ১৩০৩ হইতে ১৩১৫ পর্য্যন্ত বার বৎসরে আমরা বারখানা উৎকৃষ্ট গল্প পুস্তক পাইয়াছি, কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, অনেক ক্ষমতাশালী নূতন লেখক একবার মাত্রই কুন্তলীন পুরস্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া, বঙ্গ সাহিত্যের বিপুল আসরে বারেক চমকিয়া আবার অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছেন। এমন কি, অনেকবার দেখিয়াছি, যিনি প্রথম পুরস্কারও পাইয়াছেন তাঁহারও ভবিষ্যতে আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ কি ঠিক করা দুষ্কর। পুরস্কারের লোভে যে এই সকল অজ্ঞাতনামা ক্ষমতাশালী লেখক আত্মপ্রকাশ করিতেন এমত বোধ হয় না। শুধু গল্প রচনা কেন, যে কোন রকমের সাহিত্য চর্চ্চাই খেলার বিষয় নহে। আমাদের পেচক-বাহিতা জ্যোৎস্নাময়ী হাস্যোজ্জ্বলা ঠাকুরাণীটির চিরদিনই চঞ্চলা বলিয়া দারুণ অখ্যাতি আছে। কিন্তু অতি ভয়ে ভয়ে আজ বলিতেছি যে মানস সরসে স্বচ্ছসলিলোত্থিত শুভ্র শতদল-আসনে উপবেশন করিয়া কমলার সহোদরাটি যদিও স্থির হইয়া ধ্যান আনমনে "শ্বেতভুজে শ্বেতবীণায়" ঝঙ্কার তুলিতে থাকেন—মুগ্ধ ভ্রমর চারিদিকে গুঞ্জন করিয়া ফিরে, হংস নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া থাকে, ছোট ছোট ঢেউগুলি শতদল কাঁপাইয়া সুনীল পত্রের উপর চঞ্চল হীরকবিন্দু তুলিয়া ঝলকে ঝলকে ছলকে ছলকে নাচিয়া নাচিয়া মায়ের রক্ত-পদতলে আসিয়া ঢলিয়া পড়ে;—পার্থিব মানবের মনে সেই অনন্ত উৎসবময় ঝঙ্কারের যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে জাগে তাহা বীণাতন্ত্রীর উপর লীলায়মান মায়ের চম্পকাঙ্গুলীরই মত চঞ্চল—তাহা "নাহি থাকে স্থির একপল।" চঞ্চলা ভারতীর আনত প্রসন্ন দৃষ্টি যাঁহাদের উপর বারেকও পতিত হয় তাঁহারা সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই, যাঁহারা পাইয়াও হারাইয়া ফেলেন তাঁহারা হতভাগ্য, কিন্তু যাঁহারা পাইয়াও অবহেলা করেন তাঁহাদের মার্জ্জনা নাই, তাঁহারা মহাপাপী। এই শক্তি বিধাতার দত্তধন, বিশ্বমানবের সম্পত্তি, তোমাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছে মাত্র। তুমি যদি দান না কর, যদি পাইয়া হারাইয়া ফেল, অবহেলায় নষ্ট করিয়া ফেল, অপব্যবহার কর;—তুমি সমস্ত মানবের সম্পত্তি অপহরণের পাপে পাপী—এই পাপের মার্জ্জনা নাই।

এই কুন্তলীন পুরস্কার রচনার পুস্তকগুলি প্রত্যেক বৎসর এক একবার মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ফিরিয়া আর এগুলি মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কাজেই এ গুলিকে সাময়িক সাহিত্য বলিলে অন্যায় হয় না। এরূপ অস্থায়ী সাহিত্যের আলোচনায় কোন লাভই নাই বলিয়া আমরা এ গুলিকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু অনেক বিষয় ভাবিয়া এ গুলির একটু আলোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি।

কুন্তলীন পুরস্কারের গল্পগুলির আলোচনা করিতে করিতে একটি বিচিত্র ঘটনা চক্ষে পড়ে। পরপর বৎসরে এমন অনেক গল্প আছে যাহার "ন্যাজা মুড়া" ডালপালা বাদ দিলে মূলতঃ গল্পগুলি একই হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ কি? লেখকগণ ইচ্ছা করিয়া যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের গল্পাবলির অনুকরণ করিয়াছেন এরূপ অনুমান

করিবার কোনই কারণ নাই। তবে এরূপ কেন হয়? স্কটের আইভান হো, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী এবং রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা মূলতঃ এক কেন? আমাদের বিশ্বাস বিশ্বমানবের মনের শত বৈচিত্রের অন্তরালে যে একটি সাধারণ স্থির ভিত্তি আছে এই একত্ব তাহা হইতেই উদ্ভূত। আজকাল নূতন লেখকগণ লিখিতে আরম্ভ করিলেই অনুকরণের দায়ে ধরা পড়িয়া যান। যিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন তিনিই নাকি রবি বাবুর অনুকরণ করেন, তিনি অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাস হইতেও যাহা লেখেন তাহাও নাকি "রবি বাবুর পুরাতন পেটেণ্ট" না হইয়া যায় না। কাজেই অনেক বিজ্ঞ সমালোচক শৃঙ্গ নাড়িয়া নূতন লেখকের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন, আর নূতন লেখক উপায়ান্তর না দেখিয়া কবিতা বিস্মৃত হইয়া আত্মরক্ষার্থ তীক্ষ্নমুখ লৌহলেখনী উঁচাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, এই দৃশ্য বঙ্গসাহিত্যে অধুনা বড় বিরল নহে। ফলে অনেক সময় প্রতিভার কণ্ঠরোধই সমালোচকের প্রধানতম কার্য্য হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এই কুন্তলীন পুরস্কার রচনাগুলি পড়িতে পড়িতে আমরা আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। এক এক বৎসরে এক এক সাহিত্যিকের উপর রচনা নির্ব্বাচনের ভার ছিল, এবং একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে সহজেই দেখা যায়—পরীক্ষকগণের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বৎসরে বৎসরে গল্পগুলি কেমন বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে। তৃতীয় বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারের প্রায় প্রত্যেক গল্পই নায়ক নায়িকার মৃত্যু অথবা আত্মহত্যায় পর্য্যবসিত। চতুর্থ বৎসরের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়। সকলেই জানেন নগেন্দ্র বাবু সুন্দর সুখপাঠ্য তরল চমকপ্রদ ঘটনাপূর্ণ গল্প লিখিবার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার নির্ব্বাচিত গল্পগুলিও সেই রকম তরল, সুখপাঠ্য ও চমকপ্রদ ঘটনাপূর্ণ। সপ্তম বৎসরের নির্ব্বাচক ছিলেন শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়। জলধর বাবুর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি হৃদয়কে আমূল আলোড়ন করে, পড়িয়া মনে হয় যেন এগুলি দীর্ঘশ্বাস এবং অশ্রুজলে গঠিত। * তাঁহার নির্ব্বাচিত গল্পগুলিরও সেই গুণ আছে। সমালোচনাকালে সমালোচকের নিজত্ব বর্জ্জন করা যে কত কঠিন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহাই ফিরিয়া মনে হইতেছে। সপ্তম বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারের প্রধান গল্প "মন্দির" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভাগলপুর হইতে লিখিয়াছিলেন। ইনি কি বিখ্যাত চিত্রকর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ? যদি তাহাই হয় তবে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ উদীয়মান লেখক হারাইয়াছি। যদি তাহা না হয়—ভগবান তাই করুন তবে যিনি এমন সুন্দর গল্প লিখিতে পারেন তাঁহার চুপ করিয়া থাকা ভাল হয় না। আশা করি তিনি বঙ্গ সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। এই বৎসরের পঞ্চম গল্পটির নাম "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে"; লেখকের নাম দেখিতেছি শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ইনি বোমার মোকদ্দমায় নির্ব্বাসিত বারীন্দ্র হইলে আমরা একজন শক্তিশালী লেখক হারাইয়াছি। তাঁহার অন্য কোনও রচনা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। * এই প্রথম রচনাতেই তিনি যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালাভাষায় খুব বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা এই গল্পটির আমূল আলোচনার প্রলোভন অনেক কষ্টে সম্বরণ করিলাম।

পরিশেষে একটি কথা বলিয়া কুন্তলীন পুরস্কার রচনার আলোচনা শেষ করিতে চাই। এই দ্বাদশ বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারের অধিকাংশ গল্পই নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা হইলেও প্রায় প্রত্যেক বৎসরের পুস্তকেই দুই তিনটি করিয়া এমন গল্প আছে যাহা বঙ্গভাষার স্থায়ী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং এই কারণে সযত্নে রক্ষার যোগ্য। এইগুলি পুনর্মুদ্রিত হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, অথচ কুন্তলীন পুরস্কার পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি লুপ্ত হইয়া গেলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। এই অবস্থায় কোন প্রকাশক যদি উপযুক্ত নির্ব্বাচক দ্বারা নির্ব্বাচন করাইয়া এই দ্বাদশ বৎসরের গল্প পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন তবে বাঙ্গালাভাষার

* গল্পের এই অদিষ্টকর গতি দেখিয়া "ভারতী" পত্রে শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবু সাহিত্যে আত্মহত্যা নামক প্রবন্ধে ইহার কঠোর আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

* পুরাতন "মুকুলে" বালক বারীন্দ্রকুমারের রচনা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। ভাঃ মঃ সঃ।

একখানা উৎকৃষ্ট সুখপাঠ্য গল্প-পুস্তকের সৃষ্টি হইতে পারে। কোন্ কোন্ গল্প আমাদের বিবেচনা অনুসারে রক্ষার যোগ্য আমরা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা হইবে, এই ভয়ে করিলাম না। কোন সুযোগ্য ব্যক্তির উপর এই ভার দিলেই চলিবে।

আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্পের দীর্ঘ আলোচনা এখানেই শেষ করিতে চাই। আমরা ছোট গল্পের পূর্ণস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে কোথাও চেষ্টা করিলাম না, এখানেও করিব না। প্রকৃত গীতি কবিতার মত প্রকৃত ছোট গল্পেরও স্বরূপনির্দ্দেশ করা কঠিন। কিন্তু উৎকৃষ্ট ছোটগল্প চেনা বোধ হয় বিশেষ কঠিন নহে। অসাধারণ আনন্দ দান করিবার ক্ষমতাই শুধু ছোট গল্পের কেন সমস্ত সাহিত্য রচনারই প্রধান বিশেষত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

এই প্রবন্ধে হয়ত অনেক ভাল ছোট গল্পের উল্লেখই হয় নাই, কারণ অনেক ভাল গল্প হয়ত আমরা পড়ি-নাই অথবা পড়িয়া থাকিলেও প্রবন্ধ লিখিবার সময় মনে হয় নাই। দুই একজন গ্রন্থকারের পুস্তক সম্মুখে না থাকায় তাহাদের গল্পাবলির বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারি নাই। এ সমস্ত এবং অন্যান্য আরও অনেক ত্রুটির জন্য লেখকবর্গের নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

পথ প্রদর্শক।

আমি, মাঠের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম একা,
আমার, পথ ছিল না জানা
তারি পাশে করতেছিলে তুমি
কেবল আনাগোনা ;
বল্লাম আমি যাও গো আমায় নিয়ে
তুমি, আসা যাওয়া কর্চ্চ যে পথ দিয়ে।
শুনে, হেসে তুমি মুখের পানে চেয়ে
কর্লে ঈষৎ মানা,
আমি, কাতর হয়ে বল্লাম লহ আমায়,
আমার, পথ নেই যে চেনা।"

সেই, হবে আমার চিরদিনের ঠাঁই
যেথায় নেবে তুমি,
তারি পরে রাখব আমি মাথা
চরণে তার নমি।
দেখ্ছ কি এ রবিতপ্ত মাঠ,
কোথায় ওগো কোথায় গ্রামের বাট,
ছায়ায় ঢাকা পল্লী পুর বাট
শৈবালেতে ঘুমি
নব তৃণে ফুলের দলে ঢাকা
কোথা গো সে ভূমি!

বনের ধারে ঐ যে গেছে পথ
ঘুরে নদীর বাঁক,
এ খানেতে থামবে বুঝি তুমি?
বাজ্ছে যেথা শাঁখ,
দীপের সজ্জা যাচ্ছে দেখা যেথা
বাজন বাজে উগ্র তপ্ত ব্যথা
কি উৎসব হচ্ছে আজ্কে সেথা
লেগেছে ডাক হাঁক,
লোকের ভিড় নিবিড়তর যেথা
নাই'ক কিছু ফাঁক!

কোন্ খানেতে নিয়ে এলে আমায়
কিসের মাঝখানে,
এ নয় গো পল্লী পুর-বাট
মুখর পাখী গানে!
বনের ছায়া কোথায় মাথার পরে
টগর চাঁপা বেড়ার ধারে ধারে
প্রকাণ্ড পথ ছড়িয়ে গিয়ে ঘুরে
গেছে কিসের পানে,
কিসের শব্দ কিসের কোলাহল
পৌঁছ্চে এসে কাণে!

তুমি, থাম্‌ছ কেন, থাম্‌ছ কেন হেথা
পথ নেই কি আর?
ডাইনে বাঁয়ে, আগে কিম্বা পিছে?
নেই কি, কোনো চিহ্ন তার?
এই খানেতেই থাম্‌তে আমায় হবে?
ক্রুদ্ধ রণের হানাহানির রবে
পায়ের নীচে শোণিত মাখা শবে
শুনে; অসির ঝণৎকার
এরি মাঝে যাত্রা আমার শেষ?
নাই'ক কোনো পার?

হোক্ তবে তাই, দিলাম ফেলে ক্ষোভ
আমি, কর্ব্ব না আর ভয়,
আজ এ রুদ্র ভয়ঙ্করের সনে
করব পরিচয়,
ব্যথার নাড়ী দিলাম আজ্‌কে ছিঁড়ে,
চাইব না আর পিছন দিকে ফিরে,
শঙ্কা যত সরিয়ে দেব দূরে
ভাবনা করে ক্ষয়,
তোমার মাঝে করবো আজ্‌কে আমি
বেদনা মম লয়!

বজ্র কঠিন বর্ম্ম নেব আজ
বুকের পরে তুলে,
সকল সজ্জা সকল লজ্জা মোর
চরণ তলে দলে,
কিঙ্কিণী আজ বাজ্‌বে নতুন হাতে
অস্ত্র জ্বলায় অসির ঝঞ্ঝনাতে
আমি, চল্‌ব আজ্‌কে তোমার সাথে সাথে
তোমার ধ্বজা-মূলে,
বাঁধন যা আর আছে খোলার বাকি
ফেল্‌ব তা আজ খুলে!

তোমার তরে যুঝ্‌বো আমি আজ
শুধু তোমার তরে—।
রক্ত যখন ছুটবে চিরে বুক
চাইব পরব তরে

তোমার, মুখের পানে সকল ব্যথা ভুলি
হর্ষে, হৃদয় আমার উঠ্‌বে ওগো দুলি,
তোমার জয় ধ্বজা উচ্চে তুলি
রাখব্ হিয়ার পরে
শঙ্কা আমি সকল ভুলে যাব
তোমার স্মরণ করে!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

ছলনা।

(১)

প্রথম কন্যাটী পার করিতেই অমরলাল কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল; এখনো সে শুধরাইয়া উঠিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কন্যাটীও বেশ মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব? সম্প্রতি রিডাকসনের (Reduction) ফলে অমরলালের চাকরিটীও আবার গিয়াছে। ইহার উপর সেদিন তাহার ছোট ছেলেটী পিতামাতার বক্ষে শোকের চিতা জ্বালিয়া চলিয়া গেল। দৈন্যের সঙ্গে শোকের জ্বালা—অমরলাল অস্থির হইয়া পড়িল।

অমরলালের এখন দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রহিল। ছেলে দুইটীর লেখা পড়ার ভার নগেন মাষ্টারের উপর। সে বহুদিন হইতেই আছে, ছেলে মেয়েরা তাহাকে নগেন দাদা বলিয়া ডাকে।

নগেন স্থানীয় স্কুলে সামান্য মাহিনায় মাষ্টারি করে, এবং অমরলালের বাটীতে দুইবেলা দুটি খায় ও ছেলে দুটীকে লেখাপড়া শিখায়। ইহাতেই সে সন্তুষ্ট! কমলা পাষাণে বুক বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পুত্রহারা শোকাতুরা জননী পুত্রশোক হৃদয়ে চাপিয়া স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতরে একটা কাল দাগ রহিয়া গেল।

কমলা সংসার খরচ কমাইয়া ফেলিল। ঝিটীকে বিদায় দিল। নগেনকে বলিল, "বাবা এখন আমাদের অবস্থা মন্দ"—মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নগেন বলিল, "মা আমি কোথা যাব? আমার মা নাই, আপনাকে মা বলে আমি সুখী হই; নিলু পিলুকে ছোট

ভায়ের মতন দেখি—" নগেন বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। সে সাশ্রু নয়নে বলিল "আমি আপনাদের অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছি। এক কাজ করুন, আমি যে ২৫৲ টাকা মাহিয়ানা পাই, তাতে কোন রকমে সংসার রক্ষা করুন। এমন দিন চিরকাল যাবে না, ভগবান্‌ অবশ্য মুখতুলে চাইবেন—সেই সময় না হয়—" নগেন আর বলিতে পারিল না, তার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

কমলা নগেনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—তাহার অশ্রুমাখা মুখখানিতে যেন স্বর্গের ছবি ফুটিয়া উঠিল!

কমলার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কে যেন শীতল বারি ঢালিয়া দিল। তাহার নয়নপ্রান্ত অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল--কমলা আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, "বাবা তুমি চিরজীবী হও।"

অমরলাল একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিল। দেশের বাটীতে অমরলালের রুগ্ন পিতা থাকেন। তাঁহাকে মাসে মাসে অমরলাল কিছু কিছু পাঠাইত, এখন তাহা একরূপ বন্ধ হইয়া আসিল।

(২)

নগেনের উপার্জ্জনেই কোন রকমে সংসার চলিতে লাগিল, কমলা কাচের চুড়ী সার করিয়া, তাহার যাহা কিছু ছিল, ব্যবসা করিবার জন্য সমস্তই অমরলালের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। অমরলাল গঙ্গার ধারে খানিকটা যায়গা লইয়া একটা ইটখোলা করিল—বহু পরিশ্রমে দুই লাখ্‌ ইটের দুইটী পাঁজা সাজান হইল, যথাসময়ে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। কিন্তু অদৃষ্টের দোষ, সেই বৎসর ভীষণ বন্যায় সমস্ত ইট নষ্ট হইয়া গেল। অমরলাল একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। ইহার উপর কন্যাদায়!

অমরলাল চাকরীর আশায় বহুস্থানে সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে সে বড় পোষ্ট আপিসের ধারে বসিয়া মনি অর্ডারের ফর্ম্ম পূর্ণ করিয়া কিছু কিছু উপায় করিতেছিল। কিন্তু ইহাও তাহার ভাগ্যে সহিল না। কর্ত্তাদের নজরে পড়ায়, চাপরাশীরা তাহাকে উঠাইয়া দিল। হা ভগবান!

কমলাকে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। কিছুদিন অক্লান্তরে পরিশ্রম করিয়া পীড়িতা হই[illegible] তাহার সোনার বর্ণ কালী হইয়া গেল। দুঃখ দৈন্যে দারুণ পীড়নে কচি কচি ছেলে মেয়েগুলি কঙ্কাল-সা[illegible] হইয়া পড়িল। নগেন তাহাদিগকে আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া রাখে—গোপনে অশ্রুমোচন করে।

(৩)

একদিন কমলা বলিল, "তোমার ঠিকুজিখানা একবার কোন ভাল লোককে দেখাও দেখি, এ রকম শনির দ[illegible] আর কত দিন আছে?"

অমরলালের প্রাণটা যেন ছেঁৎ করিয়া উঠিল; শ[illegible] তাহাকে পথের ভিখারী করিয়াছে!

পরদিন অমরলাল বৌবাজারে এক প্রসিদ্ধ গণকের শরণাপন্ন হইল। সংক্ষেপে তাহার [illegible] জানাইয়া ঠিকুজিখানির সহিত কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া ফলাফল শুনিবার জন্য জ্যোতিষী মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জ্যোতিষী রজতখণ্ডটী লোকচক্ষুর অগোচরে রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বা[illegible] বার ঠিকুজির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হস্তরেখা দেখি[illegible] বলিলেন:—

"আপনি সম্প্রতি একটা শোক পাইয়াছেন।"

"আজ্ঞা হাঁ, আমার একটী পুত্রহানি হইয়াছে।"

জ্যোতিষীর উপর অমরলালের বিশ্বাস অটল হ[illegible] গেল।

জ্যোতিষী কহিল, "শনি—শনি আপনাকে এ[illegible] অবস্থায় ফেলেছে, কিন্তু আপনার শনির দশা [illegible] এসেছে, আর এই কটা দিন মাত্র আছে।"

অমরলাল আগ্রহের সহিত বলিল—"শনি আর [illegible] দিন আছে মশাই—তার পর?"

শনি আর একুশ দিন মাত্র আছে, তারপর বৃহস্প[illegible] দশা--হাত খানা আর একবার দেখি!" অমরলাল [illegible] খানি বাড়াইয়া দিল, জ্যোতিষী হাত খানি টা[illegible] টানিয়া রেখা গুলি দেখিতে লাগিলেন। একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আপনার অদৃষ্ট কিছু দেখ্‌চি, এই একুশ দিন বাদে আপনার কিছু অপ্রত্যা[illegible]

অর্থ লাভের সম্ভাবনা। বৃহস্পতি আপনার সহায় হবেন।”

অমরলাল আর কিছু শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না। সে ঢিপ্ করিয়া জ্যোতিষীকে একটা প্রণাম করিয়া বুক ভরা আশা লইয়া বাড়ীতে ফিরিল। শুষ্ক শাখায় কুসুমের মত তাহার মলিন মুখে একটা লাবণ্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

কমলা সব শুনিল, আশার মোহন স্পর্শে তাহার আঁধার প্রাণ পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভক্তিপূর্ণ প্রাণে বলিয়া উঠিল, “আহা মা কালী যেন তাই করেন।” কমলা স' পাঁচ আনার পূজা মানসিক করিল।

(৪)

অমরলাল এইখানে একটু বুদ্ধি খাটাইল। সে ভাবিল, বৃহস্পতি কিছু তাহাকে হাতে করিয়া টাকা আনিয়া দিবেন না। বৃহস্পতি সহায় মাত্র। তবে তাহাকে বৃহস্পতির উপলক্ষ হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক বন্ধুর পরামর্শে পৈতৃক শাল জোড়াটি বিক্রয় করিয়া নগদ দশ টাকা দিয়া কলিকাতার টার্ফ ক্লব হইতে একখানি ডার্বি সুইপের টিকিট কিনিল। এবার তার বুক ভরা আশা! ভাগ্য ফিরিবে!!

অমরলাল ভাবিল, যদি সে প্রথম প্রাইজ পায় তবে অন্ততঃ ছয় লক্ষ টাকা, যদি দ্বিতীয় প্রাইজ পায় তবে তিন লক্ষ টাকা, আর একান্তই যদি তৃতীয় প্রাইজ পায় তাহাও লক্ষ টাকা!

আশামুগ্ধ অমরলাল আপন মনে কত রকম সুখের কল্পনা করিতে লাগিল!

(৫)

আজ টার্ফ ক্লবের ড্রইংয়ের দিন। অমরলালের বন্ধু নাকি তাহাকে বলিয়া দিয়াছে, যাহার নামে প্রাইজ পাইবার উপযুক্ত ঘোড়া উঠিবে তাহাকে তাহারা সেই রাত্রেই টেলিগ্রাম করিয়া জানাইবে। আজ আর অমরলালের নিদ্রা নাই। সে উপরের ঘরের বাতায়নটী খুলিয়া বসিয়া আছে। কেন টেলিগ্রামওয়ালা দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া না যায়। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল, কিন্তু টেলিগ্রামের সাক্ষাৎ নাই; অমরলাল অধীর হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে যেন এখনি টার্ফ ক্লবে যাইয়া খবর লইয়া আসে, কেন তাহারা টেলিগ্রাম পাঠাইতে বৃথা দেরি করিতেছে।

রাত্রি বারটা বাজিল। এক খানি বাইসিকেল আসিয়া অমরলালের দ্বারের নিকট থামিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে “বাবু টেলিগ্রাম হ্যায়” বলিয়া পিয়ন ডাকিল। সে স্বর তাহার কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করিল। সে “জয় দুর্গে” বলিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং দাঁড়াও দাঁড়াও বলিয়া ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল—একটা চৌকাঠে পা লাগিয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল. কপালটা ফাটিয়া গিয়া দর দর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। উহা এখন তুচ্ছ, কিছুই নয়—সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে আসিয়া পিয়ন-প্রদত্ত পেন্সিলে রসিদ সহি করিয়া টেলিগ্রাম খানি লইল।

কমলা প্রদীপ হস্তে নীচে আসিয়া অমরলালকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। ভীতি-কম্পিত স্বরে বলিল, “একি, রক্ত গঙ্গা যে!”

“ও কিছু নয়! আলোটা এই দিকে নিয়ে এস” বলিয়া অমরলাল আলোর নিকটে আসিয়া কভারটা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল।

একটা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অমরলাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

টেলিগ্রাম খানি অমরলালের নামেই আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে লেখা ছিল—“তোমার পিতা সাংঘাতিক পীড়িত, অবিলম্বে সপরিবারে রওনা হইবে।”

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা।

তোমরা সকলেই বোধ হয় মহাভারত পড়িয়াছ। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের কথা মহাভারতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাযুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ কুরুপক্ষের প্রধান যোদ্ধা এবং অর্জ্জুন পাণ্ডব পক্ষের নেতা ছিলেন। প্রথম বয়স হইতেই কর্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, উভয়েই একে অন্যের অপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যায় কিসে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবেন প্রাণপণে সেই

চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কর্ণের একটা বড় অসুবিধা ছিল। তিনি অর্জ্জুনের সহোদর ভ্রাতা, সুতরাং অর্জ্জুনের ন্যায় তিনিও ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু কর্ণ বা অর্জ্জুন বা অন্য কেহ সে কথা জানিতেন না। তাঁহাদের মাতা কুন্তীদেবীই শুধু তাহা জানিতেন। সুতরাং সূত্রধর গৃহে পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সূত্রধর সন্তানরূপেই পরিচিত ছিলেন। তিনি নীচ জাতীয় বলিয়া অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হন, অথচ উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ না করিলে অর্জ্জুনের সমকক্ষ হওয়া যায় না। এজন্য কর্ণ জাতি গোপন করিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রসিদ্ধ যোদ্ধা পরশুরামের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শিক্ষায় যত্ন ও গুরুভক্তি দেখিয়া মহাবীর পরশুরাম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে সমুদয় ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা দেন। কর্ণ যে ব্রাহ্মণ নহেন একদিনের তরেও পরশুরামের এ সন্দেহ হয় নাই। কর্ণকে সূত্রধর জানিলে তিনি কখনই নীচ বংশীয় বলিয়া তাঁহাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন না। আর ক্ষত্রিয় জানিলে ত দিতেনই না, কারণ তিনি ক্ষত্রিয়ের উপর হাড়ে চটা ছিলেন. একুশ বার তিনি পৃথিবীর ক্ষত্রিয়জাতির সকল লোককে নিধন করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যা কথা কত দিন আর ধরা না পড়িয়া পারে?

পরশুরাম একদিন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আশ্রমের নিকটে শুইয়া পড়িলেন। কর্ণ গুরুর সেবা করিবার জন্য তাঁহার মস্তক নিজের উরুর উপরে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে পরশুরামের নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি আরামে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে একটা ভয়ানক কীট কর্ণের উরুদেশে দংশন করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় কর্ণ অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হইবে আশঙ্কায় নড়িতে পারিলেন না, কীটকে বিনষ্ট করিতেও পারিলেন না। কীট ক্রমে ক্ষত বড় করিতে লাগিল, কর্ণের উরুর রক্তে মাটী ভিজিয়া যাইতে লাগিল, ক্রমে সেই রক্ত পরশুরামের গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। সেই রক্তের স্পর্শে তিনি জাগিয়া উঠিলেন এবং কর্ণকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন. "মিথ্যাবাদী, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা কহিয়া এতদিন প্রবঞ্চনা করিয়াছ। ক্ষত্রিয় ব্যতীত এত কষ্টসহিষ্ণুতা আর কাহারও হইতে পারে না, তুমি কখনই ব্রাহ্মণ নও, নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়। তুমি কে আমাকে শীঘ্র বল।" কর্ণ তখন অত্যন্ত ভীত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং অস্ত্রশিক্ষার লোভে মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরশুরাম তাঁহাকে বলিলেন, "এই পবিত্র স্থানে মিথ্যা-বাদীর স্থান হইতে পারে না। আমার অভিশাপ, মিথ্যা ব্যবহারের জন্য, প্রয়োজনকালে তুমি ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার ভুলিয়া যাইবে।" এত কষ্ট সহিয়াও মিথ্যা ব্যবহারের জন্য কর্ণের সকলই পণ্ড হইয়া গেল। (উদ্ধৃত)

সমালোচনা।

শুক্লা। শ্রীসুখরঞ্জন রায় বি, এ, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৵০ আনা। একখানি খণ্ড কাব্য। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় যত কাব্য ও খণ্ড কাব্য প্রণীত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই ভিত্তি পৌরাণিক কথা। এই কাব্য খানি খুলিয়াই সেই চিত্তরঞ্জন প্রথার ব্যতিক্র দেখিয়া আমরা অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং অতি কষ্টে শেষ করিয়াছি বর্ষা অনতিদূরে,—একটা উপমার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পাঠিকাগণের কথা ছা দিলাম,—পাঠক বর্গ বর্ষাপ্লাবিত কমল-কুমুদ-কহ্লার শোভিত প্রকাণ্ড বিল দেখিয়াছেন কি? শোভার আধা সেই বিল গুলিকে যখন পানার রাশি আসিয়া ঢাকিয়া ফেলে তখন তাহাদের কি অবস্থা হয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? সেই পানাময় বিল গুলির উপর সখের খাতিরে যদি কেহ কোন দিন নৌকা চালনা করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে বলিতে পারি যে সেই পানা বনে সখের নৌকা চালনা এবং এই কাব্য পাঠ ঠিক একই রকম। কাব্যখানি সমগ্রভাবে পড়িয়া সুখ পাওয়া যায় না, এমন কি উৎসর্গ পত্রেই কবির ট-বর্গ প্রীতির পরিচয় পাইয়া হঠাৎ দেহ

কণ্টকিত হইয়া উঠে এবং পুস্তকখানা দু-চার পাতা পড়িয়াই ফেলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যিনি ধৈর্য্য ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন তিনি কাব্যের গল্পাংশের কল্পনা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন, এবং পুস্তকের যেখানে সেখানে অপর্য্যাপ্ত কবিত্ব-কমল লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন। একটা গন্ধমাদনের মত দুর্ব্বহ অমিত্রাক্ষর ছন্দের দরুণ কাব্যখানি একরূপ আপাতশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ছন্দ নির্ব্বাচনে এই শক্তিসম্পন্ন কবির এমন ভুল হইল কেন তাহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। এই সুখ স্বপ্ন সুকুমার কাব্যখানিতে যে এই কাঠ খোট্টা ছন্দ চলিবে না, ইহা কবিকে যে কেহ বলিয়া দিতে পারিত। সেই ছন্দও যদি সর্ব্বত্র অবাধ ও সরল হইত তবুও এক রকম চলিয়া যাইত. কিন্তু তাহাও হয় নাই; স্থানে স্থানে ছন্দ ও ভাষা এমন কটমটে হইয়াছে বিষম সঙ্কটে পড়িয়া পলায়নপর হইতে হয়। কবি অসামান্য শক্তি লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন,—তাঁহার কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি সমস্ত জীবন্ত এবং পরিস্ফুট,—অনেক গুলি কবিত্বময় পংক্তি কাব্যের মধ্যে হীরকের মত ঝিকমিক করিতেছে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা,—"নূতন কিছু" করিতে গিয়া পুনরায় যেন তিনি পথভ্রান্ত না হন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে কাব্যখানি অনেক স্থানে নিতান্ত দুর্ব্বোধ এবং রহস্যময় হইয়া পড়িয়াছে। কবি ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, আকার, সবই ভাল।

ছড়া ও গল্প। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত, ও ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পুস্তকখানির একটী অতি নিপুণ ও সুমিষ্ট ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন,—আমরা পাঠক সমাজের পক্ষ হইতে এই অভয় ঘোষণা করিতেছি যে ভূমিকাটি মোটেই "গুরুগম্ভীর" হয় নাই। বাল্যে সমাস-কণ্টকাকীর্ণ যে সমস্ত সংস্কৃত-গ্রথিত গল্পের রসাস্বাদন করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মহাশয়ের বেত্রের আস্বাদনও লাভ হইয়াছে, ময়রা দোকানের মধুমক্ষিকা মুক্ত মিষ্টান্নের মত তাহাদিগকে আজ সমুখে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যদি তাহাদের অত্যধিক প্রশংসা করিয়া ফেলি তবে বোধ হয় ধর্ম্মতঃ দায়ী হইতে হইবে না।—ছড়া এবং গল্প,—যেন রসের মধ্যে পানতোয়া; অতি মিষ্ট, বলিবার ভঙ্গিতে মিষ্টতর হইয়াছে। কিন্তু লেখকের নিকট এক অভিযোগ আছে—এই শিশুপাঠ্য সুন্দর রচনা গুলিতে অবাধে যে প্রাদেশিকতার স্রোত প্রবাহিত করান হইতেছে ইহার ফল কি দাঁড়াইবে কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? রাম শ্যাম যাহা করিতেছে করুক। বর্ত্তমান লেখকের মত প্রবীণ সাহিত্য-রথীও যদি ইহার প্রশ্রয় দেন তবে "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা"? পুস্তকের মলাটের উপরের ছবিটী বেশ সুন্দর কিন্তু পুস্তকের মধ্যের ছবি গুলিতে পশুগণের চিত্র অতিরিক্ত রূপে মোলায়েম হইয়া গিয়াছে। বানরের চিত্রগুলিতে তো একেবারে দারুইন তত্ত্ব উদাহৃত হইয়াছে। চিত্র সমালোচনা আমাদের মত অনধিকারীর অকর্ত্তব্য, নচেৎ চিত্রগুলির সম্পর্কে অনেক কথা বলিবার ছিল। চিত্রকরগণ অধিকতর অবধানতা অবলম্বন করিবেন এই প্রার্থনা। আর এক কথা, ছড়া গুলির মধ্যে অনেকস্থলে ছন্দপতন হইয়াছে। ধ্বনি সামঞ্জস্যে ছড়ার ছন্দ রক্ষিত হয়। কোনও একটী শব্দ অশোভন রূপে ভাঙ্গিয়া সে ধ্বনি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে ছড়া শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। আমাদের বিনীত অনুরোধ, দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার ছড়াগুলিকে ভাল করিয়া দেখিয়া দিবেন।

ফোয়ারা। শ্রীযুক্ত ললিত মার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৹ আনা। প্রত্যাশিতাগমন সুচির-বিলম্বিত সুহৃদকে লোকে যেরূপে অভ্যর্থনা করে আমরা ফোয়ারাকে বঙ্গ সাহিত্যের আসরে সেইরূপে অভ্যর্থনা করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্ত" "লোকরহস্য,"—দীনবন্ধুর "যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ,"—ইন্দ্রনাথের "পঞ্চানন্দ" এবং যোগেন্দ্র চন্দ্রের "বাঙ্গালী চরিত" বঙ্গ সাহিত্যে যে সুধা-স্রোত লইয়া আসিয়াছিল, বর্ত্তমানে দ্বিজেন্দ্র বাবু, সুরেন্দ্র বাবু এবং ললিত বাবু তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিয়া থাকিলেও সতেজ রাখিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুর হাস্য রস গানে এবং দৃশ্যকাব্য রচনায় পর্য্যবসিত। সুরেন্দ্র বাবুর

রচনাগুলি হাস্যরসাপ্লুত হইলেও বিশেষ গুরুপাক এবং এখনও মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় ললিত বাবুর তরল-সরল রস-টল-মল রচনা গুলি একত্র পাইয়া আজ বড়ই আনন্দ হইতেছে। ললিত বাবুর রচনাগুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচনার যোগ্য. কিন্তু আমাদের স্থান অল্প। মাসিক পত্রে পুস্তক সমালোচনা একরূপ বিড়ম্বনা বিশেষ। অল্প পরিসরের মধ্যে সমালোচনা করিতে যাইয়া সমালোচকের মনের কথা মনেই থাকিয়া যায়, পাঠকও মনে ভাবেন —"বেটা ফাঁকি দিতেছে", এবং গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের প্রতি অবহেলা কল্পনা করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন।

ফোয়ারায় ষোলটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "বারাণসী দর্শনে" নামক কবিতাটি না ছাপিলেই ভাল হইত. এবং "কৃষ্ণকথা" পুস্তকের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় নাই। চুট্‌কি সাহিত্যেরও অনেক গুলি চুটকিই বাদ দিলে ভাল হইত।

"নিবেদনে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে তাহার "ক্ষণ-প্রীতিকর রচনাবলী স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে এমন "দুরাশা" তিনি করেন না। ইহা যদিও তাঁহার বিনয়ের আতিশয্য তবু একথাও আমরা বলিতে বাধ্য যে ফোয়ারায় প্রকাশিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট রচনাই যে স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না, ইহা মিথ্যা নহে। ইহার কারণ দুর্ব্বোধ নহে। তাঁহার 'ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য' 'চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' 'পঞ্চস্বর' 'চতুর্দ্দশ বানর' এবং 'বর্ণমালার অভিযোগ' বিশেষ নিপুণতার সহিত রচিত প্রবন্ধ; কিন্তু এই রচনাবলীর প্রত্যেকটীরই প্রায় পরমুখাপেক্ষী। তাঁহার 'ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য' অনেক ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও অনধিগম্য। আমরা ইহাকে আমাদের দুর্ভাগ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব। কিন্তু তাঁহার 'গরুর গাড়ী' 'সুখের প্রবাস' 'পত্নীতত্ত্ব' যদি বঙ্গভাষায় স্থায়ী আদর লাভ না করে তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব বাঙ্গলা দেশে সমজদার পাঠক নাই। এই প্রবন্ধ ত্রয়ে তিনি যে অনাবিল প্রাণপূর্ণ হাস্যরস এবং কাব্যরস ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য।

পুস্তকের স্থানে স্থানে তিনি যে চাপল্যের মুখোস ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মিষ্টি এবং ঝাল মিশ্রিত বেশ দু চারিটা কথা আমাদিগকে শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা ন্যায্য প্রাপ্তি বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া নিলাম। 'পত্নীতত্ত্ব' এবং 'পান' পুস্তকের শেষে গিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় 'গবেষণার নিমন্ত্রণ' এবং 'বর্ণমালার অভিযোগ' পুস্তকের শেষে গেলে ভাল হইত; এই খয়েরশূন্য 'পান' হাতে লইয়া গ্রন্থকারের নিকট হইতে বিদায় হইবার ইচ্ছা আদৌ নাই। 'গবেষণার নিমন্ত্রণে' 'পত্নীতত্ত্বের' উল্লেখ আছে, এই জন্য 'পত্নীতত্ত্ব' তাহার আগে যাওয়া ভাল মনে করি।

নির্ব্বাণ। কবিতাগ্রন্থ; জনৈক বঙ্গনারী প্রণীত। হুগলী, ভবানী যন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্যের উল্লেখ কোথাও পাইলাম না। আমরা এই অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকর্ত্রী প্রণীত কবিতাগ্রন্থখানি পড়িয়া পুলকিত হইয়াছি। পুস্তকের প্রারম্ভেই লম্বা শুদ্ধিপত্র দেখিয়া কতকটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম. কিন্তু কবিতার পর কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব দ্রুত তিরোহিত হইতে আরম্ভ করিল এবং লেখিকাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিয়া পুস্তক শেষ করিয়া উঠিলাম। বস্তুতঃ মহিলা কবির এরূপ সুন্দর কবিতা আমরা বহুদিন পাঠ করি নাই। কবিতাগুলির গতি প্রায়ই অবাধ ও জীবন্ত।

সমালোচক।